ভারতের শিল্প-সংস্কৃতির পটভূমিকায়

বিষ্ণুপুরের মন্দির-টেরাকোটা



চিত্তরঞ্জন দাশগুপ্ত

প্রকাশক ঃ শ্রীমতী সুষমা দাশগুপ্ত
বিষ্ণুপুর (বাঁকুড়া)

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৪০৭ (ইং ২০০০)

মুদ্রণ ঃ ঘোষ প্রিন্টার্স
শাঁখারীবাজার
বিষ্ণুপুর (বাঁকুড়া)

পরিবেশক ঃ দাশগুপ্ত এণ্ড কোম্পানী প্রাঃ লিঃ
৫৪/৩ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা ৭৩

॥ উৎসর্গ ॥

ঠাকুরমা, বাবা ও মায়ের স্মৃতিতে

ঋণ স্বীকার—

প্রধানতঃ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমীর ৯০০০ (নয় হাজার) টাকা অনুদানকে সম্বল করেই এই গ্রন্থ রচনায় হাত দেওয়া হ'য় । প্রয়োজনের তুলনায় কম হলেও, ঐ টাকাই আমার এ গ্রন্থ রচনার মূল প্রেরণা । এ সাহায্য না পেলে এ কাজে হয়ত হাত দেওয়াই হ'ত না । এজন্য বাংলা আকাদেমীকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই ।

অফ্‌সেটের যুগে মফঃস্বলের অতি ক্ষুদ্র একটি প্রিন্টিং প্রেসে ছাপা এই বইটি আদৌ দৃষ্টিনন্দন হবেনা, বরং স্থান বিশেষে দৃষ্টি-কটু হবে, এটা বিলক্ষণ জানি । তবু এই প্রেসের মালিক শ্রীঅরুণ ঘোষ-কে কৃতজ্ঞতা জানাই । তিনি অত্যন্ত কম খরচায় বইখানি শুধু ছেপেই দেননি, একই প্রুফ বারংবার দেখার এবং প্রয়োজনবোধে ঐ অবস্থাতেই সংযোজন-বিয়োজনের ব্যবস্থা করে অশেষ উপকার করেছেন । শুধু তাই নয়, তিনি তাঁর অর্থাভাব সত্ত্বেও একাধিক কিস্তিতে টাকা দেবার সুযোগ করে দিয়েছেন । তাঁর এই অকুণ্ঠ সহযোগিতা না পেলে আমার মত একজন অবসরপ্রাপ্ত অসচ্ছল অবস্থার শিক্ষকের পক্ষে গ্রন্থখানি প্রকাশ করা সম্ভব হত না ।

টেরাকোটার আলোক চিত্রগুলি যথেষ্ট পরিশ্রম করে সযত্নে তুলে দিয়েছেন রণধীর রায় (বাবলু) ও আশিস দাস (ছবিঘর ষ্টুডিও) । স্কেচগুলি করে দিয়েছেন কলকাতার সৌমিত্র সেনগুপ্ত, সৌরভ জানা আর উলুবেড়িয়ার সুদীপ রায় (?) । মন্দির-টেরাকোটা অবলম্বনে "হেডপীস" ও "টেলপীস"এর স্কেচগুলি এঁকে দিয়েছেন ফাল্গুনী হাজরা, অসিত কর্মকার, আমার পুত্র বাসব দাশগুপ্ত ও ভ্রাতুষ্পুত্র নীলাঞ্জন দাশগুপ্ত । ব্লক ও মুদ্রণের কাজে আন্তরিকতার সঙ্গে সহযোগিতা করেছেন কলকাতার মেসার্স ইন্ডিয়ান ফটো এনগ্রেভিং কোম্পানী ও ইম্প্রেশন হাউস । এ ব্যাপারে সহযোগিতা করেছেন দীপক রায়, গৌতম কর্মকার, দিগন্ত কর্মকার । প্রচ্ছদ এঁকেছেন— সৌমিত্র সেনগুপ্ত । কলকাতার কাজে বন্ধুবর লক্ষ্মীকান্ত নাগের প্রচুর সহযোগিতা পেয়েছি । এছাড়াও আরও অনেকের সহযোগিতা পেয়েছি, স্থানাভাবে নামোল্লেখ সম্ভব হ'ল না, এজন্য ক্ষমাপ্রার্থী । প্রায় কুড়িবছর আগে যে দুজন মানুষের অনুপ্রেরণা আর সহযোগিতায় প্রকাশিত আমার "বিষ্ণুপুরের মন্দির-টেরাকোটায়" বর্তমান গ্রন্থের সূচনা হয়েছিল সেই মাণিকলাল সিংহ আর অনিল কর্মকারের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এই ঋণ স্বীকার প্রসঙ্গ শেষ করলাম ।

ঈশ্বরের আশীর্বাদে গ্রন্থখানি পাঠকদের মনোরঞ্জন করতে পারলে কৃতার্থ হব । বিনীত—

বিষ্ণুপুর : দশহরা : ১৪০৭ গ্রন্থকার

—প্রস্তাবনা—

প্রায় কুড়িবছর আগে লিখেছিলাম "বিষ্ণুপুরের মন্দির-টেরাকোটা" প্রধানতঃ মাণিকবাবুর (মাণিকলাল সিংহ) উৎসাহ আর অনুপ্রেরণায়। কুড়িবছর পরে আবার একই বিষয়ের উপর লিখতে বসে মনে হ'ল, আলোচ্য বিষয়ের প্রেক্ষাপট বা পটভূমিকাটি প্রশস্ত বা বিস্তৃততর করার প্রয়োজন আছে। কারণ বিষ্ণুপুরের মন্দির-টেরাকোটা কোন বিচ্ছিন্ন বা স্বতন্ত্র শিল্পোদ্যোগ মাত্র নয়—ষোড়শ-সপ্তদশশতকে পূর্বভারতের অন্যতম বিশিষ্ট কলানগরীরূপে বিকশিত বিষ্ণুপুরের সামগ্রিক শিল্প বিকাশেরই অন্যতম অভিব্যক্তি। বিশেষভাবে বিষ্ণুপুরকে কেন্দ্র করে বিকশিত হলেও এটি সর্বভারতীয় শিল্পকলারই এক অন্তিম-মধ্যযুগীয় বিকাশ। এখানে, মোগল-ভারতের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ক্লাসিক-উত্তর প্রাক্-মধ্যযুগের সর্বভারতীয় সংস্কৃতির বিবর্তিত ধারাটিরই এক মূর্ত প্রকাশ ঘটেছে। শুধু বিষয়বস্তুর দিক থেকেই নয়, একটি পরিণত সর্বভারতীয় কেন্দ্রীয় চিত্ররীতিও এর অধিকাংশ টেরাকোটা চিত্রকে যে বিস্ময়কর শিল্পবৈভবে শ্রীমণ্ডিত করেছে তা ভারতীয় শিল্পকলারই এক সুসমৃদ্ধ রীতির বিবর্তিত রূপ। এই মন্দির-টেরাকোটা-শিল্পের পাশাপাশি বিকশিত মিনিয়েচার পাটাচিত্রে (পুঁথির মলাটপাটা) এর স্বরূপটি অধিকতর পরিস্ফুট—সমসাময়িক-কালে বিকশিত রাজস্থানী (গুজরাটি এবং মোগল চিত্ররীতির মিলিত প্রকাশ) চিত্রকলারই এটি একটি রূপান্তর। উড়িষ্যা এর মূল উৎসস্থল। তাই এখানের মন্দির-টেরাকোটায় গুজরাটি, মোগল আর ওড়িশি চিত্রের বহু বহিরঙ্গ উপাদান একত্রিত। এখানের টেরাকোটা-চিত্রের বিষয়বস্তু, মোটিফ সবকিছুর মধ্যেই সারা ভারতেরই মুখচ্ছবি প্রতিবিম্বিত। আঞ্চলিকতার চিহ্ন এখানে নাই বল্লেই চলে।

মোগল-ভারতের পটভূমিকায়, মূলতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রেরণায় নির্মিত এই মন্দির-টেরাকোটায় ক্লাসিক প্রভাবই অগ্রগণ্য।

একথা সর্বজন বিদিত যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মাধ্যমে প্রাচীন ভারতীয় ক্লাসিক সংস্কৃতিরই পুনরুজ্জীবন ঘটেছিল। গোস্বামীরা সচেতনভাবেই আঞ্চলিকতার ঊর্ধ্বে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠার জন্য 'গোস্বামী সিদ্ধান্ত'কে একটি সর্বভারতীয় রূপদানে প্রয়াসী হয়েছিলেন। ভাষা মাধ্যম ছিল মূলতঃ সংস্কৃত। এমন কি আচার্য সুকুমার সেন মনে করেন আঞ্চলিকতা বিলোপের অভিপ্রায়ে তাঁরা শ্রীচৈতন্যদেবকেও প্রায় পটাবরণে ঢেকে দিয়ে শ্রীকৃষ্ণলীলার উপরেই ভিত্তি করেছিলেন। বলা বাহুল্য বিষ্ণুপুরের সপ্তদশ-শতকের 'মন্দির-টেরাকোটা'তেও শ্রীচৈতন্য প্রায় উহ্য। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের কৃত্য নবাঙ্গ ভক্তি সর্বভারতীয় পৌরাণিক বৈষ্ণবধর্মেরই অন্তর্ভুক্ত। টেরাকোটায় এ গুলিকে রূপায়িত করার ক্ষেত্রেও বহুস্থানে গোস্বামী সিদ্ধান্তকে অনুসরণ করেই সর্বভারতীয় ক্লাসিক চিত্র-ভাস্কর্যের মোটিফগুলিকে মাধ্যম রূপে গ্রহণ করা হয়েছে। সমসাময়িক ঘটনা চিত্রণের ক্ষেত্রেও ক্লাসিক ভারতের পাশাপাশি মোগল ভারতই চিত্রিত হয়েছে। মোগলভারতের সামন্ত-জগতের বিলাস-ব্যসন যুদ্ধ বিগ্রহ, আভিজাত্য-আধিপত্য এবং সমসাময়িক কালের মোগল-রাজনৈতিক সংকট পর্তুগীজ সংঘর্ষ ইত্যাদি চিত্রিত হয়েছে।

ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে যে কোন কারণেই হোক বিষ্ণুপুর তার আঞ্চলিকতার ঊর্ধ্বে অন্যতম মোগল রাজধানীর আদর্শেই বিকশিত হয়েছিল। গড়-গড়খাই, মোগল রীতিতে নির্মিত দুর্গ-দুর্গদ্বার, বর্তমান রাজবাড়ীর পশ্চাতে অবস্থিত অধুনা ধ্বংসপ্রাপ্ত প্রাসাদের ভগ্নাবশেষ সর্বোপরি কেল্লাঅঞ্চল সংলগ্ন বিশাল "কামান ঢালার" প্রান্তর আর বিশালকায় দলমাদল কামান একে ঢাকা মুর্শিদাবাদের সমকক্ষও করেছিল।

মোগলরা স্বাভাবিকভাবেই রাজধানীর বাইরে আগ্নেয়াস্ত্র নির্মাণ বা সংগ্রহে অনুমতি বা সম্মতি দিতেন না। ইতিহাসেএর সমর্থন আছে। "The Mughals made every effort to discourage gun-casting or procurement of artillery by local aristocrats – The Mughal Empire by John F Richard P.80 1998)

অথচ বিষ্ণুপুরে আগ্নেয়াস্ত্র সংগ্রহই শুধু নয়, কামান নির্মাণেরও যে এলাহি ব্যবস্থা ছিল কেল্লা সংলগ্ন "কামান ঢালার" মাঠই তার সাক্ষ্য বহন করছে। অবস্থান-মাহাত্ম্যেই এই আয়োজন। উড়িষ্যা থেকে সম্ভাব্য পাঠান বা আফগান আক্রমণ প্রতিহত করার জন্যই বিষ্ণুপুর একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিতে পরিণত হয়েছিল। এই গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানই বিষ্ণুপুরকে রাজনীতিগতভাবে এক বিশেষ স্থান দিয়েছিল এবং বিষ্ণুপুর আঞ্চলিকতার ঊর্ধ্বে প্রায় একটি মোগল রাজধানীর মর্যাদা লাভ করেছিল।

প্রতিরক্ষা ও প্রশাসনের দিক থেকে সমসাময়িক মোগলভারত এবং সংস্কৃতির দিক থেকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মাধ্যমে আগত ক্লাসিক সংস্কৃতি বিষ্ণুপুরকে সর্বভারতীয় বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে বিকশিত বিষ্ণুপুরে আঞ্চলিকতার ঊর্ধ্বে সমসাময়িক মোগল ভারতের সঙ্গে ক্লাসিক ভারতের সাংস্কৃতিক বাতাবরণটিই প্রতিবিম্বিত হয়েছে। এখানের স্থাপত্য, টেরাকোটা ভাস্কর্য, চিত্রকলা এবং সঙ্গীতে সর্বভারতীয় একটি প্রেক্ষাপট লক্ষ্য করা যায়।

আঞ্চলিকতার ঊর্ধ্বে সর্বভারতীয় সংস্কৃতি ক্ষেত্রে এই উলম্ব উত্তরণের পশ্চাতে মল্লরাজাদের সচেতন প্রয়াস কাজ করেছে, এমন মনে করা অসঙ্গত নয়। কারণ প্রথমাবধি রাজপুত কুলগৌরব দাবী করে এ'রা আঞ্চলিকতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে উচ্চ অবস্থানে প্রতিষ্ঠিত হতে চেয়েছেন। অথচ এ'রা যে আঞ্চলিক কৌম সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন আলোচ্য গ্রন্থে তার বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। নিজেদের কৌম-ধর্ম এবং সাংস্কৃতিকে আচ্ছাদিত করে সর্বভারতীয় কোন ধর্ম-সংস্কৃতিতে উত্তরণের প্রয়াস চিরন্তন। বিশেষ করে শাসন যন্ত্রকে সফলভাবে পরিচালনার জন্য শাসক-শাসিতের মধ্যে একটা সসম্ভ্রম ব্যবধান সৃষ্টিরও প্রয়োজন থাকে। তাই অন্যান্য শাসকদের মতই গোত্রান্তরিত হয়ে একটা ব্যবধান রচনা করতে চেয়েছিলেন মল্লরাজারা।

কিন্তু মল্লরাজাদের ক্ষেত্রে এই ব্যবধান শুরু হয় নাই। মূলতঃ আদিবাসী অধ্যুষিত মল্লভূমের সাধারণ জনজীবন থেকে মল্লরাজারা ছিন্নমূল হয়েছিলেন। তাঁদের আমন্ত্রণে অন্যদেশ থেকে আগত এবং তাঁদের প্রদত্ত ভূসম্পদপুষ্ট উচ্চশ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের স্বাভাবিক প্রভাব প্রতিপত্তির ফলে এখানের সাধারণ মানুষ ক্রমশঃ রাজাদের কাছ থেকে যে শুধু দূরবর্তী হয়েছিল তাই নয় - নূতন জটিল শাসন ও সমাজ ব্যবস্থায় একটি নিপিষ্ট ও শোষিত শ্রেণীতে পরিণত হয়েছিল। পূর্বতন কৌম সমাজের নিবিড় বন্ধন এবং আঞ্চলিক ভূমিপ্রীতির পরিবর্তে শ্রেণী বিভক্ত গ্রাম সমাজের স্বাভাবিক ব্যবধান তো ছিলই। মল্লরাজাদের আখেটিক বা শিকারী জীবনের স্মৃতিটুকু মাত্র রাজকীয় 'এখান' শিকারে (১লা মাঘ) বেঁচেছিল। দুটি সুস্পষ্ট মেরুতে বিভক্ত হয়েছিল মল্লভূমের সমাজ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম সংস্কৃতির বিরাট দার্শনিকতা এখানের আদিম জনজীবনে যেমন স্বক্ষেত্র খুঁজে পায়নি— মোগলাই শাসন ব্যবস্থাও তেমনি রাজা-প্রজায় বিপুল ব্যবধান সৃষ্টি করেছিল। ফলে মল্লরাজ্যের পতন ও অবসান বিপুল জনজীবনে কোন দাগ কাটে নাই। অথচ সমসাময়িককালে এখানেই আঞ্চলিক জমিদারদের নেতৃত্বে "চুয়াড় বিদ্রোহ" ব্রিটিশ শাসনকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল।

যাইহোক, মল্লরাজারা বিষ্ণুপুরকে আঞ্চলিকতার ঊর্ধ্বে উত্তীর্ণ করে যে প্রশস্ততর সর্বভারতীয় রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন তার একদিকে ছিল সমকালীন মোগল-ভারত আর অন্যদিকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মাধ্যমে বিকশিত ক্ল্যাসিক সংস্কৃতি, একথা আগেই বলা হয়েছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রেরণায় বিষ্ণুপুরের ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে বিকশিত সংস্কৃতির সর্বত্র এক ক্ল্যাসিক বাতাবরণ দুর্ণিরীক্ষ্য নয়। মন্দির টেরাকোটাতেও স্বাভাবিকভাবেই সর্বভারতীয় ক্ল্যাসিক শিল্প সংস্কৃতিরই আভাস সুস্পষ্ট। তাই সর্বভারতীয় শিল্প সংস্কৃতির পটভূমিকায় বিষ্ণুপুরের মন্দির-টেরাকোটার বিচার বিশ্লেষণ করা হ'ল।

— — — —



টেরাকোটা-শিল্প-জগতের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

বিষ্ণুপুরের মন্দির-টেরাকোটা সম্পর্কে আলোচনা করার আগে বাংলা তথা ভারতের টেরাকোটা-শিল্পের বিচিত্র জগতটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া, মনে হয়, অপ্রাসঙ্গিক হবেনা। মন্দিরের অলঙ্করণ হিসাবে ভাস্কর্য খচিত টেরাকোটা-টালির বিন্যাস অনেক পরবর্তী কালের ঘটনা হলেও তাবৎ টেরাকোটা-শিল্পের জগৎ সুপ্রাচীন। এ জগৎ তার ধাতুপ্রকৃতিতে অনেকটা আন্তর্জাতিকও বটে। শুধু টেরাকোটা কেন, পৃথিবীর প্রাগৈতিহাসিক আদিম শিল্পের সমগ্র জগতটাই কমবেশী আন্তর্জাতিক। এক অংশের প্রাগৈতিহাসিক শিল্পকৃতির সঙ্গে অন্য অংশের কোন না কোন সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। পৃথিবীর অন্যান্য স্থানের গুহাচিত্রের সঙ্গে আমাদের দেশের গুহাচিত্রের একটা ধাতুগত মিল দুর্নিরীক্ষ্য নয়। প্রাগৈতিহাসিক মানুষের আদিম শিল্প-কৃতির মধ্যে মৃৎশিল্পের বিকাশ গুরুত্বপূর্ণ। টেরাকোটা বা দগ্ধ-মৃত্তিকা-জাত দ্রব্যগুলি মানব সভ্যতার ইতিহাসে নানা কারণে উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক উপাদান। শুধু আদিম মানুষের বিচিত্র শিল্পকলার নিদর্শন হিসাবেই নয়, মানুষের আদিমতম প্রযুক্তি বিদ্যার ক্রম-বিকাশের স্বাক্ষরও এতে বর্তমান। শুধু 'চাকা'র সুদক্ষ ব্যবহারে পাতলা সুগঠিত মৃৎপাত্র নির্মাণ বা বিচিত্র পদ্ধতি-প্রয়োগে রচিত সুদর্শন মূর্তিকার রূপারোপেই নয়, নিয়ন্ত্রিত অগ্নিশিখার সুনির্দিষ্ট উত্তাপে জিনিষগুলি পুড়িয়ে নেবার কৃৎ-কৌশলে একপ্রকার আদিম বৈজ্ঞানিক কারিগরিও এই টেরাকোটা-শিল্পেই ধরা পড়ে[১]। মনে হয় তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতির যুগে

১ মৃৎশিল্পের মাধ্যমেই বোধহয় মানুষের একধরণের আদিম রাসায়নিক প্রয়োগ-পদ্ধতির জ্ঞান সবচেয়ে বেশী লক্ষ্য করা যায়। এটা অবশ্য তার দীর্ঘদিনের পর্যবেক্ষণ প্রসূত অভিজ্ঞতালব্ধ। মৃত্তিকা নির্বাচন, আর তাকে প্রস্তুত করার ব্যাপারে

আকর থেকে ধাতুনিষ্কাষণ-প্রক্রিয়াকে কেন্দ্র করে অগ্নিশিখার উপরে মানুষ যে নিয়ন্ত্রণ কায়েম করেছিল, তারই ফলশ্রুতি এ যুগের মৃৎপাত্র ও দগ্ধ-মৃত্তিকার মূর্তিগুলি[২]। আগেই বলেছি টেরাকোটা-শিল্পের জগৎ আন্তর্জাতিক। এখানে বিভিন্ন দেশ আর জাতির বিচিত্র সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান। এই জগতেই প্রথম অনুভব করা যায় প্রাচীন ভারতের শিল্প জগতে বহির্ভারতীয় প্রভাবের পদসঞ্চার—সিন্ধু-সভ্যতায় সুমেরীয় প্রভাব, প্রাক্-মৌর্যযুগে পশ্চিম-এশীয় প্রভাব, মৌর্যযুগে গ্রীক-পারসিক প্রভাব, সুঙ্গযুগে পশ্চিম-এশীয় প্রভাব আর কুষাণযুগে গ্রীক প্রভাব। আবার এখানেই লক্ষ্য করা যায় সব প্রভাবকে আত্মস্থ আর অতিক্রম করে ভারতের একটি নিজস্ব শিল্প সত্বার উদার অভ্যুদয়। আকরথেকে ধাতু গলানোর আদিম প্রক্রিয়া করায়ত্ব হওয়ার ফলে, মানুষের সভ্যতা একলাফে যে অনেকখানি এগিয়ে গেছল আর একে অনুসরণ করে যে একাধিক ধারাবাহিক আবিষ্কার-উদ্ভাবন মানুষের সভ্যতাকে সুসমৃদ্ধ করেছিল, সে বৃত্তান্তও এই টেরাকোটা-শিল্পেরই নানাপর্যায়ে স্থায়ীভাবে মুদ্রিত থাকার সুযোগ লাভ করেছে। একটি বিচিত্র বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার এই আদিমযুগে তাকে সৃষ্টির আনন্দের সঙ্গে স্রষ্টার আত্মপ্রত্যয় দিয়েছিল। পোড়ামাটির মানচিত্রে প্রাচীন মানব-সংস্কৃতির ক্রমবিকাশের গতিপথ স্থায়ীভাবে মুদ্রিত হয়ে প্রায় অবিনশ্বরত্ব লাভ করেছিল বলেই আজ হাজার হাজার বছর পরেও গবেষকরা সেই প্রাগৈতিহাসিক জগতের বহু অন্ধকার কক্ষে প্রবেশের চাবিকাঠি খুঁজে পেয়েছেন। সুপ্রাচীন সুমের কিংবা সিন্ধু সভ্যতার নাড়ী-নক্ষত্র জানার অন্যতম নির্ভরযোগ্য অবলম্বন হ'ল দগ্ধ মৃত্তিকা জাত পুরাবস্তুগুলি। এইসব প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নক্ষেত্র থেকে আবিষ্কৃত পোড়ামাটির মৃৎ পাত্রগুলির উপর রীতিবদ্ধ (স্টাইলাইজড্) শৈলীতে আঁকা ধারাবাহিক চিত্রমালা বা উৎকীর্ণ চিত্রলিপি-যুক্ত পোড়ামাটির ফলক (শীল) মানুষের লিপি আবিষ্কারের 'মাইলস্টোন' বলে পন্ডিতরা মনে

....

তো বটেই, তাকে পুড়িয়ে রূপান্তর ঘটানোর ক্ষেত্রে তার রাসায়নিক কৃৎকৌশলের সমুন্নত বিকাশ ঘটেছে। পোড়ামাটির দ্রব্যগুলিতে সচরাচর যে কালো আর লাল রং দেখা যায় তা রাসায়নিক প্রক্রিয়ারই ফল। মাটির দ্রব্যগুলিকে খোলা চুল্লীতে পোড়ালে, মাটির মধ্যে লোহাজাত যে লবণ থাকে তা অক্সিজেনের সংস্পর্শে আসায় লাল ফেরিক অক্সাইড উৎপন্ন হয়। ফলে দগ্ধ মৃত্তিকার দ্রব্যগুলির রং হয় লাল। আর দ্রব্যগুলি কাঠ কয়লায় ঢেকে পোড়ালে ঐ লোহাঘটিত লবণ বিজারিত হয়ে ফেরোসো-ফেরিক অক্সাইডে পরিণত হয় — আর পোড়ানো দ্রব্যগুলির রং হয় কালো বা ধূসর।

করেন। শুধু তাই নয়, প্রাগৈতিহাসিক যুগের ধর্মচিন্তা, ব্যবসা-বাণিজ্য শিল্পচিন্তা, এককথায় আদিম মানুষের সভ্যতার স্বরূপ উদ্ঘাটনের ক্ষেত্রে টেরাকোটা-সামগ্রীগুলির ভূমিকা অসামান্য। আদিম মানুষের বিচিত্র ধর্মচিন্তার বিভিন্ন সূত্র সন্ধানের অন্যতম আদিনিকেতনও এই টেরাকোটার জগৎ। পশ্চিম-এশীয় অঞ্চলে খননের ফলে তাম্রযুগের বেশকিছু নগ্ন নারী মূর্তিকার আবিষ্কার ঘটেছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে, প্রায় সমগ্র পশ্চিম-এশীয় অঞ্চলে, প্রচলিত মাতৃকা পূজার এগুলি মূর্তি প্রতীক বলে পণ্ডিতরা মনে করেন। একদা সুপ্রাচীন অতীতে, সুমের, মেসোপটেমিয়া প্রাচীন ইরাণ প্রভৃতি পশ্চিম-এশীয় সংস্কৃতি কেন্দ্রগুলি থেকে, আরম্ভ করে পূর্ব-গাঙ্গেয় উপত্যকা পর্যন্ত এক বিস্তৃত অঞ্চলে ছিল এই মাতৃকা পূজার বহুল প্রচলন। বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকেও নানা ধরণের মাতৃকামূর্তি পাওয়া গেছে। কুমারস্বামী এই জাতীয় অধিকাংশ মূর্তিকে ইন্দো-সুমেরীয় আখ্যায় ভূষিত করেছেন। সুপ্রকট জননেন্দ্রিয় যুক্ত এইসব মাতৃকামূর্তি উর্বরতাবাদেরই প্রতীক। এসব মূর্তিগুলি থেকে এ ধারণা করা অযৌক্তিক হবেনা যে, মানুষ তার আদিম জীবনে, স্বাভাবিকভাবেই, জনসম্পদ আর শস্যসম্পদ কামনায় 'উর্বরতার'ই সাধনা করেছে। মাতৃকাদেবীরা অনেক স্থানেই মৃত্তিকা বা পৃথিবী দেবতার সঙ্গে একীভূত হয়েছেন।'মেক্সিকো'র যিনি মাতৃদেবী তিনি আবার পৃথিবী দেবীও ছিলেন। প্রাচীন জার্মানরা যে 'নের্থাস্' দেবীর উপাসনার জন্য সমবেত হতেন, ট্যাসিটাসের মতে তিনি হলেন মাতা পৃথিবী। প্রাচীন গ্রীকদেবী র্হী (Rhea) পৃথিবী দেবী ছিলেন; রোমান দেবী সিবিলিও (Cybele) পৃথিবী আর মাতৃকাদেবীর মিশ্রিত রূপ। এঁরা শস্য আর প্রজনন শক্তির প্রতীক। উর্বরতার মূর্ত প্রতীক অমিত প্রজনন সম্ভাবনাময়ী মাতৃকা (Mother Goddess) আর মৃত্তিকা (Earth-Godess) দেবী আদিম মানুষের উর্বরতা-চেতনায় অভিন্ন এবং সমার্থক হয়ে উঠেছেন এবং পৃথিবীর এক বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে পূজিতা হয়েছেন।

. ...

রাসায়নিক বিক্রিয়ার কথা সর্বজন বিদিত ; কিন্তু সবিস্তারে এই প্রক্রিয়া-বিক্রিয়ার উল্লেখের কারণ হ'ল, এরই মধ্যে টেরাকোটা-শিল্পের জন্ম বৃত্তান্ত আর বর্ণ বৃত্তান্ত নিহিত রয়েছে। বিষ্ণুপুরের নিকটবর্তী (বাঁকুড়া জেলার তালডাংরা থানার অন্তর্গত) মৃৎশিল্পের প্রসিদ্ধ কেন্দ্র 'পাঁচমুড়া' গ্রামের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। এখানের শিল্পীরা আজও সেই আদিম গঠনের চুল্লীতে প্রায় সেই সনাতন আদিম পদ্ধতিতেই জঙ্গলের পাতার আগুনে তাঁদের শিল্পদ্রব্যগুলি

সিন্ধু-উপত্যকায় অর্ধচন্দ্রাকৃতি-মস্তকাভরণযুক্ত বেশ কিছু মাতৃকা বা মৃত্তিকা (বা প্রকৃতি) দেবীর মূর্তি পাওয়া গেছে, যেগুলির উৎস স্থল ফ্রিজিয়া (আনাতোলিয়া) বলে অনুমান করা হয়েছে[৩]। হরপ্পা থেকে প্রাপ্ত, এ বিষয়ে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ, একটি টেরাকোটা ফলকের প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। এই ফলকটিতে দেখা যায়, সম্পূর্ণ 'উল্টানো' ভঙ্গীতে (up side down) উৎকীর্ণ একটি নারীমূর্তির ফাঁক করা দুটি পায়ের মাঝখান থেকে বা গর্ভদেশ থেকে একটি চারা গাছ নির্গত হচ্ছে[৪]। নারী আর চারাগাছের একত্র সমন্বয়ে রচিত এই চিত্রটিতে উদ্ভাসিত উর্বরতা-শক্তির এই বিচিত্র ব্যঞ্জনা, আদিম-লোকমানসের ধর্মচিন্তার ধাতু প্রকৃতিতে নিহিত প্রজনন-মনস্কতার দৃষ্টান্তরূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। মাশাল 'ভিটা' থেকে প্রাপ্ত গুপ্তযুগের প্রথমের দিকের অনুরূপ একটি টেরাকোটা ফলকের উল্লেখ করেছেন। এটিতে দেখানো হয়েছে (চারাগাছের পরিবর্তে একটি পদ্ম, দেবীর স্কন্ধদেশ পূর্বোল্লিখিত মৃৎফলকে উৎকীর্ণ চিত্রের মত গর্ভদেশ থেকে নয়) থেকে উদ্গত হচ্ছে। এই দুটি টেরাকোটা চিত্রকে অনেকে 'পুষ্টি'র (nourishment) প্রতীক বলে মনে করেন। এ ধরণের বিভিন্ন বিচিত্র বহু টেরাকোটার আবিষ্কার ঘটেছে মোহেন-জো-দড়ো ও হরপ্পাতে। অধ্যাপক কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী বলেছেন ঃ "মোহেন-জো-দড়ো ও হরপ্পাতে অসংখ্য মৃন্ময়ী-মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। সিন্ধু-উপত্যকা এবং বেলুচিস্থানের মৃন্ময়ী মূর্তির মতো অনেক মূর্তি

পুড়িয়ে নেন। এঁদের সমস্ত শিল্প নিদর্শনও মূলতঃ দুটি বর্ণে বিভক্ত—কালো আর লাল। পোড়ামাটির ফাঁপা হাতি ঘোড়া আর 'মনসার ঝাড়' মূলতঃ ঐ দুটি বর্ণেরই হয়। মন্দির-টেরাকোটাগুলিও মনে হয় এ ধরণের পদ্ধতিতেই পোড়ানো হ'ত। ষোল-সতেরো শতকের বিষ্ণুপুরের মন্দির-টেরাকোটাগুলি খুঁটিয়ে দেখলে, টেরাকোটার স্বাভাবিক লালচে রঙের সঙ্গে স্থানে স্থানে কালোর আভাস লক্ষ্য করা যায়। এযুগের টেরাকোটা চিত্রগুলি অনুচ্চ বেসু-রিলিফে উদ্গত দারুশিল্পের সমগোত্রীয় হলেও পোড়ানোর পর্যায়টি কুম্ভকার শিল্পীদের দ্বারা সম্পন্ন হ'ত বলেই মনে হয়। ঊনিশ-শতকের মন্দির-টেরাকোটার চিত্রগুলিতে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই, কুম্ভকার শিল্পীদের বস্তাবলেপ সুস্পষ্ট। এ যুগের মন্দির-টেরাকোটা ফলকে সম্মুখভঙ্গীতে উদ্গত চকচকে লাল মূর্তিগুলি সর্বতোভাবে কুমোর-শিল্পীদের কাজ বলেই মনে হয়। কুম্ভকার শিল্পীদের ব্যবহৃত 'গদ' বা 'বণক' মাখিয়ে পোড়ানোর সুস্পষ্ট ছাপ এগুলিতে বর্তমান।

পারস্য, এলাম, মেসোপটেমিয়া, টাসকাস্পিয়, এশিয়া মাইনর, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, সাইপ্রাস, ক্রীত, বলকান উপদ্বীপ এবং ইজিপ্ট প্রভৃতি দেশেও দেখতে পাওয়া যায়।"[৫] শক্তি বা মাতৃকা দেবীকে মূলতঃ অনার্য দেবতা বলে মনে করা হলেও ঋকবেদে মাতা পৃথিবীর উল্লেখ দুর্নিরীক্ষ্য নয়। বিশেষতঃ পিতা 'দ্যৌ' এর সঙ্গে পৃথিবীমাতার একত্র উল্লেখ এবং 'দ্যৌ'-রূপ পিতার রেতঃ রূপ বর্ষার সিঞ্চনে মাতা-পৃথিবীর গর্ভে শস্য ধারণের বৈদিক ইঙ্গিত প্রজনন-শক্তিরই দ্যোতনা বহন করছে বলে মনে হয়। কিন্তু বেদের এই 'পৃথিবীমাতা'র সঙ্গে সিন্ধু-উপত্যকার মাতৃকা মূর্তিগুলির কোন বৈজ্ঞানিক যোগসূত্র স্থাপন করা কোনভাবেই সম্ভব নয় বলে পন্ডিতরা মনে করেন। তাই এই বিতর্কের মধ্যে প্রবেশ না করে, কোন কোন নৃতত্ত্ববিদ্ যথার্থভাবেই এই মন্তব্য করেছেন যে, মোহেন-জো-দড়োর মানুষের আদিম ধর্মাচারের কথা বৈদিক যুগের ভারতীয়-আর্যদের অজ্ঞাত ছিলনা।[১] যাই হোক, কোন বিতর্কে প্রবেশ না করেও একথা সঙ্গতভাবেই বলা চলে যে, নানাসূত্রে বিবৃত এই মাতৃকা আর মৃত্তিকার অমিত প্রজনন-শক্তি-চেতনাই পরবর্তীকালে শক্তিসাধনার রূপ পরিগ্রহ করেছে। এমন কি মাতৃকা মূর্তিগুলির সুপ্রকট জননেন্দ্রিয় আদিমকালে প্রতীকরূপেই চিহ্নিত হয়েছিল এবং পরবর্তীকালে বিবর্তিত আর অনেকাংশে রূপান্তরিত হয়ে তান্ত্রিক যন্ত্রে পরিণত হয়েছে এমন ধারণা করাও সম্পূর্ণ অযৌক্তিক নয়। যেমন আদিমকালে পূজিত লিঙ্গ প্রতীকের প্রকট বাস্তবতা কালক্রমে বিবর্তিত এবং ক্রমাগত রূপান্তরিত হয়ে বর্তমানে পূজিত লিঙ্গ-প্রতীকে এক রীতিবন্ধ রূপ নিয়েছে। কিন্তু শুধু আদিম ধর্মাচার-প্রসঙ্গই নয়, আরও নানা গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক এবং নৃতাত্ত্বিক তথ্যও প্রাচীন টেরাকোটা 'শীল' বা মূর্তিগুলি থেকে পাওয়া যায়। মোহেন-জো-দড়োতে প্রাপ্ত কিছু মূর্তিতে, বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর মানুষের অবয়বগত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গেছে।[৭] এ থেকে আদিমকালের বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর মানুষের অস্তিত্ব আর উপস্থিতি অনুমান করা যায়। প্রাচীন গ্রীস, মিশর, মেসোপটেমিয়া, চীন এবং প্রাক্-কলম্বীয় আমেরিকা থেকে পোড়ামাটির যেসব কলা-নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে

---

2. *"The first widely used metal was copper, which can be reduced from its ores by a kiln, not more efficient than that needed for pottery." The Culture and Civilisation of Ancient India in Historical Outline. D. D. KOSAMBI : Page 29. (1987)*

সেগুলির ঐতিহাসিক মূল্য অসীম—শৈল্পিক মূল্যও কম নয়। ক্রীটের নোসস্ (Knossos) এ অবস্থিত 'মিনাসে'র প্রাসাদ থেকে আর্থার ইভানস্ প্রাক্-হেলেনীয় যুগের যে সমস্ত টেরাকোটা মূর্তিকা আবিষ্কার করেছেন, সেগুলি ঐতিহাসিক-গরিমায় এবং শিল্প সুষমায় অপরূপ ; এগুলির নির্মাণ কাল নির্দিষ্ট হয়েছে ১৭০০-১৬০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ । প্রোটো-ডাইনেসটিক কাল (৫৬৫০-৪৭৭৭ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ থেকে টলেমীয় যুগ (৩৩১-৩০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ) পর্যন্ত মিশরের শিল্প ইতিহাসের সমস্ত পর্যায়ে নির্মিত প্রচুর টেরাকোটা আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রাক-কলম্বীয় আমেরিকার আদিম অধিবাসীদের প্রাচীন-টেরাকোটা নিদর্শনগুলিও নানাদিক দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। টেরাকোটার জগৎ শুধু আন্তর্জাতিকই নয়, সার্বজনীনও বটে। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের স্ফুট অস্ফুট কামনা-বাসনাগুলি এখানে সহজলভ্য মাটির-মাধ্যমে অনায়াসেই রূপলাভ করেছে। এজগতে সর্বসাধারণের অবাধ প্রবেশাধিকার। শুধু শিল্পচিন্তাই নয়, সমাজ চিত্রের আদি অকৃত্রিম রূপটির উদ্ঘাটনের ক্ষেত্রেও তাই টেরাকোটার জগৎ, গবেষকদের কাছে পরম মূল্যবান। সমাজ বিবর্তনের প্রেক্ষাপটে অনেকে, অনেকভাবেই টেরাকোটার এই জগতের উপর দৃষ্টিপাত করেছেন। এমনি একটি গবেষণা-পত্রের উল্লেখ[৮] এখানে প্রাসঙ্গিক কারণেই করা যেতে পারে। প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ভারতের ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে, টেরাকোটা-শিল্পের বিকাশ-বৈচিত্র্যের তারতম্য পর্যালোচনা করে লেখক বৈজ্ঞানিক ভাবেই একাধিক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন। তাঁর প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্য হ'ল, টেরাকোটা-শিল্পের বিকাশ-তারতম্য প্রধানতঃ নগরবিকাশের ধারাকে কেন্দ্র করেই ঘটে। তাঁর মতে আফগানিস্থান আর বেলুচিস্তানের সংস্কৃতি কেন্দ্রগুলির নাগরিক গোত্রান্তর এবং

---

3. *"A large number of female figurines in terracotta elaborately decorated with a crescent-shaped head dress have been found in the Indus cities and are said to represent the Mother or Nature Goddess whose origin is generally traced to Phrygia in Anatolia" —Lothal And The Indus Civilization—Mr. S. R. Rao. (1973)*

4. *An oblong terracotta seal from Harappa with impressions on both sides shows on the right side of its obverse face a nude female shown upside down with legs wide apart, and a plant issuing from her womb", Pauranic and Tantric Religion (1966) : J. N. Banerjee.*

এ সব স্থানে প্রচলিত ধর্মগুলির প্রাতিষ্ঠানিক রূপান্তরকে কেন্দ্র করেই সেখানে টেরাকোটা-শিল্পের সমৃদ্ধ বিকাশ ঘটেছিল। সিন্ধু উপত্যকার হরপ্পা আর মোহেন-জো-দড়োতেও মূলতঃ এক নগর সভ্যতাকে কেন্দ্র করে টেরাকোটা-শিল্পের যে সমুন্নত বিকাশ ঘটেছিল, হরপ্পা-উত্তর, তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতির গ্রাম কেন্দ্রগুলিতে তা সম্ভব হয়নি বলে আলোচ্য প্রবন্ধের লেখক মনে করেন। তাঁর মতে, গৈরিক-কৌলাল আর চিত্রিত-ধূসর-কৌলালের যুগে টেরাকোটার প্রচলন যৎসামান্য। ৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে উত্তর ভারতে নগর বিকাশকে (দ্বিতীয় পর্যায়) কেন্দ্র করেই টেরাকোটা শিল্পের পুনরাবির্ভাব পরিলক্ষিত হয়, এবং ২০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ থেকে ৩০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময় সীমার মধ্যে টেরাকোটা-শিল্পের বিপুল বিকাশও সমসাময়িক কালের দ্রুত এবং ব্যাপক নগর-বিকাশেরই ফলশ্রুতি। অন্যদিকে গুপ্তোত্তর যুগে, টেরাকোটা-শিল্পে যে পড়ন্ত অবস্থা পরিলক্ষিত হয়, তাও এ সময়ের নগর এবং শহরগুলির ক্ষয়িষ্ণু অবস্থারই প্রতিফলন। এই সূত্র অনুসরণ করে, আলোচ্য প্রবন্ধের লেখক টেরাকোটা শিল্পের বিকাশ-তারতম্য পর্যালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন প্রাক্-মৌর্যযুগে, টেরাকোটা- শিল্পের অনুন্নত মান (সব টেরাকোটাই হাতে গড়া, অনেক ক্ষেত্রে অনলংকৃত শ্রীহীন) এবং নিদর্শনগুলির সংখ্যা স্বল্পতার কারণ হল, এ সময় পর্যন্ত সমাজ যথার্থভাবে পণ্য-উৎপাদনের স্তরে উপনীত হয় নাই। নগর বিকাশেরও সবে সূচনা হয়েছে। মৌর্যযুগে অন্যান্য টেরাকোটার সঙ্গে ধর্মীয়-শাসনমুক্ত (secular), শিল্পসুষমা-মণ্ডিত একান্তভাবে কলা-নিদর্শন রূপেই যে একশ্রেণীর টেরাকোটার বিকাশ ঘটেছে তাও তদানীন্তন রাজনীতি আর অর্থনীতির কেন্দ্র মগধ অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ দেখা যায়। মৌর্যোত্তর যুগে, খ্রীষ্টপূর্ব ২০০ থেকে ৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে টেরাকোটা শিল্পের সমুন্নত বিকাশের কারণ হল, এসময়ের ব্যবসা-বাণিজ্যে ব্যাপক উন্নতিকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি এবং এ সময় বিশেষভাবে গজিয়ে ওঠা একশ্রেণীর বিলাসী-সৌখীন-নাগরিকের টেরাকোটা-সামগ্রীর প্রতি ব্যাপক আকর্ষণ।

৫। প্রাগৈতিহাসিক মোহেন-জো-দড়ো (১৯৩৬) অধ্যাপক কুঞ্জগোবিন্দ গোস্বামী।

6. *All we can say in the matter is that much of the religion of Mohenjo-daro was not unknown to the Indo-Aryans of the Vedic Age, and there is a continuous link between this religion and the present day popular Hinduism."—Bhupendra Nath Dutta : Man in India, Vol XVI, Octo—Dec, 1936, No. 4, P. 27.*

এমন কি, এ-সময়, কুম্ভকার, গজদন্তশিল্পী, রাজমিস্ত্রী, তন্তুবায় প্রভৃতি সাধারণ শ্রেণীর মানুষের আর্থিক অবস্থার যে বিলক্ষণ উন্নতি ঘটেছিল এবং তাঁরা যে মন্দির-অলঙ্করণ জাতীয় ধর্মীয় কর্মেও অর্থব্যয় করতে সক্ষম ছিলেন, ভারহুত আর সাঁচীর শিলালেখ থেকে তা প্রমাণিত হয়। আলোচ্য গবেষণা-পত্রের লেখকের (Sri Devangana Desai) মতে, আর্থিক অবস্থার উন্নতি ঘটার ফলে, বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ, ধর্মীয় প্রয়োজন ছাড়াও গৃহসজ্জা-জাতীয় অলঙ্করণ-কর্মের জন্য টেরাকোটা-সামগ্রীর প্রতি আকৃষ্ট হয়। টেরাকোটা-সামগ্রীর চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। ক্রমবর্ধমান এই চাহিদা মেটানোর তাগিদে টেরাকোটা-শিল্পে ছাঁচের প্রচলন ঘটে। ছাঁচের সাহায্যে অল্পায়াসে একই টেরাকোটা-সামগ্রীর অসংখ্য অনুকৃতি নির্মাণ সম্ভব হওয়ার ফলে, 'টেরাকোটা-নির্মাণ' একটি বিশিষ্ট শিল্পরূপে বিকাশ লাভ করে এবং টেরাকোটা-সামগ্রী বাজারে বিক্রয়যোগ্য পণ্যে পরিণত হয়। বঙ্গদেশ থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত অঞ্চলে অসংখ্য টেরাকোটা-শিল্পকেন্দ্র গড়ে উঠে। ছাঁচের প্রবর্তন বা প্রচলন টেরাকোটা শিল্পে একাধিক সম্ভাবনারও সূচনা করে। ছাঁচের প্রবর্তনের ফলে, টেরাকোটা ফলকে বর্ণনাত্মক-বিষয়বস্তুর ধারা-বাহিক চিত্রণের পথ প্রশস্ত হয়। বর্তুলাকার মূর্তি-নির্মাণ ছাড়াও টেরাকোটায় 'রিলিফ-রীতি'র প্রাধান্য সূচিত হয়। শুধু টেরাকোটাতেই নয় এই রিলিফ-রীতির প্রবণতা গজদন্ত-শিল্প এবং প্রস্তর-ভাস্কর্যের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। এ যুগে টেরাকোটা-ভাস্কর্য এবং প্রস্তর-ভাস্কর্যের মধ্যে ব্যবধান প্রায় লুপ্ত হয়ে যায়। এ প্রসঙ্গে লেখক শ্রীদেশাই ভারহুতের প্রস্তর-ভাস্কর্য আর বিহারের বলিরাজগড়ের প্রস্তর-ভাস্কর্যের সমগোত্রীয়তার (অবশ্য বিষয় বস্তুর পার্থক্য আছে) কথা উল্লেখ করেছেন

---

7. *A few of the Indus valley figures throw some light on the ethnic features of the people. The terracotta male figure from the granary at Mohenjo-daro found in 1950 has Semetic ethnic features. It has a long nose and fleshy chin, but the beard conspicuous by its absence :—Lothal And The Indus Civilization (1973)—Mr S. R. Rao*

8. *Social Background of Ancient Indian Terracottas. (CIR. 600 B, C—600 AD.) Devangana Desai—HISTORY AND SOCIETY · Essays in honour of Professor Niharranjan Roy, Editor Devi Prasad Chattopadhyaya. K P. BAGCHI & COMPANY, CALCUTTA 1976 P.—143*

ধর্মীয় বিষয়বস্তু এযুগে, টেরাকোটা ফলকে যথারীতি মূর্ত বা উদ্গত হতে থাকে, কিন্তু, নাগরিক-সৌখীনতার আঙ্গিকে। মৌর্যযুগের মাতৃকা মূর্তিকাগুলির আদিম-নগ্নতার পরিবর্তে, এ যুগের মাতৃকা মূর্তিগুলির অঙ্গে অতিসূক্ষ্ম বস্ত্রের আবরণ সৃষ্টি করে বা ইঙ্গিত মাত্র দিয়ে শিল্পী একই নগ্নতাকে যে বিচিত্র-কৌশলে প্রকাশ করেছেন তাতে সৌখীন নাগরিক রুচিরই বিচিত্র প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। এইসব মূর্তির অঙ্গের সূক্ষ্মবস্ত্র এবং অলঙ্কার বাহুল্যেও এ সময়ের শিল্প-বিকাশ-প্রসূত শ্রী-বৃদ্ধিরই পরিচায়ক বলে মনে করা হয়েছে। এ সময় সৌভাগ্যের দেবী লক্ষ্মীর জনপ্রিয়তাও বণিক-সম্প্রদায়ের ব্যাপক বিকাশকেই প্রতিভাত করে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ লেখক তমলুক, চন্দ্রকেতুগড়, বাণগড় হরিনারায়ণপুর, লাউড়িয়া-নন্দনগড়, কৌশাম্বী, মথুরা প্রভৃতি অঞ্চলে প্রাপ্ত এ সময়ের টেরাকোটা লক্ষ্মীমূর্তি গুলির উল্লেখ করেছেন। এ সময় অন্য এক দেবী, বসুধারার (করধৃত দুই মৎস্য সহ) 'মাঙ্গলিক মূর্তি' বঙ্গদেশ এবং উত্তরপ্রদেশে বিশেষ জনপ্রিয় হয়। পঞ্চচূড়া-যক্ষী-কাল্ট (প্রজননের দেবী, শিরোদেশে চূড়ারমত পঞ্চ আয়ুধ সহ) বঙ্গদেশ থেকে পাঞ্জাব (রূপার) পর্যন্ত এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে প্রসার লাভ করে। এরপর লেখক পরবর্তী যুগে (৫০-৩০০ খ্রীষ্টাব্দে) দক্ষিণ-ভারতের সাতবাহন-টেরাকোটার কথা উল্লেখ করেছেন। এ সময় দক্ষিণ-ভারতের সঙ্গে রোমের বিপুল বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে এসব অঞ্চলে অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটে, তারই ফলে অন্ধ্রপ্রদেশ, মহীশূর ও মহারাষ্ট্র প্রভৃতি একাধিক নগরে এই উচ্চমানের (white-clay : Kaolin) সূক্ষ্ম-সুষমামণ্ডিত 'সাতবাহন-টেরাকোটা'র আবির্ভাব। লেখক শ্রীদেশাই, বিভিন্ন সূত্র উল্লেখ করে এবং দক্ষিণ-ভারতে প্রাপ্ত রোমক মুদ্রার আবিষ্কারের দৃষ্টান্ত দিয়ে, এ অঞ্চলের সঙ্গে রোমের রমরমা ব্যবসার পটভূমিকায় 'সাতবাহন'দের ('কেওলিন') সূক্ষ্ম সুন্দর টেরাকোটা সামগ্রীর আলোচনা করেছেন। দক্ষিণ-ভারতের 'সাতবাহন-টেরাকোটা'র সঙ্গে উত্তরের টেরাকোটার পার্থক্য পর্যালোচনা করতে গিয়ে শ্রীদেশাই বলেছেন শুধু যুগ্ম বা 'জোড়া-ছাঁচের' ব্যবহারই নয় (কারণ উত্তর-ভারতের বহুস্থানে—যথা মথুরা, অহিচ্ছত্র প্রভৃতি স্থানে জোড়া-ছাঁচের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়) 'সাতবাহন-টেরাকোটা'র পার্থক্যমূলক বৈশিষ্ট্য হল এর মূর্তিকাগুলির সূক্ষ্ম-কমনীয় কান্তি-নির্মাণ। মনুষ্য-প্রতিমূর্তি গঠনে জাতিগত বৈশিষ্ট্যের সুনিপুণ

পরিস্ফুটনও 'সাতবাহন-টেরাকোটা'র লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। এ আমলের উপরোক্ত উচ্চমানের 'কেওলিন-টেরাকোটা-(সাদা মাটির)-শিল্প' মূলতঃ একালের ধনাঢ্য বণিক সম্প্রদায়ের রুচি চরিতার্থ করার জন্যই বিকশিত হয়েছিল বলে আলোচ্য প্রবন্ধের (**Ancient Indian Terracottas**) লেখক শ্রীদেশাই, মনে করেন। আলোচ্য টেরাকোটার ধর্মীয়-শাসন-মুক্ত বিষয় বস্তু থেকেও এসত্য প্রমাণিত হয়। বিষয়বস্তুগুলির মধ্যে একশ্রেণীর স্ফূর্তিবাজ-সম্ভ্রান্ত-পুরুষ এবং সযত্ন-বেণী-বন্ধনে-সুসজ্জিতা সালঙ্কারা রমণী মূর্তি (মস্তক ভাগ মাত্র পাওয়া গেছে) এ সময় খুব জনপ্রিয় হয়েছিল বলে প্রবন্ধ লেখক মনে করেন।

কুষাণ আমলে, রোম আর পশ্চিমের গ্রীক দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্যের ফলে ভারতবর্ষ বিশেষ সম্পদশালী হয়ে উঠেছিল। খ্রীষ্ট পূর্ব প্রথম শতক থেকে খ্রীষ্টাব্দ প্রথম শতকের মধ্যে, মধ্য-এশিয়া থেকে শক, পার্থিয়ান, কুষাণ প্রভৃতি বিভিন্ন যাযাবর জাতির ভারতে অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। এইসব অনুপ্রবিষ্ট বিদেশী জাতি-গোষ্ঠীর বিচিত্র সংস্কৃতির আত্মীকরণের মাধ্যমে, এসময়ে, ভারত সংস্কৃতিতে একটি সমন্বয় প্রবণতা পরিস্ফুট হতে দেখা যায়। টেরাকোটা-শিল্প-জগতে একটি মিশ্র-সংস্কৃতির বিকাশ এ যুগে সুস্পষ্ট রূপে পরিলক্ষিত হয়। কুষাণ-টেরাকোটায় দুটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট। একটি হ'ল, টেরাকোটা-শিল্পে, সুঙ্গ বা মৌর্যোত্তর যুগে প্রচলিত পরম্পরাগত নির্মাণ পদ্ধতির (ছাঁচের ব্যবহার) অনুবর্তন. অন্যটি হল, এ-শিল্পে, বহিরাগত জাতিগোষ্ঠীর প্রভাব-প্রসূত একটি বিশেষ প্রবণতার বিকাশ। প্রাচীন প্রচলিত পদ্ধতিতে নির্মিত টেরাকোটা সামগ্রীর ব্যাপক প্রচলন দেখা যায়, চন্দ্রকেতুগড়, তমলুক, রাজঘাট, কৌশাম্বী, ভিটা আর মথুরায়। প্রচলিত পদ্ধতির মধ্যেও এ যুগের টেরাকোটার নির্মাণ-রীতিতে কারিগরিগত কিছু উন্নতি বা বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। পূর্বকালের অনুচ্চ-অগভীর 'রিলিফে'র পরিবর্তে এ যুগের টেরাকোটায়, 'রিলিফে'র কাজে, অনেক বেশী গভীরতা দেখা যায়। বিষয়বস্তুতে সম্পন্ন-'নাগরক' (এক শ্রেণীর সৌখীন নাগরিক) শ্রেণীর রুচির সুস্পষ্ট প্রতিফলনের উল্লেখ করেছেন শ্রী দেশাই। তিনি এ প্রসঙ্গে চন্দ্রকেতুগড় থেকে প্রাপ্ত, নৃত্যভঙ্গীতে দণ্ডায়মান সুবিন্যস্ত কেশপাশ এবং রুচিপূর্ণ বেশবাসযুক্ত এক সৌখীন 'নাগরক'

মূর্তি সম্বলিত টেরাকোটা ফলকের সচিত্র উল্লেখ করেছেন। এছাড়াও এ সময়ের, অনুরূপ ধরণের বেশকিছু টেরাকোটারও উল্লেখ করেছেন, যেমন, চন্দ্রকেতুগড় আর ভিটা থেকে প্রাপ্ত মিথুন-মূর্তি-যুক্ত টেরাকোটা ফলক, কৌশাম্বী থেকে প্রাপ্ত লীলাশুক হাতে নারীমূর্তি, মথুরা থেকে প্রাপ্ত ফুল-হাতে-নারীর প্রতিমূর্তি, কৌশাম্বী আর রাজঘাট থেকে প্রাপ্ত বৃক্ষতলে দণ্ডায়মানা শালভঞ্জিকা মূর্তি এবং অহিচ্ছত্র থেকে প্রাপ্ত পতি বা উপপতি সহ এক নেশাগ্রস্ত রমণী-মূর্তি। এই বিষয়-বস্তুগুলিরই কিছু কিছু মথুরার প্রস্তর-ভাস্কর্যেও লক্ষ্য করা যায়, বলে প্রবন্ধ লেখক শ্রীদেশাই মন্তব্য করেছেন।

ভারতে অনুপ্রবিষ্ট-জাতিগোষ্ঠীর প্রভাব যুক্ত 'দ্বিতীয় ধারা'র টেরাকোটা নিদর্শন গুলিকে শ্রী দেশাই, আবার দু-ভাগে বিভক্ত করেছেন। কতকগুলি জোড়া-ছাঁচে নির্মিত আর কতকগুলি সম্পূর্ণ রূপে 'হাতে গড়া'। এ প্রসঙ্গে, জোড়া-ছাঁচে নির্মিত কিছু উপবিষ্ট 'গণ' এবং যক্ষমূর্তি ছাড়াও লেখক কিছু অদ্ভুতদর্শন মূর্তিকারও উল্লেখ করেছেন। এগুলির গঠনে একধরণের বর্তুল-গভীরতা লক্ষ্য করা যায়। যাই হোক, প্রায় সমকালে নির্মিত 'সাতবাহন-টেরাকোটা'র শ্রী-সৌন্দর্য এ গুলিতে অনুপস্থিত বলে লেখক মন্তব্য করেছেন। সম্পূর্ণ 'হাতে গড়া' টেরাকোটা নিদর্শনগুলির এ যুগে, বহুল প্রচলন ছিল, বলেও মনে করা হয়েছে। এগুলির মধ্যে, ধর্মীয় এবং ধর্মীয় শাসন-মুক্ত উভয় ধরণের টেরাকোটা-নিদর্শনই লক্ষ্য করা গেছে। মনে করা হয়েছে যে, এ সময়ের নব-বিকশিত জনসমাজের উভয়বিধ আশা-আকাঙ্খাই উক্ত টেরাকোটাগুলি চরিতার্থ করত। বিদেশী শাসকরা ব্রাহ্মণ্য এবং বৌদ্ধ উভয় ধর্মেরই পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। ফলে একদিকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের (শৈব, বৈষ্ণব ও শাক্ত শাখার) এবং অন্যদিকে বৌদ্ধ ধর্মের যুগপৎ বিকাশের পথ এ সময় প্রশস্ত হয়। 'ভক্তি' ধর্মের বিকাশের ফলে ধর্মজগতে মানবিক-আবেদন এবং আবেগ-অনুভূতি-প্রবণতার প্রাধান্য এযুগে যথারীতি পরিলক্ষিত হয়। পারিবারিক পূজা-অনুষ্ঠানের প্রয়োজনে হিন্দু দেবদেবীর মূর্তির চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় এ যুগে, বহু হিন্দু দেব-দেবীর মূর্তি, বিশিষ্ট আকার অবয়ব গ্রহণ করে, বিকাশ লাভ করে, বলে আলোচ্য প্রবন্ধে মন্তব্য করা হয়েছে। এ যুগের একমুখী-শিবলিঙ্গ, ভারতের

বিভিন্ন স্থান থেকে (মথুরা, রাজঘাট, কৌশাম্বী, ভিটা) প্রচুর সংখ্যায় পাওয়া গেছে। বলরাম, বিষ্ণু, কার্তিকেয়, গজলক্ষ্মী, সপ্ত-মাতৃকা এবং দেবী মহিষাসুরমর্দিনীর মূর্তি এ যুগের প্রস্তর এবং টেরাকোটা-ভাস্কর্যে যুগপৎ লক্ষ্য করা যায়। বঙ্গদেশের বিভিন্ন পুরাক্ষেত্র (বাণগড় প্রভৃতি) থেকে এ যুগের একাধিক, শক্তিময়ী আদিম-লক্ষণ-যুক্তা মাতৃকামূর্তির-আবিষ্কার ঘটেছে। এ যুগেই প্রথম বুদ্ধ এবং বোধিসত্ব মূর্তির আবির্ভাব পরিলক্ষিত হয়, বলেও প্রবন্ধে মন্তব্য প্রকাশ করা হয়েছে। এ সময়ের বেশকিছু টেরাকোটা নির্মিত বোধিসত্ব মূর্তির সুন্দর নিদর্শন, মথুরা ও হস্তিনাপুর থেকে পাওয়া গেছে। আলোচ্য প্রবন্ধের লেখক শ্রীদেশাই একালের কিছু বিচিত্র প্রত্নতাত্ত্বিক-নিদর্শনের ভিত্তিতে, এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, বহিরাগত বিদেশী জাতিগোষ্ঠীর ধর্ম বিশ্বাস ও পূজা পদ্ধতির আত্মীকরণের ফলে, এ যুগে, ভারতের ধর্মীয়-আচার-অনুষ্ঠানে বেশকিছু বৈচিত্র্য ঘটেছে। প্রসঙ্গক্রমে লেখক একটি টেরাকোটা নিদর্শনের উল্লেখ করেছেন। এটিতে, একটি 'নিবেদন-সরোবরে' সুপ্রতিষ্ঠিতা, পক্ষী এবং গায়কবৃন্দ পরিবৃতা, এক দেবীমূর্তি লক্ষ্য করা যায়। শ্রী দেশাই মনে করেন, এটি 'পার্থিয়ান' প্রভাবেরই ফলশ্রুতি। এ ধরণের 'নিবেদন-সরোবর' এর চিত্র সম্বলিত একাধিক টেরাকোটা-নিদর্শন অহিচ্ছত্র, হস্তিনাপুর, তক্ষশিলা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে পাওয়া গেছে। টেরাকোটা ফলকে উদ্গত ভিটা, কৌশাম্বী, প্রভৃতি অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত, 'রোমান-পারসিক' প্রভাবযুক্ত এক ধরণের 'বিবসনা দেবী' মূর্তির উল্লেখও লেখক এ প্রবন্ধে করেছেন। 'প্রতিকৃতি-নির্মাণ' এ যুগের এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। এ যুগের সাহিত্যে এর উল্লেখ আছে। কুষাণ-সম্রাটদের 'প্রস্তর-প্রতিকৃতি'র কথা তো সর্বজন বিদিত। এ যুগের, টেরাকোটা-নির্মিত বেশ কিছু 'মুণ্ড বা মস্তক' (heads with tenons : মুণ্ডগুলি আলাদাভাবে বসিয়ে রাখার জন্য – খাঁজের মধ্যে ঢোকাবার মত সরু প্রান্তভাগ সহ) এর উল্লেখ, আলোচ্য প্রবন্ধে করা হয়েছে। টেরাকোটা-নির্মিত, নর-নারীর এই 'মুণ্ড'গুলির মুখের আদলে প্রগাঢ় অভিব্যক্তির ব্যঞ্জনা সুস্পষ্ট। উত্তর প্রদেশ থেকে প্রাপ্ত এই ধরণের 'মুণ্ড'গুলি বিহারে প্রাপ্ত 'মুণ্ড-মূর্তি'গুলি থেকে উন্নতমানের। প্রবন্ধ লেখক শ্রী দেশাই মনে করেন, এ সময় রাজনীতি আর অর্থনীতির প্রধানকেন্দ্র

উত্তরপ্রদেশে স্থানান্তরিত হওয়াই এর কারণ। মথুরা, কৌশাম্বী, ভিটা অহিচ্ছত্র প্রভৃতি স্থান থেকে প্রাপ্ত টেরাকোটা-মুণ্ড গুলিতে শিল্পীর প্রতিভার স্বাক্ষর সুপরিস্ফুট। কতকগুলি 'টেরাকোটা-মুণ্ডে'র মুখমণ্ডলে বিদেশী নরগোষ্ঠীর জাতিগত ছাপ সুস্পষ্ট। কিন্তু এরই মধ্যে বেশকিছু টেরাকোটা 'মুণ্ডের' গঠনে কলা-কৌশলহীন-স্থূলতার কথাও আলোচ্য প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে। রোম-সাম্রাজ্যের সঙ্গে ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যের ফলে লব্ধ এমন একটি সমৃদ্ধির কালে, যখন মুদ্রা-অর্থনীতি সমাজের সর্বস্তরে প্রসারিত তখন, এ ধরণের নিম্নমানের 'টেরাকোটা-মূর্তি'র অস্তিত্ব বিস্ময়কর। প্রবন্ধ লেখক বিষয়টি পর্যালোচনা ক'রে, একাধিক পুরাক্ষেত্র থেকে উৎখননের ফলে আবিস্কৃত, ইঁটের ইমারতের ভগ্নাংশ এবং পাকাবাড়ীর মেঝে আর ছাদ নির্মাণে ব্যবহৃত পোড়ামাটির টালি ইত্যাদির নিদর্শনগুলি থেকে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন, যে, এ সময় দেশের শ্রীবৃদ্ধির ফলে নগরবিকাশের ধারা বিশেষ দ্রুতগতি লাভ ক'রে শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করেছিল। কুম্ভকার শিল্পীরা ইমারতের জন্য প্রয়োজনীয় ইঁট-টালি ইত্যাদি নির্মাণের কাজে অবিরাম ব্যস্ত থাকায়, ক্ষেত্রবিশেষে, টেরাকোটা--মূর্তিকার রূপারোপে গুণগত মানের অপকর্ষ ঘটেছে। যাইহোক, উপরোক্ত নিম্নমানের টেরাকোটাগুলি, মূর্তি নির্মাণের ক্ষেত্রে, উপযুক্ত প্রযত্নের অভাবকেই সূচিত করে। এ যুগে যে সমস্ত মূর্তি নূতন রূপলাভ করেছিল, সেগুলির সার্থক রূপদানের জন্য উল্লেখযোগ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং অনুশীলনের প্রয়োজন হওয়ায় শিল্পী 'হস্তকৃত-প্রতিমা-লেপের' আশ্রয় নেন। জনসংখ্যা এবং ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে উদ্ভূত, টেরাকোটা মূর্তির বিপুল চাহিদা, পূরণ করার তাগিদে শিল্পীকে গুণগত মানের চেয়ে উৎপাদন প্রাচুর্যের দিকেই বেশী লক্ষ্য করতে হয় বলে শ্রীদেশাই মন্তব্য করেছেন। তিনি মনে করেন উপযুক্ত পারিশ্রমিক পেলে, শিল্পী হয়ত টেরাকোটা-মূর্তির রূপারোপে আরও মনোযোগী হতে পারতেন। কারণ এ যুগেরই বেশকিছু উন্নতমানের টেরাকোটা-প্রতিকৃতি বা 'মুণ্ড-মূর্তি' (সম্ভ্রান্ত ও অভিজাত ব্যক্তিদের) পাওয়া গেছে, কৌশাম্বী, ভিটা, মথুরা এবং অহিচ্ছত্র থেকে। এই যুগেই প্রথম, (কুষাণ) টেরাকোটা-মূর্তির মুখমণ্ডলে প্রগাঢ় অভিব্যক্তির ব্যঞ্জনা সুস্পষ্ট ভাবে লক্ষ্য করা যায়। 'কুষাণ-টেরাকোটা' প্রসঙ্গের শেষে আলোচ্য উপরোক্ত-প্রবন্ধের (Social Background Of Ancient

Indian Terracottas) লেখক (Sri Devangana Desai) কুষাণ টেরাকোটার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যের কথা বলতে গিয়ে, মন্তব্য করেছেন – সুন্দর, শোভাময়, কমনীয়-রূপমাধুর্য নয়, কুষাণ টেরাকোটা-মূর্তির ভারী শক্ত গঠন আর সুগঠিত মুখমণ্ডলে প্রগাঢ় অভিব্যক্তির বলিষ্ঠ ব্যঞ্জনাই, অন্যান্য যুগের অন্যসব টেরাকোটা-মূর্তি থেকে তার পার্থক্য সুচিহ্নিত করে।

আলোচ্য উপরোক্ত প্রবন্ধের (Social Background Of Ancient Indian Terracottas) শেষাংশে, লেখক (Sri Devangana Desai) প্রবেশ করেছেন, ভারতের ইতিহাসের এক যুগসন্ধির কালে (খ্রীষ্টাব্দ ৩০০-৬০০)। এ কালের একদিকে দেখা যায়, গুপ্তযুগের গরিমার সুবর্ণছটায় উদ্ভাসিত বিশাল ভারত, তার বৈষয়িক আর সাংস্কৃতিক শ্রীবৃদ্ধির শীর্ষদেশে পৌঁছেছে, অন্যদিকে, এ যুগেরই অন্তিম-দিগন্তে লক্ষ্য করা যায় দুঃসময়ের পুঞ্জীভূত কৃষ্ণমেঘের অন্তরালে অবসান-অবক্ষয়ের অশনি সংকেত। এ যুগের অর্থনীতিতেও বিলক্ষণ পালাবদল ঘটেছে। একদিকে, বহির্বাণিজ্য আর শিল্পোদ্যোগ সমৃদ্ধির শীর্ষবিন্দু স্পর্শ করেছে, অন্যদিকে এই বাণিজ্য আর ব্যবসায়ে অবক্ষয়ের পথ ধরে, সামন্ততন্ত্রের দ্রুতবিকাশ আর দৃঢ়-প্রতিষ্ঠার পথ প্রশস্ত হয়েছে। শ্রীদেশাই, এই যুগসন্ধির একটি রূপ-রেখা অংকন করে এর রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক আর সামাজিক প্রেক্ষাপটে, এযুগের টেরাকোটা শিল্পের বিচিত্র বিকাশ আর বিবর্তনের পর্যালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন, এ যুগের শেষের দিকে অর্থবান প্রভাবশালী বণিক-সম্প্রদায়ের পাশাপাশি একটি নূতন জমিদার শ্রেণী গজিয়ে উঠে। গুপ্তসম্রাট এবং সামন্তদের নির্বিচার ভূমিদানই এর কারণ। এ যুগে দান-দক্ষিণা, পুরস্কার-পারিতোষিকের মুখ্য মাধ্যম হয়ে উঠে জমি বা ভূমি। বণিক-সম্প্রদায় আর নবোদ্ভূত জমিদার শ্রেণীর যৌথ পৃষ্ঠপোষকতায় এ যুগের শিল্পকলায় সামগ্রিক শ্রীবৃদ্ধি সূচিত হয়। এরই প্রেক্ষাপটে টেরাকোটা-শিল্পেরও চূড়ান্ত শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। বারাণসীর ভারত-কলা-ভবনে সংগৃহীত, উক্ত যুগের টেরাকোটা গুলির ভিত্তিতে শ্রীদেশাই গুপ্তযুগের টেরাকোটা নিদর্শন গুলির অঙ্গশোভা, নির্মাণকলার প্রযুক্তিগত নৈপুণ্য এবং পরিশেষে এ গুলির বিকাশ-বিবর্তনকে কেন্দ্র করে একটি সমীক্ষা-মূলক যুগচিত্র অঙ্কন করেছেন। এ যুগের টেরাকোটা-নিদর্শনগুলির

উন্নতমান, সূক্ষ্ম-সুষমামণ্ডিত অঙ্গ বিন্যাসের অন্যতম কারণ হিসাবে তিনি সমসাময়িক কালের উন্নতমানের লোহার যন্ত্রপাতির উপর জোর দিয়েছেন। সামগ্রিক ধাতুপ্রযুক্তির উৎকর্ষের প্রেক্ষাপটে উন্নত লোহার যন্ত্রপাতির প্রসঙ্গে তিনি এ যুগের লৌহ-শিল্পের সমুচ্চ বিকাশের দৃষ্টান্তস্বরূপ, গুপ্তসম্রাট চন্দ্রগুপ্তের মেহেরৌলী স্তম্ভের (দিল্লী) উল্লেখ করেছেন। এযুগের টেরাকোটার শ্রীসম্পন্ন অঙ্গবিন্যাসের ক্ষেত্রেই শুধু নয়, টেরাকোটা-শিল্পের নির্মাণগত প্রযুক্তিতেও বিলক্ষণ উন্নতি পরিলক্ষিত হয় বলে লেখক মনে করেন। বৃহদাকার টেরাকোটাগুলি, উপযুক্ত-ভাবে দগ্ধ করার জন্য দশ-বারো ফুট গভীর একধরণের 'বেলনাকার-চোঙা'র মত চুল্লী নির্মাণ-পদ্ধতিরও শ্রী দেশাই তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি অহিচ্ছত্র থেকে প্রাপ্ত 'গঙ্গা' আর 'যমুনা'র বৃহদাকার টেরাকোটা-মূর্তি গুলির উল্লেখ করেছেন। শ্রী দেশাই, এ যুগের টেরাকোটা-নিদর্শন গুলিকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। 'ছাঁচে-তোলা' ও 'হাতে-গড়া' মূর্তিকা (মূর্তিকার মস্তকভাগ) এবং চিত্রসম্বলিত ক্ষুদ্রাকৃতি, গৃহসজ্জার উপযোগী টেরাকোটা-ফলক গুলি প্রথম শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। এগুলি, মুখ্যতঃ গৃহসজ্জা এবং ক্ষেত্রবিশেষে ধর্মীয়-কার্যে ব্যবহৃত হ'ত। দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হ'ল মন্দির বা মঠের ভিত্তি অলঙ্করণের জন্য নির্মিত, চিত্র-সম্বলিত অপেক্ষাকৃত বড় আকারের টেরাকোটা-টালি।

সামান্য কিছু ধর্মীয়-মূর্তি ছাড়া (এ প্রসঙ্গে শ্রীদেশাই, তাঁর প্রবন্ধে দৃষ্টান্ত স্বরূপ 'নৈগমেষ' এবং হরগৌরী টেরাকোটা-মূর্তির উল্লেখ করেছেন) প্রথম শ্রেণীর অধিকাংশ টেরাকোটা-নিদর্শনেরই বিষয়বস্তু ধর্মীয়-শাসন-মুক্ত ('সেক্যুলার')। এ গুলির মধ্যে কিছু টেরাকোটা 'মুণ্ড' বা 'মস্তক' রয়েছে যেগুলিকে বিশেষভাবে অভিজাত নরনারীর প্রতিকৃতি বলে মনে করা হয়েছে। এ গুলির বিচিত্র কেশবিন্যাস, বিশেষতঃ নারী প্রতিকৃতিগুলির মাথায় বিচিত্র ছাঁদের কবরী-বন্ধনে নাগরিকতার প্রভাব সুস্পষ্ট। শ্রীদেশাই মনে করেন, এ যুগের সাহিত্যে (বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্রে) 'নাগরক'দের যে উল্লেখ রয়েছে আলোচ্য টেরাকোটা নিদর্শনগুলি হয়ত সেই ধরণেরই কোন 'নাগরক-চিত্র' হতে পারে। এগুলি বৈশালী, রাজঘাট, ভিটা, কৌশাম্বী, শ্রাবস্তী, অহিচ্ছত্র, মথুরা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে পাওয়া গেছে। ভিটা থেকে প্রাপ্ত নিদর্শনগুলিতে বর্ণ-বিন্যাসের আভাস মেলে। মনে করা হয়েছে

এ ধরণের মৃত্তিকা বা মৃৎ-প্রতিকৃতি গুলিকে ক্ষেত্রবিশেষে বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত করা হ'ত। ক্ষুদ্রাকৃতি 'টেরাকোটা-রিলিফ'ও নানাস্থান থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। 'কিন্নর-মিথুন' চিত্র পাওয়া গেছে অহিচ্ছত্র থেকে ; চন্দ্রকেতুগড় থেকেও এই ধরণের বেশকিছু মিথুন চিত্র বা প্রণয়চিত্র পাওয়া গেছে। টেরাকোটায় রূপায়িত কলসী-কাঁখে-রমণী চিত্র পাওয়া গেছে পাটলিপুত্র-কুমরাহার থেকে, মা ও ছেলের টেরাকোটা প্রতিমূর্তি পাওয়া গেছে বৈশালী, ভিটা আর অহিচ্ছত্র থেকে। পাটলিপুত্র-কুমরাহার থেকে পাওয়া গেছে শালভঞ্জিকা মূর্তি। টেরা-কোটায় 'গণ' এবং 'অশ্বারোহী' মূর্তিও বিভিন্ন স্থান থেকে পাওয়া গেছে।

অপরপক্ষে, দ্বিতীয় শ্রেণীর (বড় আকারের মূর্তি, আর মঠ ও মন্দিরের ভিত্তি অলঙ্করণের প্রয়োজনে নির্মিত চিত্র-সম্বলিত টেরাকোটা ফলক বা টালি) বহু টেরাকোটাও নানাস্থান থেকে পাওয়া গেছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর এই টেরাকোটা-টালিগুলি প্রধানতঃ সামন্ত-জমিদার-শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত ব্রাহ্মণ্য-মন্দিরগুলির অলঙ্করণের জন্য ব্যবহৃত হত। এইসব মন্দির-টেরাকোটায় মুখ্যতঃ স্মার্ত-পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য মতাদর্শই বিশেষভাবে প্রতিবিম্বিত বা আভাসিত হ'ত। সহস্রাধিক বৎসরের পরিচিত মহাকাব্যের বিষয়বস্তু-গুলির এ যুগের (গুপ্তযুগ) টেরাকোটায় এতাদৃশ প্রাধান্য লাভকে লেখক (শ্রীদেশাই) তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করেন। পুরাণ আর হাকাব্যের বিষয়গুলির, টেরাকোটা-টালিতে রূপলাভের প্রসঙ্গে লেখক একটি কালানুক্রমিক বিবরণ এখানে উপস্থাপিত করেছেন। তিনি বলেছেন, 'কৃষ্ণকথা' কুষাণ যুগ থেকেই প্রস্তর-ভাস্কর্যে লক্ষ্য করা যায়। গুপ্তযুগের টেরাকোটায় এর ব্যাপক প্রচলন দেখতে পাওয়া যায় মুখ্যতঃ রাজস্থানে (রঙমহলে । রামায়ণের দৃশ্যাবলী-খচিত-টেরাকোটা পাওয়া গেছে উত্তরপ্রদেশের শ্রাবস্তী, বিহারের চৌসা আর আসাদ থেকে এবং মধ্যপ্রদেশের দু-এক জায়গা থেকে। মহাভারতের কাহিনীও শিবোপাখ্যান এর দেখা মেলে অহিচ্ছত্রের টেরাকোটা নিদর্শনগুলিতে। ধর্মীয় বিষয়বস্তু ছাড়াও ধর্মীয়-শাসন-মুক্ত (সেক্যুলার বা সামাজিক বিষয়বস্তু সম্বলিত টেরাকোটা ফলক বা টালিও একাধিক পাওয়া গেছে মথুরা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে।

চিত্তবিনোদনকারী ক্ষুদ্রাকৃতি ছাঁচে-তোলা (বাজারে বিক্রয়যোগ্য) টেরাকোটা-সামগ্রীর উৎপাদন, গুপ্তোত্তর যুগে নগর-সংস্কৃতির ক্ষীয়মান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, হ্রাস পেতে লাগল। এ সময় এক ধরণের গ্রাম-কেন্দ্রিক-উৎপাদন ব্যবস্থার উদ্ভবের ফলে স্বয়ং-সম্পূর্ণ-গ্রামীণ অর্থ-নীতির বিকাশ ঘটে এবং পণ্য বিনিময় ও বাণিজ্য স্বাভাবিকভাবেই হ্রাস পায়। হূণ আক্রমণের ফলেও ব্যবসা বাণিজ্য দারুণভাবে ক্ষতি-গ্রস্ত হয়। ব্যবসা-বাণিজ্যে মন্দার ফলে নগরের শিল্প-বাণিজ্যের কেন্দ্রগুলিতে অবক্ষয় সূচিত হয়। 'মৃচ্ছকটি'ক নাটকে (খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতক) বণিক চারুদত্তের আর্থিক অবস্থার অবনতির চিত্র এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের ভিত্তিতে শ্রী দেশাই মন্তব্য করেছেন যে, কুষাণ যুগে, পাটলিপুত্র, বৈশালী, রাজঘাট, কৌশাম্বী, শ্রাবস্তী, হস্তিনাপুর, মথুরা প্রভৃতি (পাঞ্জাব ও হরিয়ানার) যেসব স্থানে নগর-সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল গুপ্তযুগেই সেগুলির অবক্ষয়সূচিত হয়—এবং গুপ্তোত্তর যুগে সেগুলি সর্বতো-ভাবে হৃতগৌরব হয়ে পড়ে। নগরগুলির অবনতির সঙ্গে সঙ্গে টেরাকোটা শিল্প তথাকথিত 'নাগরক'দের পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হয়। গুপ্তযুগেই মুদ্রা-অর্থনীতিতে সংকোচন দেখা দেয়। প্রচুর স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন থাকলেও তাম্রমুদ্রার প্রচলন কমে যায়। শ্রী দেশাই মনে করেন, হর্ষবর্ধনের সময় থেকে মুদ্রা দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠে। সাধারণ মানুষের ক্রয় ক্ষমতা ক্রমশঃ কমে যায়, ফলে বাজারে টেরাকোটা সামগ্রীর ক্রেতার সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পায়। নগর বা শহরের অবক্ষয়ের ফলে টেরাকোটা শিল্পীরা গ্রামাঞ্চলে আশ্রয় নিল। তারা একরকম 'গ্রাম্য-দাসে' পরিণত হল এবং নগদ টাকার পরিবর্তে বস্তুর মাধ্যমে পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে লাগল। বাজারে বিক্রয়ের জন্য টেরাকোটা সামগ্রী প্রস্তুত করার পরিবর্তে তারা এখন গ্রাম্য প্রয়োজন মেটাতে লাগল—বিশেষভাবে গ্রাম্য ভূস্বামীদের কাজেই আত্মনিয়োগ করল। ব্রাহ্মণ্য মন্দির আর বৌদ্ধ-বিহারগুলির অধিকারে অনেকগুলি করে গ্রাম থাকার ফলে এইসব ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলি সামন্ততান্ত্রিক চরিত্রলাভ করেছিল। 'গ্রামদান' আর ভূমিদানকে কেন্দ্র করে শিল্পীরা উত্তরোত্তর বেশী করে 'দাতা'র অধীনস্থ হয়ে বাধ্যতামূলক শ্রম-দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ হল। তাদের গতায়ত গ্রামেই সীমাবদ্ধ হ'ল।

দ্বিতীয় শ্রেণীর, (মঠ বা মন্দির অলঙ্কৃত করার প্রয়োজনে নির্মিত) টেরাকোটা-টালি বা ফলকগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই মন্দির-গাত্র থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় সংগৃহীত। অতীতে এগুলি যে-সব মঠ বা মন্দিরের ভিত্তি অলঙ্কৃত করত সেগুলির অধিকাংশই এখন অবলুপ্ত। সে যুগের (গুপ্তযুগ) টিকে থাকা এমনি একটি টেরাকোটা-অলঙ্কৃত মন্দিরের কথা উল্লেখ করেছেন শ্রীদেশাই। সেটি হ'ল কানপুরের সন্নিকট ভিতরগাঁওয়ের মন্দির। এ-মন্দিরটি থেকে, মন্দিরগাত্রে টেরাকোটা-বিন্যাস-রীতির একটি হদিশ পাওয়া যায়। শ্রীদেশাই মনে করেন, তথাকথিত 'নাগরক' শ্রেণীর চিত্তবিনোদনকারী ধর্মীয়-শাসন-মুক্ত (অনাধ্যাত্মিক, সেক্যুলার) পূর্বোক্ত প্রথম শ্রেণীর টেরাকোটা নিদর্শনগুলির চেয়ে মন্দির-টেরাকোটার বিষয়বস্তু অনেকখানি অন্তরঙ্গ আর কৌতূহলোদ্দীপক। এগুলি অনেকটা ঘরোয়া চরিত্রের এবং দৈনন্দিন জীবন-যাত্রার সঙ্গে অনেক বেশী সম্পর্কযুক্ত। এ প্রসঙ্গে শ্রীদেশাই ভিতরগাঁওয়ের মন্দিরের কয়েকটি টেরাকোটা-চিত্রের উল্লেখ (অনন্তশায়ী বিষ্ণুর ধর্মীয় পূজা-মূর্তি ছাড়াও, লাড্ডু-সহ পলায়ন পর গণেশের পশ্চাদ্ধাবনরত তাঁর ভ্রাতা বা অন্য একটি মূর্তির কৌতূহলোদ্দীপক চিত্র, এবং শিব-পার্বতীর গার্হস্থ্য চিত্র ইত্যাদি) করেছেন। রাজস্থানে প্রাপ্ত টেরাকোটা-ফলকগুলির বিষয়বস্তুতে একই অন্তরঙ্গতার সুর অনুভব করা যায়। অন্যদিকে 'মীরপুর খাস' এবং গুজরাটের একাধিক অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত টেরাকোটা বুদ্ধমূর্তি গুলিতে আধ্যাত্মিকতার আভাস দুর্নিরীক্ষ্য নয়। পান্না (পশ্চিমবঙ্গ) আর অহিচ্ছত্র থেকে প্রাপ্ত বড় আকারের টেরাকোটা-মুণ্ডগুলির মুখমণ্ডলে একটি আত্মসমাহিত ভাবাবেশেরও উল্লেখ করা হয়েছে।

মন্দিরের টেরাকোটা-অলঙ্করণের কাজ একক শিল্পীর সাধ্যাতীত। এজন্য কুম্ভকার শিল্পীদের একটি দল বা "গিল্ড"কে নিযুক্ত করতে হ'ত। এদের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে শ্রীদেশাই বলেছেন যে, মন্দির-অলঙ্করণের ক্ষেত্রে টেরাকোটা-শিল্পীদের সঙ্গে মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা বা পৃষ্ঠপোষকের, যে ধরণের প্রত্যক্ষ যোগ স্থাপিত হ'ত, পূর্বোক্ত প্রথম শ্রেণীর বাজারে-বিক্রয়যোগ্য, তথাকথিত 'নাগরক'দের মনোরঞ্জক (গৃহ সজ্জার আসবাব রূপে ব্যবহৃত, ছাঁচে-তোলা) টেরাকোটা-দ্রব্যগুলির ক্ষেত্রে সেটা আদৌ ঘটত না। 'নাগরক'দের

বিশেষভাবে বাজারে বিক্রয়ের জন্য টেরাকোটা-সামগ্রীর উৎপাদনের কোন সুযোগই আর রইল না। টেরাকোটা-শিল্পও আর সাধারণ মানুষের উপভোগ্য কলা-সামগ্রী রইল না, রাজা এবং সম্ভ্রান্ত ভূস্বামীদের প্রাসাদ এবং মন্দির-অলঙ্করণের কাজেই মুখ্যতঃ ব্যবহৃত হতে লাগল। ক্রমশঃ এ শিল্প নির্বাচিত একটি সম্ভ্রান্ত ভূস্বামী সম্প্রদায়ের আজ্ঞাবহ হয়ে সামন্ত-জমিদার এবং রাজাদের প্রশাসন কেন্দ্র অথবা ধর্মকেন্দ্র-গুলিতে সীমাবন্ধ হল। এ প্রসঙ্গে শ্রীদেশাই পাহাড়পুর (বঙ্গদেশ) অন্তিচক (বিহার) অখনুর এবং উস্কার কাশ্মীর) এর নাম করেছেন। পরিশেষে তিনি তাঁর প্রতিপাদ্য বিষয়টির উল্লেখ করে প্রবন্ধের ইতি টানতে গিয়ে বলেছেন যে, নগর-সংস্কৃতির অবক্ষয়ের ফলে, এইভাবে, টেরাকোটা-শিল্পের প্রচুর-উৎপাদনের-যুগের একরূপ অবসান ঘটল।

একাধিক কারণে, শ্রীদেশাই (Sri Devangana Desai) এর প্রবন্ধটির (Social Background of Ancient Indian Terra-cottas) বহুলাংশ এখানে উদ্ধৃত হ'ল। আলোচ্য প্রবন্ধটিতে একটি বিশেষ প্রতিপাদ্য ছাড়াও টেরাকোটা-শিল্পের বিকাশ ও বিবর্তনের বিভিন্ন দিক নিয়ে বৈজ্ঞানিক ভাবে বিশ্লেষণও আলোচনা করা হয়েছে। একদিকে যেমন, বিভিন্ন যুগে এ শিল্পের শিল্পগত বিচিত্র বিবর্তন এ-প্রবন্ধে উল্লিখিত হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি এর গঠন-চাতুর্য আর প্রযুক্তি-প্রকরণের ক্রমবিকাশ প্রসঙ্গও এখানে ধারাবাহিক ভাবে আলোচিত হয়েছে। ভারতের শিল্পক্ষেত্রে প্রাগৈতিহাসিক এবং আদি-ঐতিহাসিক যুগে বহিরাগত বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর প্রভাব প্রসূত এক বিচিত্র সাংস্কৃতিক বাতাবরণের প্রেক্ষাপটে এ-শিল্পের বিচিত্র বিবর্তনও শ্রী দেশাই এর প্রবন্ধে এক নূতন মাত্রা লাভ করেছে। শ্রীদেশাই এর প্রবন্ধের মূলে প্রতিপাদ্য হ'ল, নগর-সংস্কৃতির সমুন্নত বিকাশকে কেন্দ্র করেই অন্যান্য শিল্পের মতই টেরাকোটা-শিল্পেরও ব্যবসায়-ভিত্তিক বিপুল-উৎপাদন সম্ভব হয় — ভারতের টেরাকোটা-শিল্পের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে সে সত্যই উদ্ঘাটিত হয়। তিনি বলেছেন—যে, একটি শিল্পের বিশিষ্ট বিকাশ বা বিপুল উৎপাদন কতকগুলি পূর্বসর্তের উপর নির্ভরশীল। টেরাকোটা-শিল্প, তার

জন্মলগ্নে সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত গ্রামীণ-হস্তশিল্প বা লোকশিল্প রূপে ভূমিষ্ঠ হলেও, কতকগুলি সর্ত সাপেক্ষে, তা যে বিপুল উৎপাদনক্ষম বিশিষ্ট শিল্পের রূপলাভ করতে পারে তা টেরাকোটা-শিল্পের ইতিহাসে সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়। শ্রীদেশাই টেরাকোটা-শিল্পের পূর্বাপর ক্রমবিকাশ পর্যালোচনা করে তা দেখিয়েছেন। আগেই বলেছি শিল্পের সমুন্নত বিকাশ কতকগুলি সর্তের উপর নির্ভরশীল। যেমন একটি সুপ্রতিষ্ঠিত সমাজব্যবস্থা-প্রসূত সুসমৃদ্ধ সামাজিক আর অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট প্রয়োজন—যেখানে উদ্বৃত্ত সম্পদের বিনিয়োগে বিভিন্ন শিল্পের স্বতন্ত্র এবং বিশিষ্ট বিকাশ সম্ভব হয়। তাছাড়া চাই উন্নতমানের যন্ত্রপাতি, চাহিদার চাপ, ক্রয়-বিক্রয়ের জন্য সুসংগঠিত বাজার—এসবই শিল্প-বিকাশের পূর্বসর্ত। নগর-সংস্কৃতির সমুন্নত বিকাশই এই সব সর্ত পূরণ করতে সক্ষম। অতএব একই কারণে অন্যান্য শিল্পের মতই টেরাকোটা-শিল্পের ব্যবসায়-ভিত্তিক বিপুল উৎপাদনের জন্য নগর-সংস্কৃতির সমুন্নত বিকাশ প্রয়োজন। শ্রীদেশাই তাঁর প্রবন্ধে যথেষ্ট যুক্তি সহকারেই দেখিয়েছেন যে, ভারতে নগর সংস্কৃতির বিকাশের উপর নির্ভর করেই টেরাকোটা-শিল্পের-বিকাশ তারতম্য ঘটেছে। শ্রীদেশাই তাঁর প্রতিপাদ্যের সমর্থনে, ইতিহাস এবং প্রাচীন সাহিত্যের সূত্র ছাড়াও প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের প্রসঙ্গও যথারীতি উদ্ধৃত করেছেন। তিনি বলেছেন, নগর-সংস্কৃতির বিকাশ যেমন শিল্প-বিকাশের পূর্বসর্ত, তেমনি নগর-বিকাশ আর শিল্প-বিকাশের অন্যতম পূর্বসর্ত ধাতু প্রযুক্তির উন্নত অধিকার। শিল্প-বিকাশ তথা নগর-বিকাশের ক্ষেত্রে ধাতু প্রযুক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। তাম্রাশ্মীয়-সংস্কৃতি বিকাশের ফলেই হরপ্পা, মোহেন-জো-দড়ো, লোথাল প্রভৃতি নগরকেন্দ্রগুলির উদ্ভব হয়। এসব পুরাক্ষেত্রে উন্নতমানের টোরকোটা-শিল্পের বিকাশও লক্ষ্য করা যায়। শুধু টেরাকোটা শিল্পই নয়, মাল্যদানা, গজদন্ত শিল্প, অলঙ্কার শিল্প ও বিভিন্ন ধরণের ধাতু-শিল্পের নিদর্শন এইসব তাম্রাশ্মীয়-পুরাক্ষেত্রগুলি থেকে পাওয়া গেছে। উন্নতমানের ধাতব যন্ত্রপাতির সাহায্যেই এ-সব শিল্প-কার্য সম্ভব। লোথাল (কাথিয়াওয়াড়, গুজরাট) থেকে করাত, তুরপুণ জাতীয় ব্রোঞ্জের বিভিন্ন যন্ত্রপাতিরও আবিষ্কার ঘটেছে। এখানে প্রস্তর ভাস্কর্যের নিদর্শন নগণ্য হলেও টেরাকোটা সামগ্রী প্রচুর

সংখ্যায় পাওয়া গেছে। শ্রীদেশাই এর আলোচ্য প্রবন্ধ ছাড়াও একাধিক প্রবন্ধ থেকে, মোহেন-জো-দড়ো, হরপ্পা, লোথাল প্রভৃতি তাম্রাশ্মীয় পুরাক্ষেত্রগুলি থেকে প্রাপ্ত, নানাধরণের টেরাকোটা-সামগ্রীর কথা জানা যায়। এই টেরাকোটা-নিদর্শনগুলির পাশাপাশি ধাতুমূর্তিও প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পাওয়া গেছে। এমনি একটি তাম্রাশ্মীয় পুরাক্ষেত্র গুজরাটের 'লোথাল' থেকে প্রচুর টেরাকোটা নিদর্শনের সঙ্গে বহু উন্নতমানের ধাতব যন্ত্রপাতির আবিষ্কারের কথা আগেই বলা হয়েছে। এই সব যন্ত্রপাতির সূত্র ধরে, উক্ত প্রাচীন 'লোথাল' নগরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে শিল্পীদের আবাস এবং কারখানার অবস্থানও পুরাতত্ত্ববিদ্‌রা চিহ্নিত করেছেন।[৯] সিন্ধু-উপত্যকায় তাম্র-ধাতু-প্রযুক্তিকে কেন্দ্র করে নগর-বিকাশ এবং টেরাকোটা-শিল্পের বিপুল বিকাশ ঘটেছিল; শ্রীদেশাই তাঁর প্রবন্ধে লৌহ-প্রযুক্তিকে কেন্দ্র করে গঙ্গা-যমুনা উপত্যকায় নগর-বিকাশের প্রেক্ষাপটে টেরাকোটা-শিল্পের সমুন্নত বিকাশের চিত্রটি তুলে ধরেছেন। শ্রীদেশাই, ৬০০খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে ৬০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে তাঁর প্রবন্ধকে সীমাবন্ধ রেখেছেন। ৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে নগর-সংস্কৃতির বিকাশের দ্বিতীয় পর্যায়ে উত্তর-ভারতের সামাজিক স্তরে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল, তা লৌহ যুগের প্রেক্ষাপটে প্রযুক্তির সমুন্নত বিকাশেরই প্রতিক্রিয়াজাত বলে, তিনি মনে করেন। এই লৌহ-প্রযুক্তির অনুশীলন আর ক্রমবিকাশের ফলেই গঙ্গা-যমুনা উপত্যকায় নগর-বিকাশের সূচনা। ৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে ৩২০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত সময়সীমাকে শ্রীদেশাই তাঁর প্রবন্ধে প্রাক্‌-মৌর্য যুগ বলে চিহ্নিত করেছেন। এ সময়ে প্রাপ্ত টেরাকোটা-নিদর্শনের সংখ্যা অল্প। কারণ এ সময় নগর-সংস্কৃতির বিকাশের সবে সূচনা মাত্র হয়েছে। সমাজের সর্বস্তরে তার ছোঁয়া লাগে নাই। এ সময়ের যে সমস্ত টেরাকোটা নিদর্শন পাওয়া গেছে তার অধিকাংশই আবিষ্কৃত হয়েছে প্রাক্‌-উত্তরভারতীয়-চিক্কণ-কৌলালের (প্রাক্‌মুদ্রা) স্তর থেকে; কিছু অবশ্য পাওয়া গেছে উত্তরভারতীয়-চিক্কণ-কৌলালের স্তর থেকে।

9. Further Excavations At Lothal : S. R. Rao. LALIT KALA. No. 11 April 1962 : Page 14.

উত্তর ভারতীয়-চিক্কণ-কোলাল উন্নত লৌহ-প্রযুক্তিরই ফলশ্রুতি। তথাকথিত প্রাক্-মৌর্যযুগে উত্তর ভারতীয়-চিক্কণ-কোলালের সীমিত উপস্থিতি, লৌহ-প্রযুক্তি এবং নগর-সংস্কৃতির সীমিত বিকাশেরই ইঙ্গিত দেয়। তাই এসময়ে প্রাপ্ত টেরাকোটা-নিদর্শনের সংখ্যাও সীমিত এবং স্বল্প। মৌর্য-যুগের অধিকাংশ টেরাকোটাই পাওয়া গেছে উত্তর ভারতীয়-চিক্কণ-কোলালের স্তর থেকে। এ সময় থেকে লৌহ-প্রযুক্তি এবং নগর-সংস্কৃতির বিকাশ প্রসারিত হতে আরম্ভ করেছে। ২০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে নগর-বিকাশের ধারা তুঙ্গে উঠে। ২০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে ৫০ খৃষ্টাব্দ, টেরাকোটা-শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রেও সর্বোচ্চ শ্রীবৃদ্ধির কাল বলে, শ্রীদেশাই মন্তব্য করেছেন। এই পর্বে, লৌহ-প্রযুক্তির দ্রুত বিকাশ, উন্নত যন্ত্রপাতির সাহায্যে জঙ্গল কেটে কৃষিক্ষেত্র প্রস্তুত এবং নগর বসানোর কাজ ত্বরান্বিত হয়। কৃষির উন্নতি এবং উদ্বৃত্ত-সম্পদের বৃদ্ধি, অ-কৃষিজীবী শিল্পী সম্প্রদায়ের বাঁচার আশ্বাস বয়ে আনে। এতে বিভিন্ন শিল্পের বিশিষ্ট বিকাশ সম্ভব হয়, যার ফলে ব্যবসা-বাণিজ্যে শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। যানবাহনের সুবিধার ফলে পরিবহন ব্যবস্থার দ্রুত অগ্রগতি ঘটে। আগেই বলা হয়েছে, উত্তর ভারতীয়-চিক্কণ-কোলাল, উন্নত লৌহ-প্রযুক্তিরই ফলশ্রুতি। বিহার এবং উত্তরপ্রদেশের কয়েকটি পুরাক্ষেত্রে, উত্তরভারতীয় চিক্কণ-কোলালের স্তরেই প্রথম মুদ্রার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। মুদ্রার প্রচলন আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক রূপান্তর সৃষ্টি করে ; মুদ্রার ব্যাপক প্রচলনের ফলে (টেরাকোটা সহ) নানাবিধ জনপ্রিয় সুলভ শিল্পদ্রব্যের উৎপাদন লাভজনক হয় এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়, বলে শ্রীদেশাই মনে করেন। তাঁর প্রবন্ধের অনুসরণে আগেই বলা হয়েছে যে, গুপ্তোত্তর যুগে, কতকগুলি প্রতিকূল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে, দেশের আর্থসামাজিক কাঠামোর রূপান্তরকে কেন্দ্র করে নগর-বিকাশ এবং টেরাকোটা শিল্পের বিপুল উৎপাদন বিঘ্নিত হয়।

শ্রীদেশাই এর উপারাক্ত প্রবন্ধের মূল প্রতিপাদ্যের আলোকে এখানে, পশ্চিমবাংলার অন্যতম বিশিষ্ট টেরাকোটা শিল্প কেন্দ্র বিষ্ণুপুরের প্রসঙ্গে আলোচনা করা যেতে পারে। মন্দির-টেরাকোটা ছাড়াও দগ্ধ মৃত্তিকার (ফাঁপা) নানাবিধ শিল্পদ্রব্যের প্রখ্যাত উৎপাদন-কেন্দ্র বিষ্ণুপুর হ'ল তথা বাঁকুড়া জেলা। বাঁকুড়ার হাতি ঘোড়া মনসার

বারি (টেরাকোটা) বাংলার মৃৎশিল্পের উল্লেখযোগ্য নিদর্শন। বাঁকুড়ার ঘোড়া বর্তমানে দেশ-বিদেশের শিল্প-রসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। স্তবকে স্তবকে নির্মিত পোড়ামাটির মনসার-ঝাড় বিরল বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। দগ্ধ-মৃৎশিল্পের এমন সব সুবৃহৎ আকারের শিল্প-নিদর্শন সচরাচর চোখে পড়েনা। সারা জেলা জুড়ে মৃৎশিল্পের নানাধরণের উৎপাদন কেন্দ্র থাকলেও মূলতঃ বিষ্ণুপুরের সন্নিকট পাঁচমুড়া (থানা তালডাংরা, বাঁকুড়া) গ্রামটিই টেরাকোটার বিভিন্ন বিশিষ্ট শিল্প-নিদর্শন নির্মাণের ক্ষেত্রে অগ্রণী।[১০] এক সময়ে এ অঞ্চলের গ্রামীণ সমাজ কাঠামোতে পাঁচমুড়ার কুম্ভকাররা হাতি ঘোড়া, মনসার ঝাড় ইত্যাদি টেরাকোটা-শিল্প দ্রব্যগুলি একান্তভাবে ধর্মীয় প্রয়োজনে নিবেদন-প্রতীক রূপেই নির্মাণ করতেন। সামান্য কিছু শিশুদের খেলনাও নির্মিত হ'ত। খাদ্য কিংবা পরিত্যক্ত বস্ত্রের বিনিময়ে খেলনা জাতীয় পুতুলগুলির আদান-প্রদান হ'ত। বিষ্ণুপুর পশ্চিমবাংলার অন্যতম পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত হওয়ার পর থেকে টেরাকোটা-সামগ্রীর চাহিদা শুধু বৃদ্ধিই পায়নি তার উল্লেখযোগ্য রূপান্তরও ঘটেছে। ধর্মীয়-শাসন-মুক্ত (সেক্যুলার) শিল্পদ্রব্য হিসাবেই এগুলি পর্যটকদের কাছে বর্তমানে সমাদৃত হচ্ছে। পর্যটকদের রুচি এবং চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখেই এখন মুখ্যতঃ টেরাকোটার বাজার নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। গ্রামীণ সমাজে ধর্মীয় প্রয়োজনে নির্মিত টেরাকোটা সামগ্রীকে ঘিরে যেমন আঞ্চলিক বা জাতি-গোষ্ঠীগত বিভিন্ন ধরণের "টোটেম" এবং "ট্যাবু"র বন্ধন ছিল, ধর্মীয়-শাসনমুক্ত টেরাকোটার ক্ষেত্রে তা নেই।

---

10 *The district of Bankura, often called the Terracotta Zone of the State, is famous for the terracotta temples of Vishnupur and "Panchmura Horse". The terracotta products of Panchmura have achieved high acclaim throughout India and even abroad for their virile folk nature, aesthetic appeal and originality. There is still a live tradition of rural pottery in the district. This is the only region in the State of West Bengal, where large-sized folk images are made on traditional potters' wheel —The Status Report On Panchmura, Bankura, West Bengal by Amalendu Bhattacharjee & S. Chakraborty.*

ফলে কলানিদর্শন বা 'কিউরিও' রূপে নিত্যনূতন বিভিন্ন রকমের টেরাকোটা-সামগ্রী নির্মিত হচ্ছে এবং বিষ্ণুপুর আর বাঁকুড়ার ছোটবড় প্রায় ত্রিরিশটি টেরাকোটা-বিপণীতে সরবরাহ হচ্ছে। এক একটি দোকানে বিশ-পঁচিশ দফা টেরাকোটা-শিল্প-বস্তু লক্ষ্য করা যায়। এগুলির দফাওয়ারী তালিকা ক্রমাগত দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হচ্ছে। প্রায় সবই গৃহসজ্জার উপযোগী ধর্মীয়-শাসন-মুক্ত অনাধ্যাত্মিক বা (সেক্যুলার) চরিত্রের। পাঁচমুড়ার হাতিঘোড়া (বাঁকুড়ার ঘোড়া), মনসার ঝাড় জাতীয় ধর্মীয় নিবেদন-প্রতীকগুলি বহুপূর্বেই গোত্রান্তরিত হয়ে ধর্মীয়-শাসনমুক্ত লোক-শিল্পের নিদর্শন রূপেই দেশ-বিদেশে সমাদর লাভ করেছে। বর্তমানে শহরের সাধারণ সব পর্যটকের মনোরঞ্জনের তাগিদে হাতি-ঘোড়ার গায়ে রং-তুলি দিয়ে বিচিত্র-চিত্রাঙ্কন বা নক্সা অলঙ্কণের প্রবণতাও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অতি সাম্প্রতিককালে নির্মিত টেরাকোটা-ঘোড়ার অঙ্গপ্রত্যঙ্গে মাটির অলঙ্করণ-প্রাচুর্যও দুর্নিরীক্ষ্য নয়। শুধু হাতি-ঘোড়া বা মনসার ঝাড়ই নয়, শিব-দুর্গা, লক্ষ্মী-সরস্বতী, বিষ্ণু, রাধাকৃষ্ণ প্রভৃতি পূজামূর্তিগুলিরও অনাধ্যাত্মিক (সেক্যুলার) রূপান্তর ঘটছে টেরাকোটা ফলকে। সেগুলি মুখ্যতঃ গৃহ-সজ্জা বা ভিত্তি-অলঙ্করণের কাজেই ব্যবহৃত হচ্ছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে। সুপ্রাচীন 'মাতৃকা মূর্তি'র ঐতিহ্যের ধারাবাহী টেরাকোটা "ষষ্ঠী পুতুলে"রও (কাঁখে দুটি সন্তান সহ) অনুরূপ জনপ্রিয় রূপান্তর ঘটেছে। এ গুলির আকার-আয়তন বা অলঙ্করণের পরিবর্তন আর পরিবর্ধন হচ্ছে মূলতঃ পর্যটকদের রুচি এবং চাহিদার উপর দৃষ্টি রেখেই। এজন্য প্রয়োজনবোধে ধর্মীয় মূর্তিগুলির প্রতিমা লক্ষণ এবং চিরাচরিত গঠন-ভঙ্গিমাও অধিকাংশক্ষেত্রে পরিবর্তিত হচ্ছে। শহর-নগরের পর্যটকদের রুচির প্রতিফলন সাম্প্রতিককালে নির্মিত টেরাকোটা-মূর্তিকাগুলির (কি ধর্মীয়, কি ধর্মীয়-শাসনমুক্ত অনাধ্যাত্মিক) আকার-প্রকার এবং গঠন ভঙ্গিমায় সুস্পষ্টভাবে অনুভূত হয়। এ অঞ্চলের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী টেরাকোটা-সামগ্রী ছাড়াও পর্যটকদের রুচিমাফিক, ভারতের বিভিন্ন পুরাক্ষেত্রের প্রসিদ্ধ এবং জনপ্রিয় মূর্তি বা ভাস্কর্য-নিদর্শনের অনুকৃতি প্রচুর সংখ্যায় নির্মিত হচ্ছে। মোহেন-জো-দড়োর ককুদ্‌বান বৃষ থেকে, আরম্ভ করে দক্ষিণের নটরাজ মূর্তি,

উড়িষ্যার অলস-কন্যা সবই এখন পাঁচমুড়ার শিল্পীদের হাতে টেরাকোটায় নবরূপ লাভ করছে। বর্তমানে বিষ্ণুপুরের মন্দির-টেরাকোটায় বেস্-রিলিফে-উদ্গত-চিত্রমালা সম্বলিত প্যানেলগুলির অনুকরণে হাজার হাজার টেরাকোটা-টালি নির্মিত হচ্ছে পাঁচমুড়ায়।[১১] এগুলি শুধু কলানিদর্শন রূপেই পর্যটকদের চাহিদা মেটাচ্ছে না, নবনির্মিত ভবনের ভিতরের বা বাইরের দেওয়ালের কোন উপযুক্ত স্থানে এ ধরণের চিত্র-সম্বলিত টেরাকোটা-টালি বসিয়ে ভবনের (বা মন্দিরের) ভিত্তি অলংকৃত করার প্রবণতাও সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে। নিয়মিত এবং ব্যাপক না হলেও এ ধরণের টেরাকোটা-ফলকের (রিলিফে উদ্গত চিত্রসহ) চাহিদা ক্রমবর্ধমান। পাঁচমুড়ার কুম্ভকার শিল্পীরা সরাসরি বা কোন টেরাকোটা ব্যবসায়ীর মাধ্যমে এই ধরণের একাধিক চাহিদার যোগান দিচ্ছেন। শুধু কলকাতা, বর্ধমান বা হুগলী থেকেই নয়, পশ্চিম-বাংলার বাইরে থেকেও শিল্পীরা এ ধরণের 'অর্ডার' মাঝে মধ্যে পাচ্ছেন। সাম্প্রতিককালে বিশাখাপত্তনম্ থেকে একটি মন্দির অলংকরণের জন্য এ ধরণের আট-দশ হাজার টেরাকোটা-টালির অর্ডার পেয়ে পাঁচমুড়ার এক শিল্পী পরিবার তার যোগান দিয়েছেন। অনুরূপ আরও

---

১১ বিষ্ণুপুরের মন্দির-টেরাকোটায় উদ্গত বা রূপায়িত জনপ্রিয় মোটিফগুলির (নৃত্যগীত কিংবা সংকীর্তনের ছন্দোময় প্যানেলগুলি ছাড়াও পর্তুগীজ রণতরী, শিবিকারোহণে ভ্রমণরত সপারিষদ রাজা বা জমিদার) সঙ্গে যামিনী রায়ের চিত্ররাজি, এমনকি আধুনিক শৈলীতে আঁকা চিত্রাবলীর অনুকৃতিও ('সহজ পাঠে'র চিত্রাবলীর অনুসরণে) পাঁচমুড়ার শিল্পীদের হাতে টেরা-কোটা-টালিতে বেস্-রিলিফে রূপ পাচ্ছে। আধুনিক চিত্রাবলীর টেরাকোটা রূপায়ণে নগর-সংস্কৃতি-মনস্ক শহুরে পর্যটকদের রুচিরই প্রতিফলন ঘটছে। এগুলি ছাড়াও বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত দশাবতার তাসের (চক্রাকার) টেরাকোটা রূপান্তরও লক্ষ্য করা যায়। শুধু পাঁচমুড়ার টেরাকোটা দ্রব্যই নয় এজেলার 'সেন্দ্রা' গ্রামের শিল্পীদের ভিন্ন শৈলীতে নির্মিত টেরাকোটা হাতিও বাজারে আসছে। পাঁচমুড়ার শিল্পীরা মন্দির-টেরাকোটার প্যানেলগুলি তাঁদের তৈরী 'ফুলের টব' আর 'ছাইদানে'র অঙ্গশোভা বৃদ্ধির জন্যও ব্যবহার করেছেন।

কয়েকটি এমনি চাহিদার যোগান দিয়েছেন এখানের টেরাকোটা ব্যবসায়ীরা। অবশ্য এ ধরণের চাহিদা সাময়িক, এখনও এটা নিয়মিত বা নির্ভরযোগ্য হয়ে ওঠেনি। যাই হোক, আগেই বলা হয়েছে এখানের টেরাকোটা-শিল্পের এই উল্লেখযোগ্য উৎপাদন বৃদ্ধির পিছনে রয়েছে নগর-সংস্কৃতিমনস্ক পর্যটকদের ক্রমবর্ধমান চাহিদা। বিষ্ণুপুরে সমাগত পর্যটকদের অধিকাংশই নগর কলকাতা বা তার উপকণ্ঠের অধিবাসী। বর্ধমান, দুর্গাপুর, আসানশোল এবং হুগলী-হাওড়া-মেদিনীপুরের শহর ও শিল্পাঞ্চলের প্রচুর পর্যটকও বৎসরের বিভিন্ন সময়ে এখানে আসেন। স্বাধীনতা-উত্তর যুগে সড়ক যোগাযোগ সুগম হওয়ায় এবং দ্রুতগামী যানবাহনের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় কলকাতা ও তার শহরতলীর সঙ্গে বিষ্ণুপুরের যোগাযোগ ঘনিষ্ঠ হয়েছে।[১২] টেরাকোটা-শিল্পের এই প্রসারের সূচনা হয়েছে স্বাধীনতা-উত্তর যুগে, পঞ্চাশের দশক থেকে। তখন থেকেই পাঁচমুড়ার হাতি-ঘোড়া (বাঁকুড়ার ঘোড়া) মনসার ঝাড় একান্তভাবে শিল্প-নিদর্শন রূপেই সংস্কৃতি-মনস্ক নাগরিকদের কাছে আদৃত হতে আরম্ভ করেছে এবং ভারতের বিভিন্ন নগরাঞ্চলে এগুলির বাজারও সৃষ্টি হয়েছে।[১৩]

---

১২ কলকাতা এবং বিষ্ণুপুরের মধ্যে প্রত্যহ ট্রেন যোগাযোগ ছাড়াও প্রায় পনের-কুড়িটি সরকারী-বেসরকারী বাস চলাচল করছে। কলকাতা, শহরতলী এবং বৃহত্তর কলকাতার সঙ্গেও বাস যোগাযোগ স্থাপিত হয়েছে। দুর্গাপুর-খড়গপুর, আসানশোলের সঙ্গেও সরাসরি বাস যোগাযোগ রয়েছে। এছাড়া সারা বছরই, বিশেষ করে সেপ্টেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত, বছরের ছয়-সাত মাস প্রতি সপ্তাহের শুক্র থেকে রবিবার নিয়মিত ভাবে ট্যুরিস্ট বাসের সমাগম হয়। এই বিপুল পর্যটক সমাগমকে কেন্দ্র করেই টেরাকোটা-শিল্প দ্রব্যগুলির বিক্রী এবং উৎপাদন উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়েছে।

13 *Before the independence the majority of the buyers were local villagers, who used to offer them to the folk deities. It is only after the independence, that these terracotta items have found markets as art objects in the urban areas. The Panchmura Horse now owns an international reputation as an 'object de art'. —The Status Report on Panchmura Bankura, West Bengal*

বর্তমানে হাতি-ঘোড়া, মনসার বারি ছাড়া অন্যান্য অসংখ্য রকমের টেরাকোটা সামগ্রী পর্যটকদের চাহিদা অনুযায়ী বাজারে ভিড় করছে। এমন কি বাঁকুড়া জেলাতেও টেরাকোটা-সামগ্রীর চাহিদা বর্তমানে ক্রমবর্ধমান। একান্তভাবে ঘর সাজানোর উপযোগী শিল্পদ্রব্য রূপেই এগুলির কদর বাড়ছে বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুরেও। যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্রুত অগ্রগতির ফলে প্রসারিত নাগরিক-সংস্কৃতির প্রভাবই এর কারণ। হাতি-ঘোড়ার চাহিদা আগে থেকেই বেড়েছে,—সম্প্রতি মন্দির-টেরাকোটার প্যানেলগুলির অনুকরণে (পাঁচমুড়ার কুম্ভকার শিল্পীদের) নির্মিত টেরাকোটা ফলকগুলির চাহিদা এ সব অঞ্চলেও বাড়ছে। বিষ্ণুপুর শহরের নবনির্মিত অনেক ভবনের ভিতর বা বাইরের দেওয়াল অলংকৃত করার কাজে এগুলির ব্যবহার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত 'বিষ্ণুপুর মেলা'তেও এজেলার অন্যান্য শিল্পের সঙ্গে টেরাকোটা-শিল্পের প্রদর্শন আর বিপণনের একটি উল্লেখযোগ্য সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।[১৪] পুরুষানুক্রমিক ঐতিহ্যগত শিল্প-নিদর্শন ছাড়াও প্রতিবছরই এ জেলার কুম্ভকার শিল্পীরা কিছু না কিছু নূতন টেরাকোটা-শিল্প-নিদর্শন মেলায় সরবরাহ করছেন। নবোদ্ভাবিত এই সব শিল্প-নিদর্শনগুলির আবেদনও আধুনিক এবং লক্ষ্য সংস্কৃতি-মনস্ক নাগরিক ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণ। টেরাকোটা শিল্পের কদর এবং চাহিদা বাড়লেও এ শিল্পে আধুনিক বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি এখনও অপেক্ষিত। টেরাকোটা-শিল্পের ক্রমবর্ধমান চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির কথাও ভাবা হচ্ছে।[১৫] কারণ টেরাকোটা দ্রব্যগুলির প্রচুর উৎপাদন এবং এগুলিকে পরিবহনের উপযোগী শক্ত-পোক্ত করার জন্য বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির প্রয়োজন অনস্বীকার্য।

---

১৪ প্রতি বৎসর ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে ৫ দিন ধরে বিষ্ণুপুর মেলার অনুষ্ঠান হয়। প্রতিদিন হাজার হাজার দর্শকের সমাবেশ ঘটে। বিভিন্ন নগর আর শিল্পাঞ্চল থেকে আগত দর্শকরা অন্যান্য শিল্পদ্রব্যের সঙ্গে বিশেষভাবে প্রচুর টেরাকোটা-শিল্প-নিদর্শন মেলা থেকে ক্রয় করেন।

15 *"There is, thus, a need for developing appropriate technologies, and defusing them to the village potters for the overall upliftment of the rural people, specially for generating gainful employment through*

অন্যান্য শিল্পের মতই টেরাকোটা-শিল্পের উল্লেখযোগ্য বিস্তারে নগর-সভ্যতার যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে তা আগেই বিশদভাবে নানা দিক থেকে আলোচনা করা হয়েছে। বিষ্ণুপুরের সঙ্গে কলকাতা তথা বৃহত্তর-কলকাতার যোগাযোগ, দুর্গাপুর ইত্যাদি শিল্পাঞ্চলের নাগর সংস্কৃতির সংযোগ এবং সর্বোপরি পর্যটনকেন্দ্র রূপে বিষ্ণুপুরের বিকাশের ফলে এখানের টেরাকোটা-শিল্পের উৎপাদন এবং বৈচিত্র্য-বিকাশের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন সূচিত হয়েছে তা আজ সুস্পষ্ট। দেব-মন্দির পরিবৃত বিষ্ণুপুর তীর্থকামীদের কাছেও আকর্ষণস্থল। প্রাচীন কাল থেকেই দেখা যায় তীর্থক্ষেত্রকে কেন্দ্র করে শিল্পের বাজার গড়ে উঠে। তীর্থযাত্রীরা সেখান থেকে শিল্পদ্রব্য ক্রয় করেন। লোক সমাগম, বাজার ইত্যাদিকে কেন্দ্র করে তীর্থ-মহিমা-যুক্ত স্থানগুলিতেও এক ধরণের নগর-সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে। শিল্প-বিকাশের সঙ্গে নগর-সংস্কৃতির ঘনিষ্ঠ যোগ সব দিক থেকেই লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু, শুধু আগ্রহী ক্রেতা হিসাবেই নয় ভারতের টেরাকোটা-শিল্পে নগর-জীবন বা নাগর-সংস্কৃতির বিশিষ্ট একটা ভূমিকাও বর্তমান। এটা এ-শিল্পের ইতিহাসে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকেই পূর্বাপর লক্ষ্য করা যায়। শিল্প জগতে বিশেষ করে অনাধ্যাত্মিক (বা সেক্যুলার) শাখার বিকাশের মূলেও নাগর সভ্যতার অবদান কম নয়। মণ্ডনসমৃদ্ধ দরবারী সাহিত্য-শিল্পে শৌখীন বিলাস-কলা-কুশল সম্ভোগ-মনস্ক এক বিচিত্র রুচি বিকাশের মূলেও নাগরিকতার প্রভাবই সুপ্রাচীন কাল থেকেই লক্ষ্য করা যায়। উপভোগ-সচেতন এই রুচি ধাতুগত ভাবে কিছুটা অনাধ্যাত্মিকও বটে। প্রাক্-মৌর্য বা মৌর্য-যুগ থেকেই টেরাকোটা-শিল্প জগতে নর্তকী, সৈনিক, বিচিত্র সজ্জায় সজ্জিত রতি-কলা-কৌতূহলী সম্ভোগ-মনস্ক

---

judicious application of Science and Technology.

With this end in view, the Central Glass and Ceramic Research Institute (C.G.C.R.I), Calcutta has set up the Ceramic Centre for Rural Development (C:C.R D.) at Panchmura, Dist Bankura in collaboratien with the Government of West Bengal, Bankura Zilla Parishad and Council for Advancement af Peoples' Action and Rural Technology (CAPART), New Delhi The project wes started in February 1987. The Status Report of Panchmura Bankura, West Bengal by Amalendu Bhattacharjee & S. Chakraborty.

অসংখ্য নাগরিক-নাগরিকার ভিড় দুর্নিরীক্ষ্য নয়। মৌর্যযুগের 'নটী' বা নর্তকীর টেরাকোটা মূর্তিকা, কিংবা চন্দ্রকেতুগড়ের দুহাজার বছর আগেকার ছন্দোময় নৃত্য-চিত্রের বেশ-বাসে, অলঙ্কার প্রাচুর্যে নাগরিকতার আভাস সুস্পষ্ট। রাজস্থানের বিকানীর সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত রঙমহল-বড়পাল অঞ্চল থেকে পাওয়া গুপ্তযুগের অসংখ্য টেরাকোটা ফলকে নিপুণিকা-চতুরিকাদের যে জগৎ মূর্ত হয়েছে, অলঙ্কার-প্রাচুর্যে আর প্রসাধন বৈচিত্র্যে তাও মনে হয় নগর-নায়িকাদেরই জগৎ। শুধু অলঙ্কার তথা আভরণ-প্রাচুর্যই নয়, এই সব টেরাকোটা ফলকে উদ্গত নায়ক-নায়িকাদের অলঙ্কারে, বেণীবন্ধনে কিংবা বিচিত্র বেশ-বাসে যে বিদেশী প্রভাব (গান্ধার) পড়েছে তাও রাজনীতি আর বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল নগরেই সম্ভব। নগরে স্বাভাবিক কারণে সমাগত বিদেশীদের প্রভাব এখানের সমাজ জীবনে গভীর ভাবে পড়ে। বিকানীর সংগ্রহশালার এই টেরাকোটা-চিত্রপটগুলিতে উদ্গত চিত্রমালার কোনটিতে দেখা যায় পরাঙমুখ-নাগরকে পিছন থেকে আকর্ষণ করছেন কোন এক নায়িকা (বড়পাল বা রঙমহল থেকে প্রাপ্ত, গুপ্তযুগ,৩০০খ্রীঃ)। ওড়নার (লোবাড়ি) বিচিত্র বিন্যাসে আর বিশিষ্ট রীতির কণ্ঠহারে গান্ধার প্রভাব পরিস্ফুট। কোথাও কোন লাস্যময়ী-হাস্যময়ী নাগরীর হাতের ভঙ্গিমায় নর্তকী সুলভ মুদ্রা, কণ্ঠে প্রলম্বিত ফিতার মত ত্রিকোণাকার মালা বা কণ্ঠহার, মালা জড়ানো বেণী বিচিত্র ঠাটে বাঁধা (বড়পাল, গুপ্তযুগ), কোথাও পরস্পরের কাঁধে হাত রেখে নিবিড় অন্তরঙ্গ ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান "দম্পতি" বা নায়ক-নায়িকা (বড়পাল ঃ রাজস্থান ঃ মাপ৯.৫"×১২" গুপ্তযুগ)। পুরুষের মাথায় বিচিত্র ছাঁদে বাঁধা পাগড়ি ত্রিকোণ-ফিতার মত (বক্ষ পর্যন্ত) প্রলম্বিত মালা বা হারে কুষাণ-রীতির প্রভাব লক্ষ্য করেছেন বিশেষজ্ঞরা। রমণীর অঙ্গে, বসন ভূষণের প্রচুর সমাবেশ, বিশিষ্ট রীতির ধাতব কণ্ঠহারে কিংবা নক্সা করা (চার পাপড়ি যুক্ত ফুলের নক্সাদার) বক্ষাবরণীতে বৈচিত্র্যের যে আবেদন তাও নগর-সভ্যতারই প্রভাব প্রসূত বলে মনে হয়েছে। আয়না-হাতে দণ্ডায়মানা এক নায়িকার (অনাবৃত উত্তরঅঙ্গ) বিলোল কটাক্ষে এবং অর্থপূর্ণ স্মিত-হাস্যোদ্ভাসিত বয়ানে বিশেষতঃ অসামান্য শৈল্পিক দক্ষতায় একবিচিত্র ছন্দে রচিত লাস্যময় দেহবল্লরীতে কেলি-চতুরা নগর-রমণীরই আবেদন

পরিস্ফুট। বিকানীর সংগ্রহশালায় সংগৃহীত গুপ্তযুগের এই ফলকটি (৮'৫"×১২") পাওয়া গেছে রাজস্থানের 'বড়পাল' থেকে। 'বড়পাল' (রাজস্থান) থেকে পাওয়া আর একটি টেরাকোটা ফলকে (১২"×৯৫") উদ্গত এক রমণী (পূজারিণী?) মূর্তির গায়ে "দম্পতি" চিত্রের অনুরূপ হাতকাটা (short sleeved) আঁট-সাঁট (বক্ষদেশে চার-পাপড়ি-ফুলের নক্সা করা) 'বডিস' (হাইকলার যুক্ত), পরণে ঘাগরার কিয়দংশ বর্তমান। মাথার ওড়নার পরিধান রীতিতে বিশেষ করে ভাঁজগুলির স্পষ্ট বিন্যাসে গান্ধার রীতির আভাস পেয়েছেন কোন কোন গবেষক।[১৬] হাতে কোন একটি নিবেদন বা অর্ঘ্য-সামগ্রী (?), কাণে বিচিত্র রীতির সুদীর্ঘ লম্বমান দুল, কব্জিতে চওড়া বালা। আলোচ্য ফলকগুলিতে উদ্গত রমণী চিত্রগুলির সাজ-পোষাকের ক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় হ'ল, 'নর্তকী' এবং 'দর্পণ-হস্তা' নারী মূর্তিটির যেমন সাদৃশ্য রয়েছে (সাজপোষাকে) অপরপক্ষে 'দম্পতি' আর 'পূজারিণী' মূর্তির বেশবাসেও অনুরূপ মিল বর্তমান। নর্তকী আর দর্পণ-হস্তা নারীমূর্তির, উত্তরঅঙ্গ সম্পূর্ণ অনাবৃত, দুজনেই একই ধরণের 'V' আকারের (গলা থেকে স্তন যুগলের মধ্যদিয়ে প্রায় নাভিদেশ পর্যন্ত লম্বমান) হার পরেছেন; দুজনেরই গলায় আঁটা বিশেষ ধরণের চিক বা 'কলার'। অনুরূপভাবে লক্ষ্য করা যায় 'দম্পতি' আর 'পূজারিণী' চিত্রের নায়িকাদের গায়ে (বক্ষদেশে) ফুলের নক্সাদার আঁটসাঁট 'বডিস' এবং পরণে একই ধরণের ঘাগরা। ঘাগরা আর ওড়না (সুস্পষ্ট ভাঁজ-যুক্ত) একই ধরণের। পরিধেয় বস্ত্র (সুস্পষ্ট ভাঁজযুক্ত) এবং বিচিত্র রীতির অলঙ্কারে উক্ত গবেষক, গান্ধার-শিল্পের প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। শুধু অলঙ্কারই নয়, তিনি আরও মনে করেন যে, রমণী মূর্তিগুলির সুগঠিত শক্ত-পোক্ত দেহ-নির্মাণে সমসাময়িক কুষাণ আর গুপ্ত শিল্পরীতির যুগ সন্ধিকালের ছাপ পড়েছে। এদিক দিয়ে ফলকে উদ্গত রিলিফ মূর্তিগুলি আনুমানিক ৩০০ খ্রীষ্টাব্দের হওয়াই স্বাভাবিক।[১৭] নারী দেহের অলঙ্কারের ক্ষেত্রে প্রায়, সিন্ধু

---

16 TERRACOTTAS FROM FORMER BIKANER STATE : UMAKANT PREMANAND SHAH. LALIT KALA NO. 8 1960.

১৭ ঐ

সভ্যতার উত্তরকাল থেকে (সিন্ধু-উত্তর – প্রাক্‌মৌর্য সংস্কৃতির কাল থেকে) পরবর্তী বহুকাল পর্যন্ত একই ধারার অনুবর্তন দেখা যায়। অনেক টেরাকোটা-মূর্তিকারই কর্ণে রকমারি কর্ণাভরণ লক্ষ্য করা যায়। গলায় থাকে বিভিন্ন ধরণের হার; হারের দুটি প্রকারভেদ সচরাচর পরিলক্ষিত হয়। একটি গলদেশ থেকে লম্বমান প্রায় নাভিদেশ পর্যন্ত প্রলম্বিত বড় হার, অন্যটি কণ্ঠদেশে আঁটা 'চিক' বা 'কলার' জাতীয় কণ্ঠাভরণ। কিছু কিছু মূর্তির পায়ে নূপুর আর বাহুতে বাজুবন্ধ এবং কোমরে মেখলা লক্ষ্য করা যায়। আলোচ্য বিকানীর সংগ্রহশালায় রক্ষিত টেরাকোটা ফলকে উদ্গত নরনারীর ক্ষেত্রেও সাধারণভাবে দু-রকমের কণ্ঠাভরণই দেখতে পাওয়া যায়। অধিকাংশ রমণীমূর্তির গলায় সাধারণতঃ লম্বমান ফিতার মত হার, কণ্ঠদেশে আঁটা এক ধরণের 'চিক' বা 'কলার' পরিলক্ষিত হয়। বিকানীর সংগ্রহশালায় রক্ষিত টেরাকোটা ফলকে উদ্গত কিছু নারীমূর্তির কণ্ঠের 'চিক' বা 'কলার' গুলিতে গান্ধার শিল্পের প্রভাব লক্ষ্য করেছেন গবেষকরা। কিন্তু এই সব (বিকানীর সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত, গুপ্তযুগের) রমণী মূর্তি-গুলির ক্ষেত্রেই শুধু নয়, টেরাকোটা-ফলকে উদ্গত পুরুষ মূর্তিগুলির প্রসাধন-বৈচিত্র্যও সমধিক লক্ষণীয়। পূর্বোক্ত "দম্পতি" টেরাকোটা চিত্রটি ছাড়াও এখানে সংগৃহীত বেশ কয়েকটি টেরাকোটা ফলকে উদ্গত একাধিক পুরুষ মূর্তি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এ গুলির মধ্যে একটি মূর্তিকে "ভক্ত-পূজারী" বলে নির্দিষ্ট করা হয়েছে।[১৮] বড়পাল থেকে প্রাপ্ত, বিকানীর সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত, এই মূর্তিটির হাতে দেখা যায় পূজার কোন অর্ঘ্যসামগ্রী বা ফুলের গুচ্ছ। গলায় মোটা হার, গায়ে ওড়না (সুস্পষ্ট ভাঁজযুক্ত)। এটি ছাড়াও আরো দুটি টেরাকোটা-ফলকে উদ্গত, দুটি পুরুষ-মূর্তি এই সংগ্রহে বা সিরিজে বর্তমান। মূর্তিগুলির গায়ে সুস্পষ্ট ভাঁজযুক্ত ওড়না বা দোপাট্টা লক্ষ্য করা যায়। দোপাট্টা বা ওড়না বুকের উপর উপবীতের মত আড়া-আড়িভাবে জড়ানো। ওড়না বাঁ-কাঁধ আচ্ছাদিত করেছে কিন্তু ডান-কাঁধ নিরাবরণ। ওড়না বা দোপাট্টার সুস্পষ্ট ভাঁজগুলিকে গান্ধার

---

18 TERRACOTTAS FROM FORMER BIKANER STATE : UMAKANT PREMANAND SHAH. LALIT KALA NO. 8 OCTOBER 1960.

প্রভাবেরই ফলশ্রুতি বলে মনে করা হয়েছে। আলোচ্য টেরাকোটা-ফলক দুটিতে উৎকীর্ণ পুরুষ মূর্তি দু'টিকে বোধিসত্ব বা কোন পূজারী রাজপুরুষ বলে মনে করা হয়েছে। এ কথাও এ প্রসঙ্গে অনুমান করা হয়েছে যে, 'বড়পাল' (রাজস্থান) থেকে প্রাপ্ত এই টেরাকোটা ফলকগুলি সেখানের কোন ধ্বংসপ্রাপ্ত বৌদ্ধ মঠ থেকে হয়ত সংগৃহীত হয়েছে।[১৯]

হনুমানগড় (রাজস্থান) থেকে প্রাপ্ত বিচিত্র সজ্জায় সজ্জিত রমণী-যুগলের (একত্র পাশাপাশি উপবিষ্ট) একটি টেরাকোটা চিত্র এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। রমণী মূর্তি-দুটির দেহের গঠন, আর অলঙ্কার -প্রসাধনে বিশেষতঃ কম্পোজিশন এবং উপস্থাপনে নাগরিক আবেদন সুস্পষ্ট। টেরাকোটা নারী মূর্তি দুটির দেহের গঠনে উদ্ভিন্ন যৌবনা-তন্বী-রূপটি সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। অলংকারে বাহুল্য না থাকলেও বিন্যাসে পারিপাট্য বর্তমান। উভয়েরই বক্ষস্থল সম্পূর্ণ অনাবৃত। বাঁদিকের মূর্তিটির (অপেক্ষাকৃত উচ্চাসনে উপবিষ্ট) বাঁ হাত কোন অজ্ঞাত কারণে ডানদিকের স্তনের উপর ন্যস্ত। শুধু অলঙ্কার পরিচ্ছদই নয়, উপবেশন ভঙ্গিতেও নাগরিক আবেদন অনুভব করা যায়। শিল্পীর সুকৌশল ও সুনিপুণ রূপ নির্মাণে বিলাসমনস্ক নাগরিক রুচির সাদর আমন্ত্রণ। মূর্তি-যুগল গুপ্তযুগের বলে নির্দিষ্ট এবং বিকানীর সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত। অন্য একটি নারী মূর্তি (মুণ্ড হীন ঃ পীর-সুলতান-কি-থেরি থেকে প্রাপ্ত) গঠন ভঙ্গিমায় পূর্বোক্ত নারী মূর্তিগুলি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। দীর্ঘাঙ্গী-তন্বী এই টেরাকোটা মূর্তিটি (৩'৩'' × ১৫'') বিকানীর সংগ্রহশালাতেই সংরক্ষিত এবং গুপ্ত যুগের বলেই মনে করা হয়। মূর্তিটির বেশবাসেও এক স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। ছবিতে যতদূর বোঝা যায়, তাতে মনে হয় পরিধানের শাড়ী কাছা-কোঁচা করে পরা। কারণ মূর্তির সামনের দিকে লম্বা কোঁচা প্রলম্বমান দেখা যায়। বুকের উপর স্বচ্ছ ভাঁজ-যুক্ত ওড়না আলগা করে ফেলা (অন্য কোন জামা বা 'বডিস' কিন্তু লক্ষ্য করা যায় না),'বড়পালের' টেরাকোটা নারীমূর্তিগুলির অলঙ্কার সাজ-সজ্জা থেকে আলোচ্য (হনুমানগড় এবং পীর-সুলতান-কি-থেরি থেকে

---

19 TERRACOTTAS FROM FORMER BIKANER STATE : UMAKANT PREMANAND SHAH. LALIT KALA NO. 8 OCTOBER 1960.

প্রাপ্ত) টেরাকোটা মূর্তিগুলি, সাজসজ্জাতেই শুধু নয়, আকার প্রকার এবং গঠনভঙ্গিমাতেও, বেশ কিছুটা স্বাতন্ত্র্যের দাবী রাখে। মুণ্ডা থেকে (রাজস্থান) প্রাপ্ত, বিকানীর সংগ্রহশালাতেই সংরক্ষিত, একটি টেরাকোটা-নারী-মুণ্ডের উল্লেখও এ প্রসঙ্গে করা যেতে পারে। মুণ্ডটির মস্তকভাগে কেশ বিন্যাসের অসাধারণ পারিপাট্যে কারুকার্যময় শিল্পের আবেদন। মাথার পরিপাটি কুন্তল বিন্যাসের মাঝামাঝি সুচিহ্নিত সিঁথি বেয়ে প্রলম্বিত 'ললাটিকা' কপালে এসে পড়েছে। এই টেরাকোটা-মূর্তি-মস্তকের (দেহের কোন অংশ অবশিষ্ট নাই) সবচেয়ে আকর্ষণীয় আবেদন হল বঙ্কিম গ্রীবা ভঙ্গিটি। স্মিত-হাস্যোদ্ভাসিত ডিম্বাকার বা উপবৃত্তাকার দীর্ঘায়িত চক্ষু বিশিষ্ট সৌখীন অলঙ্কারে অলঙ্কৃত এই রমণী-মুণ্ডটিতে গুপ্ত রীতির ছাপ পরিলক্ষিত হয়।[২০] মুণ্ডা (রাজস্থান) থেকেই প্রাপ্ত একজোড়া টেরাকোটা-মুণ্ড বা মস্তকের কথাও এখানে বলতে হয়।[২১] হাস্যোজ্জ্বল মুখমণ্ডল বিশিষ্ট এই মুণ্ড বা মস্তক দুটির একটি স্ত্রী আর অন্যটি পুরুষের। রমণী মূর্তির পরিপাটি কেশ বিন্যাসে সূক্ষ্ম সৌখীন রুচির প্রতিফলন। সুডৌল মুখখানিকে, শিল্পী অপূর্ব রূপারোপে বা নিপুণ গঠনচাতুর্যে যে শুধু রমণীয় করে তুলেছেন তাই নয়, আয়ত চোখ দুটিতে আর ওষ্ঠদ্বয়ে অসাধারণ কৌশলে হাসির ঝিলিকটি পরিস্ফুট করে এটিকে জীবন্ত করে তুলেছেন। রমণীর মুখমণ্ডলের সর্বত্র রূপ-সচেতন নাগরিক অভিব্যক্তি। সুবিন্যস্ত কুন্তলের মাঝে (মাথার উপরে) সুচিহ্নিত সিঁথির পথ বেয়ে নেমে এসেছে 'ললাটিকা' (বা সিঁথি)। পুরুষ মুণ্ডটির কেশপাশ অনুরূপ সুবিন্যস্ত। সুস্পষ্টভাবে আঁকা জোড়া-ভুরুর নীচে আয়ত চক্ষু দুটিতে নাগরিক-ঔজ্জ্বল্য। রমণী মূর্তি-মুণ্ডটির মস্তকে সৌখীন সুচারু ছাঁদে রচিত কবরীর উপরে একটি নক্সাকরা মস্তকাবরণ (বা অলঙ্কার) জাতীয় কোন বস্তুর অস্তিত্ব চোখে পড়ে। একাধিক তরঙ্গায়িত রেখা টেনে পুরুষ-মুণ্ডটির মস্তকে সযত্ন রচিত কুন্তল-শোভায় নাগরিক সৌখীনতাকে শিল্পী সুস্পষ্ট করে তুলেছেন।

---

20 *TERRACOTTAS FROM FORMER BIKANER STATE : UMAKANT PREMANAND SHAH LALIT KALA NO. 8 OCTOBER 1960.*

২১ ঐ

সার্থক-ভাস্কর্য-সুলভ আবেদনে মুণ্ড দুটি আকর্ষণীয়। গুপ্তরীতির ভাস্কর্যে ভারতীয় নন্দনশাস্ত্র তথা দর্শন শাস্ত্রের 'ভুক্তি' আর 'মুক্তির' আদর্শ (অথবা ভুক্তি থেকে মুক্তির আদর্শ) যুগপৎ বিকাশ লাভ করেছে। শুধু সাহিত্যেই নয়, এ যুগের মূর্তিভাস্কর্যে তথা যাবতীয় শিল্প কর্মে এ আদর্শ সমধিক পরিস্ফুট। সারনাথ বুদ্ধের ধ্যানগম্ভীর রূপনির্মাণেই শুধু নয়, এ যুগের একাধিক ভাস্কর্য নিদর্শনে এক আত্মনিমগ্ন রূপ যেমন লক্ষ্য করা যায়—জীবন-উপভোগের লাস্যময় নিদর্শনও তেমনি এ যুগে দুনিরীক্ষ্য নয়। এ যুগের টেরাকোটা শিল্পেও যে জীবন-উপভোগ বা বিলাস-সম্ভোগের সার্থক রূপায়ণ ঘটেছে বিকানীর সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত টেরাকোটা চিত্রগুলি থেকে তা বোঝা যায়। বিকানীর সংগ্রহশালার অনাধ্যাত্মিক (সেক্যুলার) টেরাকোটা মূর্তিগুলির কেশ-প্রসাধনের আড়ম্বরে এবং রক্তমাংসের অভীপ্ট উত্তাপ সৃষ্টিতে শিল্পী (গুপ্তযুগের) যে অসামান্য দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন, তা অভিনব। সূক্ষ্ম এবং সৌখীন বসন ভুষণ ও কেশ-প্রসাধনে বিচিত্র একশ্রেণীর টেরাকোটা মূর্তি বা ফলকে উদ্গত টেরাকোটা-চিত্রে নাগরিক রুচির সুস্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়। বিচিত্র অঙ্গ-ভঙ্গী আর বিশিষ্ট কান্তিময় সুচারু মুখমণ্ডলের উপভোগ-সচেতন রূপ নির্মাণেও গুপ্ত শিল্পী নাগর-সভ্যতার সার্থক বিকাশ ঘটিয়েছেন। বিশেষ করে বিদেশী রীতির বিচিত্র আভরণ এবং সৌখীন বস্ত্রাদির পরিধান পদ্ধতিতে রাজধানী বা বাণিজ্য-বন্দরের একশ্রেণীর বিলাস-ব্যসন-সচেতন নাগরিকের অস্তিত্ব এই টেরাকোটা গুলি থেকে সুচিহ্নিত হয়েছে। অনেক গবেষক বিকানীর সংগ্রহশালায় সংগৃহীত (এ অঞ্চলের বিভিন্ন স্থান থেকে প্রাপ্ত) টেরাকোটা-মূর্তিকাগুলির উপর বাৎসায়নের কামশাস্ত্র (২০০ থেকে ৪০০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত বলে অনুমিত) এবং ভরতের নাট্যশাস্ত্রের প্রভাব অনুভব করেছেন। বিকানীর সংগ্রহ শালায় সংরক্ষিত পূর্বোক্ত 'দম্পতি' (পাশাপাশি নিবিড় ভঙ্গীতে দণ্ডায়মান পুরুষ ও রমণী যুগল) বা মিথুন মূর্তিটিতে নায়ক ও নায়িকা সুলভ লক্ষণ আবিষ্কার করেছেন। মূর্তি যুগলের পুরুষ মূর্তিকে 'ধীরোদাত্ত নায়ক' আখ্যায় ভূষিত করা হয়েছে। ঐ সংগ্রহেরই অন্তর্ভুক্ত পূর্বোক্ত 'নর্তকী' আখ্যায় অভিহিত সালঙ্কারা নারীমূর্তিটির

হাতের মুদ্রার বিশ্লেষণ করে গমনোদ্যোগী কোন নায়কের যাত্রায় বাধা-দানের একটি আবেগ-বিহ্বল অভিব্যক্তিও অনুমিত হয়েছে।[22] শুধু গুপ্ত যুগেই নয়, মৌর্যযুগের টেরাকোটায় এমন কি সিন্ধু-সভ্যতার যুগেও নর্তকীর (ব্রোঞ্জনির্মিত) মূর্তিকা পাওয়া গেছে। টেরাকোটায় নির্মিত না হলেও একটি নর্তক মূর্তি (ধূসর চূণা পাথরে নির্মিত) ও সংগৃহীত হয়েছে হরপ্পা থেকে। কিন্তু গুপ্তযুগেই বোধহয় ভাস্কর্য-নিদর্শনগুলি সর্বাধিক বাঙ্ময় হয়ে উঠেছে। আর তা সম্ভব হয়েছে, এগুলির প্রেক্ষাপটে সাহিত, দর্শন আর অলঙ্কার শাস্ত্রের সুসমৃদ্ধ বিকাশের ফলে। শুধু বিকানীর সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত টেরাকোটা মৃত্তিকা বা টেরাকোটা-ফলকে উদ্গত মূর্তিগুলিই নয়, এলাহাবাদ সংগ্রহ শালায় সংরক্ষিত গঙ্গা-যমুনা সঙ্গম স্থলের সন্নিকট 'ঝুসি' নামক স্থান থেকেপ্রাপ্ত (এযুগের) প্রচুর মুণ্ড-মূর্তিও এপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কেশ-প্রসাধন, আর অলঙ্কার আভরণের এমন বিপুল-বিচিত্র আড়ম্বর আর প্রকারভেদ সচরাচর চোখে পড়ে না। ঝুসি থেকে সংগৃহীত টেরা-কোটা-নারী-মুণ্ড গুলির মস্তকের কেশ প্রসাধন, বিশেষ করে, বিশদ-বৈচিত্র্য, বিস্ময়কর। অভিনব কেশ রচনাকে কেন্দ্র করে শিল্পী যেন কোন কারুকার্যময় শিল্প নিদর্শন রচনা করতে চেয়েছেন। এত বিচিত্র ছাঁদে কবরী বন্ধন, এত বিভিন্ন রীতির বেণী বিন্যাস সত্যিই বিস্ময়কর। চমৎকারিত্বে অপূর্বতো বটেই, আবেদনেও নাগরিক-বিলাসের সুস্পষ্ট ইঙ্গিতবহ। বিনুনির ছাঁদ আর ফাঁদে যেন পুরুষ মনকে বাঁধার জন্য প্রস্তুত হয়েছে প্রচুর আয়োজন কোথাও কোন রমণীর (টেরাকোটা) কুঞ্চিত কেশদাম বন্ধন-বৈচিত্র্যে শত শত চক্রমালা সৃষ্টি করে মস্তকোপরি শোভমান। কারো চুলের বিনুনি কাণের দুপাশ দিয়ে নেমে গেছে – কাণে সুস্পষ্ট কর্ণাভরণ। কোন টেরাকোটা-রমণী-মুণ্ডের বিপুল কেশভার বন্ধন-বৈচিত্র্যে পাগড়ীর আকার নিয়েছে। কারো বা, পরিপাটি সযত্ন কেশবিন্যাসের ফলে, চুলের মাঝখানে রচিত হয়েছে সুচিহ্নিত সিঁথি, সেই রমণীয় সিঁথির পথ বেয়ে নেমে এসেছে 'ললাটিকা' বা সিঁথি'। কারো চুল ফিতে দিয়ে বাঁধা।

---

22 TERRACOTTAS FROM FORMER BIKANER STATE : UMAKANT PREMANAND SHAH. LALIT KALA NO. 8 OCTOBER 1960.

সিঁথির মাঝখানে মুক্তামালা – বাঁ কানে চওড়া এক ধরণের কর্ণাভরণ। বন্ধন-বৈচিত্র্যে কারো কেশপাশে রচিত হয়েছে অসংখ্য তরঙ্গ-ভঙ্গ। করো বন্ধনমুক্ত কেশপাশ কাণের দুপাশ দিয়ে নেমে গেছে জলধারার মত। কোথাও ফুলের মাল জড়ানো কবরী বাঁ দিক চেপে বাঁধা, চূড়োর মত করে। বিচিত্র রচনা-চাতুর্যে কারো কবরীতে রচিত হয়েছে 'পরচুলার' (wig) বিভ্রম। বিলাস সম্ভোগ আর প্রচ্ছন্ন রতি-চেতনার যে আবেদন শিল্পী এই রমণীমুণ্ডগুলিতে সৃষ্টি করেছেন তাতে নগর বিলাস-মনস্কতারই সুস্পষ্ট প্রতিফলন। শুধু কি কেশ প্রসাধন, অলঙ্কার বিন্যাসেও এখানে বৈচিত্র্যের অভাব নাই। কারো কাণে তিন-ঝুরিযুক্ত-কাণবালা, কারো কাণে সুরম্য কুণ্ডল কারো চুলে মুক্তামালা, কারো সিঁথি অলঙ্কৃত করেছে মূল্যবান রত্নালঙ্কার। কারো স্তনের উপর শোভা পাচ্ছে বিচিত্র সব কণ্ঠহার। কৌশাম্বী থেকে প্রাপ্ত (এই এলাহাবাদ সংগ্রহশালাতেই সংরক্ষিত) টেরাকোটা মূর্তিগুলির মধ্যে একটি সালঙ্কারা নারীমূর্তির বাঁ হাত ত্রিস্তর মেখলার (girdle) উপর ন্যস্ত এবং উত্তোলিত ডানহাতে ময়ূরপুচ্ছের পাখা। কণ্ঠে জোড়াহার, কাণে কর্ণাঙ্গুরী, মাথায় বিশদ কেশরচনা আর মস্তকাভরণে আয়ুধাকৃতি পঞ্চচূড়া। বাহুর উপরে এবং নীচে মণিবন্ধে যথোচিত অলঙ্কার। আর একটি সালঙ্কারা নারীমূর্তিকা এই সংগ্রহেই লক্ষ্য করা যায়। মূর্তিকাটির গলায় হার, হারের লকেট স্তনের উপর দোদুল্যমান। বাম এবং ডান দুটি হাতেই বিভিন্ন ধরণের বালা। মূর্তিটির নীচের অংশ নেই। কিন্তু ফাঁক করা পা দুখানির উপরের অংশের দূরত্ব লক্ষ্য করে লেখক, মূর্তিকাটির নিম্নাঙ্গের গঠনে ইউরোপীয় ধরণের উপবেশন-ভঙ্গী অনুমান করেছেন।[২৩] অহিচ্ছত্র থেকে প্রাপ্ত (এই সংগ্রহেই সংরক্ষিত) একটি চক্রাকার মৃৎফলকে উৎকীর্ণ 'মাতলামির' দৃশ্যটিও উল্লেখযোগ্য। মাতাল একটি স্ত্রীলোককে একটি বোনা খাট বা মাদুর থেকে পাঁজাকোলা করে তুলেছেন একটি দীর্ঘদেহী পুরুষ। দুপাশে দুই পরিচারিকা নেশাগ্রস্ত রমণীটির পরিচর্যারত। নেশায় সংজ্ঞাহীন রমণীর মাথা সামনের দিকে ঝুলে পড়ছে, তার ডান হাতে মদের বোতল। পুরুষ মূর্তির কাণে

---

23 ANTIQUITIES FROM JHUSI AND OTHER SITES by B. Ch. Chhabra, Lalit Kala, No. 9, 1961.

সুস্পষ্ট কর্ণাভরণ। মূর্তির উত্তরাঙ্গ অনাবৃত, পরণে ধুতি। টেরাকোটা চিত্রে এমন অনুপুঙ্খ বিষয় বর্ণনা', সমাজচিত্রের এমন বিচিত্র উপস্থাপন খুব বেশী চোখে পড়ে না। চিত্রটিতে সম্ভোগ-মনস্ক-নাগর-সভ্যতার অবক্ষয়ের একটি দিক তুলে ধরা হয়েছে। আলোচ্য টেরাকোটা চক্রটির উল্টো পিঠে ফুল পাতার এক জটিল নক্সা লক্ষ্য করা যায়। টেরাকোটা চক্রটির মাপ হল ২১·১ × ১৮·৯ সেঃ মিঃ। এই সংগ্রহের, শিশুকোলে মাতৃকা-মূর্তিগুলি উর্বরতাবাদের আদিম প্রবাহটির ধারাবাহিকতাকেই সুস্পষ্ট করে তুলেছে। বেশ কয়েকটি হিন্দু দেবতা-মূর্তির মস্তকভাগও এলাহাবাদ মিউজিয়ামের এই সংগ্রহে লক্ষ্য করা যায়। অহিচ্ছত্র থেকে প্রাপ্ত, টেরাকোটা-বিষ্ণুমূর্তির-মস্তকভাগ, একটি নৃসিংহ মূর্তির (টেরাকোটা) মস্তক (ঝুসি থেকে প্রাপ্ত) এবং শঙ্কিশা থেকে প্রাপ্ত গজলক্ষ্মীমূর্তিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। পৌরাণিক-হিন্দু-ধর্মের যে ইতোমধ্যে সুপরিণত প্রাতিষ্ঠানিক রূপ-বিকাশ ঘটেছে এবং তার দেব-জগৎ যে সুসংবদ্ধ শাস্ত্রসম্মত রূপলাভ করেছে তা মূর্তিগুলির (মস্তকভাগের) রূপকল্পনা এবং সাজসজ্জা দেখলেই স্পষ্ট বোঝা যায়। রত্ন খচিত কিরীট-মুকুটধারী বিষ্ণু মস্তকটি এ প্রসঙ্গে সমধিক উল্লেখ যোগ্য। নৃসিংহ মূর্তিকার (টেরাকোটা) মস্তকের অংশটি থেকে বিষ্ণুর অবতার-বাদের প্রচলন ও পুজোর ইঙ্গিত মেলে। শুধু এই সংগ্রহেই নয়, সমসাময়িক কালের (গুপ্তযুগের) বহু হিন্দু-পৌরাণিক-দেবদেবীর টেরাকোটা মূর্তির সন্ধানও নানাস্থানে পাওয়া যায়। কৌশাম্বী থেকে, গুপ্তযুগের টেরাকোটার শিব ও পার্বতী মূর্তি পাওয়া গেছে। ভিটা থেকে, মার্শাল, গুপ্তযুগের 'শিব ও পার্বতীর' এক টেরাকোটা মূর্তি আবিষ্কার করেছেন। গুপ্তযুগেরই অনুরূপ আর এক শিব ও পার্বতীর মূর্তি সংগ্রহ করেছেন স্পুনার-সাহেব রঙমহল থেকে। রাজঘাট থেকে (গুপ্তযুগের) টেরাকোটা নির্মিত এক শিবমূর্তির মস্তকভাগ আবিষ্কৃত হয়েছে। এ যুগেরই ভিতরগাঁও এর (কাণপুরের সন্নিকট) মন্দির-টেরাকোটায় সাক্ষাৎ মেলে বিষ্ণুর অনন্তশায়ী মূর্তির। এক কথায় গুপ্তযুগে, পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য দেবতা-জগতের পূর্ণ বিকশিত রূপটি টেরাকোটা রাজ্যেও সুস্পষ্ট। শুধু গুপ্তযুগেই নয়, তার অনেক পূর্বে মৌর্য ও শুঙ্গ যুগেই, টেরাকোটার জগতে, হিন্দু দেবদেবীর

প্রতিমা-নির্মাণের সূচনা লক্ষ্য করা যায়। শুঙ্গ যুগের টেরাকোটা নির্মিত একাধিক লক্ষ্মীমূর্তিও আবিস্কৃত হয়েছে কৌশাম্বী, মথুরা ছাড়াও চন্দ্রকেতুগড়, তমলুক, বাণগড়, প্রভৃতি স্থান থেকে। এ প্রসঙ্গে 'টার' (মহারাষ্ট্রের ওসমানাবাদ জেলার উত্তর-পূর্বে, তিরণা নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত একটি গ্রাম) থেকে প্রাপ্ত (দ্বিতীয় খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগের) সাতবাহন-যুগের গজদন্ত নির্মিত 'শ্রী' বা 'লক্ষ্মী' মূর্তিটিও নানাকরণে উল্লেখযোগ্য। পাটনার কদমকুয়া থেকে প্রাপ্ত মৌর্য-যুগের একটি মৃৎফলকে উৎকীর্ণ চতুরাশ্ব-বাহিত রথারূঢ় সূর্যমূর্তি-চিত্রটি ভারতে প্রাপ্ত সূর্যমূর্তির প্রাচীনতম ভাস্কর্য-নিদর্শন বলে মনে করা হয়েছে।[24] কারণ ভারতীয় ভাস্কর্যে সর্বপ্রাচীন সূর্যমূর্তির সন্ধান মেলে বুদ্ধগয়ায় এটি শুঙ্গযুগের। উক্ত টেরাকোটা-ফলকে উৎকীর্ণ মৌর্যযুগের এই মূর্তি চিত্রকে যদি সূর্য বলে ধরা হয়, তবে সঙ্গত কারণেই এটিকে সূর্যমূর্তির প্রাচীনতম ভাস্কর্য-নিদর্শন বলা যেতে পারে। কুষাণ যুগেও বেশকিছু টেরাকোটা নির্মিত ব্রাহ্মণ্য এবং বৌদ্ধমূর্তির সন্ধান পাওয়া গেছে। বৈশালী থেকে (মজফ্ফরপুর বিহার) ব্লক সাহেব এক টেরাকোটা মূর্তির মস্তকভাগ আবিষ্কার করেছেন। এটিকে তিনি গ্রীক প্রভাবিত গান্ধার-শৈলীর বৌদ্ধমূর্তি বলে অনুমান করেছেন। এই মূর্তি-মুণ্ডটির পাকানো-গোঁফ-যুক্ত মুখমণ্ডলের সঙ্গে গান্ধার শৈলীর বোধিসত্ত্ব মূর্তির সাদৃশ্য লক্ষ্য করা গেছে। কুষাণ যুগের টেরাকোটা-মূর্তিকাগুলির একটি বড় অংশের উপর গ্রীক প্রভাব আছে। গঠন শৈলীর বিচার করে এ যুগের টেরাকোটা-

---

24 *Among the male religious figurines the most important is one example which probably depicts Surya Here, we find Surya in a four-horsed chariot and accompanied by an attendant who is dispelling darkness with bow and arrow The earliest known Surya image is found at Bodh Gaya and is ascribed to the Sunga age. If this be taken as an image of Surya, then it is the earliest representation of Surya in Indian art — 'ORIGIN AND EVOLUTION OF INDIAN CLAY SCULPTURE by Charu Chandra Das Gupta. UNIVERSITY OF CALCUTTA. 1961 Page 152.*

মূর্তিগুলিকে সুনির্দিষ্ট দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। একটি হ'ল মধ্য ভারতীয় (বা Central Indian School) শৈলী,....যেটি, বৈশালী, ভিটা, শংকিশা, মথুরা বেসনগর ইত্যাদি অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত টেরাকোটা মূর্তিকাগুলিতে লক্ষ্য করা যায়। অন্যটি হল, উত্তর-পশ্চিম-ভারতীয় (-বা North Western Indian School) রীতি, যেটি পরিলক্ষিত হয় তক্ষশিলা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত টেরাকোটা-মূর্তিকাগুলিতে। তক্ষশিলা থেকে প্রাপ্ত একটি টেরাকোটা-মূর্তিকাকে মার্শাল 'বোধিসত্ব' বলে অনুমান করেছেন। এ যুগের বৌদ্ধ-টেরাকোটা-মূর্তিকাগুলি, হয় বুদ্ধ মূর্তি-মুণ্ড, নয়তো বুদ্ধমূর্তি। এ প্রসঙ্গে একথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এ যুগের, এ অঞ্চলের, টেরাকোটা-বুদ্ধমূর্তি-গুলির সঙ্গে বুদ্ধের প্রস্তরমূর্তির কোন পার্থক্য নাই। একটি টেরাকোটা বুদ্ধ মূর্তিকায় ''উষ্ণীষ'' লক্ষ্য করা যায়। অনুরূপ অন্য একটি বুদ্ধ মূর্তিকায় 'দক্ষিণাবর্ত-মূর্ধজ', উষ্ণীষ এবং 'পৃথু-কর্ণ' দেখতে পাওয়া যায়। আর একটি নিদর্শনেও অনুরূপ মহাপুরুষ লক্ষণগুলির প্রকাশ পরিলক্ষিত হয়। উপরোক্ত তিন 'মহাপুরুষ-লক্ষণ' ছাড়াও কোন কোন টেরাকোটা-বুদ্ধ-মূর্তিকা মুণ্ডে 'ঊর্ণা'র উপস্থিতি চোখে পড়ে।[২৫] একটি মুণ্ডহীন টেরাকোটা মূর্তিকার-(কুষাণ) হাতে 'ধ্যান মুদ্রা' এবং অন্য একটি বুদ্ধমূর্তিতে যথোচিত 'আসন' ভঙ্গিমা চোখে পড়ে। তানুক থেকে মৌর্য-শুঙ্গ-কুষাণ যুগের কিছু টেরাকোটা ফলক পাওয়া গেছে, যেগুলিতে বৌদ্ধ-জাতকের কাহিনী বর্ণিত আছে। বৌদ্ধ ধর্মে মহাযান শাখার এক সুস্পষ্ট প্রতিমা-জগৎ শুঙ্গ কুষাণ যুগে লক্ষ্য করা যায়। কুষাণযুগে নাগছত্রযুক্ত 'নাগী'মূর্তির প্রচলন চোখে পড়ে। এছাড়াও এ যুগে বসুধরা এবং কুবের-হারিতিব টেরাকোটা-মূর্তিকার আবিষ্কার ঘটেছে। ভিটা থেকে প্রাপ্ত একটি টেরাকোটা মূর্তি-মুণ্ডে তৃতীয় নয়নের উপস্থিতি দেখে মার্শাল এটিকে শিব-মূর্তি মুণ্ড (ত্র্যম্বকরূপী) বলে চিহ্নিত করেছেন।[২৬] শুঙ্গ যুগের একটি

---

25 *ORIGIN AND EVOLUTION OF INDIAN CLAY SCULPTURE : by Dr Charu Chandra Das Gupta. CALCUTTA UNIVERSITY : 1961 Page 202.*

26 ঐ

সূর্য-মূর্তির টেরাকোটা-নিদর্শনও চন্দ্রকেতুগড় (বেড়াচাঁপা) থেকে পাওয়া গেছে। মূর্তিটি আশুতোষ মিউজিয়ামের সংগ্রহে আছে। ফলকে উৎকীর্ণ মূর্তিকাটি স্বাভাবিকভাবেই দ্বিমাত্রিক। মৌর্যযুগের ব্রাহ্মণ্য এবং বৌদ্ধ-মহাযানের মূর্তি-জগতটির বিকাশ-বিবর্তনের স্বরূপ অনুমানের ক্ষেত্রেও টেরাকোটার জগতটির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সূর্যমূর্তি খচিত টেরাকোটা ফলকের কথা আগেই বলা হয়েছে। টেরাকোটার জগতটি পর্যালোচনা করলে যথোচিত প্রতিমা লক্ষণ সহ বেশকিছু ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধমহাযান মূর্তির বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধধর্মের পৌরাণিক বিকাশ-সূচনা মৌর্য-শুঙ্গ-কুষাণযুগে অনেকখানি সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়।[27] এ যুগে, মূর্তিশাস্ত্র অনুযায়ী নির্মিত একাধিক ব্রাহ্মণ্য মূর্তির মধ্যে কয়েকটিতে, প্রচলিত প্রতিমা লক্ষণও সুস্পষ্ট। এ প্রসঙ্গে পূর্বোক্ত শুঙ্গযুগের গজলক্ষ্মী-মূর্তিকাটি উল্লেখযোগ্য। সুস্পষ্ট এবং সুপরিচিত প্রতিমা-লক্ষণ-যুক্ত টেরাকোটা মূর্তিকার এক প্রাচীনতম নিদর্শন রূপে এটিকে গণ্য করা হয়েছে।[28] আংশিক ভগ্ন এই টেরাকোটা-ফলকের মধ্যভাগে এক নারীমূর্তি লক্ষ্য করা যায়। মূর্তিটির দুপাশে প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর দণ্ডায়মান দুই হস্তী তাদের শুণ্ডধৃত কলস থেকে মূর্তির উপর বারিবর্ষণ করছে। শুঙ্গযুগেরই প্রায় সমগোত্রীয় একটি কৌতূহলোদ্দীপক মূর্তিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। মূর্তিটি লাউড়িয়া নন্দনগড় থেকে প্রাপ্ত। এই নারীমূর্তিটিও ছত্রতলে দণ্ডায়মান....দুপাশে দুইসঙ্গী মধ্যবর্তীমূল মূর্তিকার ডান হাতে 'বরদ-মুদ্রা'। মূর্তিটির পরিচয় অজ্ঞাত হলেও এটি যে কোন ভাগ্যদেবতারই প্রতিমূর্তি, তা সহজেই অনুমান করা যায়। এই মূর্তির সঙ্গে, এজিলিসের মুদ্রায় উৎকীর্ণ দেবীমূর্তি এবং ভারহুত রেলিংএর মূর্তির সাদৃশ্যের কথা বলা হয়েছে। উত্তর-পশ্চিম ভারতের তক্ষশিলা থেকে মার্শাল একটি

---

27 *It may be held that this age (SUNGA) definitely anticipates the making of the images of gods and goddesses according to the iconographical text —Origin And Evolution Of Indian Clay Sculpture : C. C. Das Gupta : Page 181.*

28 *Origin And Evolution of Indian Clay Sculpture : Page 176.*

টেরাকোটা-পুরুষমূর্তি আবিষ্কার করেছেন, যেটিকে তিনি কুবেরমূর্তি বলে অভিহিত করেছেন। নিদর্শনটি সম্পর্কে মার্শাল সঙ্গতভাবেই বলেছেন, যে, 'আলোচ্য টেরাকোটা-মূর্তিকার সঙ্গে সাঁচীর উত্তর তোরণ দ্বারে (ভাস্কর্যচিত্রে) উৎকীর্ণ 'মার'এর যোদ্ধাদের অন্যতম এক মূর্তির সাদৃশ্য আছে।' কুষাণযুগের একটি মুণ্ডহীন-টেরাকোটা-মূর্তিকে কামদেবের মূর্তি বলেও চিহ্নিত করা হয়েছে।[২৯] অতএব মৌর্য-শুঙ্গ-কুষাণ যুগে ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ-জৈনধর্মের যে পৌরাণিক বিকাশ সূচনা লক্ষ্য করা যায়, টেরাকোটা-মূর্তির জগতেও তা দুর্নিরীক্ষ্য নয়। গুপ্তযুগে এর পূর্ণ বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। দেখা যায়, ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ এবং জৈনধর্মের সুচিহ্নিত সুপরিণত এবং সুবিশাল এক প্রতিমা-জগৎ রূপ পরিগ্রহ করেছে। এ যুগের টেরাকোটা-মূর্তিকাগুলি পর্যালোচনা করলে, শুধু নানা ধর্মীয় শাখার সন্ধানই পাওয়া যায় না, নানা জটিল ধর্ম-দর্শনের অভিব্যক্তিও উক্ত মূর্তিকাগুলির মাধ্যমে সুস্পষ্টভাবে অনুভূত হয়। এ প্রসঙ্গে রাজস্থানের রঙমহল অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত, বিকানীর সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত, গুপ্তযুগের কিছু ব্রাহ্মণ্য-টেরাকোটা-মূর্তি-নিদর্শনের পর্যালোচনা করা যেতে পারে। এর আগে বিকানীর মিউজিয়ামে সংরক্ষিত, গুপ্তযুগের কিছু টেরাকোটা-মূর্তিকায় নাগরক ও নাগরিকাদের প্রসাধন এবং বিচিত্র কিছু 'মুদ্রা' ও ভঙ্গিমার অভিব্যক্তিকে কেন্দ্র করে টেরাকোটা জগতে সম্ভোগ-সচেতন এক নাগরিক বাতাবরণের সৃষ্টি প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। এখন, গুপ্তযুগে ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির সমুন্নত বিকাশ প্রসঙ্গে ঐ বিকানীর সংগ্রহশালাতেই সংগৃহীত কিছু ধর্মীয় টেরাকোটা মূর্তিকার আলোচনা সঙ্গত কারণেই করা যেতে পারে। টেরাকোটাগুলি মূলতঃ রঙমহল ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকেই একদা সংগৃহীত হয়েছে। বিকানীরের ১১৩ মাইল উত্তর পূর্বে 'ঘাগর' নদীর প্রাচীন খাতের উপর, সুরতগড় অবস্থিত। যখন ঘাগর' নদী যথারীতি প্রবহমান ছিল, তখন এর তীরবর্তী অঞ্চলে প্রচুর গ্রাম-শহরের অস্তিত্ব ছিল। আজও তার ধ্বংসাবশেষ চোখে পড়ে। সুরতগড়ে মহারাজা সুরত সিংহ ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে

29 *Origin And Evolution of Indian Clay Sculpture : Page 200.*

ইষ্টক-নির্মিত এক দুর্গ নির্মাণ করেন। ইঁটগুলি সংলগ্ন অঞ্চল থেকেই সংগৃহীত হয়। এগুলির মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক ইঁট অলংকরণ-যুক্ত। এখানের মানুষ মনে করেন, মূলতঃ ইঁটগুলি সুরতগড় থেকে দু-মাইল উত্তর-পূর্বে অবস্থিত রঙমহল ও তার সংলগ্ন অঞ্চল থেকেই সংগৃহীত হয়েছিল। এই অঞ্চলে অনুসন্ধান চালানোর ফলে রঙমহলের ৭ মাইল দূরবর্তী বড়পাল থেকেও বেশ কিছু (প্রায় দশটি টেরাকোটা মূর্তিকা) টেরাকোটা মূর্তিকা আবিষ্কৃত হয়েছে। বড়পালে প্রাপ্ত টেরাকোটা মূর্তিকার কথা আগেই বলা হয়েছে। এসব অঞ্চলে প্রাপ্ত সমস্ত টেরাকোটা মূর্তিকা বা মূর্তি-চিত্র সম্বলিত-টেরাকোটা ফলক বিকানীর মিউজিয়ামেই সংরক্ষিত আছে। এই টেরাকোটা-সংগ্রহের একটি বড় অংশে 'কৃষ্ণায়ণ' আর 'শিবায়নে'র বেশ কিছু ভাস্কর্য-চিত্র ও মূর্তিকা লক্ষ্য করা যায়। বর্তমান 'ঘাগর' নদী (সংস্কৃত নাম 'গর্গরা' প্রাচীন নাম 'দৃশবতী') উত্তর বিকানীরের মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে। এর তীরে একদা প্রচুর ইঁটের তৈরী স্তূপ আর মন্দির নির্মিত হয়েছিল। তারমধ্যে হনুমানগড় থেকে সুরতগড় রঙমহল) পর্যন্ত অঞ্চল একদা ভাগবদ্ধর্মীদের কাছে পুণ্যময় বলে মনে হওয়ায়, তাঁরা এই অঞ্চলকে মন্দির স্থাপত্য আর টেরাকোটা-ভাস্কর্যে সৌন্দর্য-ময় করে তুলেছিলেন। এই পদ্ধতিতেই ভাগবদ্ধর্ম একই সঙ্গে যুগপৎ ধর্ম ও শিল্প-কলার বাহন হয়ে উঠেছিল। এই ভক্তিমূলক ভাগবদ্ধর্ম যে সাহিত্যেও নানা লিপি-চিত্রের অনুপ্রেরণা দিয়েছিল তা গুপ্তযুগের কালিদাসের কাব্যেই প্রতীয়মান হয়।[৩০] কানিংহাম কানপুর থেকে প্রয়াগ পর্যন্ত গঙ্গা তীরবর্তী অঞ্চলে বহু ইঁটের দেউলের অস্তিত্ব লক্ষ্য করেছেন যে গুলি তাঁর মতে গুপ্তযুগের কলা কেন্দ্রিক ভাগবদ্ধর্মেরই সাক্ষ্য দেয়। 'ঘাগর' নদীর তীরবর্তী অঞ্চলেও ভাগবদ্ধর্ম আর সংস্কৃতির-অনুরূপ বিকাশই ঘটেছিল। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে হনুমানগড় ও সুরতগড় অঞ্চল পরিদর্শন করেন। তিনি ঐ সব অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত এবং বিকানীর সংগ্রহশালায় সংগৃহীত

---

30 *"In his Meghaduta (V. 15) Kalidasa compares the cloud adorned with a piece of rain-bow, with Vishnu in the shepe of the cow-herd adorned with a shining peacock feather. Here there is an*

ও সংরক্ষিত টেরাকোটা-নিদর্শনগুলি পর্যবেক্ষণ করেন। সুরতগড় (রঙ্‌মহল) অঞ্চলে একদা যে 'বৈষ্ণব' এবং 'মাহেশ্বর'-কাল্টের সমুন্নত বিকাশ ঘটেছিল তা উপরোক্ত বিকানীর সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত টেরাকোটা নিদর্শনগুলি থেকে সুস্পষ্ট ভাবেই বোঝা যায়। এগুলি থেকে দক্ষিণ-পশ্চিম পাঞ্জাব এবং উত্তর রাজপুতানায় ভাগবধর্মের বিকাশ সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। মূলতঃ 'বৈষ্ণব' আর 'মাহেশ্বর' কাল্ট এসময় একই ভক্তিমূলক ভাগবধর্মেরই বলয়ভুক্ত হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, মহাযান-বৌদ্ধ-ধর্মেও অনুরূপ প্রবণতা অস্পষ্ট নয়। মহাকবি কালিদাস তাঁর মেঘদূতে রামধনুচিত্রিত-মেঘখণ্ডকে ময়ূরপুচ্ছ শোভিত গোপাল বেশী বিষ্ণুর মোহন রূপের সঙ্গে তুলনা করেছেন। এখানেও বিষ্ণু আর গোপালকৃষ্ণের অভিন্নত্ব প্রমাণিত হয় এবং এটা যদি সত্য হয়, যে, কালিদাসের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্য তবে এটিকে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের বিষ্ণু-কৃষ্ণের অভিন্নত্ব চিন্তার একটি দলিলরূপেও ধরা যেতে পারে। যোধপুরের 'মাণ্ডোরে'র স্তম্ভ-গাত্রে আবিষ্কৃত হয়েছে, কৃষ্ণের 'গিরি গোবর্ধন ধারণ' ভাস্কর্য-চিত্র। এগুলিকে আর.জি.ভাণ্ডারকর খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের বলে অনুমান করেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্য, কুমারগুপ্ত এবং স্কন্দগুপ্ত তাঁদের মুদ্রায় 'পরম-ভাগবত' বলে উল্লিখিত হয়েছেন। এঁদের রাজত্ব কালের ব্যাপ্তি ৪০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৪৬৪ খ্রীষ্টাব্দ।[৩১] পূর্বোক্ত রঙ্‌-মহল থেকে 'গিরিগোবর্ধন-ধারণ'এর যে টেরাকোটা-চিত্র আবিষ্কৃত হয়েছে, সেটি সহ বেশ কয়েকটি টেরাকোটা-চিত্রের নির্মাণকাল তৃতীয়

---

identification of Gopala Krishna with Vishnu ; and if the Vikramaditya who was the patron of Kalidasa, was Chandragupta II of the Gupta dynasty, this must be considered to be a record belonging to the early part of the fifth century."

—Vaisnavism Saivism And Minor Religious Systems : Sri R. G. Bhandarkar, Indological Book House : Varanasi (1965) P 43.

31 We have already alluded to the sculptures on a pillar excavated at Mandor near Jodhpur These sculptures representing the over

বা চতুর্থ শতকের পরের নয় বলে রাখালদাস অভিমত প্রকাশ করেছেন। এগুলিতে উৎকীর্ণ মূর্তিগুলির পেশীবহুল দেহ, বিস্ফারিত নেত্র, এবং বিশেষ করে শ্রীকৃষ্ণের মুখে এক জোড়া সুস্পষ্ট গোঁফ প্রাচীনতর এক গঠনশৈলীর ইঙ্গিত দেয়। শ্রীকৃষ্ণের মুখের এই গোঁফ জোড়াটি উত্তর পশ্চিম বা গান্ধার শৈলীর বেশ কিছু বুদ্ধ এবং বোধিসত্ব মূর্তির সগুম্ফ-মুখমণ্ডলকে স্মরণ করিয়ে দেয়। বেশ বোঝা যায় আলোচ্য টেরাকোটা-চিত্রগুলি যখন নির্মিত হয়েছে তখনও ভারতীয় ভাস্কর্যের পক্ষে বিদেশী প্রভাব পুরোপুরি পরিপাক করা সম্ভব হয় নাই।[৩২]

কালিদাসের কাব্যে, একই সঙ্গে শিব ও বিষ্ণুর প্রতি শ্রদ্ধা-নিবেদিত হয়েছে। পাতঞ্জল মহাভাষ্যে 'শিব-ভাগবত' প্রভৃতি পদের প্রয়োগও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের মুদ্রায় উৎকীর্ণ 'পরমভাগবত' আখ্যাটির কথা আগেই বলা হয়েছে। এটিও 'ভাগবদ্ধর্ম'' প্রসারের ব্যঞ্জনা বহন করছে। শুধু তাই নয় এগুলি চন্দ্রগুপ্তের (বিক্রমাদিত্য) রাষ্ট্রনীতির ধর্মীয় দিকটিরও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়। তাঁর মধ্যভারত অভিযানের স্মারক রূপে উদয়গিরিতে বিষ্ণু মন্দির নির্মাণ - 'বিষ্ণুপদ-পাহাড়ে' 'বিষ্ণুধ্বজ' প্রতিষ্ঠা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এখানে ভাগবদ্ধর্মের মাধ্যমেই তাঁর রাজগরিমা প্রকাশ পেয়েছে। ধর্মের বাহনে 'বিজয়-গৌরব' প্রতিষ্ঠার এই রীতির মধ্যে রাষ্ট্রের বিশিষ্ট ধর্মীয় চরিত্রটিরই প্রকাশ ঘটেছে। প্রায় সমসাময়িক কালে ভাগবদ্ধর্মের অনুরাগী যৌধেয়রা (দক্ষিণ-পাঞ্জাবে) উপরোক্ত 'ঘাগর' নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে অনেক (ভাগবত-ধর্মের নিদর্শন রূপে) মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

---

turning of a cart by the baby Krishna, the holding of the 'Govardhana Mountain' by Krishna on the palm of his hand, and such other events, I refer them tentatively to the fifth century—''Vaisnavism, Saivism and Minor Religious Systems by R. G. Bhandarkar,

32 *A complete plaque (terracotta) showing Krishna lifting Govardhana — — — Krishna is wearing a long garland falling to the knees. The turban on the head consists of several bands and is decorated*

রোটক থেকে মুলতান পর্যন্ত অঞ্চলের বিভিন্ন স্থানে যৌধেয়দের মুদ্রা, শীল, ও মৃৎফলক ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকতে দেখা যায়। প্রয়োজনীয় নিবিড় উৎখনন সম্ভব হলে এ অঞ্চল থেকে আরও বহু পুরাবস্তুর আবিষ্কার সম্ভব হবে বলে মনে হয়। ফলে প্রাপ্ত এবং সংগৃহীত শিল্প-নিদর্শনগুলির নির্মাণশৈলী এবং নির্মাণকাল সম্বন্ধে আরও সুনির্দিষ্ট এবং সুনিশ্চিতভাবে একাধিক তথ্য জানা যাবে। যাই হোক, বর্তমানে আবিষ্কৃত টেরাকোটা ফলকগুলিতে মূর্ত টেরাকোটা-মূর্তি-চিত্রের বলিষ্ঠ গঠন বিভিন্ন ভঙ্গিমা ও বিচিত্র অভিব্যক্তির স্ফুরণ লক্ষ্য করা যায়। রঙ্‌মহল থেকে কৃষ্ণায়ণ আর শিবায়নের টেরাকোটা-চিত্রগুলি প্রায় সমান সংখ্যায় পাওয়া গেছে। এ যুগের ভাগবদ্ধর্মের বিশিষ্ট আদর্শটি কালিদাসের কাব্যের মতই এখনকার টেরাকোটা-শিল্প-জগতেও প্রতিফলিত হয়েছে। অথবা বলা যেতে পারে আলোচ্য শিল্প-সাহিত্যের মাধ্যমেও এ যুগের ধর্মীয় তথা রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটের বেশকিছুটা আভাস পাওয়া যায়।[৩৩] শুধু তাই নয়, বিভিন্ন দিক দিয়ে এই টেরাকোটা-শিল্পের জগৎ তাৎপর্যপূর্ণও বটে। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুমান সত্য হলে ভাণ্ডারকর কথিত মাণ্ডোরের 'গিরিগোবর্ধন-ধারণ' প্রস্তর-ভাস্কর্য থেকে রঙ্‌মহলের (গিরিগোবর্ধন-ধারণ) টেরাকোটা-ফলকটিকে প্রাচীনতর বলে মনে করা যেতে পারে। তাছাড়া এটিতে উৎকীর্ণ শ্রীকৃষ্ণের গলার হারে কুষাণ-

---

on the top by pearl pendants, a style observed on other specimens also. The flat torque and the similar triangular necklace are specially noteworthy, as being in the tradition of the typical Kushana style, which seems to have survived in this far-off region for about half a century longer. R D. Banerjee rightly observed, "From the execution of some of the terracotta plaques it can be stated that they cannot be later than 3rd or 4th century A. D." —A Religious Significance of the Gupta Terracottas From Rang Mahal : V. S. Agrawala. LALIT KALA No. 8, October 1960 P. 65.

33 Kalidasa represents a perfect model ot a Bhagavata devotee whose heart overflows with equal devotion for both deities (Vishnu and Siva)

রীতির এবং সুপষ্ট গুম্ফরাজিতে গান্ধার প্রভাব সুস্পষ্ট। এখান থেকেই প্রাপ্ত কৃষ্ণলীলার আর একটি টেরাকোটা-চিত্রের প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। এটিকে কৃষ্ণলীলার অন্তর্গত দানলীলার চিত্র বলে অনুমান করা হয়েছে। এই ফলকে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে রয়েছে দুটি মূর্তি। একটি যৌবনোদ্দীপ্ত গাঁট্টা-গোট্টা পুরুষের; অন্যটি কলসী মাথায় একটি স্ত্রীলোকের। লাঠি-কাঁধে উক্ত পুরুষ মূর্তিকে কর আদায়কারী শ্রীকৃষ্ণ এবং কলসী-মাথায় স্ত্রীলোকের চিত্রটিকে গোপী-চিত্র বলে মনে করা হয়েছে। স্ত্রীলোকটির (গোপী) পরণে গ্রাম্য ঘাগরা-জাতীয় পোষাক, মাথায় ওড়নী। মাথার কলসীটি, ভারসাম্য রক্ষা করার ভঙ্গীতে, বাঁ হাত দিয়ে ধরা—– ডান হাতের তর্জনী, বিস্ময় প্রকাশের ভঙ্গীতে ওষ্ঠ স্পর্শ করেছে। চিত্রটির বিষয়বস্তু হ'ল, শ্রীকৃষ্ণ তাঁর পিতার (নন্দরাজা) অধিকারক্রমে গোপীটির কাছ থেকে কর চাইছেন। শ্রীকৃষ্ণের চেহারায় (টেরাকোটা-ফলকে উৎকীর্ণ মূর্তিতে) 'গান্ধার' প্রভাব অনুমান করা হয়েছে। তাঁর হাঁটু-পর্যন্ত-নেমে-আসা খাটো-বহরের ধুতিতে 'শাসানীয়' রীতিতে (সমান্তরালে) রচিত দোদুল্যমান মালার মত ভাঁজগুলি গুপ্ত-ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে এক নূতন বৈশিষ্ট্য, এবং দুই পায়ের মাঝখানে দোদুল্যমান ভাঁজ করা বস্ত্রগুচ্ছ কুষাণ রীতির প্রভাব প্রসূত বলে মনে করা হয়েছে।[৩৪] কৃষ্ণলীলা-চিত্রের (টেরাকোটা) পাশাপাশি রয়েছে 'শিবলীলা' বা 'শিবায়নের' টেরাকোটা-চিত্র-সম্ভার। একটি টেরাকোটা-ফলকে উৎকীর্ণ হয়েছে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠার সাড়ম্বর অনুষ্ঠান। একটি পীঠ বা বেদিকার উপর লক্ষ্য করা যায়, একটি 'একমুখী শিবলিঙ্গ' মাথার উপর চন্দ্রাতপ। 'শিবলিঙ্গ' প্রতিষ্ঠার পৌরাণিক বর্ণনানুসারে রচিত একটি অনুষ্ঠান-চিত্র। লিঙ্গ প্রতীকের গায়ে ত্রিনেত্র এবং জটা শোভিত শিব দেবতার মুখমণ্ডল। এটিকে মথুরা-ভাস্কর্য-রীতির বিশিষ্ট লক্ষণযুক্ত একমুখী-শিবলিঙ্গ

The Raghuvamsa and the Kumarasambhaba are like two wings' of this soaring warbler. Similarly at Rang Mahal we have terracotta scenes of catholic inspiration illustrating scenes relating to both Krishna and Siva.''— LALIT KALA October 1960 P. 65

34 *A complete plaque showing a forest with Krishna and a gopi — —*

বলে নির্দেশ করা হয়েছে। ডাইনে বাঁয়ে অবস্থিত পুরুষ ও নারী মূর্তি দুটি কোন প্রতিষ্ঠাতা-দম্পতির হতে পারে।[৩৫] পুরুষ মূর্তিটির মাথায় জটা এবং হাতে দণ্ডের মত কোন এক বস্তু লক্ষ্য করা যায়। এখান (রঙ্‌মহল) থেকেই প্রাপ্ত আর একটি টেরাকোটা-ফলকে দেখা যায় উমা-মহেশ্বর মূর্তি। ত্রি-আনন বিশিষ্ট শিব, বামে উমা সহ কৈলাসে উপবিষ্ট। এই উমা মহেশ্বর মূর্তি পাশুপত শাখার অস্তিত্বের প্রামাণ্য-দলিল। এই পাশুপত শাখার অনুগামীদেরই 'মাহেশ্বর' বলা হয়। পশ্চিম ভারতে লকুলীশ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের কোন এক সময় পাশুপত শাখা প্রতিষ্ঠা করেন। একদা মথুরা এই পাশুপত শাখার এক প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠে। মনে হয় এখান থেকেই উক্ত ধর্মমত যৌধেয়দের অধিকৃত অঞ্চলে (রঙ্‌মহল) প্রসারিত হয়। কুষাণ এবং গুপ্ত যুগে ধর্মীয় বিবর্তনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল ভাগবত এবং পাশুপত ধর্মের নিবিড় নৈকট্য এবং অন্তরঙ্গ সমন্বয়। লিঙ্গপুরাণে এই ধর্ম-সমন্বয়ের আদর্শ পূর্ণ বিকশিত। এই পুরাণে বিষ্ণু এবং শিব পূজার উপর সমান জোর দেওয়া হয়েছে। রঙ্‌মহল থেকে প্রাপ্ত টেরাকোটা চিত্রে এই সত্যই পূর্ণভাবে প্রকাশিত হয়েছে। এখানের টেরাকোটাগুলি যেন ঐ ধর্মসমন্বয়েরই চিত্ররূপ। শিবদেবতা পঞ্চানন। আলোচ্য টেরাকোটায় সম্মুখভাগ থেকে তিনটি আননই স্বাভাবিকভাবে দেখা যাচ্ছে। বাকী দুই-আনন মনে হয় পিছনের দিকে থাকায় দৃষ্টি-

---

The plaque illustrates the scene of 'danalila'. The general style of the youthful figure of Krishna is similar to that of the attendant figures in Gandhara style. The hair is shown in short parallel crescents and the eyeballs have almost a goggley effect. The arrangement of the 'dhoti' up to the knees with parallel festoonlike folds in Sassanian style is a new Guptafeature while the central fold falling between the legs is in the Kushana tradition". LALIT KALA No. 8, October 1960, Page 65.

35 *This figure therefore represents an ekamukhi sivalinga which was a typical feature of Saiva iconography in the Mathura School'. -LALIT KALA, No. 8, October 1960, P. 66.*

গোচর নয়। ললাটে তৃতীয় নেত্র এবং মাথায় চূড়া-করে-বাঁধা-জটাপুঞ্জ শোভিত মধ্যবর্তী আননটি যথারীতি সদ্যোজাত, দক্ষিণমুখ বামদেব এবং বামমুখ 'অঘোর' এর প্রতীক। শিবের মূর্তিটি এক পায়ের উপর আর এক পা আড়াআড়ি রেখে উপবিষ্ট। 'ঊর্ধ্বরেত'এই মূর্তিতে লকুলীশ প্রবর্তিত ধর্মের প্রভাব সুস্পষ্ট। শিবমূর্তির নীচে বাহন বৃষ বা নন্দী। শিবের বামে হাস্যোৎফুল্ল পার্বতীর দিব্যমূর্তি। এ প্রসঙ্গে বিষ্ণুপুরের-মন্দির-টেরাকোটার উল্লেখ করা যেতে পারে। এখানের মন্দির-টেরাকোটায় উমা-মহেশ্বর তথা শৈব এবং বৈষ্ণব মোটিফ গুলিকে সন্নিকট সম্পর্ক-সূত্রে আবদ্ধ করে মন্দির অলংকরণে যেভাবে ব্যবহার করা হয়েছে, তাতে ভাব-ভক্তির বলয়বদ্ধ শৈব ও বৈষ্ণবধর্মের সমন্বয়সূচক বিচিত্র দার্শনিক বিকাশের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যেরই প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। ভাগবত তথা পঞ্চরাত্র-বৈষ্ণবধর্ম এবং লকুলীশ প্রবর্তিত পাশুপতধর্মের বিচিত্র দার্শনিক বিবর্তন ঘটে খ্রীষ্টপূর্বাব্দে প্রায় সমসাময়িক কালে। গুপ্তযুগে, এই দুই ধর্মদর্শনের নৈকট্য এবং সমন্বয়ের কথা আগেই বলা হয়েছে। গুপ্তযুগের ভাবভক্তির একই পরিমণ্ডলে আবদ্ধ ভাগবত (পঞ্চরাত্র) এবং পাশুপত ধর্মদর্শনের প্রাচীন ঐতিহ্যের সবচেয়ে সুস্পষ্ট টেরাকোটা চিত্ররূপ দেখা যায় বিষ্ণুপুরের 'শ্যামরায় মন্দিরে'। জোড়বাংলা মন্দিরের প্রতিষ্ঠা ফলকে এবং শ্যামরায় মন্দিরের একাধিক স্থানের টেরাকোটা-চিত্রে উৎকীর্ণ কৃষ্ণ-বলরামের (বিষ্ণু-সংকর্ষণ) যুগ্ম পূজা-মূর্তিতে (দুপাশে ভক্তি-নিবেদন এবং চামর-ব্যজনরত নারীমূর্তি) বিষ্ণুর ব্যূহবাদের সুপ্রাচীন স্তরটির (ধর্মশাস্ত্র এবং প্রাচীন-লিপি প্রমাণে উল্লিখিত)[৩৬] ইঙ্গিত ছাড়াও, অনন্তশয়ন-বিষ্ণুমূর্তি, বিষ্ণুর আয়ুধসংস্থানে স্পষ্টীকৃত ব্যূহমূর্তি ও বিভব (অবতার) মূর্তির সংখ্যাধিক্য একদিকে যেমন

36 In an inscription found at Ghosundi in Rajputana, which unfortunately is in a mutilated condition, the construction of a wall round the hall of worship of Samkarsana and Vasudeva is mentioned. From the form of the characters in the inscription it appears to have been engraved at least two hundred years B.C.

In the inscription no I in the large cave at Nanaghat the names

বৈষ্ণবধর্মের ভাগবত শাখা বা পঞ্চরাত্র মতবাদের ইঙ্গিত দেয়, অন্যদিকে উমা-মহেশ্বর মূর্তি এবং নন্দী-সহ-পঞ্চবক্ত্র-শিবদেবতার মূর্তি পাশুপত মাহেশ্বর শাখার ব্যঞ্জনা বহন করে। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হ'ল, এই মন্দিরেরই দক্ষিণ পশ্চিম কোণের চূড়ার নিমস্থ প্রকোষ্ঠটির মধ্যে উৎকীর্ণ নন্দী-সহ-পঞ্চবক্ত্র শিবদেবতার অনুপম টেরাকোটা-মূর্তিটির নীচে প্রায় একই সঙ্গে নিবন্ধ সমুত্থিত অগ্নিবলয়ের মধ্যবর্তী বিষ্ণুর নৃসিংহ অবতারের বিভব মূর্তি) সুন্দর মূর্তিটি। মূর্তি দুটিকে কেন্দ্র করে করজোড়ে ভক্তি-নিবেদন-রত ভক্তদের সারিবন্ধ মূর্তি (টেরাকোটা) একাধিক স্তবকে সন্নিবন্ধ করা হয়েছে। এটি ভাব-ভক্তির নিবিড় পরিমণ্ডলে বিধৃত ভাগবত এবং পাশুপত ধর্মের সমন্বয়সূচক দার্শনিক বিবর্তনের একটি সুন্দর টেরাকোটা-রূপায়ণ। এই টেরাকোটা-প্যানেলে গুপ্তযুগের এক বিশিষ্ট ধর্মদর্শনের সুপ্রাচীন ঐতিহ্যই শুধু মূর্ত হয়ে ওঠেনি, সে যুগের মন্দির-টেরাকোটা অলংকরণ পরিকল্পনার আদলটির একটি আভাসও এখানে দুর্নিরীক্ষ্য নয়। শুধু এখানের মন্দির-টেরাকোটাতেই নয়, সুপ্রাচীন ভাগবত (তথা পঞ্চরাত্র-বৈষ্ণব-শাখা) এবং পাশুপত শাখার সহাবস্থান এ জেলার মূর্তি (প্রস্তর-নির্মিত) শিল্পের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত হয়। বিষ্ণুপুরের (৮-১০ মাইল দূরবর্তী) জয়পুর থানার অন্তর্গত শলদা গ্রাম এ জেলার একটি প্রসিদ্ধ প্রত্নক্ষেত্র। বৈশিষ্ট্যে বৈচিত্র্যে এই প্রত্নক্ষেত্রটি অদ্বিতীয়। মল্লরাজাদের সতেরোর শতকের সুবিশাল (ল্যাটারাইট নির্মিত) পঞ্চরত্ন মন্দির এবং তার সম্মুখস্থ বিরাট এবং বিরল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ নাটমণ্ডপটি

---

of Samkarsana and Vasudeva, in a Dvandva compound occur along with those of other deities in the opening invocation. This inscription appears from the form of the characters to belong to the first century before the christian era

Samkarsana alone is found associated with Vasudeva In early times, as is seen from the inscriptions and the passage from the Niddesa noticed in the beginning — — — it may be taken for granted that the two Vyuhas, Vasudeva and Samkarsana only were known up to the time of the latest inscription which is to be

বর্তমানে এখানের প্রধান আকর্ষণস্থল হলেও, এখানের একটি বিরাট অশ্বসজ্জে প্রসারিত একটি প্রাচীনতর প্রস্তরক্ষেত্রের অবস্থিতি আজও সুস্পষ্ট। এখানে পাল-সেন যুগের বেশকিছু উন্নতমানের মূর্তি নিদর্শন এখনও লক্ষ্য করা যায়। কয়েকটি ভাস্কর্য নিদর্শন বঙ্গে বিরল। এখানের মূর্তি-ভাস্কর্যে বৈষ্ণব আর শৈবধর্মের, আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলা যেতে পারে, ভাগবত আর পাশুপত শাখার, যুগপৎ বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের মাঘ মাসের প্রবাসীতে (৪র্থ সংখ্যা পৃষ্ঠা ৫৬১) রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের শিল্প শিরোনামায় যে প্রবন্ধটি প্রকাশ করেছেন তাতে তিনি জয়পুর-শলদা অঞ্চলে দৃষ্ট একটি 'লকুলীশ' মূর্তির উল্লেখ করেছেন। শলদা গ্রামে প্রবেশের মুখে ডানদিকে একটি বৃক্ষতলে আজও একটি অর্বাচীন লকুলীশ মূর্তি দেখা যায়। মনে হয় এই লকুলীশ মূর্তিটির কথাই রাখালদাস বলেছেন। যতদূর মনে হয় মূর্তিটি ল্যাটারাইট পাথরের উপর চূণবালির পলেস্তারা করা একটি মূর্তি। রাখালদাস এটির নির্মাণকাল অনুমান করেছেন ১৬০০ – ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দ। মূর্তিটি অর্বাচীন হলেও এ অঞ্চলে এই মূর্তির উপস্থিতি দেখে তিনি কিছু বিস্ময় প্রকাশ করেছেন; কারণ তাঁর মতে উত্তর-পূর্ব ভারতে লকুলীশের পূজা বিরল। তাছাড়া মোটামুটি দ্বাদশ শতাব্দীর পরে লকুলীশ উপাসনা লোপ পায়। যাই হোক, রাখালদাস কথিত লকুলীশ মূর্তিটি অর্বাচীন হলেও এই শলদা গ্রাম থেকেই পরবর্তী কালে যে প্রস্তর-খিলানটি সংগৃহীত হয়ে বর্তমানে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, বিষ্ণুপুর শাখার আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনে সংরক্ষিত আছে তার শীর্ষদেশে একটি লকুলীশ মূর্তি লক্ষ্য করা যায়। একাধিক রেখ এবং পীঢ়া দেউলের অনুকৃতি খচিত এবং লম্ফমান সিংহপৃষ্ঠে উপবিষ্ট নারীমূর্তি শোভিত উড়িষ্যা-রীতির এই খিলানটি পাল-সেন যুগের বলেই মনে হয়। খিলানটি এককালে কোন এক বৃহদাকার মূর্তির

---

referred to about the beginning of the first century before the christian era, so that the system of four Vyuhas was not fully developed up to that time. —Vaisnavism Saivism And Other Religious Systems — R G. Bhandarker, Page—13.

চালচিত্র ছিল বলে মনে হয়। খিলানটির পরিকল্পনা এবং ভাস্কর্য রীতিতে উড়িষ্যার সুস্পষ্ট প্রভাব দেখে মনে হয় এক সময় উড়িষ্যা থেকেই 'লকুলীশ-কাল্ট' এ অঞ্চলে প্রবেশ করেছিল। খ্রীষ্টীয় অষ্টম-নবম শতকে উড়িষ্যায় যে লকুলীশ-পাশুপত কাল্টের বিকাশ ঘটেছিল, উড়িষ্যার এ সময়ের মন্দিরগুলি থেকে তা সুস্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হয়। যাই হোক শলদা গ্রামে শুধু লকুলীশ মূর্তিই নয় একাধিক অতিকায় শিবলিঙ্গ আজও বর্তমান। গন্ধেশ্বর ও ভুবনেশ্বর নামক দুটি অতিকায় শিবলিঙ্গ এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

শুধু এই দুই অতিকায় শিবলিঙ্গই নয়, একসময় পাথর সংগ্রহের অভিপ্রায়ে কোন এক ঠিকাদারের খননের ফলে শলদা সংলগ্ন গোকুলনগর-ফুলনগরের বিরাট প্রান্তরে এরকম একাধিক অতিকায় লিঙ্গ-প্রতীকের ভগ্নাংশ আত্মপ্রকাশ করে। গন্ধেশ্বর-শিব-মন্দিরের অনতিদূরে মাটি কাটার ফলে একসময় একটি মসৃণ স্তম্ভশীর্ষের উপর স্থাপিত একটি ক্ষুদ্রাকার শিবলিঙ্গ আবিষ্কৃত হয়েছিল। স্তম্ভটি মাটিতে যেভাবে দৃঢ়প্রোথিত ছিল, তাতে সেটিকে স্থানান্তরিত করা অসম্ভব ছিল। অথচ পরবর্তী কালে এটি আর দেখা যায় নাই। মনে হয় সেটিকে পুনরায় মাটি চাপা দেওয়া হয়েছিল। এই শলদা থেকেই একটি মহাকাল বা ভৈরব মূর্তি (নির্মাণ শৈলীর বিচারে বেশ পরবর্তী-কালের বলে অনুমান হয়) সংগৃহীত হয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বিষ্ণুপুর শাখার সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত হয়েছে। এখনও একটি শিব বা ভৈরবের নৃত্যমূর্তি এখানের ডোমপাড়ার শঙ্খাসুর-ধর্মরাজের মন্দিরে দেখা যায়। ঠিক শলদায় না হলেও, বিষ্ণুপুর মহকুমারই অন্তর্গত পাত্রসায়ের থানার কাণ্ডোড়ে একটি চক্রমধ্যস্থ শিবের যে অপরূপ নৃত্যমূর্তিটি রয়েছে সেটি নানা কারণে বিরল বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে। রাখালদাস এটিকে (গঠন ভঙ্গিমার দিক দিয়ে) বাদামী গুহার নৃত্যরত শিবমূর্তির সমগোত্রীয় বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন। এটির নির্মাণকাল নবম শতাব্দীর পরের নয় বলেও অনুমান করেছেন।[৩৭] যাই হোক, শলদার প্রখ্যাত প্রত্নক্ষেত্রটিতে যথানিয়মে শিবলিঙ্গ এবং

---

৩৭ দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের শিল্প : রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় (প্রবাসী মাঘ ১৩৩৬ পৃঃ ৫৬৬)

শৈবমূর্তির পাশাপাশি অনেকগুলি বিষ্ণু তথা বৈষ্ণব মূর্তির অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। এখানের বিষ্ণুর অবতার-মূর্তিগুলি সহজেই দর্শকের নজর কেড়ে নেয়। শলদা সংলগ্ন গোকুলনগরে অবস্থিত গোকুলচাঁদের (ল্যাটারাইট নির্মিত) পঞ্চরত্ন মন্দিরের কথা আগেই বলা হয়েছে। এই মন্দিরেরই অনতিদূরে একটি ছোটপুকুরের পাড়ে রয়েছে বিষ্ণুর বরাহ অবতারের অনিন্দ্যসুন্দর মূর্তিটি। ক্লোরাইট পাথরের তৈরী এই মূর্তিটি বহুলাংশে ভগ্ন হলেও এটিকে বঙ্গেপ্রাপ্ত প্রথম শ্রেণীর ভাস্কর্য নিদর্শনগুলির অন্যতম বলে স্বচ্ছন্দে গণ্য করা যেতে পারে। গঠনচাতুর্যে এবং তক্ষণ-কৌশলে মূর্তির অবয়বে এক আদিম বলিষ্ঠতার সঙ্গে কমনীয় রূপারোপের যে অসাধারণ সমন্বয় ঘটেছে তা উচ্চমানের এক উৎকৃষ্ট শিল্প সৃষ্টিরই পরিচায়ক। মূর্তিটি একদা যে ভাস্কর্যশিল্পের একটি অনবদ্য নিদর্শন ছিল তা এই ভগ্নাবস্থাতেও অনুমান করা কঠিন নয় অদূরে রাজগ্রামে (রাহাগ্রাম) রয়েছে নৃসিংহ অবতারের অনুরূপ একটি প্রস্তর মূর্তি। আকার-আয়তনে এবং অবয়ব সৌন্দর্যে এ মূর্তিটিও একটি উল্লেখযোগ্য ভাস্কর্য নিদর্শন। মূর্তিটি এখনও মোটামুটি অক্ষত আছে। বামনাবতারের ত্রিবিক্রম মূর্তিও এ অঞ্চলে দুর্নিরীক্ষ্য নয়। রাহা-গ্রামেই একটি বামনাবতার মূর্তি লক্ষ্য করা যায়। ফুলনগরেও ছিল অনুরূপ একটি অবতার (ত্রিবিক্রম) মূর্তি। এ অঞ্চল থেকেই বেশ কিছু ভগ্ন বিষ্ণুমূর্তি সংগৃহীত হয়ে বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদের আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনে সংরক্ষিত আছে। মূর্তিগুলির কোনটির অর্ধাংশ আবার কোনটির বা এক চতুর্থাংশ মাত্র অবশিষ্ট আছে। তা হলেও নানাদিক দিয়ে মূর্তিগুলি উল্লেখযোগ্য। মূর্তি-গুলির গঠনরীতি লক্ষ্য করার মত। তাছাড়া এগুলির হস্তধৃত আয়ুধের ক্রম লক্ষ্য করলে ব্যূহবাদের প্রভাব সুস্পষ্ট ভাবেই বোঝা যায়। লকুলীশ-পাশুপত এবং পঞ্চরাত্র ভাগবৎধর্মের পাশাপাশি অবস্থান। সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক হ'ল এখানের (গোকুলনগরের) অনন্ত শয্যায়-শায়িত বিষ্ণু মূর্তিটি। এ মূর্তি বঙ্গদেশে দুর্লভ। শুধু তাই নয় মূর্তিটির অপরূপ রূপ নির্মাণে শিল্পীর অসাধারণ দক্ষতা বিস্ময়-কর। যোগনিদ্রায় আবিষ্ট বিষ্ণুর আত্মসমাহিত ভাবটির পরিস্ফুটনে

শিল্পীর অসামান্য দক্ষতা এক নজরেই ধরা পড়ে। ইলোরার দশাবতার মন্দিরে (গুপ্তযুগ) বিষ্ণুর বরাহ, নৃসিংহ এবং বামন অবতার মূর্তির সঙ্গে বিষ্ণুর অনন্তশায়ী নারায়ণ মূর্তি বিদ্যমান। এখানেও (শলদা-রাজগ্রামে) বিষ্ণুর বরাহ, নৃসিংহ এবং বামন মূর্তির সঙ্গে বিদ্যমান অনন্তশায়ী বিষ্ণু মূর্তিকে কোন এক দশাবতার-মন্দিরের লুপ্ত অস্তিত্বের স্মারক বলে মনে করা অসঙ্গত নয়। এই সূত্রে অনুমান করা যেতে পারে যে, ভাগবত-মাহেশ্বর ধর্মের, গুপ্ত যুগে বিকশিত দার্শনিক রূপ বৈশিষ্ট্যটি পরবর্তীকালে এসব অঞ্চলেও যথারীতি প্রকাশিত হয়েছে। ট্রাডিশন প্রায় সমানে চলেছে। যাই হোক, রঙ্‌মহল-টেরাকোটার প্রসঙ্গে ফিরে যাওয়া যাক। এখানের একটি টেরাকোটা ফলক, বিষয় বস্তুর গুরুত্বে, ভারতের ভাস্কর্যশিল্পের জগতে অদ্বিতীয় বলে গণ্য হতে পারে। এই টেরাকোটা-ফলকটিতে অজমুণ্ড-বিশিষ্ট দ্বিভুজ যজ্ঞোপবীতধারী একটি বিচিত্রমূর্তি লক্ষ্য করা যায়। মূর্তির নিম্নাঙ্গে সুস্পষ্ট লিঙ্গ-চিহ্ন দৃষ্ট হয়। মূর্তিকার একটি মাত্র পদ স্থূলাকৃতি হস্তীপদের সমতুল্য। মনে হয় একটি পদের উপর সমস্ত দেহটির ভারসাম্য রক্ষা করতে গিয়ে শিল্পী হস্তীপদের কল্পনা করেছেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এটিকে দেবতা-অজৈকপাদের (একপদ ও ছাগমুণ্ড বিশিষ্ট দেবতা) মূর্তি বলে সনাক্ত করেছেন। 'অজৈকপাদ', মহাকাব্য এবং পুরাণে একাদশ রুদ্রের অন্যতম বলে গণ্য হয়ে থাকেন। লিঙ্গপুরাণে একাদশ রুদ্রের দুটি তালিকা দেওয়া হয়েছে। একটিতে 'অজৈকপাদ' অন্যটিতে 'অজেশ' নামের উল্লেখ আছে। 'মাহেশ্বর'গণ শিবদেবতাকে অজ-একপাদ এবং 'অহিবর্ধ্ন্যের' নিয়ন্তা বলে মনে করেন। উভয়েই বেদে অপরিণত এবং অপ্রধান পৌরাণিক প্রকৃতির দেবতারূপে খ্যাত হলেও পরবর্তীকালে একাদশ রুদ্রের তালিকাভুক্ত হয়েছেন। মহাভারতে এই তালিকার পুনরাবৃত্তি করা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে বলা হয়েছে যে, অজৈকপাদ এবং অহিবর্ধ্ন্য কুবেরের স্বর্ণাগারের দুইরক্ষক। অজ, অগ্নিরই এক রূপান্তর। ইনি অজ (ছাগ) মুণ্ড বিশিষ্ট এক দেবতারূপে অভিহিত হয়েছেন। এই দেবতার ব্রাহ্মণ্য-চরিত্র অভ্রান্তভাবে প্রমাণিত হয় বক্ষে, উপবীত-পরিধান পদ্ধতিতে পরিহিত উত্তরীয় থেকে। আলোচ্য অজৈকপাদ বা অজ

একপাদ মূর্তির বক্ষে উপবীতের ধরণে আড়াআড়ি পরিহিত চওড়া তরঙ্গায়িত (ভাঁজযুক্ত) উত্তরীয় বাঁ-কাঁধ থেকে নেমে এসেছে। গুপ্তযুগের মূর্তি-শিল্পে এভাবে পরিহিত উত্তরীয়কে উপবীত রূপে গণ্য করা হয়।[৩৮] মূর্তিটির ডানহাত ভগ্ন কিন্তু বাঁ হাতে একটি পত্র-পুটে ফল আর মিষ্টান্ন লক্ষ্য করা যায়। বড়পাল থেকে প্রাপ্ত 'যোগী এবং রমণী' মূর্তি খচিত টেরাকোটা-ফলকটি (বড়পাল থেকে প্রাপ্ত ১১.৫″ × ১৪.৫″ মাপের। বিকানীর সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত) এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই টেরাকোটা ফলকে দেখা যায় একটি নারী নলযুক্ত ভৃঙ্গার থেকে তার ডানদিকে দণ্ডায়মান একটি পুরুষ মূর্তির ডানহাতে জল ঢেলে দিচ্ছে। পুরুষ মূর্তিটিকে কোন 'মাহেশ্বর' যোগীর মূর্তি বলে মনে করা হয়েছে।[৩৯] মাথায় জটা-জুট এবং বুকে উপরোক্ত টেরাকোটা ফলকের (অজৈকপাদ) মূর্তির মতই যজ্ঞোপবীত-ধারণের পদ্ধতিতে পরা উত্তরীয়। মাহেশ্বর যোগী বলে অনুমিত এই মূর্তির হাতেও একটি ঠোঙায় গোলাকৃতি (ফল-মিষ্টান্ন ?) কিছু দ্রব্য।

আর একটি সমধিক গুরুত্বপূর্ণ টেরাকোটা-ফলকের কথা প্রাসঙ্গিকভাবেই বলতে হয়। রঙমহল অঞ্চল থেকেই (উপরোক্ত অজৈক-পাদ এবং ভাগবত-পাশুপত ধর্মের প্রভাব যুক্ত টেরাকোটা ফলকগুলির সঙ্গেই) এ টেরাকোটা-ফলকটিও পাওয়া গেছে। আয়ত ক্ষেত্রকার বা সমায়ত এই টেরাকোটা-ফলকটিতে একটি দ্বিভুজ দণ্ডায়মান পুরুষ মূর্তি লক্ষ্য করা যায়। মূর্তি-মস্তকের পশ্চাদ্‌বর্তী প্রভামণ্ডলটির গঠন এবং আকার চক্রের মত। মূর্তিটি 'চক্রপুরুষে'র বলে অনুমান করা হয়েছে।[৪০] বিষ্ণুর আয়ুধগুলিকে সময় সময় মনুষ্যাকারে রূপ দেবার প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য এটা তাত্ত্বিক রূপায়ণ। পূর্বালোচিত শলদার (বাঁকুড়া জেলা) প্রত্নক্ষেত্র থেকে একটি শঙ্খপুরুষ

---

38 *'This kind of scarf represented the Yajnopavita in Gupta iconography.' The Religious Significance Of The Gupta Terracottas From Rang Mahal. —V. S. Agrawala, LALIT KALA, October 1960 No. 8 Page 67.*

৩৯ ঐ

৪০ ঐ

(বিষ্ণুর হস্তধৃত অন্যতম আয়ুধ শঙ্খের মনুষ্যাকারে রূপদান) সংগৃহীত হয়ে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বিষ্ণুপুর শাখার সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত আছে। শলদার যে স্থান থেকে এই শঙ্খপুরুষের মূর্তিটি সংগৃহীত হয় সেখানে এখনও একটি নাগছত্র যুক্ত বিষ্ণু মূর্তির ভগ্নাংশ (নাগ-ছত্র যুক্ত মস্তকভাগ) লক্ষ্য করা যায়। অনুমান করা যেতে পারে যে, বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদের শঙ্খ পুরুষ মূর্তিটি একদা উক্ত বিষ্ণু মূর্তির সঙ্গে যুক্ত ছিল। যাই হোক, উপরোক্ত চক্রপুরুষের (টেরা-কোটা) মূর্তি পাওয়া গেছে রঙমহলের সুরতগড় থেকে এবং বিকানীর সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত আছে। গুপ্তযুগের এই মূর্তিটি (১৩'২'' × ৭'') নানাদিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই মূর্তিটি থেকে অনুমান করা হয়েছে যে এ অঞ্চলে জনপ্রিয় ভাগবতধর্মে 'পঞ্চরাত্র' মতবাদের গভীর প্রভাব পড়েছিল। পঞ্চরাত্র-মতবাদের অনুগামীরা "চক্রপুরুষ" বা বিষ্ণুর চক্রাবতারের উপাসক। পঞ্চরাত্র মতবাদের অন্যতম গ্রন্থ 'অহিবুধ্ন্য-সংহিতায়' চক্রাবতারের মহিমা কীর্তন করে তাঁকে 'চক্রবর্তী' পর্যায়ের নৃপতিদের অবশ্য পূজ্য দেবতা-রূপে গণ্য করা হয়েছে। ধর্মমত নির্বিশেষে শৈব, শাক্ত, বৌদ্ধ, দিগম্বর, চার্বাক যাজ্ঞিক, কাপিল সকল সম্প্রদায়ের নৃপতিই 'চক্রপুরুষে'র উপাসনা করতেন। চক্র-পুরুষের 'প্রতিমা-লক্ষণ' প্রসঙ্গে অহির্বুধ্ন্য-সংহিতায় ('মনুষ্যরূপ সংস্থান') দ্বিভুজ-মনুষ্যমূর্তির কথাই বলা হয়েছে। অবশ্য ক্ষেত্র-বিশেষে ষোল বা বাষট্টি বাহু যুক্ত মূর্তির কথাও বলা হয়েছে। আলোচ্য সুরতগড়-রঙমহলের (বিকানীর সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত) চক্রপুরুষ টেরাকোটায় দুটিহাতেই লক্ষ্য করা যায়। একই অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত পূর্বোক্ত অজৈকপাদ (টেরাকোটা-মূর্তি) এবং আলোচ্য 'চক্রপুরুষ' (টেরাকোটা-মূর্তি) এর সম্পর্ক নির্ণয় প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, বেদেই 'অজৈকপাদ' এবং 'অহির্বুধ্ন্য' এর মধ্যে একটি অন্তরঙ্গ সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়। অনেকে মনে করেন যে সংহিতা সংকলনের সম্পাদকীয় প্রক্রিয়ার চূড়ান্ত পর্যায়ে স্তোত্রে আহূত যে কোন বস্তুই সে সূক্তের দেবতা-রূপে গৃহীত হয়েছিল। যে সমস্ত ক্ষেত্রে স্পষ্ট ভাবে কোন দেবতা নির্দেশিত হয় নি, সম্পাদকরা যান্ত্রিক ভাবে ঋকে উল্লিখিত প্রাণহীন বস্তুর উপরও দেবত্ব আরোপ করতেন। এই চূড়ান্ত কৃত্রিম

আনুষ্ঠানিকতার যুগে দেবতার বিশেষণগুলিও মধ্যে মধ্যে যেন স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব অর্জন করে দেবতারূপে পরিগণিত হয়েছিল। যাস্কের মতে এইরূপ যাজ্ঞিক পক্ষের চিন্তাধারায় পরিপুষ্ট হয়ে যখন অসংখ্য উপ-বিভাগে বিন্যস্ত হচ্ছিল তখন যেন কোন কিছুরই দেবতা হয়ে ওঠার বা দেবতা রূপে পরিগণিত হওয়ার আর বাধা রইল না। যজ্ঞে বলি প্রদত্ত অশ্ব, বৃষ এবং অন্যান্য জন্তুতে যেমন দেবত্ব আরোপিত হয়েছিল, তেমনি নতুন প্রবণতার বিচিত্র অভিব্যক্তি 'অজ-একপাদ' বা 'অহির্বুধ্ন্য' রূপ কল্পনার মধ্যে দেখা গেল।[৪১] যাই হোক, বেদে অন্ততঃ পাঁচক্ষেত্রে অজ-একপাদ এবং অহির্বুধ্ন্যের নাম একত্র উল্লিখিত হয়েছে। উভয়েই 'অগ্নির' রূপ বা রূপান্তরের সঙ্গে যুক্ত। যাই হোক, পুরাণে উভয়েই রুদ্রের অবতার রূপে কল্পিত হয়েছেন। 'রুদ্র' আবার অগ্নিরই নামান্তর। ছাগমুণ্ড বিশিষ্ট দেবতা অজ-একপাদ এবং চক্রপুরুষের মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে কিনা এ প্রশ্ন তুলে আলোচ্য প্রবন্ধে[৪২] বলা হয়েছে যে পঞ্চরাত্র মতবাদের অন্যতম সংকলন গ্রন্থ অহির্বুধ্ন্য সংহিতার নামকরণই এর প্রকৃষ্ট উত্তর বহন করছে। পঞ্চরাত্র-ভাগবতদের উক্ত শৈবনাম গ্রহণের মধ্যেই উভয় দেবতার একটি সম্পর্ক আভাসিত হয়েছে। প্রথম কথা হ'ল, দেবাদিদেব মহাদেব যখন কৈলাসে অহির্বুধ্ন্য রূপে অবস্থান করছিলেন তখন তিনি ভাগবত ধর্মের আদি এবং প্রধান প্রবক্তা নারদ কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে বিষ্ণুশক্তি-চক্র বা চক্রপুরুষের প্রকৃতি, রহস্য ও তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন। মহাদেব একথাও বলেন যে, তিনি অনন্তশেষের অবতার সংকর্ষণের কাছ থেকে এই গুহ্য-তত্ব লাভ করেছেন। অনন্তশেষ, দুগ্ধ সাগরে অধিষ্ঠিত সৃষ্টির আদিতে বর্তমান মহাসর্পেরই নামান্তর। অহির্বুধ্ন্যের বৈদিক নামের তাৎপর্যও হল গভীর অধোদেশের (পাতাল) মহাসর্প। বেদের

৪১ ইতিহাসের আলোকে বৈদিক সাহিত্য (ঋগ্বেদ সংহিতা) সুকুমারী ভট্টাচার্য : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ। জানুয়ারী ১৯৯১। পৃষ্ঠা ৯৯-১০০

42 *The Religious Significance Of The Gupta Terracottas From Rang Mahal.* —*V. S. Agrawala, LALIT KALA, October 1960 No 8 Page 68.*

অহির্বুধ্ন্য ইন্দ্রের প্রতিদ্বন্দ্বী বৃত্রের সঙ্গে অভিন্ন। বিষ্ণু ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। এই রূপে নানা সূত্রে, সমন্বয় সমাহারে, সংকর্ষণ বা অনন্তশেষ বা অহির্বুধ্ন্য একীভূত হয়ে গেছেন, এবং এই সমন্বয়-চিন্তাই ভাগবত ধর্মের মূলীভূত লক্ষ্য। বিষ্ণু, মহাসর্প তথা মহাদেবের (যিনি অহির্বুধ্ন্যর সঙ্গে অভিন্ন) সঙ্গে সমন্বিত হয়েছেন। একথাও সর্বজনবিদিত যে, এই মহাসর্প শিবদেবতার অলঙ্কার। এই প্রতীক তত্ত্বটির মধ্যে ভাগবদ্ধর্মের এক সুস্থ এবং উদার সমন্বয় চিন্তার বিকাশ ঘটেছে। অতএব রঙমহলের (টেরাকোটা) ভাস্কর্য-সংগ্রহে অজ-একপাদ এবং চক্রপুরুষের একই সঙ্গে উপস্থিতি বা সহাবস্থান স্বাভাবিকভাবেই ঘটেছে।[৪৩] এই সূত্রে বাঁকুড়া জেলার (ছাতনার সন্নিকট) শুশুনিয়া পর্বতগাত্রে চক্র স্বামীর উপাসক মহারাজ চন্দ্রবর্মার সংস্কৃত ভাষায়, ব্রাহ্মী অক্ষরে উৎকীর্ণ চতুর্থ শতকের (গুপ্ত-যুগের) বলে অনুমিত লিপিটির কথা প্রাসঙ্গিক ভাবেই এসে পড়ে। লিপিতে মহারাজ চন্দ্রবর্মা নিজেকে চক্র-স্বামীর উপাসক বিশেষণে ভূষিত করেই ক্ষান্ত হননি, লিপিটির উপরের দিকে একটি চক্র-চিত্রও ক্ষোদিত হয়েছে। লিপিটির বঙ্গানুবাদ করলে দাঁড়ায় "চক্র স্বামীর দাসগণের অগ্রগণ্য কর্তৃক উৎসৃষ্ট হ'লঃ পুষ্করণাধিপতি মহারাজ সিংহ-বর্মার পুত্র চন্দ্রবর্মার অনুষ্ঠান।" বর্তমানে, অধিকাংশ ঐতিহাসিক এই পুষ্করণা বলতে বাঁকুড়া জেলার দামোদর তীরবর্তী পোখর্ণা গ্রামকেই চন্দ্রবর্মার রাজধানী বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কয়েকটি শিলালিপির নজিরে পশ্চিম যোধপুরের পোখরণ্ কে চন্দ্রবর্মার রাজধানী রূপে সাব্যস্ত করেছিলেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এই মত সমর্থন করেছেন। আবার একথাও মনে করা হয় যে, চন্দ্রবর্মার আদি পিতৃভূমি হয়ত উক্ত পোখরণে ছিল। তিনি তাঁর পিতৃভূমির স্মৃতিরক্ষার্থেই তাঁর এই নূতন প্রান্তিক রাজ্য বা দুর্গের নাম দিয়েছিলেন পোখর্ণা। সে যাই হোক, উপরোক্ত রঙমহলের 'চক্রপুরুষ' টেরাকোটার আলোকে নূতন করে এই চক্রস্বামীর

---

43 *The Religious Significance Of The Gupta Terracottas From Rang Mahal.* —V. S. Agrawala, LALIT KALA, October 1960 No 8 Paga 68.

উপাসক চন্দ্রবর্মার কথা ভাবা যেতে পারে। রঙ্‌মহলের উপরোক্ত ধর্মীয় টেরাকোটার অধিকাংশগুলির নির্মাণকাল তৃতীয়-চতুর্থ শতক বলে রাখালদাস মনে করেছেন—এটা আগেই বলা হয়েছে। আলোচ্য শুশুনিয়া লিপিও প্রায় সমসাময়িককালের। এ কথা আগেই বলা হয়েছে যে, ভাগবত ধর্মানুরাগী দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ইত্যাদি (সমসাময়িক কালের) সম্রাটরা তাঁদের বিজয়যাত্রা বা বিজয়-অভিযানের স্মারকরূপে 'বিষ্ণুধ্বজ' বা 'বিষ্ণুমন্দির' প্রতিষ্ঠা করেছেন। অনুরূপভাবেই হয়ত সমসাময়িক কালের রাজা চন্দ্রবর্মা তাঁর শুশুনিয়া লিপিতে (বিজয় লিপি), তৎকালে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী, চক্রবর্তী পর্যায়ের নৃপতিদের উপাস্য, চক্রস্বামীর পূজকরূপে নিজেকে বিশেষিত করেছেন।

শুশুনিয়া-লিপির চন্দ্রবর্মা সম্পর্কে নানা অনুমানের অবকাশ থাকলেও প্রকৃত ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের পথ এখনও খুব প্রশস্ত নয়। বিশেষ করে বাঁকুড়া জেলার পোখর্ণায় তাঁর রাজধানী স্থাপন বা তাঁর রাজ্যকাল সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট বা সুস্পষ্টভাবে কিছু জানার পক্ষে যথেষ্ট কোন নিদর্শন আজও আবিষ্কৃত হয় নাই। যেসব বিষ্ণু বা বৈষ্ণবমূর্তি এ জেলা থেকে পাওয়া গেছে সেগুলি অনেক পরবর্তীকালের বলে নির্দিষ্ট। তবু একথা সত্য যে, বঙ্গে বিষ্ণুপূজার প্রাচীনতম লিপি-প্রমাণ এই শুশুনিয়া লিপি। শুধু বিষ্ণুপূজাই নয়, ভাগবদ্ধর্মের বঙ্গে প্রবেশ এবং প্রসারেরও এটি একটি দলিল। এ প্রসঙ্গে আর একটি প্রশ্ন মনে জাগে। চন্দ্রবর্মার পিতৃভূমি কি রাজস্থানেই ছিল— যেখানের চক্রস্বামী উপাসনার প্রথা তাঁর মাধ্যমে এখানে এসে পেঁছেছিল? অবশ্য এটা একটা অনুমান মাত্র— কোন ভাবেই এটাকে কোন সিদ্ধান্ত বলে মনে করা ঠিক হবে না। বড়জোর গবেষণার একটা সূত্র বলে গ্রহণ করা যেতে পারে।

যাইহোক, রঙ্‌মহল থেকে প্রাপ্ত পূর্বোক্ত 'চক্রপুরুষে'র টেরাকোটা ফলকটি একটি বিশিষ্ট ধর্মদর্শনের বিকাশ-বিস্তারের ইঙ্গিতের সঙ্গে গুপ্তযুগের রাজনীতি এবং সংস্কৃতির সামন্ততান্ত্রিক প্রেক্ষাপটটিকেও উন্মোচিত করে দেয়। চক্রপুরুষের মূর্তি বিশেষভাবে চক্রবর্তী রাজাদের পূজ্য। চক্রবর্তী-রাজা বলতে সামন্ত-চক্র-চূড়ামণি নৃপতির কথাই বোঝায়। মৌর্যযুগে অতি কেন্দ্রীভূত শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হ'ত

মূলতঃ বেতনভুক্ কর্মচারী দিয়ে। গুপ্তযুগের, সম্রাটদের রাজ্য জয় এবং হৃতরাজ্য বিজিত-রাজাদের ফিরিয়ে দেওয়ার সূত্র ধরে যথার্থ সামন্ততন্ত্রের পথ প্রশস্ত হয়। পরিপূরকভাবে হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিরও সমুন্নত বিকাশ ঘটে। রঙমহলের (গুপ্ত-যুগের) টেরাকোটা এবং এসময়ের প্রচুর প্রস্তর-ভাস্কর্যে রয়েছে তার জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত। আগেই বলা হয়েছে, শ্রুতি আর স্মৃতির প্রভাব এযুগের এক শ্রেণীর টেরাকোটায় সমুজ্জ্বল। শুধু মূর্তি-ভাস্কর্যেই নয় কাব্য-সাহিত্যেও এ প্রভাব সুস্পষ্ট। এ যুগের অসামান্য প্রতিভার অধিকারী কালিদাস ভবভূতির কাব্যে বা নাট্যে সামন্ততন্ত্রের বাতাবরণে বিধৃত ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির প্রেক্ষাপট দুর্নিরীক্ষ্য নয়। কালিদাসের লোকোত্তর-প্রতিভার স্বর্ণদ্যুতির প্রোজ্জ্বল-উদ্ভাসের অন্তরালে অনেকাংশে আচ্ছাদিত হ'লেও ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির বিশিষ্ট রূপটি অনুপস্থিত নয় বলে অনেকে মনে করেছেন।[৪৪] মহাকবি ভবভূতি যশোবর্মরাজের সভাকবি ছিলেন। তাঁর বীরচরিত ও উত্তরচরিতে বৈদিকমার্গ প্রবর্তনের চিত্র অতি সুস্পষ্ট ভাবে চিত্রিত হয়েছে। লবকুশের জাতকর্ম, চূড়াকরণ, উপনয়ন ও বেদধ্যয়ন, রামচন্দ্রের দীক্ষা গ্রহণ, গোদানমঙ্গল ও বিবাহাদি সংস্কার; ভণ্ডায়ানাদির ব্রহ্মচর্য, অতিথি সৎকার ও তাঁর বিধি ব্যবস্থা পাঠ করলে পদে পদে যেন প্রাচীন বৈদিক সমাজের চিত্র মনে এসে পড়ে। ভবভূতি বেদ, উপনিষদ, ধর্মশাস্ত্র, রামায়ণ, পুরাণ প্রভৃতির মত উদ্ধৃত করে বৈদিক সমাজের আদর্শ প্রদর্শন করেছেন। বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক ধর্ম থেকে প্রতিনিবৃত্ত হয়ে জনসাধারণ যাতে বৈদিক আচার ব্যবহারের অনুসরণ করেন ভব-ভূতির দৃশ্য কাব্যগুলিতে সেই উদ্দেশ্য অভিব্যক্ত হয়েছে। ভবভূতির দৃশ্যকাব্য পাঠ করলে ও তাঁর আশ্রয়দাতা মহারাজ যশোবর্মার চরিত্র আলোচনা করলে সহজেই মনে হবে যে কণোজ রাজসভা থেকেই উত্তর-ভারতে বেদমার্গ প্রবর্তনের চেষ্টা চলছিল।[৪৫] কালিদাস-অনুরাগী

---

44 *Kalidasa appears to. us as the embodiment in his poems, as in his dramas, of Brahmanical ideal of the age of the Guptas.*

Keith : History of Sanskrit Literature. Page 98—100

৪৫ ঐতিহাসিক সমস্যা (কণোজ আয়ুধ রাজবংশ) নগেন্দ্র নাথ বসু। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা। সন ১৩১১ সাল ২য় সংখ্যা। ১১৬ পৃঃ।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যে প্রাচীন ভারতের যে ছবি এঁকেছেন তাতে নাকি কালিদাসের অনুসরণই পরিলক্ষিত হয়। এ ভারত কালিদাসের সমসাময়িক কালের ভারতবর্ষ বলেই অনেকে মনে করেন।[৪৬] অবশ্য এর দ্বারা রবীন্দ্রনাথের, ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির প্রতি সশ্রদ্ধ পক্ষপাত প্রদর্শনের চেয়ে প্রাচীন-ভারতের (বিশেষতঃ গুপ্তযুগের ক্লাসিক ভারতের) রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটের সনিষ্ঠ এবং যথাযথ বর্ণনা বা ভারত সংস্কৃতির বিশিষ্ট প্রকৃতিটির এক লিপি-চিত্র-অঙ্কন প্রয়াসই অধিকতর পরিস্ফুট। গুপ্তযুগের সুপরিণত এই আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সূচনা কিন্তু প্রাচীনকালেই। বেদের যুগ থেকে ক্রমাগত যজ্ঞের অনুষ্ঠানের ফলে ব্রাহ্মণের বিত্ত ও প্রতিপত্তি যেমন বৃদ্ধি পেয়েছিল,[৪৭] যজ্ঞের পৃষ্ঠপোষক রাজা বা প্রভাবশালী যজমানের সঙ্গেও তার একটা নিবিড় সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। বৈদিকসংস্কৃতির ঐতিহাসিক বা সমাজতাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে অনেকে মন্তব্য করেছেন সুপ্রাচীন কালেই জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও শ্রেণীগত বিভাজনের ফলে কৃষি-কার্যের দায়িত্ব বৈশ্য ও শূদ্রদের উপর ন্যস্ত হল, যাতে উদ্বৃত্ত সম্পদ সৃষ্টি হয় এবং তারই কল্যাণে সমাজের একটি ক্ষুদ্র অংশের মুষ্টিমেয় কিছু লোক উৎপাদন প্রক্রিয়ায় সক্রিয় অংশগ্রহণের দায়িত্ব থেকে

---

৪৬ দিকে দিকে দেখা যায় বিদর্ভ, বিরাট ;
অযোধ্যা, পাঞ্চাল, কাঞ্চী উদ্ধত ললাট।......

ব্রাহ্মণের তপোবন অদূরে তাহার,
নির্বাক গম্ভীর শান্ত সংযত উদার।

হেথা মত্ত স্ফীতস্ফূর্ত ক্ষত্রিয় গরিমা,
হোথা স্তব্ধ মহামৌন ব্রাহ্মণ মহিমা।

চৈতালি, প্রাচীন ভারত (১৩০৩ শ্রাবণ ১)

ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণের মহিমামণ্ডিত এই যে প্রাচীন ভারত, তার আদর্শান্বিত ভাবরূপ পরবর্তীকালে দেখা দিয়েছে 'নৈবেদ্য' কাব্যে (১৯০১)...... আর তার কর্মময় বাস্তব রূপ দেখা দেয় শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় (১৯০১)। —রবীন্দ্র দৃষ্টিতে কালিদাস / প্রবোধচন্দ্র সেন / রবীন্দ্রায়ণ (১ম)

৪৭ 'ইতিহাসের আলোকে বৈদিক সাহিত্য'—সুকুমারী ভট্টাচার্য পৃঃ ১৫১ ; পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, জানুয়ারী ১৯৯১।

অব্যাহতি পেল। পরশ্রমভোগী এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিল ব্রাহ্মণ আর রাজা। সমাজের উদ্বৃত্ত সম্পদ এবং অখণ্ড অবসর-অবকাশ ভোগ করে এরা জ্ঞানে, অভিজ্ঞতায়, যুক্তি, বিদ্যা ও সাধারণীকরণের ক্ষেত্রে অনেক উন্নত এবং শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠল। বেদ তথা সংস্কৃত ভাষার উপর অখণ্ড-অধিকার বলে ব্রাহ্মণের গতি হ'ল অপ্রতিহত। এরা বেদের তাৎপর্য ব্যাখ্যা, দর্শন-সাহিত্যের টীকা রচনা, সর্বোপরি স্মৃতি, ন্যায়ের অনুশাসনে বর্ণবিভাগ শ্রেণীবিভাগ সম্পন্ন করে এবং ক্রমশঃ (পরবর্তী কালে) সম্পত্তির উত্তরাধিকার পর্যন্ত নির্ণয় করে সমাজে বিজয়ীর প্রভুত্ব লাভ করেছিল। শাসন বা জাদু-পুরোহিত এবং জাদুকর সম্প্রদায়ের প্রত্যক্ষ উত্তরসূরির রূপেও তাদের গ্রহণ করা যেতে পারে।[৪৮] ব্রাহ্মণ যেমন স্মৃতির ব্যাখ্যা দিয়ে সমাজ শাসনের জন্য রাজাকে অপরিহার্য রূপে প্রতিষ্ঠা করলেন এবং 'দণ্ডনীতি'র অনুশাসনে তার ক্ষমতাকে অপ্রতিহত করলেন, রাজাও তেমনি ব্রহ্মোত্তর-দেবোত্তর প্রদান করে ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতি কে প্রতিষ্ঠা করলেন। ক্রমশঃ ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির এই স্মার্ত-অনুশাসন এমন ভাবে ভারতীয় সংস্কৃতিতে মিশে গেল যে, বৌদ্ধ-পাল রাজারাও ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করতেন প্রচুর পরিমাণে। পরম সুগত প্রথম মহীপাল বিষুব সংক্রান্তির শুভ তিথিতে গঙ্গাস্নান করে এক ভট্ট ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করেছিলেন। তৃতীয় বিগ্রহপালও আমগাছি লিপিদ্বারা এক ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করেছিলেন। আমগাছি লিপিতেও দেখা যায় তৃতীয় বিগ্রহপালকে 'চাতুর্বর্ণ্য-সমাশ্রয়' বর্ণাশ্রমের আশ্রয়স্থল বলে বর্ণনা করা হয়েছে।[৪৯] বস্তুত পালযুগের লিপিমালা পাঠ করলেই এ তথ্য সুস্পষ্ট হয়ে উঠে, এই সব লিপির রচনা আগাগোড়া ব্রাহ্মণ্য পুরাণ, রামায়ণ মহাভারতের গল্প, ভাবকল্পনা, এবং উপমা অলঙ্কার দ্বারা আচ্ছন্ন—এদের ভাবাকাশ একান্তই ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও সংস্কারের আকাশ।[৫০] বৌদ্ধ বা জৈন ধর্মের অভ্যুত্থানের ফলে সাময়িকভাবে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম-সংস্কৃতি ক্ষীয়মান এবং ম্রিয়মান হলেও

---

৪৮ এরা প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণে সহায়তা থেকে যজ্ঞানুষ্ঠানের ব্যাখ্যা সবই করত— "ইতিহাসের আলোকে বৈদিক সাহিত্য"।

৪৯ বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ : নীহাররঞ্জন রায় : বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ

৫০ ঐ

স্বল্পকাল: পরেই আবার তার পুনরভ্যুত্থান ঘটেছে। বেদের প্রতিবাদী হলেও এসব (বৌদ্ধাদি) ধর্ম আর্য ব্রাহ্মণ্য সমাজের কাঠামোকে অতিক্রম করে নূতন সমাজ ব্যবস্থার প্রবর্তন করতে পারে নাই। ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের বর্ণাশ্রম বিভক্ত ক্রমোন্নত সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেই নিহিত ছিল ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির মূল বুনিয়াদ। ব্রাহ্মণ-পুরোহিত ও ক্ষত্রিয় রাজা ছিলেন সমাজের শীর্ষে। শূদ্র বা দাসশ্রেণী সব নীচে। ভারতবর্ষে ইউরোপের মত দাস প্রথা কোন দিন প্রচলিত ছিল না সত্য; কিন্তু স্মৃতির শাসনে নির্দিষ্ট দাসত্বের বিধান ছিল অমোঘ। এরা সমাজের চিরন্তন সেবক অন্ত্যজ। বর্ণাশ্রমের এই সামাজিক আদর্শ বিস্তারের কথাই এক হিসাবে ভারতবর্ষে আর্যসংস্কার ও সংস্কৃতির বিস্তারের ইতিহাস, কারণ ঐ আদর্শের ভিতরেই ঐতিহাসিক যুগের ভারতবর্ষের সংস্কার ও সংস্কৃতির সকল অর্থ নিহিত।[৫১] কালক্রমে আর্য-ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির বৈদিকরূপটির পৌরাণিক বিবর্তন ঘটেছে অসংখ্য মানুষের সংস্পর্শে এসে। সুসমৃদ্ধ সংস্কৃত ভাষা তার অসামান্য সংশ্লেষণী ক্ষমতায় আর্য-পূর্ব বা অনার্য নানা লোককথা লোককাহিনীকে আপন বলয়ভুক্ত করে নবরূপ দান করেছে। জন-সম্পর্কের ফলে অগণিত লোকদেবতাও আর্য-ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতি-জগতে প্রবেশ লাভ করেছেন। এইসব লোকদেবতা ধর্মীয়-সংশ্লেষণ এবং (সংস্কৃত) শাস্ত্রীয় গোত্রান্তরের মাধ্যমে কাল্ট-দেবতায় রূপান্তরিত হয়ে আর্য-ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে এক বিচিত্র-বিশাল প্রতিমা-জগৎ নির্মাণ করে তার পৌরাণিক বিবর্তনকে ত্বরান্বিত করেছেন।[৫২] পুরাণে শুধু মূর্তিপূজাই নয়, মন্দির-প্রতিষ্ঠাও সমধিক পুণ্য কর্ম বলে

---

৫১ বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ : নীহাররঞ্জন রায় : বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ।

৫২ পৌত্তলিকতার উদ্ভব পুরাণে। তার পূর্বে প্রতিমা পূজা ছিল না। অগ্নি পুরাণে মাটি, কাঠ, লোহা, রত্ন, প্রস্তর, গন্ধ ও পুষ্প নির্মিত সাত প্রকারের প্রতিমার কথা বলা হইয়াছে। কোন দেবতার প্রতিমার কি রূপ হইবে তাহাও বলা হইয়াছে।
সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা। ডাঃ বিমানচন্দ্র ভট্টাচার্য।
বিদ্যোদয় লাইব্রেরী (১৯৬৪) পৃষ্ঠা ৭৬।

অভিহিত হয়েছে।[৫৩] পৌরাণিক যুগেই হিন্দু-ধর্মের বিকাশ। গুপ্তযুগে, মন্দির-মূর্তির বিপুল সমারোহ ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৌরাণিক রূপান্তরেরই প্রভাবজাত। ইটের মন্দির আর তার গায়ে টেরাকোটার সমৃদ্ধ অলঙ্করণ গুপ্তযুগের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। এ যুগের প্রতিভাবান শিল্পীরা টেরাকোটা-অলঙ্কৃত শত শত ইটের মন্দির নির্মাণ করেছেন এসব মন্দিরের ধর্মীয় বা ধর্মীয়-শাসন-মুক্ত টেরাকোটা-চিত্রাবলী কলা-চাতুর্যের এক বিস্ময়কর নিদর্শন।[৫৪] টেরাকোটা-অলঙ্কৃত মন্দির নির্মাণ এ যুগে শিল্পসৃষ্টির এক জনপ্রিয় মাধ্যম হয়ে উঠেছিল।[৫৫] বলা বাহুল্য, এই সব মন্দির আর মন্দির-টেরাকোটার বিষয় বস্তুতে ব্রাহ্মণ্যধর্মের স্মার্ত পৌরাণিক রূপটিই সর্বাধিক বিকশিত হয়েছে।

---

৫৩ অগ্নিপুরাণে বলা হইয়াছে যে বিত্ত দান, ভোগ, কীর্ত্তন বা ধর্মাচরণের জন্য ব্যয়িত হয় না তাহার অধিকারী হইলে লাভ কি? বিষ্ণু প্রভৃতির মন্দির নির্মাণে ব্যয়িত হইলেই অর্থের শ্রেষ্ঠ ব্যবহার করা হয়। 'দেব-মন্দির নির্মাণ করিব' এইরূপ চিন্তা করিলেও সকল পাপ দূরীভূত হয় নির্মাণ করিলে তো কথাই নাই।

দেবাগারং করোমীতি মনসা যস্তু চিন্তয়েৎ।
তস্য কায়গতং পাপং তদহ্না হি প্রণশ্যতি ।। (অগ্নিপুরাণ)
—সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা। পৃঃ ৭২

54 *The resourceful builders in this period (Gupta) evolved the technique of brick shrines conceived from top to bottom in terms of moulded courses and terracotta plaques loaded with religious and secular scenes as well as floral and geometrical designs of infinite variety. From Shorkot in the Punjab to Mirpur Khas in Sindh, and from Bhitargaon in Kanpur District to Sirpur in Raipur District there are hundreds of Gupta brick temples of which an account as yet remains an unwritten chapter in the glorious records of the Golden Age.*

—LALIT KALA. No. 9, APRIL 1961, Page 20

55 *Terracottas and moulded bricks formed a very popular media of*

গবেষকরা মনে করেন বেদের যুগে কোন মন্দির ছিল না। পৌরাণিক অনুশাসনের প্রেরণাতেই পুণ্য-লোভাতুর ব্যক্তিদের মন্দির-নির্মাণ-প্রয়াস ক্রমশঃ ব্যাপক রূপ ধারণ করেছিল, এমন অনুমান করা অতএব অসঙ্গত নয়।[৫৬] আর্য-ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির পৌরাণিক-বিবর্তন ঠিক কোন সময়ে সূচিত হয়েছিল, কখন পৌরাণিক যুগের সূচনা, তা সুনির্দিষ্ট ভাবে চিহ্নিত করা সম্ভব না হ'লেও শাস্ত্রীয়-মূর্তি (পূজা মূর্তি) জগতের বিকাশ-বিবর্তনকে অনুসরণ করে এর কিছুটা হদিশ পাওয়া যেতে পারে। এ ব্যাপারে টেরাকোটা-মূর্তি-জগতটি কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। টেরাকোটা-মৃত্তিকার জগতে এমনকিছু শাস্ত্রীয় কাল্টমূর্তির আবিষ্কার ঘটেছে যেগুলি তাদের প্রস্তর-প্রতিরূপের চেয়ে প্রাচীনতর। মৌর্যযুগের চতুরাশ্ব-বাহিত-রথারূঢ়-সূর্যমূর্তির কথা আগেই বলা হয়েছে। শুধু সূর্যমূর্তি কেন, মথুরার সন্নিকট সঙ্খে প্রাপ্ত টেরাকোটা-ফলকে উৎকীর্ণ মহিষমর্দিনী মূর্তিটিকেও দেবীর প্রাচীনতম মূর্তি-নিদর্শন বলে মনে করা হয়েছে। মূর্তিটি খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকের বলে অনুমান করা হয়েছে। এই মূর্তির সঠিক সনাক্ত-করণের ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা থাকলেও সমসাময়িক কালের অর্থাৎ কুষাণ যুগের বেশকিছু মহিষমর্দিনী মূর্তি সঙ্খ থেকে পাওয়া গেছে।[৫৭] যাইহোক, মৌর্যযুগ থেকেই টেরাকোটা-ভাস্কর্যের জগতে উল্লেখযোগ্য

---

aesthetic expression during the Gupta and post-Gupta times.

A Survey Of Gupta Art and Some Sculptures From Nachna Kuthara And Khoh—V. S. Agrawala

LALIT KALA NO. 9 APRIL 1961 P. 19

৫৬ বৈদিক যুগে ধর্মকে উপলক্ষ করিয়া সাধারণের কোন মিলন স্থান ছিলনা। কোনও মন্দিরও ছিলনা। তুলনীয়ঃ

"There is no mention of any temple, nor any reference to a public place of worship, and it is clear that the worship was entirely domestic." —(Wilson : Rigveda : Vol. I : Page XXIII ff)

—সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা। পৃঃ ৭২

৫৭ প্রকৃত পক্ষে প্রাচীনতম মহিষমর্দিনীর মূর্তি হিসাবে যে ভাস্কর্যটিকে দাবী করা যেতে পারে সেটির কাল খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগের আগে

পরিবর্তন লক্ষ্য করেছেন গবেষকরা। এই পরিবর্তন মূর্তিশিল্পের ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ-জৈন ধর্মের শাস্ত্রীয় মূর্তি শিল্পের (কাল্ট বা পূজা মূর্তি) বিকাশের যথার্থ ইতিহাস তমসাচ্ছন্ন। সিন্ধু-সভ্যতার যুগ থেকে মৌর্যযুগ (সিন্ধু সভ্যতার উত্তরকাল বা প্রাক্ মৌর্যযুগসহ) পর্যন্ত সময়ে গঠন ভঙ্গিমার বহিরঙ্গ বিচারে সাধারণ ভাবে ধর্মীয় বলে চিহ্নিত করা হলেও অন্তরঙ্গ বিচারে শাস্ত্রীয় প্রতিমা-লক্ষণ অনুযায়ী নির্মিত সুনির্দিষ্ট কোন ধর্মীয় দেবতা মূর্তির সন্ধান পাওয়া যায় নাই। মৌর্যযুগ থেকে আদিম অজ্ঞাত পরিচয়-ধর্মীয় (টেরাকোটা) মূর্তিগুলির পাশাপাশি শাস্ত্রীয় (কাল্ট) দেবতার মূর্তি-গুলির বিকাশ ঘটতে থাকে। এই সময় থেকেই (মৌর্যযুগ ও তার উত্তরকালে) আদিম এবং (লোকায়ত) অজ্ঞাত-পরিচয়-ধর্মীয় মূর্তি-গুলির সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পেতে থাকে এবং সুনির্দিষ্ট শাস্ত্রীয় আদর্শে নির্মিত দেবপ্রতিমার সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।[৫৮] গুপ্তযুগ থেকে

নয়। পোড়ামাটির ফলকের উপর উৎকীর্ণ এই অর্ধভগ্ন মূর্তিটি পাওয়া গেছে মথুরার নিকটবর্ত্তী সঙ্খে উৎখননের সময়। যে স্তরে (২৬নং) মূর্তিটি পাওয়া গেছে তার কাল রাজা সূর্যমিত্রের সমসাময়িক — অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর বলে অনুমিত। অবশ্য এই অর্ধভগ্ন পোড়ামাটির ভাস্কর্যে দেবী যে পশুটির গলার কাছে হাত রেখেছেন সেটিকে নিশ্চিত রূপে মহিষ বলে চিহ্নিত করা যায় না। যে মূর্তিতে এ ধরণের সমস্যা নেই মহিষ-মর্দিনীর সেইসব প্রতিরূপের মধ্যে কুষাণযুগের কিছু মূর্তিও আছে। এর মধ্যে কতকগুলি পাওয়া গেছে সঙ্খের কয়েকটি কুষাণকালীন স্তরে।

মহিষাসুরমর্দিনীর সন্ধানে : ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
দেশ : শারদীয়া ১৩৯০

58 *The Origin of Brahmanical, Buddhist and Jaina images is wrapped up in great obscurity; it is not possible to trace how a particular god has come into existence and the factors leading to its morphology. In the Indus Valley and post-Indas Valley, pre-Maurya ages we find certain images which are considered to be religious from the consideration of the outward characteristics; but from the Maurya age onwards we find the great change which has occurred*

মূর্তি-শিল্পের জগতে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। এ সময় থেকে ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ জৈন ধর্মের সুনির্দিষ্ট শাস্ত্রীয় আদর্শে নির্মিত মূর্তি-নিদর্শনেরই বহুল প্রচলন। ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের নানা শাখা-প্রশাখাকে কেন্দ্র করে এসময় বহু তত্ত্ব-ভিত্তিক মূর্তি-নিদর্শনও বিকাশ লাভ করে। শুধু ধর্মীয় আদর্শ বা তত্ত্বই নয় এ যুগের শিল্প সাহিত্যে ভুক্তি-মুক্তির অভিনব ও বিশিষ্ট নান্দনিক-আদর্শটিও সুস্পষ্ট ভাবে আত্মপ্রকাশ করে। মন্দিরের ভিত্তি-অলঙ্করণে অজস্র চিত্র ভাস্কর্যের সমারোহ, নরনারীর মূর্তিগুলির রূপ-লাবণ্যময় কান্তি নির্মাণের ক্ষেত্রে সৌন্দর্য পিপাসার অকুণ্ঠ অভিব্যক্তি, এযুগের শিল্পকলাকে যেমন এক বিশিষ্টমানে উন্নীত করেছে -- সাহিত্যের উজ্জ্বল-রস পরিষিক্ত প্রেক্ষাপট তেমনি অত্যাশ্চর্য মহিমায় আপনাকে প্রকাশ করেছে। এমনকি এযুগে ভাব-ভক্তি তথা অধ্যাত্মচেতনাও একটি বিশিষ্ট রস-পরিভাষায় ব্যক্ত হয়েছে। নৃত্য-নাট্য-সংগীতাদি চৌষট্টিকলা মন্থন করে এ যুগে যে বিশিষ্ট নান্দনিক চেতনাকে রূপদানের প্রচেষ্টা হয়েছে — তা বোধ হয় পৃথিবীর ইতিহাসেও অভিনব। সৌন্দর্য-সম্ভোগের এক বিপুল আয়োজনের মাঝ দিয়ে অধ্যাত্মমার্গে প্রবেশাকাঙ্খার এমন সুদুর্লভ চিন্তা-চেতনাও যথার্থই বিরল। ধর্মের সঙ্গে শিল্পের এমন শুভ-পরিণয়ও সচরাচর দেখা যায় না। 'নৃত্যতাং গায়তাং চৈব নানাবাদ্যং প্রকুর্বতাম্' এই ধর্মীয় আপ্তবাক্যটি শুধু অধ্যাত্মদর্শনের ক্ষেত্রেই বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেনি, মন্দির অলঙ্করণের ক্ষেত্রে রেখা বিন্যাসে ছন্দোবদ্ধ নৃত্য-গীতিময় অজস্র রূপপ্রসবিনী ষ্টাইলটিকে অবলম্বন করে মন্দির-শিল্পের জগতেও যুগান্তর এনেছে বলে মনে হয়।

---

in the sphere of iconographical art of India. In this age besides certain figures which may be considered as religious from the analysis of the outward expression we find certain images made according to the standered of Indian iconographical texts. From this age onwards this kind of images increases while figures considered to be religious from the analysis of the outward expression decreases." —ORIGIN AND EVOLUTION OF INDIAN CLAY SCULPTURE C. C. DAS GUPTA C. U. (P 256)

মন্দিরের ভিত্তি-চিত্রে (কি প্রস্তর, কি টেরাকোটা সর্বত্রই) 'নৃত্য এবং গীত-বাদ্যের' অসংখ্য 'মোটিফে'র সমাবেশে একই তত্ত্ব যেন প্রচার করা হয়েছে। সাধনক্ষেত্রে সম্ভোগময় কলামার্গেরই এ যেন একটি ইঙ্গিত। রূপ সম্ভোগের এই দুর্নিবার তৃষ্ণা জৈন কিংবা বৌদ্ধ-গুহা-চিত্র গুলিতেও সমানভাবে দৃশ্যমান। বহু বিচিত্র এই রূপবিকাশের অন্তরালে প্রগাঢ়-প্রশান্তিময় এক বোধিচিত্তের উদ্বোধন প্রয়াসের মধ্যেই গুপ্তযুগের শিল্প-সাহিত্যে বিশেষভাবে অনুসৃত নান্দনিক আদর্শ তথা ধর্মাদর্শ 'ভুক্তি-মুক্তি-প্রদা'রই যেন অকপট অভিব্যক্তি। সারনাথ-বুদ্ধ কিংবা উচহর অঞ্চলে (ভুমারার শিবমন্দিরের ৬ মাইল দূরবর্তী প্রাচীন নাগোদ-রাজ্যের সন্নিকট) প্রাপ্ত শিব-মুখলিঙ্গস্থ শিবাননে কালিদাস বর্ণিত 'সমাধির' ব্যঞ্জনা সুস্পষ্ট।[৫৯] মূর্তিদেহের রূপলাবণ্যকে অতিক্রম করে তার মুখমণ্ডলে উদ্ভাসিত 'সমাধির' এই অভিব্যক্তি শুধু গুপ্ত-ভাস্কর্য-শিল্পকেই অভিনব করে তুলেনি, ভারতের মূর্তি ভাস্কর্যেরও নবজন্ম দিয়েছে। অজস্র-অলঙ্করণ-ভূষিত মন্দিরের রূপময় ভিত্তি সজ্জার অন্তরালে এক ভাবগম্ভীর গর্ভগৃহে ধ্যানগম্ভীর দেবমূর্তির মধ্যেও সেই একই অধ্যাত্মদর্শন বা নান্দনিক-আদর্শ পরিস্ফুট হয়েছে। কিন্তু বহু-বিচিত্র এই অলঙ্করণও অর্থহীন রূপসজ্জা মাত্র নয়; এই অসামান্য রূপনির্মাণের সঙ্গেও একটি অধ্যাত্ম-ব্যঞ্জনা প্রায় সর্বত্রই যুক্ত হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ ব্যঞ্জনা ভক্তির। শুধু ব্রাহ্মণ্য নয়, বৌদ্ধমূর্তির জগতেও করজোড়ে দণ্ডায়মান রাজা বা শ্রেষ্ঠী, কিংবা অবনতমস্তকে ভূমিষ্ঠ নরনারীর ভক্তি-নিবেদনের চিত্র বিরল নয়। বহু পরবর্তী কালে নির্মিত, বিষ্ণুপুরের মন্দির-গাত্রের অলঙ্করণের সঙ্গেও

---

59 *"The truth of the above is fully exemplified in the Gupta Siva-linga from Uchahara area. Siva's face shows the perfect expression of 'Samadhi' as described by Kalidasa in the Kumarasambhava". —A Survey of Gupta Art And Some Sculptures From Nachna Kuthara And Khoh.*

by V.S. Agrawala. LALIT KALA April 1961 Page 22.

The Siva-linga from Uchahara area : Gupta : Late 4th or early 5th century A. D. Ht. of the head 10" collection of Smt. Pupul Jayakar : New Delhi.

নানাধরণের মোটিফের মাধ্যমে ভক্তি নিবেদন কিংবা শরণাগতির বিশিষ্ট ব্যঞ্জনাটি যুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। রামায়ণের কাহিনীর বিভিন্ন দৃশ্যে কৃতাঞ্জলিপুটে-দণ্ডায়মান-বানর-সৈন্য, জোড়হস্ত ভক্ত এবং করজোড়ে ভক্তি-নিবেদনরত মৎস্যনারী বা সর্পনারীর মোটিফগুলি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। রাধাকৃষ্ণের শত শত লীলাচিত্রে প্রেমভক্তি তথা শরণাগতির ব্যঞ্জনাটি বিশিষ্ট ভঙ্গিমা বা মুদ্রার মাধ্যমে সুস্পষ্ট। অলংকরণের-অরণ্যে বিশিষ্ট 'অধ্যাত্ম-দর্শনটি' কুত্রাপি হারিয়ে যায় নাই। জোড়বাংলা মন্দিরের অসংখ্য রূপময় নৃত্য-চিত্রেও বন্দনা আরাধনার মুদ্রাটিই প্রাধান্য লাভ করেছে। প্রত্যক্ষভাবে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম-সংস্কৃতির প্রেরণায় নির্মিত হলেও বিষ্ণুপুরের টেরাকোটা মন্দিরগুলিতেও 'ভুক্তি-মুক্তিপ্রদা' অধ্যাত্মদর্শনটিই রূপান্তরে পরিস্ফুট হয়েছে। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম-সংস্কৃতি, প্রাচীন ক্লাসিক ব্রাহ্মণ্য বা হিন্দু সংস্কৃতিরই এক বিশিষ্ট বিবর্তন। উত্তরাধিকার সূত্রেই সে ভাগবদ্ধর্মের 'ভুক্তি-মুক্তি'র নান্দনিক এবং সাংস্কৃতিক আদর্শটি লাভ করেছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম আর দর্শনের রূপকার শ্রীরূপ গোস্বামী উজ্জ্বল রসের উপর ভিত্তি করে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সাধন-প্রণালীতে যে অভিনব আবেদন সৃষ্টি করেন তার প্রধান অবলম্বন ছিল প্রাচীন সাহিত্য এবং অলংকার শাস্ত্র। "এই উজ্জ্বল রসের পরিকল্পনার মধ্যে প্রতীকরূপে কাজ করেছিল সম্ভোগশৃঙ্গারের ভিত্তিস্বরূপ নায়ক-নায়িকা মিথুনের অন্তরঙ্গ রতিলীলা, যার নিদর্শন শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যে, বিশেষ করে ঐ মহাগ্রন্থের দশম স্কন্ধে আমরা প্রচুর পরিমাণে লক্ষ্য করে থাকি। এই ভাবে ভাগবত-সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে চিরায়ত প্রাচীন আলঙ্কারিকসম্প্রদায়সম্মত রস-সিদ্ধান্তকে ভগবদ্‌রতিরূপ স্থায়িভাবকে কেন্দ্র করে উজ্জ্বল রসকে সর্বোচ্চ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করা এবং ভগবৎ-সাধনার পরমাকাঙ্খিত মার্গরূপে সুদৃঢ় দার্শনিক সিদ্ধান্তের সাহায্যে মহিমান্বিত গৌরবে উদ্ভাসিত করে তোলা, যে কত বড় মনীষা ও অধ্যাত্মদৃষ্টির পরিচয় বহন করে তা চিন্তা করলেও বিস্ময়াবিষ্ট হতে হয়।[৬০]

---

৬০ সংস্কৃত সাহিত্যে ভক্তি ও জাতীয় সংহতি — বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য : আলেখ্য পত্রিকা : ২০ বর্ষ ৩য় সংখ্যা (পৃঃ ২৬৩) : সম্পাদক শ্রীক্ষিতীন্দ্র চন্দ্র ঘোষাল। ৫০, সন্তোষপুর এভিনিউ। কলিকাতা-৭৫

কালিদাসের সাহিত্যে তথা গুপ্তযুগের শিল্পে 'ভুক্তি-মুক্তি'র যে আদর্শ বা শৃঙ্গাররসে যে ভক্তিশ্রীর আভাস স্ফুরিত হয়েছিল, জয়দেবের গীতগোবিন্দের পথ ধরে তা রূপ গোস্বামীতে এসে পেঁছেচে।[৬১] শ্রীরূপের নির্দিষ্ট গৌড়ীয়বৈষ্ণব-দর্শন ও সাহিত্যের আদর্শে রচিত বৈষ্ণব কবিদের রূপানুরাগের পদগুলিতে তারই পরিপূর্ণ অভিব্যক্তি। 'রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিল' কিংবা 'রূপ লাগি আঁখি ঝুরে' প্রভৃতি পদগুলিতে রূপানুরাগের তীব্র-আকুতির পাশাপাশি এই বিচিত্র-সাধন-পথে ইষ্টলাভের অভিনব ইঙ্গিত ও সুস্পষ্ট—'মাধব মাধব সোঙরিতে সুন্দরী ভেলি মাধাই'। রূপ থেকে অরূপে বা অপরূপে যাওয়ার এই প্রধান পথটিকে 'ভুক্তি-মুক্তি'র প্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত পথেরই উত্তরাধিকার বলে মনে করা বোধ হয় অসঙ্গত নয়। বিষ্ণুপুরের টেরাকোটায় (শ্যামরায় মন্দিরে বিশেষ করে) রাসলীলার চিত্রগুলির রূপনির্মাণে কৃষ্ণগোপী কিংবা রাধাকৃষ্ণের চন্দ্রাননে আর ভাবভঙ্গীতে রূপানুরাগের পাশাপাশি আত্মনিবেদনের ইঙ্গিতটি সুস্পষ্ট করে, শৃঙ্গার রসের সঙ্গে ভক্তিশ্রী-সংযোজনের কালিদাস-জয়দেব অনুসৃত সুপ্রাচীন ধারাটিকেই পরিস্ফুট করা হয়েছে বলে মনে হয়। শুধু বৈষ্ণবপদ বা মন্দির টেরাকোটাতেই নয়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বিষ্ণুপুর শাখায় সংরক্ষিত বিপুল (সাত হাজারের বেশী) পুঁথির সংগ্রহ পর্যালোচনা করলেও গৌড়ীয় বৈষ্ণব সংস্কৃতির ধাতুপ্রকৃতি গঠনে কালিদাস-জয়দেব তথা প্রাচীন-মধ্যযুগীয় কাব্য ও ভক্তিশাস্ত্রের ভূমিকাটি সুস্পষ্ট হয়ে হয়ে উঠে। জয়দেবের "গীতগোবিন্দম্" পুঁথির (টীকা ও অনুবাদ সহ) প্রতিলিপি যেমন প্রচুর সংখ্যায় রয়েছে, কালিদাস প্রভৃতি কবিদের প্রায় সমস্ত কাব্য নাটকের প্রতিলিপিও তেমনি রয়েছে প্রচুর। বিষ্ণুপুর অঞ্চল থেকে সংগৃহীত পুঁথির এই বিপুল সংগ্রহটিতে গৌড়ীয়বৈষ্ণবকেন্দ্র বিষ্ণুপুরের সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটটিই সমুজ্জ্বল।

---

৬১ "প্রাচীন কবি কালিদাসের শৃঙ্গাররসে ভক্তিশ্রীর আভাস, উত্তরসাধক জয়দেবে তার উজ্জ্বল্য, তার অন্তর্বল ও অধ্যাত্ম সুষমার পূর্ণ বিকাশ। শ্রীচৈতন্যের মনোহভীষ্ট-স্থাপক শ্রীরূপ এই উন্নত উজ্জ্বল ভক্তিরসের ভাষ্যকার এবং আলঙ্কারিক রূপকার।" —শ্রীরাধাতত্ত্ব ও শ্রীচৈতন্য-সংস্কৃতি পৃঃ ৩৮ ঃ জনার্দন চক্রবর্তী ঃ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় (১৯৭২)

এই সাংস্কৃতিক পটভূমিকাটি যে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সংস্কৃতির বেনামে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিরই পটভূমি তা আগেই বলা হয়েছে। বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদের পুঁথি সংগ্রহ থেকেও সে সত্য সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। কালিদাস-জয়দেব ছাড়াও ভট্টি, ভবভূতি প্রভৃতি কবিদের কাব্য, নানা অলংকার শাস্ত্র ও ভারতের ভক্তি-শাস্ত্রের মূল্যবান গ্রন্থগুলির সবই এখানে বর্তমান। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের অন্যতম আকরগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রচুর প্রতিলিপির সঙ্গে বিশেষভাবে 'দশমস্কন্ধে'র একাধিক প্রতিলিপিও এই সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত। এককথায় শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে উল্লিখিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনের প্রায় সমস্ত শাস্ত্র এবং সাহিত্যগত উপাদান এই সংগ্রহে রয়েছে। এই পুঁথি-সংগ্রহ পর্যালোচনার মাধ্যমে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্মের ধাতুপ্রকৃতিতে প্রাচীন ভাগবন্ধর্মের প্রভাব এবং উজ্জ্বলরসের সাধনায় সম্ভোগ শৃঙ্গারের প্রতীক নরনারীর অন্তরঙ্গ রতিলীলার উৎসটিও সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। কিন্তু কালিদাস-জয়দেবের শৃঙ্গার রসে ভক্তিশ্রী, কিংবা তারই অনুসরণে পরিকল্পিত শ্রীরূপ গোস্বামীর 'উজ্জ্বলরসের' সাধনার উৎসমূলে যে মিথুন-চেতনাটির সন্ধান পাওয়া যায় তা অত্যন্ত আদিম; মনে হয় এটি মানব সভ্যতার আদিপর্বে বিকশিত এক আদি-অকৃত্রিম জৈব চেতনা। পৃথিবীর প্রায় অধিকাংশ স্থানেই আদিম মিথুন-চেতনার যে বিকাশ ঘটেছিল তা টেরাকোটা সহ নানা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে বোঝা যায়। কিন্তু এই আদি অকৃত্রিম জৈব মিথুনচেতনা তথা প্রজনন-চেতনাকে, ভারতীয় ধর্ম দর্শনে আধ্যাত্মিক মাত্রা যোগ করে যেভাবে ধর্মীয় করে তোলা হয়েছে তা সত্যই অভিনব। এই মিথুন-চেতনার উপর 'ভুক্তিমুক্তি'র একটি ধর্মীয় আদর্শের আরোপ করে যে বিরাট তান্ত্রিক পরিমণ্ডল গঠিত হয়েছে তা শুধু একটি বিচিত্র ধর্মীয় বিবর্তনই নয়, এক বিশিষ্ট রূপ-রসময় নান্দনিক আবিষ্কারও বটে। ধর্মক্ষেত্রে দেহকে উচ্চস্থান দিয়ে ভারতীয় ধর্ম-দর্শন এক দ্বিধা বা বাধাকে অতিক্রম করেছে। ফলে রূপ রসের এক বিরাট মানবিক জগৎ তার সামনে খুলে গেছে ভুক্তি-মুক্তির আদর্শে আদিম-মিথুন-চেতনার অবলম্বনে যে তন্ত্রজগৎ সৃষ্টি হয়েছে তাতে শুধু হিন্দু নয়, বৌদ্ধ, জৈন সব ধর্মই সামিল হয়েছে। আদিম মিথুনচেতনার অধ্যাত্ম-দর্শন প্রসূত এই তন্ত্রজগৎ থেকেই উৎসারিত

হয়েছে নানা ধর্মীয় শাখা প্রশাখা। লীলাবাদ, ভক্তিবাদ, দ্বৈতবাদ, দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ সবই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এই মিথুনতত্ত্বের থেকেই বিকশিত হয়েছে। প্রকৃতি-পুরুষের অদ্বয়-তত্ত্বও এই একই উৎস থেকে উদ্ভূত হয়ে একটি বিশিষ্ট দার্শনিক রূপান্তর লাভ করেছে। এক অদ্বয় সত্তা থেকেই দ্বিতীয়ের উদ্ভব। আবার দু'য়ের নিঃশেষ মিলনে অদ্বয়ের উপলব্ধি। তান্ত্রিক ভোগবাদও এই একই তত্ত্বের ভিন্নতর ব্যঞ্জনা। দেহ-ভোগকে কেন্দ্র করে দেহাতীতে, রূপকে অবলম্বন করে অরূপে যাত্রার প্রয়াসেই বিশিষ্ট ভোগবাদ বা 'ভুক্তি-মুক্তি'র সাধন-পন্থার চরিতার্থতা। দেহবাদী বা ভোগবাদী তান্ত্রিক-মানসিকতার কবি ও সমালোচক বলে অভিহিত, মোহিতলাল মজুমদার 'ভুক্তি মুক্তি'র আদর্শটির সুন্দর ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেছেন — "প্রকৃতি পুরুষের অভেদ-তত্ত্বের উপরেই তার (ভোগ-বাদের) প্রতিষ্ঠা। এ কেবল দেহের ভোগই নয়, সে ভোগ প্রজ্ঞাবান আত্মপ্রতিষ্ঠ পুরুষের ভোগ. তা যোগ-যুক্ত ভোগ। তাতে দেহ আর আত্মার সামঞ্জস্য সাধন হয়। তাই তা একাধারে ভুক্তি ও মুক্তি।[৬২] ভোগমার্গের মাধ্যমে, যোগমার্গে উত্তীর্ণ হওয়ার দার্শনিক-মাত্রা যুক্ত হওয়ায় মথুরা-অমরাবতীর-শিল্পরীতির যথার্থ উত্তরসূরী গুপ্তভাস্কর্য উক্ত রীতিগুলির তথা পূর্ববর্তী ক্লাসিক পর্যায়ের দেহ-সর্বস্বতাকে অতিক্রম করে ভাস্কর্য শিল্পে এক রূপান্তর ঘটিয়েছে।[৬৩] সম্ভোগময় লীলা বিলাসের পথে মুক্তি-প্রয়াসের মূলীভূত মিথুন-চেতনা মাটি-

---

৬২ আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সমালোচনায় মোহিতলাল — দুর্গাশংকর মুখোপাধ্যায়। আলেখ্য পত্রিকা (১৩শ বর্ষ। ২য় সংখ্যা। কার্তিক পৌষ। পৃঃ ১৪৭) থেকে পুনরুদ্ধৃত।

63 *"Gupta Sculpture is the logical outcome of the classical sculpture of Mathura and Amaravati. — — — — The classical art of the previous phase was passionately addicted to this mundane world and it is the physical existence, in the literal sense of the term, that attracted the attention and engrossed the vision of the artists. The lush sensuality of Mathura and the careless abandon of Amaravati undergo a distinct transformation in the*

মানুষের আদি স্তর থেকে উদ্ভূত হওয়ায় তার ব্যঞ্জনাবহ 'লীলাবাদ', ধর্মদর্শনের ক্ষেত্রে এক অপ্রতিরোধ্য শক্তি অর্জন করেছে। অনেকে মনে করেন, পরম অদ্বৈতবাদী শংকরের মধ্যেও লীলাবাদ ও ভক্তিবাদের প্রবণতা দুর্নিরীক্ষ্য নয়। যাই হোক, টেরাকোটা-শিল্প জগতেও অতি প্রাচীনকালেই মিথুন-চেতনার প্রতিফলন লক্ষ্য করা গেছে। শুঙ্গ যুগের একাধিক নরনারীর মিথুন-চিত্র-যুক্ত টেরাকোটা টালির আলোচনা করতে গিয়ে বৃহদারণ্যক-উপনিষদ অনুকরণ করে চিত্রগুলির উপর অনুরূপ ধর্মীয় ব্যাখ্যার আরোপ করা হয়েছে।[৬৪]

প্রজাপতি (সৃষ্টিকর্তা) একাকী নিঃসঙ্গ অবস্থায় সুখী ছিলেন না। তিনি নিজেকে দ্বিধা বিভক্ত করে দুই আপাত ভিন্ন সত্তায় পরিণত হন। নর এবং নারী। সৃষ্টিকর্তা নিজ দেহসম্ভূত দ্বিতীয় সত্তা বা নারী-সত্তাকে নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে যৌনসঙ্গমে লিপ্ত হন। দু'য়ের এই মিলনে সৃষ্টি। নর-নারী দুই সত্তার আলিঙ্গনবদ্ধ রূপটিই একদিকে আপাতভেদ অন্যদিকে অভেদ-সত্তারই ব্যঞ্জনা বহন করছে। এক এবং অদ্বিতীয় অভেদ-সত্তা থেকে লীলার প্রয়োজনে আপাত ভেদ – এই দার্শনিক চিন্তাটি নানাভাবে বিবর্তিত হয়ে শিল্প-সাহিত্যে পূর্বাপর প্রভাব বিস্তার করছে। বৈষ্ণবের শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব বা শ্রীরাধাতত্ত্বেও এই একই দার্শনিক চিন্তার প্রভাব পড়ছে বলে মনে হয়।[৬৫] রবীন্দ্র-নাথের রূপ-অরূপ বা সীমা-অসীমের তত্ত্বচিন্তার মধ্যে যে লীলাবাদের ব্যঞ্জনা তারও গভীর উৎসমূলে এই তত্ত্বের উপস্থিতির অনুমান করাও বোধহয় অসঙ্গত নয়। ব্রাহ্মণ্য বৌদ্ধ সব ধর্মেরই মূর্তিশিল্পে এ তত্ত্বের প্রতীকী যুগনদ্ধ প্রতিমার অভাব নাই।

---

hands of the Gupta artists who seem to have been working for a higher ideal." —A Survey Of Indian Sculpture —by S. K. Saraswati. Firma K. L. Mukhopadhyay Calcutta. Page 121.

64 *Regarding the deification of the idea of 'mithuna' Ganguly (Manomohan Ganguli : Hand Book to the Sculptures in the Museum of the Bangiya Sahitya Parishad, 1922) has cited a very relevent passage from the Brihadaranyaka Upanishad whose translation runs thus : He (Prajapati) did not feel happy or satisfied by*

প্রস্তর ভাস্কর্যে মিথুন মূর্তি প্রসঙ্গে আলোচনা এবং গবেষণা হলেও কুমারস্বামীর পূর্বে টেরাকোটায় মিথুনমূর্তি প্রসঙ্গে কোন আলোচনা হয়েছে বলে জানা যায় নাই। শুঙ্গ যুগের এই ধরণের একাধিক টেরাকোটা ফলকে উদ্গত নরনারীর মিথুন-চিত্র নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে সেগুলিকে একাধিক ভাগে ভাগ করা হয়েছে।[৬৬] প্রথম শ্রেণীর টেরাকোটা-ফলকগুলিতে দণ্ডায়মান (আলিঙ্গনবন্ধ নয়) নগ্ন নরনারীর মিথুন-চিত্র লক্ষ্য করা যায়। দ্বিতীয় আর তৃতীয় শ্রেণীর টেরাকোটা-ফলকে দেখা যায়, আলিঙ্গনবন্ধ অবস্থায় (যদিও প্রকার ভেদ আছে) নর-নারীর মিথুন-মূর্তি-চিত্র উদ্গত হয়েছে।

প্রথম শ্রেণীর তিন-চারটি টেরাকোটা-ফলকের কথা বলা হয়েছে। একটি (অভগ্ন) টেরাকোটা-ফলকে দেখা যায়, একটি সম্পূর্ণ নগ্ন-পুরুষ-মূর্তির পাশে দণ্ডায়মান একটি বিবসনা-নারী মূর্তি। অনুরূপ আর একটি ফলকে (নিম্নদেশ ভগ্ন) অনুরূপ দুটি নিরাবরণ নর নারীর মিথুন-মূর্তি। ফলকের নীচের অংশ ভগ্ন হলেও নর-নারীর উপরের সম্পূর্ণ নগ্ন-দেহাংশ সুস্পষ্টভাবে চোখে পড়ে। তৃতীয় ফলকটিরও

---

himself; — — He created for a second (Companion) to himself. Then he assumed the posture—as a man and a woman embracing each other. He divided his own body into two parts, and in consequence there appeared two figures—a man and a woman.

—Origin And Evolution Of Indian Clay Sculpture. Dr. C. C, Dasgupta. C. U. 1961 Page 175.

৬১ শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব বৈষ্ণবের পরতত্ত্ব। শ্রীরাধাতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব থেকে অভিন্ন। রাধা শক্তি কৃষ্ণ শক্তিমান। শক্তি ও শক্তিমানে অভেদ,

রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা দুই দেহ ধরি।
অন্যোন্যে বিলসয়ে রস আস্বাদন করি॥

অথবা

রাধাকৃষ্ণে ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ॥

দ্রষ্টব্য ঃ শ্রীরাধাতত্ত্ব ও শ্রীচৈতন্য সংস্কৃতি— জনার্দন চক্রবর্তী। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। ১৯৭২

নীচের অংশ ভাঙ্গা। উপরের অংশটিতে দেখা যায়, একটি বিবসনা নারীমূর্তি (যার দেহের অবশিষ্ট ঊর্ধ্বভাগ সম্পূর্ণ আবরণহীন) অনুরূপ একটি নগ্ন পুরুষ মূর্তির (এটিরও দেহের অবশিষ্ট ঊর্ধ্বদেশ নগ্ন) পাশে ঘনিষ্ঠভাবে দাঁড়িয়ে আছে। একের হাত (যতটা অনুমান হয়) অন্যের স্কন্ধে ন্যস্ত। চতুর্থ ফলকটিতে দেখা যায় একটি স্ত্রী মূর্তি, (যার জননেন্দ্রিয় সূক্ষ্ম বস্ত্রের অভ্যন্তর থেকেও প্রকটভাবে দৃশ্যমান), একটি নগ্ন পুরুষমূর্তির পাশে অন্তরঙ্গভাবে দণ্ডায়মান। নগ্ন নরনারীর যুগলমূর্তিকে সঙ্গত কারণেই মিথুন-মূর্তি রূপে গণ্য করা হয়। এগুলি কামাসক্ত নরনারীর মূর্তি বলেই মনে হয়। শেষোক্ত ফলকের স্ত্রী মূর্তিটির সূক্ষ্ম বস্ত্রাভ্যন্তর থেকে দৃশ্যমান জননেন্দ্রিয়, উর্বরতা বা প্রজনন-চেতনারই দ্যোতক বলে মনে হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর টেরাকোটা-মিথুন-চিত্রগুলিতে দেখা যায় সম্পূর্ণ উলঙ্গ নরনারী উভয়ে নিবিড় আলিঙ্গনবদ্ধ। এছাড়াও একটি কিন্নর-মিথুনেব টেরাকোটা চিত্রও টেরাকোটা ফলকগুলির অন্তর্ভুক্ত। এটি তৃতীয় শ্রেণীভুক্ত, প্রথাগত মিথুন। একটি চক্রাকার টেরাকোটা-ফলকে উদ্গত শুঙ্গযুগের এই কিন্নর মিথুন চিত্রটি নানাদিক দিয়ে চিত্তাকর্ষক। ফলকটি পাওয়া গেছে মথুরা থেকে। মূর্তি যুগল অন্তরঙ্গ ভঙ্গিমায় একে অন্যের কাঁধে হাত দিয়ে রয়েছে। মিথুন-মূর্তির নীচে একটি 'বামন' মূর্তিও লক্ষ্য করা যায়। শুঙ্গযুগের পূর্বেকার অর্থাৎ মৌর্যযুগের মিথুন মূর্তিও পাওয়া গেছে। মৌর্যযুগের ধর্মীয় নারীমূর্তিগুলিকে যে পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে তার একটি হ'ল মিথুনমূর্তি। বাকীগুলির মধ্যে আছে যথারীতি মাতৃকামূর্তি, যক্ষীমূর্তি, নাগীমূর্তি, আর সপক্ষ দেবীমূর্তি। মূলতঃ মাতৃকামূর্তি, যক্ষীমূর্তি এবং মিথুনমূর্তি একই শ্রেণীভুক্ত।

---

66 These mithuna plaques may be divided into three classes, viz, (a) In which man and woman are in the posture of mithuna but do not embrace each other (b) in which man and woman very closely embrace each other and (c) in which conventional figures—male and female closely embrace each other.

—Origin And Evolution Of Indian Clay Sculpture. by Dr. C. C. Dasgupta. C. U. 1961 Page 175.

এগুলি সবই উর্বরতার প্রতীক। চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত প্রচুর সংখ্যক সুপ্রাচীন মিথুন-মূর্তিযুক্ত টেরাকোটা (বহু বিচিত্র) ফলক সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে শ্রীদিলীপকুমার মৈতে তাঁর চন্দ্রকেতুগড় পুস্তকে ডঃ নীহার রঞ্জন রায়ের যে তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্যটি উদ্ধৃত করেছেন, সেটি এখানে প্রাসঙ্গিকভাবেই পুনরুদ্ধৃত করা যেতে পারে। ডঃ নীহার-রঞ্জন রায় বলেছেন— "ঠিক পুজোর জন্য বা ধর্মীয় প্রতীক হিসাবে ব্যবহৃত না হ'লেও, প্রজনন ক্রিয়ার প্রত্যক্ষরূপ হিসাবে এ ধরণের ফলকের একটা মাঙ্গলিক প্রতীকত্ব ছিল, এবং লোকেরা অন্যান্য মাঙ্গলিক চিহ্নের মত মিথুন ফলকও ঘরে রাখতেন।"[৬৭] মৌর্য যুগের বৈশালী থেকে প্রাপ্ত একটি টেরাকোটা-ফলকে তিনজোড়া নর-নারী মিথুনে বিচিত্রভাবে উদ্গত হয়েছে। শুধু মৌর্যশুঙ্গ যুগে বা তার পূর্ববর্তী-কালেই নয়, নানা বৈচিত্র্য আর বিবর্তনের মধ্য দিয়ে মিথুন-চেতনার বিশিষ্ট ধারাটি অন্যান্য চিত্র ভাস্কর্যের মতই টেরাকোটা-ভাস্কর্যে পূর্বাপর প্রবাহিত হয়েছে, দেখা যায়। মধ্যযুগের পাহাড়পুরের টেরাকোটা-ভাস্কর্যে একাধিক মিথুন-চিত্র পাওয়া গেছে। এগুলির মধ্যে রয়েছে গন্ধর্ব-মিথুন. শবর-মিথুন ইত্যাদি। সহজ সরল চিন্তাযুক্ত এই আদিম মিথুন চেতনা, দর্শন আর সাহিত্যে বহু বিচিত্র তত্ত্বরূপে বিবর্তিত হয়েছে, এমন চিন্তা স্বাভাবিকভাবেই মনে এসে যায়। এই মিথুনতত্ত্ব বৌদ্ধধর্মেও আলিঙ্গনবন্ধ দেব-দেবীর যুগল মূর্তির রূপকে প্রকাশিত হয়ে এ ধর্ম দর্শনেও একটি লীলাবাদ তথা তান্ত্রিক ব্যঞ্জনা বহন করছে। বৌদ্ধ-দেবতারা তাঁদের শক্তির সঙ্গে আলিঙ্গনবন্ধ অবস্থায় রূপায়িত হয়েছেন। বজ্রসত্ত্ব বা বজ্রধর তাঁর শক্তি বজ্রধাত্বীশ্বরীর (বা বজ্রবারাহী বা প্রজ্ঞা বা প্রজ্ঞাপারমিতা বা নৈরাত্মা প্রভৃতি নানা নামে অভিহিতা) সঙ্গে আলিঙ্গনবন্ধ অবস্থায় রূপায়িত হয়েছেন। হেরুক তন্ত্রে, শৃঙ্গার-রসাবিষ্ট (শৃঙ্গার-রস-সমন্বিতম্) বৌদ্ধ দেবতা হেরুককে, তাঁর শক্তি বজ্রবিরোচনীর সঙ্গে উল্লসিত এবং করুণাপ্লুত (করুণা-মহোৎসব) অবস্থায় আলিঙ্গনবন্ধ ভঙ্গীতে চিত্রিত করা হয়েছে।[৬৮] নিঃশেষ-মিলনের প্রতীকত্ব প্রকাশের উদ্দেশ্যেই এই

৬৭ বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব) ডঃ নীহার রঞ্জন রায়।

68 *An Introduction to Tantric Buddhism—S B. Dasgupta : C. U. : 1974*

"আলিঙ্গনবন্ধ" বা "যোনিবন্ধ" মুদ্রার প্রবর্তন। এটি লীলাবাদ আর তন্ত্রের দার্শনিক পরিমণ্ডলে বিধৃত সেই একই অদ্বয়তত্ত্বেরই ব্যঞ্জনা। পরমেশ্বর এক এবং অদ্বিতীয় ; লীলার আকাঙ্খায় নিজ সত্ত্বা থেকেই দ্বিতীয় সত্ত্বার সৃষ্টি। পরিণামে দু'য়ে মিলে সেই এক এবং অদ্বিতীয় সত্ত্বার নিত্য অস্তিত্ব। যাই হোক, মিথুন মূর্তি বা তত্ত্বকে কেন্দ্র করে উদ্ভূত লীলাবাদের সঙ্গে একটি শক্তিতত্ত্ব প্রায় সর্বক্ষেত্রেই বর্তমান। আদিম প্রজনন-চেতনাকে এই শক্তিতত্ত্বের আদি উৎস বলে মনে করাটা, মনে হয়, অসঙ্গত নয়। কারণ, গবেষকরা দেখিয়েছেন যে আদিম মাতৃকা মূর্তিকাগুলি নানাভাবে বিবর্তিত হয়ে নানা শাস্ত্রীয় তাত্ত্বিক দেবতায় রূপান্তরিত হয়েছেন। মাতৃকা মূর্তিগুলির আবির্ভাব সুপ্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক কালে হলেও, যক্ষীমূর্তির সুস্পষ্ট আবির্ভাব মৌর্য যুগেই লক্ষ্য করা যায়। মৌর্য যুগেই একাধিক ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। কুমারস্বামী তাঁর "যক্ষ" গ্রন্থে যুক্তিযুক্ত ভাবেই প্রমাণ করেছেন যে, যক্ষ-যক্ষী দেবতারা হিন্দু-পৌরাণিক দেবতা জগৎ সৃষ্টিতে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। যক্ষ মূর্তিতত্ত্ব হিন্দু আর বৌদ্ধ মূর্তিতত্ত্বের গোড়াপত্তন করেছে।[৬৯] কুবের এবং অন্যান্য যক্ষ দেবতারা দেশীয় অনার্যদেবতা সাধারণতঃ উর্বরতা শক্তির প্রতীকে পূজিত হন। মাতৃকা মূর্তিগুলি সাক্ষাৎ উর্বরতারই দেবী। অতএব একথা মনে করা অসঙ্গত নয় যে, হিন্দুর পৌরাণিক-জগতে অনুপ্রবিষ্ট মাতৃকা, যক্ষ ইত্যাদি আদিম 'কাল্ট' বাহিত প্রজনন-চেতনা বা উর্বরতাবাদ, লীলাবাদী তথা ভক্তিবাদী ধর্মদর্শনের সহযোগী শক্তি তত্ত্বের মূলে নিহিত আছে। ভক্তি আর শক্তি সমাহৃত। যক্ষ উপাসনাও ভক্তি 'কাল্টের'ই উপাসনা। প্রজনন-চেতনা মানব-সংস্কৃতির আদিম পর্বে আদিম মানুষের সম্মুখে এক নূতন দিগন্ত উন্মোচন করে দিয়েছিল। 'প্রজনন-চক্র' তার মধ্যে এক নূতন বোধ বা চেতনা

---

69 *Certainly the yaksa concept has played an important part in the development of Indian mythology, and even more certainly, the early yaksa iconography has formed the foundation of later Hindu iconography. —"Yaksas" (Part I) A. K. Coomarswamy. Munshiram Monoharlal. New Delhi 1971.*

সৃষ্টি করে। এই শক্তির প্রভাবে একই ভূখণ্ড থেকে বারবার শস্য উৎপন্ন হয়, একটি শস্যবীজ থেকে সৃষ্টি হয় হাজার শস্যদানা। এক মাতা থেকে, নারী থেকে পর্যায়ক্রমে হয় সন্তান সৃষ্টি। 'সোহকাময়ত একোহহং বহু স্যাম' (এক আমি বহু হ'ব) এই শ্রুতিবাক্যেও যেন প্রজনন শক্তিরই ব্যঞ্জনা। সৃষ্টিশক্তি, প্রজনন শক্তির অমোঘত্ব মানুষকে তার আদিম অবস্থাতেই বিস্মিত করেছিল। শুধু তাই নয়, এই সূত্রে তার জীবন ধারার এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনও ঘটিয়েছিল। এই পরিবর্তন তার এক বিশাল সাংস্কৃতিক পরিবর্তন। বন্য-শিকারী মানুষ এই প্রজনন তথা সৃষ্টি শক্তির তাৎপর্য অনুধাবন করে গৃহবাসী হয়েছিল — স্থায়ী বসতি করতে শিখেছিল। শক্তির স্বরূপ উপলব্ধির এমন একটি স্মরণীয় ঘটনা তার অস্তিত্বের সঙ্গে জড়িত হয়ে পরবর্তীকালে যে নানা তত্ত্ব-দর্শনের জন্ম দেবে, এটা কিছু বিচিত্র নয়।

'যক্ষকাল্ট' এবং তার সঙ্গে উর্বরতাবাদের প্রভাব জৈনধর্মেও লক্ষ্য করা যায়। এক একজন জৈনতীর্থঙ্করের সঙ্গে একজন করে যক্ষ আর যক্ষী নির্দিষ্টভাবে যুক্ত আছেন। অনেকটা শাক্তধর্মের ভৈরব-ভৈরবী তত্ত্বেরই মত। যক্ষীদের হস্তধৃত আয়ুধ এবং মহাকালী প্রভৃতি নাম-করণেও যেন তান্ত্রিক আভাস। জৈনতীর্থঙ্কর নেমিনাথের (দ্বাবিংশতম তীর্থঙ্কর) শাসনযক্ষী অম্বিকা (বা কুষ্মাণ্ডিনী) যথার্থই মাতৃকা দেবতা (Mother goddess)। অম্বিকা বা জগদম্বিকা নামটিও এদিক দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। মূর্তি পরিকল্পনায় দেবীর সঙ্গে সিংহবাহন ছাড়াও সফলা 'আম্রবৃক্ষ' এবং 'শিশু'র উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। কোন কোন মূর্তিতে দ্বিভুজাদেবীর একহাতে থাকে 'আম্রফল' (আম্র-লুম্বি) অন্যহাত তাঁর শিশু সন্তানের মস্তকে ন্যস্ত থাকে। 'শিশু' বা 'সফল-আম্রবৃক্ষ' উর্বরতাবাদেরই ব্যঞ্জনা বহন করছে। আদিমকাল থেকেই একশ্রেণীর যক্ষীমূর্তির সঙ্গে বৃক্ষের নিবিড় (বৃক্ষদেবীর প্রতীক) যোগ চোখে পড়ে। এ ধরণের প্রচুর প্রস্তর-ভাস্কর্য ছাড়াও টেরাকোটা-ফলকেরও আবিষ্কার ঘটেছে।[৭০] আদিম 'মাতৃকা' পূজার

---

70 *One example (terracotta) representing a female figure in a half-dancing attitude under a palm tree — — — Its face is very worn out but hairs are well marked — — — Its upper body is*

সঙ্গে বৃক্ষপূজার সংস্কার একীভূত হয়ে এই মূর্তিকল্পনায় একটি উর্বরতাবাদেরই বাতাবরণ সৃষ্টি করেছে। জৈন 'পিতামাতা' মূর্তি পরিকল্পনাতেও মিথুনচেতনা এবং প্রজননমনস্কতার প্রভাব। জৈন তীর্থঙ্করদের 'মাতা-পিতা'র যুগলমূর্তির সঙ্গে এক বা একাধিক শিশু সন্তানের উপস্থিতি ব্রাহ্মণ্য 'সোমাস্কন্দ' মূর্তিরই যেন প্রতিরূপ। 'প্রজনন-শক্তি' কেন্দ্রিক উর্বরতাবাদের বাস্তবধর্ম নানাসূত্রে অধিকাংশ ধর্মদর্শনকে প্রভাবিত করেছে। বিশ্বচরাচরে এই মিথুন লীলা আর তার সঙ্গে যুক্ত প্রজনন শক্তিকে কেন্দ্র করে সৃষ্টির খেলা চলছে। শুধু মনুষ্য জগতেই নয়, মনুষ্যেতর জীব-জগতেও মিথুন লীলার প্রকাশ। কুণ্ডিলনগর (আসাম) থেকে প্রাপ্ত, মধ্যযুগের একটি টেরাকোটা ফলকে শিল্পী, ময়ূর-ময়ূরীর এমনি এক মিথুনলীলা চিত্রিত করেছেন শৃঙ্গার রসসিক্ত করে। শিল্পী প্রেক্ষাপটটিকেও রসঘন আর প্রতীকী করে তুলেছেন বিহঙ্গদ্বয়ের উভয়পার্শ্বে চিত্রিত বৃক্ষযুগলের উপস্থাপনে। পক্ষীযুগলের এ ধরণের রসঘন মিথুনলীলা ভারত-ভাস্কর্যে দুর্লভ।[৭১] আসামের দা-পার্বতীয়া এবং কুণ্ডিলনগর, টেরা-কোটা শিল্পের দুটি বিশিষ্ট কেন্দ্র। 'প্রকৃতি-পুরুষ' তত্ত্ব থেকে আরম্ভ করে শিব-শক্তি অথবা রাধাকৃষ্ণলীলার পরিকল্পনায় আদিম মিথুন চেতনার সঙ্গে অবিনাবদ্ধ উর্বরতা শক্তিরই প্রকাশ ঘটেছে বলে মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। লীলাবাদী-বৈষ্ণবধর্মকে কেন্দ্র করে তার ধাতুগত 'শক্তি'র ব্যঞ্জনা স্বাভাবিকভাবেই বৈষ্ণব মন্দিরের টেরাকোটা চিত্রে শাক্ত মোটিফগুলির মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছে। সুপ্রাচীন ভক্তি-

---

nude — — — There is a remarkable affinity between this figurine and the Yakshini image called "Culakoka devata" on rhe railing round the Stupa at Bharhut of the 2nd century B. C. Size $2\frac{1}{2}$ inch long. collected from Bhita : Maurya age.

—Origin And Evolution of Indian Clay Sculpture. C. U. 1961 : Page 150.

71 "One peacock and peahen in amorous attitude. The atmosphere thus created is in keeping with the natural surroundings

ধর্মের বিশাল সুপরিসর ক্ষেত্রে যে সমন্বয়ের আবহ সৃষ্টি হয়েছিল তাতে শক্তিতত্ত্ব এক নূতন ব্যঞ্জনায় ব্যক্ত হয়েছে। বৈষ্ণব-মন্দির-টেরা-কোটায় শৈব-শাক্ত মোটিফ্গুলি একরকম আবশ্যিক ভাবেই দেখা দিয়েছে। এ প্রসঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের শ্রীদুর্গাতত্ত্ব সবিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। "শক্তিতন্ত্রের শ্রীদুর্গাতত্ত্বের সঙ্গে শ্রীরাধাতত্ত্বের অভিন্নতা স্থাপন করে বৈষ্ণব আচার্যগণ এক গভীর সমন্বয়বুদ্ধির প্রকটন করেছেন। শক্তি মাত্রই মূল অংশিনী স্বরূপশক্তির অধিষ্ঠাত্রী শ্রীরাধার অংশ। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপভূত অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রসমূহে ভগবদ্ভক্ত্যাত্মক স্বরূপশক্তির বৃত্তি বিশেষের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা হলেন শ্রীদুর্গা। শ্রীজীব ভক্তিসন্দর্ভে তা দেখিয়েছেন, "শ্রীকৃষ্ণস্বরূপভূতে শ্রীমদষ্টাদশাক্ষরাদি-মন্ত্রগণেঽপি দুর্গানাম্নো ভগবদ্ভক্ত্যাত্মক-স্বরূপভূত-শক্তি-বিশেষস্যাধিষ্ঠা-তৃত্বং শ্রুতিতন্ত্রাদিষু দৃশ্যতে।"[৭২] ভারতের ধর্মদর্শনগুলি মূলতঃ সাধন-দর্শন। ধর্মসাধনার স্বাভাবিক আকাঙ্খা হ'ল এই জগৎ এবং জীবনের বন্ধন তথা দুঃখ থেকে মুক্তিলাভ। অন্যান্য ধর্মদর্শনে লীলাবাদের ব্যঞ্জনা থাকলেও বৈষ্ণবধর্মদর্শনের ভক্তিবাদে লীলাবাদ সমধিক প্রাধান্য পেয়েছে। লীলাদর্শনই বৈষ্ণবের সর্বাধিক কাম্য। এমন কি লীলা আস্বাদনকে সর্বস্ব করে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম-দর্শন মুক্তিকেও অস্বীকার করেছে।[৭৩] এই লীলা পরমেশ্বরের সঙ্গে তাঁরই শক্তির লীলা। অতএব লীলাবাদী বৈষ্ণবধর্মের ভক্তিবাদের সঙ্গে

---

indicated by two trees on two sides. The artist has given the plastic expression to the conjugal love of the birds. This kind of specimen is exremely rare in Indian sculpture.

—Origin And Evolution of Indian Clay Sculpture. C. U. 1961 : Page 238.

৭২ শ্রীরাধাতত্ত্ব ও শ্রীচৈতন্যসংস্কৃতি : শ্রীদুর্গাতত্ত্ব : জনার্দন চক্রবর্তী (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় : ১৯৭২) পৃঃ ১০৫।

৭৩ বিষ্ণুপুরের শ্যামরায়-মন্দিরের (পঞ্চরত্ন বা পাঁচচূড়া মন্দির) রাধাকৃষ্ণ লীলার টেরাকোটা-মোটিফগুলি খুঁটিয়ে দেখলে সহজেই বোঝা যাবে যে, মোটিফগুলির কম্পোজিশনের পশ্চাতে এই তত্ত্ব প্রোজ্জ্বল। রাধাকৃষ্ণ লীলার প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে এক বা একাধিক 'দর্শিকা'র উপস্থিতি এই তত্ত্বেরই ব্যঞ্জনা বহন করছে বলে মনে হয়। সমস্ত টেরাকোটা মন্দিরের

শক্তিবাদ অবিনাবদ্ধ। নারদপঞ্চরাত্রে শ্রুতিবিদ্যা সংবাদে বলা হয়েছে ভজনের শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি বা উপায়ই ভক্তি। এই ভক্তিই প্রকৃতি বা শক্তি। ভক্তিরূপিনী এই শক্তি প্রিয়কে অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণকে ভজন করেন। পরমাত্ম স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের এই ভক্তিরূপা শক্তিকে অতি দুঃখেই জানা যায়। তাই অখণ্ডরসবল্লভ সাধু-মহাত্মাগণ এই শক্তিকে দুর্গা আখ্যা দেন।[৭৪] শক্তি-শক্তিমানের অভেদ বিবিক্ষায় এই ভাগবতী শক্তি দুর্গার সঙ্গে ভগবানের অভেদ বর্ণনা করা হয়েছে গৌতমীয়কল্পে।[৭৫] গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের শক্তিতত্ত্ব বা শ্রীদুর্গাতত্ত্বের গূঢ় ব্যাখ্যা বা ব্যঞ্জনা যাই-হোক প্রচলিত ও জনপ্রিয় শাক্ত মোটিফের মাধ্যমেই তা মন্দির গাত্রে সগৌরবে এবং সবিস্তারে পরিস্ফুট হয়েছে।

মধ্যে 'শ্যামরায়' মন্দিরই প্রাচীনতম, বিষ্ণুপুরের রাজদরবার এবং রাজপরিবারের আবহ তখন ভক্তিভাবের আবেগাতিরেকে স্পন্দমান। রাজা এবং রাজপরিবারের ভক্তিভাবের এই পরিবেশটির একটি কল্পচিত্র যদুনন্দন দাসের একটি পদে আভাসিত দেখা যায়। (স্বপ্নে পদ পড়ে রাজা, রাণী সে শুনিয়া/ গোঙাইল সর্বনিশি কান্দিয়া কান্দিয়া)। ভক্তিভাবের এমনি এক উষ্ণ পরিবেশেই 'শ্যামরায় মন্দির' নির্মিত। শুধু মন্দির অলংকরণের সর্বোত্তম নজির সৃষ্টির ইচ্ছাই নয়, বৈষ্ণব ধর্মদর্শনের তাত্ত্বিক বিশুদ্ধতা রক্ষার প্রয়াসও নানাভাবে এমন্দিরে অনুভব করা যায়। রাজদরবার এবং বৈষ্ণব মোহান্তদের যৌথ প্রযত্নের সাক্ষ্য হয়ে আছে টেরাকোটাতেই উৎকীর্ণ কিছু নাম। একদিকে রাজা-যুবরাজ এবং প্রধান রাজকর্মচারীর নাম যেমন গর্ভগৃহে বা বারান্দায় লক্ষ্য করা যায় অন্যদিকে পাশাপাশি কিছু বৈষ্ণব মোহান্তদের নামও তেমনি উৎকীর্ণ দেখা যায়।

৭৪ ভক্তির্ভজনসম্পত্তির্ভজতে প্রকৃতিঃ প্রিয়ম।
জ্ঞায়তেঽত্যন্তদুঃখেন সেয়ং প্রকৃতিরাত্মনঃ।
দুর্গেতি গীয়তে সদ্ভিরখণ্ডরসবল্লভা ।।

৭৫ "যঃ কৃষ্ণ সৈব দুর্গা স্যাদ্ যা দুর্গা কৃষ্ণ এব সঃ।"
দ্রষ্টব্য : শ্রীরাধাতত্ত্ব ও শ্রীচৈতন্য সংস্কৃতি গ্রন্থে শ্রীদুর্গাতত্ত্ব।
পৃষ্ঠা : ১০৬।

বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত টেরাকোটা-মন্দিরগুলিতে দেওয়াল জুড়ে কৃষ্ণলীলার পাশাপাশি শৈব ও শাক্ত টেরাকোটা-মোটিফের বিপুল সমাবেশ এই আদর্শেরই অনুসরণ। এটা শুধু বিষ্ণুপুরের মন্দিরেই নয়, পরবর্তীকালের সমস্ত মন্দিরেও এই রীতিরই কমবেশী অনুসরণ দেখা যায়। আটপুরের মন্দিরে উৎকীর্ণ 'দেবী-যুদ্ধে'র বিশদ বর্ণনাত্মক অপূর্ব টেরাকোটা-দৃশ্যটি সর্বজনবিদিত। শুধু ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের গৌড়ীয় বৈষ্ণব মন্দিরেই নয়, গুপ্তযুগে, ভক্তিমূলক ভাগবদ্ধর্মের প্রেরণায় যখন শতশত ইটের মন্দির নির্মিত হতে থাকে, তখনই ভাগবদ্ধর্মের বিশিষ্ট দার্শনিক আদর্শটিকে অবলম্বন করেই অলঙ্করণের এই "নীল নক্সা" বা ব্লু-প্রিণ্টও রচিত হয়। লীলাবাদের দার্শনিক রূপটির উৎস মূলে নিহিত শক্তির স্বরূপটি সমীক্ষা করলে সৃষ্টি লীলারই মূল তত্ত্বটি যেন উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। মিথুন-লীলা ও প্রজনন শক্তির নানা ধর্মীয় প্রতীক এবং দার্শনিক অভিব্যক্তি ছাড়াও এই লীলা-সঞ্জাত শক্তির ভিন্নতর ব্যঞ্জনা নানা তান্ত্রিক লোকসংস্কারেও লক্ষ্য করেছেন গবেষকরা। মন্দিরের প্রস্তর-ভাস্কর্যে তাঁরা একধরণের কৌতুলোদ্দীপক মিথুন-চিত্র লক্ষ্য করেছেন। এগুলিতে দেখা যায় মৈথুনরত নরনারীর মধ্যে পুরুষ মূর্তির মাথা থেকে একগোছা চুল কেটে নিচ্ছে তৃতীয় কোন ব্যক্তি। মৈথুনকালীন অলৌকিক শক্তি বিচ্ছুরণের লোকবিশ্বাসও নানাভাবে লোকসমাজে প্রচলিত থাকতে দেখা যায়। গ্রামাঞ্চলে, সঙ্গমরত নাগ-নাগিনীর মিলিত প্রত্যঙ্গে বস্ত্র নিক্ষেপ করে অলৌকিক-শক্তি সংগ্রহের লোকসংস্কার বহু প্রচলিত। যাইহোক, টেরাকোটা জগতের প্রাগৈতিহাসিক মাতৃকা মূর্তিগুলিকে কেন্দ্র করে যে আদিম ধর্মচেতনা অকুণ্ঠভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল সেই উৎস থেকেই পরবর্তীকালের শক্তিকেন্দ্রিক ধর্মদর্শনের এক বিরাট অংশ নির্মিত হয়েছে, এমন মনে করা অসঙ্গত নয়। টেরাকোটা জগতের মাতৃকা-মূর্তিগুলিতে শুধু স্ত্রী-জননেন্দ্রিয়ই প্রকট নয়, সেগুলির অনেকেরই উদর নিতম্বের অতিরিক্ত স্ফীতি গর্ভিনী অবস্থারই দ্যোতনা বহন করছে। 'কায়রো' সংগ্রহশালা থেকে সম্প্রতি হারিয়ে যাওয়া একটি টেরাকোটা মাতৃকা-মূর্তিকায় উপরোক্ত লক্ষণগুলি সুপ্রকট (চিত্রদৃষ্টে অনুমিত)। ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যের আদর্শেও শৃঙ্গার রসের

পাশাপাশি সন্তান-সম্ভাবনার মাঙ্গলিক ব্যঞ্জনাও যুক্ত হয়েছে—কাব্যে, সাহিত্যে এবং শিল্পে। কি কুমারসম্ভব, কি শকুন্তলা সর্বত্রই মাতৃত্বে বা সফল নারীত্বে পরিসমাপ্তি। বর্ণাঢ্য কুসুম বিকাশের উদ্বেল-উচ্ছলতাতেই জীবনের বা কাহিনীর শেষ নয়, পাশাপাশি ফলের মাঙ্গলিক ইঙ্গিতেই জীবনের পরিপূর্ণ প্রকাশ। মিথুন-টেরাকোটাগুলি প্রকৃতপক্ষে নরনারীর কামোদ্দীপনার জন্য রচিত হলেও একটি মাঙ্গলিক ইঙ্গিত এগুলির সঙ্গে যুক্ত আছে। সৃষ্টিক্রিয়ার মূলীভূত হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই এই প্রজনন শক্তির একটি মাঙ্গলিক ব্যঞ্জনা বর্তমান। পরবর্তীকালে এই সব আদিম মৌলিক জৈবচেতনাগুলিরই নানা দার্শনিক রূপান্তর মানব-মনীষার বিচিত্র বিবর্তনকেই সূচিত করেছে। চন্দ্রকেতুগড়ের মিথুন-টেরাকোটা সম্পর্কে ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের পূর্বোক্ত অভিমত এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু সাধারণভাবে এই মিথুনলীলার দার্শনিক ব্যাখ্যা করা গেলেও, চন্দ্রকেতুগড় থেকে আবিষ্কৃত প্রচুর মিথুন-টেরাকোটা-ফলকে উদ্গত মৈথুনের জটিল বিচিত্র প্রকারভেদের কোন সরল সহজ ধর্মীয় ব্যাখ্যা বোধহয় দেওয়া যায় না। অন্তত দশবারো প্রকার কলা-কৌশলে শৃঙ্গার ও রতিক্রীড়ার দৃশ্য উপহার দিয়েছে চন্দ্রকেতুগড়। বাংলার তাম্রলিপ্ত, আটঘরা, হরিনারায়ণপুর, বাণগড় তথা ভারতের বিভিন্ন পুরাক্ষেত্র যথা বৈশালী উজ্জয়িণী, পাটলিপুত্র, কৌশাম্বী প্রভৃতি প্রাচীন জনপদে পরিলক্ষিত 'টেরাকোটা' বা পোড়ামাটির 'মিথুন' মূর্তির মধ্যে চন্দ্রকেতুগড়ের "মিথুন" শুধুমাত্র বৈচিত্র্যে ও কৌশলে অনন্য নয় সংখ্যায় সর্বাপেক্ষা অধিক।[৭৬] সঙ্গতকারণেই মনে করা যেতে পারে প্রাচীন বন্দর-নগরগুলি থেকে প্রাপ্ত এই সব টেরাকোটা-ফলকে 'নাগরক'-নাগরিকাদের বা নগর-বিলাসিনীদের অত্যুগ্র কামকেলির উন্মাদ-সম্ভোগই প্রতিফলিত হয়েছে। এই তীব্র উপভোগ-চেতনা, কামকেলির কুটিল বঙ্কিম প্রকৃতি রাজা-রাজন্য অথবা বণিক শ্রেণীর অত্যুগ্র রতি-সম্ভোগ লিপ্সা—অখণ্ড অবসরবিনোদনজনিত কিংবা উদ্বৃত্ত-সম্ভোগ প্রসূত মানসিকতারই ফলশ্রুতি বলেও মনে করা যেতে পারে। শ্রীহর্ষের উত্তরনিষাদচরিতে মহারাজ নলের রাজপ্রাসাদ বর্ণনাকালে কবি দুটি

৭৬ চন্দ্রকেতুগড় ঃ দিলীপকুমার মৈত্রে

প্রাচীর চিত্রের উল্লেখ করেছেন। অষ্টাদশ সর্গের বিংশতি শ্লোকে বর্ণনা আছে, একটি প্রাচীরচিত্রে স্বয়ং পদ্মসম্ভবের, অর্থাৎ ব্রহ্মার সুরত দৃশ্য। অপর একটি প্রাচীরে অঙ্কিত হয়েছে দেবরাজ ইন্দ্র ঋষি গৌতমের পত্নী অহল্যার সঙ্গে সঙ্গমরত। উভয় ক্ষেত্রেই বিষয়বস্তু অবৈধ প্রণয়ের। সূত্রকার বলেছেন এ জাতীয় প্রাচীর চিত্রের মূল উদ্দেশ্য কামোদ্দীপণার্থম্।[৭৭] শুধু শ্রীহর্ষের কাব্যেই নয় রাজসভা তথা নগরকেন্দ্রিক অধিকাংশ শিল্পকলা ও সাহিত্যে কামোদ্দীপনার এই আয়োজন প্রসারিত। রাজা নলের শয়ন মন্দিরে অবস্থিত প্রাচীর চিত্রের চরিত্র বিচার করলেই বোঝা যায় এটা সাধারণ মানুষের নেহাৎ স্বাভাবিক জৈব-যৌন-প্রবৃত্তির প্রকাশ মাত্র নয়। এটি রাজা-রাজন্য শ্রেষ্ঠীর সম্ভোগ-মনস্ক কাম-চর্চারই অভিব্যক্তি। বাৎস্যায়ণের কাম-শাস্ত্রের কথা ছেড়ে দিলেও কালিদাস থেকে জয়দেব পর্যন্ত অধিকাংশ রাজসভা বা নগরাশ্রয়ী মণ্ডন-সমৃদ্ধ সাহিত্যে শৃঙ্গাররসের বিচিত্র বিকাশ। শৃঙ্গাররসের সর্বোত্তম বিকাশ যে পরকীয়া প্রেমে—এটা অতি নৈষ্ঠিক বৈষ্ণব আচার্যরাও স্বীকার করেছেন। তাঁরাও মনে করেন এই পরকীয়া-প্রেমেই 'রসের উল্লাস' সর্মাধিক। তাই রাজা বা শ্রেষ্ঠীর বিচিত্র সম্ভোগ তৃষ্ণা চরিতার্থ করার জন্যই সভাশ্রয়ী সাহিত্য-শিল্পে অবৈধ বা পরকীয়া-প্রেমের প্রকাশ নির্বাধ। দ্বাদশ শতকের সেন-বর্মণ যুগের সভাশ্রয়ী সংস্কৃত শৃঙ্গার রস সাহিত্যের ব্যাপক চর্চা ও প্রসার সম্পর্কে ডঃ নীহার রঞ্জন রায় যা বলেছেন সেটি প্রায় সর্বযুগের রাজা তথা উচ্চকোটি সম্ভোগমনস্ক নাগরিকদের সম্পর্কে কমবেশী প্রযোজ্য।[৭৮]

---

৭৭ ভারতীয় ভাস্কর্যে মিথুন : নারায়ণ সান্যাল : পৃষ্ঠা ২৫ : বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিঃ, প্রথম সংস্করণ আগস্ট ১৯৮০।

৭৮ আসল কথা, এই পর্বের বাংলাদেশে রাজসভায়, সামন্তসভায়, উচ্চতর সম্প্রদায়গুলির বহির্বাটিতে, এককথায় উচ্চকোটি সমাজের সামাজিক আবহাওয়াটাই ছিল এই ধরণের। ধোয়ীই হউন, আর শ্রীধরদাসই হউন, জয়দেবই হউন, আর উমাপতিধরই হউন, সকলেই লক্ষ্মণ সেনের তুলনা করিয়াছেন কৃষ্ণের সঙ্গে, এবং সে কৃষ্ণ মহাভারতের শ্রীকৃষ্ণ নহেন, মথুরাবৃন্দাবনের রাধালীলাসহচর-কৃষ্ণ। যেখানে লক্ষ্মণসেন সেখানেই কেলি; তাহা রাজকীয় লিপিতেই হউক বা কবির স্তুতিতেই হউক। এ তথ্যের

একথা সত্য লক্ষ্মণসেনের কাল বিশেষভাবে বাঙালীর অবক্ষয়ের কাল। সেকালে শৃঙ্গাররসের ঢল প্রবলবেগে উচ্চকোটি সমাজের উপর প্রবাহিত হচ্ছিল। প্রতিভাবান কবিদের কাব্যেও শৃঙ্গাররস, যত বৈচিত্র্য নিয়েই বিস্তারিত হোক না কেন, তা উচ্চ সমাজের এই অসংবৃত কাম-কল্পনাভাবনার আবিল স্পর্শ থেকে মুক্ত ছিলনা। গীতগোবিন্দ আর্যাসপ্তশতীর শৃঙ্গাররস সমৃদ্ধ শ্লোক, পবনদূত সমস্তই সেই রাজ-সভার বিলাস-লালসাময় সংস্কৃতির সঙ্গে অচ্ছেদ্য সম্বন্ধযুক্ত।........ শুধু জয়দেবের গীতগোবিন্দই নয়, প্রায় সমসাময়িক কাল বা কিছু পরবর্তীকালে রচিত ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণেও কামনা-বাসনাময় আবহের মধ্যে রাধাকৃষ্ণলীলাকে আশ্রয় করে একইসঙ্গে ইন্দ্রিয়-কামনা ও প্রেম ভক্তির জয়ঘোষণার ইঙ্গিত সুস্পষ্ট।[৭৯] গুপ্তযুগে, রাষ্ট্রীয় সংহতির এক বিস্তীর্ণ, সুপরিসর গঠনশীল আবহের প্রেক্ষাপটে বিকশিত কালিদাসের সংস্কৃত কাব্য-নাটকে স্বাভাবিকভাবেই শৃঙ্গাররস বা রতিচিন্তার তটপ্লাবী উচ্ছ্বলতা না থাকলেও শৃঙ্গাররসের বিচিত্র বিকাশ অনুপস্থিত নয়। কালিদাস রাজসভার কবি। তাঁর কাব্যে নাগরিক কামকেলির সচেতন লীলা-বৈচিত্র্য সহজেই চোখে পড়ে। কালিদাসের অধিকাংশ কাব্য-নাট্যে শৃঙ্গাররসের ভূমিকা মুখ্য। তাঁর এই উজ্জ্বল রসাত্মক কাব্যকৃতির ক্ষেত্রে সম্ভোগমনস্ক রাজা বা রাজন্যবর্গের, তথা রসিক নাগরকদের, রতিতৃষ্ণা চরিতার্থ করার প্রবণতা অনেকাংশে প্রশ্রয় পেয়েছে এমন মনে করা অসঙ্গত নয়। অন্যান্য শিল্পের মতই টেরাকোটার জগতেও রাজা, রাজন্য, শ্রেষ্ঠীদের উপভোগ তৃষ্ণার প্রতিফলন সুস্পষ্ট। টেরাকোটা-শিল্পের আদিম জগতের একাংশে

ঐতিহাসিক ইঙ্গিত অবহেলার বস্তু নয়। দ্বিতীয়তঃ শ্রীহর্ষের নৈষধচরিত বা ধোয়ীর পবনদূত, জয়দেবের গীতগোবিন্দ বা গোবর্ধনের সপ্তশতী সর্বত্রই যেন শৃঙ্গাররসের প্রাবল্য একটু বেশি। সাহিত্যের এই চিত্র সাধারণভাবে সমসাময়িক সমাজের প্রতিফলন, এবং এই সমাজ রাজসভাপুষ্ট অভিজাত সমাজ।"

—বাঙালীর ইতিহাস (সংক্ষেপিত) নীহাররঞ্জন রায় ঃ পৃষ্ঠা ৩৯৪-৩৯৫ লেখক সমবায় সমিতি ঃ ১৩৮২ (কে, এল, এম, প্রকাশিত)।

৭৯ বাঙালীর ইতিহাস (সংক্ষেপিত) —ডাঃ নীহার রঞ্জন রায়।

সাধারণ মানুষের সরল-সহজ অকৃত্রিম আশা-আকাঙ্খার পরিচয় মুদ্রিত থাকলেও পরবর্তীকালে আর্থ-সামাজিক বিবর্তনের ফলে উদ্ভূত নাগরিক শ্রেণীর বিচিত্র রুচির প্রভাবজাত একশ্রেণীর টেরাকোটা মূর্তিকার আবির্ভাব ঘটেছে। গ্রামকেন্দ্রিক কৃষিঅর্থনীতি থেকে, ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারের ফলে, বিকশিত সওদাগরী অর্থনীতির সম্প্রসারিত ক্ষেত্রে সমাজের উত্তরণ ঘটেছে। উদ্বৃত্তভোগী ভূস্বামীদের বিচিত্র সম্ভোগতৃষ্ণার সঙ্গে নগর-বন্দরে গজিয়ে ওঠা বণিকশ্রেষ্ঠীদের আশা-আকাঙ্খা যুক্ত হয়েছে। নগর বন্দরের টেরাকোটা জগতে তাই অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই সম্ভোগমনস্ক একশ্রেণীর প্রভাবশালী মানুষের রতিতৃষ্ণা চরিতার্থ করার প্রবণতা দেখা দিয়েছে টেরাকোটা-শিল্পে। আদিম-অকৃত্রিম একান্তভাবে ধর্মীয় প্রথাবন্ধ যক্ষী ইত্যাদি উর্বরতার দেবতাদের উপর এই সম্ভ্রান্ত নাগর-রুচির প্রতিফলনের ফলে এ গুলির বিলাস-সচেতন নাগরিক রূপান্তর ঘটেছে। এ প্রসঙ্গে ডঃ নীহাররঞ্জন রায়ের মৌর্যোত্তর যুগের টেরাকোটা মূর্তিকা সম্পর্কে উক্তি প্রণিধান-যোগ্য।[৮০] ডঃ নীহাররঞ্জন রায় মথুরা থেকে পাওয়া (কিছু বুদ্ধ-বোধিসত্ব মূর্তি থাকলেও অধিকাংশই যক্ষী, বৃক্ষিকা, অপ্সরামূর্তি) উন্নত-রিলিফ-রীতির (খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের বলে অনুমিত) কিছু ভাস্কর্য-নিদর্শনের সমগোত্রীয় শুঙ্গ-কাণ্ব-কুষাণ যুগের টেরাকোটা মূর্তিকার (ভারহুত, সাঁচী, বুদ্ধগয়ার ভাস্কর্য রীতির সঙ্গেও মিল অস্বীকার করা যায় না) প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন আদিম যুগের সরল সহজ অকৃত্রিম যক্ষীমূর্তিগুলির এগুলি লাস্যময়-বিলাস-সচেতন নগর-সংস্করণ। আদিতে এই সমস্ত উর্বরতা-দেবীদের নিরাবরণ যৌন-অঙ্গগুলি প্রজননের প্রথাবদ্ধ ধর্মীয় প্রতীকরূপেই

---

80 In the sort of urban Sophistication and delicate tastefulness that are unmistakable in the post-Maurya terracottas or in the consciously langourous attitudes, sensuous bhangas and luxurious ornamentation of the yaksinis of Barhut and Bodgaya, one can easily see the social ideology of the upper and middle class patrons and donors. "Maurya And Post-Maurya Art" Nihar Ranjan Roy. (P. 74) Indian Council of Historical Research : New Delhi 1975.

কুণ্ঠাহীনভাবে প্রকট করা হ'ত ধর্মীয় শাসন মেনে। কিন্তু এ যুগে (শুঙ্গ-কুষাণ) মূর্তিকাগুলির উপর নগরের সম্ভোগ-মনস্কতার প্রতিফলনের ফলে মূর্তির রূপারোপে এক উপভোগ-সচেতনতার বিকাশ লক্ষ্য করা গেল। পূর্বকালে বা আদিমযুগে এক ধর্মীয় সংস্কার বশে যক্ষী-অপ্সরা-বৃক্ষিকা প্রমুখ প্রজনন-দেবতাদের যেসব যৌন-অঙ্গপ্রত্যঙ্গ-কে প্রজনন-পালন ও প্রাচুর্যের উৎসরূপে বা প্রতীক রূপে প্রথাবদ্ধ রীতিতে সম্পূর্ণ নিরাবরণ করে দেখানো হত, এযুগে (শুঙ্গ-কুষাণ যুগে) বিশেষ করে, সেগুলিকে রতিসচেতনতার ইঙ্গিতময় বাহন করে তোলা হ'ল। অপেক্ষাকৃত দীর্ঘাঙ্গী (তন্বী) এই নারী মূর্তিগুলির সৌষ্ঠবযুক্ত যুগল চরণ, কিংবা সুডৌল-সুগোল স্তন, এবং গুরু নিতম্ব, সর্বোপরি দেহবল্লরীর ভঙ্গি এবং কান্তিনির্মাণে উদ্ভাসিত সংবেদনশীল ছন্দোময় রূপসৃষ্টিকে কেন্দ্র করে যে এক সচেতন সম্ভোগ-মনস্কতার আভাস পরিস্ফুট হল, তা বিলাসকেলি-সচেতন নাগরিক-বুর্জোয়া রুচিরই প্রতিফলন। মথুরা-শিল্পকেন্দ্রের ঐতিহ্যমণ্ডিত দেশীয় বর্ণনাত্মক রীতিতে নির্মিত (নির্মাণ শৈলীর বিচারে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের) এমনি কিছু প্রসাধনরত কিংবা লীলাশুক সহ [৮১] ক্রীড়ামগ্ন রতি-সচেতন রূপলাস্যযুক্ত যক্ষী-বৃক্ষিকা-অপ্সরা মূর্তির সঙ্গে বিষয়-বস্তু এবং নির্মাণরীতির দিক থেকে সমসাময়িক শুঙ্গ-কুষাণ যুগের একশ্রেণীর টেরাকোটা-যক্ষী ইত্যাদি মূর্তিকার-সাদৃশ্যের কথা বলেছেন নীহাররঞ্জন। ভারহুত-সাঁচী-বুদ্ধগয়ার যক্ষীমূর্তিগুলির রূপমণ্ডনে অনুরূপ সমগোত্রীয়তা অনস্বীকার্য। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় মনে করেন, এ ধরণের রক্ত-মাংসের উষ্ণ আবেদনযুক্ত জীবন্ত রূপনির্মাণে সম্ভোগ-মনস্ক সৌখীন বুর্জোয়া রুচির প্রকাশ এ যুগেই প্রথম ভাস্কর্য-শিল্পে সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়। [৮২]

---

৮১ বাঁকুড়া জেলার পোখর্ণা থেকে প্রাপ্ত (খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক বলে অনুমিত) টেরাকোটা যক্ষী-মূর্তিকার হাতে ধরা একটি পাখি লক্ষ্য করা যায়।

82 *The continuity of the indigenous tradition of narrative reliefs is however best represented by a series of high relief sculptures on the flat background of the front sides of uprights and pillar bases picked up from the different sites of Mathura. Most of these seem*

শ্রেণী-মাহাত্ম্যে, বুর্জোয়া-মানসিকতায় সম্ভোগ-চেতনা সদাবর্তমান। শ্রেণী-চেতনা অপ্রতিরোধ্য। ধর্ম, দর্শন, সাহিত্য শিল্প, নন্দনতত্ত্ব প্রভৃতি সমস্তকিছু সৃষ্টির মধ্যে স্রষ্টার শ্রেণী চরিত্রের প্রকাশ অবশ্যম্ভাবী। ধর্ম বা ধর্মীয়-প্রতিষ্ঠান যখনই বিত্তবানের আশ্রয় নিয়েছে তখনই তাদের আভিজাত্য আর আশা-আকাঙখার ছাপ পড়েছে ধর্ম-প্রতিষ্ঠানের উপর। বৌদ্ধ-জৈন অথবা ব্রাহ্মণ্যধর্ম যখনই তার প্রাতিষ্ঠানিক প্রসারের জন্য বিত্তবানের শরণাপন্ন হয়েছে তখনই তার গায়ে বিশেষ বিশেষ আভিজাত্যের ছোপ লেগেছে। এমনি করেই ভারতের ধর্মকেন্দ্রিক শিল্পকলা এবং সাহিত্যে, বণিক-শ্রেষ্ঠী, রাজা-বাদশাহ, জমিদার মনসবদারদের আশা-আকাঙ্খা তথা আভিজাত্যের প্রকাশ ঘটেছে। কারণ অধিকাংশ অভিজাত শিল্প-সাহিত্য এই ধনাঢ্য শ্রেণীরই কৃপাপুষ্ট। এও দেখা যায় যে, শিল্প-সাহিত্যে ঐসব সম্পন্ন শ্রেণীর সম্ভোগময় বিলাস জীবনেরই প্রতিফলন প্রাধান্য লাভ করেছে। এই সম্ভোগ-বিলাসের মাধ্যমেই সামাজিক ধনের উদ্বৃত্ত এবং অখণ্ড অবসরভোগী এইসব সম্পদশালী মানুষের শ্রেণী-চরিত্রটি অকুণ্ঠভাবে উদ্ঘাটিত হয়েছে। ধর্ম-মন্দিরের চিত্র-ভাস্কর্যেও এই শ্রেণীর সম্ভোগ-চেতনার উদ্ধত প্রকাশ এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। শুধু তাই নয়, ক্ষেত্রবিশেষে এই শ্রেণীর-বল্গাহীন কামকেলি অথবা নারী সম্ভোগের অনুপুঙ্খ বর্ণনাত্মক-চিত্রমালা সদম্ভে এবং সগৌরবে ধর্মমন্দিরে স্থান

---

to belong, stylistically speaking, to the second century A. D., and while a few represent Buddhas or Bodhisattvas and male figures, the large majority shows nude or semi-nude, female figures of Yaksis, Vriksakas or apsaras in consciously sensuous attitudes emphasising fertility ; or women engaged in toiletting themselves, Or playing with pet birds. An intimate connection with the terracottas of Sunga Kanva-Kusan periods is atonce suggested, both in theme and treatment ; a lineal relationship with the Yaksis and Vriksakas of Barhut, Bodhgaya and Sanci is also equally undeniable. But what in earlier times had been spontaneous movement has now become conscious gestures, and what stood

লাভ করেছে। ভূম্যধিকারী শ্রেণীর এই আভিজাত্যের চিত্রে প্রতিপত্তি এবং আধিপত্যের সদম্ভঘোষণা। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজারা ছিলেন মোগল যুগের সামন্ত-জমিদার। তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত বৈষ্ণব মন্দিরের টেরাকোটায় মোগল যুগের সামন্ত-জগতের সম্ভোগলীলা সবিস্তারে বর্ণিত হয়েছে। বিষ্ণুপুরের "জোড়বাংলা" মন্দিরের ভিত্তি সংলগ্ন একটি "পটিতে" (পটিটি সমস্ত মন্দিরের ভিত্তি বেষ্টন করে আছে) নারীসম্ভোগ সহ সামন্তবিলাসের চিত্রগুলি সদম্ভে আত্মপ্রকাশ করেছে। চিত্রগুলিতে সামন্ত-অর্থনীতি এবং রাজনীতির ফলে বিকশিত জমিদার শ্রেণীর আধিপত্য ও প্রভুত্বের চরিত্রটিও উদ্ঘাটিত হয়েছে। বিচিত্র উৎপাদন ব্যবস্থার ফলে সমাজের শীর্ষদেশে অবস্থিত শাসককুলকে কেন্দ্র করে স্তরবিন্যস্ত যে উচ্চ অভিজাত শ্রেণী বিরাজ করত প্রাচীন এবং মধ্যযুগে অভিজাত সাহিত্য এবং শিল্পকলার একটি বড়অংশে তাদের বিলাস জীবনের ছাপ পড়েছে। বিত্ত এবং অখণ্ড অবসরভোগী এই অভিজাত সম্প্রদায়ের মানসপটে এক সম্ভোগমনস্ক রতি-বিলাসের যে জাগর স্বপ্ন বিরাজ করত স্বাভাবিকভাবেই তা শিল্পকলায় প্রতিফলিত হত। কারণ এসব যুগে অভিজাত সাহিত্য আর শাস্ত্রের অধিকাংশই ছিল সভাশ্রয়ী। শিল্প-কলা-সাহিত্যের পশ্চাদ্‌বর্তী শাস্ত্র-সাহিত্যের যে প্রেক্ষাপট, যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে চিত্র-ভাস্কর্যকে অনুপ্রাণিত বা প্রভাবিত করত তার রচয়িতা কবি বা শাস্ত্রকাররা বৃত্তি, পারিতোষিক বা ভূমি-জমির সূত্রে রাজসরকারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নীহাররঞ্জন রায় মনে করেন, শিল্পীরাও সমকালীন ধনাঢ্য ব্যক্তিদের এবং সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের আশা-আকাঙ্খা এবং বিশিষ্ট রুচিগুলির সঙ্গে পরিচিত ছিলেন।[৮৩]

---

as symbols and emblems have now become vehicles of sensuous or even erotic suggestiveness." MAURYA AND POST-MAURYA ART. Dr. Nihar Ranjan Roy (P. 86) Indian Council Of Historical Research. New Delhi. 1975

83 *In any case, these artists and craftsmen seem to have combined in them the knowledge and experience of the social ideology of*

রাজা বা জমিদারের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত মন্দিরের ক্ষেত্রে যে পূর্ণ রাজকীয় কর্তৃত্ব বজায় থাকত তা প্রতিষ্ঠা-লিপি থেকেই বোঝা যায়। রাজার লোক এসব মন্দিরের তত্ত্বাবধান করতেন। মন্দিরের শিল্প-নির্দেশকও রাজরুচি অথবা সমকালীন সামন্তরুচির খবর রাখতেন। বিশেষ বিশেষ ধর্ম মন্দিরের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ধর্মতত্ত্ব সম্পর্কে অভিজ্ঞ ধর্মযাজক বা মোহান্তরাও ক্ষেত্র বিশেষে তদারক এবং তত্ত্বাবধান করতেন রাজার-অনুরোধে। বিষ্ণুপুরের শ্যামরায় মন্দিরের গর্ভগৃহের টেরাকোটায় রাজা-যুবরাজ এবং রাজার সরকারের নাম (রাজকর্মচারী) ছাড়াও কয়েকজন বৈষ্ণব (?) যাজক বা মোহন্তর নাম আছে। অতএব প্রকারান্তরে রাজা বা রাজসভার আকাঙ্খাই প্রতিফলিত হত, রাজাদের বা জমিদারদের মন্দিরে একথা অনুমান করা যেতে পারে। অনেকে মনে করেন রাজসভা-নারী বা রতিকলা-কুশলা 'রাজ-গণিকা'দের আদর্শে অনেকক্ষেত্রে মূর্তির (ক্ষেত্রস্থলে দেবীমূর্তির) রূপারোপ করতেন চিত্রী বা ভাস্কররা।[৮৪] মহারাষ্ট্রের 'টার' গ্রাম (ওসমানাদের সন্নিকট) থেকে প্রাপ্ত একটি গজদন্ত নির্মিত 'লক্ষ্মী' বা শ্রীমূর্তির বিচিত্র রূপারোপের প্রসঙ্গ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রখ্যাত শিল্প-সমালোচক মোতিচন্দ্র একথা বলেছেন। আলোচ্য গজদন্তনির্মিত মূর্তিটির ইন্দ্রিয়পরায়ণ বিচিত্র রূপান্তরটি তাৎপর্যপূর্ণ এবং উল্লেখযোগ্য। প্রস্তর-ভাস্কর্যে সুনির্দিষ্ট শাস্ত্রীয় অনুশাসন অনুসারে নির্মিত 'লক্ষ্মীমূর্তি' থেকে এ মূর্তি ভিন্ন। মূর্তির অঙ্গে রুচিসম্মত অলংকার প্রাচুর্য থাকলেও সম্পূর্ণ নিরাবরণ এই মূর্তিটিকে যথার্থ উর্বরতার লক্ষণযুক্ত করেই গড়া হয়েছে। মূর্তিটির উপরে একটি রতিচেতনার প্রলেপ লক্ষ্য করেছেন সমালোচক।

---

the upper classes and of urban life on the one hand, and that of the lower and despised castes and classes and their aboriginal life on the other." MAURYA AND POST-MAURYA ART. Nihar Ranjan Roy. Page 74.

84 *The detailed examination of the iconographic and literary source should convince that the striratnas of the Chakravartin embodies the concept or Sri Lakshmi, the patron-goddess of the regal authority. The representation of Sri Lakshmi in sculpture is*

ভারতের শিল্পকলা এবং সাহিত্যের প্রাচীন ও মধ্যযুগের প্রেক্ষাপটটি রাজা আর দেবতা-কেন্দ্রিক তো বটেই, পার্থিব-রাজা এবং স্বর্গের-দেবতা এখানে প্রায় সমাহৃত। রাজা, রাজ চক্রবর্তী, রাজবৈভব এবং রাজসভার আদলেই দেবসভার পরিকল্পনা। পার্থিব-রাজার বিলাস-সম্ভোগের আদর্শেই অপ্সরা-কিন্নরীদের নিয়েই দেবতাদের চিত্তবিনোদনের আয়োজন। পুরাণ বা পৌরাণিক-সাহিত্যে পৃথিবীর রাজাদের, স্বর্গের দেবতাদের পক্ষে দানবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের কথা আছে। এ যেন স্বর্গ-মর্তে সামন্তপ্রথার বিচিত্র বিস্তার। দেবতাদের অস্ত্র-শস্ত্র, সাজ-সজ্জা, বাহন সবই মর্তের রাজাদের অনুরূপ। শুধু তাই নয়, সমকালীন রাজপরিচ্ছদের আদলেই দেবতা বা দেবসেনাপতিদের পরিচ্ছদ নির্মাণও টেরাকোটা-মন্দিরে লক্ষ্য করা যায়। শিল্প-সাহিত্যের জগতে এই ভুস্বামী রাজা-মহারাজা ছাড়াও ব্যবসা বা বহির্বাণিজ্যের কল্যাণে নগর-বন্দরে বিকশিত বণিক-শ্রেষ্ঠী সম্প্রদায়ের সওদাগরী-সম্ভোগমনস্কতার যে একটি বিশেষ ভূমিকা আছে, সেটা আগেই বলা হয়েছে। প্রস্তর ভাস্কর্যে প্রধানতঃ ভূস্বামীদের আশা-আকাঙ্খা অধিকতর প্রতিফলিত হয়। সমাজ-রাজনীতি ক্ষেত্রে নিয়ামক এই শ্রেণীর আশা-আকাঙখায় একটি প্রতিষ্ঠানিক বাতাবরণ প্রায়ই উপস্থিত থাকে। কিন্তু টেরাকোটার সুপরিসর উদার জগতে সর্বসাধারণের নির্বাধ এবং অকুণ্ঠ প্রবেশ। এখানে প্রজনন-কেন্দ্রিক দেব-জগতের উপর সওদাগরী-সম্ভোগমনস্কতার প্রতিফলনে আদিম লোকায়ত দেবতাদের বিচিত্র-বিবর্তন অধিকতর সুস্পষ্ট। প্রজনন-প্রাচুর্যের আদিম লোকদেবতা যক্ষীমূর্তিগুলির উপর সওদাগরী-সম্ভোগমনস্কতার প্রলেপ পড়ে মূর্তিগুলির অঙ্গ-ভঙ্গিমা তথা রূপ রচনায় উচ্চারিত লীলাবিলাস কেমন করে আদিম

---

discreet, but in the ivory figurines the goddess is noted for her voluptuousness and eroticism, the traits which she shares with the Yakshi figures from Mathura. Sri Lakshmi is primarily a goddess of fertility and to a lesser extant a goddess of beauty. It should therefore cause no surprise that in keeping with her character as a goddes of fertility her nudity should be emphasized. One could however enquire about the iconographic source fcr such kind of

ধর্মীয় নিদর্শনগুলির অনাধ্যাত্মিক (বা অনেকাংশে ধর্মীয় শাসনমুক্ত 'সেক্যুলার') রূপান্তর ঘটিয়েছে তাও এই টেরাকোটা-শিল্পের জগতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়। সবচেয়ে বড় কথা হ'ল, মৌর্য-শুঙ্গ-কুষাণ যুগের টেরাকোটা-জগতের বিচিত্র বিবর্তনের মধ্যেই উপলব্ধি করা যায়, একটি বিশিষ্ট শ্রেণীর বিকাশ। বহির্বাণিজ্যের ফলে বিকশিত সুবিধাভোগী সম্ভোগমনস্ক মধ্যবিত্ত পর্যায়ের এই শ্রেণীর আশা-আকাঙ্খাকে কেন্দ্র করেই টেরাকোটা-জগতের এই রূপান্তর, এটা মনে করা অসঙ্গত নয়। কারণ এই শ্রেণীর মানুষরা শুধু সৌখীন শিল্প-দ্রব্যের সংগ্রাহক মাত্র নয়, এই সম্ভোগ-রতিসচেতন নাগরিক শ্রেণীর তীব্র রূপতৃষ্ণা শিল্প-সৃষ্টির পিছনে প্রেরণা রূপেও কাজ করে। কবি দার্শনিক-নন্দনতত্ত্ববেত্তা সকলেই কমবেশী এই শ্রেণীরই অন্তর্ভুক্ত। মৌর্য-শুঙ্গ-কুষাণ যুগের কোন শাস্ত্র-সাহিত্যের সুস্পষ্ট নজীর পাওয়া যায় না। কিন্তু এসব যুগের টেরাকোটা-শিল্প জগতে এমন বেশকিছু সার্থক উন্নতমানের নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে যেগুলি ভারতের সমুন্নত ভাস্কর্য-শিল্পের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। সাধারণতঃ এ ধরণের সুসংগঠিত রূপনির্মাণের পিছনে উন্নত শাস্ত্র-সাহিত্যের প্রেরণা থাকে। মৌর্য-যুগের বলে অনুমিত একাধিক টেরাকোটা মূর্তিকার অত্যাশ্চর্য রূপনির্মাণ এপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এগুলিতে যক্ষীমূর্তির রতি-সচেতন রূপান্তর সুস্পষ্ট। পাটনার গোলকপুর থেকে প্রাপ্ত মৌর্যযুগের বলে অনুমিত এমনি একটি টেরাকোটা-নারী মূর্তিকার উল্লেখ এখানে প্রাসঙ্গিকভাবেই করতে হয়। বিশিষ্ট শিল্প-সমালোচক সরসীকুমার সরস্বতী এই মুণ্ডহীন মূর্তিকায় পূর্ণ প্রস্ফুটিত রমণীরূপের অত্যাশ্চর্য বিকাশ লক্ষ্য করেছেন। মৃত্তিকা নির্মিত এই মূর্তির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে শিল্পী যেন রক্তমাংসের উষ্ণ আবেদনকে দৃষ্টিগ্রাহ্য করে তুলতে চেয়েছেন। মূর্তিকার গঠনে ডৌলে শুধু উন্নত কারিগরীই নয়, এক রোমান্টিক কবি কল্পনাও যেন সোচ্চার হয়ে

---

figures. To our mind, courtesans, employed in royal court, who were noted for their knowledge of 'ars amoris' and coquettishness served as models to the artists carving the figures of mother goddess". Ivory Figure From Ter. LALIT KALA, No. 8, Oct 1960 Page 14

উঠেছে। সুডৌল-সুগোল দুটি স্তন চূড়ায় দুই স্তনবৃন্তের নিপুণ বিন্যাসে এক সংবেদনশীল রোমাঞ্চ সৃষ্টির প্রয়াস সুস্পষ্ট। মামুলি কণ্ঠহার কিংবা বিলম্বিত মালার পরিবর্তে একবিচিত্র ধরণের রত্নহার বাঁ-কাঁধ থেকে নেমে এসে বরতনুকে কোনাকুনিভাবে বেষ্টন করেছে। উদরদেশে একরত্নময় উদর-পেটিকার অভিনব সন্নিবেশ। কটিতট বেষ্টন করেছে চারনরির মণিময় মেখলা। অলঙ্কারগুলি আলাদা-ভাবে তৈরী করে মূর্তিদেহে জুড়ে দেওয়া হয়েছে। মূর্তির সর্বাঙ্গজুড়ে শুধু রূপ নয়, এক সম্ভোগ-সম্মোহের নিপুণ এবং সচেতন আয়োজন। প্রখ্যাত শিল্প সমালোচক স্টেলা ক্রামরিশ মূর্তিটিকে যক্ষী মূর্তির পরিবারভুক্ত করতে চেয়েছেন। বুলন্দিবাগ এবং তমলুক থেকে পাওয়া যক্ষীমূর্তিগুলির অঙ্গজুড়ে এমনি রূপের কুহক সৃষ্টি করেছেন শিল্পীরা। প্রথাগত অলঙ্কার-প্রাচুর্যের স্থূল জড়ত্বকে অতিক্রম করেও মূর্তিগুলির রূপলাবণ্য যেন উছলে পড়ছে। বুলন্দি-বাগ থেকে পাওয়া দুটি মূর্তির (মৌর্য যুগের বলে অনুমান করা হয়েছে) একটির হাতের গঠনে নৃত্য-ভঙ্গিমা। দ্বিতীয়টির অঙ্গের কান্তিনির্মাণে পেলব সংবেদনশীল কমনীয়তা। দেহের সূক্ষ্ম বসন সর্বাঙ্গে সেঁটে বসে যাওয়ায় তার স্বচ্ছতার মধ্যদিয়ে অঙ্গসুষমার অকুণ্ঠ প্রকাশ। তমলুকের এমনি একাধিক যক্ষীমূর্তির দেহে সম্ভোগ-সচেতন কান্তিনির্মাণ সঙ্গতই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তমলুক থেকে সংগৃহীত "অক্সফোর্ড-যক্ষী" নামে খ্যাত মূর্তিকার রূপনির্মাণে এমনি এক অসাধারণ শিল্পচাতুর্য পরিলক্ষিত হয়। কমনীয় নমনীয় এই মৃত্তিকামূর্তির অঙ্গজুড়ে রক্তমাংসের সজীব-সংবেদনশীল আবেদন শিল্পী সার্থকতার সঙ্গে পরিস্ফুট করেছেন। সালঙ্কারা এই মূর্তি সম্পূর্ণ ছাঁচে গড়া। প্রথাগত অলঙ্কার প্রাচুর্যে মূর্তিকাটি ভারাক্রান্ত হলেও তা সুষমামণ্ডিত দেহলাবণ্যের আকর্ষণীয় আবেদনকে ঢেকে দিতে পারেনি। দেহের সূক্ষ্মবসনে সম্ভোগ-রতিচেতনার যেন এক নিগূঢ় ইঙ্গিত। "বসনের আবরণে সূক্ষ্ম সংবেদনশীল অবয়বের পুরন্ত নমনীয় ডৌলে দীর্ঘ পরিশীলনজাত কৌশলের অনায়াস প্রতিফলন যেমন স্পষ্ট, তেমনি আপাদমস্তক দেহকে অলংকারের প্রাচুর্যে প্রায় ভারগ্রস্ত করার মধ্যে এক অতিপ্রাকৃত অস্তিত্বের ইঙ্গিতও লক্ষ্য

করা যায়।"[৮৫] স্টেলা ক্রামরিশের মতে অপূর্ব দেহলাবণ্যের অধিকারিণী এই টেরাকোটা-মূর্তিকা সাগর মন্থনে উত্থিতা পঞ্চচূড়-অপ্সরার। অন্যদিকে অধ্যাপক জনস্টন এটিকে মাতৃকা-মূর্তি বলে অভিহিত করেছেন। মূলতঃ যক্ষী, মাতৃকা একই পরিবারভুক্ত বা সমগোত্রীয় প্রজনন প্রতিমা। কোন এক আদিম কৌম-সংস্কৃতি থেকে মূর্তিগুলি বিবর্তিতরূপে ভারতীয় সাহিত্য বা মূর্তিশিল্পের জগতে প্রবেশলাভ করেছে। মূর্তিশিল্পের জগতে সম্ভোগমনস্ক কাব্যিক আবেদন সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে এই মূর্তিগুলির অবদান অসামান্য। কি টেরাকোটা কি প্রস্তরভাস্কর্যে তীব্র সংবেদনশীল রূপের জগৎ সৃষ্টি করার জন্য শিল্পী এই যক্ষী, অপ্সরা, বৃক্ষিকা মূর্তিগুলিকে সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহার করেছেন। শুঙ্গ-কুষাণ যুগের বর্ণনাত্মক টেরাকোটা-চিত্রেও এমনি অসাধারণ কাব্যময়তার সঙ্গে তীব্র সম্ভোগচেতনার মূর্ত প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। কৌশাম্বী থেকে প্রাপ্ত এমনি কিছু টেরাকোটায়, এপ্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। এখানের টেরাকোটাগুলির একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে 'মিথুন', 'দম্পতি', 'শুকক্রীড়া', 'সুরাসম্ভোগ' (Bacchanalian Scenes) এবং গীতবাদ্য বিষয়ক বিচিত্র সব টেরাকোটা। 'শুকক্রীড়া'র টেরাকোটা-চিত্রগুলি যেন এক একটি খণ্ড লিরিক কবিতা। বর্ণনার বৈচিত্র্যে, ব্যঞ্জনা ও দ্যোতনার সমৃদ্ধ প্রয়োগে, কল্পনার সমুন্নত বিকাশে চিত্রগুলি অনন্য। কোন টেরাকোটা ফলকে দেখা যায়, একটি পাখী এক রমণীর মেখলার বাঁদিকে বসে তার স্তন স্পর্শ করছে। কোথাও দেখা যায়, এক নারী ডান হাতে একটি শুকপাখী ধরে আছে—পাখীটি দাড়িম্ব ভ্রমে নারীর বিম্বাধর স্পর্শ করতে চাইছে। কোন চিত্রে দেখা যায়, সদ্যস্নাতা কোন রমণীর সিক্ত কেশদাম থেকে ঝরে পড়া বারিবিন্দুকে যেন বৃষ্টি বিন্দু মনে করে একটি পাখী তা পান করছে। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রীষ্টাব্দ তৃতীয় শতক পর্যন্ত সময়ে ভারতীয় ভাস্কর্যে, (কি টেরাকোটায় কি প্রস্তর ভাস্কর্যে) ব্যাপক বৈচিত্র্য এবং বিবর্তন বিশেষভাবে অনুভূত হয়। এসময়ে, টেরাকোটা-চিত্রগুলির পাশাপাশি প্রস্তরভাস্কর্যে যে

৮৫ বাংলার ভাস্কর্য : কল্যাণকুমার গঙ্গোপাধ্যায় : পৃঃ ৮, সুবর্ণরেখা কলিকাতা ১৯৮৬

অগণিত নারী মূর্তির ভিড় লক্ষ্য করা যায়, ভারহূত, সাঁচী অমরাবতীতে, তাদের অধিকাংশই অন-আর্য যক্ষী তথা মাতৃকা-মূর্তির রূপান্তরিত প্রতিমা। বিভিন্ন লোকস্তর থেকে আগত এইসব অন-আর্য মূর্তি আর্য নন্দন চিন্তার সমৃদ্ধ সংস্কৃত স্পর্শ লাভ করে এক রূপময়-রসময় শিল্পজগৎ রচনা করেছে। এই সুবিশাল মূর্তিজগতে হিন্দু-পৌরাণিক জগতই আভাসিত। আর্য, অন-আর্য মিলন মিশ্রণেই এই জগৎ রূপলাভ করেছে। আর্য সংস্কৃতির সুসমৃদ্ধ কেন্দ্র ছিল নগর। যে কোন উন্নত সভ্যতায় নগর-সংস্কৃতির সুবিকশিত রূপটিরই প্রাধান্য। বারাণসী, রাজগীর, বৈশালী, তক্ষশীলা, মথুরা, প্রয়াগ বা এলাহাবাদ ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ এবং জৈনধর্মের বিকাশ কেন্দ্র। সিন্ধু-সভ্যতা থেকে আরম্ভ করে গাঙ্গেয় সভ্যতার সমস্ত শিল্পকেন্দ্রগুলিই নগরকেন্দ্রিক। নাগর-সংস্কৃতির অধিকাংশ প্রাচীন কেন্দ্র থেকেই উন্নতমানের প্রস্তর এবং টেরাকোটা ভাস্কর্যের নিদর্শনগুলি আবিষ্কৃত হয়েছে। গ্রাম্য সমাজের আদিম-ধর্মীয় মূর্তিগুলি নগর সমাজের প্রয়োজন এবং প্রেরণায়, সূক্ষ্ম, সংস্কৃত নান্দনিক চিন্তার প্রভাবে আভিজাত নাগর-সংস্কৃতির নূতন স্তরে উন্নীত হয়ে বিদগ্ধ সম্ভোগমনস্ক রূপলাভ করেছে। প্রস্তর-ভাস্কর্যে, নাগর-সংস্কৃতি-প্রসূত শিল্পরূপের উন্নততর বিকাশ লক্ষ্য করা গেলেও টেরাকোটা জগতেই এই উত্তরণের ক্রমটি অধিকতর সুস্পষ্ট। শুঙ্গ-কুষাণ যুগের একশ্রেণীর টেরাকোটা-নারী-মূর্তির সম্ভোগমনস্ক রূপ নির্মাণে উত্তরভারতের সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে একটি যুগসন্ধির তথা সমাজবিবর্তনের আভাস লক্ষ্য করেছেন নীহাররঞ্জন।[৮৬]

---

৮৬ স্থূল কৌম সমাজ ধীরে ধীরে সমৃদ্ধ ও সচেতন নাগর-সমাজে বিবর্তিত হইতেছে মাত্র। এই অবস্থার সমাজ-বিবর্তনের এই স্তরের ছবিই ধরা পড়িতেছে পোড়ামাটির এই অসংখ্য ফলকগুলিতে, স্বল্পাংশে বুদ্ধগয়ার বেষ্টনীর উপর, কিন্তু আরও উচ্চারিত রূপে মথুরার কয়েকটি প্রস্তর বেষ্টনীর গায়ে। কিন্তু এই প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে রুচিবোধ আরও একটু সূক্ষ্ম ও অভিজাত, মন ও দৃষ্টি আরও সচেতন, এবং কারুকলার আঙ্গিক আরও সুনিপুণ। তবে সামাজিক

টেরাকোটার সুপরিসর জগতেই অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে দেখা যায় সমাজগঠন ও সমাজের বিকাশ-বিবর্তনের বিভিন্ন দিক। শ্রেণী বিভক্ত নগর-সমাজের তাৎপর্যপূর্ণ গঠনটিও এই টেরাকোটার জগতে দুর্নিরীক্ষ্য নয়। শ্রেণী বিভক্ত সমাজ-ব্যবস্থা নগর সভ্যতার স্বধর্ম। টেরাকোটার জগতে, বিপরীত ধর্মী দুধরণের টেরাকোটা-নিদর্শনের মাধ্যমে নগর-সমাজের শ্রেণীবিভাগ সুস্পষ্টরূপে ধরা পড়ে। একদিকে সম্ভোগমনস্ক সুবিধাভোগী উচ্চ ও মধ্যবিত্তস্তরের মানুষের দুর্নিবার আশা-আকাঙ্খাকে অবলম্বন করে সমুন্নত কারুকলার প্রয়োগে অপরূপ রূপনির্মাণ, কিংবা গভীর মনন-সমৃদ্ধ অত্যুন্নত ধর্মদর্শনের মূর্ত প্রতীক সুসমৃদ্ধ দেবতা-জগৎ রচনা, অন্যদিকে স্থূলরীতির প্রায় অবয়ব বিহীন আড়ষ্ট-গঠনের 'জড়োপাসনা'র নিবেদন-প্রতীক গ্রাম্য কৃষিজীবী পর্যায়ের টেরাকোটা-নিদর্শন। দুটি সুস্পষ্ট মেরু বিভাজন। একটিতে সুবিধাভোগী উচ্চকোটি নাগরিক বা 'নাগরকদের' আশা-আকাঙ্খার অভিব্যক্তি, অন্যটিতে নগর সমাজের নিম্নকোটি মানুষের ভাবলেশবিহীন সহজ-সরল অনেকাংশে আদিম আকাঙ্খার সংক্ষিপ্ত আত্মপ্রকাশ। এই চিত্র প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে ঐতিহাসিক তথা আধুনিক কাল পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত। সিন্ধুসভ্যতার যুগে নগর-কেন্দ্রগুলিতে আবিষ্কৃত স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রশিল্প (কৌলালগাত্রে) ও সূক্ষ্ম মৃৎপাত্র নির্মাণের নজিরে নগরসমাজের শ্রেণী বিভাজন চিহ্নিত করেছেন গবেষকরা। এখানে প্রাপ্ত বা এরও পূর্ববর্তী অধ্যায়ের অন্যান্য স্থান থেকে সংগৃহীত সম্পূর্ণ হাতে গড়া স্থূলরীতির টেরাকোটা-নিদর্শনগুলিকে কৃষিজীবী মানুষের শিল্পরূপে গণ্য করা হয়েছে। সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হ'ল, যখন গাঙ্গেয় উপত্যকায় দ্রুত নগরবিকাশকে কেন্দ্র করে টেরাকোটার জগতেও সমুন্নত বিবর্তন

বিবর্তনের প্রাথমিক স্তরের স্থূলতর প্রমাণ হিসাবে মৃৎফলকগুলির সাক্ষ্য অধিকতর প্রাসঙ্গিক। বাঙলা দেশে যত এ ধরণের নিদর্শন মৃৎকলা পাওয়া গিয়াছে তাহার সঙ্গে কৌশাম্বী-পাটলিপুত্র বসার প্রভৃতি স্থানে প্রাপ্ত খ্রীষ্ট-পূর্ব প্রথম ও খ্রীষ্টোত্তর প্রথম দ্বিতীয় শতকের ফলকগুলির আত্মীয়তা ঘনিষ্ঠ। বাঙালীর ইতিহাস (আদি পর্ব ২য়) নীহাররঞ্জন রায়। পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি। পৃঃ ৭৭৯।

ঘটেছে—ছাঁচের প্রচলনের ফলে উন্নততর প্রযুক্তির সাহায্যে শুঙ্গ-কুষাণ যুগে অপরূপ রূপনির্মাণ এবং মনন-সমৃদ্ধ ধর্মদর্শনের প্রতীক দেববিগ্রহ রচনা সম্ভব হয়েছে, তখনও প্রথমোক্ত শ্রেণীর আদিম চরিত্রের হাতে গড়া প্রায় অবয়ববিহীন 'জড়োপাসনার' প্রতীক টেরাকোটা নিদর্শনগুলি পূর্বাপর প্রতিটি নাগর-প্রত্নক্ষেত্রে সমানভাবে আত্মপ্রকাশ করে নগর-সমাজের শ্রেণী বৈষম্যের ধারাটি সুচিহ্নিত করেছে। বিত্ত আর অবসরের আশীর্বাদে সমন্বিত মুক্ত জীবনের অধিকারী উচ্চকোটি জনস্তরের পাশাপাশি উদয়াস্ত শ্রমে আবদ্ধ চিন্তা-চেতনায় অনগ্রসর নিম্নকোটি মানুষ। প্রথমোক্ত শ্রেণীর স্থূল আদিম অথচ অব্যাহত ধারাবাহী টেরাকোটা-নিদর্শন গুলির চিরায়ত অবস্থানকে বিশেষিত করতে গবেষকরা এই শ্রেণীর টেরাকোটাগুলির নাম দিয়েছেন "চিরন্তন (বা এইজ্‌লেস) রীতি''র টেরাকোটা।[৮৭] অন্যদিকে সৌখীন উন্নতমানের ছাঁচের ব্যবহারে নির্মিত যুগানুযায়ী বিবর্তিত টেরাকোটা-নিদর্শনগুলিকে "কালনিবদ্ধ'' (টাইমবাউন্ড) রীতির নিদর্শন বলে অভিহিত করা হয়েছে। অন্যান্য গবেষকের মতই বিশিষ্ট শিল্পতত্ত্ববিদ্ সরসীকুমার সরস্বতী তাঁর গ্রন্থে টেরাকোটা-জগতের এই দুটি সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট মেরু বিভাজনের কথা বলেছেন এবং একই সঙ্গে সুদূর অতীতকাল থেকে অব্যাহত ধারায় আধুনিককাল পর্যন্ত প্রবাহিত আদিম স্থূলরীতির কৃষিজীবী সংস্কৃতির প্রতীক প্রথমোক্ত 'এইজ্‌লেস রীতির-টেরাকোটার চিরায়ত-ধারাটির কথাও উল্লেখ করেছেন।[৮৮]

---

৮৭ সেই প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু সভ্যতার আমলে সিন্ধুনদীর তীরে বসিয়া সমসাময়িক লোকেরা যে পুতুল তৈরী করিত, বাঙলার গ্রামে নদীর ধারে পুকুরপাড়ে বটের ছায়ে বসিয়া বাঙালী কুমোর, বাঙালী ব্রতধর্মী নারী আজও তাই করে। বাঙালীর ইতিহাস : আদিপর্ব (২য়) নীহাররঞ্জন রায় পৃষ্ঠা ৭৬৬।

88 A Study of Indian terracottas leads us to their broad division into two well-defined groups —One indicating a primitive form and experience and the other showing the impress and formulations of a stylistic advance

টেরাকোটা-জগতের এই মেরুবিভাজন ধর্ম ও সংস্কৃতি-সাধনার ক্ষেত্রে অতি-উন্নত ও অতি-অনুন্নত দুই জনস্তরের যে দুস্তর ব্যবধান সুচিহ্নিত করে. তা গবেষণার পক্ষে তাৎপর্যপূর্ণ ও কৌতূহলোদ্দীপক হলেও সমাজ বা রাষ্ট্রীয় সংহতির ক্ষেত্রে আদৌ সুখকর নয়।[৮৯] একটি অভিজাত সীমাবদ্ধ জনস্তরে শিল্প-সংস্কৃতির সমুন্নত বিকাশ দেশের মহতী বিনষ্টিকে কোনভাবেই রোধ করতে পারে না। মৌর্য যুগ থেকে মোগল যুগ পর্যন্ত ভারতের শিল্প-সংস্কৃতির ক্রমোন্নতি অক্ষুন্ন থাকলেও, শিল্প-সাহিত্যে শত পুষ্প বিকশিত হলেও, তা সমাজ দেহের সর্বাংশে কোন শক্তিই সঞ্চার করতে পারে নি। এই সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে একাধিক রাজত্ব শিল্প-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে উজ্জ্বল স্বাক্ষর রাখলেও একই ভাবে অবলুপ্ত হয়েছে। এই দেড়-দু হাজার বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, রাজ্য-রাজনীতির গতি প্রকৃতি প্রায় এক, এবং পতনের কারণও প্রায় অভিন্ন। পরোক্ষে সমাজের তলদেশের বিপুল জনস্তরের সঙ্গে উচ্চস্তরের সর্বাত্মক বিচ্ছিন্নতা।[৯০] রাজা বা রাজ্যের উত্থান পতনে তথা কথিত সাধারণ মানুষের কোন মাথাব্যথাই ছিল না। এমন কি ঊনবিংশ শতকেও বঙ্কিমচন্দ্রের একই প্রশ্ন 'উচ্চ সম্প্রদায়ের শ্রীবৃদ্ধিতে, হাসিম সেখ অথবা রামা কৈবর্তের কি?' তারা সমানেই ভাঙা পাত্রে রাঙ্গা রাঙ্গা চালের অন্ন

---

natural to a progressive art movement in a chronological sequence. In form and technique the former differ but little form the terracotta figurines of the pre-historic Indus civilisations. What is further interesting is the fact that the primitive type has been found in association with the other, and that terracotta object of primitive type are also being fashioned out by the rural people even in the present-day." —A SURVEY OF INDIAN SCULPTURE : S. K. Saraswati P. 99.

(Firma K.L. Mukhopadhyay Calcutta)

৮৯ এখানে অগ্রসর অনগ্রসর সংস্কৃতির চরম দৃষ্টান্ত একই স্থানে মিলবে।......

গলাধঃকরণ করছে অথবা নিরন্ন আছে। এ প্রশ্ন আবহমান কালের। সমাজ-সংস্কৃতির সর্বক্ষেত্রে এ প্রশ্ন সদা সমুদ্যত। সভ্যতার, বিশেষ করে নগর-সভ্যতার উষালগ্ন থেকে এই প্রভেদ পার্থক্য অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বিভিন্ন সংস্কৃতির বিচিত্র উপাদানগুলির মধ্যে আভাসিত। আগেই বলা হয়েছে, সিন্ধু সভ্যতার যুগেই হরপ্পা, মোহেন-জো-দড়োর অধিবাসীদের বাসগৃহের তারতম্য আর ঐসব প্রত্নক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত টেরাকোটা-মূর্তিকার সঙ্গে ধাতু বা প্রস্তর মূর্তির নির্মাণ ও গঠণ শৈলীর পার্থক্য নির্দেশ করে কোন কোন গবেষক সেখানের জনস্তরের শ্রেণী বিভাগ চিহ্নিত করেছেন।[১১] সিন্ধু-সভ্যতার যুগের টেরাকোটা মূর্তিকাগুলিকে সাধারণ ভাবে আদিম কৃষিজীবী-সভ্যতার ধর্মীয়-নিবেদন-প্রতীক রূপে চিহ্নিত করা হলেও এরই মধ্যে কিছু টেরাকোটা মূর্তিকার দেহের গঠন-সৌষ্ঠবে আর অলঙ্কার সংযোজনের বৈচিত্র্যে বেশ কিছু স্বাতন্ত্র্য বা বৈশিষ্ট্যের আভাস পাওয়া যায়। এখানে প্রাপ্ত টেরাকোটাগুলির অধিকাংশই আদিমরীতির। হস্তপদ বা দেহাবয়বের স্বাভাবিকত্ব প্রায় ক্ষেত্রেই অনুপস্থিত। কোন কোন গবেষক সিন্ধু উপত্যকায় প্রাপ্ত টেরাকোটা-মূর্তিকাগুলিকে আলোচনার এবং সমীক্ষার সুবিধার জন্য ছ'টি মোটা ভাগে ভাগ করেছেন। এরই মধ্যে তৃতীয় বিভাগ বা গ্রুপের টেরাকোটা-মূর্তিকার রূপনির্মাণে বা অলঙ্কার

জ্ঞানালোচনার পক্ষে এরূপ ক্ষেত্রে যতই সুবিধা হোক না কেন, রাষ্ট্রীয় সংহতি ও শক্তির পক্ষে এইরূপ অবস্থা সাংঘাতিক। নৌকাকে খণ্ড খণ্ড করে রাখলে নৌবিদ্যা শেখাবার পক্ষে হয়তো সুবিধা হতে পারে, কিন্তু সেইরকম নৌকায় সাগর পার হতে গেলেই বিপদ। শক্তির মূল কথাই সংহতি। ভারতের সংস্কৃতি : ক্ষিতিমোহন সেন : বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ : বিশ্বভারতী। পৃঃ ৮ (১৩৮৪ বঙ্গাব্দ)

৯৭ মৌর্যযুগ থেকে মোগলযুগ পর্যন্ত ভারতীয় সাম্রাজ্যগুলির পতনের কারণ অনুসন্ধান করলে কতকগুলি সাধারণ কারণ একই ভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। এগুলি হ'ল রাজপরিবারের অন্তর্দ্বন্দ্ব, প্রাদেশিক অভ্যুত্থান, আঞ্চলিক বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রবণতা, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, বিদেশী শত্রুর আক্রমণ। একাধিক বিদেশী পর্যটকের বিবরণ থেকে জানা গেছে ব্রাহ্মণ এবং অভিজাত গোষ্ঠী প্রাচুর্য এবং বিলাস ব্যসনে দিন কাটাতেন, অন্যদিকে

বিন্যাসে বিশেষ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গেছে। মূর্তিকাটির দেহের গঠনে স্বাভাবিক অবয়ব নির্মাণের সুস্পষ্ট প্রয়াস ছাড়াও কণ্ঠ থেকে আরম্ভ করে বক্ষঃস্থলে প্রলম্বিত কয়েক নরি বা লহরের রত্নহারে ধণাঢ্য শ্রেণীর অভিজাত এবং উন্নত রুচির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রচুর রত্ন শোভিত কণ্ঠহারটি শুধু ঐশ্বর্য গৌরবই নয় এক উন্নত সৌখীন বিলাস-মনস্কতারও পরিচায়ক।[১২] কিছু কিছু কেশ প্রসাধনেও বিদেশী প্রভাব পরিস্ফুট। সৌখীন রুচির নাগরিকাদের বহু বিচিত্র বিলাস চেতনারই এসব সুস্পষ্ট প্রকাশ। গঙ্গা-যমুনা-উপত্যকায় আবিষ্কৃত টেরাকোটা-সামগ্রীগুলি স্পষ্টতর এক সাংস্কৃতিক পরিচয় নিয়ে ভারত-সংস্কৃতির পাদপ্রদীপের সমীপবর্তী। তাই মৌর্য-যুগের টেরাকোটায় এক উল্লেখযোগ্য স্বাতন্ত্র্য লক্ষ্য করেছেন কোন কোন গবেষক।

সাধারণ মানুষের একটা বড় অংশ নানা সামাজিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্যের শিকার হ'তেন। রাজ্য-রাজনীতির উত্থান-পতনে এঁরা নিরুদ্বেগ বা উদাসীন থাকতেন।

91 The contrast presented by the two traditions—One in terracotta and the other in stone and bronze—offers a rather perplexing problem in view of the apparent contemporaneity of the objects. It is possible that the former represents a popular plastic idiom of the common people, perhaps following the terracotta traditions of peasants cultures of Kulli and Zhob, while the stone and bronze sculptures represent an art of the higher section of the people already sophisticated because of their elevated position in society. The distinction in the art idioms was in all probability, due to the class distinctions which appear to have emerged as a result of the predominant commercial economy that provided the mainstay of the civilisation". —A SURVEY OF INDIAN SCULPTURE : S. K. Saraswati, P. 8. Firma K. L. Mukhopadhyay Calcutta. First Edition 1957.

মৌর্য যুগ থেকে কিংবা তারও কিছু পূর্ব থেকেই ইতিহাসের উজ্জ্বল আলোকে সমুদ্ভাসিত হয়েছে ভারতের শিল্প-সংস্কৃতির প্রেক্ষাপট। এ যুগে, পাঠযোগ্য-লিপি আর মুদ্রার আবিষ্কার ঘটেছে। জৈন ও বৌদ্ধ দুটি বিশিষ্ট ধর্ম-সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছে এই সময়ের মধ্যে। ব্রাহ্মণ্য-মূর্তি-জগতের সুস্পষ্ট বিকাশ লক্ষ্য করা যায় মৌর্যযুগ থেকেই। এই সময় থেকেই সুনির্দিষ্ট প্রতিমা-লক্ষণ অনুযায়ী নির্মিত মূর্তির আবির্ভাব লক্ষ্য করা গেছে। আগেই বলা হয়েছে যে, মৌর্য যুগের টেরাকোটাতেই সূর্য-মূর্তির (চতুরাশ্ববাহিত রথারূঢ়) প্রাচীনতম নিদর্শনটির সাক্ষাৎ পাওয়া গেছে। শুঙ্গ যুগের টেরাকোটায় মহিষাসুর-মর্দিনীর প্রাচীনতম মূর্তিটির আবিষ্কার লক্ষ্য করা গেছে। শুধু শাস্ত্রবিহিত পূজা মূর্তিই নয়, মৌর্যযুগের কিছু নারীমূর্তির রূপনির্মাণে যে শিল্পোৎকর্ষ লক্ষ্য করা গেছে তা কোন বিশিষ্ট নন্দনচিন্তার সমুচ্চ বিকাশ ছাড়া সম্ভব নয়। বিশিষ্ট সমালোচকরা গোলকপুরের টেরাকোটা নারী-মূর্তিকাটিকে সর্বযুগের সর্বকালের নারীরূপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ বিকাশ বলে অভিহিত করেছেন। শুধু তাই নয়, মৌর্য-শুঙ্গ যুগে টেরাকোটা-শিল্পের কারুকর্মে অসাধারণ দক্ষতাও শিল্পীদের করায়ত্ত দেখা যায়। শুঙ্গ যুগের একটি টেরাকোটা ফলকে দৃশ্য রচনার ক্ষেত্রে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারুকর্ম নিপুণ প্রস্তর ভাস্কর্যকেও

---

92 "It is six-stringed. The main string which is aptly called "dog-collared" is tightened round the neek. Beads are attached to the string. The second string which flows down has three beads attached to it, the third and fourth strings have got five beads each and the fifth string has got the lotus-like designs embossed on it, This necklace is a product of very refined taste and speaks well of the high and refined taste of the Indus valley people." —ORIGIN AND EVOLUTION OF INDIAN CLAY SCULPTURE : Charu Chandra Das Gupta, (C. U.) Page. 54.

হার মানিয়েছে দেখা যায়। সাঁচীর প্রস্তর-ভাস্কর্যের সমগোত্রীয় শিল্প শৈলীতে-উদ্গত অত্যাশ্চর্য কারুকার্যময় দৃশ্যপট সম্বলিত ভিটা থেকে প্রাপ্ত, এই চক্রাকার-টেরাকোটা ফলকের ছাঁচটির নিপুণ প্রযুক্তি মার্শালের নজর কেড়েছে। তাঁরমতে এই টেরাকোটা-চক্রের কারুকার্য যেকোন প্রস্তর বা মার্বেল ভাস্কর্যের চেয়ে উন্নত।[৯৩] মৌর্য-শুঙ্গ-কুষাণ যুগের টেরাকোটায় যখন চারু ও কারুশিল্পের সমুন্নত বিকাশ ঘটেছে তখন কিন্তু এই সব উন্নত শিল্পনিদর্শনের পাশাপাশি যথারীতি অপর মেরুর শিল্পে প্রাগৈতিহাসিক স্থূলতা নির্মাণ-আঙ্গিকে জড়ত্ব এক সাংস্কৃতিক ভিন্নতাকেই সূচিত করে। এ ভিন্নতা সংস্কৃতি সাধনার —এ পার্থক্য অনেকাংশে গ্রাম-শহরের পার্থক্যজনিত।[৯৪] গ্রাম্য-কৃষিজীবী সংস্কৃতির আদিম উর্বরতা উপাসনার সঙ্গে শহরের সম্ভোগমনস্ক অভিজাত শ্রেণীর সৌখীন বিদগ্ধ রুচির প্রভেদজনিত পার্থক্য। একটি আদিম এবং একান্ত-ভাবে ধর্মীয় নিবেদন-প্রতীক ; অন্যটি অনেকাংশে সৌখীন অভিজাত রুচির এবং ক্ষেত্রস্থলে সম্ভোগমনস্ক অনাধ্যাত্মিক বিলাস দ্রব্যেরই সমগোত্রীয়। যেসব প্রত্নক্ষেত্র থেকে প্রচুর পরিমাণে টেরাকোটা-মৃত্তিকার আবিষ্কার ঘটেছে, সেগুলি প্রায় সবই প্রাচীন নগরকেন্দ্র। নগরে সমবেত বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের ধর্ম ও সংস্কৃতি সাধনার এগুলি দৃষ্টান্ত স্বরূপ। 'নানাশ্রেণীর সংস্কৃতি পাশাপাশি থাকলেই উন্নতির মাপকাটিতে উচ্চ নীচ ভেদ এসে পড়ে।' গ্রাম আর নগরের

---

93 Regarding one terracotta plaque found at Bhita Marshall has rightly observed, "The scene, Which is repeated on both sides of the medallion, recalls in every feature the reliefs of Sanchi, but the workmanship of the die from which this relief was stamped, is infinitely more minute and delicate than any workmanship in stone or marble could ever be." —ORIGIN AND EVOLUTION OF INDIAN CLAY SCULPTURE : Charu Chandra Das Gupta, (C. U. 1961) Page. 179.

সংস্কৃতিতে আজও শুধু পার্থক্যই নয় একটা অভিজাত-অনভিজাত অথবা অগ্রসর-অনগ্রসরতার বোধ যেন স্বাভাবিকভাবেই যুক্ত হয়ে আছে। গ্রামের মানুষ উৎপাদক হলেও শহর-নগরের অভিজাত ব্যক্তিরাই ধনের বন্টক।[৯৫] সভ্যতা-সংস্কৃতির সর্বোত্তম বিকাশ শহরে। প্রাচীনকালে রাজধানী বা মন্দির-নগরীকে কেন্দ্র করেই বিদগ্ধ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কবি, দার্শনিকরা বাস করতেন। সমাজের উদ্বৃত্ত আহরণের দিক থেকে এঁদের অবস্থান বিতর্কিত হলেও এঁরাই সর্বোত্তম সৃষ্টির উৎস, তা সে সাহিত্য বা শিল্প যাই হোক। এঁদের নব নব উন্মেষশালিনী মণীষাই শিল্প-সংস্কৃতির জগৎকে সমৃদ্ধ করেছে। নানা দিক থেকে নগরের এইসব বিদগ্ধ মানুষরা সংস্কৃতি ক্ষেত্রে একটি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তবু গ্রাম-শহরের এই দুস্তর সাংস্কৃতিক ব্যবধান অশুভ। সাহিত্যে-শিল্পে, ভাষায় নন্দন-

---

94 There was, from the distance between the villages and the capital, already a clear difference of cultural attitudes. While the villages, with their scattered huts made of bamboos and reed, continued to lead a homogeneous existence, based on folk needs related to agriculture and small scale exchange of goods, within the narrowest proportions ; the courts in the capital were evolving a higher and finer culture in consonance with the patronage afforded by the paramount rule and the all-encompassing sovereignty to which the king aspired. BUDDHISM The Marxist Approach, P, 69, Peoples Pub. House, Delhi.

৯৫ 'নগরগুলি ব্যবসা বাণিজ্য লব্ধ ধনের প্রধান সঞ্চয় কেন্দ্র ছিল ; তাহাছাড়া গৃহশিল্প ও কৃষিলব্ধ ধনের প্রধান বন্টন-কেন্দ্রও ছিল নগরগুলি। তাহার ফলে সামাজিক ধনের অধিকাংশই কেন্দ্রীকৃত হইত নগরে, এবং অল্পসংখ্যক নগরবাসীই সে ধনের অপেক্ষাকৃত অধিকাংশ ভোগের সুযোগ ও অধিকার লাভ করিত। ইহাই নগরগুলির ঐশ্বর্য, বিলাস ও আড়ম্বরের মূলে।" বাঙালীর ইতিহাস (আদি পর্ব) নীহাররঞ্জন রায়।। প্রথম খণ্ড।। পৃঃ ৪০৩।। পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি।

চিন্তায় একের পথ অন্যের পথের থেকে বহুদূরে বেঁকে গেছে। দুটি শ্রেণীর টেরাকোটা পাশাপাশি রাখলে এই বিরাট ব্যবধান চোখে পড়ে। একটিতে সুদক্ষ কারিগরী সমুন্নত কলাচিন্তা এবং যুগ-কালে বিবর্তনশীল শিল্পচেতনার অভিব্যক্তি, অন্যটিতে অনড় অবিচল আদিম প্রথাবদ্ধতা। একটি একান্তভাবে আদিম ধর্মীয় নিদর্শন, অন্যটিতে সম্ভোগময় রূপারোপের ক্রমবর্ধমান প্রবণতা। কৌশাম্বী (এলাহাবাদের সন্নিকট) থেকে চারহাজারেরও বেশী টেরাকোটা-নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। সেখানেও এই একই সাংস্কৃতিক মেরু-বিভাজন লক্ষ্য করা যায়। উত্তরপ্রদেশের বালিয়া জেলার (সরযূ নদীর তীরবর্তী) খয়রা ডি' থেকে মুখ্যতঃ কুষাণ আমলের প্রচুর মূর্তিকা আবিষ্কৃত হয়েছে। এখানের টেরাকোটা সামগ্রীর একাংশে, বহিরাগত বিদেশী প্রভাবকে আত্তীকরণের প্রচেষ্টায় একদিকে যেমন বিবর্তনশীল শিল্প-প্রয়াসের সাক্ষ্য রয়েছে, অন্যদিকে তেমনি একইভাবে দেখা যায় আদিম-প্রথাবদ্ধ যুগকালে প্রায় অপরিবর্তিত "চিরন্তন" শ্রেণীর টেরাকোটা মূর্তিকার অনিবার্য উপস্থিতি। টেরাকোটা-জগতের এই মেরু-বিভাজন বা অতি স্পষ্ট পার্থক্য সমাজ তথা সংস্কৃতি বিকাশের বিচিত্র ধারাটিকেই সুচিহ্নিত করেছে। ভারতের অত্যুন্নত সংস্কৃতি-চিন্তার পাশাপাশি অনুন্নত চিন্তা-চেতনার এক জগৎ। পার্থক্যটা শুধু গঠন-কৌশল বা কারিগরী দক্ষতার নয়. আশা-আকাঙ্খা, চিন্তা ভাবনার মূলীভূত ব্যবধান। আদিম-রীতির স্থূল প্রায়-অবয়ব-বিহীন টেরাকোটা-মূর্তিকাগুলির বিবর্তন-বিহীন অনড়ত্ব প্রাগৈতিহাসিক সংস্কারের প্রশ্নহীন অনুবর্তনেরই প্রতীক। মানব সংস্কৃতির আদিম ঊষাকালে উদ্ভাসিত এবং অস্ফুট জড়োপাসনার নৈর্ব্যক্তিক নিবেদন প্রতীক। ভারতীয় সমাজের উপরের স্তরের চিন্তাভাবনার সমুন্নত বিকাশ কিংবা বিদগ্ধ ব্যক্তিত্বের সুদুর্লভ মনীষা প্রসূত সংস্কৃতির অত্যুজ্জ্বল রশ্মি সমাজের তৃণস্তরে অবস্থিত বিভিন্ন অনগ্রসর জাতি-গোষ্ঠীর মানস কন্দরে প্রবেশের সুযোগ পায় নাই। আগেই বলা হয়েছে পার্থক্যটা গঠনগত বা রূপারোপের দৈন্যপ্রসূত নয়, মূর্তিকাগুলির সৃষ্টির পশ্চাতে নিহিত চিন্তা চেতনার। একদিকে সমুন্নত দার্শনিক চেতনা আর

সুপরিণত সুসংগঠিত নান্দনিক ভাবনা কল্পনার প্রেরণা অন্যদিকে অস্ফুট এক আদিম সংস্কারের অনুবর্তন। একটি গ্রামীণ অন্যটি নাগর-সংস্কৃতির ঋদ্ধ রূপান্তর। সমাজের উপরের স্তরের মানুষ এইসব উন্নত মার্গ-সংস্কৃতির অত্যুজ্জ্বল দ্যুতির কণামাত্র সমাজের নিম্নস্তরে পেঁছে দেবার দায়িত্ব গ্রহণ করেননি। তাঁদের অবহেলায় নিম্ন অবস্থানের মানুষের মানস-তিমির স্থায়ী হতে পেরেছে বলে অনেকে মনে করেন। তাই ভারতের সমুন্নত অধ্যাত্মদর্শন অথবা সাহিত্য-সংস্কৃতি পৃথিবীতে এক বিশিষ্ট আসন লাভ করলেও নিজের দেশের এক বিপুল সংখ্যক মানুষের কাছে তা অর্থহীন। তারা যে তিমিরে ছিল সেই তিমিরেই আছে। ভারতের বিভিন্ন ধর্মপন্থার মধ্যে অত্যুচ্চ আত্মিক বিকাশ প্রচেষ্টার যে প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়, তা কোন ব্যক্তি বা ব্যষ্টির সাধ্য হতে পারে, কিন্তু বিপুল জনসাধারণের কাছে তার কোন আবেদনই নেই। এমন কি জ্ঞানী মনীষীরাও এইসব উন্নত সাধন সকলের জন্য নয়, এটা ধরে নিয়েই এইসব উচ্চ সাধন ক্ষেত্রে সাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছেন, এবং এইসব ইতরজনের অধিকাংশকেই অনধিকারী বলে ত্যাগ করেছেন।[৯৬]

---

৯৬ কেবলমাত্র কঠোর চিন্তার জোরে মানুষ নিজের বাসনা ও প্রবৃত্তিকে মুছে ফেলে, জগদ্‌ব্রহ্মাণ্ডকে বাদ দিয়ে, শরীরের প্রাণক্রিয়াকে অবরুদ্ধ করে একটি গুণলেশহীন অবিচ্ছিন্ন (abstract) সত্তার ধ্যানে নিযুক্ত থাকতেও পারে, কিন্তু দেহমনহৃদয়বিশিষ্ট সমগ্র মানুষের পক্ষে এরকম অবস্থায় অবস্থিতি করা অসম্ভব এবং সে তার পক্ষে কখনই প্রার্থনীয় হতে পারেনা। এই কারণেই তখনকার জ্ঞানীরা যাকে মানুষের চরম শ্রেয় বলে মনে করতেন তাকে সকল মানুষের সাধ্য বলে গণ্যই করতেন না। এই কারণে এই শ্রেয়ের পথে তাঁরা বিশ্বসাধারণকে আহবান করতেই পারতেন না—বরঞ্চ অধিকাংশকেই অনধিকারী বলে ঠেকিয়ে রাখতেন এবং এই সাধারণ লোকেরা মূঢ়ভাবে যে কোন বিশ্বাস ও সংস্কারকে আশ্রয় করত তাকে তাঁরা সকরুণ অবজ্ঞা ভরে প্রশ্রয় দিতেন। যেখানে যেটা যেমন ভাবে আছে ও চলছে তাই নিয়েই সাধারণ মানুষ সন্তুষ্ট থাকুক এই তাঁদের কথা ছিল.........দেশের জ্ঞান এবং দেশের অজ্ঞানের মধ্যে, দেশের সাধনা এবং

তারাও উচ্চ আদর্শের বিন্দুমাত্র স্পর্শ না পেয়ে মূঢ়ভাবে আপন আপন সংস্কারকে আঁকড়ে ধরে আছে। বৌদ্ধধর্মের শূন্যবাদ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ এ উক্তি করেছেন। এই সাংস্কৃতিক বৈষম্যের দ্বারা সূচিত পার্থক্য যে একদিন সামাজিক বিপর্যয় ঘটাতে পারে এ আশঙ্কাও তিনি এই প্রসঙ্গে প্রকাশ করেছেন। এই সাংস্কৃতিক বৈষম্যের কথা, ভিন্ন প্রসঙ্গে হলেও, ক্ষিতিমোহনের রচনাতেও প্রতিধ্বনিত হয়েছে। তিনি বলেছেন "যখন শান্তিনিকেতনে বসে কবিসাধক রবীন্দ্রনাথ গীতাঞ্জলি, গীতিমাল্য সাধনা প্রভৃতি গ্রন্থরচনা করছেন, তখন তার পাশেই সাঁওতালেরা তাদের পাড়ায় 'বোঙ্গা পূজা'য় মত্ত আছে। পাশ্চাত্য জগতে এমনটি কোথাও দেখতে পাওয়া অসম্ভব।" ক্ষিতিমোহন অবশ্য ভারতের বহুবিচিত্র যোগসাধনার প্রসঙ্গে এই উক্তি করেছেন। তবে ভারতের ধর্মসংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই প্রভেদ-পার্থক্যের ফলে সমাজ ও রাষ্ট্রক্ষেত্রে বিপর্যয়ের সম্ভাবনার কথাও পরবর্তী ছত্রেই তিনি বলেছেন।[৯৭] বৌদ্ধধর্মের শূন্যবাদ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের উপরোক্ত মন্তব্য ভারতের অন্যান্য উচ্চমানের ধর্মদর্শন সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। শ্রীচৈতন্য যে জনমুখী গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রবর্তন করেছিলেন, বা করতে চেয়েছিলেন, তা কালক্রমে সংস্কৃতজ্ঞ সুপণ্ডিত ষট্‌গোস্বামীর হাতে, শ্রুতি-স্মৃতি-ন্যায় প্রভৃতি প্রস্থানগুলিকে অবলম্বন করে জটিল তত্ত্বভিত্তিক এক ধর্মদর্শনে রূপায়িত হয়। নানা প্রাচীন সংস্কৃত শাস্ত্র এবং সাহিত্য মন্থন করে ভক্তিতত্ত্বের যে জটিল রসায়ণ প্রস্তুত হয়, এবং শ্রীকৃষ্ণ-ভামিনী-শ্রীরাধিকার এক প্রতীকী রূপান্তর ঘটিয়ে যে দুরূহ 'রাধাতত্ত্ব' নির্মাণ করা হয় তা ভাবুক রসিক পণ্ডিতের

দেশের সংসার যাত্রার মধ্যে, এতোবড় একটা বিচ্ছেদ কখনোই সুস্থভাবে স্থায়ী হতে পারেনা। বিচ্ছেদ যেখানে একান্ত প্রবল সেখানে বিপ্লব না এসে তার সমন্বয় হয়না—কি রাষ্ট্রতন্ত্রে, কি সমাজতন্ত্রে, কি ধর্মতন্ত্রে।" সামঞ্জস্য (শান্তিনিকেতন) রবীন্দ্র রচনাবলী ।। জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ দ্বাদশখণ্ড। ২৫শে বৈশাখ ১৩৬৮. পৃঃ ৩৬৮।

৯৭ ভারতের সংস্কৃতি ঃ ক্ষিতিমোহন সেন ঃ বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ ঃ বিশ্বভারতী

আস্বাদ্য হলেও সাধারণ মানুষের কল্পনাতীত। এমনি করে বৈষ্ণব সাধনের যে দুরূহ দুজ্ঞেয় পন্থা নির্মিত হ'ল তা ইতরজনার পক্ষে অসাধ্য। ব্রাহ্মণ্য-স্মৃতি-ন্যায় ইত্যাদির সুস্পষ্ট প্রভাবে রচিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে, কালক্রমে স্বাভাবিকভাবেই, ব্রাহ্মণ্য-গুরুবাদ প্রতিষ্ঠিত হ'ল। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ''সংস্কৃত-করণে''র মাধ্যমে অভিজাত হয়ে উচ্চকোটি অভিজাত পণ্ডিত, ভাবুক বা রসিকের রসতৃষ্ণা চরিতার্থ করল। আপামর জনসাধারণ এই জটিল তত্ত্ব-ভিত্তিক ধর্মদর্শনের ক্ষেত্র থেকে বহুদূরে শুধু নাম সংকীর্তনে সন্তুষ্ট রইল। বর্ণাশ্রম-শাসিত ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় উচ্চকোটি মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ শিক্ষা-দীক্ষা এবং জ্ঞান গরিমার প্রেক্ষাপটে উদ্ভাসিত ধর্মদর্শন এবং দুরূহ দুজ্ঞেয় সাধনপন্থা উচ্চকোটি সুপণ্ডিতদের লক্ষ্য করেই রচিত হয়েছে। এইসব ধর্মদর্শনের রূপকাররা বর্ণাশ্রমকে অনিবার্য রূপে মেনে নিয়ে, এইসব ধর্মদর্শন জ্ঞান-গরিমা এবং পাণ্ডিত্যহীন অনভিজ্ঞাত আপামর জনসাধারণের সাধ্য বলে (প্রত্যক্ষভাবে না হোক পরোক্ষভাবে) গণ্য করেননি। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট অনেকাংশে পরিবর্তিত হলেও আজকের চিত্রও খুব একটা পৃথক নয়। এখনও এক বিপুল সংখ্যক শিক্ষা-দীক্ষাহীন মানুষ আদিম অন্ধকারের অধিবাসী। এখনকার বুদ্ধিজীবীরা যাকে মানুষের শ্রেয় বলে মনে করেন তাকে সর্বজন-সাধারণের সাধ্য বলে কতখানি জ্ঞান করেন তা সুস্পষ্ট নয়। আজকের বুদ্ধিজীবীরা জ্ঞানের ক্ষেত্রে, শিক্ষার ক্ষেত্রে এইসব আপামর জনসাধারণকে প্রত্যক্ষভাবে অনধিকারী বলে ঠেকিয়ে না রাখতে চাইলেও বিদ্যার ক্ষেত্রে তাদেরকে আন্তরিকভাবে আহ্বান করার দায়বদ্ধতা কতটা স্বীকার করেন তাও দুর্বোধ্য। জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য-দর্শনের ক্ষেত্রে ভারতের যে বিপুল অগ্রগতি তার ফলশ্রুতি একটি গণ্ডীর মধ্যেই আবদ্ধ। এখানের বিপুল সংখ্যক মানুষ ভারতের এই বহু বিঘোষিত সমুচ্চ সংস্কৃতির সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের বিন্দু-বিসর্গ উপলব্ধি না করে তার দিকে পিঠ ফিরিয়ে তাদের আদিম ধর্মাচার আর প্রাগৈতিহাসিক সংস্কারকে আঁকড়ে ধরে আছে। মনু, যাজ্ঞ-বাল্ক্য, কালিদাস, ভবভূতি দূরে থাক, সাম্প্রতিক কালের বিশ্ববিশ্রুত

মহাকবি রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেও তাঁরই দেশের এক বিপুল সংখ্যক অধিবাসী সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তাদের অনেকেই তাদের প্রাত্যহিক জীবন-যাত্রায় এখনও প্রাগৈতিহাসিক 'শিকার-খাদ্যান্বেষণে'র যুগ অতিক্রম করে নাই।[৯৮] ভারতের সুপ্রাচীন মহান সংস্কৃতির অসামান্য ঐশ্বর্যের হিরণ্যদ্যুতির সামান্যতম উপলব্ধিও এদের অনেকেরই নাই। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, বিষ্ণুপুর শাখার পক্ষ থেকে, নানা প্রয়োজনে, গ্রাম পরিক্রমা করতে গিয়ে দেখেছি উচ্চ দার্শনিক-ধর্মীয় পরিচয়যুক্ত আর্য-হিন্দুদেবতা-মূর্তি সম্পূর্ণ ভিন্ন পরিচয়ে লোকদেবতার নিয়মে পূজা পাচ্ছেন, লোকদেবতারই বেদীতে। শাস্ত্রীয় এই দেবমূর্তির পশ্চাতের সমুচ্চ-দার্শনিক প্রেক্ষাপট কিংবা যথার্থ শাস্ত্রীয় পূজাবিধির বিন্দুমাত্র তাঁর বর্তমান পূজকেরা জানেন না। জটিল এই ধর্মতত্ত্ব তাঁদের কল্পনার সম্পূর্ণ বাইরে। ভারতীয়-আর্য-সংস্কৃতি ধর্মক্ষেত্রে যে সমুচ্চ দর্শন, শিল্পক্ষেত্রে যে উন্নত মূল্যমান এবং সমাজক্ষেত্রে যে অসামান্য মূল্যবোধের প্রতিষ্ঠা করেছে তা অতুলনীয়। কিন্তু তার সীমাবদ্ধতাও কম নয়। আর্যরা যেমন লোহা-অশ্ব আর রথের অধিকার আয়ত্ত্ব করে অনায়াসে ভারত তথা অন-আর্য বিজয় সম্পন্ন করেছিল, তেমনি আর্যভাষার সমৃদ্ধ অধিকার লাভ করে তার সাংস্কৃতিক বিজয়ও সুসম্পূর্ণ করেছিল। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকেই পাণিনির হাতে ভারতীয় আর্যভাষার 'সংস্কৃত' রূপান্তর ঘটে।

---

98 "Cultural difference between Indians in the same province, district or city are as wide as the physical differences between the various parts of the country, Modern India produced an outstanding figure in Tagore. Within easy reach of Tagore's final residence may be found Santals and other primitive people still unaware of Tagore's existence. Some of them hardly out of the food gathering stage." —The Culture And Civilisation of Ancient India in Historical Outline : D. D. KOSAMBI Page—2.

মৌর্যযুগেই আমরা টেরাকোটা-জগতে শাস্ত্রীয় সূর্যদেবতার আবির্ভাব দেখি। শুধু সমৃদ্ধ দার্শনিক ঐতিহ্যবাহী সূর্যমূর্তিই নয়, পাটনা-গোলকপুরের অনুপম টেরাকোটা-রমনী-মূর্তির কান্তি নির্মাণে এক বিরল নন্দনচেতনার আভাসও এযুগেই উপলব্ধি করা যায়। এই উন্নতধর্ম দর্শন কিংবা সমুন্নত নন্দনচেতনা উভয়ই আর্যভাষা ও সাহিত্যেরই ফলশ্রুতি। এরই পূর্ণ বিকশিত রূপ গুপ্তযুগের ক্লাসিক পর্যায়ে। গুপ্তযুগের মুদ্রায় সুস্পষ্ট সংস্কৃতভাষা আর শাস্ত্রীয় মূর্তির সমুন্নত প্রকাশ। গুপ্তযুগের শুশুনিয়া-শৈল-শাসনের লিপি ব্রাহ্মী হলেও ভাষা সংস্কৃত। সংস্কৃতই ক্লাসিক সংস্কৃতির মুখ্য বাহন এবং এই সমুন্নত সংস্কৃতির প্রেক্ষাপট নগর। ক্লাসিক সাহিত্য, উন্নত শিল্পভাস্কর্য নগর সমাজের প্রেক্ষাপটেই বিকশিত হয়। আগেই বলা হয়েছে, অন্যান্য সমস্ত শিল্পের মতই নগর-কেন্দ্রেই টেরাকোটা শিল্পের সর্বোত্তম বিকাশ এবং ভারতের উচ্চমানের সমস্ত টেরাকোটা নিদর্শনই আবিষ্কৃত হয়েছে সুসমৃদ্ধ নগরকেন্দ্রগুলি থেকে। ভারতের প্রথম পর্যায়ের নগর বিকাশ ঘটেছিল সিন্ধু উপত্যকায়। এই সমুন্নত নগরসভ্যতা আজও বিশ্বের বিস্ময়। এখানের নগর পরিকল্পনায় যে সমুন্নত বাস্তুবিদ্যার প্রকাশ ঘটেছে আজও তা বিস্ময়ের বস্তু। শুধু সিন্ধু-উপত্যকার হরপ্পা-মোহেন-জো দড়ো-তেই নয়, এই সুপরিণত তাম্রাশ্মীয় সভ্যতার নানা পর্যায় ভারতের নানা অংশে বিস্তৃত। গুজরাটের "লোথালে" দেখেছি এই সিন্ধু সভ্যতারই এক পর্যায়ের সমৃদ্ধ বিকাশ। এখানের সুচারু পরিচ্ছন্ন বাস্তুনির্মাণের কৌশল আজকের অত্যুন্নত বাস্তুবিদ্যা-বিশারদের কাছেও সমাদরের বস্তু। শুধু গৃহ-নির্মাণের উন্নত কৌশলই নয়, কৌলাল গাত্রে যে অত্যাশ্চর্য চিত্রাঙ্কণের বিকাশ ঘটেছে তার গুণগত এবং পরিমাণগত সমৃদ্ধি প্রতিটি দর্শককে স্তম্ভিত করে দেয়। এসব চিত্রের পরিকল্পনা এবং সম্পাদন-সৌকর্য আজকের শিল্পীরও বিস্ময়ের বস্তু। পরিমিত স্থানের মধ্যে মোটিফগুলির সুচারু সংস্থানের জন্য ক্ষেত্র বিভাজন, এবং ক্ষেত্র বিশেষে মোটিফগুলির বিচিত্র উপস্থাপন দর্শক মাত্রেরই নজর কাড়বে। এক বা বহু বর্ণের এইসব চিত্রগুলির বেশকিছুতে সেকালের জনপ্রিয় লোককথার ইঙ্গিতও দুষ্প্রাপ্য নয়।

টেরাকোটার বেশকিছু বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মূর্তিকা ছাড়াও এখানে এমন কিছু টেরাকোটার অলঙ্কার রয়েছে, যা থেকে একদিকে সুপ্রাচীন লোথালের নগর বাসীদের উন্নতরুচি এবং অন্যদিকে এখানের শিল্পী-দের সমুন্নত কারিগরীর পরিচয় পাওয়া যায়। অর্থবানদের ধাতু-অলঙ্কারের পাশাপাশি এইসব টেরাকোটা অলঙ্কার হয়ত অপেক্ষাকৃত নিম্ন অবস্থানের মানুষের আশা-আকাঙ্খা চরিতার্থ করত। কিন্তু এই টেরাকোটা অলঙ্কারগুলির নির্মাণকলাও অপরূপ। এর সুনিপুণ কারিগরীতে নগররুচির আভাস পাওয়া যায়। একটি সুসমৃদ্ধ নগরসভ্যতার সমস্ত উপাদানই এখানে প্রস্তুত। তাম্রনির্মিত দর্পণটি পর্যন্ত। কিন্তু এই সমুন্নত, সুসমৃদ্ধ নগরসভ্যতা মৌন। সিন্ধু-সভ্যতার কেন্দ্রগুলিতে প্রাপ্তলিপি বা চিত্রলিপির সুনির্দিষ্ট পাঠোদ্ধার আজও সম্ভব হয় নাই। ফলে এ সভ্যতার সম্পূর্ণ পরিচয় আজও অপেক্ষিত। এদিক দিয়ে দ্বিতীয় পর্যায়ে, গাঙ্গেয়-উপত্যকায় বিকশিত আর্যসভ্যতা ভিন্নতর চারিত্র-বৈশিষ্ট্যে শুধু মুখরই নয়, বিশেষভাবে প্রভাবশালী তাৎপর্যপূর্ণ এবং ইঙ্গিতবহ। এই আর্য-সংস্কৃতি বিজয়ীর সংস্কৃতি। এর ধাতু প্রকৃতিতে সদা সমুদ্যত বিজয় বাঞ্ছা। আগেই তার দেশবিজয় এবং সাংস্কৃতিক বিজয়ের কথা আমরা বলেছি। আগেই বলা হয়েছে, শুধু তার ধর্ম-সংস্কৃতি নয়, এক বিচিত্র বিন্যস্ত সমাজ ব্যবস্থাও এই আর্যসংস্কৃতির অবদান। বর্ণভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার পত্তন একটা বড় ধরণের দিগ্বিজয় থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। আগেই ডঃ নীহার রঞ্জনের বক্তব্যের উপর ভিত্তি করে বলা হয়েছে যে, বর্ণাশ্রমের এই সামাজিক বিস্তারের কথাই এক হিসাবে ভারতবর্ষে আর্যসংস্কার ও সংস্কৃতির বিস্তারের ইতিহাস। কারণ এই আদর্শের ভিতরই ঐতিহাসিক যুগের ভারতবর্ষের সংস্কার ও সংস্কৃতির সকল অর্থ নিহিত। বর্ণাশ্রমেই আর্যসমাজের ভিত্তি, শুধু ব্রাহ্মণ সমাজেরই নয়, জৈন এবং বৌদ্ধ সমাজেরও।[৯৯] বর্তমানের ভারতীয় হিন্দুসমাজ এবং সংস্কৃতির উৎসস্থল ভারতের দ্বিতীয় পর্যায়ের গাঙ্গেয়-নগরসভ্যতা। বর্ণ এবং শ্রেণী বিভক্ত এক নাগর-সংস্কৃতির

---

৯৯ বাঙালী হিন্দুর বর্ণভেদ : নীহাররঞ্জন রায় : বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ : বিশ্বভারতী

প্রেক্ষাপটে বিকশিত আর্যসংস্কৃতিই ভারতের প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কৃতি। আর্যসংস্কৃতির বিজয়-চিহ্ন শুধু আর্যধর্ম আর সমাজেই সীমাবদ্ধ নয়, ক্লাসিক সংস্কৃতির সর্বত্র আর্যবিজয়-লাঞ্ছন সুচিহ্নিত। মূর্তি মন্দির সর্বত্র। আর্যসমাজ ব্যবস্থার অনুসরণে ক্লাসিক মন্দিরগুলির বর্ণভেদ করা হয়ে থাকে। নবরথ, সপ্তরথ, পঞ্চরথ, ত্রিরথ দেউলগুলি যথাক্রমে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র গোত্রে বিভক্ত।[১০০] গুপ্ত-যুগের মূর্তিগুলিতে নানা আর্যচিহ্ন। অনেক মূর্তির বক্ষঃস্থলে উপবীত বা উপবীতের মত করে উত্তরীয় ধারণ লক্ষ্য করা যায়। সব দেশে সব কালে কোন না কোন ধরণের শ্রেণী বিভাগ থাকেই। কিন্তু ভারতের আর্যসংস্কৃতির মত শাস্ত্র-সাহিত্যের বিধান দিয়ে শ্রেণী বা বর্ণবিভাগকে বৈধীকরণের এমন পরিকল্পিত পরিপাটি প্রয়াস দুর্লভ। বর্ণ-গোত্র-প্রবর ইত্যাদির পেরেক ঠুকে সমস্ত সমাজকে নিশ্চল করার এমন পাকাপাকি ব্যবস্থা অন্যত্র বড় একটা দেখা যায়না। আর্য-ব্রাহ্মণ্য-স্মৃতি, ধর্মশাস্ত্র, ব্যবহারশাস্ত্র গুলিই সমাজের মেরুদণ্ড, সংস্কৃতিরও। বৌদ্ধ-জৈন ধর্ম-সংস্কৃতিও এই সমাজ ব্যবস্থাকেই মেনে নিয়েছে। শাস্ত্র নির্দেশে এক বিরাট সংখ্যক অন-আর্য বিজিত মানুষকে অন্ত্যজ স্তরে নির্বাসিত করে সর্বঅধিকার হরণ করার এমন কৌশল দেখা যায় না। এতে তথাকথিত দাসত্ব প্রথার প্রত্যক্ষ নির্মমতা না থাকলেও, শাস্ত্র সাহিত্য, শিল্প সব দিক থেকে স্মৃতির শাসন জাল বিস্তার করে সংস্কৃতশিক্ষাকে কুক্ষিগত করে[১০১] এবং সর্বপ্রকার সমৃদ্ধিকে উচ্চশ্রেণীর হাতে কেন্দ্রীভূত

---

100 The Brahmins,, Kshatriyas, Vaisyas, and Sudras have the following classes assigned to them respectively Navaratha, Saptaratha, Pancharatha, and the Triratha. The Ekaratha is of no classic importance." Orissa And Her Remains : Mono Mohan Ganguli. Page—112 GIAN PUBLISHING HOUSE : NEW DELHI, First Reprint In India. 1986.

১০১ বেদ অথবা সংস্কৃত শিক্ষায় শুধু ব্রাহ্মণের অধিকার। বেদ অধ্যয়ন দূরে থাক, শ্রবণ করলে শিসে গলিয়ে কান বুজিয়ে দেবার এবং উচ্চারণ করলে জিহবা কর্তনের নির্দেশ আছে শাস্ত্রে। —গৌতম সংহিতা

ক'রে বিপুল সংখ্যক নীচুতলার মানুষের ললাটে বঞ্চনার লিখন, প্রায় বিধিলিপির মত এমন অমোঘভাবে মুদ্রিত এবং তাকে এমন অনিবার্য রূপে প্রতিভাত করা হয়েছে, যাতে ঐ বঞ্চিতদেরই চেতনার কোনস্তরে কোন প্রশ্ন জাগার অবকাশ মাত্র ঘটেনি। শাস্ত্র বিধানে সমাজের গড়নটিকেই এমন সুকৌশলে বিন্যস্ত করা হয়েছে, যাতে নিম্ন-অবস্থানের মানুষ উচ্চ অবস্থানে আরোহণের (social mobility) জন্য যতটা আগ্রহী সমাজ-পরিবর্তনের জন্য ততটা নয়। সর্বপ্রকার সমৃদ্ধিতে উজ্জ্বল উপরতলার আকর্ষণ, নিচুতলার বাসিন্দাদের চিরন্তন। আর্যদের এই সুনিপুণ সাংস্কৃতিক-বিজয় অতুলনীয়। পুরাণ-মহাকাব্য রচনাকালে আর্য-পূর্ব, অন-আর্য-সংস্কৃতির সমস্ত উপাদান, এদেশে প্রচলিত জনপ্রিয় লোককথা (রামকথা-কৃষ্ণকথা) লোকাচার সাগ্রহে গৃহীত হয়ে সুসমৃদ্ধ সংস্কৃত ভাষার অলংকার ও প্রতীকী ব্যঞ্জনার আলোকে গোত্রান্তরিত হয়ে আর্যসংস্কৃতিকে ঐশ্বর্য-মণ্ডিত করেছে। রামায়ণ মহাভারতের মত জনপ্রিয় লোককথাগুলিকে স্মৃতি-ধর্মশাস্ত্রের ছাঁচে ঢেলে একই প্রক্রিয়ায় সেগুলিকে গোত্রান্তরিত করে আত্মসাৎ করা হয়েছে।[১০২] গুপ্তযুগের মন্দির-টেরাকোটায় রামায়ণ-মহাভারতের মোটিফগুলির স্মার্ত-পৌরাণিক রূপান্তরের মাধ্যমে আর্য-ব্রাহ্মণ্য মতাদর্শই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। এটা আগেই বলা হয়েছে। মন্দির টেরাকোটায় বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ্য-মন্দিরে এই ট্রাডিশন সমানে চলেছে। রামায়ণ মহাভারতের যুদ্ধ বা গল্প মন্দির টেরাকোটায় প্রায় অপরিহার্য মোটিফ। সুদীর্ঘ সময় ধরে রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনী কোন না কোনভাবে মন্দিরগাত্রে চিত্রিত হয়েছে। ভারতের হিন্দু-মন্দিরের ক্ষেত্রে এই দুই মহাকাব্যের বিশেষ করে রামায়ণের কাহিনী মুখ্যস্থান অধিকার করেছে— শৈব-বৈষ্ণব সব মন্দিরেই তার অপ্রতিহত গতি। রামায়ণের কাহিনী গুপ্তযুগ থেকেই ভারত এবং বহির্ভারতে জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। গুপ্তযুগেই সে ভারতের বাইরে পাড়ি জমিয়েছে। সেখানের সংস্কৃতি ক্ষেত্রে স্বাক্ষর

---

১০২ "উভয় মহাকাব্যের জনপ্রিয়তা দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ ইহা কবলিত করেন।" সংস্কৃত সাহিত্যের রূপরেখা—ডাঃ বিমান চন্দ্র ভট্টাচার্য। বিদ্যোদয় লাইব্রেরী। ১৯৬৪

রেখেছে ব্যাপকভাবে।[১০৩] শ্রীমদ্ভাগবত, ব্রাহ্মণ্য, বিশেষ করে গৌড়ীয় মন্দির-টেরাকোটার অপর একটি অপরিহার্য অবলম্বন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের দুটি মুখ্য আকার গ্রন্থ—শ্রীমদ্ভাগবত আর জয়দেবের গীতগোবিন্দ। ভাগবতের রাসমণ্ডল আর গীতগোবিন্দম্ এর দশাবতার প্রায় প্রতিটি বৈষ্ণব-মন্দিরের টেরাকোটায় বর্তমান। বৃন্দাবনের ষট্‌গোস্বামী গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের যে দার্শনিক কলেবর রচনা করেন, তা মূলতঃ শ্রুতি (বেদ) এবং স্মৃতি-নির্ভর প্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত হিন্দু-ক্লাসিক ধর্মসংস্কৃতিরই রূপান্তর। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের তথা শ্রীমদ্ভাগবতের মুখ্যতত্ত্ব রাসলীলা শ্রীকৃষ্ণলীলার একটি দার্শনিক বা তাত্ত্বিক অভিব্যক্তি। এই রাসলীলাকে কেন্দ্র করে বৈষ্ণবদর্শনে এক গূঢ় তত্ত্বের প্রকাশ ঘটেছে। মন্দির টেরাকোটায় একটি "মণ্ডল" বা বৃত্তের প্রতীকে রাসলীলার চিত্ররূপ বর্ণিত হয়েছে। অনেকে মনে করেন আদিবাসীদের একধরণের যৌথ নৃত্য থেকে রাসমণ্ডলের বস্তুরূপ গৃহীত হয়েছে। আদিবাসী নর-নারীরা এই ধরণের যৌথ নৃত্যে একজন পুরুষের পাশে একজন করে রমণী দাঁড়িয়ে একটি বৃত্ত বা মণ্ডল রচনা করে। মাঝে থাকে, মাদল-বাদক আর বংশীবাদক। আর্যসংস্কৃতির প্রতীকী-ব্যঞ্জনার আরোপে এই মণ্ডল এবং মণ্ডলস্থ নরনারী এক তত্ত্বদর্শনে রূপায়িত হয়েছে।

---

103 In the Gupta age we find something which is quite important. In this age we have found some terracotta-panels in which we find the representation of Ramayana scene. Vogel is right in opining that these panels were meant to form a continuous frieze on the wall of a Brahmanical or, more correctly speaking Vishnu temple. Similar Ramayana panels have been found on the outer walls of the Gupta temple at Deogarh. Regarding those panel Coomarswamy has observed, "The basement was decorated with fine panels representing Ramayana scenes an almost unique instanee of an arrangement

নারী বা গোপীমূর্তিগুলি ভিন্ন ভিন্ন হলেও, পুরুষ বা কৃষ্ণমূর্তি-গুলি মূলতঃ অভিন্ন। একই শ্রীকৃষ্ণের বহুধা প্রকাশ। এক কৃষ্ণ গোপীজন মনোরঞ্জনের কারণে একাধিক হয়েছেন। অন্যভাবে বলা যেতে পারে, অদ্বয় ব্রহ্মের বহুধা বিভক্ত রূপই দৃশ্যমান জগতে প্রতিভাত। বিষ্ণুপুরের শ্যামরায় মন্দিরের টেরাকোটায় ছোট বড় প্রায় চল্লিশটি রাসমণ্ডল গৌড়ীয় বৈষ্ণবের এই পরমতত্ত্বের ব্যঞ্জনা বহন করেছে। দক্ষিণদিকের প্রবেশ পথের দুপাশে বিপুলায়তন দুটি রাসমণ্ডল শুধু দর্শকের দৃষ্টিনন্দনের জন্যই নয়, যেন বৈষ্ণবধর্মের গূঢ় তত্ত্বদর্শনের আখ্যাপত্রের মত কোন ধর্মরসিকের অপেক্ষায় আছে। তত্ত্বজিজ্ঞাসুর কাছেও এই শ্যামরায় মন্দির অত্যাশ্চর্য এক আকর গ্রন্থ বিশেষ। কয়েক হাজার টেরাকোটার সমাবেশে নানা রূপক আর প্রতীকের ব্যঞ্জনার মাধ্যমে এই মন্দিরে প্রাচীন হিন্দু ক্লাসিক সংস্কৃতির যে আবহ সৃষ্টি করা হয়েছে, তাতে প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ঐতিহ্যমণ্ডিত ভাগবদ্ধর্ম; যার প্রেক্ষাপটে উদ্ভাসিত হয়েছে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের রূপরেখা।

প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকেই একটি আদিম 'শক্তিচেতনা' মানুষের চিন্তায় উপ্ত হয়েছে। আদিম টেরাকোটা-মাতৃকা-মূর্তিগুলি তারই প্রকাশ বলে মনে করা যেতে পারে। এই আদিম শক্তি-চিন্তাই পরবর্তীকালে শাখায় পল্লবে পল্লবিত হয়ে নব নব শক্তিতত্ত্বে বিবর্তিত

---

quite common in Java," ... ... Among the Far Eastern temples the Ramayana panels are found in the Baphaon and Prah Vihar in Combodia, Loro Jongrong in Java and Panataran temple in East-Java. It is quite natural to conclude that this idea of decorating the outer walls of a temple with Ramayana scenes might have gone to the Far East from Northern India sometime after the Gupta Period".

—Origin And Evolution Of Indian Clay Sculpture : C. C. Das Gupta (P-259) C. U.

হয়েছে—একথা আগেই বলা হয়েছে। মূর্তিও নির্মিত হয়েছে এই সব জটিল তত্ত্বজালকে রূপদেবার জন্যে। মন্দির ভাস্কর্যেও এই শক্তি চেতনার ধারাটি নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে। কালক্রমে বৈষ্ণব টেরাকোটা-মন্দিরে এক নূতন ব্যঞ্জনায় শক্তিতত্ত্ব রূপলাভ করেছে একথাও আগে বলা হয়েছে। টেরাকোটা জগতের আদিম মাতৃকা মূর্তিগুলিকে মোটা তিনটি দাগে ভাগ করা হয়েছে।[১০৪] এগুলির মধ্যে (১) দিব্যাঙ্গনা (Divine woman-Isthar type) ও দিব্য-মাতৃকা (Divine Mother or Isis type) মূর্তিগুলির পরবর্তী-কালে, ঐতিহাসিক যুগে, নানা বিবর্তন সূচিত হয়েছে বলে মনে করাটা অযৌক্তিক নয়। অহিচ্ছত্র থেকে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতকের বেশকিছু শিশুসহ-নারীমূর্তির আবিষ্কার ঘটেছে, যেগুলিকে Dr. V. S. Agrawala তিনটি মোটা দাগে বিভক্ত করেছেন। এগুলি হল (১) স্তন্যপানরত শিশুক্রোড়ে-নারীমূর্তি, (২) শিশু-ক্রোড়ে নারীমূর্তি, (৩) বামক্রোড়ে শিশুসহ নারীমূর্তি। শিশুর হাতে ক্রীড়া-গোলক। Dr. Agrawala বৌদ্ধ এবং জৈন সাহিত্যের অনুসরণে এই শিশুসহ নারী মূর্তিকাগুলিকে ধাত্রীরূপে (যথাক্রমে স্তনধাত্রী বা ক্ষীরধাত্রী, অঙ্কধাত্রী ও ক্রীড়াধাত্রী) চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু সমসাময়িককালের (ষষ্ঠশতক) অনুরূপ কিছু প্রস্তর ভাস্কর্যের (বরোদা মিউজিয়াম) নিরিখে এগুলির নূতন মূল্যায়ণ করতে চেয়েছেন (R. C. Agarwala) জনৈক গবেষক। এই প্রস্তর-ভাস্কর্য-গুলিকে কার্ত্তিকেয়ের পালিকা ষষ্ঠে-'কৃত্তিকা' রূপে R. C. Agrawala চিহ্নিত করেছেন। কারণ উদয়পুরের নিকটবর্তী "তানেসর" (Tanesar) থেকে এই ধরণের মাতৃকাগোষ্ঠীর বেশকিছু মূর্তির সঙ্গে একটি কার্ত্তিকেয় মূর্তির আবিষ্কার ঘটেছে। এই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে উক্ত গবেষক বলতে চেয়েছেন যে, অহিচ্ছত্রের শিশু-ক্রোড়ে টেরাকোটা-নারীমূর্তিকাগুলি সাধারণ ধাত্রী পর্যায়ের নন, এগুলিও কার্ত্তিকেয়ের পালিকা কৃত্তিকাগণেরই মূর্তি। কিন্তু একথাও

---

104 Origin And Evolution Of Indian Clay Sculpture : C. C. Das Gupta (Page 81-82) C. U.

সত্য যে টেরাকোটা মূর্তিকাগুলির সঙ্গে কোন টেরাকোটা-কার্তিকেয়ের আবিষ্কার ঘটেনি।[১০৫] এই প্রসঙ্গে আর একটি দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা যেতে পারে। আহ্মেদাবাদ (গুজরাট) এর 'লালভাই-দলপতভাই' মিউজিয়ামে একটি প্রস্তর নারীমূর্তি (প্রায় দেড় ফুট, নং ১১১৮ বেলেপাথর ঃ মধ্যভারত) দেখেছি, যেটির বাঁদিকে দাঁড়িয়ে আছে একটি শিশু। শিশুটি নারীটির কাপড় চেপে ধরে আছে। শিথিল বসনা এই নারীমূর্তির বসনের কিয়দংশ খসে গিয়ে মূর্তির যোনিদেশ অর্ধউন্মোচিত হয়েছে। এই নারীমূর্তির গঠনে সম্ভোগ মনস্কতা এবং রতিচেতনার সুকৌশল প্রয়োগ থাকলেও মাতৃকামূর্তির একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য এখানে (জননেন্দ্রিয় নিরাবরণ) লক্ষিত হচ্ছে। বিশেষ করে বামপার্শ্বে দণ্ডায়মান শিশুটির উপস্থিতি মূর্তিটিকে "ক্রীড়াধাত্রী"র পর্যায়ভুক্ত করেছে বলেই মনে হয়। বলা বাহুল্য এই সংগ্রহশালাতেই ষড়ানন কার্তিকেয়ের একটি আবক্ষমূর্তিও দেখেছি। মূর্তিটির সম্মুখভাগ থেকে তিনটি মুণ্ড দৃষ্টিগোচর হয় (বেলে-পাথর ঃ সপ্তমশতক ঃ মধ্যভারত) কার্তিকেয়ের আবক্ষমূর্তির তিনটি দৃশ্যমান আননে গুপ্তযুগের ধ্যানমগ্নতা দুর্নিরীক্ষ্য নয়। পূর্বোক্ত (আমেদাবাদের) শিশুসহ নারীমূর্তিটি ৫ম শতকের এবং কার্তিকেয়ের মূর্তি ৭ম শতকের। দুটিরই প্রাপ্তিস্থান মধ্যভারত বলে নির্দিষ্ট হয়েছে। অতএব পূর্বোক্ত বরোদা ও উদয়পুর মিউজিয়ামের ষষ্ঠ-সপ্তম শতকের প্রস্তর-ভাস্কর্য (শিশুক্রোড়ে মাতৃকারূপে অভিহিত) গুলির আলোকে আহ্মেদাবাদ এর "লালভাই-দলপতভাই" সংগ্রহ-শালার উক্তমূর্তিগুলি নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। পূর্বোক্ত বরোদা মিউজিয়ামেরই আর একশ্রেণীর মাতৃকা-মূর্তির প্রসঙ্গও এই সঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এখানে সংরক্ষিত বিশেষ করে দুটি (মাতৃকামূর্তির) ভাস্কর্য নিদর্শন নানাদিক দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। একটিতে দেখা যায় সন্তানক্রোড়ে পার্বতী, বীণাধর শিবমূর্তির বাঁ পাশে দাঁড়িয়ে আছেন।

---

105 Mother and Child sculpture from Samalaji and Rajasthan R. C. Agrawala Bulletin, Museum And Picture Gallery Baroda. Vol. XXIII : Prge 10 (1971)

পার্বতী বাঁ হাত দিয়ে ক্রোড়স্থ শিশুটিকে ধরে আছেন, ডান হাতে একটি সমৃণাল পদ্ম। দেবীর বাঁ দিকে একটি ময়ূর। অনুরূপ আর একটি প্রস্তরপটে দেখা যায়, গণেশজননী পার্বতী এক নৃত্যরত গণেশমূর্তির পাশে দণ্ডায়মানা। এখানেও পার্বতী মূর্তির ডানপাশে দেখা যায় একটি ময়ূরের উপস্থিতি। উভয় ভাস্কর্যেই ময়ূর কার্তিকেয়ের দ্যোতনা বহন করছে। এই মূর্তিদুটিকে "স্কন্দমাতা" পর্যায়ভুক্ত করেছেন বিশেষজ্ঞরা। কারণ উভয়ক্ষেত্রেই কার্তিকেয়ের (বাহন) প্রতীকরূপে ময়ূর উপস্থিত। অত্যন্ত প্রাসঙ্গিকভাবেই এখানে বিষ্ণুপুরের "জোড়বাংলা" মন্দিরের একটি টেরাকোটা-চিত্রের উল্লেখ করা যেতে পারে। ঐ মন্দিরের পশ্চিমের দেওয়াল জুড়ে দেবী যুদ্ধের চিত্রযুক্ত টেরাকোটা-ফলকগুলির নীচের দিকের কয়েকটি 'ফ্রিজে' বা পটিতে বিভিন্ন মাতৃকা-মূর্তির সমাবেশ। মাতৃকারা স্ব স্ব দেবতার বাহনসহ বিভিন্ন যুদ্ধভঙ্গিমায় চিত্রিত। তারই নীচে একটি টেরাকোটা-ফলকে গণেশক্রোড়ে পার্বতী এবং পাশে (ডানপাশে) ময়ূরারূঢ় কার্তিকেয় মূর্তি। উপরোক্ত বরোদা মিউজিয়ামের (স্কন্দমাতা নামে অভিহিত) প্রস্তর ভাস্কর্য-নিদর্শন দুটির আলোকে জোড়বাংলার টেরাকোটা-চিত্রটি নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। শ্যামরায় (পঞ্চরত্ন ঃ বিষ্ণুপুর) মন্দিরের মধ্যবর্তী বিপুলায়তন শিখরটির অভ্যন্তর ভাগে স্থাপিত, টেরাকোটা ফলকে উদ্গত ছয়মুখবিশিষ্ট ষড়ানন কার্তিকেয়ের বড় আকারের মূর্তিটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। বিশেষতঃ উমামহেশ্বরের মূর্তির উপরের দিকের একটি টেরাকোটা-ফলকে রিলিফে উদ্গত এই মূর্তিটির উপস্থিতি চিত্তাকর্ষক। "দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার ভাস্কর্য" বিষয়ে ক্ষেত্রসমীক্ষা করতে গিয়ে বাঁকুড়া-পুরুলিয়ায় কার্তিকেয়ের একাধিক (প্রস্তর) ভাস্কর্য-নিদর্শন চোখে পড়েছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বিষ্ণুপুর শাখার সংগ্রহশালা "আচার্য যোগেশ-চন্দ্র পুরাকৃতি ভবনে" একটি সুন্দর কার্তিকেয় মূর্তি আছে। আর একটি ময়ূরারূঢ় কার্তিকেয় মূর্তি দেখেছি ইছাগড় স্কুলের (পাতকুম ঃ সিংভূম) মূর্তিসংগ্রহে। আনাই-আশ্রমের (পুরুলিয়া) সন্নিকট মহাদেব বেড়াতেও একটি ময়ূরারূঢ় কার্তিকেয় মূর্তি আছে। কিন্তু শ্যামরায় মন্দিরের "ষড়ানন-কার্তিক"টি নানা দিকদিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ।

ছয়জন "কৃত্তিকা"র ("স্তনধাত্রী মাতৃকা") স্তন্যদানের সুযোগ করে দেবার জন্যেই নাকি কার্তিকেয়ের অন্যান্য মুখগুলি উদ্গত হয়। পৌরাণিক কাহিনীতে এই মত প্রচলিত।

'সকলোত্তরাপথনাথ' হর্ষবর্ধনের মৃত্যুর পর রাজনৈতিক অবস্থার ফলে উদ্ভূত "মাৎস্য-নায়-যুগে"র বিড়ম্বনা থেকে পরিত্রাণ পাবার উদ্দেশ্যে ("মাৎস্য ন্যায়ম্-অপোহিতুম"—খালিমপুর শাসন) বাঙলার প্রকৃতিপুঞ্জ গোপাল (১ম) কে নৃপতি নির্বাচন করেন। এই অন্তবর্তী অন্ধকার যুগে বৃহৎমৎস্যের মতই পাশ্বর্বতী শক্তিশালী নৃপতিদের আগ্রাসী আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য বঙ্গের প্রজাপুঞ্জের এই প্রগতিশীল ভূমিকা যথার্থই তাৎপর্যপূর্ণ। পাল রাজাদের প্রভুত্ব মূলতঃ বঙ্গ-বিহারেই সমধিক বিস্তৃত ছিল। পাল রাজাদের অধিকাংশ "শাসন" এ সব অঞ্চল থেকেই পাওয়া গেছে। অনেকে মনে করেন পাল রাজারা বাঙালী ছিলেন। সে যাই হোক পাল-পর্বে, বাঙ্লাদেশ ভারত-সংস্কৃতির পাদপ্রদীপের অধিকতর সমীপবর্তী হয়। পাল-পর্বের বঙ্গদেশে সংস্কৃতচর্চার যে বিপুল প্রসার ঘটেছিল এবং সে চর্চা যে যথেষ্ট সমৃদ্ধ ছিল তা এসময়ের লিপিপ্রমাণগুলিতে ব্যবহৃত প্রসাদগুণসম্পন্ন সংস্কৃত ভাষার প্রচলন থেকেই বোঝা যায়। কিন্তু সংস্কৃত ছাড়াও পাল যুগে, বিশেষ করে নবম-দশম শতকে, আরও দুটি ভাষার প্রচলন লক্ষ্য করা যায়। একটি শৌরসেনী অপভ্রংশ অপরটি মগধী-অপভ্রংশের বিবর্তিত রূপ। এই রূপ বিবর্তনে আর্যেতর আস্ট্রিক দ্রাবিড় ভোট-ব্রহ্ম ভাষা-গোষ্ঠীর কোন না কোন প্রভাব ছিল।[১০৬] শুধু ভাষা নয়, এসময় নানা ধর্মকর্মের রূপ বিবর্তনেও আর্যেতর বঙ্গজন সংস্কৃতির এমনি কোন না কোন ভূমিকা ছিল, এটা মনে করাও অসঙ্গত নয়। এইসব আর্যেতর সংস্কৃতির উৎস অন্ত্যজ মানুষগুলির মূর্তিরূপ পাহাড়পুরের টেরাকোটায় দুর্নিরীক্ষ্য নয়। শবর, শবরী, শিকারবাহী ব্যাধ, বংশীবাদক আদিবাসী মানুষ ন্যাঙ্গোটিমাত্র পরিহিত স্কন্দদেশে প্রলম্বিত যষ্ঠির দুইপ্রান্তে পুঁটুলি ঝোলানো

---

১০৬ বাঙালীর ইতিহাস : আদিপর্ব : নীহাররঞ্জন রায় : দ্বিতীয় খণ্ড : পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি : ১৯৮০ : পৃ: ৭৩০।

পথিক সন্ন্যাসী বা দরিদ্র ভিক্ষুক। লোকসমাজের বিভিন্ন স্তরের এমনকি সর্বনিম্ন স্তরের আন্তরিক চিত্র। এই পালপর্বেই মাগধী অপভ্রংশের বিবর্তিত রূপকে অনুসরণ করে সৃজ্যমান বাঙলা ভাষার আদিরূপও উদ্ভাসিত হয়েছে চর্যাপদে। 'চর্যাপদ' বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের গুহ্য সাধনার এক বিশিষ্ট গ্রন্থ হলেও পদগুলির ধর্মীয় বাতাবরণ রচনায় এবং বাক্‌প্রতিমা নির্মাণে বাঙলার নীচুতলার মানুষ আর তাদের জগতেরই আধিপত্য। অপভ্রংশ ভাষার প্রবাহ ধরে অপভ্রংশ-লোকায়ত সংস্কৃতির আত্মপ্রকাশ। এখানে বাঙলার অন্য এক মুখচ্ছবি—অন্ত্যজ মানুষের আর এক পৃথিবী এইসব অপভ্রংশ ভাষা-সাহিত্যে আত্মপ্রকাশ করেছে। সবচেয়ে বড়কথা এসময় থেকেই, (পালপর্ব) ক্লাসিক শিল্প শৈলীর যে বিবর্তন ঘটে, তাতেও আঞ্চলিক বা দেশীয় কোন না কোন প্রভাব অনুমান করা অসঙ্গত নয়। পাহাড়পুরের প্রস্তর এবং টেরাকোটা-ভাস্কর্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে স্টেলা-ক্রামরিশ বলেছেন [১০৭] যে, এখানে মুখ্যতঃ যে দুটি শিল্পধারা দেখা যায় তার একটি হ'ল (সংখ্যায় কম) সমসাময়িককালে প্রচলিত মধ্যদেশীয় শিল্পরীতিরই পূর্বী-বিবর্তন (পূর্বদেশীয়)। অন্যটি হল অবিমিশ্র পূর্বাঞ্চলীয় দেশীয়রীতি। কিন্তু কোন ধর্মীয় দেবতার 'সমপদস্থানক' মূর্তি নির্মাণের ক্ষেত্রে মধ্যদেশীয় গুপ্তশৈলীর সঙ্গে অবিমিশ্র বাঙলা-

---

107 The terraeotta and stone-panels from Prharpur, North Bengal, belong to two traditions—the one, numerically in the minority, is an eastern and provincial version of contemporary sculpture in Madhyadesa,, but the other is an undiluted and indigenous and eastern Indian contribution. Significantly enough, the latter is animated scenes and figures. But when divinities are represented in 'samapadasthanaka', a hybrid compromise between the tradition of Gupta sculpture of Madhya-desa and Bengali form is arrived at. From this the cult images of the Pala and Sena Schools take their beginning. ''Indian Sculpture'' Stella Kramrisch. (1933)

রীতির মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। ক্রামরিশ মনে করেন এই ধরণের একটি মিশ্র-মাধ্যমকে অবলম্বন করেই পাল-সেন যুগের ধর্মীয় পূজা-মূর্তি (কাল্টমূর্তি) গুলির বিশিষ্ট নির্মাণরীতির সূচনা। ডঃ চারুচন্দ্র দাশগুপ্ত পাহাড়পুর থেকে প্রাপ্ত টেরাকোটা ফলকগুলির মধ্যে তিনটি নির্বাচিত ফলক-প্রসঙ্গে আলোচনা করে পালযুগের ভাস্কর্যরীতির উপরোক্ত বিবর্তন ব্যাখ্যা করেছেন। প্রথমটি একটি মিথুনমূর্তি খচিত ফলক, দ্বিতীয়টি এক বংশীবাদকের গ্রাম্য-লোকায়তচিত্র। ভাঁটার মত বিস্ফারিত নেত্র, মাথায় অবিন্যস্ত ঝাঁকড়া চুল, পরণে খাটো-কাপড় ছাড়া সারা দেহ নিরাবরণ। তৃতীয়টি বোধিসত্ত্ব-পদ্ম পানির। এই তিনটি ফলকের নির্মাণরীতি পর্যালোচনা করলেই পার্থক্যটি সহজেই অনুমান করা যায়। প্রথম ফলকে উদ্গত নরনারীর মিথুন চিত্রটিতে গুপ্তশৈলী সুস্পষ্ট। দ্বিতীয়টিতে উদ্গত বংশীবাদকের চিত্রটিতে পূর্বাঞ্চলীয় দেশীয় রীতির পূর্ণ প্রকাশ। তৃতীয়টিতে উদ্গত বোধিসত্ব মূর্তিতে গুপ্তরীতির পেলব সুঠাম নির্মাণশৈলী অথবা পূর্বাঞ্চলীয় দেশীয় রীতির কোনটাই অবিমিশ্র ভাবে বর্তমান নাই। পরিবর্তে এটিতে লক্ষ্য করা যায়, মধ্যদেশীয় গুপ্তশৈলী আর ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় দেশীয় শৈলীর মিশ্রণ। এই ধরণের এক মিশ্রশৈলী থেকেই পাল-সেন যুগের ধর্মীয়-পূজামূর্তিগুলির নির্মাণরীতির বিকাশ বলে মনে করা হয়েছে। এগুলির কালনির্ণয় করতে গিয়ে বলা হয়েছে, পূর্বোক্ত প্রথম মূর্তি-চিত্রটি নিঃসন্দেহে প্রাচীনতম। কারণ নির্মাণ শৈলীতে গুপ্ত উপাদানের উপস্থিতি সুস্পষ্ট। আলোচ্য চিত্র ফলকটিকে গুপ্তযুগের পূর্ববর্তী বলা যায়না, কারণ পাহাড়পুরের টেরাকোটা প্যানেলগুলিকে গুপ্তযুগের পূর্বে নিয়ে যাওয়া যায়না। দ্বিতীয় "বংশীবাদকের" টেরাকোটা-চিত্রটিকে, তৃতীয় টেরাকোটা চিত্রটি থেকে প্রাচীনতর নিদর্শনরূপে গ্রহণ না করার কারণ হ'ল তৃতীয়টিতে (বোধিস্বত্ব) মধ্যদেশীয় গুপ্তরীতি ও বাঙলারীতির মিশ্রণ ঘটেছে—এখনও এতে প্রাচীন গুপ্তরীতির অস্তরাগ বর্তমান। দ্বিতীয় "বংশীবাদকের-চিত্রটি" অবিমিশ্র এবং পূর্বাঞ্চলীয় দেশীয় রীতিতে নির্মিত। অতএব এটিকে তিনটির মধ্যে সর্বাপেক্ষা অবাচীন বা পরবর্তী-কালের বলে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এই বিভিন্ন শৈলী পর্যালোচনা

করে এই সিদ্ধান্ত করা হয়েছে যে, উপরোক্ত 'প্রথম-টেরাকোটা-চিত্রটি র (গুপ্ত শিল্পীর) নির্মাণের পরবর্তীকালে, গ্রামীণ টেরাকোটা-শিল্পীরা (যাঁরা অবিমিশ্র পূর্বাঞ্চলীয় দেশীয়-রীতির টেরাকোটা-নির্মাতা) পাহাড়পুরের টেরাকোটা-প্যানেলগুলি যখন নির্মাণ করেন তখন তাঁরা মধ্যদেশীয় গুপ্তশৈলীর প্রভাবে পড়েন। স্বাভাবিকভাবেই এইসব গ্রামীণ শিল্পীর অবিমিশ্র লোকায়ত শিল্পরীতির উপর মধ্যদেশীয় গুপ্তশৈলীর প্রভাব পড়ে। ফলে এইসব টেরাকোটা-প্যানেলে গুপ্তরীতি এবং পূর্বাঞ্চলীয় দেশীয়রীতির মিশ্রণ দেখা যায়। উপরোক্ত তিনটি টেরাকোটা চিত্র, নির্মাণরীতির বিচারে, বিভিন্ন সময়কালের বলে মনে করা হয়েছে। প্রথম টেরাকোটা-চিত্রটি যেটিকে নির্মাণ শৈলীর বিচারে প্রাচীনতম বলা হয়েছে, সেটিকে ষষ্ঠ শতকের মধ্যে ফেলা হয়েছে, তৃতীয়টিকে সপ্তম এবং দ্বিতীয়টিকে অষ্টম শতকের মধ্যে ফেলা হয়েছে। এককথায় পাহাড়পুরের টেরাকোটা-গুলির নির্মাণকাল পঞ্চম থেকে নবম শতকের মধ্যে ধরা হয়েছে।

অষ্টম-নবম শতকের পর শিল্পে, বিশেষ করে টেরাকোটা-শিল্পে লোকায়ত জনজীবনের সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। বস্তুত পালযুগের পরে এবং সতেরোর শতকের পূর্বে টেরাকোটা-শিল্পের সমৃদ্ধ প্রচলনও বড় একটা চোখে পড়ে না। অবশ্য পনেরোর শতকে (১৪৮০) গৌড় পাণ্ডুয়ার মসজিদে, টেরাকোটায় বিমূর্ত উদ্ভিজ্জ অলঙ্করণের সার্থক বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। পালযুগের পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে অপভ্রংশ তথা সৃজ্যমান বাঙলা ভাষা ও সাহিত্যের দর্পণে সমাজের নিম্নস্তর পর্যন্ত উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। চর্যাপদে (তান্ত্রিক বৌদ্ধ-ধর্মের বিবর্তনজাত সহজিয়ার গুহ্য প্রতীকরূপে) ডোম্বী বা শবর-শবরীদের সাক্ষাৎ মেলে। শুধু তাই নয়, পাহাড়পুরের টেরাকোটাতেও এইসব জাতিগোষ্ঠীর মানুষের উজ্জ্বল উপস্থিতি। কিন্তু পরবর্তী সেন-বর্মণ যুগে সংস্কৃত-মনস্ক ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির প্রবল প্রতিপত্তিতে জনজীবনের এই ভূমিস্তর সংস্কৃতির পাদপ্রদীপ থেকে দূরবর্তী হয়ে যবনিকার অন্তরালে অপসৃত প্রায়। সতেরোর শতকে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্মের প্রেরণায় বিশেষ করে বঙ্গদেশে টেরাকোটা-অলঙ্কৃত-বিষ্ণুমন্দিরের বহুল প্রসার লক্ষ্য করা যায়। গৌড়ীয়

বৈষ্ণবধর্ম-সংস্কৃতির মাধ্যমে প্রাচীন ভারতীয় হিন্দু সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন প্রয়াস সুস্পষ্ট। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্মদর্শনের গ্রন্থগুলি বিশেষ করে "শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত" এর উপাদানসমষ্টি পর্যালোচনা করলে এসত্য সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয়। পঞ্চদশ শতকের মধ্যভাগ থেকে সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত দু'শ বছরে ভারতের বিভিন্ন অংশে লোকসাহিত্যের সুসমৃদ্ধ বিকাশ এবং তার মাধ্যমে ভক্তিধর্মের প্রসার ঘটলেও, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের দার্শনিক কলেবর রচিত হয় সংস্কৃত সাহিত্যে সুপণ্ডিত গোস্বামীদের হাতে। বৃন্দাবনে, ছয়গোস্বামী মূলতঃ সংস্কৃতভাষা ও সাহিত্যকে অবলম্বন করেই শ্রুতি-স্মৃতির নির্দিষ্ট প্রাচীন শাস্ত্রীয়-পথে এই ধর্ম-সংস্কৃতির রূপদান করেন। বৃন্দাবন-মথুরা ও রাজস্থানে ক্রমশঃ এধর্মের প্রসার ঘটে। কালক্রমে, কলাকেন্দ্রিক প্রাচীন ভাগবধর্মের উত্তরসূরী, এই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের একটি বিশিষ্ট কলা-কলেবর রচিত হয়। কেন্দ্রীয় মোগলশাসনের প্রেক্ষাপটে এই সুসমৃদ্ধ কলাকলেবর সহ গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ভারতের বিভিন্ন অংশে বিস্তার লাভ করে। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে বিষ্ণুপুর, এই ধর্মসংস্কৃতির একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র হয়ে উঠে। এখানের মন্দির-টেরাকোটায়, পুঁথির পাটাচিত্রে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের শিল্পরূপের আভাস পাওয়া যায়। এখানের সতেরোর শতকের একাধিক মন্দিরে হাজার হাজার টেরাকোটা-চিত্রের সমাবেশ—পুঁথির পাটাচিত্রের প্রাচুর্যও কম নয়। এখানের মন্দির টেরাকোটায় বেসু-রিলিফে উদ্গত চিত্রগুলিতে রাজস্থানী-চিত্রশৈলীর প্রভাব সুস্পষ্টভাবে অনুভব করা যায়—পাটাচিত্রগুলিতে এপ্রভাব স্পষ্টতর। টেরাকোটা চিত্রের বিষয়বস্তুর দার্শনিক ব্যঞ্জনায়, মোটিফগুলির ঐতিহ্যধর্মিতায় এগুলির উপর প্রাচীন হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির প্রভাব সুস্পষ্টভাবেই উচ্চারিত হয়েছে, দেখা যায়। তাছাড়া বিষ্ণুপুরের-ধ্রুপদ সঙ্গীতে এবং বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদের সংগৃহীত কয়েকহাজার সংস্কৃত (কাব্য, নাটক, অলঙ্কারশাস্ত্র, ন্যায়-স্মৃতি) পুঁথিতে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্মের প্রাচীন ভারতীয় হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটটি সমুদ্ভাসিত। টেরাকোটা বা পাটাচিত্রে অনুভূত রাজস্থানী চিত্রশৈলী নিঃসন্দেহে লোকশৈলী হলেও উপলব্ধির গভীরতায়, রোমান্টিক

কল্পলোক রচনায় বিশেষ করে প্রেম শ্রদ্ধা-ভক্তি-শরণাগতির ব্যঞ্জনাময় মূর্ছনায় তথাকথিত গ্রাম্য-লোক-চিত্রশৈলী থেকে এর পার্থক্য বা কৌলীন্য একনজরেই ধরা পড়ে। লোকায়ত-টেরাকোটা-মাধ্যমে বিকশিত হলেও এখানের (বিষ্ণুপুর) টেরাকোটা-শিল্পের একটি পরিশীলিত, মার্জিতরুচির ধ্রুপদী আবেদন, পরবর্তীকালের (অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকের) মন্দির-টেরাকোটার লৌকিক-আবেদন থেকে পৃথক।

বিষ্ণুপুরের সতেরোর শতকের মন্দির-টেরাকোটায় সমকালীন বৈষ্ণবধর্মের উচ্চ তত্ত্ব-দর্শনের বাতাবরণ ভেদকরে লোকায়ত জীবন, বিশেষ করে নিম্নবর্গীয় জনস্তরের অনুপ্রবেশ অসম্ভব ছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম-সংস্কৃতির ধাতুপ্রকৃতিতে বাস্তব লোক-জীবন নিরপেক্ষ এক অতীন্দ্রিয় ভাবসর্বস্বতারই প্রাধান্য। বিশেষ করে এধর্মের শিল্প-সাহিত্যে, প্রথাবদ্ধ নির্মাণরীতির তত্ত্বঘন বয়ন-বৈচিত্র্যে সমাজ সংসারের কলরব-কোলাহল একরূপ অবাঞ্ছিতই ছিল। এমনকি বাঙলা ভাষায় লিখিত হলেও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের অনুশাসনে রচিত এযুগের বৈষ্ণব পদাবলীতেও বাস্তব সমাজজীবন প্রায় উহ্য। এযুগের মন্দির-টেরাকোটাতেও কৃষ্ণলীলা-রামায়ণ-মহাভারতের উপস্থাপনে স্মার্ত-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ঐতিহ্য রূপায়ণের প্রয়াসই সুস্পষ্ট। এ জগত থেকে প্রাকৃত নিম্নবর্গীয় লোকজীবন অনেক দূরবর্তী ছিল। অবশ্য সমকালীন রাজন্যবর্গের বা অভিজাতশ্রেণীর বিলাস জীবন বিষ্ণুপুরের মন্দিরে চিত্রিত হয়েছে, সামন্ত-আনুগত্যের স্মারকরূপে। নিম্নবর্গীয় জনস্তরের এখানে স্থান সংকুলানের কথা নয়। সেদিক থেকে চর্যাপদের যোগ্য উত্তরসূরী মঙ্গলকাব্য ; এমনকি শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের প্রেক্ষাপটেও গ্রাম্য লোকজীবনের আভাস দুর্নিরীক্ষ্য নয়। এসব কাব্য কথায় লোকজীবনের চিত্রই শুধু নয়, চর্যাপদের মতই অনেকক্ষেত্রে (মঙ্গলকাব্যে) লোকজীবনের নিম্নস্তরে পুঞ্জীভূত, উচ্চকোটি মানুষের বিরুদ্ধে, ক্ষোভেরও আভাস পাওয়া যায়।

অষ্টাদশ-শতকের শেষ থেকে আরম্ভ করে ঊনবিংশ শতক জুড়ে ইংরাজ রাজত্বের পরিবর্তিত প্রেক্ষাপটে উদ্ভূত নয়া জমিদারদের প্রতিষ্ঠিত টেরাকোটা মন্দিরে আভিজাত্য আকাঙ্খাই প্রাধান্য পেয়েছে।

সম্পূর্ণ ভিন্নগোত্রের এইসব জমিদারদের নীতিনির্দিষ্ট কোন ধর্মীয় বা সাংস্কৃতিক দায় ছিলনা। প্রাচীন ধর্মীয় ঐতিহ্যও তখন অস্পষ্ট। এদের প্রতিষ্ঠিত মন্দিরের টেরাকোটা-বিন্যাসের ক্ষেত্রে তাই স্বাভাবিক ভাবে উদ্ভূত এক শিথিল পরিবেশে বিচ্ছিন্ন বিশ্লিষ্টভাবে বিন্যস্ত কৃষ্ণলীলা-রামায়ণ-মহাভারতের টেরাকোটার সঙ্গে বেশকিছু উজ্জ্বল সমাজচিত্র স্থান করে নিয়েছে। শুধু তাই নয়, এযুগের মন্দির টেরাকোটার স্টাইল, বিষয়বস্তুর সর্বত্র এক আমূল পটপরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এযুগের টেরাকোটার গঠনশৈলীতে বাঙলার কুম্ভকার শিল্পীদের পুতুল-প্রতিমা গড়ার লোকশৈলীটির সুস্পষ্ট প্রকাশ। বিষয়বস্তুতেও মঙ্গলকাব্য আর লোককথার অনুপ্রবেশ এবং চিত্রভাষায় পটুয়া পটের লৌকিক আবেদন অনেক মোটিফে সুস্পষ্ট। মোগল কেন্দ্রীয় শাসনের অবসানে, যথানিয়মে সতেরোর শতকের ঐতিহ্যমণ্ডিত কেন্দ্রীয় স্টাইলটির পরিবর্তে তার স্থান নিয়েছে বাঙলার দেশীয় লোকশৈলী।





প্রথম পরিচ্ছেদের সার সমীক্ষা

প্রথম পরিচ্ছেদে টেরাকোটা-শিল্পের বিকাশ-বিবর্তনের মাধ্যমে ভারত-সংস্কৃতির একটি রূপরেখা অঙ্কনের চেষ্টা করা হয়েছে, এবং বিষ্ণুপুরের সপ্তদশ শতকের মন্দির-টেরাকোটায় তার ছায়াপাত প্রসঙ্গেও কিছু কিছু ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। বর্তমান পরিচ্ছেদে, পূর্ব বক্তব্যের সারাংশ রচনা ও তাকে অনুসরণ করে, সমীক্ষার মাধ্যমে, বিশেষভাবে বিষ্ণুপুরের মন্দির-টেরাকোটার পশ্চাদ্বর্তী ধর্মদর্শন ও তত্ত্বে এবং টেরাকোটা-চিত্রের বিষয়বস্তু ও রচনাশৈলীতে ভারত-সংস্কৃতির উত্তরাধিকারের সূত্র আবিষ্কারের চেষ্টা করা হ'ল। ভারতের রাজধানী দিল্লী থেকে দূরবর্তী এক অরণ্য-কান্তারে অবস্থিত হলেও তদানীন্তন বিষ্ণুপুরে বিকশিত টেরাকোটা-ভাস্কর্যে যে প্রাচীন এবং মধ্যযুগের ভারত-সংস্কৃতির ছায়াপাত ঘটেছে, সে ইঙ্গিত আগেই দেওয়া হয়েছে। পুরী থেকে বৃন্দাবনের পথের ধারে বিষ্ণুপুরের অবস্থান। বৃন্দাবন থেকে এপথ ধরেই আগত বৈষ্ণব গোস্বামীদের পুঁথির গাড়ী লুঠ হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে শ্রীনিবাসের মল্লরাজসভা-বিজয় এবং মল্লরাজা বীরহাম্বীরের বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষার বিষয়টি সর্বজনবিদিত। এরপর প্রায় দু'শবছর ধরে বিষ্ণুপুর গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের এক বিশিষ্ট কেন্দ্ররূপে বঙ্গদেশে খ্যাতিলাভ করে।[1] গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রেরণাতে বিষ্ণুপুরে

১ গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রধান কেন্দ্র সর্বপ্রথম ছিল নবদ্বীপ। চৈতন্যের সংন্যাসের পর নবদ্বীপের আলোক নিভিয়া যায়। চৈতন্যদেব অষ্টাদশ বৎসর পুরীতে ছিলেন। তাঁহার তিরোধান পর্যন্ত সেই আলোককেন্দ্র পুরীধামে প্রবর্তিত হয়। তারপর কয়েকবৎসর ১৫৩৩ হইতে ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত অর্দ্ধশতাব্দীর অধিককাল সেই আলোক বৃন্দাবনে জ্বলিতে থাকে। ষট্ গোস্বামীরা এই আলোক জ্বালাইয়া রাখিয়া-

শিল্প সংস্কৃতির অত্যুচ্চ বিকাশ ঘটেছিল. টেরাকোটা-মন্দিরগুলি তারই অন্যতম ফলশ্রুতি। শুধু হাজার-হাজার টেরাকোটা-চিত্রের চারু অলঙ্করণে সজ্জিত মন্দিরগুলিতে অসামান্য রূপময় রসময় শৈল্পিক আবেদন সৃষ্টিই এগুলির প্রতিষ্ঠার পিছনে একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলনা, মন্দিরের ভিত্তিচিত্রে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের বিশিষ্ট দার্শনিক আবেদনটিকেও পোড়ামাটিতে বাঙময় করে তোলার সচেতন এবং উদগ্র প্রয়াস ছিল সমান সক্রিয়। শ্যামরায় মন্দিরের বাইরে ভিতরে এমনকি ছাদের 'শিলিং' এ কয়েক সহস্র টেরাকোটার সুচারু বিন্যাসে শুধু অলঙ্করণ-উৎকর্ষই নয় গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের অধ্যাত্ম-দর্শনের এক নৈষ্ঠিক রূপায়ণ প্রচেষ্টাও লক্ষ্য করা যায়। এই জন্যেই বোধহয়, এই মন্দিরটির টেরাকোটা অলঙ্করণ ইত্যাদির উপর সজাগ দৃষ্টি রাখা হয়েছিল। মন্দিরের গর্ভগৃহে রাজা, যুবরাজ এবং বৈষ্ণব-গোস্বামীদের নাম এবং বারান্দা ও বাইরের দেওয়ালে ভারপ্রাপ্ত রাজকর্মচারী, কোন বিষ্ণুপদ সরকারের নাম তারই ইঙ্গিত দেয়। একথা মনে করা অসঙ্গত নয় যে, মল্লরাজ বীরহাম্বীরের বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা এবং শ্রীনিবাস আচার্যের বিষ্ণুপুরে অবস্থিতিকে কেন্দ্র করে এখানের বৈষ্ণব ধর্মদর্শনের তথা ভাবভক্তির যে উষ্ণ পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল তারই প্রেক্ষাপটে রচিত এই মন্দিরগুলিতে স্বাভাবিকভাবেই ধর্মদর্শন ও শিল্প-সৌকর্যের যুগপৎ আবেদন মূর্ত হয়ে উঠেছে। আগেই বলা হয়েছে, গুপ্তযুগে বিশেষভাবে বিকশিত ভাগবদ্ধর্মের দার্শনিক এবং নান্দনিক উত্তরাধিকার বা তার প্রভাব গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মসংস্কৃতিতে এসে বর্তেছে। ভাগবদ্ধর্মও একাধারে ধর্ম ও শিল্পের বাহন হয়ে উঠেছিল গুপ্তযুগে। এ সময় রাজস্থানের হনুমানগড় থেকে সুরতগড় (রঙমহল) পর্যন্ত অঞ্চল ভাগবদ্ধর্মীরা মন্দির-স্থাপত্য আর টেরাকোটা-ভাস্কর্যে সৌন্দর্যময় করে তুলেছিল।

ছিলেন। তাঁহাদের স্বর্গারোহনে—বিশেষতঃ জীবগোস্বামীর তিরোধানের সহিত সেই আলোক বৃন্দাবনে নিষ্প্রভ হইলে, শ্রীনিবাস আচার্য সেই আলোক বিষ্ণুপুরে প্রজ্বলিত করেন। সেই থেকে পূর্ণ দুই শতাব্দীকাল বিষ্ণুপুর রাজসভাই বৈষ্ণবধর্ম প্রচার ও বৈষ্ণব শিক্ষাদীক্ষার কেন্দ্রস্বরূপ ছিল।"
বৃহৎবঙ্গ (দ্বিতীয়খণ্ড) দীনেশচন্দ্র সেন : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় : পৃঃ ১১০৮

এসময়ের শিল্পসাহিত্যে সমন্বয়বাদী ভাগবদ্ধর্মের ভাবভক্তির পরিমণ্ডলে "বৈষ্ণব ও মাহেশ্বর কাল্ট" যে একত্র বিধৃত হয়েছিল, রঙ্‌মহলের টেরাকোটা এবং কালিদাসের কাব্যে তার প্রতিফলনের কথাও পূর্বপরিচ্ছেদে আলোচিত হয়েছে। বিষ্ণুপুরের মন্দির-টেরাকোটায় বৈষ্ণব ও মাহেশ্বর কাল্টের একত্র সমাবেশের কথাও আগেই বলা হয়েছে। ভাগবদ্ধর্মের ধাতুপ্রকৃতিতে নিহিত সমন্বয়-বুদ্ধি যে তার উত্তরাধিকারী গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রেরণায় নির্মিত বিষ্ণুপুর-মন্দির-টেরাকোটার উমামহেশ্বর, হরিহর প্রভৃতি চিত্রে উদ্ভাসিত হয়েছে, কিংবা একই সঙ্গে বিন্যস্ত বিষ্ণুর নৃসিংহ অবতার আর 'পঞ্চানন শিব' এর টেরাকোটা-চিত্রে রূপলাভ করেছে, সে ইঙ্গিতও ইতিপূর্বে দেওয়া হয়েছে। শুধু বিষয়বস্তুর দিক থেকেই নয়, ভাগবদ্ধর্মের দার্শনিক বা নান্দনিক আদর্শটিও এখানের মন্দির সুস্পষ্ট। প্রাচীন ভারতীয় 'ক্লাসিক' বাদ্যযন্ত্র সহযোগে সঙ্গীতচর্চা কিংবা শত শত নৃত্যচিত্রের (জোড়বাংলা মন্দিরে) মাধ্যমে ভুক্তি-মুক্তি'র নান্দনিক বা আধ্যাত্মিক আদর্শটির প্রতিফলন এখানের মন্দির টেরাকোটায় দুর্নিরীক্ষ্য নয়। আগেই বলা হয়েছে, যে, 'ভুক্তিমুক্তি'র নান্দনিক ও দার্শনিক আদর্শটি গুপ্তযুগে কালিদাসের কাব্য থেকে জয়দেবের গীতগোবিন্দ বরাবর রূপগোস্বামীতে এসে পৌঁছেছে। শৃঙ্গাররসে ভক্তিশ্রীর বিশিষ্ট আবেদন এ আদর্শের মূলসূত্র। সম্ভোগমনস্ক অথচ ভক্তিবিনম্র রাজস্থানী চিত্ররীতিতে 'ভুক্তিমুক্তি'র নান্দনিক আদর্শটির সার্থক মর্মানুবাদই যেন সম্পন্ন হয়েছে। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে রাজস্থানের বিভিন্ন কলাকেন্দ্রে শ্রীমদ্ভাগবত আর গীতগোবিন্দ থেকে চিত্রাঙ্কণ খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। বিশেষতঃ 'গীতগোবিন্দম্' এর ছন্দ-গীতিময় রূপকল্প-গুলি রাজস্থানী রীতিতে তার সার্থক মাধ্যম যেন খুঁজে পেয়েছিল। কথিত আছে, জয়দেব-দম্পতি নৃত্যগীতের মাধ্যমে শ্রীকৃষ্ণের অর্চনা করতেন।[২] গীতগোবিন্দম এর রূপকল্পগুলিতে নৃত্যের ব্যঞ্জনাময় এক

---

২ উভৌ তৌ দম্পতি তত্র একপ্রাণৌ বভূবতুঃ।
নৃত্যন্তৌ চাপি গায়ন্তৌ শ্রীকৃষ্ণার্চ্চন তৎপরৌ ॥ —ভক্তমাল

অনির্বচনীয় ভাবাতিরেক যেন উজ্জ্বলরসাত্মক প্রেমভক্তির পথে অসীমে উধাও হতে চেয়েছে। ভুক্তি-মুক্তির বিশিষ্ট সাধনপথটি জয়দেবের গীতগোবিন্দম্ এর মূলসুরের সঙ্গে এমনি করে অবিনাবদ্ধ। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের আকরগ্রন্থ 'শ্রীমদ্ভাগবত' আর 'গীতগোবিন্দ'এর রূপকল্পগুলির চিত্ররীতি উত্তরভারত থেকে বৈষ্ণবধর্মের সঙ্গে বিষ্ণুপুরে প্রবেশ করে টেরাকোটা আর পাটাচিত্রে মূর্ত হয়েছিল, এটা অনুমান করা বোধ হয় অসঙ্গত নয়। বিষ্ণুপুরের মন্দির-টেরাকোটায়, এক লোকায়ত ভিত্তিভূমির উপর প্রতিফলিত রাজস্থানী চিত্ররীতির প্রভাবে বিকশিত, ছন্দোময় ঋদ্ধ স্টাইলটি সহজেই চোখে পড়ে। বিষ্ণুপুর অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত পুথির প্রচুর পাটাচিত্রে এর স্পষ্টতর প্রভাবের কথাও আগেই বলা হয়েছে। বিষ্ণুপুরের ধার-পাশ থেকে প্রচুর চিত্রিত পুথির পাটা সংগৃহীত হয়ে বিভিন্ন সংগ্রহশালায় স্থান লাভ করেছে। সাম্প্রতিককালে, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ সংগ্রহশালা থেকে প্রকাশিত ১২খানি পাটাচিত্রের আলোকচিত্র সম্বলিত ''পোস্টকার্ড-সেট''এর অর্ধেকগুলিই বাঁকুড়া থেকে সংগৃহীত। বাঁকুড়ার পাটাচিত্রগুলিতে বিশেষভাবে বিকশিত ঋদ্ধ অঙ্কনরীতিটি বিশিষ্ট কলাসমালোচকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে—দেখা যায়। লোক উপাদানের উপস্থিতি সত্ত্বেও চিত্রগুলির কম্পোজিশন, সূক্ষ্ম ড্রইং ও রুচি সম্পন্ন বর্ণবিন্যাসে রাজস্থানী প্রভাব সুস্পষ্ট।[৩] যে কোন দেশের যে কোন অঞ্চলে

---

3 12 Cards of Bengal manuscript covers. The Ms. covers from districts Hooghly, Midnapore, Bankura, Birbhum, and Murshidabad in Bengal present a most rich and varied selection of this form of art, which is now well-known to connoisseurs of Indian painting. Particularly fine are those from Bankura, with their lacquer red backgrounds, gracefully poised figures and decorative trees and foliage. The fondness for a red background

বিকশিত সমকালীন শিল্পকলার ধাতু প্রকৃতিতে একটা মিল সচরাচর দৃষ্ট হয়। সমসাময়িক কালের চিত্র এবং ভাস্কর্যের মধ্যে নির্মাণ-রীতির মিল থাকাটা শিল্পজগতে প্রায় প্রতিষ্ঠিত একটি সূত্র বিশেষ। বিষ্ণুপুরের মন্দির-টেরাকোটায় বেসরিলিফে উদ্গত চিত্রধর্মী আঙ্গিকে পরিস্ফুট মোটিফগুলিতে এবং পাটাচিত্রে একই রাজস্থানী প্রভাব স্বাভাবিক ভাবেই অনুভব করা যায়। রাজস্থানী চিত্রের কিছু জনপ্রিয় বিষয় এবং 'টাইপ-মোটিফ'ও এখানের টেরাকোটায় লক্ষ্য করা যায়। শুধু বৈষ্ণব শিল্পকলাতেই নয়, বেশ কিছু টাইপ-মোটিফের মাধ্যমে বিভিন্নযুগে বিভিন্ন স্তরের মানুষের বিভিন্ন ধরণের আধ্যাত্মিক বা অনাধ্যাত্মিক আশা-আকাঙ্খার প্রকাশ ঘটে। সব যুগেই এমনি কিছু টাইপ-মোটিফের প্রচলন সমকালীন চিত্র-ভাস্কর্যে যুগপৎ লক্ষ্য করা যায়। কৌশাম্বী থেকে প্রাপ্ত শুঙ্গ-কুষাণ যুগের টেরাকোটায় শুক-ক্রীড়ার বিবিধপ্রকার মূর্তিকার কথা আগেই বলা হয়েছে। সমসাময়িক কালের 'গিরিচিত্রেও অনুরূপ মোটিফ লক্ষ্য করা গেছে। সম্প্রতি প্রকাশিত একটি-গ্রন্থে, ভূপাল থেকে ৩০ কি. মি, দূরবর্তী 'গেলপুরে'র গিরিচিত্রে একদল যোদ্ধার পাশে এক শুকপাখী হাতে এক নারীমূর্তির সচিত্র উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। এই গিরিচিত্রকেও কুষাণযুগের বলেই চিহ্নিত করা হয়েছে।[৪] যাইহোক, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্মের প্রেরণায় ষোড়শ শতকের শেষ থেকে অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্যন্ত সময়ে বিষ্ণুপুরে শিল্পকলা, শিক্ষা-দীক্ষা, চর্চা-চিন্তার যে

---

in all the covers which are illustrated is a noticeable feature. The folk element is of course present but there is a finesse in presentation and a degree of technical skill which differentiates them from characteristic examples of folk art. They are all belong to the 17th and 18th centuries A.D."

(LALIT KALA : No 9, April 1961, Review Page 69.)

4. Lines On Stone-The Prehistoric Art Of India.

Neumayer Erwin : Manohar Delhi 1993 P 182

বিকাশ ঘটে ছিল, সেটি সর্বভারতীয় প্রাচীন সংস্কৃতিরই একটি বিবর্তিত রূপ। অনেকে এটিকে সর্বভারতীয় ক্লাসিক সংস্কৃতির অন্তিম-মধ্যযুগীয় বিবর্তন রূপে অভিহিত করেছেন।[৫] এঁদের মতে, এসময় বিষ্ণুপুর শুধু এ অঞ্চলেই নয় পূর্বভারতের অন্যতম কলা-নগরীতে পরিণত হয়। এঁরা মনে করেন মধ্যযুগে বারাণসীর পূর্বদিকে, এক দক্ষিণ বিহারের গয়া এবং বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর ছাড়া প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যমণ্ডিত কোন কলানগরীর অস্তিত্ব ছিলনা।[৬] একথা মনে করা হয় যে, মল্লরাজ বীরহাম্বীরের সময় প্রধানতঃ দুটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিষ্ণুপুর তথা মল্লভূমের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মানোন্নয়ন ঘটেছিল। ষোড়শ-শতকে উড়িষ্যা-বিজয় উদ্দেশ্যে প্রেরিত এক অগ্রগামী মুঘল-সেনাদলের নেতৃত্ব দেবার সময় মানসিংহের নেশাগ্রস্ত পুত্র জগৎসিংহ মল্লরাজধানীর সন্নিহিত কোন অঞ্চল থেকে আফগানদের দ্বারা অপহৃত হলে, মল্লরাজ বীরহাম্বীর

---

5 Two centuries from the close of the 16th to the close of the 18th, saw the magnificent floraison of Bengali art and culture as a late provincial phase of our pan-Indian medieval art and culture— in and around Vishnupur, in the tract known as Mallabhum.

—By S.K.C. Modern Review for March 1933.

6 East of Benares, we have no town which is worth mentioning as a city of art— a town replete with noble architechtural monuments and with artistic traditions which still linger on, a town in which we find vestiges of a great past and of a great period of art, — excepting Gaya in South Bihar aud Vishnupur in Bankura district in West Bengal."

—The Music School At Vishnupur by S.K.C.
Modern Review for March 1933.

তাঁকে আফগান কবল থেকে মুক্ত করেন। ফলে মানসিংহ তথা মোগল রাজদরবারের দাক্ষিণ্যে বীরহাম্বীর বেশ কিছু দুর্গ এবং জমিদারীর অধিকার লাভ করে প্রতাপশালী মোগল-সামন্ত-জমিদারে পরিণত হ'লে বিষ্ণুপুর তথা মল্লভূমের রাজনৈতিক মানোন্নয়ন ঘটে। মনে হয়, শুধু মানসিংহের পুত্রকে বিপন্মুক্ত করার জন্যই নয়, উড়িষ্যা থেকে আফগান আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে 'মুঘল-রাজ' সীমান্তবর্তী মল্লরাজত্বের দিকে বিশেষ নজর দেয়। মল্লরাজধানীর জোরদার প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অবশেষ লক্ষ্য করলে আজও তা সহজেই বোঝা যায়। স্তবকের পর স্তবক গড়-গড়খাই, এবং মোগল-স্থাপত্য-রীতিতে নির্মিত সুদৃশ্য দুর্গদ্বার (পাথরদরজা) দিয়েই শুধু মল্লরাজধানীকে সুরক্ষিত করা হয়নি, আগ্নেয়াস্ত্র নির্মাণের এক প্রশস্ত ব্যবস্থাও করা হয়েছিল। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের কেল্লা-সংলগ্ন 'কামান-ডালা'র প্রান্তর তার সাক্ষ্য বহন করছে। শুধু তাই নয়, সমকালীন মুঘলবঙ্গের তিনটি বিপুলায়তন কামানের একটি রয়েছে বিষ্ণুপুরে। বিষ্ণুপুরের দলমাদল কামান, ঢাকার 'কালেখাঁ' এবং মুর্শিদাবাদের 'জাহানকোষার' সমকক্ষ। ঢাকা এবং মুর্শিদাবাদ তদানীন্তন বঙ্গে মোগল রাজধানী ছিল। তাছাড়া কথিত আছে যে, বিষ্ণুপুরের দক্ষিণপ্রান্তে (লালবাঁধের দক্ষিণ দিকে) 'তুড়কী'র (তুর্কী) বিশাল প্রান্তরে মল্লরাজাদের তুর্কী সৈন্যরা থাকত।[7] সব মিলিয়ে এই পাকাপোক্ত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা মল্লরাজধানীর গুরুত্ব এবং মর্যাদারই পরিচায়ক। অন্যদিকে, বিষ্ণুপুর তথা মল্লভূমের সাংস্কৃতিক গোত্রান্তর সম্পন্ন হয়েছিল, সমকালীন ভারতের বিশিষ্ট কলাকেন্দ্রিক গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের স্পর্শে। বিষ্ণুপুরের কাছে, বৃন্দাবন থেকে আগত বৈষ্ণবগ্রন্থ সম্ভার অপহৃত হওয়ার কথা আগেই বলা হয়েছে। 'পুথি চুরি'র ঐতিহাসিক ঘটনাকে কেন্দ্র করে শ্রীনিবাসের বিষ্ণুপুরে অবস্থিতি এবং শ্রীনিবাসের কাছে মল্লরাজ বীরহাম্বীরের দীক্ষার কথাও

---

7 There was also a standing army consisting of Turks. They encamped on the old site of '**Turki**', which got its name from them." —History of **Bishnupur-Raj** by **A. P. Mallik**, (Second Edn.), 1981, P-87.

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।[৮] ঘটনাটি শুধু বিষ্ণুপুর তথা মল্লভূমের ক্ষেত্রেই নয়, বাঙলার বৈষ্ণব জগতের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন—"শ্রীনিবাসের 'মল্লরাজসভা-বিজয়' বাঙ্গালার বৈষ্ণবধর্ম ও সংস্কৃতির ইতিহাসে এক বৃহৎ ঘটনা। সাহিত্যে না হোক সঙ্গীত ও কারুশিল্পে বাঙ্গালীর শিল্পভাবনা এখানে একটু নূতন পথে বিকশিত হয়ে উঠেছিল।[৯] ঘটনাটি যে বৃহৎ এবং অপরিসীম গুরুত্বপূর্ণ তা অনুমান করা যায়, এটিকে স্মরণীয় করে রাখার বিভিন্ন বিচিত্র বৈষ্ণব-প্রয়াসে। শুধু বৈষ্ণব গ্রন্থেই নয়, বৈষ্ণব পুথির পাটা-চিত্রে (চিত্রিত-মলাট-পাটায়) এবং মন্দির টেরাকোটায় বিষয়টি যুগপৎ চিত্রিত হয়েছে, দেখা যায়। সাম্প্রতিককালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ সংগ্রহশালা, পুথির-পাটা-চিত্রের আলোকচিত্র সম্বলিত যে 'পোস্টকার্ড সেটটি' প্রকাশ করেছেন, তার একটি পাটা-চিত্রকে 'বীরহাম্বীর-সকাশে-শ্রীনিবাস' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। অনুরূপ একটি পাটাচিত্র দেখেছি আমেদাবাদ (গুজরাট)-এর 'লালভাই-দলপত্ ভাই' সংগ্রহশালায়। বিষ্ণুপুরের মদনমোহন মন্দিরের দক্ষিণদিকের ত্রি-খিলান প্রবেশ পথের বাঁদিকের দেওয়ালের ভিত্তিসংলগ্ন পটিতে এই ধরণের একটি টেরাকোটা-চিত্র রয়েছে। চিত্রটির পরিকল্পনা বা কম্পোজিশন অবশ্যই পাটাচিত্র থেকে ভিন্ন তবু এখানে পুথিপাঠরত জনৈক বৈষ্ণব গোস্বামীর পাশে পাঠশ্রবণরত এক রাজপুরুষের চিত্র, বীরহাম্বীরের রাজদরবারে শ্রীনিবাসের ভাগবত-পাঠের ঘটনাটিরই ইঙ্গিতবহ। এটি যেন সেই ঐতিহাসিক ঘটনাটিরই 'স্মারক-চিত্র'। শ্রীনিবাসের মল্লরাজসভা বিজয়ের ঘটনা নানাদিক দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। এসময় ব্রজমণ্ডলের 'গোস্বামী সিদ্ধান্তে'র

---

৮ আষাঢ়ের কৃষ্ণপক্ষে তৃতীয়া দিবসে।
ভালদিন নাহি পরে বুঝিলা বিশেষে ॥
সেইদিন মন্ত্রদীক্ষা রাজার হবেক।
ঠাকুর বিদ্যমানে সামগ্রী করিল অনেক ॥
রাধাকৃষ্ণ মন্ত্রদিল ধ্যানাদিক যত।
শিক্ষা করাইল শ্রীরূপের গ্রন্থমত ॥ (প্রেম বিলাস/ত্রয়োদশ বিলাস)

৯ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস : প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ, ডঃ সুকুমার সেন।

সঙ্গে বঙ্গ বা গৌড়ের গৌরাঙ্গবাদীদের মতের অনৈক্য দেখা দিয়েছিল বলে অনেকে মনে করেন। একথাও মনে করা হয় যে, এই অনৈক্যের অবসান ঘটিয়ে ঐকমত প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায়েই বৃন্দাবন থেকে গোস্বামী গ্রন্থগুলি গৌড়ে পাঠান হয়েছিল। বিষ্ণুপুরের কাছে পুঁথি লুঠ ও শ্রীনিবাসের কাছে বীরহাম্বীরের শিষ্যত্ব গ্রহণের ঘটনাটি এই পরিপ্রেক্ষিতেও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তাই এই সংবাদ বৃন্দাবনে পৌঁছালে শ্রীজীব গোস্বামী পরম পুলকিত হয়েছিলেন এবং বীরহাম্বীরের "চৈতন্যদাস" নামকরণ করেছিলেন।[১০] শ্রীনিবাসের কাছে বীরহাম্বীরের শিষ্যত্ব গ্রহণের ফলে বঙ্গে একটি রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে শ্রীনিবাস (গোস্বামীমতের ধারক-বাহক) এখানে প্রতিষ্ঠালাভের সুযোগ পেয়েছিলেন। পরবর্তীকালে গৌড় এবং ব্রজমণ্ডলের বৈষ্ণবদের মধ্যে মতানৈক্য যে দূর হয়েছিল, খেতুরির মহোৎসবেই তা প্রতিভাত হয়। এখানে রূপ-নির্দেশিত বিধি অনুসরণ করেই শ্রীগৌরাঙ্গের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয। একথা মনে রাখতে হবে, খেতুরীর মহোৎসবের আয়োজন হয়েছিল যে নরোত্তমের প্রেরণায় এবং প্রচেষ্টায়, তিনি বৃন্দাবন থেকে আগত পুঁথির গাড়ীর তিনজন তত্ত্বাবধায়কের অন্যতম (শ্রীনিবাস, নরোত্তম, শ্যামানন্দ পুঁথির সঙ্গে আসছিলেন)। বলাবাহুল্য খেতুরির মহোৎসবে শ্রীনিবাস উপস্থিত ছিলেন। প্রেমবিলাস, ভক্তিরত্নাকর, অনুরাগবল্লী, কর্ণানন্দ প্রভৃতি বৈষ্ণবগ্রন্থে, গোস্বামী-গ্রন্থরাজি সহ শ্রীনিবাসাদি সকলের বৃন্দাবন থেকে গৌড়ে গমনের যে বর্ণাঢ্য এবং অনুপুঙ্খ বর্ণনা আছে তা থেকেই পুঁথি প্রেরণের গুরুত্ব অনুমিত হয়। বৈষ্ণবতত্ত্ব ব্যাখ্যায় শ্রীনিবাসের অসাধারণ ব্যুৎপত্তি দেখে পূর্বাহ্লেই শ্রীজীব গোস্বামী তাঁকে "আচার্য" উপাধি দান করেন। গ্রন্থসহ বৃন্দাবন ত্যাগের পূর্বে শ্রীনিবাস ভূগর্ভ গোঁসাই আর গোপাল ভট্ট সন্দর্শনে গেলে গোপাল ভট্ট 'স্বরক্ষিত গৌরের কৌপীন ও বহির্বাস শ্রীনিবাসের মাথায় বেঁধে

---

১০ শ্রীজীব গোস্বামী হইলা প্রসন্ন তোমারে ।।
শ্রীচৈতন্য দাস নাম থুইল তোমার ।
শুনিয়া রাজার নেত্রে বহে অশ্রুধার ।। ভক্তিরত্নাকর, নবমতরঙ্গ পৃঃ ৫৮০

দিয়ে প্রকারান্তরে তাঁকে তাঁর যোগ্য উত্তরাধিকারী নির্বাচন করেন। লোকনাথ গোস্বামী তাঁর শিষ্য নরোত্তমকে শ্রীনিবাসের হস্তে সমর্পণ করেন—শ্রীজীব সমর্পণ করেন শ্যামানন্দকে। গ্রন্থসম্পুট বহন করার জন্য চারটি বলিষ্ঠ বলদ এবং দুটি গাভী প্রস্তুত ছিল। সঙ্গে যাবার জন্য প্রস্তুত ছিল দশজন লোক। বৃন্দাবনের গোস্বামীদের আশীর্বাদ নিয়ে গোবিন্দমন্দির থেকে যাত্রা সুরু হয়। শ্রীনিবাস সেই ছোট দলটি নিয়ে অগ্রসর হলে জীব গোস্বামী তাঁদের সঙ্গে মথুরা পর্যন্ত এসে তারপর বিদায় নেন। প্রায় সমস্ত গোস্বামী গ্রন্থই এই গ্রন্থসম্পুটের অন্তর্ভুক্ত ছিল।[১১] পুথি লুঠকে কেন্দ্র করে বিষ্ণুপুরে এক সমৃদ্ধ বৈষ্ণবকেন্দ্র গড়ে ওঠার কথা ইতিপূর্বে একাধিকবার বলা হয়েছে। এ সময় বিষ্ণুপুর তথা মল্লভূমে বৈষ্ণবধর্মের প্রবল-প্রভাবের কথা 'ভক্তিরত্নাকর' প্রভৃতি বিখ্যাত বৈষ্ণবগ্রন্থগুলি থেকে সুস্পষ্টরূপে বোঝা যায়। সমগ্র বিষ্ণুপুর বৈষ্ণবধর্মের বন্যায় প্লাবিত হয়।[১২] বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বিষ্ণুপুর শাখা-সংগৃহীত প্রাচীন পুথির বিপুল সঞ্চয়েও এই ঘটনার ছায়াপাত লক্ষ্য করা যায়। এই সংগ্রহে অধিকাংশ গোস্বামী গ্রন্থেরই প্রতিলিপি বর্তমান। এগুলি থেকে বিষ্ণুপুরে শ্রীনিবাস তথা গোস্বামী-সিদ্ধান্তের সুদৃঢ়

---

১১ গৌড়দেশে লক্ষ গ্রন্থ কৈলা প্রকটন ।।
শ্রীরূপ গোস্বামিকৃত যত গ্রন্থগণ ।
যত গ্রন্থ প্রকাশিলা গোস্বামী সনাতন ।।
শ্রীভট্ট গোসাঞি যাহা করিলা প্রকাশ ।
রঘুনাথ ভট্ট আর রঘুনাথ দাস ।।
শ্রীজীব গোস্বামিকৃত যত গ্রন্থচয় ।।
কবিরাজ গ্রন্থ যত কৈলা রসময় ।। —কর্ণানন্দ

১২ এইভাবে শ্রীনিবাস গ্রন্থপ্রাপ্তির সহিত একত্রে রাজা-হাম্বীর এবং তাঁহার পরিবারবর্গ ও রাজসভাস্থ সকলের হৃদয় জয় করিয়া বিষ্ণুপুর মধ্যে বিপুল সম্মান লাভ করিলেন। সমস্ত বিষ্ণুপুর বৈষ্ণবধর্মের বন্যায় প্লাবিত হইল।—চৈতন্য-পারিকর : শ্রীরবীন্দ্র নাথ মাইতি : পৃঃ ৫৫৫ : বুকল্যাণ্ড প্রাঃ লিঃ ১৯৬২।

প্রতিষ্ঠার কথাও সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়। শ্রীনিবাস আচার্য ছিলেন তদানীন্তন ভারতের গোড়ীয় বৈষ্ণব সমাজে প্রথম সারির নেতা। জীব গোস্বামীর পরম আস্থাভাজন ছিলেন তিনি। শ্রীজীব তাঁর উপর গোড়ে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের সমস্ত দায়িত্ব দিয়ে নিশ্চিন্ত ছিলেন। শুধু তাই নয়, খেতুরির বিখ্যাত মহোৎসবেও শ্রীনিবাসের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। বৈষ্ণব জগতে সে সময় খেতুরির মহোৎসবের ভূমিকা যে তাৎপর্যপূর্ণ ছিল তা আগেই বলা হয়েছে। এই মহোৎসবের উদ্যোক্তা নরোত্তম এবং মহোৎসবের প্রধান পুরুষ শ্রীনিবাস। বলা বাহুল্য বৈষ্ণবজগতের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে শ্যামানন্দও এই উৎসবে যে উপস্থিত ছিলেন তাও বৈষ্ণবগ্রন্থ থেকে জানা যায়। এক কথায় বলা যায়, বৃন্দাবন থেকে গোড়ে গোস্বামী-গ্রন্থসহ যাঁদের পাঠান হয়েছিল এবং যাঁদের উপর গোড়বঙ্গে গোস্বামী-সিদ্ধান্ত তথা গোড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্মপ্রচারের ভার ছিল সেই শ্রীনিবাস, নরোত্তম, শ্যামানন্দের এই উৎসবে উপস্থিতি এবং আধিপত্য থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, এসময় নাগাদ গোড়ে গোস্বামী-সিদ্ধান্ত সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। শ্রীনিবাস আচার্যের মত এক বিরাট বৈষ্ণব-ব্যক্তিত্বের বিষ্ণুপুরে প্রায় স্থায়ীভাবে উপস্থিতি বা বসতি বিষ্ণুপুরকে যে অসামান্য এক বৈষ্ণব সংস্কৃতি কেন্দ্রে পরিণত করেছিল তা সহজেই বোঝা যায়। বিষ্ণুপুর শ্রীনিবাসের এক বিশিষ্ট সাধনপীঠে পরিণত হয়েছিল। আজও বিষ্ণুপুরের গোস্বামীপাড়ায় শ্রীনিবাসের সাধনপীঠের অস্তিত্ব বর্তমান এবং তার পাশেই কন্যা হেমলতার প্রতিষ্ঠিত শ্রীরাধারমণ জীউ বিগ্রহের ভগ্নমন্দিরও বিদ্যমান। এখনও বিষ্ণুপুরের কবিরাজ (দাশগুপ্ত)দের কুলদেবতা শ্রীশ্রীরাধাদামোদর জীউ এর মন্দিরে পূজিত হচ্ছে শ্রীনিবাস আচার্যের বলে কথিত একজোড়া কাঠের খড়ম। খেতুরির-মহোৎসব সম্পন্ন করে শ্যামানন্দ সহ শ্রীনিবাস যখন নরোত্তমের কাছে বিদায় চাইলেন, তখন নরোত্তম বিচ্ছেদ-ভাবনায় কাতর হলে, শ্রীনিবাস বলেছিলেন তাঁর তিনটি ঘর—যাজিগ্রাম, খেতরি আর বিষ্ণুপুর।[১৩] শ্রীনিবাসকে কেন্দ্র করে তদানীন্তন বঙ্গের বিশিষ্ট

---

১৩ তিনঘর হৈল তাহা কহিয়ে বিশেষে।
খেতরি যাজিগ্রাম বিষ্ণুপুর তিনদেশে॥

বৈষ্ণব ব্যক্তিত্বের বিষ্ণুপুরে যাতায়াত চলত। এসময়ে বঙ্গের বৈষ্ণব-জগতে শ্রীনিবাস ছাড়াও নরোত্তম, রামচন্দ্র কবিরাজ, তাঁর ভ্রাতা গোবিন্দদাস ছিলেন বিশিষ্ট তাত্ত্বিক-ব্যক্তিত্ব। স্বয়ং শ্রীজীব গোস্বামীর প্রযত্নে বৈষ্ণবজগতে এঁদের প্রতিষ্ঠা দৃঢ় হয়। হয়ত গৌড়ে গোস্বামী সিদ্ধান্ত প্রচারের ক্ষেত্রে এঁদের সুপ্রতিষ্ঠার প্রয়োজন ছিল। রামচন্দ্র কবিরাজ ও তাঁর ভ্রাতা গোবিন্দদাস উভয়েই শ্রীনিবাসের শিষ্য ছিলেন। কথিত আছে, বিষ্ণুপুরে থাকাকালীন একবার শ্রীনিবাস ভাবাবেগে সম্বিত হারালে, শ্রীনিবাসের প্রথমা-পত্নীর নির্দেশে রামচন্দ্র কবিরাজকে বিষ্ণুপুরে আনা হয়, এবং রামচন্দ্র বিষ্ণুপুরে এসে শ্রীনিবাসের চৈতন্য সম্পাদন করেন। বিষ্ণুপুরের রাজা বীরহাম্বীর রামচন্দ্রকে সসম্মানে একটি গ্রামদান করেন।[১৪] মল্লরাজ বীরহাম্বীর যে শুধু শ্রীনিবাসের শিষ্যই ছিলেন তাই নয়, বৈষ্ণবজগতে তাঁর একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। বৈষ্ণবগ্রন্থ থেকে তাঁর শ্রীনিবাস তথা বৈষ্ণবধর্মে গভীর এবং নিবিড় ভাবভক্তির নানা দৃষ্টান্তও

গৌরাঙ্গ আশ্রয় আর মাতার পিরিতি।
বিষ্ণুপুরে রহি রাজার নবীন ভকতি।
একবার যাই আমি আসিব পুনর্বার।
(প্রেমবিলাস-১৪শ বি; পৃঃ ২০৭ঃ 'চৈতন্য পরিকর' দ্রষ্টব্য)

১২ প্রেমবিলাস ও কর্ণানন্দের বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, একবার বনবিষ্ণুপুরে শ্রীনিবাস-আচার্য ভাবাবেশে সম্বিৎ হারাইয়া ফেলিলে তাঁহার প্রথমাপত্নী দ্রৌপদী ('কর্ণানন্দ' হইতে জানা যায় সেসময় শ্রীনিবাস দুইপত্নীকে লইয়া বিষ্ণুপুরে বাস করিতেছিলেন।) রামচন্দ্র কবিরাজকে আনাইবার নির্দেশ দিয়া সমবেত শিষ্যবৃন্দকে জানান যে, রামচন্দ্রই শ্রীনিবাসের প্রকৃত মর্মবেত্তা, এবং সেই জন্যই শ্রীনিবাস ব্রাহ্মণ হওয়া সত্ত্বেও রামচন্দ্রের নিকট জাতিকুলের সকল ব্যবধান ঘুচাইয়া দিয়াছিলেন। এইভাবে দ্রৌপদী-ঈশ্বরী কর্তৃক রামচন্দ্রের বহুবিধ গুণবর্ণনার পর রামচন্দ্রকে আনা হইলে তিনি শ্রীনিবাসকে প্রকৃতিস্থ করিতে সক্ষম হন। কর্ণানন্দকার বলেন যে, এই ব্যাপারের পর স্বয়ং রাজা বীরহাম্বীর রামচন্দ্রের প্রত্যক্ষ পরিচয় লাভ করিয়া অনুগত শিষ্যের ন্যায় তাঁহার নিকট তত্ত্বশিক্ষালাভ করেন এবং তাঁহাকে গুরুমান্য হিসাবে একটি গ্রামও দান করেন।—চৈতন্য পরিকরঃ রবীন্দ্রনাথ মাইতিঃ পৃঃ ৬১৮, বুকল্যান্ড।

পাওয়া যায়। বীরহাম্বীরের (বাহুল্যবোধে উল্লেখ না করলেও 'চৈতন্য-দাস' ভণিতাতেও যে তাঁর পদ আছে তা 'ভক্তিরত্নাকর' এর ইঙ্গিত থেকে বোঝা যায়) ভণিতাযুক্ত পদগুলিতে গুরু শ্রীনিবাসের প্রতি রাজার অচলাভক্তি ও নিবিড় আনুগত্যের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।[১৫] গুরু শ্রীনিবাসের মাধ্যমেই যে তাঁর বিষয়াসক্তি লোপ পেয়ে ধর্মানুরাগ জাগ্রত হয়েছে তাও ঐ পদগুলিতে ব্যক্ত হয়েছে। গুরুর কৃপায় 'গোস্বামী-সিদ্ধান্তের বিশিষ্ট তত্ত্বচিন্তা' যে তাঁর চেতনায় উদ্ভাসিত হয়েছে সে ইঙ্গিতও এই পদগুলিতে বর্তমান। সর্বোপরি রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা-তত্ত্বের বিশিষ্ট 'গোস্বামী-ভাষ্য'টি শিক্ষা দিয়ে গুরু শ্রীনিবাস যে বীরহাম্বীরের চক্ষু উন্মীলিত করেছেন একটি পদে

---

১৫ প্রভু মোর শ্রীনিবাস পুরাইলে মনের আশ
তুয়া বিনু গতি নাহি আর।
আছিনু বিষয় কীট সদাই লাগিত মিট (মিষ্ট)
ঘুচাইলে রাজ অহংকার॥
... ...
রাধাপদে সুধারাশী সে পদে করিলা দাসী
গোরাপদে বাঁধি দিলা চিত।
রাধিকাগণ সহ দেখাইলে কুঞ্জ গেহ,
জানাইলা দুহুঁ প্রেমরীত॥
যমুনার কুলে যাই তীরে সখি ধাওয়া ধাই,
রাধাকানু বিলসয়ে সুখে।
এ বীরহাম্বীর হিয়া ব্রজপুর সদাধীয়া
যাঁহা অলি উড়ে লাখেলাখে॥ —ভক্তিরত্নাকর

(২)

বসিয়া থাকয়ে যবে আসিয়া উঠায় তবে,
লৈয়া যায় যমুনার তীর।
কি করিতে কিনা করি, সদাই ঝুরিয়া মরি
তিলেক নাহিক রহি থীর॥
শাশুড়ী ননদী মোর সদাই বাসয়ে চোর
গৃহপতি ফিরিয়া না চায়।
এ বীরহাম্বীর চিত শ্রীনিবাস অনুগত
মজি গেলা কালাচাঁদের পায়॥ —ভক্তিরত্নাকর

সে ইঙ্গিতও আছে (জানাইলা দুহুঁ প্রেমরীত)। পদমধ্যে 'রাধাপদে দাসী করা' কিংবা 'কুঞ্জগৃহ প্রদর্শনে'র ('রাধিকাগণসহ দেখাইল কুঞ্জ-গেহ') যে উল্লেখ আছে, তাতে গোপীভাব এবং 'কুঞ্জসেবা-সাধনারই' আভাস পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যের দেহত্যাগের পর ব্রজমণ্ডলের গোস্বামীবৃন্দ গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের যে দার্শনিক রূপদান করেন তাতে 'গুরু-মাধ্যম' একটি বিশিষ্ট মাত্রা লাভ করে। ক্রমে এই গুরুবাদ প্রাধান্য লাভ ক'রে 'ব্রাহ্মণ-গোস্বামী-গুরুবাদে' পরিণতি লাভ করে। ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন শ্রীচৈতন্যের সময় শ্রীভগবান ও ভক্তের মধ্যে সরাসরি যোগাযোগ স্বীকৃত হ'ত। এখন ভক্ত ও ভগবানের মাঝে এলেন গুরু। এই গুরুর প্রতীকরূপে দেখা দিলেন গোপী বা মঞ্জরী।[১৬] গোপী বা মঞ্জরীর কৃপাছাড়া ঈশ্বর লাভের কোন উপায় নাই। ব্রজে সিদ্ধদেহ লাভ ক'রে সেবারস আস্বাদন করার বিশিষ্ট তত্ত্বপথটি এইভাবে নির্মিত হ'ল। 'বিলাপ কুসুমাঞ্জলি'তে রঘুনাথ দাস এই মঞ্জরী-তত্ত্ব সুস্পষ্টরূপেই ব্যক্ত

---

১৬ চৈতন্য-নিত্যানন্দ-অদ্বৈতের তিরোধানের পর গুরুর গুরুত্ব বহুগুণে বাড়িয়া গেল। চৈতন্যের গুরু ছিল। তিনি গুরুর এবং গুরুর গুরুর কাছে তাঁর ঋণ স্বীকার করিতেন। কিন্তু বিনা গুরুকরণে যে জীবের গতি নাই, এমন কথা তিনি কখনও বলেন নাই। গুরুহীনেরও অধ্যাত্মপথে অগ্রাভিসার তিনি স্বীকার করিতেন। পরম সত্য যে কাহারও কাহারও হৃদয়ে এমনিই আভাসিত হইতে পারে এবং সাধারণতঃ সেইভাবে পরমসত্য (বা ব্রহ্মবোধ) মানব হৃদয়ে জাগ্রত হয়। .... চৈতন্য বলিতে চাহিয়াছিলেন যে, কৃষ্ণই গুরু, মনুষ্যরূপে হোক, অরূপে হোক, মনের উদ্ভাসে হোক। চৈতন্যের নির্দেশে সনাতন ও রূপ যে ভক্তিশাস্ত্র রচনা করিলেন, তাহাতে গুরুর প্রাধান্য ঈশ্বরের পরেই। চৈতন্যের ধর্মে শুধু ভগবান ও ভক্ত, মাঝখানে কেহ নাই কিছু নাই। এখন মাঝখানে আসিলেন গুরু, এবং ভগবান আর ভক্তের প্রিয় বা প্রেমিক রহিলেন না। ভক্তের স্থান লইল রাধা। রাধাকে লইয়া কৃষ্ণের লীলা। সে লীলার সহায়ক গুরু। প্রথম শ্রেণীতে গুরু সখী। এবং সখীরা গোপীরাধার অংশ। দ্বিতীয় শ্রেণীতে গুরু সখীসহায়ক "মঞ্জরী" (ফুলের কুঁড়ি) বা সেবাদাসী।

করেছেন। গোপীতত্ত্ব বিশেষতঃ মঞ্জরীতত্ত্ব নামান্তরে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্মের গুরুবাদেরই দ্যোতনা বহন করছে। বীরহাম্বীরের পদাবলী-তেই শুধু গুরুস্তুতি নেই, বিষ্ণুপুরের মন্দির টেরাকোটাতেও গোপী বা মঞ্জরী ভাব-সাধনার মাধ্যমে গুরুবাদের ইঙ্গিত আছে। যাইহোক, অনেকে বীরহাম্বীরের নামাঙ্কিত এই পদগুলিকে তাঁর নিজের রচনা বলে মনে করেন না। সে বিতর্কে প্রবেশ না করেও বলা যায়, শ্রীনিবাসের সহযোগিতায় মল্লরাজা বীরহাম্বীর বৈষ্ণব জগতে একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করেছিলেন। বৈষ্ণব গ্রন্থগুলি থেকে অন্তত তাই মনে হয়। এটাও বোঝা যায়, বীরহাম্বীরের সময় রাজপরিবারে তথা মল্লভুমের বিশিষ্ট পরিবারগুলিতে বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে ভাবভক্তির এক জোয়ার এসেছিল। মল্লরাজ পরিবারের দিনরাত্রি যে এক নিবিড় ভাব-তন্ময়তায় অতিবাহিত হ'ত, তা কিছু কিছু বৈষ্ণবপদ থেকেই বোঝা যায়। যদুনন্দনের একটি পদে উল্লেখ আছে যে, সময় সময় নিদ্রাগত রাজা (বীরহাম্বীর) স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে বৈষ্ণবপদ আবৃত্তি করতেন। তা শুনে রাণী ভাবাশ্রু বিসর্জন ক'রে বিনিদ্র নিশি যাপন করতেন। [১৭] কিন্তু মল্লরাজমহিষীরা সকলেই নীরব শ্রোতামাত্র ছিলেন না।

সখীরা অপ্রাকৃত মঞ্জরীরা মহাগুরু স্থানীয়। মহান্তগুরু হইতেছেন মঞ্জরীদের অনুগৃহীত। তিনি সিদ্ধ-সাধককে মঞ্জরীর অনুগ্রহ লাভ করিতে সহায়তা করেন। মঞ্জরীর কৃপা হইলে সিদ্ধদেহ পাইয়া সাধক ব্রজে রাধাকৃষ্ণের সেবারসের আস্বাদন করেন ও মঞ্জরীত্ব প্রাপ্ত হন। সখী মঞ্জরীর অনুগ্রহ ছাড়া কৃষ্ণপ্রাপ্তির কোনই উপায় নাই। এই হইল রাগানুগ মার্গের রহস্য।

গোপী অনুমতি বিনা ঐশ্বর্য জ্ঞানে,
ভজিলেহ নাহি পায় ব্রজেন্দ্র নন্দনে। —চৈতন্য চরিতামৃত

মঞ্জরী অনুগতির কথা স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন রঘুনাথ দাস।
যদবধি মম কাচিন্মঞ্জরী .... ইত্যাদি। (বিলাপ কুসুমাঞ্জলি)
বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস। প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ: সুকুমার সেন। পৃঃ ৪৪৩-৪৪।

১৭ স্বপ্নে পদ পড়ে রাজা-রাণী সে শুনিয়া।
গোঙাইল সর্বনিশি কান্দিয়া কান্দিয়া॥ —যদুনন্দন

তাঁরাও পুঁথির প্রতিলিপি রচনায় এবং মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করেছেন দেখা যায়। বিষ্ণুপুরে, কয়েকটি মন্দির প্রতিষ্ঠা ছাড়াও মল্লরাজমহিষীদের অনেকেই বৈষ্ণব-সাহিত্য চর্চায় আত্মনিয়োগ করেছেন এমন দৃষ্টান্ত বিরল নয়। মল্লমহীপতি গোপাল সিংহের মহিষী ধ্রুজামণি নিজহস্তে প্রেমবিলাস পুঁথির প্রতিলিপি রচনা করেছেন বলে জানা যায়। একটা লক্ষণীয় বিষয় এই যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম-সংস্কৃতির অঙ্গনে একাধিক মহিলা-ব্যক্তিত্ব সমাগত হয়েছিলেন। বীরহাম্বীরের পাশাপাশি রাণী সুদেষ্ণা বা সুলক্ষণার অবস্থিতি শুধু বৈষ্ণবগ্রন্থেই লক্ষ্য করা যায় না, পুঁথির পাটাচিত্রেও (বীরহাম্বীর সকাশে শ্রীনিবাস) লক্ষ্য করা যায়। নিত্যানন্দ পত্নী জাহ্নবা অথবা শ্রীনিবাস কন্যা হেমলতার কথা তো সর্বজন বিদিত। হেমলতার নামাঙ্কিত 'মানবি বিলাস' (সহজিয়া পুঁথি) পুঁথিটি সাহিত্য পরিষদের সংগ্রহে আছে। তাঁর প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীরাধারমণ জীউ বিগ্রহটি এখনও বিষ্ণুপুরের গোস্বামী পরিবারে (সুকণ্ঠ গায়ক জ্ঞানেন্দ্রপ্রসাদ গোস্বামীদের বাড়ী) পুজা পাচ্ছেন। শ্রীশ্রীরাধারমণ জীউ-এর পরিত্যক্ত মন্দিরটি এখনও গোস্বামী পাড়াতেই শ্রীনিবাস, আচার্যের সাধন-পীঠের পাশে ভগ্নদশা প্রাপ্ত হয়েও টিকে আছে। মল্লরাজ বীরহাম্বীরের সঙ্গে তাঁর মহিষী এবং পুত্র ধাড়িহাম্বীরও শ্রীনিবাসের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। শ্রীজীব গোস্বামী ধাড়িহাম্বীরেরও নাম পরিবর্তন করে গোপালদাস নাম রাখেন।[১৮] শুধু রাজ পরিবারের মানুষরাই নয়, বীরহাম্বীরের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে, সভাপণ্ডিত ব্যাসাচার্য, এবং সভাসদ কৃষ্ণবল্লভ প্রভৃতি অনেকেই শ্রীনিবাসের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন। কথিত আছে প্রথমবারে শ্রীনিবাস এঁদের দীক্ষা না দিলেও, তিনি হাম্বীরমল্লকে 'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যপদে সমর্পণ' করে নাম সংকীর্তনের নির্দেশ দিয়ে 'হরিনাম মহামন্ত্র কৈল উপদেশ।' তিনি রাজাকে বলেন, যে গোঁসাঞির গ্রন্থাস্বাদ

---

১৮ রাজার পরমার্থ শুনি শ্রীজীব গোঁসাঞি।
নাম শ্রীগোপাল দাস থুইল তথাই ।।

ধাড়িহাম্বিরের ভূমিকায় শ্রীনিবাস প্রশস্তিমূলক একটি মিশ্র সংস্কৃত ভাষার পদ পাওয়া যায়। —চৈতন্য পরিকর : রবীন্দ্রনাথ মাইতি : পৃ: ৬১৯

করার পর তিনি তাঁকে (রাজাকে) রাধাকৃষ্ণ মন্ত্রে বিধিমত দীক্ষা দেবেন। 'শ্রীকৃষ্ণবল্লভ ব্যাস আদি সর্বজন'—'আচার্যের পাদপদ্মে লইলা শরণ'।[১৯] হাম্বীরের সভাপণ্ডিত ব্যাসাচার্য এবং তাঁরপুত্র শ্যামদাস ও শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য হন। পিতাপুত্র উভয়েই যে বৈষ্ণব জগতে প্রতিষ্ঠালাভ করেছিলেন এর উল্লেখও বৈষ্ণবগ্রন্থগুলি থেকেই পাওয়া যায়। অন্যতম বৈষ্ণব-তত্ত্ববেত্তা রূপে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের দার্শনিক চিন্তা-চর্চায় ব্যাসাচার্যের একটি বিশেষ ভূমিকা ছিল। পুত্র শ্যামদাসও শ্রীজীবের ঘনিষ্ঠ ছিলেন বলে জানা যায়। জীব গোস্বামী তাঁর পত্রে অনেক সময় বীরহাম্বীর ও ধাড়িহাম্বীরের সঙ্গে ব্যাসাচার্য ও তাঁরপুত্র শ্যামদাসের খবর নিতেন। শ্যামদাসের রচিত কিছু ব্রজবুলির পদ পাওয়া গেছে। বৈষ্ণবজগতে এসময় একাধিক শ্যামদাস থাকলেও এ পদগুলি ব্যাসপুত্র শ্যামদাসের বলেই ডঃ সুকুমার সেন চিহ্নিত করেছেন।[২০]

কিন্তু শুধু কয়েকটি বৈষ্ণবগ্রন্থে উল্লিখিত বিবরণ থেকেই নয়, বিষ্ণুপুর এবং তার আশেপাশের অঞ্চল থেকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, বিষ্ণুপুর শাখা, যে প্রায় আটহাজার পুঁথি সংগ্রহ করেছেন, তারমধ্যেও

---

১৯ চৈতন্য পরিকর : রবীন্দ্রনাথ মাইতি : পৃঃ ৬২৮

২০ ব্যাসাচার্য ও তাঁহার পুত্র শ্যামদাস উভয়েই বৈষ্ণব হিসাবে যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছিলেন। এমনকি বৃন্দাবন হইতে জীবগোস্বামী পত্র মারফত রাজা-হাম্বীর, ধাড়িহাম্বির, এবং তাঁহাদের (ব্যাসাচার্য-শ্যামদাস) সংবাদ জানিতে চাহিয়া পত্র পাঠাইতেন। পরবর্তিকালে শ্রীনিবাসের নিকট লিখিত জীবের একটি পত্র হইতে জানা যায় যে, শ্যামদাস-আচার্য বৃন্দাবন হইতে শোধিত বৈষ্ণব-তোষণী, দুর্গম সঙ্গমণী ও গোপালচম্পু গ্রন্থ লইয়া আসিয়াছিলেন। পত্রমধ্যে জীব জানাইতেছেন যে শ্রীনিবাস যেন তাঁহার পরমার্থ সহৃদয় পণ্ডিতবর্য শ্যামদাসের সহিত স্নেহসহকারে ভগবদ্ভক্তি বিচার করেন। .... শ্যামদাস ভণিতার ব্রজবুলির পদগুলিতে 'ব্রজভাখার' প্রভাব থাকায় ডঃ সুকুমার সেন, অনুমান করেন, যে ঐ পদগুলি ব্যাস-পুত্র শ্যামদাসের রচিত, কারণ এই শ্যামদাসের পক্ষেই বৃন্দাবন গিয়া শিক্ষাগ্রহণ করার সম্ভাবনা অধিক ছিল।" —চৈতন্য পরিকর : ৬৩১।

প্রচুর বৈষ্ণব পুঁথি রয়েছে। শুধু তাই নয়, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের দার্শনিক কলেবর গঠনে যেসব প্রাচীন শাস্ত্র-সাহিত্য ব্যবহৃত হয়েছে সেগুলির সটীক সংকলনও এ সংগ্রহে কম নেই। বৃন্দাবনের গোস্বামী গ্রন্থগুলির মূল ছাড়াও অনুবাদগ্রন্থ রয়েছে একাধিক। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রধান অবলম্বন শ্রীমদ্ভাগবত এবং শ্রীগীত-গোবিন্দমের একাধিক পুঁথি এ সংগ্রহে বর্তমান। গীতগোবিন্দম্ এর প্রখ্যাত টীকাকার পূজারী গোস্বামী বা চৈতন্যদাসের বিখ্যাত 'বালবোধিনী টীকা' এ সংগ্রহে যেমন রয়েছে, তেমনি (গীতগোবিন্দম্ এর) নারায়ণদাস রচিত সর্বাঙ্গসুন্দরী টীকাও রয়েছে একাধিক। বিষ্ণুপুর মহকুমার সোনামুখী থেকে, বিশিষ্ট বৈষ্ণবতত্ত্বাচার্য হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (আচার্য সুনীতিকুমার সহ) শ্রীগীতগোবিন্দম্ এর চৈতন্যদাস রচিত "বালবোধনী টীকা"র একটি কপি সংগ্রহ করেন। এই প্রতিলিপি থেকেই চৈতন্যদাস এবং বৃন্দাবনের গোবিন্দ-পূজক পূজারী গোস্বামী যে একই ব্যক্তি এ সিদ্ধান্তে তিনি উপনীত হন।[২১] বিষ্ণুপুরাণ, পদ্মপুরাণ প্রভৃতি যেসব পুরাণের প্রভাব গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে সর্বাধিক সেগুলিও সাহিত্য পরিষদের সংগ্রহে রয়েছে। বিষ্ণুপুরাণের একটি প্রাচীন পুঁথি রয়েছে যার লিপিকাল ১৪৪৬ শকাব্দ। বেশ কিছু প্রাচীন পুঁথি ছাড়া অধিকাংশ প্রতিলিপির লিপিকাল দুই থেকে আড়াই'শ বৎসরের মধ্যে। বৈষ্ণব-ধর্মের ধারাহিক চর্চাচিন্তা যে এক-দেড়'শ বছর আগেও বিষ্ণুপুরে এবং তার পাশাপাশি অঞ্চলে সজীব ছিল তা শতশত বৈষ্ণবগ্রন্থের প্রতিলিপি থেকেই বোঝা যায়।

---

২১ ১৩৩৯ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত 'চন্ডীদাস' সম্পাদনকালে পদাবলী সংগ্রহের জন্য বৈষ্ণবাচার্য হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সমভিব্যহারে বাঁকুড়া জেলা পরিভ্রমণ করার সময় সোনামুখী থেকে পূজারী গোস্বামীর 'বালবোধনী টীকার' এক প্রতিলিপি সংগ্রহ করেন। "সুপন্ডিত গদাধর শিরোমণির দৌহিত্রবংশীয় বাঁকুড়া সোনামুখীর জমিদার স্বর্গগত তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের গৃহে রক্ষিত শ্রীগীত-গোবিন্দের পূজারী গোস্বামী রচিত বালবোধনী টীকার.............

সমাপ্তি শ্লোক—

গোবিন্দ-পাদ সেবায়াঃ প্রভা বা দুদিতা স্বয়ম্।
চৈতন্যদাসতো বালবোধনী স্যাৎ সতাংমুদে ॥

শুধু সাহিত্য পরিষদের (বিষ্ণুপুর) পুঁথি সংগ্রহই নয়, সাহিত্য পরিষদের বিষ্ণুপুর শাখা প্রতিষ্ঠার (১৯৫১ খ্রীঃ) অনেক আগেই এ জেলা থেকে গাড়ী গাড়ী পুঁথি নানাসূত্রে সংগৃহীত হয়ে, বঙ্গদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে সংরক্ষিত হয়েছে। তেতাল্লিশ বৎসর আগে প্রতিষ্ঠিত সাহিত্য পরিষৎ, বিষ্ণুপুর শাখা তার প্রতিষ্ঠার মাত্র ৫বছরের মধ্যেই যে প্রচুর পুঁথি সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন, এখানের পুঁথির অপরিসীম প্রাচুর্যই তার কারণ। দীর্ঘদিন ধরে হাজার হাজার পুঁথি বাইরে যাওয়ার পরও বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদের এই বিপুল পুঁথির সংগ্রহ (প্রায় আট হাজার) নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। অবশ্য পুঁথিগুলি মূলতঃ সংগৃহীত হয়েছে ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ পরিবার থেকে। এঁরা অধিকাংশই বিষ্ণুপুর রাজদরবারের সঙ্গে কোন না কোনভাবে জড়িত ছিলেন বলে দাবী করেন। অনেকে মনে করেন মল্লরাজধানীরূপে বিষ্ণুপুর যখন শ্রীবৃদ্ধি লাভ করে তখন বাইরে থেকে বহু উচ্চবর্ণের মানুষ বিষ্ণুপুর ও পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে এসে বসবাস করেন। তাঁরা তাঁদের সঙ্গে সেসব দেশের চিন্তা-চর্চা বহন করে আনেন।[২২] এই চর্চার অনুশীলন এ জেলায় আরম্ভ হলে এসব পুঁথির শত শত প্রতিলিপি রচিত হয়। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বাঁকুড়ায় একটি 'মিউজিয়াম' স্থাপন করতে চেয়ে ১৩৪১ সালের প্রবাসীতে যে প্রবন্ধ প্রকাশ করেছিলেন তাতে—দেখা যায়,

---

এই সমাপ্তি শ্লোক হইতে প্রমাণিত হয় যে, শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের গোবিন্দপূজক চৈতন্যদাস এবং শ্রীগীতগোবিন্দের টীকাকার চৈতন্যদাস একই ব্যক্তি। টীকাকার নিজেই বলিতেছেন যে, গোবিন্দ পদসেবার প্রভাবেই এই বালবোধনী স্বয়ং উদিতা হইয়াছেন, অর্থাৎ এই টীকা রচনা গোবিন্দ পাদসেবার প্রভাবেই সম্ভব হইয়াছে, ইহাতে তাঁহার কৃতিত্ব কিছু নাই। ·········স্বর্গত সুবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রদত্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শ্রীগীতগোবিন্দের ২৪৭২ নং পুঁথির লিপিকাল সংবৎ ১৮১৯। এই পুঁথির মধ্যে পুজারী গোস্বামীর টীকার শেষে সোনামুখীর পুঁথির অনুরূপ পাঠ পাওয়া যায়। —কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ। ভূমিকা পূজারী গোস্বামী : ২০৭ পৃঃ (দে'জ পুনর্মুদ্রণ ১৩৮৪)।

কনৌজ থেকে পাঠক, ত্রিবেদী, অধ্বর্যু, বাজপেয়ী, অগ্নিহোত্র ব্রাহ্মণ এ জেলার বাসিন্দা হয়েছেন ; উৎকল থেকে ব্রাহ্মণ ও বৈশ্য এসেছেন, বর্ধমান থেকে অসংখ্য কুলীন ব্রাহ্মণ এসেছেন। এ'রা নিজেদের দেশের বিদ্যানুশীলন আর আচার অনুষ্ঠান ত্যাগ করেন নাই। এ'দের সঙ্গে প্রচুর পুঁথি এঅঞ্চলে এসেছে, এ'রাও অসংখ্য পুঁথি লিখেছেন। এইসব পুঁথি এদেশে জ্ঞান-চর্চার ইন্ধন জুগিয়েছে। শুধু সংখ্যাধিক্যের জন্যই নয়, বেশকিছু মূল্যবান পুঁথিও এ অঞ্চল থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বিষ্ণুপুর শাখার সংগৃহীত কয়েক হাজার পুঁথির সঞ্চয় এ অঞ্চলের বিপুল গ্রন্থ-সম্ভারের এক ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ মাত্র। এই সংগ্রহে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে খ্যাতিসম্পন্ন সমস্তপ্রকার প্রাচীনগ্রন্থের প্রায় অধিকাংশই (পুঁথি) বর্তমান। এই পুঁথিগুলিকে দুটি মোটাদাগে ভাগ করলে মল্লরাজত্বে জ্ঞানানুশীলনের চেহারাটি স্পষ্ট হয়। প্রথম ভাগটি হ'ল বৈষ্ণবধর্ম আর সংস্কৃতির তত্ত্ব আর সাহিত্য নিদর্শন ; দ্বিতীয়টি হল—তার পশ্চাদবর্তী ন্যায়-স্মৃতি-পুরাণাদি-প্রস্থানের-প্রেক্ষাপট। সংস্কৃত ভাষা ও ক্লাসিক সংস্কৃতির এই প্রাচীন প্রেক্ষাপটটি থেকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম আর সংস্কৃতির ধাতু প্রকৃতিটি স্পষ্ট বোঝা যায়। আগেই বলা হয়েছে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্মের মাধ্যমে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। পরিষদ শাখার (বিষ্ণুপুর) বিপুল পুঁথির সম্ভার তারই ইঙ্গিত দেয়।

---

২২ বাহিরের পুথী বাহিরের লোকের সহিত আসিয়াছিল, কিন্তু বাহিরে যায় নাই। এইরূপে দীর্ঘকালে বহু পুথী সঞ্চিত হইয়াছিল। কত পুথী ইঁদুরে কাটিয়াছে, উইমাটি করিয়াছে, বর্ষায় জল পাইয়াছে, আগুনে ভস্ম করিয়াছে ; নষ্ট পুথী ডোবার জলে ও সারকুড়ে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। তথাপি গাড়ী গাড়ী পুথী স্থানান্তরিত হইয়াছে। 'এশিয়াটিক সোসাইটির পুঁথিশালায়', 'বিশ্বকোষ কার্যালয়ে' কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথী-শালায়, কিছু বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুথীর সংখ্যা বাড়াইয়াছে।……… কাশীরামদাসের মহাভারতের তিনখানা পুথী পাত্রসায়েরর হইতে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়াছে। তন্মধ্যে একখানি কাশীরামদাসের নিজের পুথীর মাত্র পনের বৎসর পরে পাত্রসায়েরে

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, বিষ্ণুপুর শাখার পুঁথি সংগ্রহ অবলম্বন করে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের ধাতু-প্রকৃতিটির এখানে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যেতে পারে। আগেই বলা হয়েছে, এখানের পুঁথি-সংগ্রহে বৃন্দাবনের গোস্বামীদের পুঁথিগুলির পাশাপাশি ন্যায়-স্মৃতি-পুরাণ-মহাকাব্যের সঙ্গে ব্যাকরণ-অলঙ্কার-জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিপুল সমাবেশ। কালিদাস-ভট্টি-প্রভৃতি প্রাচীন কাব্যের পাশাপাশি 'ব্রহ্মবৈবর্ত্ত'পুরাণ', 'পদ্মপুরাণ', 'স্কন্দপুরাণ', 'ভাগবত পুরাণ' প্রচুর সংখ্যায় এখানে সংগৃহীত। ব্রহ্মসংহিতা, 'কৃষ্ণকর্ণামৃত', 'ভক্তমালে'র সঙ্গে শ্রীগীত-গোবিন্দের একাধিক (সটীক) প্রতিলিপিও এখানে বর্তমান। বিশেষ করে স্মৃতি ও ব্যবহারগ্রন্থের প্রাচুর্য ও সংখ্যাধিক্য নিঃসন্দেহে আকর্ষণীয়। এই পুঁথিসংগ্রহে শুধু বৈষ্ণব-কাব্য-দর্শনই নয়, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সংস্কৃতির স্মার্ত-পৌরাণিক বা প্রাচীন ভারতীয় সনাতন-সংস্কৃতি-নির্ভর কাঠামোটিও নিহিত রয়েছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের দার্শনিক রূপটি শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ ইত্যাদি অবলম্বন করে প্রাচীন ভারতীয় সনাতন সংস্কৃতির আদলে বা নিয়মেই যে রচিত হয়েছে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক-ভাষ্য 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' এর উপাদান-সমষ্টি বিশ্লেষণ করলে যে সত্যই প্রতিভাত হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্মের প্রেমভক্তির বিশিষ্ট রসায়ন নির্মাণের ক্ষেত্রেও এই সনাতন পদ্ধতির অন্যথা হয় নাই। 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু'তে ভক্তির প্রকৃতি বিশ্লেষণ সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মমতে ভক্তি অবশ্যই শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণের অনুশাসনের অনুগত হবে। এমনকি ঐকান্তিক হরিভক্তিও উক্ত শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ এবং পঞ্চরাত্র বিধির অনুগত না হ'লে তা শ্রেয়-সাধক হয়না।[২৩] শ্রীরাধিকার প্রেম

অনুলিখিত হইয়াছিল। 'ধর্মপুজা বিধানে'র ও রামাই পণ্ডিতের শূণ্য পুরাণের পুথী বিষ্ণুপুর অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছিল। এত পুথী নষ্ট ও স্থানান্তরিত হইবার পরে যে বিষ্ণুপুরে আদি কবি বড়ু চণ্ডীদাসের পদাবলীর পুথী পাওয়া গিয়াছে, আশ্চর্য বটে।" —বাঁকুড়ার পুরাকৃতি রক্ষা : যোগেশ চন্দ্র রায় ।। প্রবাসী ১৩৪১ ফাল্গুন।

২৩ শ্রুতি-স্মৃতি-পুরণাদি-পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে। ইতি ।। ৯৯
(ভক্তিরসামৃত সিন্ধুঃ)

'সাধ্যশিরোমণি' রূপে স্বীকৃত হ'লেও তাঁর পরকীয়াত্ব ব্রজমণ্ডলের গোস্বামীরা সম্পূর্ণরূপে স্বীকার করে নেন নাই। তাঁরা শুধু 'রসের উল্লাসে'র খাতিরে কিংবা 'পূর্বরাগ' 'মান' 'অভিসার' প্রভৃতি প্রেমবিকাশের বিভিন্ন পর্যায় রচনার প্রেক্ষাপট নির্মাণের প্রয়োজনে 'পরকীয়াতত্ত্ব'কে গ্রহণ করলেও তাকে 'মায়া' রূপেই ধার্য করছেন। এই 'পরকীয়া-রতির' অস্তিত্ব ব্রজের বাইরে কুত্রাপি নাই, বলেই তাঁরা মনে করেন। শ্রীজীব গোস্বামী তো তাঁর 'গোপালচম্পূতে' শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিধিসম্মত শাস্ত্রীয় (বৈদিক) বিবাহের যথাবিধি অনুষ্ঠান করেছেন। এর পিছনে একটি স্মার্ত-পৌরাণিক চিন্তার প্রভাব অনুমান করা অসঙ্গত নয়। কারণ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের পরিণীতা স্বকীয়া পত্নীরূপে পরিগণিত করা হয়েছে। পৌরাণিক মতে ব্রজধামের রাধা তথা গোপীরা দ্বিত্ব সত্তার অধিকারিণী। স্বরূপে (আসলসত্তায়) তাঁরা হলেন শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া। গোপদের সঙ্গে গোপীদের এবং রাধার সঙ্গে আয়ান (বা রায়ান) ঘোষের স্বামী সম্পর্ক মায়া (যোগমায়া-সৃষ্ট) প্রসূত। অনেকে জয়দেবের গীতগোবিন্দের রহস্যময় প্রথম শ্লোকটির অন্তর্নিহিত অর্থ বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণোক্ত মত বা ঐ ধরণের কোন মতবাদের প্রভাব আবিষ্কার করেছেন। তাঁরা ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের (শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ড ১৫শ অধ্যায়) আলোকেই জয়দেবের উক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যা করে শ্রীরাধাকৃষ্ণের দাম্পত্যধর্ম প্রতিষ্ঠা করেছেন।[২৪] গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকে আছে, মেঘমেদুর অন্ধকার আকাশ দেখে ভীত শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীরাধিকা যখন নন্দ নির্দেশে গৃহে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন পথে

"শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ ও পঞ্চরাত্রাদি শাস্ত্রে যে সকল বিধি-নির্দিষ্ট আছে, তাহা অবজ্ঞা করিয়া যে ব্যক্তি হরিভক্তিকে ঐকান্তিকী নিষ্ঠা করেন, তাঁহার সেই ঐকান্তিকী নিষ্ঠাপ্রাপ্ত সাধনভক্তিও শ্রেয়ঃ সাধক হয় না।" শ্রীভক্তিরসামৃত সিন্ধুঃ। নবদ্বীপ শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠতঃ। শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৬১। বঙ্গাব্দ ১৩৫৪।

২৪ শ্রীগীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোক যে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণোক্ত (শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ড ১৫শ অধ্যায়) এই আখ্যান অংশের আধারে রচিত একথা বলা যাইতে পারে। ব্রহ্মবৈবর্ত্তের আখ্যানে মেঘাচ্ছন্ন আকাশ শ্যামবর্ণ বনভূমি,

'যমুনাকুলের প্রতি কুঞ্জে শ্রীরাধামাধবের যে বিজনকেলি তা জয়যুক্ত হোক।' ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের মতে এই কুঞ্জকেলির পূর্বেই পিতামহ ব্রহ্মা আবির্ভূত হয়ে যথারীতি শাস্ত্রীয় মতে বিবাহ অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। গোপালচম্পূতে শ্রীজীব গোস্বামীও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের মতই 'আসলরাধাকে কৃষ্ণেরপরিণীতা পত্নী' রূপে প্রতিষ্ঠা করেছেন। শ্রীজীব গোস্বামী যথারীতি শাস্ত্রীয় নিয়মেই তাঁদের বিবাহ দিয়েছেন। ললিতমাধব নাটকে শ্রীরূপগোস্বামীও শ্রীরাধাকে শ্রীকৃষ্ণের বিবাহিতা পত্নীরূপেই চিত্রিত করেছেন।[২৫] অতএব বলা যায় বৃন্দাবনের গোস্বামীরা ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ এবং পদ্মপুরাণের মতের আশ্রয়ে তাঁদের আখ্যান রচনা করেছেন। ব্রজমণ্ডলের গোস্বামী সিদ্ধান্ত যে একটি স্মার্ত-পৌরণিক প্রেক্ষাপটে রচিত এমন অনুমান করা অতএব অযৌক্তিক নয়। সনাতন-ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির নিষ্ঠাবান সমর্থক উচ্চ অভিজাত সম্প্রদায়ের গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্যই উচ্চবর্ণের লোকাচার সম্মত বৈদিক বিবাহ, লাজ-হোম, সপ্তপদী গমন ইত্যাদির অনুষ্ঠান করা হয়েছে। আলোচ্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনে যেমন শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণের অনুশাসন মান্য করেই 'ভক্তি' উন্মেষের গতিপথ নির্ণয় করা হয়েছে, তেমনি প্রেমের ক্ষেত্রেও সনাতন 'স্বকীয়া' তত্ত্বকেই প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে বলেই মনে হয়।

এমনকি ভীরু শব্দটি পর্যন্ত পাওয়া যাইতেছে। এই শ্লোকের অন্যতম রহস্য, শ্রীরাধাকৃষ্ণের গোলক লীলায় নিত্য স্বকীয়া ও মর্ত্ত্য বৃন্দাবনলীলায় পরকীয়া ভাবের ইঙ্গিত।' পিতাকর্তৃক কন্যা সম্প্রদানের মত ব্রহ্মা কর্তৃক বিধি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের হাতে কন্যা সম্প্রদান উভয়ের দাম্পত্য ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।" —কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ।

বলা-বাহুল্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বিষ্ণুপুর শাখার পুঁথি সংগ্রহে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের শ্রীকৃষ্ণ জন্মখণ্ড এর পুঁথি রয়েছে (পুঁথির সংখ্যা বঃ সাঃ পঃ বিঃ শাঃ ৩১৯৭। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে কৃষ্ণ জন্মখণ্ড)

২৫ ললিত মাধবের দশম অঙ্কে মহেশ্বরাদি দেবতাদের ও আত্মীয়স্বজনদিগের সম্মুখে নববৃন্দাবন নামক দ্বারকা নগরীতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত শ্রীরাধার বিবাহ হওয়ায় উক্ত অঙ্কের নাম পূর্ণমনোরথ নামক দশম অঙ্ক বলা হইয়াছে। অতএব শ্রীরূপ গোস্বামীর সহিত জীবগোস্বামীর মতের কোন অমিল হয়

'ভক্তি'কে শ্রুতি আর স্মৃতি-সম্মত করে, শ্রীরাধাকৃষ্ণ প্রেমকে দাম্পত্য ধর্মে প্রতিষ্ঠা দিয়ে এবং 'গোপী' তথা 'মঞ্জরী'-তত্ত্বের রূপকে গুরুবাদকে (বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ-গুরুবাদকে) অপরিহার্য করে ব্রজ-মণ্ডলের গোস্বামীরা পরোক্ষে অধিকারী-ভেদ সৃষ্টি করেছেন এবং বৈষ্ণব-স্মৃতি-গ্রন্থপ্রণয়ন করে বৈষ্ণবের আচার-আচরণ-বিচারকে প্রাধান্য দিয়ে তাঁরা স্মৃতিশাসিত বর্ণাশ্রম সম্মত সনাতন-হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির অনুবর্তনের মাধ্যমে শ্রীচৈতন্যের উদার-মানবমুখী হৃদয়ধর্মের থেকে সন্তর্পণে কিছুটা সরে এসেছেন। শ্রীচৈতন্যের মানবমুখী ব্যক্তি-হৃদয়োৎসারিত 'প্রেমভক্তি'র আন্দোলনে সনাতন-হিন্দু ঐতিহ্যের সঙ্গে অতিসূক্ষ্ম হ'লেও যেটুকু বিরোধ ছিল, বৃন্দাবনের গোস্বামীরা শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণের সনাতন ঐতিহ্যকে কঠোরভাবে অনুসরণ করে তার উপর তত্ত্বের আবরণ সৃষ্টি করেছেন। ডঃ সুকুমার সেন যথার্থই বলেছেন যে, বৃন্দাবনের গোস্বামীরা শ্রীচৈতন্যকে পটাবরণে আবৃত করেছেন। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, বিষ্ণুপুরের মন্দির টেরাকোটায় শ্রীচৈতন্য (এক দুটি চিত্র ছাড়া) প্রায় উহ্য। সনাতন ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যের সঙ্গে চৈতন্যধর্মের সূক্ষ্ম ঐতিহ্য-বিরোধটুকুর সংস্কারের কারণ হ'ল, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মকে নিষ্ঠাবান সনাতনপন্থী অভিজাত সম্প্রদায়ের গ্রহণযোগ্য করে একে প্রাতিষ্ঠানিক মর্যাদা দেওয়া। এই উদ্দেশ্যে বৈষ্ণব-স্মৃতি ইত্যাদি রচনা করে বৈষ্ণবের আচরণ নির্দিষ্ট এবং বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল। বিষ্ণুপুরের বৈষ্ণব-রাজার রাজত্বে 'একাদশী পালনে'র কঠোরতা থেকে বন্যপশুরও নিস্তার ছিলনা।[২৬] মল্লরাজধানী বিষ্ণুপুরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম-সংস্কৃতির চিন্তা-চর্চা যে, মুখ্যতঃ ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থদের মধ্যে বিশেষ প্রসার লাভ করেছিল, সেকথা আগেও বলা হয়েছে। সাহিত্য পরিষদের সংগৃহীত 'পুঁথির

নাই। উভয়েই আসল রাধাকে শ্রীকৃষ্ণের পরিণীতা পত্নীই বলিয়াছেন। [বৈষ্ণবধর্মের আরাধ্যা রাধিকা শ্রীকৃষ্ণের পরিণীতা পত্নী :] শ্রীরমেশচন্দ্র তর্কতীর্থ।

আলেখ্য কার্তিক—পৌষ (১৯শ বর্ষ ২য় সংখ্যা ১৩৯৫) পৃঃ ১৬৮

২৬ চারা মানা হাতীকে ঘোড়াকে মানা ঘাস।
দশমীর বাদ্য বাজে রাজার নিবাস॥ —ধর্মমঙ্গল

অধিকাংশই' এসেছে এইসব সম্ভ্রান্ত পরিবার থেকে কিংবা টোল-চতুষ্পাটী থেকে। সেখানে ব্রাহ্মণ-বৈদ্য, বড়জোর প্রতাপশালী কায়স্থের প্রবেশাধিকার ছিল। সংস্কৃত শিক্ষা তো শুধু ব্রাহ্মণ-বৈদ্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। প্রচুর সংখ্যায় স্তূপীকৃত পুঁথি সংগৃহীত হয়েছে দেশড়া (বিষ্ণুপুর মহকুমার কোতুলপুর থানার অন্তর্গত) গ্রামের টোল-চতুষ্পাটী থেকে, বিষ্ণুপুরের কাদাকুলি মহাপাত্র পাড়ার প্রয়াত নীরদ মহাপাত্র মহাশয়ের (রাজ পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত ; এঁদের বাড়ীতে মল্লরাজ পরিবারের অনুসরণে শ্রীদুর্গার পটপূজা হয়) বাড়ী থেকে, ওন্দা থানার (বাঁকুড়া) পাটপুরের যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের বাড়ী থেকে, বিষ্ণুপুর শহরের কবিরাজপাড়া নিবাসী প্রয়াত প্রখ্যাত কবিরাজ হৃষীকেশ দাশগুপ্ত মহাশয়ের বাড়ী থেকে (এখান থেকে সংগৃহীত পুঁথির সঙ্গেই প্রাচীন বিষ্ণুপুরাণের তালপাতার পুঁথিটি পাওয়া যায়। পুঁথির লিপি কাল ১৪৪৬ শকাব্দ) এবং

পুঁথির সংখ্যা	পুঁথির বিবরণ
১০৪	প্রেমেন্দুসাগর (মূল) শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম। লেখক চাবড়া (বাঁকুড়া ওন্দা) নিবাসী নিমানন্দ সরকার। সন ১২৪৬ সাল।
৩১১০	পদ্মপুরাণ (১-৪৬০ পত্র) শ্রীরামগোপাল দেবশর্ম্মণা বৈদিকশ্রেণী, শকাব্দ ১৭৬৭ ॥ ১২ মাঘস্য।
১৯১৩	পদ্মপুরাণে (কৃষ্ণজন্ম রহস্য)।
৩১১	পদ্যাবলী (রূপ) ১-২৯ (স) লিপি হরিকৃষ্ণ দেবশর্ম্মা
১৮২	বিদগ্ধমাধব ১-১২৩ (স) যদুনন্দন দাস লিপি রামকান্ত দাস।
১১৪	উজ্জ্বল নীলমণি (মূল) লোচনরচনী টীকাসহ (স) লিখিত চুনীলাল দাশগুপ্ত। বাং ১২৪২।
৫২০	দণ্ডাত্মিকা পদাবলী লিঃ কৃষ্ণদাস বৈরাগী
৯৯	বিলাপ কুসুমাঞ্জলি (পৃঃ ২-১২ অস) রঘুনাথ দাস লিখিতং পঞ্চানন দেবশর্ম্মা সাং চাবড়া ১১১৬ সাল ২রা মাঘ।

চাবড়ার (বাঁকুড়া-ওন্দা) প্রয়াত অলকানন্দ সরকার মহাশয়ের সৌজন্যে তাঁদের পরিবারের সংগ্রহ থেকে। এছাড়া বামিরার (বিষ্ণুপুর থানা পাত্রসায়ের) কবিরাজদের বাড়ী থেকেও প্রচুর পুঁথি এসেছে। বাঁকুড়া খ্রীশ্চান কলেজের প্রয়াত অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় রামশরণ ঘোষ এবং ঐ কলেজেরই অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক শ্রীসুখময় চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁদের পুঁথির সংগ্রহ সাহিত্য পরিষদের বিষ্ণুপুর শাখাকে দান করেছেন। সে কথা যাই হোক, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের চর্চা-চিন্তা যে এ অঞ্চলের উচ্চবর্ণের অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকতর-বিস্তার লাভ করেছিল তা এখানের পুঁথিগুলি পর্যালোচনা করলেও বোঝা যায়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ পাদটীকায় কিছু পুঁথির তালিকা (১৪৮ পৃষ্ঠা থেকে দ্রষ্টব্য) দেওয়া গেল। তালিকা থেকে সহজেই অনুমান করা যেতে পারে যে,

---

পুঁথির সংখ্যা	পুঁথির বিবরণ
৩২১১	হংসদূতাখ্য কাব্য (১-৯) শক ১৭৬১।৯।৩।৬ সন ১২৪৬ সাল, ৪ঠা মাঘ। লিখিতং নিমানন্দ সরকার। চাবড়া-পরগণে বিষ্ণুপুর।
৩২৪৫	ভগবদ্ভক্তি বিলাসগ্রন্থ ঃ গোপাল ভট্ট ঃ (পৃঃ ১-৪৮৭ পৃঃ) কায়স্থকুলোদ্ভবস্য শ্রীবিশ্বরূপ সরকারস্য লিপিরিয়ং। শকাব্দ ১৭৬৬ সন ১২৫১ সাল।
৩২০৯	কৃষ্ণচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য ঃ লিপিরিয়ং শ্রীবিশ্বরূপ সরকার সন ১২৫২ সাল ; ১১ই ভাদ্র।
৩২১০	উজ্জ্বলনীলমণি ॥ লিখিতং বিশ্বরূপ সরকার ॥ খামারবেড়া গদাইদাসের ঘরে আদরস আনিয়া লেপি হয়। সন ১২৪৯ সাল। ১৬ই আষাঢ়।
৭৯২	দানকেলি কৌমুদী (১-৪২) শ্রীনিমানন্দ সরকার। চাবড়া ১৭৭০ শকাব্দ।
৭৯৩	ললিতমাধব রূপ গোস্বামী (১-৮০ স) ১৭৬৬।৭।২৩ শ্রীবিশ্বরূপ সরকার চাবড়া।
৭১৩	ব্রহ্মসংহিতা মূলসূত্রের পঞ্চমঅধ্যায়ের টীকা। চুনীলাল দাশগুপ্ত ১৭৪০ শক।

মল্লরাজত্বে গৌড়ীয়বৈষ্ণব ধর্মের চিন্তা-চর্চার পরিমণ্ডলটি ছিল ব্যাপক এবং সুবিস্তৃত। ভক্তিগ্রন্থের সটীক প্রতিলিপি রচনাই শুধু নয়, এসংগ্রহের গোস্বামী গ্রন্থ তথা ভক্তিগ্রন্থের ভাষানুবাদ বা বঙ্গানুবাদের প্রতিলিপিগুলিও নিঃসন্দেহে বৈষ্ণবীয় চিন্তা-চর্চার সমৃদ্ধ দিগন্তটি উন্মোচিত করে। বৈষ্ণবকবি যদুনন্দনের একাধিক গোস্বামী-গ্রন্থ তথা ভক্তিগ্রন্থের বঙ্গানুবাদের প্রতিলিপি এবং মোহন পূজারীর 'ভক্তমাল' গ্রন্থের অনুবাদের প্রতিলিপি, এ সংগ্রহে রয়েছে। কথিত আছে, শ্রীচৈতন্য দক্ষিণদেশ থেকে শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত (লীলাশুক রচিত) গ্রন্থের এবং ব্রহ্মসংহিতার প্রতিলিপি সংগ্রহ করে আনেন। উক্ত পুঁথি-গুলির একাধিক প্রতিলিপি ছাড়াও যদুনন্দন রচিত শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের

পুঁথির সংখ্যা	পুঁথির বিবরণ
৩২৭১	স্তবমালা (১-৪৭) শ্রীনিমানন্দ সরকার তথা লিখিতং বিশ্বরূপ সরকার। চাবড়া তরফ গামিদ্যা। শকাব্দ ১৭৬১ ; মল্লাব্দ ১১৪৫ সাল।
৩১৩১	শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে ঃ পঞ্চদশোহধ্যায় ১-৩৫ সপ্তম স্কন্দ সন ১২৭১সাল। ১৭ই ভাদ্র বৃহস্পতি-বার। লিখিতং শ্রীকুঞ্জবেহারী সরকার আদরস শ্রীযুৎ বিশ্বম্ভর গোস্বামী। উক্ত শ্রীকুঞ্জবেহারী সরকার পর্যায়ক্রমে নবম, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ স্কন্দের (শ্রীভাগবত) প্রতিলিপি করেছেন।
৩১০২	পদ্মপুরাণ (১-২৭৫ পৃঃ) শকাব্দ ১৭৫৮ শ্রীমদানন্দ শর্ম্মা।
৬৮৬	স্বরূপ দামোদরের কড়চা (১-২৭ স) লিপি বিশ্বরূপ সরকার ঃ চাবড়া
৩১১৭	শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ॥ কৃষ্ণদাস কবিরাজ ॥ আদিখণ্ড শ্লোকমালা ॥ টীকা হলধর দাশগুপ্ত (১-২৩) সন ১২৫৩। ৩০ আষাঢ়। শ্রীহলধর দাশগুপ্ত পর্যায়ক্রমে মধ্যখণ্ড এবং অন্ত্যখণ্ডেরও টীকা রচনা করেছেন দেখা যায়। সবগুলি সাহিত্য পরিষদের বিষ্ণুপুর শাখার সংগ্রহে আছে।

বঙ্গানুবাদের একাধিক প্রতিলিপি পরিষদের পুঁথি সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত। যদুনন্দন শ্রীনিবাস কন্যা হেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য ছিলেন বলে মনে করা হয়। বৃন্দাবনের ছয় গোস্বামীর প্রত্যেকেই বৈষ্ণবশাস্ত্র-সাহিত্যের উপর একাধিক গ্রন্থ রচনা করলেও এ জগতে রূপের তুলনা মেলা ভার। বলতে গেলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম দর্শন এবং সাহিত্যের সব শাখাকেই সমৃদ্ধ করেছেন রূপ। কাব্য-নাটক-অলঙ্কার-রসশাস্ত্র সর্বত্র রূপের স্বচ্ছন্দ গতায়ত। বৃন্দাবনের গোস্বামী-সিদ্ধান্তের অধিকাংশটাই রূপ প্রণীত। তাঁর রচনার একদিকে যেমন রয়েছে উদ্ধবসন্দেশ, হংসদূত, স্তবমালা প্রভৃতি স্তব ও কাব্যগ্রন্থ অন্যদিকে

পুঁথির সংখ্যা	পুঁথির বিবরণ
৩১৩৭	শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ দশমস্কন্দ শকাব্দা ১৬৫৫ ইতি শ্রীপরমানন্দ সংমতা (১-১৭৪ স)
৭৭০	হংসদূত ঃ রূপ গোস্বামী বিরচিত (১০ ৩২ অস) পদ ৪০-১৪২। ইতি মদ্রূপগোস্বামীনা বিরচিত হংসদূতাখ্যং কাব্যং ; বসু নবরস চন্দ্র শাকে (১৬৯৮ শক)। লিখিতং শ্রীচণ্ডীচরণ ধীমতা শুক্লপক্ষে দ্বিতীয়া, মার্গ শীর্ষ প্রযত্নতঃ।
৭১৬	ভক্তমাল (মধ্যখণ্ড) (১-৬৫ স) লিখিতং বিশ্বরূপ সরকার চাবড়া ১৭৬৭।১৬
৭১৭	ভক্তমাল ঃ অন্ত্যখণ্ড ঃ (১-২৫৬) রচিল ভক্তমাল ও মোহন দাস ঃ বিশ্বরূপ সরকার চাবড়া। ১২৫৩ সাল।
৭৫৫	চৈতন্যচরিতামৃত (কয়েকপত্র) মোকাম বিষ্ণুপুর শ্যামনগর লিখিতং শ্রীবংশীধর সরকার। সন ১২১৫ সাল।
৫৪৫৩	কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিতং (১ এবং ৩) শ্রীরঘুনাথ দাস গুণলেশ সূচক, সম্পূর্ণ ; শকাব্দা ১৭৬৫মাহ আষাঢ় ১৪ রোজ সন ১২৫০ লিখিতং শ্রীবিশ্বরূপ সরকার চাবড়া।

তেমনি দেখা যায়, বিদগ্ধমাধব, ললিতমাধব দানকেলিকৌমুদী (ভাণিকা) প্রভৃতি নাটকের সমাবেশ। উজ্জ্বলনীলমণি, ভক্তিরসামৃত সিন্ধুতে মূলতঃ বৈষ্ণব রসতত্ত্ব আর অলঙ্কারশাস্ত্রেরই মুখ্য ভূমিকা। এই গ্রন্থদুটি যেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মদর্শনের দিশারী। কৃষ্ণের মধুর লীলাকে নিয়ে 'বিদগ্ধমাধব' আর 'পুরলীলা'কে নিয়ে ললিতমাধব। প্রতিটি গ্রন্থই পরম তাৎপর্যপূর্ণ। বিদগ্ধমাধবের প্রারম্ভিক শ্লোকটিকে (তুণ্ডে তাণ্ডবিনীরতিং ······· ইত্যাদি) বৈষ্ণবধর্মদর্শনের তত্ত্বব্যাখ্যায় প্রায়ই ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। রূপের রচনা পরবর্তীকালের পদাকর্তাদের ও গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছে। প্রচলিত রসতত্ত্বের সঙ্গে গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্মানুমোদিত রসতত্ত্বের পার্থক্য পরিদৃষ্ট হয় রূপ-গোস্বামীর ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে। বৈষ্ণবমতে শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মাধুর্য রসের ভূমিকাই অগ্রগণ্য। অন্যান্য প্রচলিত রসগুলি এ রসের অনুবর্তী বা সহযোগী। রূপের গ্রন্থে (ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু) 'ভক্তিরসের'ই মুখ্যস্থান। 'কৃষ্ণরতি' রূপ স্থায়ীভাব থেকেই ভক্তিরসের উৎপত্তি (কৃষ্ণরতি স্থায়ী ভাবো ভক্তিরসো ভবেৎ ॥)

পুঁথির সংখ্যা	পুঁথির বিবরণ
৮৩১	চৈতন্যচন্দ্রোদয় (ভাষা) প্রেমদাস (১-২৯ স) লিখিতং নিমানন্দ সরকার চাবড়া।
৮০৯	চৈতন্যচরিতামৃত ঃ আদিখণ্ড (১-৬৫ স) কৃষ্ণদাস লিখিতং ১৭২৬ শকাব্দা সন ১১১০। নক্ষত্র পূর্ণ-ঙ্ব র্সু······· ১৪ সম্পূর্ণ। শ্রীনিমানন্দ সরকার।
৭২৪	মনশিক্ষা। প্রেমানন্দ দাস (২৪) পত্র (১-১৪) লিখিতং শ্রীব্রজনাথ সরকার। চাবড়া সন ১২৫৮; ৮ই পৌষ।
৫৪৪	ভক্তিরসামৃত সিন্ধু লিঃ হরচন্দ্র দেবশর্মা।
৪৬৯	উদ্ধবসন্দেশ কাব্য (রূপ গোস্বামী) লিঃ মথুরা মোহন সেন।
৭৯৬	বিলাপকুসুমাঞ্জলি। রঘুনাথ দাস ঃ গৌউরমোহন দাস ঃ (বৈষ্ণব গোস্বামী পদ এই করি আস। যথা অনুরাগ ক্রমে কহে গৌরমোহন দাস।) সন ১২৪৮ ২৩ ফাল্গুন।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে মধুররসের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হ'ল রূপ-গোস্বামীর উজ্জ্বলনীলমণি। এতে প্রেমের সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে—'সর্ব্বথা ধ্বংসরহিতং সত্যপি ধ্বংসকারণং।' ধ্বংসের সমস্ত রকম কারণ বর্তমান থাকা সত্ত্বেও প্রেম অবিনশ্বর। রূপের গ্রন্থে উদ্ধৃত এবং উল্লিখিত প্রবচনগুলি গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের ধাতুপ্রকৃতিটিকে সুস্পষ্টভাবে উন্মোচিত করে দেয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম দর্শনের সূক্ষ্ম নিগূঢ় রূপনির্মাণে রূপের অবদান অপরিসীম। রূপগোস্বামী প্রেমকে দুভাগে ভাগ করেছেন— (১) বিপ্রলম্ভ অন্যটি হ'ল (২) সম্ভোগ। এর আবার একাধিক সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিভাগ বর্তমান।

পুঁথির সংখ্যা	পুঁথির বিবরণ
৯২৭	উদ্ধবদূতাখ্য কাব্যং শকে বিক্রম ভূপতে ১৭৩৭ শকে মল্লমহীপতে ১১২১; লিখিতং শ্রীরামচন্দ্র দেবশর্ম্মণ।
৭৯৭	মুকুন্দমুক্তাবলী রূপগোস্বামী বিরচিত (১—৪ পৃঃ স)।
৯৩০	চাটুপুষ্পাঞ্জলি।
১৭৪	গীতাবলি (রূপ) শকাব্দা ১৭৩৫ লিপি শংকর দেবশর্ম্মণঃ।
৩৩৬৭	হরিনামামৃত (বৈষ্ণব) ব্যাকরণ (১—৩১ পত্র)।
৮১	জগন্নাথ বল্লভ নাটক (মূল) রায় রামানন্দ (১-১১, ১৩) শক ১৭২৪।
৩৪৯৩	গৌতমীয় মহাতন্ত্র (৭-১৮, ৩২-৫১ পত্র) একাধিক পুঁথি আছে।
১৯৮৫	গীতগোবিন্দম্ জয়দেব লিখিতং; নানাশাস্ত্রাধ্যাপক শ্রীল শ্রীযুক্ত কমলাকান্ত বিদ্যালংকার ভট্টাচার্য সুরগুরু········পাত্রবাখড়া।
৩১০৯	বাল্মিকী রামায়ণ (১—৯৩) লিখিতং রামধন দেবশর্ম্মণা। পাঠার্থে শ্রীমধুসূদন গোস্বামিণা। ১৭৫৮। ২১ আষাঢ়।

অলঙ্কার শাস্ত্রাদির প্রয়োগ করে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মদর্শনে সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম যেসব তত্ত্বের অবতারণা করা হয়েছে তাতে কিছু আপাতভিন্নতা বা পার্থক্য প্রতিভাত হলেও মূলতঃ সবই শ্রুতি-স্মৃতি-ন্যায়-পুরাণ প্রভৃতি সনাতন হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য প্রস্থানগুলির প্রেক্ষাপটেই রচিত। অতএব মূলতঃ ক্লাসিক ঐতিহ্য আর সংস্কৃতভাষা নির্ভর গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম স্বাভাবিকভাবেই সমাজের সংস্কৃতজ্ঞ উচ্চকোটি বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যেই মুখ্যতঃ সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। বৃন্দাবনের গোস্বামী গ্রন্থের প্রায় সমস্তই সংস্কৃত ভাষায় এবং প্রাচীন শাস্ত্র-

পুঁথির সংখ্যা	পুঁথির বিবরণ
৩০৫৯	পদাঙ্কদূত টিপ্পনি সমাপ্তা (১—১৯৮ পৃঃ)।
৩১১১	মহাভারত (সং) ১-৩৭২ পৃঃ লিপিরিয়ং রামসুন্দর দেবশর্ম্মণো ১৭৪৫ শক।
৩১১৫	শ্রীমদ্ভাগবতগীতা—শ্রীধর স্বামিণা শাকে পক্ষে বেদ চন্দ্রমিতে····।
২৯১০	নৈষধ চরিতম্—শ্রীহর্ষ।
৩৩৮৮	দণ্ডীর কাব্যাদর্শ ৩য় পরিচ্ছেদ, বলরাম দেবশর্ম্মণো লিপিরিয়ং. শকাব্দা ১৬৮৬।
২৯২৭	সাহিত্য দর্পণ (১—১৭৩) যদ্বর্ষে রঘুনাথ সিংহ নৃপতিস্মর্লেন্দ্র চূড়ামণি চ তত্র শ্রীবরদাখ্য দেশমধ্যায়(?) নেতুং সৈন্যোমুদৈ তস্মিন্নেব মুণি দ্বিকাল বসুধাযুক্তে ব্যালখ্যাদিদং শ্রীমান স্বীয় বিরাটপর্ব ধরণীলেখো জগন্নাথ।
৩৩৮৯	কাব্যাদর্শ তৃতীয় পরিচ্ছেদের টিকা, শকাব্দা ১৬৮৬।
৩৩৮৭	অলঙ্কার কৌস্তুভ ঃ (১—৮৭ স) শ্রীচৈতন্যমুদে শাকে বিন্ধব্দীকলা গতে অলেখি নিমানন্দেয়ং গ্রন্থ শুভাকর।
৫৩১৬	শ্রীকৃষ্ণসার্ব্বভৌমভট্টাচার্য্য বিরচিত শ্রীকৃষ্ণপদাঙ্কদূতং মহাকাব্যং সমাপ্তম্। লিখিতং সর্ব্বানন্দ শর্ম্মণা। শাকে বিক্রমভূপতে ১৭।৪৩ সাল সন ১২।২৮ সাল, ১০ ভাদ্র।

সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে রচিত। কবিরাজ গোস্বামী বা কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বাংলা ভাষায় রচিত হলেও. এর মূল প্রতিপাদ্য হ'ল দুরূহ গোস্বামী সিদ্ধান্তের ভাষ্য (এবং ব্যাখ্যা) রচনা। এ গ্রন্থের উপাদানগুলিও মূলতঃ প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্র-সাহিত্য থেকেই গৃহীত। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে. গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্মে'র আকরগ্রন্থ (১) শ্রীমদ্ভাগবত ও (২) শ্রীগীতগোবিন্দ ছাড়াও (৩) শ্রীমদ্ভাগবতগীতা (৪) ব্রহ্মসংহিতা (৫) মহাভারত (৬) রামায়ণ (৭) বিষ্ণুপুরাণ (৮) কূর্ম'পুরাণ (৯) পদ্মপুরাণ (১০) নৃসিংহ-পুরাণ (১১) অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ (১২) রঘুবংশ (১৩) কিরাতার্জ্জুনীয় (১৪) নৈষধচরিত (১৫) সাহিত্য দর্প'ণ (১৬) অমর-কোষ প্রভৃতি গ্রন্থ থেকে উপাদান এবং উদ্ধৃতি এ গ্রন্থে গ্রহণ করা

পুঁথির সংখ্যা	পুঁথির বিবরণ
৭১৯	গীতগোবিন্দম্ (চৈতন্যদাসের বালবোধিনী টীকা-সহ)।
৭২০	গীতগোবিন্দম (টীকাসহ) ১৪-৩৭ চৈতন্যদাস-কৃতা বালবোধিনী।
৫৭৬৪	রঘুবংশ মহাকাব্যে রামবিজয় (৭৯-৮৬ পত্র)।
১৬৭৪	বিষ্ণুপুরাণ (তালপত্রের) ১৪৪৬ শকাব্দে : (বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদকে প্রদত্ত হৃষীকেশ কবিরাজের পারিবারিক সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত)।
৭৫২	গীতগোবিন্দম্ জয়দেব : নারায়ণ দাস : সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দরী (টীকা)।
৬৩৪	চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক : কবিকর্ণপুর পরমানন্দ সেন।
৭০৯	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাষ্টকং : রূপগোস্বামী বিরচিত।
৭৯৯	শ্রীচৈতন্যচন্দ্র বিরচিতং প্রেমমৃত স্তোত্রং : (১-৩স) লিখিতং শ্রীকৃষ্ণশর্ম্ম'ণা, ১৫১৭ শক ২৩শে আষাঢ়।
৮৬১	কৃষ্ণকর্ণামৃত (১-২৫ লীলাশুকের) ভাষা যদুনন্দন দাস।
৩৮২১	বৃহৎ গৌতমীতন্ত্র (২৩—৪২ পত্র)
৩৭৩৩	অমরকোষ : শকাব্দা ১৫৭৭। (১ - ৮৯ পত্র)।

হয়েছে। গোস্বামীগ্রন্থগুলি তো এর প্রধান অবলম্বন এবং উপজীব্য। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, বিষ্ণুপুর শাখার পুঁথিসংগ্রহে গোস্বামী গ্রন্থের অধিকাংশ ছাড়াও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মদর্শনের উপাদান এবং আকরগ্রন্থের অনেকগুলিরই প্রতিলিপি লক্ষ্য করা যায়। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে সুপণ্ডিত গোস্বামীদের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম দার্শনিক তত্ত্বনিরূপণ, ভূরি ভূরি গ্রন্থ প্রণয়ন এবং জটিল সাধনপথ নির্ণয়ের মাধ্যমে শ্রীচৈতন্যের মানবমুখী সরল সহজ ব্যক্তিহৃদয়সর্বস্ব অকৃত্রিম ভক্তিধর্ম যতই প্রাতিষ্ঠানিকতা লাভ করতে লাগল ততই তার গোত্রান্তর

পুঁথির সংখ্যা	পুঁথির বিবরণ
৪৫৮৪	অমরকোষের টীকা। শুভমস্তু শকাব্দা ১৬৫৪/ ১৩ ভাদ্র শ্রীদুর্য্যোধন দেবশর্ম্মণা লিখিমেতৎ
৪৬২৩	শিশুপাল বধ মহাকাব্য মাঘ সমাপ্তোহয়ং মাঘ ৪ (১—১০৮ স) শাকে নিশাকরে স ব (?) পৃথব্যাঙ্গাকৈ তথৈবচ লিখিতং পুস্তকশ্চেদং শ্রীনরোত্তম শর্ম্মণা ১৬১৯।
২৬১২	শকুন্তলা : কালিদাস শকাব্দ ১৬৭৯ মল্লাব্দ ১০৬৩ শ্রীমদ্গোকুল শর্ম্মণা।
২৭০৯	নারদ পঞ্চরাত্র (২য় রাত্র) বাগড়া জেলা বাঁকুড়া।
৪৪০৮	অমরকোষ ১—৯৫ শকাব্দ ১৫৪৩ তেরিখ ৩ চৈত্র, শ্রীআনন্দিরাম শর্ম্মণা শ্রীমহাদেব দেবশর্ম্মণ পাঠার্থে।
৪১১৭	হরিনামামৃত বৈষ্ণব ব্যাকরণ, ৬ বৈশাখ সমাপ্ত হইল লিখন। ১০০২৪ ? (১০২৪)।
৩১০৭	স্কন্দপুরাণ। কাশীখণ্ড (১-২৮৮)
২৯১২	রাসপঞ্চাধ্যায়।
৪৯৭২	শ্রীশ্রীভাগবত কৃষ্ণচৈতন্যদেব চরণানুচর, বিশ্ববৈষ্ণব রাজসভা সভাজন ভাজন শ্রীরূপসনাতনানুশাসন ভারতীগর্ভে শ্রীভাগবত সন্দর্ভোনাম দ্বিতীয় সন্দর্ভ (১—৮২ পত্র সম্পূর্ণ) শকাব্দা ১৬৭৪।
৫৮৬৪	গৌরগণোদ্দেশ (৩—৭, ১—২, ৫ পাতা)।

ত্বরান্বিত হল এবং যথানিয়মে অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের আধিক্যে ক্রমশঃ ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির অঙ্গীভূত হয়ে পড়ল। বৈষ্ণবস্মৃতি (হরিভক্তি বিলাস) বৈষ্ণব ব্যাকরণ (হরিনামামৃত ব্যাকরণ) ইত্যাদি রচিত হ'ল। একাদশী ইত্যাদি অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানগুলি কড়াকড়ি ভাবে নির্দেশিত হ'ল। ব্রাহ্মণ্য গুরুবাদ প্রবর্তনের মাধ্যমে বর্ণাশ্রমকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এমনি করে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম আর্য-ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির বলয়বদ্ধ হল। অবশ্য কোনদিনই গৌড়ীয় বৈষ্ণমধর্ম সংস্কৃতি আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির মূলধারা থেকে দূরবর্তী ছিল না। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের আকর গ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত। বিশেষ করে লীলাবাদের দ্যোতক এর দশমস্কন্ধেই সমস্ত প্রাতিষ্ঠানিক বৈষ্ণবধর্ম তথা ভক্তিধর্মের মর্মকথা নিহিত আছে। ভারতে প্রচারিত কোন ধর্মই ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাবশালী ধারাকে সর্বাংশে অতিক্রম করতে পারেনি। ধর্ম-দর্শনের ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য থাকলেও সামাজিক তথা রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে কেউই বড় একটা পরিবর্তন আনতে পারেনি। সংস্কৃত পাঠ্যক্রম-শিক্ষাক্রম তথা সাহিত্য দর্শনের সর্বত্র ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রচুর প্রভাব। শ্রীচৈতন্য নিজে একজন খ্যাতনামা সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন। সংস্কৃত শাস্ত্র সাহিত্যের প্রায় সমস্ত শাখাতেই ছিল তাঁর অসাধারণ ব্যুৎপত্তি। নবদ্বীপে তাঁর চতুষ্পাটী ছিল। তাঁর শিক্ষাদীক্ষা মনন-চিন্তন সমস্তই সংস্কৃত-ভিত্তিক-সংস্কৃতির অনুবর্তী। তাঁর অচিন্ত্য-ভেদাভেদ তত্ত্বে প্রচুর অভিনবত্ব থাকলেও মূলতঃ তা বেদান্তের অনুসারী। অর্থাৎ বহুদিক দিয়ে অমিল থাকলেও এবং নানাদিক

৩১২৭ শ্রীভাগবতে মহাপুরাণে— দশমস্কন্দে রুদ্রমোক্ষণ (১—১৮ পৃঃ)।

৩১৩০ শ্রীভাগবত মহাপুরাণ (১—২২৮, দশমস্কন্দ) লিপিরিয়ং শ্রীরামকুমার শর্ম্মণঃ। সাং মধুখণ্ড, হালসাকিম বামিরা।

৩১৩৩ শ্রীশ্রীভাগবতে মহাপুরাণে। দশমস্কন্দ। শকাব্দা ১৭৮৫ বাং ১২৭০; ১৭ আষাঢ়, তিথিপূর্ণমাসী লিখিতং।

৩১৮১ শ্রীশ্রীভাগবত মহাপুরাণে দশমস্কন্দ পর্যন্ত (২১—২০৭) পরমানন্দ সম্মতা, শ্রীধর স্বামীর টীকাসহ।

দিয়ে অভিনব হলেও তাঁর অধ্যাত্ম-মতবাদ রামানুজ, নিম্বার্ক, মধ্ব, বল্লভের মত ভারতীয় সংস্কৃতির প্রাতিষ্ঠানিক ভক্তিধর্মেরই সমগোত্রীয় ছিল। একথা ঠিক, যে শ্রীচৈতন্যের অলৌকিক দিব্যোন্মাদ জীবনের প্রচণ্ড ভাবাবেগে সমস্ত প্রকার ধর্মতত্ত্ব, দর্শন ও অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের বাঁধ ভেঙ্গে গিয়ে, এক অপরূপ প্রাণময়, প্রেমময়, হৃদয়সংবেদ্য, অধ্যাত্মসাধনার এক বিচিত্র বিকাশ সম্ভব হয়েছিল। সেই প্রচণ্ড বেগবান, ভাবোন্মাদ ব্যক্তিত্বের অবর্তমানে তাঁর ভক্তি ধর্ম তার প্রকৃতিগত সাজুয্যে ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির মূলধারায় প্রত্যাবর্তন করে শ্রুতি-স্মৃতি-ন্যায় প্রস্থানের পাশাপাশি সহাবস্থান করল। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বিষ্ণুপুর শাখার বিপুল পুঁথির সংগ্রহ তারই সাক্ষ্য দেয়। এখানে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের আকরগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতের প্রচুর প্রতিলিপিই শুধু নয় ভারতীয় ভক্তিশাস্ত্রের বিভিন্ন গ্রন্থগুলির একাধিক করে প্রতিলিপি রয়েছে —রয়েছে প্রচুর পুরাণ আর সংহিতার প্রতিলিপি। ভক্তিধর্মের মুখ্য উপজীব্য লীলাবাদকে বিশেষ মাত্রা

৩১৮৩ শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ। পঞ্চম, ষষ্ঠ, সপ্তম, অষ্টম, নবম দশমস্কন্দ টীকা সহ।

৩১২০ ভাগবতে দশমস্কন্দে রাসক্রীড়া ; সন ১২৫৩, মহা (মাহ ?) জ্যৈষ্ঠী ?

১২৭৯ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ব্রহ্মখণ্ড।

৩১৯৭ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত মহাপুরাণে, কৃষ্ণজন্মখণ্ড।

৩১৮৭ ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ — লিখিতং শ্রীরামধন দেবশর্ম্মণা। শকাব্দা ১৭। ২৬ মাহ ভাদ্র রোজ ৬।

৩১৭২ বায়ুপুরাণ ঃ শৌনক সংবাদ।

১৭৫৬ স্কন্ধপুরাণ ঃ (১—৩১৫ পৃষ্ঠা)।

২৩৪১ অগ্নিপুরাণ ষোড়ষি বিধি (?) ১৭২৩ শকাব্দা।

১৬৮৪ মৎস্যপুরাণ।

১৪৩২ বৃহন্নরসিংহপুরাণ।

৩৩৩৯ বৃহৎ নারদীয়পুরাণ।

দিয়েছে এখানে সংরক্ষিত শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের একাধিক প্রতিলিপি। ভারতে প্রচারিত প্রায় সমস্ত বৈষ্ণব-ভক্তিধর্মের মূলে আছে শ্রীমদ্ভাগবত। পশ্চিম ভারতের আমেদাবাদের (গুজরাট) বিখ্যাত গবেষণা প্রতিষ্ঠান বি, জে. ইনস্টিটিউটে সংরক্ষিত প্রচুর পুঁথির তিন ভল্যুম সুসম্পাদিত 'ক্যাটালগ' দেখেছি। তাতেও শ্রীমদ্ভাগবত তথা দশমস্কন্ধের প্রাচুর্য, সেইসঙ্গে গীতগোবিন্দের। একদা গুজরাটে ভাগবদ্ধর্মের প্রবল বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। "গুজরাটের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহে (মেবারে) ভাগবতধর্মের প্রথম নিদর্শন পাওয়া যায় খ্রীঃ পূঃ দ্বিতীয় তৃতীয় শতাব্দীতে। এই সময়ে মেবারে একটি বিষ্ণুমন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং সম্ভবত এই স্থান থেকেই গুজরাটে বৈষ্ণবধর্ম প্রসারিত হয়েছিল। গুজরাটে বৈষ্ণবধর্মের অস্তিত্বের ঐতিহাসিক প্রমাণ সাপেক্ষ তারিখ অবশ্য খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী। এই সময়ে ভারতবর্ষের অনেকখানি অংশে গুপ্তসাম্রাজ্য বিস্তৃত ছিল। গুপ্ত সম্রাটেরা ভাগবতধর্মে বিশ্বাসী পরম ভাগবত ছিলেন.. ...." (ভারতের বৈষ্ণব-পদাবলী ॥ ডঃ সতী ঘোষ : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক

গুজরাটের প্রসিদ্ধ বি,জে, ইনস্টিটিউটে সংরক্ষিত গুজরাট-বিদ্যাসভা সংগৃহীত পুঁথিসংগ্রহে শ্রীমদ্ভাগবত গীতগোবিন্দ ও অন্যান্য পুঁথির তালিকার একাংশ :

Sl. No.	Acc. No.	পুঁথির বিবরণ	লিপিকাল ইত্যাদি
3525	2240	ভাগবত দশমস্কন্ধ	C.V. 19th
3526	4667	ভাগবত দশমস্কন্ধ	C.V. 19th
3528	5451	ভাগবত দশমস্কন্ধ : ব্যাস রচিত : শ্রীধর টীকা (?)	C.V. 17th Damaged
3530	5744	ভাগবত দশমস্কন্ধ (সুবোধিনী টীকা শ্রীবল্লভ দীক্ষিত)	C.V. 19th
3532	5883	ভাগবত দশমস্কন্ধ উত্তরার্ধ : বল্লভ দীক্ষিত	C.V. 18th
3536	6431	ভাগবত দশমস্কন্ধ পূর্বার্ধ : ব্যাস	C.V. 19th

পর্ষদ)। গুপ্ত সম্রাটদের ভাগবতধর্মের কথা আগেই বলা হয়েছে। গুপ্তযুগে ভাগবতধর্মীরা যে ইঁটের মন্দির এবং টেরাকোটা-ভাস্কর্যে রাজস্থানের হনুমানগড় থেকে সুরতগড় (রঙমহল) পর্যন্ত অঞ্চল সৌন্দর্যময় করে তুলে ভাগবতধর্মকে একই সঙ্গে ধর্ম আর শিল্পকলা প্রচারের বাহন করে তুলেছিল সে কথা আগেই বলা হয়েছে এবং সেই উত্তরাধিকার অনেকাংশে যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম-সংস্কৃতিতে এসে বর্তেছে সে আভাসও দেওয়া হয়েছে। গুপ্ত শাসনকালেই গুজরাটে বৈষ্ণবধর্মের উল্লেখযোগ্য প্রভাব অনুভূত হয়েছিল। তার ধারা যে প্রায় বর্তমানকাল পর্যন্ত প্রবহমান তা ঊনবিংশ শতকের বৈষ্ণবপুঁথির প্রতিলিপিগুলি থেকেই অনুভূত হয়। শুধু শ্রীমদ্ভাগবতই নয় আমেদাবাদের (গুজরাটের) বি. জে. ইনস্টিটিউটের পুঁথি সংগ্রহে গীতগোবিন্দ এবং অন্যান্য ভক্তি শাস্ত্রেরও পুঁথি প্রচুর সংখ্যায় রয়েছে। বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদের মতই এই সব বৈষ্ণব ভক্তি-শাস্ত্রের প্রেক্ষাপটে রয়েছে শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণের এক কথায় ভারতীয়

Sl. No.	Acc. No.	পুঁথির বিবরণ	লিপিকাল ইত্যাদি
2141	4240	গীতগোবিন্দ টীকা : শ্রীকুম্ভকর্ণ নৃপতি :	(Damaged) ৩০০ বছরের প্রাচীন
2143	5615	গীতগোবিন্দ টীকা : শিবদাস সুত বনমালী ভট্ট	সং ১৯২১ (Damaged)
2137	866	গীতগোবিন্দ (সন্দেহভেদিকা) কুমার খান	৫০ বছরের প্রাচীন
2138	1894	গীতগোবিন্দ (সটীক) রসসন্দিপনী : জয়দেব : ভট্টরত্নাকর	১৬৭৮ সংবৎ
2139	2324	গীতগোবিন্দ টীকা (ভাবপ্রবোধিনী)	১৫০ বছরের প্রাচীন
2142	4241	গীতগোবিন্দ (সটীক) জয়দেব	২০০ বছরের পুরাণো
3698	689	গীতগোবিন্দ সটীক : জয়দেব	C.V. 17th

ক্লাসিক সংস্কৃতির ঋদ্ধ বাতাবরণ।

বিষ্ণুপুরের টেরাকোটা-মন্দিরের অধিকাংশ চিত্রে শ্রীমদ্ভাগবত গীতগোবিন্দের প্রভাব শুধু গভীরই নয়, এখানে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্মের গোস্বামী-সিদ্ধান্তের আলোকে টেরাকোটা-চিত্রগুলি নূতন তাৎপর্যে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। আগেই বলা হয়েছে, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের মাধ্যমে শ্রীনিবাস মল্লরাজ-সভা জয় করেছিলেন। বৈষ্ণবগ্রন্থ থেকে জানা যায় শ্রীনিবাস যখন তাঁর লুণ্ঠিত পুঁথির সন্ধানে প্রথম মল্লরাজসভায় পদার্পণ করেন, তখন রাজসভায় রাসপঞ্চাধ্যায় পাঠ করা হচ্ছিল (মতান্তরে ভ্রমরগীতা)। অতএব বৈষ্ণবধর্ম মল্লরাজত্বে শ্রীনিবাসের পূর্বেই যে প্রচলিত ছিল তা মনে করা যেতে পারে। শুশুনিয়া-শৈল-শাসনের কথা আগেই বলা হয়েছে। মহারাজ চন্দ্রবর্মার শুশুনিয়া-শৈল-শাসনকে বঙ্গে বিষ্ণুপূজার (চক্রস্বামী) প্রাচীনতম নিদর্শন বল্লেও অত্যুক্তি হয় না। তাছাড়া এ অঞ্চলে পাল-সেন যুগের অপরূপ সব অবতার মূর্তি এবং অতি দুষ্প্রাপ্য অনন্তশায়ী-বিষ্ণুমূর্তির অস্তিত্ব এ জেলায় বিষ্ণুধর্মের প্রাচীন ঐতিহ্য-কেই উদ্ঘাটিত করে। অতএব বীরহাম্বীরের সভায় বৈষ্ণব-গ্রন্থপাঠ কোন বিস্ময়ের ব্যাপার নয়। তবুও যে মল্লরাজসভায় গ্রন্থপাঠ শুনে শ্রীনিবাস সন্তুষ্ট হতে পারেননি, তার কারণ ভিন্ন। ব্রজমণ্ডলে ভাগবত তথা ভক্তিশাস্ত্রের চর্চা-চিন্তায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত

আমেদাবাদের সংগ্রহে গীতগোবিন্দের প্রায় ২২টি প্রতিলিপি লক্ষ্য করা যায়, এরসঙ্গে রয়েছে বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদের পুঁথি সংগ্রহের মতই কাব্য, পুরাণ, ভক্তিশাস্ত্র ইত্যাদির প্রচুর প্রতিলিপি। এখানে রঘুবংশের ২১টি প্রতিলিপি রয়েছে (৩৭১৮-৩৭৩৪) তাছাড়া মেঘদূত কুমার সম্ভব অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ ছাড়াও মাঘ ইত্যাদি অন্যান্য কবিদের কাব্যও বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদের মতই এসংগ্রহে লক্ষ্য করা যায়।

Sl. No.	Acc. No.	পুঁথির বিবরণ	লিপিকাল ইত্যাদি
3741	1878	শিশুপাল বধ ॥ মাঘ ॥ মল্লিনাথ	C V. 19th
3749	6370	অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ ঃ কালিদাস ঃ	V. 1921
1916	4055	মেঘদূত শ্রুতবোধিনী টীকা সহিত (কালিদাস) টীকা সোমনাথপুত্র ধনেশ্বর	সংবৎ ১৬২৯

শ্রীনিবাস, গোস্বামী-সিদ্ধান্তের আলোকে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ এবং শ্রবণে অভ্যস্ত ছিলেন। আগেই বলা হয়েছে, তিনি গোস্বামী-সিদ্ধান্ত প্রচারের গুরুদায়িত্ব নিয়েই বৃন্দাবন থেকে গৌড়বঙ্গে এসেছিলেন বা প্রেরিত হয়েছিলেন। এই গোস্বামী সিদ্ধান্তের আলোকে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ এবং ব্যাখ্যা করেই তিনি মল্লরাজসভা বিজয় করেন। মল্লরাজ বীরহাম্বীরকেও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের গোস্বামী-সিদ্ধান্তের সাধন অনুসারেই তিনি দীক্ষা দিয়েছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ করে মল্লরাজসভা জয় করার ঐতিহাসিক ঘটনাটি শুধু যে বৈষ্ণবগ্রন্থ থেকেই পাওয়া যায়, তাই নয়. মদনমোহন মন্দিরে একটি টেরাকোটা-চিত্রে তার সুস্পষ্ট প্রতিফলন ঘটেছে বলে মনে করার যথেষ্ট হেতু আছে। এই চিত্রে পুঁথি পাঠরত জনৈক বৈষ্ণব আচার্যের পাশে পাঠ-শ্রবণরত জনৈক রাজপুরুষকে দেখা যায়। মদনমোহন-মন্দির এবং তার সন্নিহিত রাধাবিনোদ মন্দিরেই বিশেষভাবে কয়েকটি গোস্বামী-চিত্রের সমাবেশ দেখা যায়। রাধাবিনোদ মন্দিরের উত্তর-পশ্চিম কোণে পুঁথি পাঠরত জনৈক বৈষ্ণব-গোস্বামী সকাশে হরিনামের মালাহাতে দুজন নারী শ্রোতাকে লক্ষ্য করা যায়। গ্রন্থপাঠ ও শ্রবণ গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের বৈধী ভক্তির অন্যতম কৃত্য। বলাবাহুল্য মদনমোহন এবং রাধাবিনোদ মন্দির দুটিই গোস্বামী পাড়ায় অবস্থিত শ্রীনিবাসের সাধনপীঠের নিকটবর্তী।

আমেদাবাদের পুঁথি সংগ্রহ ঃ

Sl. No.	Acc No.	পুঁথির বিবরণ	লিপিকাল ইত্যাদি
3443	5618	ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ঃ কৃষ্ণজন্মকথা	C. V. 18th
3447	6690	কৃষ্ণজন্মখণ্ড (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত মহাপুরাণের অংশ)	C .V. 18th
3428	6611	পদ্মপুরাণ (পাতালখণ্ড)	V. 1813
3416	2874	গরুড় পুরাণ	C. V. 17th
4069	5339	পুরুষসূক্তম্	C. V. 18th
4106	6400	ভক্তিরসামৃত সিন্ধু (সটীক)	C. V. 18th
3399	4809/1	অধ্যাত্ম রামায়ণ	C. V. 18th

যাইহোক, এটা অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, শ্রীনিবাসের প্রণোদনায় এবং বীরহাম্বীরের পৃষ্ঠপোষকতায় মল্লভূমে গোস্বামী-সিদ্ধান্ত-সম্মত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের যে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল রচিত হয়েছিল তাতে শ্রীমদ্ভাগবতের স্থান মুখ্য। শ্রীচৈতন্যের গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম সাধনায় এবং তার বিশিষ্ট সংস্কৃতির অনুশীলনে শ্রীমদ্ভাগবতের ভাবধারা সর্বত্র প্রতিধ্বনিত হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে—

সালোক্যসার্ষ্টি সারূপ্যসামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥

আমার ভক্তদের সালোক্য (আমার অর্থাৎ শ্রীভগবানের সঙ্গে একলোকে বাস) সার্ষ্টি (ঐশ্বর্যলাভ) সারূপ্য (আমার সঙ্গে সমান রূপলাভ) সামীপ্য (আমার সমীপে বাস) অথবা একত্ব (আমাতে সম্পূর্ণ লীন

Sl. No.	Acc. No.	পুঁথির বিবরণ	লিপিকাল ইত্যাদি
3709	2439	নৈষধচরিত ঃ শ্রীহর্ষ	C. V. 18th
3734	6114	রঘুবংশ (সটীক)	V. 1826 (Saka 1691
2163	30002	প্রবোধচন্দ্রোদয় ঃ কৃষ্ণমিশ্র	সং ১৬৫২
4196	6228	মহিম্নস্তোত্র	V. 1726
3252	2855	আত্মবোধ (মানেকদাসজী)	V. 1921
3600	5740	স্কন্দপুরাণ ঃ কাশীখণ্ড (সটীক)	C .V. 18th
1900	5617	নলোদয় ঃ	৩০০ বছরের পুরাণ
3624	5021/1	মলিম্লুচ ঃ একাদশী মাহাত্ম্য	C. V. 18th
3698	5905	সত্যনারায়ণ কথা	C. V. 19th
4107	6375	ভক্তিবিলাস (সটীক) গোপাল ভট্ট (দিক্‌দর্শিনী টীকাসহ)	
2118	1829	অমরুশতক	২৫০ বছরের প্রাচীন

দ্রষ্টব্য : এর মধ্যে নৈষধচরিত প্রবোধচন্দ্রোদয় এবং 'অমরুশতকে'র প্রতিটির অনেকগুলি করে প্রতিলিপি এ সংগ্রহে আছে।

হওয়া) দান করলেও তাঁরা তা গ্রহণ করেন না — আমার সেবা ছাড়া কিছুই তাঁদের কাম্য নয়। এই উক্তিরই প্রতিধ্বনি যেন শ্রীচৈতন্যের কামনায়—

ন ধনং ন জনং সুন্দরীং কবিতাং বা জগদীশ কাময়ে।
মম জন্ম-জন্মনীশ্বর ভবতাদ্ভক্তিরহৈতুকী ত্বয়ি ॥

আমি ধন, জন, মনোহারিণী কবিতা (বা সুন্দরী নারী এবং কবিতা) কিছুই চাইনা — হে ঈশ্বর, জন্মে জন্মে যেন তোমার প্রতি আমার অহৈতুকীভক্তি থাকে।" শ্রীচৈতন্যের এই প্রার্থনাটিই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মর্মবাণী। ভক্তিশাস্ত্রে চতুর্বিধ পুরুষার্থ কাম্য নয়, প্রেম-ভক্তিই কাম্য। গৌড়ীয় বৈষ্ণবরাও নির্বাণ বা মোক্ষ চাহেন না। শুধু শ্রীভগবানের সেবা ও লীলাদর্শন চান। রূপ গোস্বামীর পদ্যাবলীর শ্লোকেও সেই কামনাই ধ্বনিত হয়েছে।

ভবন্তু তত্র জন্মানি যত্র তে মুরলীকলঃ।
কর্ণপেয়ত্বমায়াতি কিং মে নির্ব্বাণবার্ত্তয়া ॥ (পদ্যাবলী)

আমেদাবাদ (বি· জে ইন্‌স্টিটিউট সংগ্রহ)

Sl. No.	Acc. No.	পুঁথির বিবরণ	লিপিকাল ইত্যাদি
1733	2193	আদিত্যহৃদয়	১৫০ বছর পূর্বের
1744	135	আনন্দৈকাদশী মাহাত্ম্যম্ : বৈশাখ কৃষ্ণএকাদশী (পদ্মপুরাণ হইতে)	১৭৪৭ সং
1791	2291	গঙ্গাস্তোত্র	১৫০ বছর
1662	3349	বটুকভৈরব পটল (রুদ্রযামলের সারাংশ)	১০০ বছর পুরাতন
1645	474	গজেন্দ্রমোক্ষ (মহাভারত শান্তিপর্ব)	১৫০বছর
1659	142	নৃসিংহচতুর্দ্দশী ব্রত	১৭৮৪ সংবৎ বৈশাখ
1612	1902	হরিভক্তিবিলাস ঃ গোপালভট্ট	সংবৎ ১৮৪৫ শক১৭১৪
1928	1009	বিদগ্ধ মুখমণ্ডনম্ ধর্মদাস	সংবৎ ১৮৯৯
1929	3369	বিদগ্ধ মুখমণ্ডনম্ ঐ	৪০০ বছর পূর্বের
1930	5238	বিদগ্ধ মুখমণ্ডনম্ ঐ	২০০ বছর পূর্বের

দ্রষ্টব্য ঃ এখানে বিদগ্ধমুখমণ্ডনম্ এর একাধিক কপি বর্তমান।

শ্রীকৃষ্ণের মধুর মুরলী যেখানে ধ্বনিত হচ্ছে সেখানেই তিনি বারংবার জন্মগ্রহণ করতে প্রস্তুত ; নির্বাণে তাঁর কোন প্রয়োজন নাই।

এই পদ্যাবলীরই অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

জাতু প্রার্থয়তে ন পার্থিবপদং নৈন্দ্রে পদে মোদতে
সন্ধত্তে নচ যোগসিদ্ধিষু ধিয়ং মোক্ষং নচাকাঙ্ক্ষতি।
কালিন্দীবনসীমনি স্থিরতড়িন্মেঘদ্যুতৌ কেবলং
শুদ্ধে ব্রহ্মণি বল্লবীভুজলতা বদ্ধে মনো ধাবতি ॥ ৭৮

(আমার মন কখনও পার্থিব রাজপদ কামনা করেনা স্বর্গের ইন্দ্র পদেও আমোদ প্রকাশ করেনা, যোগসিদ্ধি বিষয়ে বুদ্ধিকে নিয়োজিত করেনা মোক্ষের প্রতিও আকাঙ্খা রাখেনা ; কিন্তু কালিন্দী বনসীমায় স্থির বিদ্যুৎ ও মেঘদ্যুতিরূপ গোপীভুজলতাবদ্ধ অর্থাৎ আলিঙ্গিত নির্ম্মল ব্রহ্মে ধাবিত হইতেছে) এখানেও সেই নির্বাণ, মোক্ষ, যোগসিদ্ধি ইন্দ্রত্বপ্রাপ্তিকে তুচ্ছ করে কবির মন গোপীভুজলতাবদ্ধ শ্রীহরির দিকেই ধাবিত হচ্ছে। কৃষ্ণলীলা, বিশেষভাবে রাসলীলা দর্শনের

আমেদাবাদ (বি· জে ইন্স্টিটিউট সংগ্রহ)

Sl. No.	Acc. No.	পুঁথির বিবরণ	লিপিকাল ইত্যাদি
২৪২৮	৫৫	মুগ্ধবোধ	১০০বছরের পুরাতন
২০৩৪	২২২৫	পদ্যাবলী	২০০বছরের পুরাতন
২৪৪৮	২২০৬	সারসিদ্ধান্তকৌমুদী ঃ ভরদ্বাজভট্ট	১৫০বছরের পুরাতন
২৪৭৬	৩৫৫১	সিদ্ধান্তকৌমুদী ঃ ভট্টজী দীক্ষিত	৪০০বছরের পুরাতন
১৬৭৫	৪৯০	মুকুন্দ মুক্তাবলী	২০০বছরের পুরাতন
৩২৩৬	৫৩৭৮	সিদ্ধান্ত চন্দ্রোদয় ঃ তর্কসংগ্রহ ব্যাখ্যাসহ	C.V. 19th
২১৮০	৮৯৩	কাদম্বরী পূর্বভাগ	প্রায় ২৫০বছর পূর্বের
৪৬৯১	১৬৩১	অমরকোষ ঃ অমরসিংহ	C.V. 18th
৪৬৯৫	৬৫৮৩	অমরকোষ (নাম লিঙ্গানুশাসন)	C.V. 18th ব্রহ্মবর্গ পর্যন্ত
২২৩৮	১৮৮৩	শার্ঙ্গধর পদ্ধতি	শাঙ্গধর ৪০০বছরের পুরাতন

আকাঙ্খাই সর্বোপরি প্রাধান্যলাভ করেছে এই শ্লোকে। নির্বাণ বৈষ্ণবের কাম্য নয়। শ্রীভগবানে অহৈতুকী ভক্তি, তাঁর সেবা ও লীলাদর্শনই বৈষ্ণবের অভীষ্ট। লীলাশুকের (বিল্বমঙ্গল রচিত শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থে) একই আকুতি ; তিনি বলেন—'যদি শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁর (লীলাশুকের) ভক্তি স্থিরতরা হয়, এবং দৈববশে যদি কিশোরমূর্তি ফলবতী হয়, তবে ধর্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ এই পুরুষার্থ চতুষ্টয় সময় প্রতীক্ষা ক'রে কৃতাঞ্জলিকরপুটে তাঁরই (লীলাশুকের) সেবা করবে।' অর্থাৎ চতুর্বিধ পুরুষার্থ এমনকি মোক্ষ বা মুক্তিও তাঁর দাসত্ব করবে। (মুক্তিঃ স্বয়ং মুকুলিতাঞ্জলি সেবতেহস্মান্—ধর্ম্মার্থকামগতয়ঃ সময়প্রতীক্ষাঃ ॥ ১০৭। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত) মুখ্যতঃ লীলাস্ফূর্তি বা লীলাদর্শনই হ'ল লীলাশুকের কাম্য। শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থের বঙ্গানুবাদে (যদুনন্দন কৃত) এই সুরই ধ্বনিত হয়েছে—

রাধাআদি গোপাঙ্গণা সনে কৃষ্ণচন্দ্র।
রাসলীলা করে মনে পাইয়া আনন্দ ॥
সেই রাসলীলা স্ফূর্তি হইলা লীলাশুকে।
নিজসম সখী প্রতি কহে নিজ মুখে ॥

(বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, বিষ্ণুপুর শাখার পুঁথি-সংগ্রহ)

ক্রমিক নং	পুঁথির বিবরণ	লিপিকাল ইত্যাদি
৩১৮২	পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে হরপার্বতী সংবাদে নারায়ণ মাহাত্ম্য	
১৯২৯	পদ্মপুরাণে গোপনীয় চিন্তামণি ধ্যান	
৪৬৪১	আত্মবোধ, দ্বাদশ উল্লাস।	সকে ১৭। ৬৮। ৭। ১০ সন ১২৫৩ সাল কার্ত্তিকে বুধবারে প্রতিপদ তিথৌ লিপিরিয়ং শ্রীনিমানন্দ সরকার ॥ শ্রীবিশ্বরূপ সরকার ॥ সাং চাবড়া
২৯৩৯	বিদগ্ধমুখমণ্ডনম্ ঃ ধর্মদাস ঃ	লিপিরিয়ং বেণীমাধব দাশগুপ্ত, সন ১২৭০। ১৯ বৈশাখ
৫৫৫৩	অধ্যাত্মরামায়ণে রামসীতা	শকাব্দা ১৭৯৪ রামনারায়ণ বৈদিক দেবশর্ম্মণ। উমাচরণ দেবশর্ম্মা। বেলিয়াতোড় নিবাসী পুরুণিয়া পরগণা সন ১২৭৯ সাল

এই লীলাস্ফূর্তির কামনাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরও অভীষ্ট। বলাবাহুল্য শ্রীচৈতন্য দক্ষিণ-দেশ থেকে লীলাশুকের 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত' এবং 'ব্রহ্মসংহিতা'র প্রতিলিপি করিয়ে নিয়ে এসেছিলেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে, অতএব, শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের প্রভাব আশ্চর্যের নয়। বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদের পুঁথি সংগ্রহে 'ব্রহ্মসংহিতা' এবং 'শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত' প্রতিটির একাধিক করে প্রতিলিপি বর্তমান। যাইহোক, কৃষ্ণলীলা তথা রাসলীলা প্রসঙ্গ ভারতে প্রচারিত সমস্ত বৈষ্ণবধর্মের মূলে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করেছে। শ্রীমদ্ভাগবতে ব্যাখ্যাত শ্রীকৃষ্ণলীলার শ্রেষ্ঠলীলা রাসলীলা। এখানে গোপীদের আত্মনিবেদনে আভাসিত হয়েছে শরণাগতির সর্বোৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এই রাসলীলাতেই "সর্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" ঈশ্বরের এই উক্তির প্রতিফলন এবং এরই মধ্যে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের অন্যতম মূল প্রতিপাদ্য গোপীভাবের বীজ নিহিত।

(বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, বিষ্ণুপুর শাখার পুঁথি-সংগ্রহ)

ক্রমিক নং	পুঁথির বিবরণ	লিপিকাল ইত্যাদি
১৫৩৩	বটুকভৈরবস্তব	
১৪৫১	প্রবোধ চন্দ্রোদয়	
১৭৯৮	নলোদয় কাব্য	
৫৫১৮	অমরুশতক টীকা	লেখক রামচন্দ্র দেবশর্ম্মা ১৭৪৬ শকাব্দা ৩রা ভাদ্র (১—২৫)
৫৮৫৯	সত্যনারায়ণ ব্রত	
৩৪৮৪	মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ	শ্রীঅধরচন্দ্র দেবশর্ম্মা। পাইকপাড়া ১৮১২। ৭। ৯ সোমবার
৩০৯৮	গরুড়পুরাণে আয়ুর্বেদ	
৫৬৮৭	পুষ্পদন্ত বিরচিত মহিম্নস্তোত্র, টীকাসহ,	লিখিতং রামলোচন গোস্বামী
২৯৫১	মেঘদূতম্	লিখিতং ১৭৬৭
৫৩৬৩	আদিত্যহৃদয় নামাস্তোত্রং সমাপ্তম্	শ্রীমুক্তারাম দেবশর্ম্মণঃ শাক্ষর পুস্তকমিতি

তৎপত্যপত্যসুহৃদামনবৃত্তিরঙ্গ
স্ত্রীণাং স্বধর্ম্ম ইতি ধর্ম্মবিদ্যাত্বয়োক্তম ।
অস্তেবমেতদুপদেশপদে ত্বয়ীশে
প্রেষ্ঠো ভবাংস্তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা ॥

হে প্রভু ! ধর্মকে আপনি যে বলেছেন পতি, পুত্র ও সুহৃদবর্গের শুশ্রূষাই স্ত্রীলোকের ধর্ম, তা উপদেশকারী ও ঈশ্বররূপী আপনার সেবাতেই সিদ্ধ হউক, যেহেতু আপনি দেহধারীমাত্রেরই প্রিয়তম আত্মা ও বন্ধুস্বরূপ (অনুবাদ মহানামব্রত ব্রহ্মচারী। ভারতের বৈষ্ণব পদাবলী, ডঃ সতী ঘোষ, থেকে উদ্ধৃত)। এই ভাবাদর্শের প্রকাশ ঘটেছে যুগপৎ গোবিন্দদাসের রাসলীলার পদে।

তোহে সোঁপিত জিউ তুয়া রস পাব
তুয়াপদ ছোড়ি অব কাঁহা যাব ॥

ডঃ সতী ঘোষ তাঁর 'ভারতের বৈষ্ণব পদাবলী' গ্রন্থে গোবিন্দদাসের সমধর্মী অসমীয়া কবি শঙ্করদেবের রাসলীলার যে পদ উদ্ধৃত করেছেন তা থেকে অংশবিশেষ নিম্নে দেওয়া হল।

সমস্ত বিষয় এড়িয়া স্বামী ।
ভজিলে তোমার চরণে আমি ॥

(বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, বিষ্ণুপুর শাখার পুঁথি-সংগ্রহ)

ক্রমিক নং	পুঁথির বিবরণ
৩৩০১	ভাগবত ভাবার্থ দীপিকা ঃ শ্রীধরস্বামী
৩৩৩৯	রত্নাবলী নাটক। শ্রীহর্ষ ১৬৯৩ আশ্বিন
৪৬৬৯	শ্রীকৃষ্ণার্চ্চন দীপিকা (১৭-৩৬) শকাব্দা ১৬১৭ তেরিখ ৭ পৌষ লিখিত সেহতৎ শ্রীকৃষ্ণশর্ম্মণা।
৫৪১৪	পদ্মপুরাণে পাতালখণ্ডে মুরলীগুঞ্জে। চন্দ্রিকাণাং প্রাদুর্ভাব। (১—২)
৫৯৪৬	বেণীসংহার = ভট্টনারায়ণ
৩২১৬	পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ড।
৩১৫৬	আদিত্য হৃদয়।
৩২১২	ভাগবতামৃত গ্রন্থ। লিখিতং বিশ্বরূপ সরকার সাং চাবড়া পরগণে বিষ্ণুপুর তরফ গামিদ্যা সন ১২৪৭ তাং ২শ্রাবণ শক ১৭৬২ বেলা আড়াই প্রহর বৃহস্পতিবার ।
৪৯০৪	অমরুশতকের বাংলা অনুবাদ (১—৮ পত্র)

(এই প্রসঙ্গে পশ্চিম ভারতের গুজরাটী কবি নরসিংহ দাস মেটার রাসলীলার পদের অনুবাদ তুলনীয়। ডঃ সতী ঘোষের "ভারতের বৈষ্ণব পদাবলী" থেকে উদ্ধৃতি।)

থেই থেই করে অগণিত অঙ্গনা
প্রতি গোপী সাথে শোভে সুন্দর কান
বাজিছে নূপুর কটিতটে কিংকিনী
তাল মৃদঙ্গরস একতান।

শ্রীধরস্বামী রাসের বর্ণনা দিয়েছেন ঃ—

'অন্যোন্যব্যতিষক্তহস্তানাং স্ত্রীপুংসাং গায়তাং মন্ডলীরূপেণ ভ্রমতাং নৃত্যবিনোদঃ রাসো নাম।'

(নারী ও পুরুষ পরস্পরের হস্তধারণ করে গান করতে করতে মন্ডলী রূপে ভ্রমণ করতে করতে যে নৃত্যানন্দ সম্ভোগ করে তাকে বলা হয় 'রাস'—"বৈষ্ণব সাহিত্য" ত্রিপুরাশংকর সেন দ্রষ্টব্য)।

(বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বিষ্ণুপুর শাখার সংগ্রহ)

ক্রমিক নং	পুঁথির বিবরণ
৫৮৪	কৃষ্ণগণোদ্দেশদীপিকা
৮৯	ভাগবতামৃত (সনাতন) গোলকমাহাত্ম্য খন্ডে ... ...
৩৩২	সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় (১-২১) স সন ১২২৩ সাল
৭৯৮	গদাধরভট্ট, ও জীবগোস্বামী সংবাদ। ১-৩০ (ভাষা)
৩৬৮	প্রাকৃত পিঙ্গল। পত্র ১-৪৪(অস)
৮০৭	চৈতন্যচন্দ্রামৃতং (প্রবোধানন্দ সরস্বতী—২-১১)... শকাব্দা ১৬৬৭ ভাদ্র পদ সপ্তবিংশতি দিবসে দিবা তৃতীয় প্রহরে সম্পূর্ণ।
৪০৪৩	অনর্ঘরাঘব = মুরারি মিশ্র
২৯৫০	শৃঙ্গারতিলক (কালিদাস কৃত) সন ১২৪৮ সাল।
১৮৮৭	কিরাতার্জ্জুন
১৮৭৮	পবনদূত (ধোয়ী)
১৮৭৯	কিচকবধ-নীতিবর্ম্মা।

রাসলীলা অধিকাংশ বৈষ্ণবধর্মে প্রভাব বিস্তার করলেও তার প্রেক্ষাপটে প্রকটিত গোপীভাবকে অঙ্গীকার করে শ্রীচৈতন্যের মত এক সাধন প্রণালীর প্রবর্তন যে কুত্রাপি দেখা যায় না তা আগেও একাধিকবার বলা হয়েছে। প্রমথনাথ তর্কভূষণের মতে ('ভারতের পদাবলী সাহিত্য' = ডঃ সতীঘোষ দ্রষ্টব্য) শ্রীমদ্ভাগবতে প্রতিপাদিত গোপীভাবপ্রবণ সাধনা রামানুজ ও মধ্ব কর্তৃক অঙ্গীকৃত ও প্রচারিত হয় নাই তাই সেই সেই সম্প্রদায়ে এভাব-সাধনের প্রচলন নাই। নিম্বার্ক ও বিষ্ণুস্বামী প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ে ইটি আংশিকভাবে স্বীকৃত হয়েছে।' বল্লভাচার্যের 'মর্যাদা-মার্গ' বা 'পুষ্টিমার্গের' সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের 'বৈধীভক্তি' ও 'রাগানুগা'র মিল থাকলেও, এবং তাঁর 'মধুরাষ্টক' ইত্যাদির মাধ্যমে গৌড়ীয়বৈষ্ণবদের মধুরভাব সাধনার ব্যঞ্জনা প্রকাশিত হলেও এ মতের দ্বারা কোন গোপীভাবসমৃদ্ধ সাধন প্রণালী প্রবর্তিত হয় নাই। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে গোপীপ্রেম তথা রাগানুগাভক্তির যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মননসমৃদ্ধ বিভাগ এবং ভাষ্য রচিত হয়েছে এই প্রণালীতে সাধনের যেসব বিচিত্র পর্যায় এবং পন্থা নির্দিষ্ট হয়েছে তা অন্যত্র ঠিক এমন দেখা যায় না। গোপীদের মধ্যে স্বভাবভেদে বিবিধ বিভাগ বর্তমান। শ্রীরাধার কায়াব্যূহ স্বরূপিনী যে ব্রজগোপীরা রয়েছেন, তাঁরা "নিত্যসিদ্ধা" বা নিত্যপ্রিয়া। তাঁদের কৃষ্ণপ্রেম সাধনালব্ধ নয়—স্বরূপগত। তাঁরা স্বরূপ শক্তির মূর্ত বিগ্রহ বা স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ। প্রেম তাঁদের স্বভাবেই নিহিত। সেবার প্রকারভেদে এই সখী বা গোপীদের

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বিষ্ণুপুর শাখার সংগ্রহ)

ক্রমিক নং	পুথির বিবরণ
৭০৯	শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যাস্তকং রূপগোস্বামী বিরচিত
৫৩৫৪	মথুরামাহাত্ম্য সমাপ্ত। শকাব্দ ১৬৫৮ তারিখ ৮ কার্ত্তিক। বসু বাণ রস চন্দ্রে গণিতে বিক্রম শাকে ব্যলেখি পুস্তকমিদং, শ্রীবিষ্ণুশর্ম্মাত্মজ ;
৩১৪১	ব্রহ্মান্ড পুরাণে – শ্রীমদধ্যাত্ম রামায়ণে (১—১৯৯)
৫৩৭০	ব্রহ্মান্ড পুরাণে শ্রীরাম গীতা পঞ্চম অধ্যায়, শকাব্দা ১৬৪৫ (১-৬পত্র)

দুটি শ্রেণী আছে—সখী ও মঞ্জরী। ললিতা-বিশাখা প্রভৃতি সখী, কারণ তাঁদের সেবায় শ্রীরাধিকার মত স্বাতন্ত্র্য আছে। শ্রীরূপমঞ্জরী, অনঙ্গমঞ্জরী প্রভৃতি, যাঁদের সেবা ললিতা-বিশাখাদির আনুগত্যময়ী, স্বতন্ত্রা নন। তাই তাঁরা মঞ্জরী বা আনুকূল্যকারিণী কিংকরী। শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপশক্ত্যেকসহায়। সখী ও মঞ্জরী এই উভয়বিধ পরিকররূপিনী তাঁর স্বরূপশক্তিরই প্রকাশ। অপর এক শ্রেণীর গোপী আছেন, যাঁদের 'সাধনসিদ্ধা' বলা হয়। 'সাধন-সিদ্ধা' গোপীরা সকলেই মঞ্জরী। এই সাধনসিদ্ধ 'গোপীতত্ত্বই' জীবের সাধ্য।* অনেকে মনে করেন—('কবি জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ ঃ ভূমিকা ঃ হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়) সখী ও মঞ্জরীর সেবায় তাৎপর্য-পূর্ণ পার্থক্য আছে। সখীদের সঙ্গে কদাচিৎ হলেও শ্রীকৃষ্ণের বিলাস সম্ভব—কিন্তু মঞ্জরীদের সঙ্গে বিলাস নৈব নৈব চ। মঞ্জরীরা লীলার দর্শিকা। শ্রীকৃষ্ণ রাধিকার বিলাস কালে সখীরা স্থানত্যাগ করেন, কিন্তু মঞ্জরীরা কুঞ্জদ্বারে উপস্থিত থেকে লীলাদর্শন করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে মঞ্জরী ভাবসাধনার একটি বড় ভূমিকা আছে। রূপ ইত্যাদি মুখ্য গোস্বামীরা এক এক 'মঞ্জরী' রূপে অভিহিত হতেন। কোন কোন গ্রন্থে শ্রীরূপগোস্বামীকে 'রূপমঞ্জরী' বলা হয়েছে। রামচন্দ্র কবিরাজের সিদ্ধসখীরূপের নাম ছিল কণকমঞ্জরী। ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন পদাবলীর দুই বলরামের মধ্যে একজন ছিলেন রামচন্দ্র কবিরাজের শিষ্য। বিশিষ্ট ব্রজবুলির পদগুলি যে এই বলরামেরই রচিত সে সিদ্ধান্ত তিনি করেছেন একটি মঞ্জরী ভাবসাধনার পদে "কণকমঞ্জরী'র উল্লেখ থেকেই ঃ

কণকমঞ্জরী রতি মঞ্জরী রোয়ত
রোয়ব কব বলরাম ॥

(বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বিষ্ণুপুর শাখার সংগ্রহ)

ক্রমিক নং	পুঁথির বিবরণ
৩২৩৮	মার্কণ্ডেয় পুরাণে রৌচ্য মন্বন্তরে পিতৃবর প্রদান নাম রুচিস্তব সমাপ্ত। শ্রীরামকিংকর দেব শর্ম্মণঃ লিপিরয়ং পুস্তকঞ্চ শক ১৭৩৪।৩।১০
৭১	প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা=নরোত্তম ১-৭পৃ সন ১১৯৪ সাল

* শ্রীরাধাতত্ত্ব ও শ্রীচৈতন্য সংস্কৃতি—জনার্দন চক্রবর্ত্তী

কথিত আছে, শ্রীরূপ গোস্বামী গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে মঞ্জরীভাব-সাধনার প্রবর্তন করেন। তাঁরই আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে রঘুনাথদাস গোস্বামী 'বিলাপকুমাঞ্জলি'তে চাটুপুষ্পাঞ্জলির ভাবাদর্শানুরূপ সেবা প্রার্থনা করে যেসব পদরচনা করেছেন তার অনুবাদের কিয়দংশের উদ্ধৃতি এখানে দেওয়া হ'ল (অনুবাদক কবি রাধাবল্লভ দাস ঃ বরাহনগর পাঠবাড়ীর অনুবাদ ঃ পুঁথির সংখ্যা ১৯) ঃ—

প্রাতঃকালে কর্পূর মিশ্রিত সুবাসিত।
যত্নকরি আনি জল মৃত্তিকা সহিত॥
গন্ধ কর্পূর দিয়া সুবাসিত বারি।
কলসি কলসি করি সুবাসিত জল ভরি॥
প্রণয়ে ললিতা সখি আগে আনি দিব।
তব বর অভিষেক হা কবে করিব॥

(শ্যামরায় মন্দিরের দক্ষিণদিকের ত্রিখিলান প্রবেশদ্বারের বাঁ দিকের দেওয়ালের টেরাকোটা-চিত্রে এই অভিষেকচিত্র পরিস্ফুট)।
নরোত্তম দাস এই পথেরই পথিক। রূপ আর রঘুনাথকে অনুসরণ করে তিনি মঞ্জরী ভাব-সাধনার পথে অগ্রসর হওয়ার প্রবল আকাঙ্খা প্রকাশ করেছেন ঃ—

রূপ রঘুনাথ বলি হইবে আকুতি।
কব হাম বুঝব সে যুগল পিরিতি॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে রহু মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস॥

নরোত্তমের গুরু ছিলেন লোকনাথ। রূপ আর রঘুনাথের পদে আশ্রয়-প্রার্থনা করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি নিজগুরুর কৃপাভিক্ষা করেছেন মঞ্জরী ভাব-সাধনার আদর্শে।

(বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বিষ্ণুপুর শাখার সংগ্রহ)

ক্রমিক নং	পুঁথির বিবরণ
৭৩	স্মরণ মঙ্গল=নরোত্তম (১-১৭পৃঃ) ১০৬৪ সাল
১২১	চমৎকার চন্দ্রিকা নরোত্তম দাস) ১-১১ সন ১২৮৩
১৩৮	রাধাকৃষ্ণলীলারসকদম্ব (পৃঃ১-১০৯সমু) যদুনন্দন শক ১৭৬৪ সন ১২৪৯
১৪৮	কার্পণ্য পঞ্জিকা—(১-২) সং বৈষ্ণবপুঁথি

তোমার সহিত থাকি সখির সহিতে।
এইত বাসনা মোর সদা উঠে চিতে ॥
সখীগণ জ্যেষ্ঠ যেঁহ তাঁহার চরণে ।
মোরে সমর্পিবে কবে সেবার কারণে ॥

নরোত্তম ঠাকুর প্রেমভক্তি চন্দ্রিকায় বলেছেন :—

রাগের ভজন পথ কহি এবে অভিমত
লোক বেদসার এই বাণী।
সখির অনুজা হইয়া ব্রজে সিদ্ধ দেহ পায়্যা
সেই ভাবে জুড়াবে পরাণী ॥

শ্রীনিবাসের গুরু গোপালভট্ট 'গুণমঞ্জরী' নামে খ্যাত ছিলেন। এ নামেই শ্রীনিবাস এক পদে তাঁকে স্মরণ করে সেবা প্রার্থনা করেছেন

তুঁহু গুণ মঞ্জরী রূপে গুণে আগরী
মধুর মধুর গুণধামা ।

আপনা অনুগা করি করুণা কটাক্ষে হেরি
সেবা সম্পদ করদানে ।

(বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, বিষ্ণুপুর শাখার সংগ্রহ)

ক্রমিক নং	পুঁথির বিবরণ
৬৫৭	মঞ্জরীতত্ত্ব (খণ্ডিত জীর্ণ)
৬৫	প্রার্থনা পদাবলী : নরোত্তম দাস
৬৪	ভক্তি লতাবলি : নরোত্তম দাস
৬৮	চমৎকারচন্দ্রিকা : নরোত্তম ১ — ৭ সম্পূর্ণ
৭০	উপাসনা পটল : নরোত্তম ৩ — ৮ পৃঃ খণ্ডিত ।
১২৭	বৈষ্ণব বন্দনা (দেবকীনন্দন) ১- ৫ পৃঃ (সম) শকাব্দ ১৭০৭।
১২৬	বৈষ্ণব বন্দনা (দেবকীনন্দন) পৃঃ ১— ৯ (সম) সন ১০৯১ সাল।
১২৩	বৈষ্ণব বন্দনা (দেবকীনন্দন) পৃঃ ৩, ৪. ৬, ৭ লিখিতং যুগলকিশোর দাস সন ১০৪৫।

অনেকে মনে করেন, শ্রীনিবাস আচার্য 'মঞ্জরী-ভাব-সাধনা'র অন্যতম বিশিষ্ট প্রবক্তা। শ্রীনিবাস, নরোত্তম, শ্যামানন্দ, গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্ম (মূলতঃ ব্রজধামের গোস্বামী-সিদ্ধান্ত) প্রচারের ভার পেয়েছিলেন শ্রীজীবগোস্বামীর কাছ থেকে। তাঁর নির্দেশেই তাঁদের বঙ্গদেশে অভিযান। স্ব স্ব গুরুর উদ্দেশে রচিত শ্রীনিবাস আর নরোত্তমের উপরোক্ত পদগুলি থেকে এটা মনে করা অসঙ্গত নয় যে, তাঁরা গৌড়বঙ্গে গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্মের 'গোস্বামী-সিদ্ধান্তের' যে ধারা বহন করে আনেন তাতে রূপগোস্বামী প্রবর্তিত মঞ্জরীভাব সাধনার একটি অতি প্রধান ভূমিকা ছিল। শ্রীনিবাসের উদ্যোগে এই মঞ্জরী ভাব-সাধনা যে গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্মের সাধন দর্শনে এক বিশিষ্ট মাত্রা লাভ করেছিল, তা শুধু তাঁর পদ থেকেই নয়, তাঁর শিষ্য এবং গোষ্ঠীভুক্ত কবিদের কবিতা থেকেও বোঝা যায়। শ্রীনিবাসের শিষ্য (কর্ণানন্দ-মতে) বিখ্যাত কবি গোবিন্দদাস কবিরাজও মঞ্জরী-ভাবের একাধিক পদ লিখেছেন। বলাবাহুল্য শ্রীনিবাসের প্রভাবেই তা সম্ভব হয়েছে। বিলাসের সময় শ্রীরূপ গোস্বামী যেমন কিশোর-কিশোরীকে বাতাস করেন (বা বাতাস করার আকাঙ্খা ব্যক্ত করেন) গোবিন্দদাসও ঠিক সেইরূপ সেবা প্রার্থনা করেছেন—

নিতি নিতি ঐছন দুহুঁক বিলাস।
বীজন করতহি গোবিন্দ দাস॥ (পদকল্পতরু ১১১১)

অথবা

গোবিন্দ দাস ঝারি লেহি ঠারহি
চামর ঢলায়ত থোরি।

(বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বিষ্ণুপুর শাখার সংগ্রহ)

ক্রমিক নং	পুঁথির বিবরণ
১৪৭	রাধাকৃষ্ণতত্ত্ব নিরূপণ (বৈষ্ণবপুঁথি) সম্ ১ -৩ পঃ
১৩৩	গোবিন্দ রতিমঞ্জরী : ঘনশ্যাম দাস (অস) ১ ১২ পৃঃ
১২২	স্বরূপবর্ণন ঃ কৃষ্ণদাস (খণ্ডিত)
১৩১	স্মরণ দর্পণ ৯, ১০, ১২ পাতা মাত্র
২০৭	গুণলেশ সূচক স্তোত্র শ্রীশ্রীনিবাসস্য, পৃঃ ১ ৭ (স)
২০৭	দেহতত্ত্ব চিন্তামণি (জয়দেব ?) ১—১৭ ; সন ১২৭০ ঃ সাক্ষর শ্রীনাথমণ্ডল দাসানুদাস।

চামর হাতে কিংবা জলের ঝারি হাতে সেবিকা গোপী বা মঞ্জরীর চিত্র বিষ্ণুপুরের মন্দির (শ্যামরায়) টেরাকোটায় অসংখ্য । এই নিরলস সেবা ও লীলাদর্শনেচ্ছা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের অনন্য সাধন-বৈশিষ্ট্য । শ্রীজীবগোস্বামী 'ভক্তিসন্দর্ভে' (২৮৬ অনুচ্ছেদে) লিখেছেন– ভগবৎ সেবাই যাঁদের একমাত্র পরম পুরুষার্থ সেইরকম শুদ্ধ ভক্তগণের পক্ষে নিজ ভাবানুকূল সেবার উপযোগী ভগবৎ পার্ষদ দেহের ভাবনা অবশ্য কর্তব্য । মঞ্জরীরা ব্রজে সিদ্ধ দেহলাভ করে রাধাকৃষ্ণের নিত্যলীলা দর্শনের প্রত্যাশী । বিলাসে অংশ গ্রহণে প্রত্যাশী নন । শ্রীরূপ-গোস্বামী উজ্জ্বল নীলমণিতে (পৃঃ ৩৫৮-৫৯) শ্রীরাধার মুখে বলিয়েছেন – "মণিমঞ্জরী কদাপি লীলাবিলাসের স্পৃহা করেনা, যদিও আমি তাহাকে বহু প্রলোভন বাক্যে প্রলুব্ধ করে বলেছিলাম যে কৃষ্ণাঙ্গ সঙ্গসুখ ব্যতীত কোন সুখই অধিক নহে । তার অনিচ্ছা থেকে বুঝলাম সে শুদ্ধধী ।" গোবিন্দদাসের পৌত্র ঘনশ্যামদাসও পিতা-মহের ন্যায় আবিষ্ট হয়ে ভণিতা দিতে পারেন নাই । অধিকাংশ পদের ভণিতাতেই তিনি "কহ ঘনশ্যামদাস" এইরূপ সাধারণ ভণিতা দিয়েছেন । ক্বচিৎ কখনও লীলাদর্শন করবার কথা বলেছেন ।

(শ্রীরূপ ও পদাবলী সাহিত্য)

(বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বিষ্ণুপুর শাখার সংগ্রহ)

ক্রমিক নং	পুঁথির বিবরণ
৩০	স্বরূপ বর্ণন ঃ কৃষ্ণদাস
১০২	গোবিন্দরতিমঞ্জরী ঃ ১-১৯ ঘনশ্যামদাস
৯৪৩	বৈষ্ণবামৃত ঃ নরোত্তম
৯৩৯	স্মরণ মঙ্গল; ১ম পত্র তারিখ ১২ই জ্যৈষ্ঠ সন-১১২১
৮৯৯	গোলক মাহাত্ম্য ; শকাব্দ ১৬৬৫পুস্তকমিদং সুন্দরা-নন্দ শর্ম্মণা
৮৯৩	তত্ত্ববিলাস (৩৭-৩৯ পত্র) ১০৬৮ ; ২২ আষাঢ় বিদ্যাপতির পদ শেষ
৮৩২	মুরলীবিলাস ঃ রাজবল্লভ দাস
৩৬২	ভট্ট (ভতৃ) হরি বিচরিত নীতিশতক ১-৮ (স)
৪৩৮	কৃষ্ণমঙ্গল (দ্বিজমাধব)

'কার্পণ্যপঞ্জিকা'র স্তোত্রে রূপগোস্বামী কিশোর-কিশোরীর দৌত্য প্রার্থনা করে জানিয়েছেন গুরুজন পরিবৃত হয়ে থাকার কালে যখন তাঁদের পরস্পরের দেখা সাক্ষাৎ দুরূহ হয়, তখন রূপ উভয়ের খবরাখবর উভয়কে সরবরাহ করে তাঁদের আনন্দবিধান করে কৃতার্থ হবেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের শাস্ত্র-সাহিত্যে পরিস্ফুট এই সেবাভিলাষের মধ্যেও এধর্মের অঙ্গীকৃত গোপীভাবের মূলসূত্র বিদ্যমান। 'গোপী' এবং 'মঞ্জরী'র প্রকৃতিগত প্রভেদ থাকলেও উভয়েরই অভীষ্ট সেবা। মঞ্জরীরা 'গোপীভাবের'ই এক বিশিষ্ট বিবর্তন। শ্রীরাধাকৃষ্ণের বিলাসলীলার সংঘটন করিয়ে অথবা তাতে অংশগ্রহণ করে (ক্বচিৎ হলেও) গোপী বা সখীরা কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছাই সম্পাদন করেন। কৃষ্ণের প্রীতি বিধানেই তাঁদের আনন্দ বা অভীষ্ট সিদ্ধি (আমার দর্শনে কৃষ্ণ পাইল এত সুখ / এই সুখে গোপীর প্রফুল্ল অঙ্গ মুখ)। নিজেদের মন-প্রাণ-দেহ সম্পূর্ণরূপে শ্রীকৃষ্ণের পায়ে অর্পণ করেই গোপীর পরম চরিতার্থতা। এই শরণাগতিই 'গোপীভাবে'র একপ্রকার মুখ্য সূত্র। মুক্তি বা মোক্ষকে তুচ্ছ করে শুধু প্রিয়কে আনন্দ দেওয়ার বিশিষ্ট রতিকে অবলম্বন করেই গৌড়ীয়বৈষ্ণবের 'গোপীভাব সাধনা' বিকশিত হয়েছে। 'মঞ্জরী ভাব-সাধনা' এরই এক সাধনসিদ্ধ রূপান্তর মাত্র। উজ্জ্বল শৃঙ্গাররসের ভিত্তিতে বিকশিত এই 'গোপীভাবে'র প্রাণ প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে বৃন্দাবনের গোস্বামীরা প্রচলিত রসসিদ্ধান্তকে নূতন আলোকে উপস্থাপিত করে ভগবদ্ রতিরূপ স্থায়ীভাবকে কেন্দ্রে রেখে উজ্জ্বলরসকে প্রাকৃত নায়ক-নায়িকার সম্ভোগ-শৃঙ্গারের রূপকে প্রতিষ্ঠা দিয়ে এক অভিনব 'সাধনপ্রণালী' প্রবর্তন করেছেন। ভগবদ্ভক্তি-কেন্দ্রিক উজ্জ্বলরসকে প্রাকৃত-প্রেমলীলার আবেদনে প্রকাশের ঐতিহ্য ভারতীয় শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রাচীন হলেও তাকে বিশেষভাবে সাধনপ্রণালীতে প্রয়োগের কৃতিত্ব গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের। তাই শৃঙ্গাররসসম্পৃক্ত এই ভক্তিধর্ম একই সঙ্গে ধর্মতত্ত্ব ও শিল্পকলার সফল বাহন হয়েছে। এই শৃঙ্গাররসাশ্রিত ভক্তিভাবকে কেন্দ্র করেই শিল্পজগতেও তাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রেরণায় শত কুসুম বিকশিত হয়েছে। আনন্দোৎফুল্ল গোপীদের

নৃত্যগীতে 'গোবিন্দ-পরিচর্যার' যে বিচিত্র মোটিফগুলি চিত্রে বা মন্দির-ভাস্কর্যে রূপলাভ করেছে তা ধর্মতত্ত্বকে প্রকাশ করতে গিয়ে অসামান্য শিল্পরূপে বিকশিত হয়েছে। সুর-ছন্দ এবং তালনিবন্ধ হয়ে কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছায় যথার্থই নিবেদিত হয়েছে বিষ্ণুপুরের টেরাকোটা-মন্দিরগুলি। এই মন্দিরগুলির প্রতিষ্ঠাফলকে উল্লিখিত 'রাধাকৃষ্ণ মুদে' কথাটিও মন্দির প্রতিষ্ঠাতা ভক্তের গোপীভাবেরই যেন অভিব্যক্তি। শ্রীরাধাকৃষ্ণের আনন্দের জন্যই এই মন্দির আর টেরাকোটা-চিত্রের অলঙ্করণ। আগেই বলা হয়েছে, গুপ্তযুগে রাজস্থানের ঘাগর নদীর (গর্গরা) তীরে ভাগবদ্ধর্মীরা এমনি প্রচুর ইটের টেরাকোটা-মন্দির নির্মাণ করেছিলেন। সেখানেও কৃষ্ণলীলার বিচিত্র চিত্রাবলীর সন্নিবেশ লক্ষ্য করা যায়। গৌড়ীয়বৈষ্ণবধর্মের প্রেরণায় নির্মিত বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলি সেই ঐতিহ্যই বহন করছে। মধ্যযুগের অন্তিম অধ্যায়ে নির্মিত হলেও এগুলির স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যে ক্লাসিক আবেদন বর্তমান। অনেকে তাই বিষ্ণুপুরের

(বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, বিষ্ণুপুর শাখার সংগ্রহ)

পুঁথির সংখ্যা	পুঁথির বিবরণ
	শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এবং বাংলা রামায়ণের প্রতিলিপি প্রস্তুত করেছেন বৈষ্ণব এবং অন্যান্য শ্রেণীর সাধারণ মানুষ : –
৫৪১৮ (১)	জগন্নাথ বন্দনা : লিখিতং মধুসূদন মিস্ত্রীর : সাং রাধাবল্লভপুর পাঠক শ্রীনফর মদক। সাং গোলা সন ১২৩৪ সাল
৫৪২০ (২)	শিবরামের যুদ্ধ : দ্বিজলক্ষণ : সন ১২৫৭। তারিখ ২১শে ফাল্গুন পঠনার্থে হীরালাল দাস কামারপাড়া
৫৪২৩ (৩)	বীরবাহুর যুদ্ধ : দ্বিজলক্ষ্মণ : লিপি শ্রীবংশীধর দাস সরকার। পুস্তক শ্রীনবীন মোহন তন্তুবায় শ্যামনগর সন ১২৩০ সাল। ৩২শে শ্রাবণ।
৯৪৬ (৪)	মানভঞ্জন। সন ১২৪০। ১৯ আশীন। লিখিতং হরিচরণ দাস ঘোষ। আউসনাড়া ইন্দাস।
৮৩৭ (৫)	চৈতন্যচরিতামৃত (আদিলীলা) ১-৮৩(স) পত্র সন ১২৩১ / ১৪ই পৌষ / স্বরূপচরণ দাস।

সতেরোর শতকের (বৈষ্ণবযুগ) শিল্প-বিকাশকে ভারতীয় ক্লাসিক সংস্কৃতির অন্তিম-মধ্যযুগীয় এক বিবর্তন রূপে চিহ্নিত করেছেন। গুপ্তযুগের ভাগবদ্ধর্মীদের ঐতিহ্যের অনুসরণ ছাড়াও, প্রাচীন-সংস্কৃত-শাস্ত্র-সাহিত্য অবলম্বনে ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে বিকশিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনে, বিশেষতঃ 'গোস্বামী সিদ্ধান্তে'র ধাতুপ্রকৃতিতে, নিহিত ক্লাসিক প্রবণতা তার শিল্পসংস্কৃতিতে স্বাভাবিকভাবেই আভাসিত হয়েছে। অবশ্যই এক বিবর্তিত রূপে। বৈষ্ণবসাহিত্যে, বিশেষকরে পদাবলী সাহিত্যে একটি 'মিস্টিক'আবেদন এবং কখনও কখনও 'রোমান্টিক' আভাস লক্ষ্য করা গেলেও শিল্পে প্রাচীন-ঐতিহ্যানুসরণ-প্রবণতা-প্রসূত একটি ক্লাসিক বাতাবরণ দুর্নিরীক্ষ্য নয়। বৈষ্ণবযুগেই, বিষ্ণুপুরে মার্গসঙ্গীতের চর্চা ঘটে। ধ্রুপদ গানের অন্যতম কলাকেন্দ্র হয়ে ওঠে বিষ্ণুপুর। বিষ্ণুপুর ঘরানার অন্যতম বিশিষ্ট গুণী রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন—বাংলাদেশে সংগীত কেন্দ্র বলতে বিষ্ণুপুরকে বোঝায়। এরূপ ব্যাপকভাবে মার্গসংগীতের অনুশীলন ভারতবর্ষের মধ্যে অতি

পুঁথির সংখ্যা	পুঁথির বিবরণ
৬৯	প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা ঃ নরোত্তম ঃ (১-৭)
৭৮	সিদ্ধান্ত চন্দ্রিকা ঃ রামচন্দ্র দাস ঃ পৃঃ ৩-৮ অস
২৫৩	গোবিন্দলীলামৃত ঃ পৃঃ ১-৩৮, ১১৫ খণ্ডিত রঘুনাথদাস ভট্ট শঃ ১৭৪৪ (?)
২৯৯	ভক্তিচিন্তামণি (১-২০ অস) বৃন্দাবন দাস
২৪০	গোবিন্দলীলামৃত (যদুনন্দন) নন্দরামদাস ১২২৮ সাল।
২৯৫	গোবিন্দলীলামৃত খণ্ডিত (যদুনন্দন)
৩২৬	বিষ্ণুভক্তি রত্নাবলী ঃ পৃঃ ১৬ ২২-৩৫, ৩৮ খণ্ডিত
৩২৪	রাধিকা কবচ ঃ (শেষপত্রটি মাত্র)
৩২৮	রাধাষ্টক লক্ষ্মীস্তুতি ইত্যাদি (খণ্ডিত)
৩৪৩	চৈতন্যমঙ্গল ঃ লোচনদাস পত্র ২৪-২৮, ৩০, ৩১ অস
৩৩৭	চৈতন্যভাগবত ঃ আদি-মধ্য-অন্ত্য পত্র ১-১০৭ অস

অল্পই হয়েছে এবং বিশেষ করে সঙ্গীতের মান-উন্নয়ন এবং তার শিক্ষা বিস্তারে সাহায্য করেছে বিষ্ণুপুরের সংগীতজ্ঞগণ। এখানে একসময়ে তানসেনের সঙ্গীতধারা প্রবর্তিত হয় এবং গুরুশিষ্য পরম্পরায় সেই ধারা সযত্নে রক্ষিত হয়।" (ভারতীয় সংগীতের ক্রমবিকাশ ও বিচিত্র রূপ ঃ অভেদানন্দ স্মারক গ্রন্থ) বিষ্ণুপুর ঘরানার স্বরূপ বা রূপ-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন— বিষ্ণুপুরে বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব থাকায় দেশবাসীর মন মহাজন-পদাবলীর ভাবরসে সিঞ্চিত ছিল। সেজন্য ধ্রুপদ, যার মধ্যে কাব্যের স্থান আছে, সে গানের প্রধানতঃ সেখানে অনুশীলন হয়। বিষ্ণুপুরের স্বনামধন্য সংগীতজ্ঞগণ গানে কথার আবেদনই উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁরা গানের ভাবরসের দিকে যতটা নজর দিয়েছিলেন, ততটা দেননি Technique বা অলঙ্কার প্রাচুর্যে। (ভারতীয় সঙ্গীতের ক্রমবিকাশ ও বিচিত্র রূপ ঃ অভেদানন্দ স্মারকগ্রন্থ ঃ পৃঃ ২৫৫)। এক সময় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বিষ্ণুপুর শাখার উদ্যোগে আয়োজিত "গোপেশ্বর স্মৃতি বক্তৃতা মালার" (বিষ্ণুপুর সঙ্গীত ঘরানার উপর) দ্বিতীয় বক্তৃতায় অংশগ্রহণ করে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এ ঘরানার চারিত্র-বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করতে গিয়ে বলেছিলেন সরল অনাড়ম্বর প্রকৃতির এই বিষ্ণুপুরী-ধ্রুপদের সমগোত্রীয় সঙ্গীত তিনি রাজস্থানের একলিঙ্গজীর মন্দিরে আরতির সময় শুনেছিলেন।' রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (অভেদানন্দ স্মারকগ্রন্থ) বলেছেন, ধ্রুপদ-সংগীত ছিল উপাসনার অঙ্গ কিন্তু পরবর্তী যুগে ধ্রুপদ দরবারী-সংগীতে পরিণত হয়। কিন্তু এখনও ভারতবর্ষের অনেক পুরাণো মন্দিরে মৃদঙ্গ সহযোগে ধ্রুপদ গীত হয়।" এ প্রসঙ্গে রমেশচন্দ্র বিষ্ণুপুরের কথাও উল্লেখ করেছেন - "বিষ্ণুপুরে বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব ছিল এবং দোল উৎসবে স্থানীয় গায়কগণ দলবদ্ধভাবে মৃদঙ্গ ও তানপুরা সহযোগে বিখ্যাত হোরিগান (ধামার) গেয়ে সমস্ত মন্দিরগুলি প্রদক্ষিণ করতেন।" এ অনুষ্ঠান আধুনিককালে অনুষ্ঠিত হলেও (বিংশ-শতকের প্রথমভাগে) এটিকে প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী প্রচলিত ধারার অনুসরণ বলে অনুমান করা অসঙ্গত নয়।

কথিত আছে, বিষ্ণুপুরে বর্তমানে প্রচলিত সঙ্গীতধারার প্রবর্তন অষ্টাদশ শতকে মল্লরাজ দ্বিতীয় রঘুনাথসিংহের আমলে। অষ্টাদশ শতকে এখানে প্রবর্তিত সঙ্গীত ধারা ক্রমশঃ গুরু-শিষ্য-পরম্পরায় বিস্তার লাভ করে এই শতকের শেষের দিকে বঙ্গদেশে ভারতীয় শাস্ত্রীয়সঙ্গীতের চর্চা-চিন্তার পুনরুজ্জীবনে এক বিশিষ্ট ভূমিকা পালন করে। বিশেষতঃ ধ্রুপদ-চর্চার ক্ষেত্রে বঙ্গদেশে এসময় বিষ্ণুপুর ছিল পুরোধা। কিন্তু অষ্টাদশ শতকে প্রবর্তিত সঙ্গীত ধারাটিই যে বঙ্গদেশে ভারতীয়-শাস্ত্রীয়-সঙ্গীত-চর্চার একমাত্র নজির এমনটা বলা যায় না। অনেকে মনে করেন, অষ্টাদশ-শতকের পূর্ববর্তী কালে যে বঙ্গদেশে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের চর্চা ছিল তার সাক্ষ্য মেলে জয়দেবের গীতগোবিন্দ কাব্যে এবং নরোত্তম দাসের ক্লাসিক-কীর্তনে।[২৭] সপ্তদশ শতকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের বিশিষ্ট কেন্দ্র বিষ্ণুপুরেও যে শাস্ত্রীয়-সঙ্গীতের চর্চা ছিল একথা অনুমান করা অসঙ্গত নয়। বিশিষ্ট সঙ্গীত তত্ত্ববেত্তারা বিষ্ণুপুরের ধ্রুপদের ধাতুপ্রকৃতিতে এক সরল-অলঙ্কারহীন-ভাবনিবিড়তার

---

২৭ বাংলাদেশের সঙ্গীতচর্চা যে এই প্রথম (অষ্টাদশ শতকে) ভারতীয় মূল সঙ্গীত ধারার সঙ্গে যুক্ত হল, এ ব্যাপারে কিছু ব্যাখ্যার অবকাশ আছে। মনে হতে পারে, দ্বাদশ শতকের বাংলার সঙ্গীতবিদ কবি জয়দেব রচিত গীতগোবিন্দের পদাবলী কি তৎকালীন ভারতীয় সঙ্গীতের মূল ধারা প্রবন্ধ-গীতির অন্তর্গত নয়? কিংবা ষোড়শ শতকের শেষ ভাগে নরোত্তমঠাকুর প্রবর্তিত কীর্তনপদ্ধতি কি নিবদ্ধকরণ-প্রবন্ধ গানের রীতি অনুসারে গঠিত হয়নি? সত্য কথা, ভারতীয় সঙ্গীতের তৎকালে প্রচলিত প্রধান ধারা অনুসরণ করেই সঙ্গীত রচনা করেছিলেন বাংলার উক্ত দুজন সঙ্গীতস্রষ্টা। কিন্তু ফলকথা এই যে, জয়দেবের পদাবলীর সাঙ্গীতিক ঐতিহ্য উত্তরাধিকারী পরম্পরায় বাংলা দেশে রক্ষিত ও বাহিত হয়নি। ক্লাসিকাল কীর্তনসঙ্গীতও পরবর্তীকালে আখর প্রথা প্রযুক্ত হয়ে এবং জনচিত্ত আকর্ষক সরল গীত রূপ গ্রহণ করে ক্লাসিকাল পদ্ধতির আদর্শ থেকে কিছু পরিমাণে বিচ্যুত হয়ে পড়ে। (ভারতীয় সঙ্গীতে নব-জাগৃতি: সংক্ষিপ্ত রূপরেখা: দিলীপ কুমার মুখোপাধ্যায় অভেদানন্দ-স্মারকগ্রন্থ পৃঃ ২৬০)

কথা বলেছেন ; বিষ্ণুপুরী-ধ্রুপদের রূপবিকাশের পর্যালোচনা করতে গিয়ে এঘরাণার অন্যতম বিশিষ্ট সঙ্গীত গুণী রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এর ধাতুপ্রকৃতিতে নিহিত ভাবসর্বস্বতার কারণস্বরূপ পশ্চাদ্‌বর্তী বৈষ্ণবীয় প্রেক্ষাপটের দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করেছেন। বিশিষ্ট সঙ্গীত সমালোচক দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় বঙ্গে মার্গসঙ্গীত চর্চার ক্ষেত্রে অষ্টাদশ শতকের পূর্ববর্তী যে প্রাচীনতর পর্যায়ের কথা বলেছেন, সেখানেও রয়েছে মোটামুটি বৈষ্ণবসূত্রেরই ইঙ্গিত। তিনি এ পর্যায়ে জয়দেব ও নরোত্তমের সাঙ্গীতিক চর্চার কথা বলেছেন। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্মে জয়দেবের প্রভাব যেমন অনিবার্য, বঙ্গে বৈষ্ণব-ক্লাসিক-কীর্তন প্রবর্তনে নরোত্তমের অবদানও তেমনি অবিস্মরণীয়। গৌড়ীয় ধর্ম-দর্শনের কলেবর গঠনে গীতগোবিন্দের মুখ্য ভূমিকা। শ্রীমদ্ভাগবত আর শ্রীগীতগোবিন্দ এ-ধর্মের দুই আকর-গ্রন্থ। শ্রীমদ্ভাগবতে রাধা অনুমান মাত্র, শ্রীগীতগোবিন্দ রাধাময়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম-দর্শনে রাধাই সর্বস্ব। রাধাতত্ত্বই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম-দর্শনকে অভিনবত্ব দিয়েছে। ষোড়শ সপ্তদশ শতকে ভারতের অন্যতম প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কেন্দ্র বিষ্ণুপুরে অতএব জয়দেব-চর্চা স্বাভাবিক ভাবেই এক বিশিষ্ট মাত্রা পেয়েছিল সঙ্গত কারণেই এমনটা মনে করা যেতে পারে। বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদের বিপুল পুঁথি সংগ্রহে জয়দেবের গীতগোবিন্দের প্রচুর প্রতিলিপি বর্তমান। গীতগোবিন্দের পূজারী গোস্বামী কৃত বালবোধিনী এবং নারায়ণদাসের সর্বাঙ্গসুন্দরী টীকার একাধিক প্রতিলিপি এখানে রয়েছে। বিষ্ণুপুরের অন্তর্গত সেনামুখী থেকে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় (ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়সহ) পূজারী গোস্বামীকৃত গীতগোবিন্দের বালবোধিনী টীকার একটি তাৎপর্যপূর্ণ প্রামাণ্য পুঁথির প্রতিলিপি একদা সংগ্রহ করে নিয়েযান একথা আগেই বলা হয়েছে। শুধু বিষ্ণুপুর নয়, ভারতের সমস্ত বৈষ্ণব কেন্দ্রে জয়দেবের গীতগোবিন্দ গ্রন্থের প্রচুর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। আমেদাবাদের পুঁথি সংগ্রহেও একই চিত্র। সেখানেও গীতগোবিন্দের সটীক প্রতিলিপি কম নেই। এর সঙ্গীতের রাগ-রাগিনীর টীকাও সেখানে বেশ কিছু আছে। বিষ্ণুপরের সন্নিকট কাঁকিল্যা গ্রাম থেকে প্রাপ্ত বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও শ্রীগীতগোবিন্দের প্রতিফলন

লক্ষ্য করা যায়, অনেকগুলি পদ গীতগোবিন্দের আক্ষরিক অনুবাদ। গীতগোবিন্দের বেশ কিছু রাগ রাগিণীর সঙ্গেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের বিস্ময়কর সাদৃশ্য আছে। এ মিল প্রথাগত বলে মনে হয় না কারণ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নাটগীত। [২৮] নৃত্যগীত সহযোগে এ পালা সাধারণ্যে পরিবেশিত হত। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নিয়ে বিতর্কের আজও শেষ হয় নাই। এ বিতর্কে প্রবেশ না করে সাধারণভাবে এর রচনাকাল পঞ্চদশ শতক ধরে নিলেও বলা যায়, বিষ্ণুপুর অঞ্চলে গীতগোবিন্দের তথা প্রবন্ধ-সঙ্গীতের সাঙ্গীতিক বাতাবরণ তখনও বজায় ছিল। বিষ্ণুপুরের সতেরোর শতকের প্রায় প্রতিটি মন্দিরের টেরাকোটায় জয়দেবের "দশ-অবতার-চিত্র" আবশ্যিক ভাবে বর্তমান। পরবর্তীকালেও এ ট্রাডিশন সমানে চলেছে সামান্য কিছু পরিবর্তন পরিবর্ধন সহ। এসবই বিষ্ণুপুরে জয়দেবচর্চার নজির।

---

২৮ প্রসিদ্ধ সঙ্গীত-গবেষক শ্রীরাজ্যেশ্বর মিত্র জয়দেবের পদগুলির সঙ্গে (শিরোদেশে) উল্লিখিত রাগগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি রাগরূপের প্রাসঙ্গিকতা দেখিয়ে ঐ ঐ রাগরূপের ভাবার্থের সঙ্গে গীতগোবিন্দের উক্ত পদগুলির অন্তর্নিহিত ভাব-সাদৃশ্য বিশ্লেষণ করেছেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ক্ষেত্রেও এমনি পদশীর্ষে উল্লিখিত দু-চারটি রাগের সঙ্গে উক্ত পদগুলির ভাবসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। যথাঃ— দেশাগ (বা দেশাখ) রাগের রূপ হল দেশাখঃ রাগ কিলমল্লমূর্তিঃ। বিরহ যেন মল্লমূর্তিতে আসিয়া প্রচণ্ড উৎপীড়ন করিতেছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে দেশাগ রাগাঙ্কিত পদটিতে এই ভাবই পরিস্ফুট হয়েছে।

এত দুঃখ বড়ায়ি পরাণে না সহে।
মরোঁ হের রাধার বিরহে ॥ কৃ কী

অন্যত্র দেশ-বড়ারি রাগের একটি পদ আছে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে। দেশ-বড়ারির রাগরূপ হ'ল 'বিনোদয়ন্তী দয়িতং সুকেশী' (যেন দয়িত বিনোদনে শ্রীরাধিকাকে প্রেরণা বা অনুপ্রেরণা দান এতে প্রকাশ পাচ্ছে)। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে দেশ-বড়ারির পদটি হল— তোর রতি আশো আশেঁ গেলা অভিসারে
সকল শরীর বেশ করি মনোহরে ॥ কৃ কী

অথবা

তেজহ সুন্দরি রাধা মুখর মঞ্জীর
সত্বরে চলহ কুঞ্জ এ ঘন তিমির ॥ কৃ কী

অষ্টাদশ শতকের পূর্ববর্তীকালের বঙ্গে মার্গসঙ্গীতচর্চার ক্ষেত্রে দ্বিতীয় যে সূত্রটির প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হয়েছে, তা হ'ল নরোত্তমের ক্লাসিক কীর্তন।[২৯] নরোত্তমঠাকুরের ক্লাসিক-কীর্তনের প্রভাব বিষ্ণুপুরে পড়া খুবই স্বাভাবিক। শুধু বিশিষ্ট বৈষ্ণবকেন্দ্র বলেই নয়, নরোত্তম ছিলেন শ্রীনিবাসের অন্তরঙ্গ সুহৃদ। শ্রীনিবাসের নেতৃত্বে

দ্বিতীয় পদটি জয়দেবের "চল সখি কুঞ্জং......সতিমির পুঞ্জং" পদের আক্ষরিক অনুবাদ। অতএব যদি রাগসন্নিবেশ জয়দেবের অনুসরণেও হয়ে থাকে, তবুও তা নির্বোধ অনুকরণ মাত্র নয়। রাগরূপের সঙ্গে পদের সামঞ্জস্য রেখেই যথানির্দিষ্ট রাগসন্নিবেশ করা হত এবং সাধারণ্যে পরিবেশন করা হত বলেই মনে হয়। এ থেকে শ্রীগীতগোবিন্দের সঙ্গে বড়ু চণ্ডীদাসের শুধু পরিচয়ই নয় এঅঞ্চলে জয়দেব-চর্চার অন্তরঙ্গ চিত্রটিও পরিস্ফুট হয় এবং সমকালে বিষ্ণুপুরে রাগরাগিনীর চর্চা-চিন্তার এক ঋদ্ধ সাঙ্গীতিক-পরিবেশও উদ্ভাসিত হয়।

২৯ ভক্তিরত্নাকরের বর্ণনা থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়, শুদ্ধ বা প্রবন্ধ সঙ্গীতের নিয়মেই নরোত্তমের কীর্তন পরিবেশিত হয়েছিল : প্রাসঙ্গিকভাবেই বর্ণনার কয়েক পংক্তি এখানে উদ্ধৃত হল :—

অনিবদ্ধ নিবদ্ধ গীতের ভেদদ্বয়।
অনিবদ্ধ গীত গোকুলাদি আলাপয়॥
অনিবদ্ধ গীতে বর্ণন্যাস স্বরালাপ।
আলাপে গোকুল কণ্ঠধ্বনি নাশে তাপ॥
আলাপে গমক মন্দ্র মধ্যতার স্বরে।
সে আলাপ শুনিতে কেবা ধৈর্য ধরে॥
... ...
বার বার প্রণমিয়া সবার চরণে।
আলাপ অদ্ভুতরাগ প্রকট কারণে।
রাগিনী সহিত রাগ মূর্তিমন্ত কৈলা।
শ্রুতি স্বর গ্রাম মূর্চ্ছনাদি প্রকাশিলা॥

(ভক্তিরত্নাকর ১০। ৫২৮—৫৪৬)

ধ্রুবপদ বা ধ্রুপদের মতই আলাপ তারপর গান। শ্রুতি, স্বর, মূর্ছনা প্রকাশের বর্ণনা থেকেও ক্লাসিক কীর্তনের স্বরূপটি উদ্ঘাটিত হয়।

যখন বৃন্দাবন থেকে 'গোস্বামী সিদ্ধান্তের' পুঁথির সম্ভার গৌড়ে আসছিল, (গাড়ীভর্তি এই গ্রন্থরাজি বিষ্ণুপুরের সন্নিকটে অপহৃত হয় বলে কথিত আছে) তখন শ্রীনিবাসের সঙ্গী ছিলেন নরোত্তম ও শ্যামানন্দ। যে খেতুরির মহোৎসবে অনিবদ্ধ আর নিবদ্ধ পর্যায়ে বিভক্ত করে নরোত্তম তাঁর ক্লাসিক কীর্তন প্রথম প্রবর্তন এবং পরিবেশন করেন, সেই খেতুরির মহোৎসবে শ্রীনিবাসের ছিল মুখ্য ভূমিকা (অনেকে মনে করেন তিনি প্রধান আচার্য পদে বৃত হ'ন)। এই মহোৎসবের নেত্রী ছিলেন নিত্যানন্দের পত্নী স্বয়ং জাহ্নবাদেবী। কথিত আছে মহোৎসব সমাপনান্তে শ্রীনিবাসের প্রত্যাগমনকালে নরোত্তম যখন বন্ধু বিরহে একান্ত কাতর হয়ে পড়েন, তখন শ্রীনিবাস তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন, এখন থেকে যাজিগ্রাম বিষ্ণুপুর আর খেতুরি এই তিনস্থানেই তাঁর ঘর হ'ল। শ্রীনিবাসের সঙ্গে নরোত্তম তথা খেতুরির এই ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থেকে মনে করা আশ্চর্য নয় যে নরোত্তমের ক্লাসিক-কীর্তনের প্রচার-প্রসার বিষ্ণুপুরে যথারীতি ঘটেছিল। অনেকে শ্রীনিবাসকে বৈষ্ণবীয় ক্লাসিক-কীর্তনের শাখা বিশেষের প্রবর্তক বলেও মনে করেন। ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন ঝাড়খণ্ডী বা মান্দারণী শাখার কেন্দ্র ছিল বিষ্ণুপুর (?)। তিনি বলেছেন বিষ্ণুপুরের রাজসভায় কীর্তন গানের খুব সমাদর ছিল। রাজাদের ঠাকুর বাড়ীতে নানা উৎসবে কীর্তন গান হত। তাঁর মতে বিষ্ণুপুরের কীর্তনগানে বৃন্দাবনের কালোয়াতি গানের প্রভাব বেশীরকম ছিল এবং বৈষ্ণবতায় ব্রাহ্মণ্যের ছাপও গভীরতর ছিল। ডঃ সুকুমার সেন তাঁর মন্তব্যের পক্ষে কোন প্রমাণ সূত্র উল্লেখ না করলেও উক্তিটি অযৌক্তিক নয়। বিষ্ণুপুর এবং বৃন্দাবনের সাঙ্গীতিক সমগোত্রীয়তা খুবই স্বাভাবিক। বৃন্দাবন থেকেই গোস্বামী-সিদ্ধান্তের প্রবাহ বিষ্ণুপুরে আসে। এ সময় বৃন্দাবন ছিল হিন্দু-ধ্রুপদের প্রধান কেন্দ্র। তানসেনের গুরু বলে খ্যাত, বিখ্যাত ধ্রুপদী হরিদাসস্বামী বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করে ইষ্টদেবতা বঙ্কুবিহারীর আরাধনায় বৃন্দাবনে দিনাতিপাত করছিলেন। বৃন্দাবনে থাকাকালীন অনেক বাঙ্গালী বৈষ্ণব আচার্য ধ্রুপদ গানে তালিম নেন। নরোত্তম ঠাকুরকে এঁদের অন্যতম বলে মনে করা হয়। নরোত্তমের ক্লাসিক-কীর্তন এই

অনুমানের সত্যতারই ইঙ্গিত দেয়। বলা বাহুল্য অনিবন্ধ আর নিবন্ধ দুই পর্যায়ে নির্মিত নরোত্তমের কীর্তন যথারীতি মার্গ বা শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের কাঠামোকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। অনিবন্ধ-গীত অর্থে বন্ধনহীন আলপ্তি বা আলাপ। নিবন্ধ গান ধাতু বা অঙ্গদ্বারা আবন্ধ। এই বন্ধত্বহেতুই এর নাম প্রবন্ধসঙ্গীত। প্রবন্ধের অবয়বগুলিই ধাতু। ভক্তিরত্নাকর বর্ণিত নরোত্তমের কীর্তনে শ্রুতি-স্বর-গ্রাম-মূর্ছনা সবই শাস্ত্রীয় সঙ্গীতেরই উপাদান। মূর্ছনাই রাগরূপকে প্রকটিত করে। বস্তুত মূর্ছনার বৈচিত্র্যেই রাগের বৈচিত্র্য ঘটা সম্ভব হয় এবং মূর্ছনার মধ্যেই রাগবিশেষের মূলরূপটি প্রতিফলিত হয়।[৩০] গমক, মন্দ্রস্বর অথবা ন্যাস ইত্যাদিও ক্লাসিক সঙ্গীতেরই অঙ্গ। সর্বসাকুল্যে নরোত্তমের ক্লাসিক-কীর্তনের কাঠামো বা ধাতুপ্রকৃতিটি এই বর্ণনা থেকেই ধরা পড়ে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের, বিশেষ করে বৃন্দাবনের গোস্বামী সিদ্ধান্তের সাঙ্গীতিক আদর্শটিও পরিস্ফুট হয়। বলাবাহুল্য শুধু শাস্ত্র-সাহিত্যেই নয়, গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম, সঙ্গীত, নৃত্য সর্বক্ষেত্রেই শাস্ত্রীয় আদর্শকেই অনুসরণ করেছে, দেখা যায়। কীর্তন ছাড়াও নরহরি চক্রবর্তীর 'ভক্তিরত্নাকরে' (৫ম তরঙ্গে) শাস্ত্রীয় নাচের বিবরণ আছে।[৩১] মূলতঃ ক্লাসিক সংস্কৃতভাষা তথা সংস্কৃতিকে অবলম্বন করেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে আত্মপ্রতিষ্ঠায় প্রয়াসী হয়েছিল। বৃন্দাবনের গোস্বামী-সিদ্ধান্ত এই প্রয়াসেরই ফলশ্রুতি। বৃন্দাবন তথা উত্তরপ্রদেশ তখন ভারতের ভক্তি-আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল। অন্যান্য ভক্তিধর্মের পাশাপাশি গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মকে প্রতিষ্ঠা করে তার একটি সার্বজনীন সর্বভারতীয় রূপ দেবার জন্যই শ্রীচৈতন্য স্বয়ং রূপ, সনাতন, গোপালভট্ট, প্রমুখ গোস্বামীদের বৃন্দাবনে যাবার নির্দেশ দেন। বৃন্দাবনে রচিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের দার্শনিক-

---

৩০, সঙ্গীত সমীক্ষা—রাজ্যেশ্বর মিত্র।

৩১ গীতচন্দ্রোদয়ের গীতবিবরণ অংশেও নরহরি নৃত্যবিষয়ে আলোচনা ও নর্তকের লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন। আগেকার দিনে অনেক কীর্তনীয়া কুশলী নর্তক ছিলেন। তাঁদের দৌলতে মার্গসঙ্গীতের সঙ্গে শাস্ত্রীয় নৃত্যকলা লীলাকীর্তনের প্রকাশ্য আসরে সর্বজনভোগ্য হইয়া উঠিয়াছিল। বাঙ্গলা কীর্তনের ইতিহাস : হিতেশরঞ্জন সান্যাল : লীলাকীর্তন ২০৫ পৃঃ।।

কলেবরটি তাই রূপলাভ করেছিল প্রাচীন ভারতীয় ভক্তিধর্মের প্রাতিষ্ঠানিক পথের অনুসরণে। শুধু দার্শনিক রূপটিই নয়, সঙ্গীত নৃত্য, শিল্পকলা, এককথায় এর সামগ্রিক সাংস্কৃতিক-বলয়টিই যে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির আদলে বা আদর্শে রচিত হয়েছিল তা আগেই বলা হয়েছে। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের বিষ্ণুপুরে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের গোস্বামী- সিদ্ধান্তের মাধ্যমে বা বেনামে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির উত্তরাধিকার স্বাভাবিকভাবেই বর্তেছিল। বিষ্ণুপুরের মন্দির-টেরাকোটতেও গুপ্তযুগের ভাগবদ্ধর্ম বা প্রাচীন ভারতীয় ভক্তি ধর্মের স্মার্ত-পৌরাণিক আভাস দুর্নিরীক্ষ্য নয়। বিষ্ণুপুরের মন্দির-টেরাকোটাতেও আছে প্রচুর নৃত্য-গীতের ছবি। এখানে ব্যবহৃত যন্ত্রগুলি ক্লাসিক; নৃত্যের ভঙ্গিমা (করতালি দিয়া তালরক্ষার) এবং সহযোগী খোল বা মৃদঙ্গের চিত্রগুলিতে ক্লাসিক বৈষ্ণবীয় উচ্চাঙ্গ কীর্তনের সাঙ্গীতিক বাতাবরণেরই যেন আভাস মেলে। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্মের প্রেরণায় ষোড়শ শতকে সর্বভারতীয় সংস্কৃতির অন্যতম উপাদান ক্লাসিক-সঙ্গীতের মধ্যযুগের বিবর্তনজাত ধ্রুপদ গান বিষ্ণুপুরে প্রবর্তিত বা প্রচলিত হয়েছিল এমন ধারণা অতএব স্বাভাবিকভাবেই করা যায়।

বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদের পুঁথিসংগ্রহে প্রাচীন শাস্ত্র সাহিত্যের কয়েক সহস্র পুঁথির সঙ্গে প্রায় দু'শর মত গানের পুঁথি রয়েছে এ গুলিতে প্রাচীন শাস্ত্রীয় রাগরাগিনী সম্বলিত প্রচুর গান রয়েছে। রাগরাগিনীর মধ্যে রয়েছে মল্লার, টোড়ী, গৌরী, কেদার, ধানশ্রী, কানড়, বরাড়ি বেলোআর, সিন্ধুড়া, গোণ্ডশ্রী, সুই, বিভাস, পূরবী মারু, ইত্যাদি; তুলসীদাস, ব্রহ্মদাস, সুরদাস প্রমুখ মধ্যযুগের সাধক-সঙ্গীতজ্ঞদের গানও অনেক আছে। গানগুলিতে ক্ষেত্রবিশেষে আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান, টোড়রমল্ল, বৈরাম খাঁ প্রমুখ মধ্যযুগের সম্রাট-রাজা-রাজপুরুষদের নামোল্লেখও লক্ষ্য করা যায়।[৩২]

৩২। হরিদাস স্বামীর নামোল্লেখঃ দিজ বোলাঅন দখিণা দঅ বহু মঙ্গল পাঅ
হরিদাস প্রভু সেই সে সন্তন সে মন ভাঅ

জাহাঙ্গীরের নামোল্লেখঃ জাঁহাঙ্গীর চলতে বনন ঘর নই পহু

পুঁথি ছাড়াও পুঁথির বহু বিচ্ছিন্নপত্র এখানের সংগ্রহে রয়েছে। এইসব পুঁথি-পত্রে বিভিন্নরাগ-রাগিনীর গানের সঙ্গে ধ্রুপদাঙ্গের কীর্তনের দুটি প্রবন্ধেরও উল্লেখ পাওয়া গেছে। প্রবন্ধ দুটি 'গজলীল' এবং হরিবিলাস প্রবন্ধ। বেশ কিছু তাল এবং খোলের বোলের সন্ধানও এগুলিতে মেলে। এগুলি থেকে বিষ্ণুপুরে ক্লাসিক অঙ্গের কীর্তন এবং ধ্রুপদ গানের নজির মেলে। নরোত্তম দাসের কীর্তনেরও একটি পুঁথি এখানের সংগ্রহে বর্তমান (পুঁথি নং ৪৬৬৮) গানের রাগ-রাগিনী সম্বলিত এমনি একটি পুঁথির পৃষ্ঠায় লিখিত কোন এক অযোধ্যা মহাপাত্রের (বিষ্ণুপুর মহাপাত্র বংশের পূর্বপুরুষ) দুই পুত্রের জন্মপত্রিকার নজিরে মাণিকলাল সিংহ তাঁর "পশ্চিমরাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি" গ্রন্থে বিষ্ণুপুরে সপ্তদশ শতকে সঙ্গীত চর্চার একটি ইঙ্গিত দিয়েছেন।[৩৩] উক্ত জাতকদ্বয়ের জন্ম পত্রিকা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে, ১৬৪০-৪৫ খ্রীষ্টাব্দে অর্থাৎ শ্যামরায় মন্দির ইত্যাদি প্রতিষ্ঠার যুগে (বৈষ্ণব সংস্কৃতির সুবর্ণ যুগে) বিষ্ণুপুরে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের চর্চা অব্যাহত ছিল। বিষ্ণুপুরী ধ্রুপদের অন্যতম লক্ষণ বিশুদ্ধস্বর বা শুদ্ধ রাগ সংরক্ষণ প্রয়াস-প্রবণতার অতিরেকেও রয়েছে বৈষ্ণব সূত্রের ইশারা। শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা যায় গোপীরা কৃষ্ণচিত্ত বিনোদনের জন্য ধ্রুপদ পরিবেশন করছেন। যথা-রীতি প্রথমে আলাপ, তারপর গান। গোপীদের এই উচ্চাঙ্গ ধ্রুপদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে কণ্ঠমাধুর্য বা সুরচাতুর্যের চেয়ে স্বরবিশুদ্ধতা বা স্বরজাতির অমিশ্র রূপের উৎকর্ষই স্বীকৃত হয়েছে। এখানে দেখা যায় কোন গোপী ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে স্বরজাতির আলাপ করছেন। এই স্বরালাপ অমিশ্রিত বা বিশুদ্ধ হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণ 'সাধু'

বৈরাম খাঁ এর উল্লেখ—খান বৈরম সুতন চিত্ত জো হরিরস বক্তু ঔ .....

শাহজাহানের (?) উল্লেখ ..সরণ সাহজনান দীন এ অকববর বেট্টা...

তোড়রমল্লের উল্লেখ—(গজলীস প্রবন্ধ) বর নন্দন মৃগাংক বাড়/তোড়রমল্ল ইআ ইআ। ৩৩ প্রথম জন্ম পত্রিকা : মাঘ মাসস্য বিংশতি বাসরে দিবসে শ্রীঅযোধ্যা মহাপাত্রস্য নবকুমারজাতকস্য রাশি নাম শ্রীমনোহর শৰ্ম্মেতি ....।

(১) শুভমস্তু শকাব্দা ১৫৬২

দ্বিতীয় জন্মপত্রিকাটির পার্শ্বে লিখিত রহিয়াছে শ্রীঅযোধ্যা মহাপাত্রস্য

'সাধু' বলে ঐ গোপীর প্রশংসা করছেন। ঐ গোপী আবার অমিশ্র ধ্রুবতালের সঙ্গে গান করায় ভগবান অধিকতর প্রীত হয়ে তাকে বহুমানে সম্মানিত করছেন। শ্রীগীতগোবিন্দম্ এ দেখা যায়, কোন গোপী (রাসলীলাকালে) মুরলিধ্বনির সঙ্গে করতালি দিয়ে তাল রক্ষা করছেন, তাতে তাঁর বলয়গুলি মৃদুভাবে শিঞ্জিত হচ্ছে। হরি রাসরসে নৃত্যপরা সেই সহচরিনীর প্রশংসা করছেন (প্রথম সর্গ। সামোদ দামোদর ।। ৪৫) চৈতন্যদাস বা পূজারী গোস্বামীর টীকা ঃ রাসরসে নৃত্যপরা যুবতির করতালি দিয়ে তাল রক্ষার কালে হাতের বলয়ের আন্দোলনে উত্থিত শিঞ্জিনীরবের সঙ্গে মুরলীধ্বনির সাদৃশ্য অবলোকন করে শ্রীহরি গোপীর প্রশংসা করছেন (রাসরসে নৃত্যপরা যুবতি : হরিণা প্রশশংসে। তদ্বীয় কিঞ্চিৎ সাদৃশ্যাভাসং সমালোক্য স্তুতেত্যর্থঃ। কীদৃশে ? করতলতালৈস্তরলবলয়াবলিভিস্তৎ স্বনৈঃ-মিলিতঃ কলস্বনো বংশো যত্রতস্মিন)। শ্রীহরির স্তুতির কারণ হ'ল সুর আর তালের মিলে নৃত্য। এখানেও নৃত্যে শাস্ত্রীয় বিশুদ্ধতারই ইঙ্গিত। চৈতন্যদাসের (পূজারী গোস্বামী) টীকায় এ ইঙ্গিত আরও সুস্পষ্ট। তিনি বলেছেন সুরতালের সাদৃশ্যাভাস পেয়ে শ্রীহরি নৃত্যপরা গোপীর প্রশংসা করেছেন। পরবর্তী পংক্তিতে আরও পরিস্কার করে বলেছেন, বংশীর-সুর, তালরক্ষার উদ্দেশ্যে করতালি এবং বলয়ের শিঞ্জিনীর নিশ্ছিদ্র মিল দর্শনেই শ্রীহরির এই প্রশংসা (করতলতালবলয়ধ্বনিমুরলীনাদ সংকুল ইত্যর্থঃ।।৪৫।।)। জয়দেবের উক্তিতেও যেমন শাস্ত্রীয় সঙ্গীত বিধির সন্নিষ্ঠ প্রশস্তি চৈতন্যদাসের টীকাতেও তেমনি শাস্ত্রীয় সঙ্গীত-মনস্কতার নজির। চৈতন্যদাস বা পূজারী গোস্বামী রচিত গীতগোবিন্দের "বালবোধনী টীকার" পুঁথি সোনামুখী থেকে "বৈষ্ণবতত্ত্বাচার্য" হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় উদ্ধার করেছিলেন, একথা আগেই বলা হয়েছে। তিনি তাঁর "কবি

নবকুমারো জাতস্য রাশিনাম শ্রীমনোহর শর্মেতি ....

(২) শুভমস্তু শবাব্দা ১৫৬৭.........

উপরোক্ত জন্ম-পত্রিকা দুইটির কাল হইতে বোঝা যায় যে, অযোধ্যা মহাপাত্রের পুত্রদ্বয়ের জন্মকাল যথ ক্রমে ১৬৪০ এবং ১৬৪৫ খৃষ্টাব্দ।"

পশ্চিমরাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি— মাণিকলাল সিংহ

জয়দেব ও শ্রীগীতগোবিন্দ গ্রন্থে চৈতন্যদাসের বালবোধনী টীকাই অবলম্বন করেছেন দেখা যায়। বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদের সংগ্রহে সম্পূর্ণ এবং খণ্ডিত গীতগোবিন্দ পুঁথির সংখ্যা অনেক। এসব পুঁথির অনেকগুলিতেই রয়েছে চৈতন্যদাসের "বালবোধনী টীকা" (নারায়ণদাসের সর্বাঙ্গসুন্দরী টীকাও রয়েছে)। এই চৈতন্যদাস এবং বৃন্দাবনের গোবিন্দপুজক পুজারী গোস্বামী যে একই ব্যক্তি সে বিষয়ে হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় নিঃসংশয় হয়েছেন সোনামুখীর (বিষ্ণুপুর মহকুমা/জেলা বাঁকুড়া) তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের নিকট প্রাপ্ত একটি টীকার পুঁথি থেকে। চৈতন্যদাস ভূগর্ভ গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন। অপরপক্ষে ভূগর্ভ গোস্বামী ছিলেন শ্রীল গদাধর পণ্ডিত মহোদয়ের শিষ্য। সোনামুখীর উক্ত তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় গদাধর শিরোমণির দৌহিত্র বংশীয়। বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদের পুঁথি সংগ্রহে চৈতন্যদাস রচিত গীতগোবিন্দের বাংলা অনুবাদ-টীকা রয়েছে একাধিক। এটি যে জয়দেবের গীতগোবিন্দের বাংলা টীকা বা চৈতন্যদাসের বালবোধনী টীকার বাংলা অনুবাদ তা পুথি থেকেই বোঝা যায়। কবি লিখেছেন চৈতন্যপদারবিন্দের মধুমত্ত মহামতি কবি চৈতন্যদাস গীতগোবিন্দের অর্থ বোঝার জন্য বালবোধনী টীকা রচনা করেছিলেন। কিন্তু এই বঙ্গানুবাদ যে পুজারী গোস্বামী-চৈতন্যদাসেরই তার কোন নিঃসংশয় প্রমাণ আলোচ্য গ্রন্থে নেই। সম্প্রতি বাঁকুড়া খ্রীশ্চান কলেজের অধ্যাপক ডঃ রবীন্দ্রনাথ সামন্ত বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদের উক্ত গীতগোবিন্দের বাংলা টীকা অনুবাদের উপর কাজ করে সাহিত্য পরিষদের অনুমতিক্রমে প্রকাশ করেছেন। তিনি নানাবিধ প্রমাণ-প্রয়োগের ভিত্তিতে আলোচ্য অনুবাদ যে চৈতন্যদাসেরই কৃত বালবোধনীর বঙ্গানুবাদ এবং চৈতন্যদাস বা পুজারী গোস্বামী যে বিষ্ণুপুর অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন তা নির্দেশ করেছেন।[৩৪] বিষ্ণুপুর মহকুমার অন্তর্গত সোনামুখী থেকে গোবিন্দ পুজক পুজারী গোস্বামী বা চৈতন্যদাসের টীকার আবিষ্কার এবং বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদের প্রচুর গীতগোবিন্দ গ্রন্থের টীকারূপে "বালবোধনীর" ব্যবহার বিশেষ করে বিষ্ণুপুর

৩৪ শ্রীগীতগোবিন্দ ঃ ডঃ রবীন্দ্রনাথ সামন্ত ঃ পুস্তক বিপণি ঃ ১৯৯৪ দ্রষ্টব্য

সাহিত্যপরিষদের পুঁথি-সংগ্রহে বালবোধনীর অনুসরণে রচিত বঙ্গানুবাদ থেকে চৈতন্যদাসের (বা পুজারী গোস্বামীর) সঙ্গে এ অঞ্চলের নিবিড় সম্পর্ক ছিল এমন মনে করা অসঙ্গত বা ভিত্তিহীন নয়। গোস্বামী-সিদ্ধান্তের আলোকেই চৈতন্যদাস বালবোধনীর বঙ্গানুবাদ করেছেন বলেই মনে হয়। তিনি স্পষ্টই লিখেছেন ঃ যেখানে যে অর্থ ইথে থাকে ব্যতিক্রম / বৈষ্ণব গোসাঞি তাহা করিবে সোধন॥ একথা সর্বজন বিদিত যে শ্রীনিবাসের প্রযত্নে বিষ্ণুপুর তদানীন্তন বঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের গোস্বামীসিদ্ধান্তের এক অদ্বিতীয় কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদের পুঁথি সংগ্রহে "পুজারী" উপাধিধারী আর এক বৈষ্ণব কবির "ভক্তমাল" গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ রয়েছে। ইনি তিনখণ্ডে এই বিপুল গ্রন্থের অনুবাদ সম্পাদন করেছেন। ইনি হলেন মোহন পুজারী। ইনি যে বিষ্ণুপুরের বাসিন্দা ছিলেন এবং তিন প্রভুর (বৈষ্ণব আচার্য?) দর্শনের জন্য বৃন্দাবনে এসেছিলেন সেকথা গ্রন্থে স্পষ্ট করেই লিখেছেন।[৩৫] বিষ্ণুপুরের গোস্বামী পাড়ায় শ্রীনিবাস আচার্যের সাধনপীঠ এবং তাঁর কন্যা হেমলতার প্রাণের ঠাকুর শ্রীশ্রীরাধারমণজীউ বিগ্রহের মন্দিরের কাছাকাছি প্রখ্যাত পুজারী পরিবারের বাস। এঁরা এখনও কলিকাতা বাগবাজারে অধিষ্ঠিত বিষ্ণুপুরের অধিবাসীদের প্রাণপ্রিয় দেবতা শ্রীশ্রীমদনমোহনজীউ এর পুজারী। পুজারী গোস্বামী, মোহন পুজারী এবং বিষ্ণুপুরের পুজারী পরিবারের মধ্যে কোন সম্পর্ক আছে কিনা আমার জানা নেই। না থাকাই সম্ভব। কারণ মোহন পুজারী স্পষ্ট করেই বলেছেন তিনি গোপাল নগরে ছিলেন

---

৩৫ মোহন পুজারী (মোহন দাস) ভক্তমাল গ্রন্থের অনুবাদে আত্মপরিচয়দান কালে লিখেছেন :—

বিষ্ণুপুরে জন্মস্থান মোহন পুজারী নাম
আছিলাম গোপালনগরে
তিন প্রভুর দরশনে আইলাম বৃন্দাবনে
রহিলাম গোপীনাথের ঘরে ॥

অন্যত্র লিখেছেন ঃ পাঁচালী প্রবন্ধে আমি ভক্তিমালার ভাকাখানি
রচিলাম সামর্থানুসারে।

তবে ভবিষ্যৎ গবেষণার কাজে কোন না কোন ভাবে প্রয়োজন হতে পারে, একথা মনে করেই এসব সূত্রগুলি উল্লেখ করলাম। শ্রীনিবাসের সময় থেকেই বিষ্ণুপুর অঞ্চলে শত শত কৃষ্ণমন্দির স্থাপিত হয়েছিল। মন্দিরে মন্দিরে পূজারীও নিযুক্ত হয়েছিলেন অনেক। এখানের শত শত মন্দির-বিগ্রহকে কেন্দ্র করে পূজা-পাঠের জন্য বহু পূজারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের যে সমাবেশ ঘটেছিল এবং এঅঞ্চল বৈষ্ণব শাস্ত্র-সাহিত্যের চর্চা-চিন্তার এক বিশিষ্ট কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল তা এখানের সাহিত্য পরিষদের পুঁথি সংগ্রহ থেকেই বোঝা যায়। শুধু বৈষ্ণবগ্রন্থ নয় রামায়ণ-মহাভারত ও অন্যান্য নানা সংস্কৃত শাস্ত্র সাহিত্যের প্রচুর অনুবাদ এখানে রয়েছে। বিষ্ণুপুরের মল্ল-রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতাতেই যে এগুলি সম্পাদিত হয়েছে তাও স্পষ্ট করে লেখা হয়েছে। এসব গ্রন্থের কোথাও মল্লরাজাদের নাম কোথাও বা মল্লশকের উল্লেখ রয়েছে। শ্রীনিবাস বা বীরহাম্বীরের কাল থেকে গোপাল সিংহ-চৈতন্য সিংহের কাল পর্যন্ত এ চর্চা অব্যাহত ছিল। [৩৬] বঙ্গের বিদগ্ধ বৈষ্ণব সমাজ এই চর্চা কেন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হয়েছেন স্বচ্ছন্দে এমন মনে করা যায়, বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদের পুঁথি সংগ্রহের নজিরে। "গোস্বামীসিদ্ধান্তের" আলোকে বৈষ্ণব কবি যদুনন্দনের অনূদিত লীলাশুকের "শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের" একাধিক কপি এখানে রয়েছে। যদুনন্দন শ্রীনিবাসের কন্যা হেমলতার শিষ্য ছিলেন।

---

৩৬ রামায়ণ রচয়িতা দ্বিজ সীতাসুত বাল্মিকী অনুসরণে রচনা করেছেন রামায়ণ। তিনি গোপাল সিংহ এবং চৈতন্য সিংহ উভয়ের কল্যাণ কামনা করেছেন তাঁর গ্রন্থে ঃ—

বাল্মিকী আদেশে দ্বিজ সীতাসুত গায়।
মহারাজ গোপাল সিংহ নাথের জয় জয়।

আবার দ্বিজ সীতা সুত কহে বাল্মিকী পুরাণ।
মহারাজ চৈতন্য সিংহের জয় কররাম ।।

....

দুর্জন সিংহের রাজত্বকালে শ্রীরামচরণ চক্রবর্তী জৈমিনির অনুসরণে মহাভারতের অশ্বমেধপর্ব রচনা করেন। কবি ভণিতায় লিখেছেন ঃ

শ্রীযুক্ত দুর্জন সিংহ নামে নৃপবর।
শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দে উন্মত্ত ভ্রমর ।।

কৃষ্ণকর্ণামৃত গ্রন্থের টীকানুবাদছাড়াও যদুনন্দনকৃত একাধিক ভক্তিগ্রন্থ বা গোস্বামী গ্রন্থের অনুবাদ বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদের সংগ্রহে রয়েছে। গোপাল সিংহের রাজত্বকালে রাঘব রচিত "শ্রীকৃষ্ণপ্রকাশ রতনের" বাংলা অনুবাদ করেন এখানেরই এক কবি বিষ্ণুপুর নিবাসী উত্তম দাস। তিনি তাঁর গ্রন্থে গোপাল সিংহের প্রশস্তি করেছেন।[৩৭] মল্লরাজাদের উৎসাহ আর পৃষ্ঠপোষকতায় এমনি ভূরি ভূরি অনুবাদ গ্রন্থ রচিত হয়েছে দেখা যায়। এইসব অনুবাদ গ্রন্থের উপস্থিতি এ অঞ্চলের বিশিষ্ট চিন্তা-চর্চার যে প্রেক্ষাপট উন্মোচিত করে তাতে সঙ্গত কারণেই মনে হয় গীতগোবিন্দের "বালবোধনী টীকার" বঙ্গানুবাদও এ অঞ্চলেই হয়েছে। "বালবোধনী টীকার" রচনাস্থল বা কবির বাস-স্থান বিষয়ক বিতর্কের অবকাশ এখানে নেই। সে বিতর্কে প্রবেশ করাও আমাদের কাম্য নয়। এখনে শুধু এ অঞ্চলের প্রাচীনতর এক সঙ্গীতধারার উৎস সন্ধানে অগ্রসর হয়ে এ অঞ্চলে গীতগোবিন্দ চর্চার সমৃদ্ধ প্রেক্ষাপটটি খুঁজে বের করারই চেষ্টা করা হয়েছে। আগেই বলা হয়েছে যে, সঙ্গীত সমালোচক দিলীপ মুখোপাধ্যায়ের মতে অষ্টাদশশতকে বাংলায় প্রবর্তিত ধ্রুপদসঙ্গীতের পশ্চাদবর্তী যদি কোন প্রাচীনতর শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ধারার নজির বঙ্গে থেকে থাকে তা হ'ল জয়দেবের গীতগোবিন্দ আর নরোত্তম দাসের ক্লাসিক কীর্তন। এটা আগেই উদ্ধৃত করা হয়েছে। এ দুটির চর্চা-চিন্তা যে যথারীতি বিষ্ণুপুরে হয়েছিল তার আভাস দেওয়া হয়েছে। শুধু সাধারণভাবে চর্চা-চিন্তাই নয়, জয়দেবের গীতগোবিন্দের চিন্তা-চর্চাকে কেন্দ্র করে এ অঞ্চলে যে এক বিশিষ্ট সাঙ্গীতিক আবহও সৃষ্টি হয়েছিল তার ইঙ্গিতও দেওয়া হয়েছে। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কথা বাদ দিলেও এ অঞ্চলে প্রাপ্ত চৈতন্যদাসের সংস্কৃত বালবোধনী" টীকা এবং তার বঙ্গানুবাদ উভয় ক্ষেত্রেই সঙ্গীতের বিশদ আলোচনা রয়েছে। "বালবোধনী"র বাংলা অনুবাদগ্রন্থেও যথারীতি রাগ-রাগিনী

৩৭ ভুবনে বিদিত এই বিষ্ণুপুর গ্রাম
মদনমোহন তাঁহা সদা অবস্থান।
শ্রীল শ্রীগোপাল সিংহ যাঁহা মহারাজা
শীলবন্ত পুণ্যবান অতি মহাতেজা।

আর তাদের উল্লেখ করছেন কবি। এখানেও সেই মালবগৌড়া, গুর্জরী বসন্ত, দেশাগ, রামকিরীরাগ এবং রূপক তাল, যতিতাল ইত্যাদির উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। এই রাগ এবং তাল পর্যায়ের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেরও আংশিক মিল আছে। আসলে রাসলীলার প্রেক্ষাপটে (বিশেষতঃ বাসন্তরাস) মিলন বিরহ এবং আনন্দ-বেদনা ও উদ্দীপনাময় শৃঙ্গার-রসাত্মক-বাতাবরণ সৃষ্টির ক্ষেত্রে এই রাগরাগিনী ছিল অনুকূল। চৈতন্যদাসের 'বালবোধনীর' বঙ্গানুবাদের ক্ষেত্রে যে উপরোক্ত রাগ রাগিনীর অন্ধ অনুকরণ মাত্র করা হয় নাই, সে কথা ডঃ সামন্ত (সদ্যপ্রকাশিত 'বালবোধনী-টীকা' অনুবাদের সম্পাদক ডঃ রবীন্দ্রনাথ সামন্ত) সুস্পষ্ট ভাবেই বলেছেন। চৈতন্যদাস যে জয়দেবের মতই সঙ্গীত পটু ছিলেন সেটা তিনি উদ্ধৃতি সহকারে দৃষ্টান্ত দিয়েই দেখিয়েছেন।[৩৮] এটাও লক্ষ্য করা যায় যে, জয়দেবে ব্যবহৃত রাগপর্যায়ের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের হুবহু মিল নাই। বেশ কিছু সংযোজন-বিযোজন আছে। চৈতন্যদাস কৃত টীকা বা তাঁর নামাঙ্কিত অনুবাদে কিছু পার্থক্য থাকলেও সাদৃশ্যই সমধিক। কারণ 'বালবোধনী' গীতগোবিন্দেরই টীকা বা অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন গীতগোবিন্দের আক্ষরিক এমনকি যথার্থ ভাবানুবাদও নয়। যাই হোক, এসবই এঅঞ্চলে প্রাচীন সঙ্গীত চর্চারই সাক্ষ্য বহন করছে। জয়দেব-চর্চা তথা প্রাচীন প্রবন্ধসঙ্গীতের চর্চা-চিন্তাকে কেন্দ্র করে এঅঞ্চলে যে একটি প্রাচীন সঙ্গীত-আবহ বিদ্যমান ছিল, তা অনুমান করা অতএব অসঙ্গত নয়। এই প্রাচীন সঙ্গীতধারার প্রেক্ষাপটে ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে বৃন্দাবনী হিন্দু ধ্রুপদ সঙ্গীতের ধারা তথা নরোত্তমের ক্লাসিককীর্তন বিকশিত হয়ে এক ভাবভক্তিমূলক সাঙ্গীতিক প্রেক্ষাপট রচনা করেছিল এমনটা মনে করা যেতে পারে। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে শুধু গীতগোবিন্দ নয়, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের

৩৮. আচার্য হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের সম্পাদিত গীতগোবিন্দ গ্রন্থটির সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছি যে বহুক্ষেত্রে চৈতন্যদাস ভিন্ন রাগও তালের নির্দেশ দানকালে অন্ধভাবে জয়দেবের নির্দেশ মানেননি। অনুবাদক-টীকাকার চৈতন্যদাসও যে জয়দেবের মত সঙ্গীতপটু কবি ছিলেন এই ভাবে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। গীতগোবিন্দ।। ডঃ রবীন্দ্র সামন্ত।। পুস্তক বিপণি (পৃঃ ৬২-৬৩) ।।

গোস্বামী-সিদ্ধান্তের একাধিক ভক্তিগ্রন্থেরও অনুবাদ হয়েছিল, বিশিষ্ট এই বৈষ্ণবধর্মের ভক্তিস্রোতকে জনসমাজে সঞ্চারিত করার অভিপ্রায়ে। রূপগোস্বামীর 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' অবলম্বনে বাঙ্গলা ভাষায় একাধিক গ্রন্থ এসময় রচিত হয়েছে।[৩৯] এই ভাবভক্তির ধারাটি বিষ্ণুপুরের পরবর্তী কালের সাঙ্গীতিক-আবহকেও প্রভাবিত করেছে। জনসমাজে ভক্তিস্রোতকে সঞ্চারিত করার মানসে অন্যান্য বৈষ্ণবীয় ক্লাসিক-শাস্ত্র সাহিত্যের মত ধ্রুপদ গানেরও ভাষা-রূপান্তর ঘটেছে। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগেই রামশঙ্করের রচিত যে সুসমৃদ্ধ বাংলা ধ্রুপদ লক্ষ্য করা যায় তার অনবদ্য আবেদন রবীন্দ্রনাথকেও প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছে। রবীন্দ্র সঙ্গীতের অন্যতম প্রসিদ্ধ স্বরলিপিকার সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করতেন বিষ্ণুপুরের রামশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা ধ্রুপদের জনক। তিনি বলতেন কবিগুরু তাঁর প্রথমের দিকে রামশঙ্করের একাধিক গানের অনুসরণে সঙ্গীত রচনা করেছেন। টপ্পা-কথকতার ধারার মধ্যেও বিষ্ণুপুরী ধ্রুপদের বিচিত্র-বিকাশটি

---

৩৯. রসময় দাস ভক্তিরসামৃতসিন্ধু অনুসরণে শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লী রচনা করেছেন। ইনি জয়দেবের গীতগোবিন্দেরও অন্যতম বঙ্গানুবাদক। ''বিশ্বভারতী'' প্রকাশিত সাহিত্যপ্রকাশিকা দ্বিতীয়খণ্ড প্রকাশিত 'শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লীর' সম্পাদক শ্রীদুর্গেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রসময়দাসকে সপ্তদশ শতকের কবি বলে চিহ্নিত করেছেন। এঁকে শ্রীনিবাসের শিষ্য বলেও মনে করা হয়েছে। 'রসময় দাস ব্যতীত আরও কয়েকজন কবি ভক্তিরসামৃত সিন্ধু অবলম্বনে গ্রন্থ রচনা করেছেন। এঁদের মধ্যে নন্দকিশোর দাসের 'রসপুষ্পকলিকা' প্রাচীনতম। ভক্তিরসামৃত সিন্ধু নামে একটি বাঙ্গালা নিবন্ধগ্রন্থ পাওয়া গেছে। কিন্তু এর আকর সংস্কৃত ভক্তিরসামৃতসিন্ধু নয়—ভক্তিরত্নাকর ও উজ্জ্বলনীলমণি। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দু নামে একখানি অনূদিত নিবন্ধগ্রন্থ পাওয়া যায় কৃষ্ণদাসের ভণিতায়। এসিয়াটিক সোসাইটিতে রক্ষিত ২৭৮৯ সংখ্যক পুঁথিখানি 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' নামে একখানি বাঙ্গালায় অনুবাদগ্রন্থ। (সাহিত্যপ্রকাশিকা, দ্বিতীয়খণ্ড বিশ্বভারতী দ্রষ্টব্য ১৩৬৩ ইং ডিসেম্বর ১৯৫৬) বলাবাহুল্য 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দুর' কপি বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদের পুঁথি সংগ্রহে আছে। (পুঁথির নং ৫৫৪)

সুস্পষ্ট। বিষ্ণুপুরের ধ্রুপদ বা শাস্ত্রীয়-সঙ্গীত-চর্চা একটি বিশিষ্ট রূপলাভ করে বিবর্তিত হয়েছিল এবং বাংলাভাষাকে অবলম্বন করে অজস্রধারায় প্রবাহিত হয়েছিল। এই বাংলা-ধ্রুপদের উৎসরূপে ভাবভক্তি-আপ্লুত ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের বৈষ্ণবীয়প্রেক্ষাপটকে ধরা যেতে পারে। বিষ্ণুপুর-ঘরাণার অন্যতম প্রখ্যাত গুণী সঙ্গীতাচার্য সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—তাঁদের বাড়ীতে পুরুষানুক্রমে টোল চলত, যেখানে শ্রীমদ্ভাগবতপাঠ, সংস্কৃত শিক্ষা, এবং ধ্রুপদ গানের রীতিমত প্রশিক্ষণ দেওয়া হ'ত। তাঁর পিতা-পিতামহ-প্রপিতামহ সকলেই অদ্বিতীয় ভাগবত-পাঠক এবং প্রতিভাবান ধ্রুপদ গায়ক ছিলেন। সত্যকিঙ্করবাবুর বিবরণ পর্যালোচনা করলে মনে হয়, শ্রীমদ্ভাগবতের ভক্তিভাব জনচিত্তে সঞ্চারের বাহনরূপেই তাঁরা বাংলা ধ্রুপদকে ব্যবহার করতেন। সত্যকিঙ্করবাবু তাঁর প্রপিতামহ ঈশ্বরবন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের পরিচয়দান প্রসঙ্গে বলেছেন 'ইনি বন্দনাগীতি, সংস্কৃত-স্তোত্রগান এবং ভাবসমৃদ্ধ বাংলা গানে তান বিস্তার করে লোককে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতেন। সত্যকিঙ্করবাবু তাঁর পিতামহের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন "শিক্ষার বয়সের সময় পিতামহের কণ্ঠে অদ্ভূত দ্রুত তান শুনে আশ্চর্য হতাম। তান যে এত দ্রুত হতে পারে তা তখন ধারণায় ছিলনা। ইনিও তাঁর পিতার মত ভাগবত পাঠে অদ্বিতীয় ছিলেন।" সত্যকিঙ্করবাবুর বাবাও ছিলেন সংস্কৃতে পণ্ডিত, শ্রীমদ্ভাগবত পাঠক এবং সঙ্গীতে বিশেষ অধিকারী। তাঁর (সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের) কাকা অম্বিকাচরণ কাব্যতীর্থ ছিলেন যোগসাধক এবং শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে অপূর্ব গায়কীর অধিকারী। "ইনি আলাপ, ধ্রুপদ ছাড়াও রাগবিস্তার ও সাবলীল তানের বৈচিত্র্যক্রিয়ার দ্বারা হিন্দী ও বাংলা খেয়াল এবং ভক্তিমূলক বাংলা গানে সকলের মন মাতিয়ে দিতেন। ... এঁদের আমল পর্যন্ত আমাদের বাড়ীতে সংস্কৃত, ভাগবত এবং শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিক্ষা দেওয়ার জন্য একটি টোলছিল।" [৪৫] শ্রীমদ্ভাগবত কেন্দ্রিক বাংলা-ধ্রুপদ চর্চার ধারাটি সময়কালের হিসাবে রামশঙ্করের

---

৪৫ রাগ অভিজ্ঞান ।। সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ।। প্রকাশক সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ।। ১৯৬৯ ।। পৃঃ ২৭০—২৭১

সমসাময়িক তো বটেই, সত্যকিংকরবাবুর বিবরণ অনুযায়ী, এর উৎস বা প্রেক্ষাপট প্রাচীনতর হওয়াও অসম্ভব নয়। কথিত আছে, শ্রীনিবাস আচার্য রসকীর্তন আর শ্রীমদ্ভাগবত-পাঠের মাধ্যমে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম প্রচারে ব্রতী হন।[৪১] (বিষ্ণুপুরের মন্দির-টেরাকোটাতেও একাধিক স্থানে গ্রন্থপাঠের চিত্র আছে)। নরোত্তমের ক্লাসিক-কীর্তনের অভীষ্টও ছিল অভিন্ন। বৃন্দাবন-প্রত্যাগত গোস্বামীদের কণ্ঠ-বাহিত ধ্রুপদ গানও অনুরূপভাবে ভাগবত-পাঠকে কেন্দ্র করে বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের এক সহযোগী-প্রয়াস-মাধ্যমরূপে বিষ্ণুপুরে প্রবর্তিত হয় এবং জনচিত্তে ভাবভক্তি সঞ্চারের অভিপ্রায়ে স্বাভাবিকভাবে বিবর্তিত হয়ে জনমুখী রূপান্তর লাভ করেছিল, এমন চিন্তা করা অসঙ্গত নয়। ভাব-ভক্তির রসসিঞ্চনে জনচিত্তের আশা-আকাংখা চরিতার্থ করার মানসে রূপান্তরিত এমনি এক উর্বর-সরস-সাঙ্গীতিক প্রেক্ষাপট থেকেই পরবর্তীকালে ভিন্নতর পরিবেশ-প্রয়োজনে রামশংকরের বাংলা ধ্রুপদের বিকাশ ঘটেছিল বলেই মনে হয়। অনেকে মনে করেন রামশংকর শুধু বাংলাদেশের আদি ধ্রুপদাচার্যই নন, বাংলা-ধ্রুপদ গান রচনারও পথ প্রদর্শক। ··· ········ তিনি প্রস্তুতি-পর্বের সূচনাকালের ধ্রুপদ সঙ্গীতধারাকে উপনীত করেদেন নবজাগৃতির বিকশিত যুগের দ্বারপ্রান্তে।"[৪২] সত্যকিংকর বাবুদের পরিবারে লালিত (সংস্কৃত শিক্ষাসহ) শ্রীমদ্ভাগবত-কেন্দ্রিক ধ্রুপদ বা শাস্ত্রীয় সঙ্গীতচর্চা এমনি এক প্রাচীন সাঙ্গীতিক-ঐতিহ্যেরই উত্তরাধিকার। এই ধারার অনুসরণ

---

৪১ শ্রীনিবাস ছিলেন কীর্তন রসিক এবং কীর্তনের প্রসারের জন্য তাঁহার চেষ্টা ছিল। "দিবানিশি সংকীর্তন রসে মগ্ন হৈলা।" (ভক্তিরত্নাকর ১ম তরঙ্গ) সংক্ষেপে বলা যায় যে, "গোস্বামি গ্রন্থের পঠন-পাঠন ভাগবত পাঠ ও রসকীর্তনের প্রসার দ্বারা শ্রীনিবাস গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রচারে ব্রতী হন।"

চৈতন্যোত্তর যুগে গৌড়ীয় বৈষ্ণব (বাঙলার নবজাগরণ) নন্দগোপাল গোস্বামী।। পৃঃ ৩৫

৪২ ভারতীয় সঙ্গীতে নবজাগৃতি ঃ সংক্ষিপ্ত রূপরেখা ঃ দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায় ঃ অভেদানন্দ স্মারকগ্রন্থ ঃ পৃঃ ২৬৩ ঃ রামকৃষ্ণ বেদান্তমঠ প্রকাশিত—১৯৬৭।

করে একশ বছর আগেও যে প্রচুর ভক্তিমূলক বাংলা রাগসঙ্গীত রচিত হয়েছিল তা সাহিত্য-পরিষদের পুঁথিসংগ্রহ থেকেই জানা যায়।[৪৩] বিষ্ণুপুরের অন্যতম সঙ্গীতগুণী রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর "দ্বিতীয় দিল্লী বিষ্ণুপুর" নামক বিষ্ণুপুরের সঙ্গীত-ইতিহাসে বিষ্ণুপুরের সঙ্গীত সাধকদের জীবনীর সঙ্গে তাঁদের রচিত যে সঙ্গীতগুলির উল্লেখ করেছেন সেগুলির মধ্যেও অনেক বাংলা গান রয়েছে।[৪৪] বিষ্ণুপুরী-ধ্রুপদ সম্পর্কে রমেশচন্দ্রের কিছু উক্তি প্রণিধানযোগ্য। এগুলি পর্যালোচনা করলে এখানের ধ্রুপদ-সঙ্গীতের গতিপ্রকৃতির আভাস মেলে। তিনি বলেছেন সঙ্গীতজ্ঞ হরিদাসস্বামী সন্ন্যাস গ্রহণ করে বঙ্কুবিহারীর সেবায় দিনাতিপাত করতেন। তিনি তাঁর শিষ্যদের নিয়ে বৃন্দাবনের পথে পথে সংকীর্তন করে বেড়াতেন। তাঁর অধিকাংশ গান ছিল রাসলীলা বিষয়ক (বিষ্ণুপুরের শ্যামরায় মন্দির যেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার উদ্দেশেই নিবেদিত)। সেগুলিতে সংস্কৃত ও ব্রজবুলির সমন্বয় দেখা যায়। রমেশবাবুর মতে-'এইভাবে' তিনি (হরিদাসস্বামী) সে যুগে ধ্রুপদকে জনপ্রিয় করে তোলেন। তিনি ধ্রুপদকে জনসমাজে প্রচার করেছিলেন ধর্মকে

---

৪৩. সঙ্গীতাচার্য সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠভ্রাতা রামসত্য বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের পারিবারিক কিছু পুঁথির সংগ্রহ তাঁর পিতামহের (বিখ্যাত কথক) একটি ছবিসহ পরিষৎ শাখাকে দান করেন। এই পুঁথিগুলি থেকে সংগৃহীত কিছু শাস্ত্রীয় রাগাভিত্তিক-বাংলা-গান এখানে দেওয়া গেল। দু-একটি গানে সন তারিখ দেওয়া আছে। মনে হয় গানগুলি কথকতায় ব্যবহার করা হত।

৫০০৪ (৫) রা০ ঝিঁঝিট ।। ভাব মন সেই ভবভাবন সেবক দুখহারি।

(৬) রা০ মুলতান ।। ভাব ভাব ভ্রান্তমন শ্রীরামরঘুনন্দনে।

(৭) রা০ সুরফের্তা ; তালঝাঁপতাল ।। কৃষ্ণকরুণাময় রামহৃষিকেশ/ বৃন্দাবিপিন পূর্ণচন্দ্র মথুরেশ / মাধব মুকুন্দ রাধিকারমণ নটরাজ নটবেশ / তবচরণ কমলমতি-বিহিন রামশঙ্কর সুদিনে করুকৃপালেশ— ।।

(৪নং) রাগ সুরট মল্লার। হে রঘুনন্দন গুণসাগর হে।

(৭নং) রাগ ভিমপলাশি তাল আড়াঠেকা ।। লাগিলো নয়নে মনে বিখেনে নবীন কিশোর সুন্দর / ঐ ঐ সোই জমুনা পুলিনে/আরত গৃহে জাওআ হোলনা /

আশ্রয় করে। ধ্রুপদ উৎসবের অঙ্গরূপে পুনরায় ব্যবহৃত হয়েছিল বাংলাদেশের বিষ্ণুপুরে-বিংশ-শতাব্দীর প্রথমদিকে।.... বিষ্ণুপুরে বৈষ্ণব ধর্মের সম্যক প্রভাবছিল এবং দোল উৎসবে স্থানীয় গায়কগণ দলবদ্ধভাবে মৃদঙ্গ ও তানপুরা সহযোগে বিখ্যাত হোরিগান (ধমার) গেয়ে সমস্ত মন্দিরগুলি প্রদক্ষিণ করতেন।... বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত গীতিকারগণ এই উৎসব উপলক্ষে বাংলায় হোরিগান রচনা করতেন। "রমেশচন্দ্র তাঁর পিতা গোপেশ্বর বাবুর (বন্দ্যোপাধ্যায়) মুখ থেকে শোনা একটি হোরিগানের উল্লেখও করেছেন।[৪০] বিংশ-শতকের এই চিত্র বৈষ্ণব ভাবভক্তির প্রেরণা-প্রসূত বলেই রমেশবাবু মনে করেন। রমেশবাবুর অনুমানকে অনুসরণ করে স্বাভাবিক ভাবে মনে হয় ষোড়শ-সপ্তদশ-শতকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সর্বাধিক প্রভাবের উষ্ণ প্রেক্ষাপটেই এই ট্রাডিশনের সূচনা হয়েছিল। মন্দিরময়-বিষ্ণুপুর; মন্দিরই ছিল, এখানের সর্বপ্রকার সংস্কৃতির বিকাশ কেন্দ্র। জোড়-বাংলা মন্দিরের টেরাকোটায় যেন সঙ্গীতেরই সমারোহ। বৃন্দাবন থেকেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম এবং তার আনুষঙ্গিক সংস্কৃতি-ধারাও বিষ্ণুপুরে প্রবর্তিত হয়, সঙ্গতকারণেই মনে করা যেতে-পারে, যে বৃন্দাবনের সমকালীন সঙ্গীতচর্চার ভাবধারাই বিষ্ণুপুরে প্রবাহিত হয়েছে।

বুঝি রহেনাকুল মুরলি সুনে / চলিতে চরণ-বাধে চরণে।

(২নং) রাগ মুলতান/তাল কাওআলি/এই সময় ভজমন তারা। গেলে এসময় হবে অসময় শেষে হুলে-স্থুলে মুলেতে হইবি দিশাহারা......।

(৩নং) রাও ইমন। তাল কাওআলি / হরিনামে রস রসনা / সুধাময় বিষয়-বিষয় বিষে করোনারে বাসনা/জে নাম করি আশ্রয়, মৃত্যুর্জয় মৃত্যুঞ্জয়, জে নাম করিলে মুখে থাকেনা শমণের ভয়......।

(১৩) রাগ কানাড়া ।। সদা ভাবরে মন নবঘন বরণ / রাধা জীবনধন নন্দ নন্দন (১২৯৯ সাল তারিখ ২৪ শ্রাবণ)

(২২নং) রাগসিন্ধু। তাল আড়ঠেকা। ধ্রুপদ। হে মথুরেশ মুরারে..... ।

৪৪, 'দ্বিতীয় দিল্লী বিষ্ণুপুর' গ্রন্থে উল্লিখিত (বাংলা সহ) কিছু সংখ্যক গান:

১। রামশঙ্কর—প্রণমামি শম্ভু শিব। বাহার

২। রামকেশব—ভীষ্মজননি ভাগীরথি গঙ্গে...

৩। কেশবলাল—কে জানিবে অন্তভব অনন্ত তোমার লীলে।

হরিদাসস্বামীর গান বিংশ-শতকের মধ্যভাগেও গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে। এখনও তাঁর কোন কোন ছাত্রের কণ্ঠে এ গান শোনা যায়। সাঙ্গীতিক-বৈদগ্ধ্য না থাকলেও ভাববিহ্বল নিরলঙ্কার আবেগোচ্ছ্বল এই গানের সঙ্গে বিষ্ণুপুরের গানের সমগোত্রীয়তার আভাস পাওয়া যায়। বিষ্ণুপুরের ওস্তাদদের রচিত গানগুলির অধিকাংশ শাস্ত্রীয়-ভক্তিগীতিরই সমগোত্রীয়। বিষ্ণুপুরের অনেক হিন্দিগানে বাংলা-গানের আবেদন। রামশংকর আর যদুভট্টের একাধিক গানে সংস্কৃত আর ব্রজবুলির অবাধ মিশ্রণ প্রসূত যে ভাবপরিমণ্ডলের আভাস পাওয়া যায় তার সঙ্গে বৈষ্ণব পদাবলীর ভাবসাজুয্য দুর্নিরীক্ষ্য নয়।[৪-৮] রামশঙ্করের প্রণমামি শঙ্কর ..." অথবা যদুভট্টের "আজু বহত সুগন্ধ পবন..." গানে ছন্দ, সর্বোপরি তার আবেদনে বাংলা আদলেরই আভাস। রবীন্দ্রনাথের আজি বহিছে বসন্ত পবন... গানটি শুধুমাত্র অনুকরণ নয় যেন যদুভট্টের গানটিরই স্বাভাবিক পরিণতি। সাজুয্য শুধু রাগ বা সুরে নয় কথায়, বাক্যবন্ধেও। ভাবসর্বস্ব বিষ্ণুপুরী ধ্রুপদের আত্মসমাহিত আবেদনে রবীন্দ্রনাথ তাঁর শাস্ত্রীয় ধর্মসঙ্গীত রচনার যুগে স্বক্ষেত্র খুঁজে পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর উক্তিতে ধ্রুপদ-গানের স্বভাব বৈশিষ্ট্যের যে পরিচয় দিয়েছেন, তাতে তাঁর তদানীন্তন সঙ্গীতমানসের ধাতু প্রকৃতিটিই উদ্ঘাটিত হয়। রবীন্দ্রনাথের সাঙ্গীতিক-কর্মকে এক সময় বিষ্ণুপুরের ওস্তাদরা নানাভাবে সহযোগিতা করেছেন। বিষ্ণুপুরের যদুভট্টের প্রশস্তি করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সঙ্গীত ভাবুকতার' উপরেই জোর দিয়েছেন। বিষ্ণুপুরের রাধিকা প্রসাদ গোস্বামী, গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

৪। যদুনাথ ভট্টচার্য : (যদুভট্ট) 'জয় প্রবল বেগবতি
জয়তি জয় গঙ্গে... । "

৫। অম্বিকা চরণ বন্দ্যোপাধ্যায় — মদনমোহন মনোরঞ্জনকারী (ইমন কল্যাণ)

৬। কার্তিক বন্দ্যোপাধ্যায় — ঐ যায় গো প্রাণ কৃষ্ণধন / ব্রজবাসিগণে নিদয় হয়ে (সিন্ধুবিজয়)

৭। তার গো তারিণি, ভবঘোরে / কে তারে মোরে... (রামপদ বন্দ্যোপাধ্যায়)

৮। দীনবন্ধু গোস্বামী — তুমি অতিমনোহর সকল গুণাকর (রামকেলি)

প্রতি তাঁর আকর্ষণ সর্বজন বিদিত। বিষ্ণুপুরের ওস্তাদদের কেউ কেউ অনেকটা নিজেদের নিয়মেই রবীন্দ্র সঙ্গীত রেকর্ড করেছেন-রবীন্দ্রনাথ আপত্তি করেননি। এর কারণ, দুই সঙ্গীত ধারার ধাতু প্রকৃতিতে এক ভাবগত সাজুয্য আছে। বিষ্ণুপুরী ধ্রুপদ তার এই ধাতুগত বৈশিষ্ট্য টি বৈষ্ণব যুগে ষোড়শ সপ্তদশ শতকে অর্জন করেছে বলেই মনে হয়। যে বৃন্দাবনী ধ্রুপদ নরোত্তমের কীর্তনে এক বিশিষ্ট রূপলাভ করেছে তারই প্রেরণা বা প্রেক্ষাপটে বিষ্ণুপুরের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতচর্চা তার বিশিষ্ট রূপটি লাভ করেছে। হিন্দি ক্লাসিকে সুরই প্রধান-কথার ভূমিকানগণ্য। বিষ্ণুপুরী ধ্রুপদে কথার আবেদন প্রধান। রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের উক্তিতেও এর সমর্থন আছে "(বিষ্ণুপুরের স্বনামধন্য সঙ্গীতজ্ঞগণ গানে কথার আবেদনই উপলব্ধি করেছিলেন-)[৪৭]। বিষ্ণুপুরী ধ্রুপদে কথাই সুরের বাহন। যেমন কীর্তন, কথকতা, টপ্পা ইত্যাদি। বিষ্ণুপুরের সঙ্গীত জগতে টপ্পার প্রাধান্য সমধিক। টপ্পা অনেকাংশে শাস্ত্রীয় কীর্তনের ছায়াবাহী। জনচিত্তের কোন বিশিষ্ট রসতৃষ্ণা চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যেই বিষ্ণুপুরের ধ্রুপদের এই চরিত্র-বৈশিষ্ট্য দেখা দিয়েছে। রামশঙ্করের আমলে বাংলা গানে সেই বৈশিষ্ট্যই মূর্ত হয়েছে। আদি যুগ থেকেই বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতচর্চার ক্ষেত্র রাজদরবার নয়, জনতার আমদরবার। আদিযুগ বলতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কালকেই বলা হচ্ছে। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের পূর্ববর্তী সঙ্গীতচর্চার কোন প্রাচীনতর অধ্যায় ও এঅঞ্চলে থেকে থাকলেও তার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া কঠিন। তবে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্তনের পূর্বেও যে এ অঞ্চলে সঙ্গীতচর্চা ছিল তার আভাস

৯। গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় :মগন যোগ নিত যোগী মহেশ্বর (নটনারায়ণ)।
এতে বাংলা গানেরই আবেদন

১০। রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়— তুমি ভুবন মোহিনী তারা (বাহার)।

৪৭। কে তুমি চলেছ ব্রজে,
অঙ্গে আবীর রাঙ্গায়ে।
শ্রীরাধা গোপিনী সাথে
আকুলা তব আশা পথে
আবীর গুলাল হাতে। ......

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেই আছে। বড়ু চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে যে প্রচুর রাগ এবং তাল ব্যবহার করেছেন তার 'ট্রাডিশন' এঅঞ্চলে অবশ্যই ছিল, এটা মনে করা যেতে পারে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কৃষ্ণকথার একটি লৌকিক ধারাকে কিছুটা সংস্কার ও সম্পাদন করে পরিবেশন করলেও এর চারিত্র-বৈশিষ্ট্য বিলুপ্ত হয় নাই। আদিম লোকাচার, ভয় ও বিশ্বাসের আলো-আঁধারি জগতটির সঙ্গে তন্ত্র-যোগের আভিচারিক বাতাবরণ এবং সর্বোপরি 'রাধাবিরহ' পর্যায়ে শাস্ত্রীয়-বৈষ্ণব ভক্তির প্রলেপ প্রদানের প্রয়াস একত্র মিলিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের পুরা 'মিথ' টিকে এক বিতর্কিত বৈশিষ্ট্য দিয়েছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের উপর অনেকে চর্যাপদ আর শূন্যপুরাণের প্রভাব অনুভব করেছেন। এঁরা মনে করেন লিপিবিচারে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে চতুর্দশ শতকের বলে দাবী করা হলেও, আখ্যায়িকার বিচারে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন প্রাচীনতর। এঁদের মতে বড়ু চণ্ডীদাস ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে আবির্ভূত হয়েছিলেন।[৪৮] এসব বিতর্কে প্রবেশ না করে আমরা বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতচর্চার ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভূমিকাটিই বিচার করব। কারণ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নাটগীত। গীতাভিনয়ের মাধ্যমেই এটি সাধারণ্যে পরিবেশিত হত। অতএব এতে সঙ্গীতের মুখ্য ভূমিকা। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে শাস্ত্রীয় রাগ ও তালের উল্লেখ আছে। প্রবন্ধসঙ্গীতের স্মৃতির আভাসও এতে দুর্নিরীক্ষ্য নয়। কিন্তু ঝুমুরের আবেদন এর ধাতুগত। ঝুমুরের অবশ্য একটি শাস্ত্রীয় রূপ আছে যার নাম ঝোম্বড়া। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে শাস্ত্রীয় রাগ-রাগিনীর উল্লেখ থাকলেও

---

৪৬ যদুভট্টের গান : আজু বহত সুগন্ধ পবন সুমন্দ মধুর বসন্ত মেঁ
হর মুকুর পর যূথ মধুপ মদহর নিরত কর রব কুঞ্জমেঁ।
কঁহি কোয়েলিয়া কুহু করহি আমুয়েকে ডার রঙ্গমে
কঁহি বেলি চামেলী গুলাব গেঁদা চম্প রঙ্গ বিরঙ্গমেঁ

বা

রুম ঝুম বরখে আজু বদরুবা
পিয়া বিদেশ মোরি
থরথরাত ছতিয়ন নিশিদিন মন ভাঁবে।

৪৭ ভারতীয় সঙ্গীতের ক্রমবিকাশ ও বিচিত্র রূপ : রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় : অভেদানন্দ স্মারক গ্রন্থ (রামকৃষ্ণ বেদান্তমঠ ১৯৬৭) পৃঃ ২৫৫

ক্ষেত্রস্থলে, অভিনয়ের সময় জনচিত্ত-বিনোদনের প্রয়োজনে বা ত্যাগিদে রাগ-রাগিনীগুলি কতটা বিশুদ্ধভাবে পরিবেশন করা সম্ভব হ'ত তা বলা কঠিন। তবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দর্পণে এ অঞ্চলের সমকালীন সঙ্গীতচর্চা প্রতিফলিত হয়েছে, এমন মনে করা যেতে পারে। কারণ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বিষ্ণুপুর অঞ্চলে (কাঁকিল্যা) প্রাপ্ত অদ্বিতীয় পুঁথি। তা ছাড়া পদের সঙ্গে রাগ-রাগিনীর উল্লেখ যে শুধু প্রথাগতভাবেই করা হয় নাই, পদগুলির ভাবানুষঙ্গের সঙ্গে রাগরূপের সাদৃশ্য মিলিয়েই রাগ নির্ণয় করা হয়েছে, সে কথা আগেই বলা হয়েছে। অতএব বড়ুচণ্ডীদাস সচেতনভাবেই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে রাগ-রাগিনী প্রয়োগ করেছেন, এমনটা মনে করা অসমীচীন নয়।

রাগ-রাগিনীর ক্ষেত্রে শ্রীগীতগোবিন্দ আর শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে প্রচুর মিল আছে। যেভাবেই ব্যাখ্যা করা যাক এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাল-নির্ণয়ের ক্ষেত্রে ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ যে সময়কেই ধার্য করা হোক গীতগোবিন্দের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের একটি সম্পর্ক অস্বীকার করা যায় না। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মূল আখ্যায়িকাটি নিঃসম্পর্ক হলেও এটির, সম্পাদনা কালে বড়ু এই সম্পর্ক স্থাপন করেছেন, এমন মনে করা যেতে পারে। নানাকারণে এটাও অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের স্মার্ত-পৌরাণিক বাতাবরণটিও বহুলাংশে আরোপিত। রাগ-রাগিনীর ক্ষেত্রেও একই অনুমান করা যেতে পারে। অতএব আখ্যায়িকার আদিরূপ যাই হোক সুপণ্ডিত বড়ু এটিকে কোন একটি শিষ্ট-সাহিত্যের আদর্শে সংস্কার করতে চেয়েছেন, এমনটা মনে করা যেতে পারে। সেকথা যাইহোক, জয়দেবের গীতগোবিন্দের সঙ্গীতকে যদি বঙ্গে সঙ্গীতচর্চার এক প্রাচীনস্তর-রূপে চিহ্নিত করা হয়, তবে সেক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভূমিকাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

অনেকে মনে করেন, প্রাচীন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের নিয়ন্ত্রণ শৈথিল্যের সুযোগে দেশী এবং অপভ্রংশের সমকালীন ধারা যখন তার শক্তিশালী প্রভাব বিস্তার করে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের বিবর্তন সূচিত করছিল সেই সময়ের রচনা গীতগোবিন্দ।

৪৮, ভাষার দিক দিয়া, চর্যাপদের ভাষা ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাষার মধ্যে সময়ের ব্যবধান দুই বা আড়াইশত বৎসরের অনধিক এবং শূণ্যপুরাণের ভাষাও

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে, প্রাকৃত-অপভ্রংশের, অনুরূপ একধারার স্মৃতির আভাস বর্তমান। যাইহোক, রাগ-রাগিনী এবং পদসন্নিবেশের ক্ষেত্রে জয়দেবের গীতগোবিন্দ গ্রন্থের সঙ্গে মিলযুক্ত শ্রীকৃষ্ণকীর্তনকে আমরা বিষ্ণুপুর অঞ্চলে সঙ্গীত চর্চার এক প্রাচীন সোপান রূপে গ্রহণ করতে পারি। এখন পর্যন্ত প্রাপ্ত প্রমাণের ভিত্তিতে এটিকে আদিস্তরও বলা যেতে পারে।

সম্ভাব্য দ্বিতীয় পর্যায় হ'ল ষোড়শশতকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের ও সংস্কৃতির প্রেরণায় প্রবর্তিত, বৃন্দাবন থেকে বৈষ্ণব গোস্বামীদের মাধ্যমে আগত ধ্রুপদের ঐশ্বর্যমণ্ডিত ধারা। বৃন্দাবনী ধ্রুপদের ধারা থেকেই উৎসারিত হয়েছে ক্লাসিক কীর্তন, কথকতা ইত্যাদি ধারাগুলি।

এ যুগে জয়দেবচর্চার পুনরুজ্জীবিত ধারাটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের গোস্বামী-সিদ্ধান্তের আলোকে বিষ্ণুপুর অঞ্চলে যে জয়দেব-চর্চা হয়েছিল, চৈতন্যদাসের বালবোধনী টীকা বিশেষ করে তার বঙ্গানুবাদ থেকে তা সুস্পষ্ট হয়। সঙ্গীতাচার্য সত্য-কিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মনে করেন, মল্লভূমে একদা রাগসঙ্গীতের চর্চায় প্রধান স্থান অধিকার করেছিল পদাবলী, স্তোত্র সংস্কৃতে রচিত, কৃষ্ণ-লীলা ইত্যাদি এবং বন্দনাগীতি ও বাংলা ভাষায় নানা ভাবসমৃদ্ধ গান। 'গীতপদ্ধতি'তে এগুলি যে রাগরূপের গঠন-বৈচিত্র্য এবং তানা-লঙ্কারে ভূষিত হয়ে থাকত তার প্রমাণ বিষ্ণুপুরের প্রাচীন বাংলা গীতির গায়কীতে (বিশেষ করে সত্যকিঙ্করবাবুদের বংশের গায়কদের গায়কীতে) পাওয়া যায়।[৪৯]

অষ্টাদশ শতকে মল্লরাজ দ্বিতীয় রঘুনাথের আমলে দিল্লী থেকে আগত বাহাদুর খাঁ প্রবর্তিত বর্তমান ধারা বা তানসেনী ধারার

বড়ুচণ্ডীদাসের ভাষার মধ্যে ব্যবধান শত বৎসরেরও কম বলিয়া মনে হয়। চর্যাপদের ভাষাকে যদি দশম শতাব্দীর শেষার্ধ বা একাদশ শতাব্দীর বাংলা ভাষা বলিয়া ধরা যায়, তবে বড়ুচণ্ডীদাসের ভাষা ত্রয়োদশ শতকের পরবর্তী বলিয়া মনে হয় না। এই সকল কারণে আমাদের ধারণা বড়ুচণ্ডীদাস ত্রয়োদশ শতাব্দীর মাঝা-মাঝি সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। ·· বড়ুচণ্ডীদাস ও দ্বিজচণ্ডীদাসের দেশ ও কাল। ডাঃ কালিপদ বন্দ্যোপাধ্যায় (পাণ্ডুলিপি)

৪৯, রাগ-অভিজ্ঞান—সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৬৯

বিকাশ ঘটে বিষ্ণুপুরে। রাজসভার আনুকূল্যে গুরুশিষ্য পরম্পরায় প্রচলিত বর্তমান প্রণালীবদ্ধ সঙ্গীত ধারাটি এখানে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ষোড়শ শতকের বিষ্ণুপুরে, অর্থাৎ রাজা বীরহাম্বীরের যুগে ভক্তি-রসে সমস্ত বিষ্ণুপুর তথা মল্লভূম যখন প্লাবিত, নিদ্রিত রাজা স্বপ্নাবিষ্ট অবস্থায় যখন বৈষ্ণবপদ আবৃত্তি করছেন—গুরু শ্রীনিবাসের অনুগত রাজার (বীরহাম্বীরের) ভক্তিপ্লুত চিত্ত যখন সম্পূর্ণরূপে কালাচাঁদের পায়ে মজে গেছে, তখন, বৈষ্ণবযুগের প্রথম অধ্যায়ে, সঙ্গীতের স্বাভাবিক স্থান হয়েছে মন্দিরে। দ্বিতীয় রঘুনাথ মল্লরাজ কুলে এক ব্যতিক্রম বিশেষ। তাঁর আগে বা পরের মল্লরাজারা প্রচুর মন্দির নির্মাণ আর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেছেন। এ পথ অনুসরণ করেননি দ্বিতীয় রঘুনাথ। একটি বিতর্কিত ক্ষুদ্রাকৃতি নিঃসঙ্গ মন্দির (বিষ্ণুপুরের কৃষ্ণবাঁধের পূর্বদিকে পাটপুরে অবস্থিত) ছাড়া দ্বিতীয় রঘুনাথের কোন মন্দির নাই। তাঁর সময় মল্লরাজ বংশ সামন্ত গরিমার শীর্ষে উঠে। ভোগ বিলাস, রাজ্যজয়, নৃত্যগীতেই ছিল রঘুনাথের (দ্বিতীয়) আসক্তি। তাঁর সময়ে প্রবর্তিত সঙ্গীত, অতএব দরবারী সঙ্গীত। রাজদরবারেই তার অবস্থান রাজপুজাই তার অভীষ্ট। রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর "সঙ্গীতমঞ্জরী" গ্রন্থে তাঁর পিতা অনন্তলালের সঙ্গীত সংগ্রহ থেকে বাহাদুর খাঁ[৫০]এর নামাঙ্কিত যে গানটি উদ্ধৃত করেছেন, তা থেকেই এ আভাস পাওয়া যায়। দরবারীধারাই ক্রমশঃ গুরুশিষ্য পরম্পরায় প্রবাহিত হয়েছে। এই ধারার অন্যতম গুণী রামশঙ্কর-শিষ্য অনন্তলালেরও একটি রাজ-বন্দনাসূচক গান রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় দিল্লী বিষ্ণুপুর গ্রন্থে উদ্ধৃত হয়েছে।[৫১]

---

৫০ বাহাদুর খাঁ এর নামাঙ্কিত মল্লরাজ-দ্বিতীয় রঘুনাথের বন্দনা-সূচক গান :

সাহানা—চৌতাল

সব গুণ নিধান মহারাজ রঘুনাথ
তুঅ দরবার সায়ত পোহাবে।
অনেক গুণীজন বহু চকসে আয়ে
ঔর সব অযাচক পদ পাবে।
তুঁহি দাতা বীর সবকো কর বেপীর

অনেকে বাহাদুর খাঁ'র বিষ্ণুপুরে আগমন-কাহিনী অনৈতিহাসিক বলে মনে করেন। কিন্তু বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদ আয়োজিত "সঙ্গীতাচার্য গোপেশ্বর স্মৃতি বক্তৃতামালা"র (বিষ্ণুপুর সঙ্গীত-ঘরাণার উপর) চতুর্থ বক্তৃতায় উপযুক্ত প্রমাণ-প্রয়োগসহ এই বাহাদুর-প্রসঙ্গকে ঐতিহাসিক বলে দাবী করেছেন। বিষ্ণুপুরে বর্তমানে প্রচলিত ধ্রুপদ যে 'সেনীঘরাণা' প্রভাবিত এটা সর্বজন বিদিত। কিন্তু অন্যান্যস্থানে প্রচলিত সেনী-ঘরাণার সঙ্গে বিষ্ণুপুরী ধ্রুপদের পার্থক্যও সঙ্গীতাচার্য বীরেন্দ্রকিশোর নির্দেশ করেছেন। তাঁর মতে বিষ্ণুপুর এবং রামপুর উভয় স্থানেই "সেনী ঘরাণা" প্রভাবিত ধ্রুপদ প্রচলিত হলেও বিষ্ণুপুরের সঙ্গে রামপুরের আঙ্গিকগত কিছু পার্থক্য বর্তমান। রামপুরে রংদারী অলঙ্কারযুক্ত তানের প্রয়োগ বেশী। বিষ্ণুপুরে বিশুদ্ধরাগ ও স্বরের দিকেই অধিকতর লক্ষ্য প্রকাশ পায়।[৬২]

আগেই শ্রীমদ্ভাগবতের দৃষ্টান্ত তুলে প্রাচীন হিন্দু-সঙ্গীতের আদর্শের কথা বলা হয়েছে। সেখানেও দেখা যায়, বিশুদ্ধ স্বরালাপ এবং অমিশ্ররাগের ধ্রুপদ গেয়েই গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের চিত্ত বিনোদন করে প্রশংসা অর্জন করতে পেরেছেন। ঐতিহাসিকভাবে বিষ্ণুপুরের সর্বাত্মক সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটেছে ষোড়শ সপ্তদশ শতকে মুখ্যতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে। ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ এই দু'শ বছর ধরে বিষ্ণুপুর গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের বিশিষ্ট কেন্দ্র ছিল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মাধ্যমেই ক্লাসিক সংস্কৃতির এখানে বিকাশ ঘটেছে। একথা আগেই বহুবার বলা হয়েছে। এই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সংস্কৃতি-প্রসূত ভক্তিধর্মের বৈশিষ্ট্য হ'ল গোপীভাব। শ্রীকৃষ্ণের আনন্দের জন্যই গোপীরা নিবেদিতপ্রাণ। মন্দিরের টেরাকোটায় এই

৬০, বিক্রম সে দুরজন সব দূরে যাবে।
তুঅ সম রাজ জগমেঁ নহি দুজো
ইস লিয়ে বাহাদুর নিশিদিন গাবে।।

৬১, অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত গানে রাজস্তুতি :—
সুজন নরেশ গোপাল সিংহদেব" (বাগীশ্বরী)

৬২, বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী বলেছেন 'বলাবাহুল্য বিষ্ণুপুর প্রবাসী

'গোপীভাবের' প্রকাশ সুস্পষ্ট। মন্দিরের প্রায় প্রতিটি 'প্রতিষ্ঠা-ফলকে' উক্ত 'রাধাকৃষ্ণ' মুদে (শ্রীরাধাকৃষ্ণের আনন্দের জন্য) কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ। মোক্ষ নয়, মুক্তি নয়, এমন কি নিজেদের আনন্দও নয় শ্রীকৃষ্ণের আনন্দের জন্যই গোপীরা নিবেদিতপ্রাণা। শরণাগতির এক গভীর ভাব ব্যক্ত ক'রাই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের 'গোপীভাব' সাধনার তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। মন্দির-টেরাকোটায়, নৃত্যগীত-নিবেদনের মাধ্যমে 'কৃষ্ণচিত্ত' বিনোদনের চিত্রগুলিতে গোপীভাবের প্রকাশ ঘটেছে। শ্রীমদ্ভাগবত-কেন্দ্রিক গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম-সংস্কৃতির সর্বত্র এই ভাবেরই প্রত্যক্ষ অনুসরণ। অতএব শ্রীমদ্ভাগবতে আভাসিত গোপীভাবকে অনুসরণ করে বিষ্ণুপুরের মন্দিরে উপাসনার জন্য নিবেদিত ধ্রুপদ, শ্রীমদ্ভাগবত তথা প্রাচীন হিন্দু সঙ্গীতের আদর্শে একটি বিশিষ্ট আধ্যাত্মিক বা সাত্ত্বিক রূপলাভ করেছে, এমন মনে করা অসঙ্গত নয়। এই কারণেই একই 'সেনী ঘরাণার' অন্তর্ভুক্ত হয়েও বিষ্ণুপুরী-ধ্রুপদ তার পূর্বকালের বৈষ্ণব ঐতিহ্যের প্রভাবে উপরোক্ত বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে বলেই মনে হয়। বিষ্ণুপুরের সঙ্গীত ভাণ্ডারে তানসেন তথা 'সেনীঘরাণার' গানের সংখ্যাধিক্য থাকলেও বিষ্ণুপুরের বৈষ্ণবসংস্কৃতির প্রাচীন প্রেক্ষাপটের প্রভাবে এখানের ধ্রুপদ গভীর ভাবসমৃদ্ধ এক বিশিষ্ট রূপ লাভ করেছে একথা মনে করা অযৌক্তিক নয়।

বিষ্ণুপুর, বিশেষভাবে, ধ্রুপদগানের কেন্দ্ররূপেই বঙ্গ তথা ভারতে একদা প্রসিদ্ধি লাভ করেছিল। ধ্রুপদ ভারতের প্রাচীন সঙ্গীত ধারার অনুক্রম বিবর্তন। স্বাভাবিকভাবেই এর ধাতুপ্রকৃতিতে এক গভীর অধ্যাত্ম-আবেদন বর্তমান। এটি শুধু সভাশোভন শ্রুতি-সুখকর গান মাত্র নয়, এর মাধ্যমে ভারতীয় প্রাচীন সংস্কৃতির দার্শনিক রূপটিরও প্রকাশ ঘটে। নৈষ্ঠিক-সাধন-ধর্মী অন্তর্মুখী

বাহাদুর খাঁও রামপুর ঘরাণার বাহাদুর হুসেন খাঁ এক ব্যক্তি নহেন। বাহাদুর খাঁ বাহাদুর হুসেন খাঁর সম্পর্কে জ্যেষ্ঠতাত এবং উভয়ের বয়সের তফাত ও ষাটবছরের বেশী। ইংরাজ কোম্পানীর শাসন বাংলায় প্রতিষ্ঠার সময় বাহাদুর খাঁ বিষ্ণুপুরে ছিলেন। পক্ষান্তরে বাহাদুর হুসেন খাঁ লক্ষ্ণৌর নবাব ওয়াজেদ আলিশাহের দরবারে বাদক ছিলেন।

এক সাত্ত্বিক-চেতনা, প্রাচীন ভারতীয়-সংস্কৃতির অন্যান্য শাখার মতই ধ্রুপদে অভিব্যক্ত। প্রাচীন ধ্রুপদ ভাবগভীরতায় যেমন অতল পরিবেশন-সংযমে তেমনি অটল। সাঙ্গীতিক নিয়ম-শৃঙ্খলের শৃঙ্খলায় তেমনি এক অটুট ঐক্যে প্রণালীবদ্ধ। রাগ-তাল-লয়ের এক অটুট ঐক্য অক্ষুন্ন রেখে সুনির্দিষ্ট কক্ষপথে সমাবর্তনের মাধ্যমে রাগ-রূপকে এবং তার অন্তর্নিহিত ভাবকে প্রকটিত করাই প্রাচীন-ভারতীয়- হিন্দু সঙ্গীত তথা ধ্রুপদের অভীষ্ট। সমস্ত কিছুর মধ্যে কেন্দ্রীয় ভাবটি মুদ্রিত করাই এর প্রধান লক্ষ্য। ভারতীয় সঙ্গীতের রাগরূপ এক একটি ধ্যানরূপকে অবলম্বন করে মূর্ত হয়েছে। কাব্যের অর্থালঙ্কারের মত আপাত অনলঙ্কৃত ভাবটিকে তার স্বভাব-সৌন্দর্যে স্বপ্রকাশ করে তোলাই প্রাচীন ভারতীয় ক্লাসিক সঙ্গীত রীতির বৈশিষ্ট্য। এর স্বভাবধর্ম প্রকাশে বিঘ্ন ঘটাতে পারে বলে শব্দালঙ্কারের মত বহিরঙ্গ অলঙ্কার-বাহুল্য এ সঙ্গীতে বর্জিত হয়েছে। শুধু ক্লাসিক সঙ্গীতই নয়, ক্লাসিক-চিত্র-ভাস্কর্যও এমনি অলঙ্কার-বাহুল্য বর্জিত। স্বমহিমা প্রকাশের মধ্যেই সমস্ত ক্লাসিক-শিল্প চরিতার্থতা লাভ করে। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির সর্বত্র তার সাধনার ইতিহাস নিহিত আছে।

সঙ্গীতের ক্ষেত্রেও 'সুরে ধ্যানে ও ছবিতে—এই ত্রিমূর্তিতে ভারতের গুহ্যতম সৃষ্টিতত্ত্ব নাদব্রহ্ম অপরূপ রূপে আত্মপ্রকাশ করেছে'। গভীর অধ্যাত্ম-আকুতির এক অতলান্ত আবেদন স্ফূর্তি-লাভ করেছে প্রাচীন ভারতীয় প্রবন্ধ-সঙ্গীত আর ধ্রুপদ সঙ্গীতে।

শ্রীমদ্ভাগবতে নিবেদিত গোপীদের ধ্রুপদে কিংবা নরোত্তমের ক্লাসিক-কীর্তনে ভগবদ্ভক্তির এক গভীর আবেদন প্রকাশিত হয়েছে।

বাহাদুর হুসেনের দৌহিত্র ছিলেন বীণকার উজির খাঁ। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে যৌবনকালে ৭।৮ বৎসর তিনি কলকাতায় অবস্থান করেন। 'কলিকাতার ডায়েরী' নামক তাঁর দিনপঞ্জিকার পাণ্ডুলিপিতে তিনি লিখিয়াছেন যে শতবৎ-সরের অধিকপূর্বে তাঁহার নিকট সম্পর্কিত প্রমাতামহ বাহাদুর খাঁ বিষ্ণুপুর রাজার দরবারে আসিয়া দীর্ঘকাল ছিলেন। তাঁহার হাঁপানি রোগ ছিল। তাই শেষ জীবনে মক্কায় চলিয়া যান। সেখানে তাঁহার মৃত্যু হয়।

......বিষ্ণুপুর ও রামপুর ঘরাণার রাগগত পার্থক্য খুবই কম ; কারণ উভয়

জয়দেবের শৃঙ্গার রসাত্মক ভক্তির গভীর ভাবটিও প্রবন্ধ সঙ্গীতকে অবলম্বন করেই বিকশিত হয়েছে। বিষ্ণুপুরেও ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে বৈষ্ণবধর্ম-সংস্কৃতির সফল বিকাশের ক্ষেত্রে ধ্রুপদ এক গুরুত্ব-পূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, এটা মনে করা অসমীচীন নয়। বিষ্ণু-পুরী ধ্রুপদের চরিত্র বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ করে বিশিষ্ট সঙ্গীততত্ত্ব বিদ্‌রা এই সিদ্ধান্তেই উপনীত হয়েছেন। চরিত্র-মহিমায়, অধ্যাত্ম-আবেদন সুপ্রকট করার ক্ষেত্রে ধ্রুপদ অপরিহার্য।

রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন-বিষ্ণুপুরে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাব থাকায় দেশবাসীর মন মহাজন-পদাবলীর ভাবরসে সিঞ্চিত ছিল। সেজন্য ধ্রুপদ যার মধ্যে কাব্যের বিশেষ স্থান আছে, সে গানের প্রধানত সেখানে অনুশীলন হয়।[৫৩] বিষ্ণুপুরের মন্দির-টেরাকোটায় ভারতীয় সঙ্গীতের প্রাচীন এবং মধ্যযুগের বিবর্তনটি নানাভাবে চিত্রিত হয়েছে। বীণাধর গন্ধর্বদের বিহঙ্গাকৃতি চিত্রে যেমন মার্গ বা গান্ধর্ব সঙ্গীতের উৎপত্তির ইঙ্গিত রয়েছে,[৫৪] তেমনি বিভিন্ন বীণা, সারেঙ্গী, রবাব, মৃদঙ্গ বেণু ব্যবহারের মাধ্যমে প্রাচীন ও মধ্যযুগের সাঙ্গীতিক প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছে মন্দিরে মন্দিরে। দু-একটি নয় এমন চিত্র শত শত। জোড়বাংলার ত্রিখিলান প্রবেশদ্বার দিয়ে দক্ষিণের দালানে এলে চোখে পড়ে 'গোপী' বা 'দেবদাসীর' নৃত্য-চিত্র। এসব চিত্র থেকে শাস্ত্রীয় কোন রীতি আবিষ্কার করা সাধারণ দর্শকের পক্ষে (নৃত্যতত্ত্ব বিশারদ দর্শক কিছুটা হদিশ পাবেন বলে মনে হয়) সম্ভব না হলেও মনে হয় শ্রীগীতগোবিন্দমের নৃত্যকেই চিত্রার্পিত করা হয়েছে। শ্রীগীতগোবিন্দমের জয়দেব বর্ণিত এবং টীকাকার চৈতন্য-দাস বিশ্লেষিত 'গোপী' নৃত্যই যেন এখানে রূপ পেয়েছে।

ঘর সেনীগণের সঙ্গীতের দ্বারা প্রভাবান্বিত। কিন্তু রামপুরে রংহরি বা রংদারী অলংকার যুক্ত তানের প্রয়োগ বেশী; বিষ্ণুপুরে বিশুদ্ধ রাগ ও স্বরের দিকেই অধিকতর লক্ষ প্রকাশ পায়।"

(.... "সঙ্গীতাচার্য গোপেশ্বর স্মৃতি বক্তৃতামালা" (৪র্থ বক্তৃতা) বীরেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী।)

৫৩. ভারতীয় সঙ্গীতের ক্রমবিকাশ ও বিচিত্ররূপ। রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অভেদানন্দ-স্মারকগ্রন্থ।

গর্ভগৃহে প্রবেশের মুখেই দেখা যায় এই রকম শত শত নৃত্য চিত্র। বেণুবাদনরত শ্রীকৃষ্ণের পাশে উপবিষ্ট এক গোপী মুরলী-রবের সঙ্গে মিলিয়ে তাঁর বীণাতে সুনিপুণ অঙ্গুলিসঞ্চালনে যথারীতি সুর বেঁধে নিচ্ছেন। এই সুরের সঙ্গে তাল রেখেই যেন শত শত গোপী নেচে চলেছেন। করতালি দিয়ে নাচছেন কোন কোন গোপী; সুর-তাল আর বলয়ধ্বনির নিশ্ছিদ্র সাদৃশ্যের ইঙ্গিত রয়েছে যেন গোপীর সুরবাঁধার চিত্রে (একটি বড়মাপের টেরাকোটায়)। জোড়াবাংলা মন্দিরের দক্ষিণদালান জুড়ে নৃত্য গীতের বিপুল সমারোহ। শ্রীমদ্ভাগবত আর শ্রীগীতগোবিন্দের নিখুঁত চিত্ররূপ যেন। এই দালানেরই একটি খিলানে উৎকীর্ণ রয়েছে বীণাধর-গন্ধর্বদের চিত্রগুলি। নানা-ইঙ্গিত-ব্যঞ্জনা সহযোগে এখানে মন্দির টেরাকোটায় রচিত হয়েছে সঙ্গীতের একটি পরিচ্ছেদ। আর এই সঙ্গীতের জাতি নির্ণয়ের জন্যই কি গন্ধর্ব চিত্রগুলির সন্নিবেশ?[৫৫] নৃত্যগীতের অগণিত চিত্রে শ্রীমদ্ভাগবত আর শ্রীগীতগোবিন্দ কেন্দ্রিক গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের কলা-কেন্দ্রিক মার্গটিই মুখ্যতঃ উদ্ভাসিত হয়েছে।

নৃত্য-গীত, চিত্র-ভাস্কর্যের মাধ্যমে বৈষ্ণবধর্মের প্রচার গুপ্ত-যুগের ভাগবদ্ধর্মীদের সময় থেকেই দেখা যায়। টেরাকোটায় কীর্তন, কথকতা, নৃত্যগীতের সমারোহ গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সাধন মার্গটিই উন্মোচিত করেছে। স্মরণ করা যেতে পারে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের অন্যতম প্রবক্তা রায় রামানন্দ উড়িষ্যার দেবদাসীদের নৃত্য-প্রশিক্ষক ছিলেন। বিষ্ণুপুরের মন্দির-টেরাকোটায় বিকশিত নৃত্যগীতের চিত্র-গুলিতে যে ভাবে শ্রীগীতগোবিন্দ বা চৈতন্যদাসের সাঙ্গীতিক ইঙ্গিত রূপায়িত হয়েছে তাতে এটা মনে করা অসঙ্গত নয় যে মন্দিরে দেবার্চনার ক্ষেত্রে প্রাচীন আদর্শের অনুসরণে ক্লাসিক নৃত্যগীতের ব্যবস্থা অবশ্যই ছিল।

আজ অধিকাংশ মন্দির শূণ্য। যেখানে দেবতা আছেন সেখানেও

৫৫, ভারতের প্রাচীন সঙ্গীত শাস্ত্রগুলি মনে করে, গান্ধর্বগানের উৎপত্তি বীণা ও বংশ থেকে (অস্য যোনির্ভবেদ্ গানং বীণাবংশস্তথৈবচ। নাট্য শাস্ত্র)

সাড়ম্বর পুজোর ব্যবস্থা নাই। কিন্তু শতবর্ষ পূর্বে এখানের মানুষের মানসাকাশে অথবা রসতৃষ্ণায় যে পূর্বযুগের প্রভাব ছিল তা তখনকার রচিত পদাবলী, গান ইত্যাদির নজিরেই বোঝা যায়। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের সেই বৈষ্ণবভাবুকতার প্রেক্ষাপটে বিকশিত ধ্রুপদ স্বাভাবিক নিয়মেই প্রণালীবদ্ধ হয় নাই, কিন্তু তার প্রবল সাংস্কৃতিক প্রভাব পরবর্তীকালের অন্যান্য সব সাংস্কৃতিক-কীর্তির মত বিষ্ণুপুরের প্রণালীবদ্ধ ধ্রুপদ সঙ্গীতকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। কথকতা-কীর্তন-টপ্পার সহযোগী ধারা গুলি নৈষ্ঠিকভাবে ধ্রুপদ বা ধ্রুপদাঙ্গের সঙ্গীত পরিবেশনের মাধ্যমে বিষ্ণুপুরের মানুষের রসতৃষ্ণা চরিতার্থ করেছে।

বিষ্ণুপুরী ধ্রুপদের অনলংকৃত ভাবপ্রধান রূপটিই তার বৈশিষ্ট্যের চাবিকাঠি। এটি একদিকে যেমন এর প্রাচীন সূত্রটি উদ্ঘাটিত করে, অন্যদিকে তেমনি এর ভাবভক্তিমূলক চারিত্র-বৈশিষ্ট্যের উৎসমুখটিও অঙ্গুলি নির্দেশে দেখিয়ে দেয়। অনেকে তাই এই ধ্রুপদে কারুকর্মের সচেতন চমৎকারিত্বের পরিবর্তে মন্ত্রধ্বনির প্রতিধ্বনি শুনেছেন। ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর শোনা রাজস্থানের একলিঙ্গজীর মন্দিরে আরতির সময় গীত ধ্রুপদ সঙ্গীতের সঙ্গে বিষ্ণুপুরী ধ্রপদের চারিত্র-সাজুয্যের উল্লেখ করেছেন "গোপেশ্বর স্মৃতি বক্তৃতামালার" দ্বিতীয় বক্তৃতায়।

বিশুদ্ধ সুর আর রাগসংরক্ষণের সযত্ন-প্রয়াসের মাধ্যমে বিষ্ণুপুরের ওস্তাদরা প্রাচীন ধ্রুপদের ধারাটিকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। তাই অনেক সঙ্গীতসমালোচক বিষ্ণুপুরী-ধ্রুপদে প্রাচীনতার সঙ্গে রক্ষণশীলতারও আভাস পেয়েছেন। [৫৬]

---

56. The simple and orthodox style or in otherwords the unsophisticated way of presentation also corroborates the fact that Vishnupur School can rightfully claim a tradition of antiquity be it from the line of Tansen or any other source.
Rajyeswar Mitra : VISHNUPUR GHARANA
BANKURA DISTRICT GAZETTEER : 1968 Page 484

ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে বিষ্ণুপুরে বৃন্দাবন থেকে আগত সঙ্গীত ধারা এখানের প্রাচীন (প্রবন্ধ-সঙ্গীত) সঙ্গীতচর্চার প্রেক্ষাপটে গভীরতর আবেদনসমৃদ্ধ হয়েছিল। প্রণালীবদ্ধ না হলেও এই সমৃদ্ধ ঐতিহ্য একটি বিশিষ্ট সাঙ্গীতিক-সংস্কারের মত এখানের কলাকারদের চিত্তভূমিকে পর্যায়ক্রমে রসসিঞ্চিত করে অন্তঃসলিলা ফল্গুর মত আজও বয়ে চলেছে।

সঙ্গীতাচার্য রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন (স্বামী অভেদানন্দ স্মারকগ্রন্থ) ধ্রুপদের ধর্ম—নিবেদন, খ্যালের ধর্ম - প্রকাশ। ধ্রুপদের নিবেদন-ধর্মিতার মধ্য দিয়ে আত্মনিবেদনের সর্বোৎকৃষ্ট প্রকাশ ঘটে বলেই বোধহয় ভারতের মন্দিরে মন্দিরে ধ্রুপদের অগ্রণী ভূমিকা। মন্দিরময় বিষ্ণুপুরেও বৈষ্ণবসাধনার অন্তর্নিহিত 'শরণাগতির' বিশিষ্ট ভাবটি প্রকাশের জন্যই হয়ত ধ্রুপদকে বিশেষ ভাবে অবলম্বন করা হয়েছিল, এবং বিষ্ণুপুর বিশেষভাবে ধ্রুপদের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল।

তথাকথিত ঘরাণায় বিশেষভাবে কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর মানুষের বিশিষ্ট শিল্পকৃতির বিকাশটি সুস্পষ্টভাবে মুদ্রিত থাকে। বিষ্ণুপুরী সঙ্গীতে এ ধরণের কোন কলাকৃতির সুস্পষ্ট পরিচয় নাই বলে অনেকের অনুযোগ। মনে হয়, অলঙ্কার-বৈচিত্র্য আর উপস্থাপন-চাতুর্যের বা চমৎকারিত্বের উপর এঁরা জোর দেন। বিষ্ণুপুরী ধ্রুপদ যে মন্ডনসমৃদ্ধ নয় সেকথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এখানেই বিষ্ণুপুরী রীতির বৈশিষ্ট্য।

গোপেশ্বরবাবুর সঙ্গীত-পরিবেশনকে কেন্দ্র করে রবীন্দ্রনাথ একদা যে বিতর্কে প্রবেশ করেছিলেন তাতে তিনি স্পষ্টই রীতি-বৈচিত্র্যের কথাই বলেছেন। এই সূত্রে অলঙ্কার-আড়ম্বরহীন গায়কী রীতিই বিষ্ণুপুরী 'ঘরাণা' বা 'রীতির' বৈশিষ্ট্য সে ইঙ্গিতও তিনি করেছেন। [৫৭]

৫৭. আর একটা বিষয় নিয়ে তর্ক হচ্ছে গোপেশ্বর বাবুর গানের স্টাইলটা 'বিষ্ণুপুরী' বলে কেউ কেউ তাঁর ওস্তাদীতে কলঙ্ক আরোপ করে থাকেন। সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রে দেখা যায় যে, প্রদেশভেদে সাহিত্যের স্বাভাবিক রীতিভেদ স্বীকার করা হয়েছে। 'বৈদর্ভরীতি', 'গৌড়ীয়রীতি' প্রভৃতি রীতির বিশিষ্টতা তিরস্কৃত হয়নি। ভারতীয় স্থাপত্যে দেখা যায় দক্ষিণ

পণ্ডিত শ্রীকৃষ্ণ রতনজনকার (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, বিষ্ণুপুর শাখা আয়োজিত গোপেশ্বর-স্মৃতি-বক্তৃতা মালার পঞ্চম বক্তৃতা) সঙ্গীতাচার্য গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধ্রুপদকে 'ঐতিহাসিক' বলে অভিহিত করেছেন। তাঁর গায়কীর প্রশংসা করে তিনি বলেছেন-গোপেশ্বরবাবু তাঁর বিলম্বিতলয়ের ধ্রুপদে শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করতে পারতেন। তাঁর সঙ্গীত পরিবেশনের আদি-মধ্য-অন্ত ছিল একই রকম শ্রুতিসুখকর এবং অপূর্ব। [৫৮]

রবীন্দ্রনাথের উপর বিষ্ণুপুরী ধ্রুপদের প্রভাবের কথা আগেই বলা হয়েছে। এ ঘরাণার স্বরূপ তাঁর অনুভূতিতে বা সাঙ্গীতিক চেতনায় সুস্পষ্ট ছিল। তাই তাঁর উপরোক্ত উক্তিতে বিষ্ণুপুরী ধ্রুপদের বৈশিষ্ট্যটি সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে। বিশিষ্ট সঙ্গীত তত্ত্ববিদ্ প্রজ্ঞানানন্দস্বামী রবীন্দ্রনাথের উপর বিষ্ণুপুর ঘরাণার প্রভাবের কথা বলতে গিয়ে বিষ্ণুপুরী ঘরণার কতকগুলি রাগ-রূপের স্বাতন্ত্র্যের কথা বলেছেন। [৫৯] ধ্রুপদের বিভিন্ন রীতির মধ্যে তানসেনের 'গৌরহার' রীতিই যে বিষ্ণুপুরে প্রচলিত ছিল, সে কথা

ভারতীয় স্থাপত্যের সঙ্গে উড়িষ্যার ও উত্তর ভারতের অনেক পার্থক্য। মাদুরার মন্দির রচনায় স্থাপত্য পদে পদে যে তান লাগিয়েছে তার অংশে অংশে অলঙ্কার বৈচিত্র্যর যে অতি বাহুল্য তা কারো কারো ভালো লাগেনা, তাঁর সঙ্গে সেকেন্দ্রার স্থাপত্যে তানবিহীনতা ও অলঙ্কার বিরলতার তুলনা করলে সেকেন্দ্রাকেই কারো কারো রুচিতে ভালো ঠেকে। তবু ভারতীয় স্থাপত্যে দক্ষিণা রীতিকে অস্বীকার করা চলেনা। তেমনি হিন্দুস্থানী গান যদি বাংলা দেশে কোন বিশেষ রীতি অবলম্বন করে থাকে তবে তার স্বাতন্ত্র্য মেনে নিতে হবে। এই রীতির মধ্যেও যে উৎকর্ষের স্থান নেই তা বলা চলেনা। যদুভট্টের প্রতিভার প্রথম ভূমিকা এই বিষ্ণুপুরী রীতিতেই। রাধিকা গোস্বামী সম্বন্ধেও সেই কথা বলা চলে। পশ্চিমদেশী শ্রোতারা যদি এই রীতির গান পছন্দ নাও করে সেটাকেই চরম বিচার বলে মেনে নেওয়া চলেনা।" - রবীন্দ্ররচনাবলী

58 His (Gopeswar Banerji) Dhrupad style is singnlarly historic. He charmed the audience with Dhrupad and bilambita lay. His beginning, interval and finish were mervellous.

Pandit Srikrishna RatanJanKar (Gopeswer smriti-Baktritamala Fifth Lecture).

সঙ্গীতাচার্য বীরেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী (গোপেশ্বর স্মৃতি-বক্তৃতা-মালার চতুর্থ বক্তৃতায়) নির্দ্বিধায় বলেছেন।[৬০] তিনি বলেন 'গৌরহার' রীতির বিষ্ণুপুরে প্রচলনের দ্বারাও বাহাদুর খাঁ এর বিষ্ণুপুরে আগমন এবং এখানে 'সেনী-ঘরানার' প্রবর্তনের দাবীটি দৃঢ়ীকৃত হয়।

বিষ্ণুপুর-ঘরাণার ভূমিকা যতটা না শৈল্পিক তার চেয়ে অনেক বেশী ঐতিহাসিক। বিষ্ণুপুরী ধ্রুপদ বঙ্গে সঙ্গীতচর্চায় এক অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করে ভারতবর্ষের শাস্ত্রীয় সঙ্গীতচর্চার মূল ধারার সঙ্গে বঙ্গের সঙ্গীত-সাধনাকে যুক্ত করে এক ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেছে। রামশঙ্করের বাংলা-ধ্রুপদও এক ঐতিহাসিক কীর্তি। তবে এটা কিছু আকস্মিক ব্যাপার নয়। ষোড়শ-সপ্তদশ শতক থেকে বিষ্ণুপুরে বঙ্গভাষা-সাহিত্যের যে বিপুল এবং নিবিড় চর্চা-চিন্তা চলছিল তার প্রেক্ষাপটে রামশঙ্করের বাংলা ধ্রুপদ আকস্মিক নয়। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে রাজা বীরহাম্বীর থেকে আরম্ভ করে রাজকুমার রাজকর্মচারী সকলেই ছিলেন পদকর্তা। মল্লরাজ-মহিষীরাও বৈষ্ণবীয় চর্চা-চিন্তা থেকে বাদ পড়েননি। মল্লরাজাদের আনুকূল্যে এই দু'শ বছরে প্রচুর সংস্কৃত-শাস্ত্র-সাহিত্যের অনুবাদ হয়েছে। স্বাধীন রচনাও হয়েছে প্রচুর। পূজারী গোস্বামী, মোহন পূজারীর

---

৫৯. বিষ্ণুপুরে যে ভাবেই হিন্দুস্থানী পদ্ধতির অভিজাত গানের প্রচলন হোক না কেন, কতকগুলি রাগের রূপে স্বতন্ত্র বিকাশের ভাব সুস্পষ্ট। রবীন্দ্র-নাথের সঙ্গীত জীবনে যে কোন কারণেই হোক বাংলার বিষ্ণুপুরের প্রভাব পড়েছিল এবং তাঁর স্বাধীন স্বতন্ত্র মন বাংলার রীতিকেই যে বিশেষভাবে গ্রহণ করেছিল, এ কথা বাদানুবাদের মধ্যে না গিয়েও সহজভাবে প্রমাণ করা যায়। —সঙ্গীতে রবীন্দ্র প্রতিভার দান : স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ

৬০, ''একথা অম্লানবদনে বলা যাইতে পারে যে, 'বিষ্ণুপুর ঘরাণার' গায়কগণ 'গৌরহার-রীতির' গান ও গায়কীতে যথেষ্টই প্রসিদ্ধি লাভ করেন। মিঁয়া তানসেনের গানে এই 'গৌরহার-রীতির' শ্রেষ্ঠত্ব রীতিমত বর্ণিত আছে। তিনি স্বয়ং এই রীতির কলাকার ছিলেন।'' —বীরেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী : গোপেশ্বর স্মৃতি বক্তৃতামালা : বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বিষ্ণুপুর শাখা : চতুর্থ বক্তৃতা।

অনুবাদের কথা আগেই বলা হয়েছে। গোবিন্দদাস, যদুনন্দন যথাক্রমে শ্রীনিবাস ও তাঁর কন্যা হেমলতার শিষ্য ছিলেন। তাঁরা এখানের কবি না হ'লেও, গুরুর সাধনপীঠ এবং সমসাময়িককালে বঙ্গের বৈষ্ণব সংস্কৃতির অন্যতম বিখ্যাত কেন্দ্র বিষ্ণুপুরের সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল এটা স্বাভাবিকভাবেই মনে করা যায়। যে অষ্টাদশ শতকের শেষে রামশঙ্কর আবির্ভূত হয়েছিলেন সেই অষ্টাদশ শতকেই আবির্ভূত হয়েছিলেন মল্লভূমের বিখ্যাত কবি কবিচন্দ্র। এঁর রামায়ণ-বিষ্ণুপুরী-রামায়ণ নামে খ্যাত।

কবি দীর্ঘজীবী ছিলেন এবং রামায়ণ-মহাভারত ছাড়াও অন্যান্য বহুগ্রন্থ রচনা করেন। ডাঃ সুকুমার সেন মনে করেন কবিচন্দ্রের রামায়ণের কয়েকটি পরিচ্ছেদ কৃত্তিবাসের রামায়ণে কালক্রমে সংযুক্ত হয়েছে এবং কৃত্তিবাসের নামেই চলছে। অষ্টাদশ শতকে মল্লরাজাদের আনুকূল্যে বেশ কিছু ধর্মমঙ্গল এবং অন্যান্য গ্রন্থও রচিত হয়েছে।[৬১] বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের দু'শ বছরের (ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ) চর্চা-চিন্তার ঋদ্ধ প্রেক্ষাপটে খুব স্বাভাবিকভাবেই আত্মপ্রকাশ করেছে রামশঙ্করের বাংলা ধ্রুপদ।

বঙ্গের সঙ্গীতজগতে এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করে বিংশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বিষ্ণুপুরের সঙ্গীত সাধকরা নিরলসভাবে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের চর্চা করেছেন। শুধু সঙ্গীত পরিবেশনই নয়, সঙ্গীতকে প্রণালীবদ্ধ করে সার্বজনীন চর্চার পথপ্রশস্ত করেছেন। শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের প্রচার প্রসারের জন্য স্বরলিপি উদ্ভাবন এবং গ্রন্থপ্রকাশের মাধ্যমে বিষ্ণুপুরের সঙ্গীত ঘরাণার বিপুল-

---

৬১. দ্বিজ কবিচন্দ্রের রামায়ণের ভণিতায় মল্লরাজা দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহের (যিনি বাহাদুর খাঁ কে দিল্লী থেকে পাঁচশত টাকার বিনিময়ে বিষ্ণুপুরে আনেন বলে কথিত আছে) প্রশস্তি লক্ষ্য করা যায় :—

দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় পানুয়ায় বসতি।
রঘুনাথ সিংহের জয় কর রঘুপতি ॥

নবাসনের দ্বিজ রামচন্দ্র ধর্মমঙ্গলের ভণিতায় গোপাল সিংহের প্রশস্তি করেছেন।

রাজা গোপাল সিংহ কৃষ্ণপদে ভৃঙ্গ
প্রহ্লাদ (প্রসাদ) ভকত সমান।

ভাণ্ডারকে সাধারণ মানুষের কাছে উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। শুধু তাই নয় সর্বসাধারণের শাস্ত্রীয় সঙ্গীত শিক্ষার জন্য বিষ্ণুপুরে প্রায় দুইশত বৎসর পূর্বে রীতিমত এক সঙ্গীত বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। অনেকে মনে করেন সাধারণ মানুষের অবাধ-সঙ্গীত শিক্ষার জন্য এই ধরণের সঙ্গীত বিদ্যালয় ভারতবর্ষের মধ্যে বিষ্ণুপুরেই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। বঙ্গে বিকশিত বিভিন্ন সঙ্গীত-ধারার প্রসারে সহযোগিতা করেও এঁরা ঐতিহাসিক দায়িত্ব এবং কর্তব্য পালন করেন।[৬২] বিষ্ণুপুর ঘরানার যে সমৃদ্ধি আর ব্যাপ্তি রামশংকরের সময়েই লক্ষ্য করা যায়, প্রায় সমসাময়িককালে বা সামান্য কিছু পরবর্তীকালে অনন্তলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সময়ে (অনন্তলালের দুইপুত্র রামপ্রসন্ন এবং গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশিত দুই সঙ্গীত-সংকলন যথাক্রমে 'সঙ্গীতমঞ্জরী' ও 'সঙ্গীতচন্দ্রিকা'য় এই বিপুল সঞ্চয়ের অধিকাংশ স্থান পেয়েছে) এর যে অফুরন্ত সঞ্চয় কিংবদন্তী, যা আজও কুবেরের (বিশিষ্ট সঙ্গীতগুণী সত্যকিংকর বন্দ্যোপাধ্যায় বিষ্ণুপুর ঘরাণার বিশাল ভাণ্ডারকে কুবেরের ভাণ্ডার বলেছেন) ভাণ্ডাররূপে বিশিষ্ট সঙ্গীতগুণীদের দ্বারা অভিহিত হয়, সঙ্গতকারণেই তার ঐতিহ্য সুপ্রাচীন বলেই মনে হয়। অষ্টাদশ শতকে বিষ্ণুপুর ঘরাণার প্রত্যক্ষবিকাশের পশ্চাতে যে এক সুদীর্ঘ এবং সুসমৃদ্ধ ঐতিহ্যের অস্তিত্ব অনুমান করা হয়েছে তা নিঃসন্দেহে গবেষণা সাপেক্ষ।

৬২. বাংলায় মার্গ সঙ্গীতচর্চা ক্ষেত্রে রামশংকরের ঐতিহাসিক ভূমিকা ছাড়াও ঊনবিংশ-বিংশ শতকেও এখানের সঙ্গীত সাধকরা সঙ্গীত-সাধনায় অবিস্মরণীয় স্বাক্ষর রেখেছেন। সঙ্গীতাচার্য ক্ষেত্রমোহন গোস্বামী 'দণ্ড-মাত্রিক-স্বরলিপি'র উদ্ভাবন ছাড়াও একাধিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। তাঁর সুযোগ্য শিষ্য রাজা শৌরীন্দ্র মোহন ঠাকুরের সঙ্গে একযোগে তিনি বঙ্গের সঙ্গীত জগতকে নানাভাবে সমৃদ্ধ করেছেন। শৌরীন্দ্রমোহনের 'যন্ত্রক্ষেত্রদীপিকা' নামক যন্ত্র সঙ্গীতের গ্রন্থে ক্ষেত্রমোহনের প্রতি যে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদিত হয়েছে তাতেই তাঁর অক্ষয় কীর্তির স্বীকৃতি। ক্ষেত্রমোহন নিজেও প্রচুর সঙ্গীত গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এর মধ্যে সঙ্গীতসার (১৮৬৯), গীতগোবিন্দের স্বরলিপি (১৮৭১) কণ্ঠকৌমুদী (১৮৭৫) এবং আশুরঞ্জনীতত্ত্ব উল্লেখ্য। এঁরই সম্পাদনায় বাংলার প্রথম সঙ্গীত পত্রিকা

বিষ্ণুপুর ঘরানার এই ঐতিহ্যমণ্ডিত সুপ্রাচীন প্রেক্ষাপটটি শুধু বিষ্ণুপুর নয়, বঙ্গের সঙ্গীতচর্চার উপর গবেষণাক্ষেত্রেও এক সম্ভাবনাময় সূত্ররূপে গৃহীত হতে পারে। এই উৎস-সন্ধানের ক্ষেত্রে যে সব নির্ভরযোগ্য অবলম্বন আছে, তার অন্যতম হল শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন। শুধু অন্যতম নয়, প্রধান অবলম্বন বলা যেতে পারে। বিষ্ণুপুর ঘরানার প্রাচীনত্ব নির্ণয়ের ক্ষেত্রে তো এর গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন বিশেষভাবে এই অঞ্চলে আবিষ্কৃত অদ্বিতীয় পুঁথি, আর শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন মূলতঃ গানের পুঁথি। এর কবিতাগুলি গীত, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন নাটগীত। এ অঞ্চলে রাগরাগিনী আর তালযুক্ত এমন প্রাচীন প্রামাণ্য গানের পুঁথি এখনও পর্যন্ত অনাবিষ্কৃত। মধ্যযুগীয় বাংলা ভাষায় রচিত প্রবন্ধ সঙ্গীতের লক্ষণযুক্ত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের গানগুলি থেকে বিষ্ণুপুর তথা বঙ্গের সঙ্গীতচর্চার নানা সূত্র আবিষ্কৃত হতে পারে। বঙ্গের সঙ্গীতচর্চার ক্ষেত্রে জয়দেবের গীতগোবিন্দকে আদিস্তর বলা হয়েছে। জয়দেবের গীতগোবিন্দের পূর্ণ প্রভাবযুক্ত এই বাংলা পুঁথিটি সেদিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে জয়দেবের প্রভাব অনস্বীকার্য। বহুপদ জয়দেবের ভাবানুবাদ কতকগুলি আক্ষরিক অনুবাদও বটে। গীতগোবিন্দে ব্যবহৃত বহুরাগ-রাগিনী শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনেও ব্যবহৃত হয়েছে এবং গীতগোবিন্দের মতই গানের ভাবানুষঙ্গের সঙ্গে শাস্ত্রীয় রাগরূপের সাজুয্য রেখেই যে রাগনির্ণয় করা হয়েছে তা বিশ্লেষণ করে আগেই দেখানো হয়েছে।

জয়দেবের গানগুলি সংস্কৃতে লেখা। ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ঃ প্রথমখণ্ড ঃ পূর্বার্ধ) এ সংস্কৃত আসলে প্রাকৃত (অপভ্রংশ, অবহট্ঠ) ভাষার সম্পূর্ণ ছায়াবহ। জয়দেবের গানের ভাষার ভাঙ্গা পদ্ধতির পথ ধরেই মিশ্রভাষা ব্রজবুলি।

"সঙ্গীত সমালোচনী" প্রকাশিত হয়। যদুভট্ট রাধিকাপ্রসাদ, গোপেশ্বরের অবিস্মরণীয় ভূমিকা রবীন্দ্রলেখনীর কল্যাণে সর্বজনবিদিত। রামপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সঙ্গীতমঞ্জরী' এবং গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'সঙ্গীত চন্দ্রিকার' কথা আগেই বলা হয়েছে। বিশিষ্ট সঙ্গীতগুণী সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ও অনেকগুলি সঙ্গীত-গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। এঁরা ছাড়াও বিষ্ণুপুরের অনেকে সঙ্গীতের নানা শাখায় গ্রন্থরচনা করেছেন।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে এই ভাঙ্গারই এক রূপবিবর্তন কি আভাসিত ? প্রাকৃত-অপভ্রংশ মিশ্রিত মধ্যযুগীয় বঙ্গভাষায় রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের গানগুলি এদিক থেকেও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

জয়দেবের গীতগোবিন্দ সংস্কৃতে লেখা প্রবন্ধসঙ্গীত। শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের (বাঙ্গালা) গানগুলিও যে প্রবন্ধসঙ্গীতের লক্ষণাক্রান্ত তার আভাস-এর ভূমিকাতেই বলে দেওয়া হয়েছে।[৬৩]

ডঃ সুকুমার সেন তাঁর বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে (প্রথমখণ্ড পূর্বার্ধ) বলেছেন নবম শতক থেকে জয়দেবের কাল পর্যন্ত শ্রীকৃষ্ণ লীলার একটি লোকধারা শাস্ত্রীয় ধারার পাশাপাশি প্রচলিত ছিল। এই প্রসঙ্গে তিনি গঙ্গাদাসের 'ছন্দোমঞ্জরী' থেকে একটি "কুঞ্জলীলার" পদ এবং অপর এক ছন্দ-গ্রন্থ "প্রাকৃত-পৈঙ্গল" থেকে 'নৌকাবিলাসে'র (অবহটঠ ভাষার) একটি পদ উদ্ধার করেছেন। উপরোক্ত গ্রন্থদুটিতে 'অবহটঠ' বা অপভ্রংশে রচিত পদগুলি 'কৃষ্ণলীলার' লোকধারার পদ বলে তিনি মনে করেন। কারণ সমসাময়িককালে 'অবহটঠ' লোক-ভাষা রূপে প্রচলিত ছিল। গীতগোবিন্দের শাস্ত্রীয়ধারাটির উপরে এই ধারাটির প্রভাবও অনুমান করা হয়েছে, বিশেষ করে জয়দেবের কাব্যের বৈচিত্র্যময় সংস্কৃতকে কেন্দ্র করে।

শ্রীমদ্ভাগবতের কৃষ্ণলীলার পাশাপাশি উপরোক্ত লোকায়ত

প্রচুর রবীন্দ্র সঙ্গীতের স্বরলিপি প্রস্তুত করে সঙ্গীতরত্নাকর সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় রবীন্দ্রসঙ্গীত জগতে এক অবিস্মরণীয় কীর্ত্তি স্থাপন করেছেন। তাঁকে প্রদত্ত এক মানপত্রে সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছেন : "উদার আনন্দে কবি যে গানের ঝরণাধারা বইয়ে দিয়েছিলেন, তার অনেকটাই হারিয়ে যেত যদি কবির পাশে পাশে এমন দুএকজন মানুষ না থাকতেন যাঁরা গানের পরিচয় লিপির টানে বেঁধে না রাখতেন। সুরেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সেই জাতীয় সাধক যাঁরা নীরবে কবির এই মহার্ঘ-দানকে সর্বসাধারণের করে দেবার আপ্রাণ সাধনা করেছেন। আমি আজ টেগোর ইনস্টিটিউটের পক্ষে তাঁকে রবীন্দ্রতত্ত্বাচার্য উপাধিতে ভূষিত করি (সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর সভাপতি। ১৪ই জানুয়ারী ১৯৬৮ সাল কলিকাতা)

৬৩, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কবিতা মাত্রেই গীত ; এবং ঐসকল গীতের সুর ও

ধারাটি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে ধরা পড়েছে বলে মনে হয়। মধ্যযুগের বাংলায় রচিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনেই বোধ হয় এধারাটি একটি গ্রন্থবদ্ধ সুস্পষ্ট এবং সুসম্পাদিত রূপ পেয়েছে। এদিক থেকেও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের গুরুত্ব অসীম।

বিষ্ণুপুরের মন্দির-টেরাকোটাতেও ভাগবতীয় ধারার পাশাপাশি উপরোক্ত লোকধারার অস্তিত্ব সুস্পষ্ট। দানলীলা-নৌকালীলার চিত্রগুলি কৃষ্ণলীলার লোকায়তধারা বাহিত বলেই মনে হয়। শুধু তাই নয়, দানলীলা – নৌকালীলা সম্পর্কে বৈষ্ণব গোস্বামীরাও যে সচেতন ছিলেন তা সনাতনের রচনা থেকেই বুঝা যায়। ''কুঞ্জলীলা'' প্রসঙ্গও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রবক্তাদের হাতে দার্শনিক বা তাত্ত্বিক রূপান্তর লাভ করে 'কুঞ্জসেবা' তত্ত্বে পরিণত হয়েছে-এমনও হতে পারে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন বিষ্ণুপুর অঞ্চল থেকেই আবিষ্কৃত অদ্বিতীয় পুঁথি। মন্দির-টেরাকোটায় বিকশিত এই লোকধারার চিত্রগুলি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন থেকে কিংবা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে বিধৃত এ অঞ্চলে প্রচলিত অনুরূপ কোন লোকধারা থেকে প্রত্যক্ষভাবে, টেরাকোটায় অনুপ্রবেশ করেছে বলেই মনে হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের মাধ্যমেও মন্দির-টেরাকোটায় এধারার আবির্ভাব ঘটতে পারে। সেকথা যাই-হোক, উক্ত-টেরাকোটা গুলির পশ্চাতে লোকসঙ্গীতের কোন অনুষঙ্গ

তাহাদির অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত নির্দেশ দেওয়া আছে। উহাতে ব্যবহৃত একটি পারিভাষিক শব্দের নিম্নলিখিতরূপ বিবৃতি কবি শেখরাচার্য্য জ্যোতিরীশ্বর ঠাকুর বিরচিত বর্ণরত্নাকরে (খ্রীষ্টীয় ১৪শ শতক) পাওয়া যায়। দণ্ডক শব্দে হংসপদ, ক্রৌঞ্চপদ প্রভৃতির ন্যায় প্রবন্ধ পর্যায়ের গীত, বিচিত্র রাগ-রাগিনীর অন্যতম। চিত্রা ও বিচিত্রা দ্বাবিংশ শ্রুতির দুইটি শ্রুতি। [সঙ্গীতরত্নাকর এবং সঙ্গীত মকরন্দে চিত্রা ও চিত্রাবলী গান্ধার রাগের মূর্ছনা বলিয়া বিধৃত।] রূপক জগক ইত্যাদি তালও অপ্রধান বা আধুনিক নয়। ..... সুতরাং সাঙ্গীতিক প্রবৃত্তি হইতে পুঁথির প্রাচীনত্ব অনুমানও অযৌক্তিক নহে। গ্রন্থদ্বয়ের শব্দ সাদৃশ্যও বিলক্ষণ। —শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভূমিকা। নবমসংস্করণ।

প্রবন্ধ সঙ্গীতে তৃতীয় অবয়বের নাম ধ্রুবপদ বলে খ্যাত। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে

বিদ্যমান ছিল কিনা তাও বিচার্য। কারণ নৌকালীলা ইত্যাদি এখনও লোক সঙ্গীতের জনপ্রিয় বিষয়।

আরেকটি প্রসঙ্গের দিকে গবেষকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। আগেই বলা হয়েছে, গীতগোবিন্দের মতই শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনেও বহুপদ বা গীতের ভাবানুষঙ্গের সঙ্গে রাগরূপের সাদৃশ্য বিচার করেই রাগ নির্ণয় করা হয়েছে। কিন্তু এটাও লক্ষ্য করা যায় যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কোন কোন পদের সঙ্গে জয়দেবের গীতগোবিন্দের পদ বিশেষের ভাবানুষঙ্গের হুবহু মিল থাকা সত্ত্বেও রাগনির্ণয়ে উভয়ের সূক্ষ্ম পার্থক্য বর্তমান। পার্থক্য থাকলেও কিন্তু দেখা যায়, ঐসব পদে বড়ুচণ্ডীদাসের রাগনির্ণয় যথার্থ এবং প্রাসঙ্গিক। এগুলিতে বড়ুর স্বকীয় সঙ্গীতচিন্তা বা সমসাময়িক কালের সঙ্গীত-চিন্তার বিশিষ্ট বিবর্তনের আভাস মেলে। তাছাড়া 'দানখণ্ড', 'নৌকাখণ্ড', 'রাধাবিরহ' ইত্যাদি বিষয়গুলি শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীগীত-গোবিন্দের অনুসরণে রচিত নয়। এইসব খণ্ডের গানগুলি বিচার করে এগুলির রাগনির্ণয়ের যাথার্থ নিরূপণ করারও প্রয়োজন আছে। তার ফলেও এ অঞ্চলের মধ্যযুগীয় সাঙ্গীতিক প্রেক্ষা-পটের বেশ কিছু আভাস পাওয়া যেতে পারে।[৬৪] শুধু তাই নয় গীতগোবিন্দের সঙ্গীতচর্চার একটি বিবর্তনের ধারাও ধরা পড়তে পারে।

আচার্য হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মনে করেন, চর্যাপদের গানগুলিও সংকীর্ত্তনের মত করে গাওয়া হত সিদ্ধাচার্যদের সাধন প্রণালী

এর বহুল দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করা যায়। তৃতীয় অবয়বে 'ধ্রু' চিহ্ন দিয়ে মনে হয় ধ্রুবপদটিকেই নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

৬৪. জয়দেবের "রতিসুখসারে... ..." পদটি গুর্জরী রাগে গেয়। অথচ এর হুবহু অনুবাদ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের "তোর রতি আশো অাশে " পদটিতে দেশ বড়ারি রাগ সন্নিবেশিত হয়েছে। গুর্জরী এবং দেশ বরাড়ী উভয় রাগেরই রূপ বা অন্তর্নিহিত কথা হ'ল 'দয়িত বিনোদন'। উপরোক্ত দুটি পদেই কুঞ্জে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁর চিত্তবিনোদনের জন্য রাধিকাকে প্রেরণা দেওয়া হচ্ছে। জয়দেবের অন্ধ অনুকরণ করলে তাঁর অনুবাদে 'গুর্জরীই' নির্দেশ করতেন। কিন্তু তা না করে গীতটিতে 'দেশবরাড়ি' রাগ বসিয়ে

সাধারণ্যে প্রচারের জন্য। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে তন্ত্রযোগের একটি বিশিষ্ট সাধনপ্রণালীর আভাস আছে। এই রকম কোন সাধনপ্রণালী প্রচারের একটি অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যই কি এই শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের নাট্যগীত অনুষ্ঠানের পশ্চাতে সক্রিয় ছিল? অনেকে মনে করেন শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে বৌদ্ধসহজযানের মূল সূত্রগুলির আভাস পাওয়া যায়।[৬৫]

বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতচর্চার ক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন সম্পর্কিত আরেকটি সূত্রের উল্লেখ করা যেতে পারে। মল্লরাজ কাহিনীতেও বিষ্ণুপুরী সঙ্গীতের এক সুপ্রাচীন ঐতিহ্যের ইঙ্গিত আছে। কাহিনীকারদের অনেকে মনে করেন মল্লরাজ পৃথ্বীমল্লের সময় বিষ্ণুপুরে সঙ্গীতচর্চার প্রবর্তন হয়। মল্লরাজ পৃথ্বীমল্লের কাল চতুর্দশ শতক বলে মনে করা হয়। এর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের রচনাকালের খুব একটা ব্যবধান নেই। বিষ্ণুপুর রাজকাহিনীর মল্লপর্যায় আজও কিংবদন্তীর ঘনকুয়াশায় আচ্ছন্ন; এ সময়ের কথানির্দিষ্ট করে বলা শক্ত।

বিষ্ণুপুরের মন্দির-টেরাকোটার উপর লিখতে বসে বিষ্ণুপুর সঙ্গীত ঘরানার সম্পর্কে এই দীর্ঘ আলোচনা অনেকের কাছে অবান্তর মনে হতে পারে। কিন্তু এই আলোচনা অপরিহার্য ছিল। যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রত্যক্ষ প্রেরণায় এইসব মন্দির এবং মন্দির-টেরাকোটার

একই সঙ্গে সঙ্গীতচিন্তার স্বকীয়তা এবং পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। দেশবরাড়িও দয়িতবিনোদনের ভাবটি পরিস্ফুট করার ক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। এমন হতে পারে জয়দেবের পরবর্তীকালে গানটি বাংলায় ঐ রাগেই গাওয়া হ'ত।

রাধাবিরহের পদগুলি বিশ্লেষণ করলেও কিছু আভাস ইঙ্গিত মেলে। একথা সত্য এই খণ্ডে প্রতিটি পদের মাথায় যে রাগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তাতে প্রতিটি গীতের ভাবানুষঙ্গের সঙ্গে মাথার উপরে লিখিত রাগরূপ নিখুঁতভাবে মেলেনা। (অবশ্য যুগের পরিবর্তনে রাগরূপের বিচিত্র বিবর্তন হয়েছে)। বিশেষভাবে প্রতিটি গীতের ভাবানুষঙ্গের সঙ্গে রাগরূপ না মিললেও কতকগুলির ক্ষেত্রে মেলে। তাছাড়া এখণ্ডের সামগ্রিক সাঙ্গীতিক-বাতাবরণটি রচনার ক্ষেত্রে কিন্তু রাগসন্নিবেশ যথার্থ এবং তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে হয়। 'রাধাবিরহ' খণ্ডের বিষয় হল, রাধার অনুতাপ বা আক্ষেপানুরাগ, শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে মিলিত হয়ে রতিসম্ভোগের দারুণ কামনা, বিরহের জ্বালা। শেষ পর্যন্ত রাধার

উদ্ভব তাতে সঙ্গীতের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীগীতগোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন, নরোত্তমের ক্লাসিক-কীর্ত্তন সর্বত্রই কৃষ্ণলীলা-কীর্ত্তনে সঙ্গীতের এক বিশিষ্ট ভূমিকা লক্ষিত হয়। শুধু তাই নয় কৃষ্ণলীলা-কীর্ত্তনের ক্ষেত্রে দেখা যায়, শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীগীত গোবিন্দ এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে প্রবন্ধ সঙ্গীত বা শাস্ত্রীয় ধ্রুপদ সঙ্গীত-কেই বিশেষভাবে অবলম্বন করা হয়েছে। একই সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম এবং ধ্রুপদ সঙ্গীতের বিশিষ্ট কেন্দ্র বিষ্ণুপুরের ধ্রুপদ সঙ্গীতের উৎস সন্ধানের ক্ষেত্রে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের ভূমিকা কতখানি তা নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়েছে। এ জন্যও সঙ্গীতের আলোচনা দীর্ঘ হয়েছে। তাছাড়া বিষ্ণুপুরের সতেরোর শতকের মন্দির-টেরাকোটায় এক সাঙ্গীতিক-বাতাবরণের মুখ্য ভূমিকা। শুধু নৃত্য গীতের চিত্রেই নয়, টেরাকোটা-স্টাইলেও তার প্রভাব সমধিক। অধিকাংশ টেরাকোটা-চিত্রের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সাঙ্গীতিক অনুষঙ্গ। সবচেয়ে বড় কথা, ষোড়শ সপ্তদশ শতকে বিষ্ণুপুরে বিকশিত স্থাপত্য ভাস্কর্য-চিত্রশিল্প বর্তমানে স্তব্ধ-পুরাকীর্তির নীরব অধ্যায়। এরই মধ্যে সঙ্গীতই কিছুটা জীবন্ত। তাই সঙ্গীতের আলোচনার মাধ্যমে বিষ্ণুপুরে বিকশিত ভারতীয় ক্লাসিক সংস্কৃতির মধ্যযুগীয় বিবর্তনের রুদ্ধ প্রেক্ষাপটটি উন্মোচিত করার উদ্দেশ্যে এই দীর্ঘ আলোচনা।

ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের বঙ্গে ভারতীয় প্রাচীন সংস্কৃতির যে অন্তিম-মধ্যযুগীয় বিবর্তন সূচিত হয়েছিল, বিষ্ণুপুর তার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল। বিষ্ণুপুর এবং তার পাশাপাশি বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে মন্দির-স্থাপত্যের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা, রাজস্থানী মিনিয়ে-চারের প্রভাবিত বিপুলসংখ্যক পাটাচিত্র, সঙ্গীত, নানা কারুশিল্প আজও তার সাক্ষী। উত্তরভারত তথা উড়িষ্যার শিখর-মন্দিরের সঙ্গে বাংলা চালার সমন্বয় ঘটিয়ে যে সৌষ্ঠবসম্পন্ন শতশত রত্নমন্দির

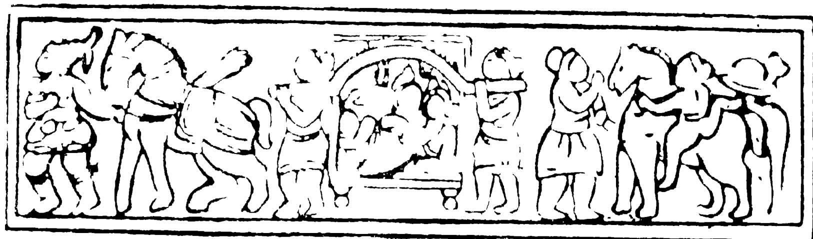
বাসনা চরিতার্থ হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে তাঁর মিলন হয়েছে রতি সম্ভোগের পর রতিশ্রান্ত রাধা শ্রীকৃষ্ণের কোলে নিদ্রা গেছেন। এই ভাবগুলি ফুটিয়ে তুলতে গুর্জরী, ধনাশ্রী বা ধানশ্রী এবং বিভাষ সঙ্গতভাবেই সন্নিবেশিত হয়েছে। ধনাশ্রী বা ধানশ্রীতে রাগরূপ হল, ধানশ্রী রাগিনী কোন সুন্দরী নারীর ন্যায় নায়কের বিরহানলে দগ্ধা ব্যাকুলা এবং তিনি বকুলতলে বসে ক্রন্দনরতা;

নির্মিত হয়েছে তা ক্লাসিক সৌন্দর্যের অধিকারী ; পুঁথির বিচিত্র পাটা বা টেরাকোটা-ভাস্কর্যে ক্লাসিক রাজস্থানী-রীতির প্রভাবও দুর্নিরীক্ষ্য নয়। অপূর্ব এই পাটাচিত্রগুলি পূর্বভারতের অমূল্য সম্পদ বলে মন্তব্য করেছেন অনেকে। অবশ্য বীরহাম্বীরের আমলে বা কিছু পরে এই চিত্রকলা বাংলার পটচিত্রের প্রভাবে বিবর্তিত হয়ে ক্রমশঃ লোকচিত্রের সমধর্মিতা লাভ করেছে বলেও অনেকে মনে করেন। শিক্ষা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে সংস্কৃতভাষা আর ক্লাসিক শাস্ত্র সাহিত্যই যে প্রাধান্য পেয়েছিল তার সাক্ষ্য দিচ্ছে হাজার হাজার পুঁথির স্তূপ। এতে ক্লাসিক শাস্ত্র-সাহিত্যের মধ্যযুগীয় চর্চা-চিন্তা সুস্পষ্ট। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের কথা ইতিহাস-স্বীকৃত। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের এমনি এক প্রেক্ষাপটেই বিষ্ণুপুরের মন্দির আর মন্দির-টেরাকোটার বিকাশ।

গুর্জরী হলেন সুসজ্জিতা নায়িকা বীণাবাদনে প্রিয় সম্ভাষণ করছেন। আর বিভাষায় রাগরূপ হ'ল রতিশ্রান্তা নায়িকা নিদ্রিতা ; ধনুর্বাণ হাতে কন্দর্প সদৃশ নায়ক কুক্কুট শাসন করছেন। রাধাবিরহ খণ্ডে রাধিকার বিরহজ্বালা, অনুতাপ, আক্ষেপ সম্ভোগ-কামনা এবং সবশেষে রতিতৃপ্তা রাধার নিদ্রা ; সমাহার করলে এই খণ্ডে সামগ্রিকভাবে সাঙ্গীতিক-বাতাবরণ রচনায় উপরোক্ত রাগ সন্নিবেশের প্রাসঙ্গিকতা ধরা পড়ে।

৬৫. বাংলার সহজিয়া ধর্ম সিদ্ধাচার্যদের সহজযান হইতেই উদ্ভূত। মধ্য-যুগীয় বাংলার সহজিয়া আদি ও শ্রেষ্ঠ কবি ও লেখক হইতেছেন বড়ুচণ্ডীদাস। তাঁহার শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বৌদ্ধ সহজযানের মূল সূত্রগুলি ধরিতে পারা কঠিন নয়।"—বাঙালীর ইতিহাস : আদিপর্ব : নীহাররঞ্জন।





৩

ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে মল্লভূমের প্রেক্ষাপট

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন, ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে বিষ্ণুপুর পূর্বভারতে একটি বিশিষ্ট কলানগরীরূপে বিকাশ লাভ করেছিল। তাঁর মতে, এসময় বাঙ্গালাদেশের নাগরিক জীবন মুখ্যতঃ গ্রাম জীবনেরই একটি বিস্তৃত সংস্করণ ছিল। বাঙ্গালার নগরের মধ্যে লক্ষ্মণাবতী, বিষ্ণুপুর দু-একটির নাম মাত্র করা যায়।[১] আজকের বিষ্ণুপুরকে সাধারণভাবে দেখলে এ কথা হয়ত অত্যুক্তি বলে মনে হবে। কিন্তু ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের স্মৃতি-চিহ্নগুলি খতিয়ে দেখলে সহজেই এর সত্যতা প্রতীয়মান হয়। এসময়ের বঙ্গে অবস্থান-গুরুত্বে আর কাল মাহাত্ম্যে মোগল-সামন্ত রাজধানী বিষ্ণুপুর যে যথার্থই একটি বিশিষ্ট নগরীরূপে বিকশিত হয়ে উঠেছিল তার স্মৃতি আজও দুর্নিরীক্ষ্য নয়। গড়খাই বা পরিখা বেষ্টিত নগরীর সর্বোচ্চস্থানে সুরক্ষিত কেল্লাঅঞ্চলে প্রাচীন রাজপ্রাসাদের সমুচ্চ প্রাকার এবং মিনারসদৃশ উচ্চশির-হর্ম্যচূড়ার

১, ভারতসংস্কৃতি : সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় : 'জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য' প্রবন্ধ : পৃষ্ঠা ১২১ মিত্র ও ঘোষ : ১৩৬৪ :

ধ্বংসাবশেষ আজও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই ; বিশাল প্রাসাদ-প্রাকারের কিয়দংশ এখনও কোনমতে আত্মরক্ষা করে রয়েছে। এগুলির গঠনে মোগল-স্থাপত্যের ছাপ সুস্পষ্ট ; কেল্লা অঞ্চলে প্রবেশের জন্য রচিত দুটি সুদৃঢ় দুর্গদ্বার বা গড়দরজাব নির্মাণ-রীতিতেও নির্ভেজাল মোগল-স্থাপত্যরীতির অনুসরণ। 'কামান-ঢালা' নামে চিহ্নিত কেল্লাসংলগ্ন এক বিস্তীর্ণ প্রান্তর আগ্নেয়াস্ত্র নির্মাণের স্মৃতিবহন করছে। বিশালকায় দলমাদল এই স্মৃতিরই অংশবিশেষ। আগেই বলা হয়েছে, উড়িষ্যা থেকে পাঠান-আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে বিশ্বস্ত-সামন্ত-জমিদার বীরহাম্বীরের হাত শক্ত করতেই এই এলাহি মোগলাই-প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। বীরহাম্বীরের রাজ্যে আফগান আক্রমণ ঐতিহাসিক ঘটনা।[২] প্রথমেই বলা হয়েছে, অবস্থান গুরুত্বে আর কালমাহাত্ম্যে বিষ্ণুপুর মোগলবঙ্গে একটি যথার্থ সামন্ত-নগরীতে পরিণত হয়েছিল। মধ্যযুগের কাব্যে, ষোড়শ-শতকের মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল থেকে অষ্টাদশ শতকের রামপ্রসাদের 'বিদ্যাসুন্দর' পর্যন্ত রাজধানী বা নগর বর্ণনায় এ ধরণের ছবি আছে। মধ্যযুগের সামন্তনগরীর মতই মূল অধিবাসীরা কারুশিল্পী—শিল্পী-সংঘ বা গিল্ডে সুসংগঠিত। বিদেশাগত শিল্পী আর উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ-বৈদ্য কায়স্থ নিজ নিজ নির্দিষ্ট অঞ্চলে সুপ্রতিষ্ঠিত। ব্রাহ্মণেরও নানা প্রকারভেদ ; বারেন্দ্র বৈদিক, মহাপাত্র জ্যোতিষাচার্য নানা শ্রেণী। হাজার হাজার পুঁথির স্তূপ শত শত টোল-চতুষ্পাটী পণ্ডিত-আর পড়ুয়ার স্মৃতিবহন করছে। ন্যায় স্মৃতির পুঁথি প্রাচুর্যে বর্ণবিভক্ত সমাজে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের আভাস। বিষ্ণুপুর এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের শতশত সুরম্য মন্দির পূজারী-ব্রাহ্মণ ও অতিথি সমাগমের ইঙ্গিত দিচ্ছে।[৩] রাজার গড়্ঘিরে চাকরাণভূমিতে অধিষ্ঠিত বাউরী,

---

২. They (Afghan) broke the treaty, seized the temple of Jagannath, from the Mughal castodian, and attacked Birhambir for his loyalty to the Delhi throne.

—History of Bengal Vol II Dacca University publication.

৩. বাঁকুড়া জেলার অন্তর্গত বিষ্ণুপুরে যে সকল মন্দির বিরাজ করিতেছে তাহাদের শিল্প সৌন্দর্য বাস্তবিক চিত্তাকর্ষক। বিষ্ণুপুরের মন্দির সমূহে

মাঝি, লোহার জাতির মানুষ অতীতের জঙ্গী পাইক-লাঠিয়ালদেরই বংশধর।

এরই মধ্যে সামন্ততান্ত্রিক নিয়মেই ঘটেছে স্থাপত্য, ভাস্কর্য আর চিত্রশিল্পের সমুন্নত বিকাশ। উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীত আর ক্লাসিক-কীর্তনের কথা আগেই বলা হয়েছে। মল্লরাজধানী আর তার পার্শ্ববর্তী বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে মন্দির-স্থাপত্যে বিশিষ্ট বাংলা রীতির প্রশস্ত চর্চা-চিন্তার ব্যাপক দৃষ্টান্ত আজও লক্ষ্য করা যায়। এ অঞ্চলের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে মন্দির-স্থাপত্যের পরীক্ষা নিরীক্ষায় একদা যেন এক গবেষণাগারের রূপ নিয়েছিল বিষ্ণুপুর। উচ্চাঙ্গ-সঙ্গীতের এখানে যে একটি বিশিষ্ট ঘরানার বিকাশ ঘটেছিল তা আগেই বলা হয়েছে। মন্দির গাত্রে টেরাকোটা-ভাস্কর্যের অনুপম কারুকর্মেও বিষ্ণুপুর অগ্রগণ্য। মোগল ভারতে বিকশিত একটি বিশিষ্ট ভাস্কর্য শৈলীর সাক্ষ্য বহন করছে এই টেরাকোটা চিত্রগুলি। টেরাকোটা-চিত্রের সন্নিবেশ-পরিকল্পনাতেও সামন্ত-সংস্কৃতির আভাস দুর্নিরীক্ষ্য নয়। সামন্ত-আভিজাত্য আর সামন্ত আধিপত্যের প্রেক্ষাপটেই যেন গৌড়ীয়-বৈষ্ণব ধর্মের তত্ত্ববাহী টেরাকোটা-গুলির সমাবেশ ঘটেছে মন্দির-গাত্রে। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে তথা রূপগোস্বামীর কৃষ্ণলীলা বর্ণনায় অনেকে সামন্ততান্ত্রিক আভিজাত্যের এক প্রেক্ষাপটের আভাস লক্ষ্য করেছেন। শুধু তাই নয় বিষ্ণুপুরের মন্দির-টেরাকোটায় মোগল ভারতেরও আভাস উদ্ভাসিত। যাইহোক, ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের বিষ্ণুপুরে বিকশিত স্থাপত্য-ভাস্কর্য-চিত্রকলা-সঙ্গীত আর কারু-শিল্পের গৌরবময় প্রসারের সমাহার করলে এ সময়ে বিষ্ণুপুর যে পূর্বভারতে একটি বিশিষ্ট কলানগরী রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল তা

যে অপূর্ব কলা-কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়, তাহা বঙ্গদেশের আর কোন মন্দিরে দৃষ্ট হয় কিনা সন্দেহ। এখানের কতকগুলি মন্দির ইষ্টক এবং কতক একপ্রকার গৈরিক (laterite) প্রস্তরে নির্মিত।...........হ্যাভেল, মার্শাল এবং ব্লক প্রমুখ মনীষিগণ বিষ্ণুপুরের মন্দির সমূহের গঠন-সৌষ্ঠবে আকৃষ্ট হইয়া যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। (Havell : Indian Architecture, P. 122. Archaeological survery Report 1903-4 P.P. 9 and 54) ডাক্তার ব্লক ইহাদের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছিলেন— "It is not on

অনায়াসেই বোঝা যায়—এগুলির গৌরব বিগত হলেও আজও এদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় নাই।

বলাবাহুল্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের পশ্চাদবর্তী প্রেক্ষাপটটি একান্তভাবে নগরকেন্দ্রিক। নবদ্বীপ-পুরী-বৃন্দাবনের মত ভারতের বিশিষ্ট-নগরী গুলিতেই এর উৎপত্তি এবং ক্রমবিকাশ। শাস্ত্র-সাহিত্য-শিল্পের যে ঋদ্ধ পরিমণ্ডলে এর পুষ্টি তা একান্তভাবেই ছিল নাগরিক বুদ্ধিজীবীদের উপরে নির্ভরশীল। মোগল দরবারের আনুকূল্য এবং বৈষ্ণব-সংস্কৃতির দাক্ষিণ্যে বিষ্ণুপুর যথার্থভাবেই এক প্রখ্যাত নগরকেন্দ্র পরিণত হয়েছিল।

ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে বিষ্ণুপুরের বিচিত্র বিকাশের পশ্চাতে ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় যে দুটি কারণ নির্ণয় করেছেন, তার একটি হল, উড়িষ্যা আর দক্ষিণ-ভারতের পূর্ব-উপকূলের সঙ্গে উত্তরের যোগ-বিধায়ক পথের উপরে এর অবস্থান আর দ্বিতীয়টি হল বিষ্ণুপুরের সঙ্গে ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে নবদ্বীপের ঘনিষ্ঠ যোগ।[৪] উত্তর থেকে দক্ষিণে আশা-যাওয়ার পথের ধারে অবস্থিতির ফলে বৃহত্তর ভারতের হাওয়া লেগে এ অঞ্চলের সীমাবদ্ধতা অনেকাংশে অপসৃত হয়েছিল। পুরী এবং বৃন্দাবন প্রাচীন ভারতের দুই বিখ্যাত তীর্থক্ষেত্র—প্রসিদ্ধ সংস্কৃতিকেন্দ্রও বটে। এই দুই

---

account of their age or their historical association that these temples claim the interest of the archaeologists, but because they represent the most complete set of specimens of the peculiar Bengal style of temple architecture." বিষ্ণুপুরের অধিকাংশ দেবালয় সপ্তদশ শতাব্দীর রচনা। মোগল শাসনকালে এদেশে কিরূপ মন্দির নির্মিত হইত তাহাদের বিশেষত্ব, লক্ষণ এবং আকারই বা কিপ্রকার ছিল প্রবীণ প্রত্নতত্ত্ববিৎ শ্রীযুক্ত মনোমোহন চক্রবর্তী মহাশয় একটি প্রবন্ধে (Bengal Temples and Their General Characteristics J. A. S. B. 1909 P. P. 141—64) বর্ণনা করিয়াছেন।"
—অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন (বর্ধমান) স্মারক গ্রন্থ : ১৩২১" হইতে উদ্ধৃত। ননীগোপাল মজুমদার লিখিত প্রবন্ধ "বঙ্গীয় স্থাপত্যের ধারা"।

৪. ভারত সংস্কৃতি : সুনীতিকুমার : মিত্র ঘোষ।

অঞ্চলের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রভাবে মল্লভূমের বিচিত্র সাংস্কৃতিক বিকাশ সম্ভব হয়েছিল। বিশেষ করে যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এই রূপবিকাশ সম্ভব হয়েছিল, ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে তার সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছিল পুরী এবং বৃন্দাবনের যুগ্ম প্রভাবে। শ্রীচৈতন্যের সময় পুরী এবং তাঁর তিরোধানের পর বৃন্দাবনই হয়ে উঠে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রাণকেন্দ্র। ভারতের বিস্তৃত সাংস্কৃতিক আবহাওয়ায় বর্ধিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম তার পরিণত রূপে বৃন্দাবন থেকেই বিষ্ণুপুরে এসে বর্তায়। তাই বিষ্ণুপুরের এসময়ের সাংস্কৃতিক বিকাশে আঞ্চলিকতার পরিবর্তে সর্বভারতীয় প্রাচীন সংস্কৃতিরই একটি মধ্যযুগীয় রূপবিকাশ অধিকতর সুস্পষ্ট। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে এঅঞ্চলের সঙ্গে উড়িষ্যার যোগ দীর্ঘ দিনের। তিনি বলেন সপ্তদশ-শতক পর্যন্ত এঅঞ্চলের সঙ্গে যে উড়িষ্যার যোগ ঘনিষ্ঠ ছিল তার দৃষ্টান্ত এখানের মন্দির স্থাপত্যে উজ্জ্বল।[৫] এখানের মন্দির স্থাপত্যে উড়িষ্যারীতির প্রভাব সর্বজন স্বীকৃত। সতেরোর শতকেও বাঁকুড়া জেলায় উড়িষ্যা রীতির অনেকগুলি মন্দির নির্মিত হয়েছে। বিষ্ণুপুর শহর এবং তার বাইরে এধরণের মন্দির বেশ কয়েকটিই রয়েছে। বিষ্ণুপুর শহরে মল্লরাজাদের নির্মিত ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দের মল্লেশ্বরের মন্দিরটি

---

৫. এ কথাটা মনে রাখা প্রয়োজন যে বাঁকুড়া নাম আধুনিক এবং উনবিংশ শতাব্দীতে গঠিত। পঞ্চদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে উড়িষ্যার হিন্দু রাজারা এঅঞ্চল জয় করেন। তখন স্থানীয় সামন্তরা গজপতিরাজগণের বশ্যতা স্বীকার করিতেন। কিন্তু এঅধীনতার মধ্যে বিশেষ কড়াকড়ি ছিল না। ১৬৯২ খ্রীষ্ঠাব্দে মোগলরা উড়িষ্যা বিজয় সম্পন্ন করে এবং সেই সঙ্গে এই সকল জায়গা উড়িষ্যার অন্তর্ভুক্ত হয়। মহিষাদল' তমলুক, মানভূম, সিংভূম, ও রায়পুর তখন বিষ্ণুপুর জমিদারীর এলাকায় ছিল। প্রথম দিব্যসিংহ খুর্দার ও সর্বেশ্বর ভঞ্জ ময়ুরভঞ্জের রাজা এইরূপ উল্লেখ থাকাতে বাঁকুড়া ঠিক কোন সময়ে যে উড়িষ্যার অধীন ছিল তাহার চিহ্ন আমরা কেবল মাত্র এ অঞ্চলের মন্দির স্থাপত্যে পাই ভাস্কর্যে তার কোন আভাস নাই। সেইসময়ে মানভূম সিংহভূম বিষ্ণুপুরের রাজাদের অধীন ছিল। -দক্ষিন পশ্চিমবঙ্গের শিল্প : রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় : প্রবাসী : ১৩৩৬ মাঘ

রেখ দেউলাকৃতির। এখানের হাজরাপাড়া অঞ্চলের অধুনা বিলুপ্ত রেখ দেউলটি সম্পূর্ণ উড়িষ্যা রীতির রেখদেউল ছিল। যতদূর মনে আছে, এর গায়ে লম্ফমানসিংহ ছাড়াও একটি ক্ষুদ্রাকৃতি জগমোহন এর সঙ্গে যুক্ত ছিল। রাজদরবারের কাছে রাজাদের অভিষেক মঞ্চের প্রায় সংলগ্ন অঞ্চলে শ্যামকুণ্ডের পাড়ে আজও দুটি ইঁটের রেখদেউল বর্তমান আছে। এর সর্বাঙ্গে ছিল উড়িষ্যার 'গজসিংহ' মোটিফ। দেউল দুটিকে সতেরোর শতকের বলেই মনে করা হয়। দেবী মৃন্ময়ীর মন্দিরের সন্নিকটে দুটি বড় আকারের রেখ দেউল বর্তমান। বিষ্ণুপুরের বাইরে বাঁকুড়া জেলার বড়জোড়া থানায় (বড়জোড়ার সন্নিকট) ঘুটগেড়িয়া গ্রামের রেখদেউলটিতে উড়িষ্যারীতির ছাপ দুর্নিরীক্ষ্য নয়। মন্দিরটির গায়ের অলংকরণে বৈষ্ণবতার ছাপ। এটিকেও সপ্তদশ শতকের বলে মনে করা হয়। বিষ্ণুপুর শহর থেকে ৪ মাইল দূরবর্তী দ্বারকেশ্বরের উত্তর তীরবর্তী ধরাপাটের বর্তমান রেখদেউলটিও সমসাময়িক কালের বলেই মনে হয়। সতেরোর শতকে, বিষ্ণুপুর শহরের বাইরেও বেশ কয়েকটি দেউলরীতির মন্দির নির্মিত হয়। এগুলি হল, বৈতলের ঝগড়াই চণ্ডী, ওন্দা থানার বিক্রমপুরের (জগমোহন যুক্ত) শ্যামচাঁদ মন্দির। এগুলির সবগুলিই নিখুঁত উড়িষ্যারীতির অনুসরণজাত না হলেও প্রভাব এবং প্রেরণা এসেছে উড়িষ্যা থেকে।

কিন্তু এই দেউলরীতির মন্দিরের কথা বাদ দিলেও মল্লরাজারা এই শতকে যে মন্দিরগুলি নির্মাণ করেন তারমধ্যে (চতুষ্কোণ গর্ভগৃহের প্রায় ধনুকাকৃতি বাঁকানো ছাদের উপর চূড়াবিশিষ্ট) [৬] রত্ন-

---

মল্লভূমের ষোল-সতেরোর শতকের দেউল ও রত্নমন্দির :

১, মল্লেশ্বর শিবমন্দির (মল্লেশ্বর) মাকড়াপাথর রেখ ১৬২২ খ্রীঃ
বীরসিংহ (১ম) ? মতান্তর আছে

২, শ্যামচাঁদ (হাজরাপাড়া) অধুনালুপ্ত ঐ ঐ ১৬৪০ ,,

৩, ঝগড়াই চণ্ডী (বৈতল, থানা জয়পুর) ঐ ঐ ১৬৫৯ ,,
রঘুনাথ সিংহ (১)

৪, শ্যামরায় (বিষ্ণুপুর দুর্গের মধ্যে) ইঁটের পঞ্চরত্ন ১৬৪৩ প্রথম রঘুনাথ

৫, কালাচাঁদ (লালবাঁধতীরে) মাকড়া একরত্ন ১৬৫৬ ঐ

মন্দিরগুলির উপরও উড়িষ্যা স্থাপত্য রীতির প্রভাব পরোক্ষভাবে হলেও সুস্পষ্ট। রত্নমন্দিরের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ হল চূড়া বা শিখর। এখানের রত্নমন্দির গুলির অধিকাংশের শিখর রচনায় উড়িষ্যার রেখ ও পীঢ়া দেউলের সমাহার লক্ষ্য করা যায়। শিল্পী, মন্দিরের চূড়া বা রত্নগুলির মস্তকভাগে উড়িষ্যার পীঢ়া-দেউলের অনুসরণে ক্রমহ্রস্বায়মান কার্ণিশগুলির সুকৌশল সন্নিবেশের মাধ্যমে যে সুবঙ্কিত সমান্তরাল রেখা সৃষ্টি করে আলোছায়ার নির্বাধ বিচরণ বা ক্রীড়াক্ষেত্র রচনা করেছেন তা অভিনব। কোনারকের মন্দিরের (বা জগমোহনের) রূপরচনার কলাকৌশল সম্পর্কে বলতে গিয়ে ফার্গুসন বলেছেন যে 'আলোছায়ার' এতাদৃশ সুকুমার ক্রীড়ার এমন অবকাশ পৃথিবীর আর কোন ইমারতে আছে কিনা সন্দেহ। প্রস্তরবিহীন বঙ্গদেশে ইঁটের মন্দির রচনায় বিশেষ করে রত্নমন্দিরের স্থাপত্য শৈলীতে চূড়াগুলির বিশিষ্ট আবেদনে এই অপরূপ শিল্পসৃষ্টির প্রয়াস বঙ্গের স্থপতিদের অবিস্মরণীয় কীর্তি। আর বিষ্ণুপুরই তার অন্যতম পথিকৃৎ। সপ্তদশ-শতকের এত রত্নমন্দির একসঙ্গে অন্যত্র দেখা যায় না। শ্যামরায় আর কালাচাঁদ ছাড়াও কেল্লার ভিতরের 'লালজী'মন্দির, মাধবগঞ্জের (বিষ্ণুপুর) মদনগোপাল মন্দির বৈতলের (বিষ্ণুপুর। থানা জয়পুর) শ্যামচাঁদ মন্দির, শলদার (জয়পুর থানা ঃ গোকুলনগর) গোকুলচাঁদ মন্দির উল্লেখযোগ্য। বিষ্ণুপুরের মদনগোপাল, বৈতলের শ্যামচাঁদ এবং গোকুলনগরের মত সুবৃহৎ পঞ্চরত্ন বঙ্গে বিরল এখানে "রত্নমন্দিরের"[৬]

৬, বিষ্ণুপুরে এবং বিষ্ণুপুরের বাইরে মল্লভূমের বিভিন্ন অংশে মল্লরাজারা

মল্লভূমের ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের দেউল ও রত্নমন্দির :

৬,	লালজী (দুর্গ মধ্যে অবস্থিত)	ল্যাটারাইট ঃ	একরত্ন	১৬৫৮	বীরসিংহ
৭,	মুরলীমোহন (মহাপাত্রপাড়া ঃ বিষ্ণুপুর)	ঐ	ঐ	১৬৬৫	বীরসিংহ মহিষী
৮,	মদনগোপাল (মাধবগঞ্জ)	ঐ	পঞ্চরত্ন	১৬৬৫	ঐ
৯.	শ্যামচাঁদ (বৈতল ।। থানা জয়পুর)	ঐ	ঐ	১৬৬৫	?
১০,	মদনমোহন (বিষ্ণুপুর শাঁখারীবাজার)	ইঁটের	একরত্ন	১৬৯৪	দুর্জনসিংহ
১১,	বৃন্দাবনচন্দ্র (বর্নবীরসিংহ থানা পাত্রসায়ের)	ল্যাটা :	পঞ্চরত্ন	?১৬৩৮	রঘুনাথ ১ম
১২,	রসিকনাগর (রাসতলা। অধুনা বিলুপ্ত)	ইঁটের	পঞ্চরত্ন	১৬৯৩	দুর্জন

সংখ্যাধিক্য একটি বিশিষ্ট এবং সমৃদ্ধ স্থাপত্যরীতির প্রভাবেরই ফলশ্রুতি। উড়িষ্যার রেখ আর পীঢ়াদেউলের প্রেরণা এই রত্নমন্দির-গুলির পিছনে কাজ করেছে বলে মনে হয়। আগেই বলা হয়েছে 'রত্নমন্দিরের' প্রধান আকর্ষণ যে চূড়াগুলি তা রেখ আর পীঢ়া-দেউলের সমাহারে রচিত। উড়িষ্যার মন্দির স্থাপত্যের প্রভাব শুধু সপ্তদশ শতকেই নয়, বহু পূর্ব যুগ থেকে, খ্রীষ্টীয় দশম-একাদশ শতক থেকে বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর তথা দক্ষিণ পশ্চিম বঙ্গের উপর পড়েছে। বাঁকুড়া পুরুলিয়ার এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে উড়িষ্যা-রীতির (প্রাক্ মুসলিম) বেশ কিছু রেখদেউল এখনও বিদ্যমান। বাঁকুড়া জেলার বহুলাড়া (ওন্দা) সোনাতপল (থানা ওন্দা) ষাঁড়েশ্বর ও শৈলেশ্বর (বিষ্ণুপুরের ৪ মাইল উত্তরে দ্বারকেশ্বর নদীর তীরে) এবং প্রখ্যাত মৃৎশিল্প কেন্দ্র পাঁচমুড়ার (থানা তালডাংরা) সন্নিকট দেউলভিড়ার (এখানে অবস্থিত দেউলটির সময় সম্বন্ধে মতান্তর আছে) দেউলগুলি এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সন্নিহিত[৭] পুরুলিয়া জেলার জয়পুর গ্রামের সন্নিহিত বোড়াম বা দেউলঘাটায় (কাঁসাই নদীর তীরবর্তী) রয়েছে তিনটি ইঁটের তৈরী রেখদেউল এবং প্রচুর ভাস্কর্য নিদর্শন। পুরুলিয়ার 'পাড়া'[৮]গ্রামের দেউলগুলিরও উল্লেখ-যোগ্য। একদা এই পুরুলিয়া জেলার তেলকুপিতে[৯] প্রচুর দেউল মন্দিরের অস্তিত্ব ছিল। আজ তা দামোদরের জলাধারে নিমজ্জিত। বাঁকুড়ার ওন্দা থানার বহুলাড়া গ্রামের সিদ্ধেশ্বর শিবের অপরূপ ইঁটের তৈরী রেখদেউলটি বঙ্গে মন্দির-স্থাপত্যের একটি উল্লেখযোগ্য নিদর্শন।[১০] এমন অপরূপ ইঁটের তৈরী রেখদেউল শুধু বাংলায় নয়

প্রচুর 'রত্ন' মন্দির নির্মাণ করেন। মনেহয় মল্লরাজাদের নির্মিত মন্দির গুলির মধ্যে রত্ন মন্দিরের সংখ্যাই সমধিক। চারচালা-আকৃতির ছাদের উপর রচিত এক বা একাধিক চূড়া বিশিষ্ট মন্দিরকে রত্ন মন্দির বলে। এক একটি চূড়াই এক একটি 'রত্ন'। এমনি করে 'চারচালা-একচূড়' 'চারচালা-পাঁচচূড়' এবং 'চারচালা নয়চূড় বিশিষ্ট' মন্দিরকে যথাক্রমে 'একরত্ন' 'পঞ্চরত্ন' ও 'নবরত্ন' বলা হয়। চূড়াগুলির গঠন রেখদেউলের মতই একাধিক রথে বিভক্ত এবং মস্তকভাগ পীঢ়া-দেউলের মতই স্তবকিত হ্রস্বায়মান কার্ণিশ সন্নিবেশে রচিত।

সারা ভারতবর্ষে বিরল। নলিনীকান্ত ভট্টশালী এটিকে ইঁটের তৈরী রেখদেউলের সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শনরূপে চিহ্নিত করেছেন।[৭] এটির নির্মাণকাল সম্পর্কে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ বিভিন্ন মত প্রকাশ করেছেন। কুমারস্বামী এটিকে দশম শতকের বলে মনে করেছেন। অপরদিকে কে, এন, দীক্ষিত কোন নির্দিষ্ট সময় না বলে এটিকে 'প্রাক্-মুঘল' যুগের বলে অভিহিত করেছেন। মন্দিরটি সম্পর্কে পার্শি ব্রাউন উচ্চ প্রশংসা করেছেন এবং কুমারস্বামীর মতই এটির নির্মাণকাল দশম শতক বলেই অভিহিত করেছেন।[৮] মন্দিরটির গায়ে ইঁটের উপর পঙ্খের প্রলেপ দিয়ে অলঙ্করণ করা হয়েছে। মন্দিরটি উড়িষ্যা-রীতির। এটি সম্পর্কে অধ্যাপক নির্মল কুমার বসু বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর ডায়েরীতে।[৯] নির্মল কুমার বসুর বিশ্লেষণ থেকেই বোঝা যায় মন্দিরটির উপর উড়িষ্যারীতির প্রভাব কি পরিমাণ পড়েছে। এই মন্দিরের অদূরেই. বাঁকুড়া থেকে মোটামুটি পাঁচ মাইল দূরে বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর সড়কের কিছু উত্তরে বালিয়াড়া গ্রামের উপকণ্ঠস্থ সোনাতপলের দেউলটিও একদা অনুরূপ মর্যাদার অধিকারী ছিল বলেই মনে হয়। ইঁটের তৈরী বিশালকায় এমন্দিরটি বর্তমানে

---

7. "The Siddheswara temple at Bahulara in the Bankura district is probably the finest specimen of a brick bu lt Rekha temple of the mediaeval period now standing in Bengal. Dr. Coomarswamy places the temple in the 10th century A. D. but does not mention authority. K.N. Dikshit on the other hand takes a more sobre view and places the temple in the pre-Mughal period."—Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures in Dacca Museum.

8. The most ornate is the Siddheswara Temple at Bahulara in the Bankura District of the 10th century. Built of bricks enriched with terracotta reliefs carried over the entire snrface, yet this profusion of pattern does not offend, it serves to emphasize its graceful lines." Indian Architecture Vol II PERCY BROWN.

কালগ্রাসে পতিত হয়ে ভগ্নদশা প্রাপ্ত হলেও এর অঙ্গসৌষ্ঠব এবং অলঙ্করণ বৈচিত্র্য সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। অঙ্গের 'চৈত্য-মোটিফ' এখনও লক্ষ্য করা যায়। একই জেলায় এমন দুটি উৎকৃষ্ট উড়িষ্যা-রীতির দেউল, মন্দির-স্থাপত্যের ক্ষেত্রে একদিকে যেমন বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে অন্যদিকে তেমনি উড়িষ্যার মন্দির শিল্পের উত্তরাধিকারেরও সাক্ষ্য বহন করে। উড়িষ্যার ইতিহাসেই বাঁকুড়াকে 'ত্রিকলিঙ্গের' অন্তর্ভুক্ত (প্রাচীনকালে) অঞ্চলরূপে গণ্য করে এখানের মন্দির স্থাপত্যে উড়িষ্যার প্রভাব পর্যালোচনা করে অঞ্চলটিকে 'শিখররীতির' অন্যতম 'বিকীরণ-ক্ষেত্র' রূপে উল্লেখ করা হয়েছে।[১০] সংলগ্ন পুরুলিয়া জেলার বোড়ামে (গড়জয়পুরের সন্নিকট কাঁসাই নদীর তীরবর্তী) অবস্থিত তিনটি অপরূপ ইঁটের দেউলের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে।[১১]

পুরুলিয়া আর বাঁকুড়া পরস্পর সংলগ্ন দুই অঞ্চল। পশ্চিম-বাঁকুড়ার সঙ্গে পুরুলিয়া বা মানভূম অবিচ্ছেদ্য। দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট 'কালচার-জোনের' উভয়েই শরিক এবং নিকটতম প্রতিবেশী।

---

9. নির্মল বসু তাঁর ডায়েরীতে লিখেছেন : Bahulara (বহুলাড়া) between Vishnupur and Bankura, Bahulara is 4/5 m. north east of Onda. গর্ভ ৫$\frac{৩}{৪}$ cubits ×2. কর্ণিক ১৩$\frac{১}{২}$ cubits. North face ইঁটের মন্দির। উপরে সব Plaster করা। সপ্তরথ—তাতে মূর্তি খোদাই ছিল। ইঁটে খোদাই নাই বল্লেই হয়। পাভাগ—৬কাম : খোরা কুম্ভ, পটা (নীচে ধরে 4) পটা, নোলি, বসন্ত। তালজাংঘ—চুণের উপর কন্যাদি মূর্তি ছোট ছোট। বন্ধনা-৩কাম, পটা, নোলি (অঁলা carvingযুক্ত) বসন্ত। উপরজাংঘ—৩ কাম। তার উপরে ছোট ছোট শিখর সারি বন্দী। গণ্ডী—গোলাকার ভূমি অঁলা। ভূ-বরণ্ডী ৫।৬।৪ এরকম ভূমি বিভিন্ন দিকে ৬।৭ পর্যন্ত দেখা যায়। অনুরাহাতে ভূমি $\frac{১}{৪}$(Circular) segment ভূ-অঁলা রাহা অংশে নীচের দিকে ৫ সমান্তরাল শিখরের শ্রেণী, তার উপরে 'ভো' (অলঙ্করণে বোড়ামের দেউলের সঙ্গে মিল।) এখন উচ্চতা 75' চোখের আন্দাজ। ইঁট বাড় পর্যন্ত অস্পষ্ট গোণা তাতে ৩০' মতন হয়। অন্তর সিংহনাথের (বড়ম্বা) মত Corbelled to a Point মূর্তি-ভিতরে অষ্টগ্রহযুক্ত তীর্থঙ্কর মূর্তি, পিছনে ফণাধারী

শুধু সাংস্কৃতিক সাদৃশ্যের সূত্রেই নয় বাঁকুড়া পুরুলিয়ার প্রাকৃতিক বা ভৌগোলিক সীমারেখারও সর্বত্র অস্তিত্ব নাই। পশ্চিম বাঁকুড়ার ভূখণ্ড কখন যে পুরুলিয়ায় মিশেছে তা বোঝা যায় না।

পুরুলিয়ার (গড় জয়পুরের সন্নিকট) বোড়াম বা দেউলঘাটায় ইঁটের তৈরী মন্দিরগুলি সৌন্দর্যে বাঁকুড়ার পূর্বোক্ত বহুলাড়া বা সোনাতপলের মন্দিরের একদা সমকক্ষ ছিল। বিশেষতঃ এখানের বৃহত্তম মন্দিরটি মন্দির-স্থাপত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। বিশিষ্ট শিল্প-সমালোচক ডঃ সরসীকুমার এর শিল্প সৌন্দর্যের নিরিখে এটিকে বহুলাড়ার মন্দিরের সমকক্ষ বলেছেন এবং নির্মাণ কালের বিচারে বহুলাড়ার সমসাময়িক বলে মনে করেছেন। বোড়ামের দেউল সম্পর্কে ডালটনও উচ্চ অভিমত প্রকাশ করেছেন।[১২] এই মন্দিরগুলির নির্মাণ কার্যে ব্যবহৃত ইষ্টকাবলির নিপুণ-নির্মাণ-চাতুর্যের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন তিনি। ডালটনের রিপোর্ট (১৮৬৪-৬৫) শতাধিক বৎসর পূর্বের। উড়িষ্যা রীতির প্রত্যক্ষ প্রভাবে নির্মিত হলেও ইঁটের তৈরী এই মন্দিরগুলির এক বিশেষ আকর্ষণ আছে। শুধু যে পাথরের দুষ্প্রাপ্যতার জন্যই ইঁটের মন্দির নির্মিত হয় তাই নয় মন্দির-স্থাপত্যের সূক্ষ্ম শিল্প চাতুর্যের অভিব্যক্তি পরিস্ফুট করার জন্যও ইঁটের মন্দির নির্মিত হত। ইঁট গুলিকে যত সূক্ষ্ম ভাবে কেটে মন্দিরের গঠনে এক সূক্ষ্মচারুতা পরিস্ফুট করা যায়, পাথরে ততটা হয় না। রাজস্থান আর গুজরাটের প্রায় সন্ধিস্থলে অবস্থিত বিখ্যাত শ্যামলাজীর মন্দিরের অদূরে একটি ইঁটের তৈরী মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দেখেছি।

মহিষাসুরমর্দিনী, গণেশ। পার্শ্বদেবতা unidentified.
Indian Temple Designs. Saraswat Library. Cal. Ist edn. 1981 June. P. 59.

10. The sikhara temples characterised by the Orissan spire are to be found in the area formerly known as Trikalinga. They are to be found is Bankura (Bengal) in the east, Amarkantaka (M.P) in the west and Vizagapatam (Andhra) in the south. which according to them comprised

পুরুলিয়া জেলার তেলকুপিতে একদা বহু মন্দিরের অস্তিত্ব ছিল। বর্তমানে প্রায় সবই দামোদরের পাঁচেৎ-জলাধারের গর্ভে নিমজ্জিত। অধ্যাপক নির্মল কুমার বসু তাঁর ডায়েরীতে এখানের ৯টি 'মন্দিরের বিবরণ দিয়েছেন।[১৩] বেগলার এখানের ১৩টি মন্দিরের বিবরণ দিয়েছেন। ১৯০২ সালে ব্লক এখানে ১০টি মন্দিরের অস্তিত্ব দেখেছিলেন। বাকী দামোদর গর্ভে বিলুপ্ত। পরবর্তীকালে তিনটি মাত্র মন্দির দেখা যেত। তার মধ্যে একটি অর্ধজলমগ্ন (Debala Mitra Telkupi—a submerged temple-site in West Bengal দ্রষ্টব্য)। বিনয় ঘোষ বলেছেন 'বাংলা--বিহার-উড়িষ্যার প্রধান বাণিজ্যপথ ছিল এই নদীপথ। তাই কিংবদন্তী হ'ল কোন রাজা মহারাজার পোষকতায় এই দেবালয় কেন্দ্রটি গড়ে ওঠেনি প্রধানত বণিকদের আনুকূল্যেই গড়ে উঠেছিল (পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি : প্রথম খণ্ড বিনয় ঘোষ : প্রকাশভবন সংস্করণ ১৯৭৬ দ্রষ্টব্য)। বেগলার তার রিপোর্টে [১৪]

---

the area of Trikalinga'.-History of Orissa. K,C. Panigrahi Kitab Mahal First Published 1981

11, In the chasteness of design and the felicity of its execution, including that of its fine and restrained ornamentations, this temple at Boram compares favourably with the Siddheswara at Bahulara and must have been co-eval with it in date.'' Architecture of Bengal Sarasi Saraswati.

12. Some four miles south of the town of Jaipore......near the village Boram, are three very imposing looking brick temples rising amidst heaps of debris of other ruins, roughly cut and uncut stones and bricks......the most southern of the three temples is the largest......the bricks of which these temples are composed. some of them eighteen inches by twelve, and only two inches thick, look as if they were mechine-made, so sharp are the edges, so smooth their surface, and so perfect their

যে কয়েকটি প্রাচীন পথের নির্দেশ দিয়েছেন তার মধ্যে তাম্রলিপ্ত থেকে পাটনা যাবার পথেও 'তেলকুপি' পড়ে। এ পথ বিষ্ণুপুর, বহুলাড়া, এক্তেশ্বর, ছাতনা, রঘুনাথপুর, তেলকুপি, ঝরিয়া বরাবর রাজৌলী হয়ে রাজগীরে প্রবেশ করেছে এবং সেখান থেকে পাটনা গেছে। প্রাচীন বন্দর তাম্রলিপ্ত থেকে ভারতের প্রাচীন রাজধানী পাটনা বা পাটলিপুত্রগামী এ-পথও মুখ্যতঃ বাণিজ্য পথ বলেই মনে হয়। বেগলার প্রাচীন পুরাকীর্তির নিরিখে বারাণসীগামী আর একটি পথের নির্দেশ দিয়েছেন। এটি স্বাভাবিকভাবেই পুরুলিয়ার পাকবিড়রা, বুধপুর, বরাভূমের মধ্য দিয়ে অথবা কাছ দিয়ে দুলমিতে গিয়ে পেঁাছাত এবং সেখানে সুবর্ণরেখা পেরিয়ে রাঁচী পালামৌ বরাবর গিয়ে শোণ নদী পেরিয়ে বারাণসীতে পেঁাছাতো। বলাবাহুল্য বাঁকুড়া, পুরুলিয়ার উপরোক্ত স্থানগুলিতে এখনও

---

shape. They are very carefully laid throughout the masonry, so closely fitting that it would be difficult to insert at the Junction the blade of a knife......

ইঁটের গঠনেই সম্ভাব্য অলংকরণের অবকাশ রাখা হয়েছে—"The bricks used for ornamental friezes, and cornices appear to have been carefully moulded for the purpose before they were burned and the design ....is, though very elaborate wonderfully perfect and elegant as a whole. The only animals I could discern in the ornamentation were geese....

১৩, অধ্যাপক নির্মল কুমার বসু তেলকুপির (আদ্রা-রঘুনাথপুর-চেলিয়ামার নিকট দামোদরের কূলে) মন্দিরগুলির বিবরণ দিতে গিয়ে তাঁর ডায়েরীর প্রথমেই সাধারণভাবে (শিরোনামে) Bhubaneswar type', বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর ডায়েরীর এক নম্বর মন্দিরটি সম্বন্ধে লিখেছেন-পূর্বমুখী জগমোহনবিহীন। ত্রিরথ। ত্রিঅঙ্গ বাড়। পাভাগ—পঞ্চকাম। জাংঘ—বজ্রমুণ্ডীযুক্ত পার্শ্বদেউল। গণ্ডী—মধ্যরথ, Plain good projection. ইত্যাদি। দু-নম্বর মন্দির ভাঙ্গা ত্রিআদি বাড়—সূর্যমন্দির, ভদ্রবিহীন। ভিতরে গর্ভমুদ, রত্নমুদ দেখা যায়। আঁজার উপরে খপুরি। Iconography-সূর্য, দরজার Jamb ও Lintel পূর্বেরটির মত।

পুরাকীর্তির প্রচুর নিদর্শন লক্ষ্য করা যায়। বেগলারও বলেছেন এই দুইপথের ধারে অবস্থিত স্থানগুলি তখনকার সুসমৃদ্ধ নগরছিল। বাঁকুড়া জেলার বহুলাড়া, সোণাতপলের (বেগলারের রিপোর্টে সোনাতপন) কথা আগেই বলা হয়েছে। বাঁকুড়া শহর সংলগ্ন এক্তেশ্বর শিবের (দ্বারকেশ্বরের তীরে) মন্দিরটিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। মন্দিরটি বিরল বৈশিষ্ট্যের দাবীদার। বেগলার তাঁর রিপোর্টে (১৮৭২-৭৩) লিখেছেন : The temple is remarkable in its way ; the mouldings of the basement are the boldest and finest of any I have seen, though quite plain. The temple was built of laterite (Report of a Tour Through The Bengal Provinces : Beglar A.S.I Report, 1872-73) মন্দিরটির একাধিকবার সংস্কার হয়েছে। বর্তমানে এমন বিচিত্র গঠন মন্দির বঙ্গে বিরল। অনেকে এটিতে 'পীঢ়া-দেউলের আদল লক্ষ্য করেছেন। সরসীকুমার সরস্বতী মনে করেন বর্তমান বঙ্গে পীঢ়া দেউলের (বা ভদ্র দেউল) নিদর্শন দুষ্প্রাপ্য।

তিন নম্বর মন্দির ঠিক ঐরূপ সূর্য মন্দির। কিন্তু পা-ভাগ ৪ কাম। কলসের স্থানে—Iconography সূর্য with halo (জ্যোতির্মণ্ডল) চার নম্বর মন্দির ঠিক আগেরটির মত ত্রিরথ, ত্রিঅঙ্গ বাড়। পা ভাগ—পঞ্চকাম। Iconography নৃসিংহ মূর্তি। পাঁচ নম্বর পার্শ্বদেউল রেখশিখর। ভিতরে গর্ভমুদ, গমা, নহড়া, পরাশপাট। ছয় নম্বর মন্দির—same as 1—4. পা-ভাগে ৬ কাম, দরজার লক্ষ্মীপাটে কমলা নয়, একটি উপবিষ্ট পুরুষ (?) ভৈরব থান। সাতনম্বর মন্দির পঞ্চরথ (সপ্তরথ ?) রেখদেউল ও ভদ্র দেউল পঞ্চাঙ্গ বাড়। তল জাংঘের ভিতরেই বিরাল ও বন্ধ (যেমন ভুবনেশ্বরে ব্রহ্মেশ্বরের ভদ্রে)। আটনম্বর—আধুনিক-কদাকার! নয় নম্বর মন্দির (তেলকুপি) 1-4 এর মত। ত্রিঅঙ্গ, ক্ষুদ্র কয়েকটি।—Indian Temple Designs : Nirmal Kumar Bose. P. 157—60.

বলাবাহুল্য অধ্যাপক নির্মল কুমার বসু ৬নং মন্দিরটিকে ভৈরবথান বলেছেন পুরুলিয়ায় ভৈরব নামে একাধিক জৈনতীর্থংকর মূর্তির পুজা হতে দেখা যায়। পুরুলিয়ার পাকবিড়রা এবং ঐ জেলারই ভজুডি রেলস্টেশনের সন্নিকট পলকুড়িতে মনুষ্য-প্রমাণ জৈন তীর্থংকর ভৈরব নামে পূজা পান।

এ ধরণের পীঢ়া-দেউলের যে দু-তিনটির সন্ধান পাওয়া যায়। সেগুলি সবই বাঁকুড়া জেলায়।[১০] এগুলি হল, আটবাইচণ্ডী (থানা ইঁদপুর : বাঁকুড়া) বাঁকুড়ার এক্তেশ্বর মন্দির-সংলগ্ন নন্দীমণ্ডপ ও ময়নাপুরের হাকন্দ মন্দির।

বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার (মানভূম) অনেকগুলি দেউল, স্থাপত্যরীতির বৈশিষ্ট্যে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে স্থান লাভ করেছে। 'ভিতরগাঁও'এর মন্দিরের কথা বলতে গিয়ে কুমারস্বামী বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার শিখর-মন্দিরগুলির উল্লেখ করেছেন (Other brick and stone towers of similar character but more developed one found at Sona-Tapan and Chinpur near Bankura and several other at Manbhum Dalmi, all in Bengal (History of Indian and Indonesian Art Page 80)

---

14. Roads would naturally lead up from Tamluk to Patna to Mongir, and elsewhere.

There would be a choice of several routes to Patna, the most direct route would be through Bishanpur, Bahulara, Sonatapan' Ekteswar, (where the Darikeswar River would be crossed), Chatna, Raghunathpur, Telkupi, Jharia, Rajauli, and Rajgir. It Would cross the Salay river near or at Ghatal, the Dwarikeswar between Bahulara and Ekteswar, the Damuda at Telkupi, the Barakar, close to Palgunjo, the range of hills near Rajauli and pass into Rajgir by the great south gate and out by the north on to Patna. This road would be a great thoroughfare, and we see that, at every obstacle large cities sprang up, as attested by the remains about Ghatal, about Bishanpur, at Telkupi, about Palganj and near Rajauli...—

Another great road would go to Benares, this road would naturally go past Pakbirra and Buddhpur,

আগেই বলা হয়েছে বাঁকুড়া, উড়িষ্যার শিখররীতির মন্দির-স্থাপত্যের অন্যতম 'বিকীরণ-ক্ষেত্র'। বাঁকুড়াই শুধু নয় সংলগ্ন পুরুলিয়া মানভূম এবং বর্ধমানেও এই শিল্পক্ষেত্র প্রসারিত। অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু মনে করেন, বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার ইঁটের মন্দিরগুলির চেয়ে পাথরের মন্দিরগুলির উপর উড়িষ্যা-শৈলীর প্রভাব স্পষ্টতর।[১৬] এটি যে মন্দির নির্মাণের উপাদান বৈশিষ্ট্যেরই ফলশ্রুতি তাও তিনি তাঁর লেখায় ব্যক্ত করেছেন।[১৭]

তবে বাঁকুড়া-পুরুলিয়ার উপর উড়িষ্যার রেখদেউলের প্রভাব প্রত্যক্ষভাবে পড়লেও এখানের শিখর দেউলগুলি গঠনস্বাতন্ত্র্যে বিরল বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। উড়িষ্যার রেখদেউলের বিশিষ্ট স্থাপত্য-রীতির একটি বিবর্তিত রূপ এগুলিতে পরিস্ফুট। এই বিবর্তনের উৎস উড়িষ্যার অন্তর্গত ময়ূরভঞ্জের প্রাচীন রাজধানী খিচিং। উড়িষ্যার মন্দির-স্থাপত্যের একটি আঞ্চলিক রূপ-বিবর্তন এখানের মন্দির স্থাপত্যে উচ্চারিত। অনেকে মনে করেন উড়িষ্যার মন্দির স্থাপত্য শৈলীর সঙ্গে বঙ্গের স্থাপত্যরীতির মিশ্রণে এই বিশিষ্ট রীতির উদ্ভব। এ বঙ্গ, যতদূর মনে হয়, দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গ। দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে ময়ূরভঞ্জের যোগ নিবিড়। 'মুখমণ্ডপ' বা 'জগমোহনবিহীন' এই দেউলগুলি যেন ময়ূরভঞ্জসহ দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের নিরাবরণ-নিরাভরণ মাটি আর মানুষেরই প্রতিনিধিত্ব করছে।

---

through or close past Barabhum, through or close to Dulmi (which I shall subsequently show to be Hwen Thsang's Kirana Suvarna), there crossing the Suvarna Riksha, close past Ranchi, Palamow across the Son to Benares. "(Report of Tour In The Bengal Provinces 1872-73. By J.D. BEGLAR : VARANASI : INDOLOGICAL BOOK HOUSE. Page 50-51)

15. Mention may be made in this context of three such ancient temples in order to complete the study of the type and its variations and transformations. They are all in Bankura district (West Bengal) : Architecture of

এখানের প্রকৃতি নিরাভরণ। জলহীন নদী, শস্য-শষ্পহীন দিগন্তবিস্তৃত অনুর্বর প্রান্তরের মাঝে মাঝে ঋজু উন্নত শীর্ষ শাল-পিয়াশালের জঙ্গল ; আর এই নিরাভরণ নিরলঙ্কার প্রকৃতির মতই এখানের সহজ সরল মানুষগুলির দেহে বা জীবনে কোন অলঙ্কার নেই, অথচ আছে আদিম শৌর্যে ভরা বাহুল্যবর্জিত দেহসৌষ্ঠব। মন্ত্র-দীক্ষাহীন এ অনার্যভূমিতে ব্রাত্যজনের ক্ষীণপ্রতিবাদের সঙ্গেই যেন সংশোধিত-আর্যধর্ম গৃহীত হয়েছে। যাগ-যজ্ঞ ষোড়শোপচার-উপাসনার পরিবর্তে সহজ ভক্তিধর্মই এখানে মানুষের উপাসনার সম্বল। তাই যেন তারা ভোগমণ্ডপ-নাটমন্দির বর্জন করে শুধু দেবতার মন্দিরটুকুকেই নির্বাধ উন্মুক্ত অবস্থানে নিরাবরণ রেখেছে। মন্দির প্রবেশের অধিকারহীন ব্রাত্যজনাও যেন বাইরে থেকে দেবতাকে দর্শন করে ভক্তিটুকু নিবেদন করতে পারে। পার্শি ব্রাউন তাঁর গ্রন্থে খিচিং-শৈলী প্রসঙ্গে বিশদ আলোচনা করেছেন। কোন কোন ভারতীয় বিশেষজ্ঞের মতের উল্লেখ করে তিনি বলেছেন, যে তাঁরা (বিশেষজ্ঞরা) মনে করেন, এই মুখমণ্ডপহীন বিশিষ্টগঠন রীতির ফলে মন্দির অভ্যন্তরস্থ প্রদীপ শিখা উজ্জ্বলতরভাবে প্রজ্জ্বলিত হতে পারে।[১৭] রমাপ্রসাদ চন্দ রাঢ়-দেশের মন্দিরস্থাপত্যে এই অলঙ্কার পরিহার-প্রয়াসকে 'শুদ্ধা-ভক্তি' বিকাশের অধিকতর সহায়ক বলে মনে করেছেন (নোট অন দি এনসিয়েণ্ট মনুমেণ্টস্ অফ্ ময়ূরভঞ্জ: জার্ণাল অফদি বিহার অ্যাণ্ড উড়িষ্যা রিসার্চ সোসাইটি। জুন ১৯২৭) শুধুমাত্র অন্তরের ভক্তিকে সম্বল করে যে সহজ-সাধনার এখানে বিকাশ ঘটেছে তার অন্তরঙ্গ পরিমণ্ডলে প্রবেশ করে আর্য সংস্কৃতিরও যেন নবতর রূপায়ণ হয়েছে।

Bengal (Book 1) S.K. SARASWATI.

16. The temples of Telkupi, Para, Chharra, in Manbhum, which were built of stone instead of brick, partake more of the character of Orissan temples than the brick-built examples. The 'bada' is of three elements, while the 'gandi' is generally 'triratha'. There is no porch in front, but the frontal 'raha' is a shade more exaggerated than

খিচিং তথা ময়ূরভঞ্জ আর বাংলার শিল্পকলার মিলন-মিশ্রণ সম্পর্কে বলতে গিয়ে রমাপ্রসাদ চন্দ তাঁর রিপোর্টে লিখেছেন যে, "বাংলাদেশের স্থাপত্য যে ময়ূরভঞ্জের স্থাপত্যের উপর এতটা প্রভাব বিস্তার করেছে, তার কারণ হচ্ছে এদেশের সঙ্গে বাংলার সান্নিধ্য।" আগেই বলেছি এ বাংলা, যতদূর সম্ভব, দক্ষিণ-পশ্চিমবাংলা। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের শিল্প (প্রবাসী ১৩৩৬ মাঘ) প্রবন্ধে খিচিং এর ভাস্কর্য সম্বন্ধে বলতে গিয়ে বলেছেন—'দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের এবং উড়িষ্যার আর্টের সংযোগ মন্দির স্থাপত্য হইতেও প্রমাণিত হয়।" পার্শি ব্রাউন (Indian Architecture : Muslim Period) বলেছেন - Kiching forms a connecting link between the development of southern Bengal and Orissa. 'ভারতীয় শিল্প ও ময়ূরভঞ্জ' প্রবন্ধে ফনীন্দ্রনাথ বসু লিখেছেন – খিচিং এর মন্দিরগুলি ঠিক উড়িষ্যার মত নয় সেগুলিতে বাংলার প্রভাব আছে।

পাল-সেন যুগই মনে হয়, খিচিং এর শিল্প বিকাশের সুবর্ণ যুগ। বাঁকুড়া পুরুলিয়ার প্রাক্ মুসলিম দেউলগুলি মোটামুটি এ সময়েরই। পার্শি ব্রাউন বহুলাড়ার মন্দির সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে লিখেছেন - Numerous other temples of this order are to be found distributed throughout south western Bengal and in the Manbhum district of Bihar, all built while the Pala dynasty was in power and therefore dating between eighth and eleventh centuries.

---

the 'raha' on other faces. The 'bisama' is often plain the 'raha' nowhere stretching beyond 'bisama'. ইঁটের তৈয়ারী মন্দিরগুলিকে উড়িষ্যারীতির সংশোধিত (Modified) রূপান্তর বলা হলেও এগুলি যে রেখদেউল এবং উড়িষ্যাতেও যে এ রীতির ইঁটের দেউল বর্তমান তাও প্রসঙ্গক্রমে অধ্যাপক বসু বলেছেন—West Bengal and Manbhum possesses a type of brick-built which is evidently related to 'rekha'. Similar examples are

আসলে পাল-নৃপতিদের রাজত্বকালে গৌড়ীয়-শিল্পের সমুন্নত বিকাশ ঘটে। গৌড়, বঙ্গীয়-স্থাপত্য-ভাস্কর্যের বিশিষ্ট কেন্দ্র হয়ে উঠে। বঙ্গীয়-স্থাপত্যশিল্পের প্রভাব ক্রমশঃ প্রসারিত হয়। এই সজীব বঙ্গীয় রীতির সঙ্গে উড়িষ্যারীতির মিলনেই হয়ত এসময় রেখদেউলের এই বিবর্তন ঘটেছে। আগেই বলা হয়েছে, গুপ্তযুগের কেন্দ্রীয় শাসন অবলুপ্ত হলে, পালযুগে, আঞ্চলিক শিল্প-সংস্কৃতি পাদপ্রদীপের অধিকতর সমীপবর্তী হয়। পাহাড়পুরের টেরাকোটা আলোচনা প্রসঙ্গে পাল-সেন যুগের শিল্পরীতির বিকাশ-সূচনার কথাও বলা হয়েছে। আর্য-শিল্পরীতির সঙ্গে আঞ্চলিক শিল্পরীতির মিলনেই এই পাল-সেন শিল্পরীতির উদ্ভব। বলতে গেলে, এসময়েই সুস্পষ্টভাবে অপভ্রংশ তথা সৃজ্যমান বাংলাভাষার দর্পণে আসল বাংলার মুখ দেখা যায়। সাহিত্যে, শিল্পে অন-আর্য প্রধান বঙ্গ সংস্কৃতি উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। চর্যাপদে আর পাহাড়পুরের

---

present near Banpur, in the Puri district as well as in Ranipur-Jharial in the Patna State, in Orissa. (Temple Designs, N. K. BOSE : Preface. Page 18.)

১৭, তেলকুপির মন্দির প্রসঙ্গে হলেও অধ্যাপক নির্মলকুমার বসুর এই উক্তি থেকে রেখদেউল নির্মাণের উপাদানগত পার্থক্যের গুরুত্ব সমধিক প্রতিভাত হয়। "অধ্যাপক নির্মলকুমার বসু বলেছেন" তেলকুপির মন্দিরগুলি পাথরের তৈয়ারী হইলেও এই সকল পাথর সংগ্রহ করা হয়ত কঠিন হইত। তাই কিছুদিনের মধ্যে মানভূমের শিল্পীরা পাথরের বদলে ইঁটে রেখ-দেউল গড়িতে আরম্ভ করিলেন। ফলে মন্দিরের আকৃতিতেও খানিকটা পরিবর্তন ঘটিয়া গেল। রেখদেউল পাথরে গড়িতে হইলে শিল্পীরা খানিকদূর পর্যন্ত গড়িয়াই পাথরের প্রকাণ্ড কয়েকটি পাটা দিয়া একটি ছাত তৈয়ারী করিতেন ও দুদিককার দেওয়ালকে পাকাপোক্তভাবে বাঁধিয়া দিতেন। ইঁট ব্যবহার করিলে কিন্তু তাহার উপায় ছিলনা। তাই দেবালয়কে বাহিরের দিকে খাড়া তুলিয়া যাইতে হয় ও ভিতরে লহড়া (corbel) রচনা করিয়া শেষে একটি বিন্দুতে মিলাইয়া দিতে হয়। ফলে গভীর কাটেনী নীচের দিকে কিছুই থাকেনা একেবারে শেষে একেবারে অত্যধিক কাটেনী-দিয়া গর্ভগৃহকে ঢাকা দিতে হয়। মন্দিরের

টেরাকোটায় গৌড়-বঙ্গসংস্কৃতির সুস্পষ্ট রূপ দেখা যায়। এই অনার্য অধ্যুষিত বঙ্গসংস্কৃতির সঙ্গে মিলনে-মিশ্রণে আর্য সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটে। মিলন-মিশ্রণের এই রূপটি থেকেই পাল যুগের গৌড়ীয়রীতির শিল্প-বিকাশ সূচিত হয়।

আর্যসংস্কৃতি, দেরীতে হলেও, যথারীতি বঙ্গে প্রবেশ করেছে। কিন্তু সে এখানের মাটি আর মানুষের দুর্লংঘ্য প্রভাব এড়িয়ে যেতে পারেনি নিজেই উল্লেখযোগ্যভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। আর্য-ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বা সংস্কৃতি-সাধনার ক্ষেত্রেও মধ্যদেশ থেকে বঙ্গের পার্থক্য প্রচুর। বাঙ্গালীর বিশিষ্টতার পশ্চাতে আর্য-অনার্য ধর্মসংস্কৃতির মিশ্রণ প্রসূত এক বিশিষ্ট বাতাবরণই ক্রিয়াশীল। আর্য-ব্রাহ্মণ্য অনুশাসনের বাইরে সহজ-সাধনার আন্তরিক আবহে এখানে শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণব একাকার। তাত্ত্বিক অর্থে বা আর্য-ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রমতে এখানের মানুষগুলিকে বিশেষভাবে শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণব কিছুই বলা যায় না,

---

শীর্ষস্থানটি এজন্য কমজোর হইয়া যায়। তাহার উপরে বড় বেঁকি বা আঁলা আর বসান যায়না. দুটিকেই ছোট করিতে হয়। এজন্য মানভূমের সর্বত্র আমরা ইঁটের দেউলে ছোট আঁলা (আমলক) ও সোজা গণ্ডী দেখি। যেসব মন্দির ভাঙ্গিয়া গিয়াছে তাহা ঠিক গণ্ডীর মাথাতেই ভাঙ্গিয়াছে। শুধু মানভূম নয়, বীরভূম বা বর্ধমান জেলায় যেখানেই দেউল আছে. তাহা ইঁটের হইলে মানভূমের মত একইভাবে তৈয়ারী হইয়াছে ও একইভাবে ভাঙ্গিয়াছে (মানভূম জেলার মন্দির : প্রবাসী ভাদ্র ১৩৪০) বাঁকুড়ার ইঁটের দেউলগুলি সম্পর্কেও এই উক্তি সমান প্রযোয্য।

18. A feature of the Khiching shrine is that none of them possesses a 'mukhamandapa' or portico and most of those of the same class built in Bengal follow a similar plan which has led a Hindu authority to observe that" a richly ornamented temple without a portico appears a more pious structure than one with a portico, for in the former the lamp of sacrifice burns with greater brilliance (Indian Architecture : Vol I. Taraporevala Bombay ; 1975

এরা সবধর্মকে সহজ-সংস্কারে পরিবর্তিত করে হৃদয়াবেগের সঙ্গে গ্রহণ করেছে। চৈত্র গাজনে লক্ষ লক্ষ শিবভক্তের আনন্দ-গর্জনে যেমন এই আকুল আবেগ উচ্চারিত হয়, মৃদঙ্গনাদে রাধাকৃষ্ণ নাম সংকীর্তনেও তেমনি এই হৃদয়াবেগ একইভাবে সহস্রধারায় ঝরে পড়ে।

ধর্মসাধনার মত শিল্প-সাধনার ক্ষেত্রেও বঙ্গভূমির বৈশিষ্ট্যকে কোন কোন বিশেষজ্ঞ অন-আর্য 'দস্যুসংস্কৃতি'র অভিব্যক্তি রূপে চিহ্নিত করেছেন। জেমস ফার্গুসন দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের মুখমণ্ডপহীন রেখদেউলগুলিকে অন-আর্য শিল্প নিদর্শন বলেছেন। এর নিরিখে স্থাপত্যগতভাবেও তিনি এ ভূমিকে অন-আর্য দস্যু সংস্কৃতির অধিকার ভুক্ত বলে চিহ্নিত করেছেন। বাঁকুড়া জেলার বহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বর শিবের দেউলটিকে (একটি উডকাট চিত্রসহ) তিনি উপরোক্ত অন-আর্য বা 'দস্যু-স্থাপত্য-রীতির নিদর্শনরূপে উল্লেখ করেছেন (হিস্ট্রি অফ ইণ্ডিয়ান এ্যাণ্ড ইস্টার্ণ আর্কিটেকচার : প্রথম খণ্ড : মুন্সীরাম মনোহরলাল নিউ দিল্লী সংস্করণ : ১৯৭২ জানুয়ারী : পৃষ্ঠা ১৪ দ্রষ্টব্য)[১৯]

---

19. Architecturally there is no difficulty in defining the limits of Dasyu province : wherever a square-tower like temple exists with a perpendicular base, but a curvilinear outline above such as that shown in the woodcut (No I : Hindu Temple at Bahulara near, Bankura) there we may feel certain of the existence, past or present of a people of Dasyu extraction. No one can accuse the Pure Aryans of introducing this form into India or of building temples at all or of worshipping images of Siva or Vishnu, with which there temples are filled, and they consequently have little title to confer their name on the style. The Aryans had, however, become so impure in blood before these temples were erected, and were so mixed up with the aboriginal tribes whose superstitions had so influenced

ফাগু'সন কথিত 'দস্যু-স্থাপত্য'রীতি যেমন অবিমিশ্র আর্য সংস্কৃতি প্রসূত নয়, তেমনি অবিকল অনার্য সংস্কৃতিরও অবদান নয়। ফাগুসনকে অবলম্বন করেই বলা যায়, এ মন্দিরগুলি নির্মাণের পূর্বেই আর্যরক্তে অনার্য রক্তধারার অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। আর্যরা তাদের বিশুদ্ধতা হারিয়েছিল। অনার্যরক্তের মিশ্রণে পরিবর্তিত আর্যজাতিগোষ্ঠীর নির্মিত মিশ্র-সংস্কৃতির শিল্পনিদর্শন এগুলি। বিশুদ্ধ আর্যস্থাপত্য বলে এক নজরে দেখানো যায় এমন আদর্শ স্থাপত্য রীতি দুর্লভ।[২০] অঞ্চলভেদে আর্যরীতির স্থাপত্য-ভাস্কর্যের বিভিন্ন পরিবর্তন পরিবর্ধন ঘটেছে। তারই মধ্যে গঠনগত একটা সাধারণ সাদৃশ্য লক্ষ্য করে ভারতীয় মন্দির স্থাপত্যকে নাগর, বেসর, দ্রাবিড় এই কয়টি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। কিন্তু এক 'নাগর-রীতিই সারা ভারতে নানাভাবে পরিবর্তিত হয়েছে। মন্দিরগাত্রে উদ্গত তিনটি অংশের (ত্রিরথ) বিন্যাস এবং তিনটি-অঙ্গে বিভক্ত 'বাঢ়' অংশ টির সমন্বয়ে 'ত্রিঅঙ্গ-ত্রিবাঢ় ব্যবস্থাই নাগরশৈলীর আদিরূপ বলে মনে করা হয়। পরে পশ্চিমভারতে 'পঞ্চরথ-ত্রি অঙ্গবাঢ় কিংবা কোথাও সপ্তরথ-সপ্তাঙ্গ বাঢ় ইত্যাদি পরিবর্তন পরিবর্ধন ছাড়াও মূলশিখরের গাত্র সংলগ্ন অগণিত 'অঙ্গশিখরের' সমন্বয়ে খাজুরাহোর মত নাগর-রীতির আঞ্চলিক বিবর্তনও ঘটেছে। খাজুরাহোতে যে আঞ্চলিক নাগররীতির বিকাশ ঘটেছে, তার সঙ্গে উড়িষ্যার সুউচ্চ শিখর শোভিত বৃহৎ আমলকশীর্ষ "পঞ্চরথ পঞ্চাঙ্গ বাঢ়" রেখদেউলের আবার প্রচুর প্রভেদ। "কিন্তু এই অবশ্যম্ভাবী আঞ্চলিক বিভেদ সত্ত্বেও পশ্চিমভারত খাজুরাহো বা উড়িষ্যার মন্দিরগুলি মূলত একই স্থাপত্যরীতির অনুসরণ করেছে বলে সকলেই মূল নাগরশৈলীর অন্তর্ভুক্ত। উত্তর ভারতের নাগরশৈলী যেমন একদিকে বাঁকুড়ার মন্দির স্থাপত্যের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে, তেমনি অব্যবহিত

---

their religion and their arts that they accepted their temples with their gods........."

(History of Indian and Eastern Architecture : James Fergusson : Munshiram Manoharlal New Delhi, 2nd Indian Edition 1972)

পাশ্বর্বর্তী উড়িষ্যার প্রভাব এখানের স্থাপত্য-রীতির উপর যথানিয়মে পড়েছে। শুধু তাই নয়, উড়িষ্যার মত একটি বিশাল এবং বিখ্যাত সংস্কৃতি-ক্ষেত্রের প্রভাব প্রায় সংলগ্ন দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের শিল্প-সংস্কৃতির উপর গভীরতরভাবেই প্রভাব বিস্তার করেছে। স্থাপত্যে তো বটেই ভাস্কর্যেও উড়িষ্যার প্রভাবে এ অঞ্চলে একটি মিশ্ররীতির বিকাশ ঘটেছে। উড়িষ্যা ভারতীয় স্থাপত্য শিল্পের শুধু এক বিশাল ক্ষেত্রই নয় প্রাচীন এবং মধ্যযুগের ভারতীয়-স্থাপত্য-রীতির এক প্রশস্ত গবেষণা-ক্ষেত্রও বটে। এক ভুবনেশ্বরেই পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকের লক্ষ্মণেশ্বর-ভরতেশ্বর-শত্রুঘ্নেশ্বর মন্দির গুচ্ছ থেকে আরম্ভ করে পরশুরামেশ্বর, মুক্তেশ্বর, বৈতাল, অনন্তবাসুদেব ও লিঙ্গরাজমন্দিরে স্থাপত্যরীতির যে বিচিত্র বিবর্তন ঘটেছে ভারতে তার দৃষ্টান্ত বিরল। এই সুসমৃদ্ধ প্রত্নক্ষেত্রের প্রভাব যে প্রবলভাবে পাশ্বর্বর্তী দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে পড়বে তাতে আশ্চর্যের কি আছে ?

অনেকে বাঁকুড়া-পুরুলিয়ায় (মানভূম) পঞ্চদশশতক পর্যন্ত নির্মিত মন্দিরের স্থাপত্যরীতিতে উত্তরভারতীয় বিশুদ্ধ স্থাপত্যরীতির কিছুটা অবনয়ন ঘটেছে, বলে মনে করেন[২১]। দেশীয় প্রভাবের ফলেই এটা হয়েছে, বলে তাঁদের বিশ্বাস। কিন্তু ময়ূরভঞ্জের খিচিং থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের উপর প্রবাহিত স্থাপত্য-রীতির ধারাটি উড়িষ্যা আর বঙ্গদেশের শিল্পরীতির মিশ্রণজাত এক অভিনব বিকাশ রূপেই বিশেষজ্ঞদের কাছে অভিনন্দিত হয়েছে। অবশ্য মিশ্রণের ফলে উত্তরভারতীয় স্থাপত্যরীতির বিশুদ্ধতার ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যতিক্রম ঘটেছে এবং পঞ্চদশ শতক পর্যন্ত বিলম্বিত পর্যায়ে ক্ষেত্রবিশেষে

---

২০. মন্দির স্থাপত্যের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধ আর্যরীতির একক নিদর্শন এক নজরে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। তবে ভারতীয়-স্থাপত্য-বিজ্ঞানের যে একাধিক প্রাচীন পুঁথির আবিষ্কার ঘটেছে, তাতে মন্দিরের যে বহুবিচিত্র অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিশদবিবরণ (ভোগমণ্ডপ, নাটমন্দির, বিমান, তোরণ, প্রাকার ইত্যাদি) রয়েছে, তাতে মনে হয় এগুলি যথেষ্ট আড়ম্বরপূর্ণ ছিল এবং শাস্ত্রীয় অনুশাসনে এদের গঠনপ্রক্রিয়া শাসিত হত। বিশেষত: শাস্ত্রীয় অনুশাসনে পরিচালিত পুজাবিধির রাজকীয় রূপটির অনুসরণেও মন্দির স্থাপত্য অনেকটা নিয়ন্ত্রিত হত। এই পুজাবিধির প্রয়োজনেই মন্দিরের বিশদীকৃত

হয়ত উল্লেখযোগ্য রূপান্তরও ঘটেছে, সেটা আঞ্চলিক। আগেই বলা হয়েছে, ভারতের অন্যান্য অঞ্চলের মতই এখানের মাটি আর মানুষের ধাতুপ্রকৃতি, মূল নাগররীতির পরিবর্তন ঘটিয়েছে। এখানের দেউল গুলিতে আর্য-অনার্য মিশ্রসংস্কৃতির প্রভাব পড়েছে। অতএব ব্যতিক্রম অবশ্যম্ভাবী। উপাদানগত বৈশিষ্ট্যও যে এই পার্থক্যের একটি কারণ সে কথাও আগে বলা হয়েছে। পঞ্চদশ শতকের দিকে কালবিলম্বে ও বহুবিধ মিশ্রণের ফলে স্বাভাবিক ভাবে নাগর-শৈলীর মূলরীতির বিশুদ্ধতা ক্রমশঃ হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু এই মিলন-মিশ্রণ-গ্রহণ-বর্জনের মাঝেই বাঙ্গালীর শিল্প-মনীষা তার স্বক্ষেত্র খুঁজে পেয়েছে। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতক থেকেই মুসলিম স্থাপত্যের বিস্তার ঘটেছে বঙ্গে। ত্রিবেণীর জাফরগাজির থেকে গৌড়-পাণ্ডুয়ায় এই মুসলিম স্থাপত্য-রীতি ক্রমশঃ বিস্তৃত হয়েছে। কিন্তু আর্য-সংস্কৃতির মতই এখানের মাটি আর মানুষের প্রকৃতির প্রভাবে মুসলিম শিল্পকৃতি'রও পরিবর্তন ঘটেছে। যারা একদিন বিজয়ীর গৌরবে অবিভূত হয়েছিল এ মাটিতে, তারা সংস্কৃতি-গতভাবে ক্রমশঃ বিজিত হয়েছে। ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি বঙ্গের মুসলিম স্থাপত্যরীতি একটি সুপরিণত রূপ লাভ করেছে যা ষোড়শ শতকের প্রারম্ভ পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে।[২২] বঙ্গ প্রকৃতির অনুসরণে বাংলা-চালার আদলটি কোন না কোন ভাবে স্থাপত্য রীতিতে গৃহীত হয়েছে। গৌড়-পাণ্ডুয়ার স্থাপত্যরীতির তৃতীয় অধ্যায়ে বাঙ্গালী শিল্পীর শিল্পমনীষার যে বহু বিচিত্র বিকাশ ঘটেছিল তা বিশেষজ্ঞরা সকলেই স্বীকার করেন। অনেকে মনে

রূপটির পরিকল্পনা হয়েছে। পুঁথিগুলি আর্য-হিন্দুমত এবং বর্ণাশ্রমের প্রেক্ষাপটেই রচিত। ভারতীয়-স্থাপত্য-বিজ্ঞান সম্বন্ধে প্রাপ্ত বা আবিস্কৃত পুঁথি গুলির মধ্যে "মানসার" ই প্রধান এবং উল্লেখযোগ্য। এর অষ্টাদশ অধ্যায়ে, বিমান দেবালয় ইত্যাদির বর্ণনা আছে, ১৯শ থেকে ২৮শ পর্যন্ত দশটি অধ্যায়ে চূড়া, একতল হইতে দ্বাদশতল পর্যন্ত তাদের পারিপ্রেক্ষিতক পরিমাণ সহ বিবরণ; ২৯শ অধ্যায়ে প্রাকার ও দেবালয়ের বহিরঙ্গণ, দেবালয় গাত্রে সংরক্ষিত দেবতাদের বিবরণ ৩১ 'গোপুর' বা সিংহদ্বার ও তাহার চূড়া-সংযুক্ত গৃহ, ৩২শ অধ্যায়ে মণ্ডপ (Portico) ৩৩শ অধ্যায়ে শালা' (hall) বর্ণিত

করেন পাণ্ডুয়ার 'একলাখী' মসজিদ থেকেই এই পট-পরিবর্তনের সূচনা। ক্রমশঃ দেশের প্রকৃতি, জলহাওয়া, দেশের মানুষের আশা আকাঙ্খা তার স্থাপত্যের উপর প্রভাব বিস্তার ক'রেছে। বাংলার আবহাওয়া যেমন আর্যসংস্কৃতির স্থাপত্যরীতিকে পরিবর্তিত (বাংলার প্রাক্-মুসলিম দেউলগুলি উল্লেখ্য) করেছে, তেমনি মুসলিম-সংস্কৃতির ইরাণ-পারসিক রীতিকেও পরিবর্তিত করে বাঙ্গালীর জাতীয় সম্পদে পরিণত করেছে। মানুষের যাবতীয় কীর্তি-রচনার পশ্চাতে থাকে তাকে স্থায়িত্ব দানের আকাঙ্খা। এখানে প্রচুর বর্ষণের জল-নিকাশের জন্য তার বাসগৃহের (চালাঘর) আদলেই মন্দির বা মসজিদের ছাদ ঢালু বা বক্রকরা হয়েছে। যেখানে সম্পূর্ণ চালা-রীতির অনুসরণ করা হয় নাই, সেখানেও স্থপতিদের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতা লব্ধ এবং কারিগরীর তীক্ষ্ণ অনুভূতি প্রসূত বক্র কার্ণিশের (ধনুকাকৃতি) ব্যবহার প্রায় স্বতঃসিদ্ধভাবেই হয়েছে। ডেভিড ম্যাক্‌কাচচন মালদহের গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদ বা সমাধির সঙ্গে পরবর্তীকালের রত্নমন্দির গুলির সাদৃশ্য নির্দেশ করেছেন।[২৩] গৌড়ের 'কদমরসুলের' সঙ্গে তিনি বিষ্ণুপুরের একরত্ন মদনমোহন মন্দিরের সাদৃশ্যের উল্লেখ করেছেন (লেট মিডাইভ্যাল টেম্পলস অফ্ বেঙ্গল : এশিয়াটিক সোসাইটি কলিকাতা প্রকাশিত : ১৯৭২) কদমরসুলের এক গম্বুজযুক্ত ছাদই শুধু নয়, ত্রিখিলান প্রবেশদ্বারের সঙ্গে বিষ্ণুপুরী রত্নমন্দিরের সাদৃশ্যও দুর্নিরীক্ষ্য নয়। রত্নমন্দির

হয়েছে। ভারতীয় স্থাপত্য বিজ্ঞান : মন্মথনাথ চক্রবর্তী অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন বর্ধমান ১৩২১ (স্মারকপত্র)

একদিক থেকে এ গ্রন্থগুলিতেও আঞ্চলিক ধারার প্রভাব বর্তমান। অধিকাংশ গ্রন্থ দাক্ষিণাত্য থেকে পাওয়া গেছে। দক্ষিণের এবং কিয়দংশে উড়িষ্যার স্থাপত্যে এর অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়। বঙ্গদেশের আর্য-ব্রাহ্মণ্য অনু-শাসনের প্রভাব ক্ষীণ। স্থাপত্য-ভাস্কর্যেও যথানিয়মে সেই একই চিত্র।

21. Several temples representing the process of degeneration of the original version of the North-Indian 'nagara' were built till the 15th century. They may be found in Telkupi, Chhoto-Balarampur, Banda and Para in

ছাড়াও পিরামিড-আকৃতির ছাদযুক্ত বিষ্ণুপুরের রাসমঞ্চের চারদিক বেষ্টন করে রচিত খোলাবারান্দায় দুপ্রস্থ করে হ্রস্বাকৃতি অথচ স্থূল প্রচুর ভারবহনক্ষম স্তম্ভের মাথায় সারিবদ্ধ অন্তহীন খিলান (endless array of archways) রচনা করে স্থাপত্যরীতির যে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করা হয়েছে, যে গুলির মধ্যদিয়ে দর্শকের নিবাধ দৃষ্টি বারান্দার অপর প্রান্তের বহির্দেশে গিয়ে পৌঁছায় তা আদিনা বা গৌড়ের বড়সোনা মসজিদকেই মনে পড়িয়ে দেয়। শুধু রাসমঞ্চের চারদিকের বারান্দায় দুপ্রস্থ সারিবদ্ধ খিলান সন্নিবেশেই নয়, পিরামিডাকৃতি শীর্ষদেশের চারদিকের ছাদে যে দু-চালা এবং প্রতিকোণে চারচালা কুটিরের প্রতিকৃতি রচনা করা হয়েছে সেগুলিকে গম্বুজের রূপান্তর বলেই মনে হয়। গৌড়ের ছোট-সোনা মসজিদের ছাদে (১৪৯৩-১৫১৯) এমনি সারিবদ্ধ গম্বুজের মাঝে একটি চার-চালা কুটিরের প্রতিকৃতি লক্ষ্য করা যায়। কদমরসুলের প্রাঙ্গণে রয়েছে দু-চালা কুটিরের আদলে তৈরী ফতেখাঁর সমাধি (১৬৫৭ খৃঃ)। অনেকে মনে করেন, খিলান মুসলিম স্থাপত্যেরই অবদান। মুসলিম-স্থাপত্যের সঙ্গেই ইঁটের খিলান বঙ্গে প্রবর্তিত হয়েছিল। কিন্তু হ্যাভেল তা স্বীকার করেন না। তিনি মনে করেন, মুসলমানদের আগমনের বহুপূর্বেই এখানের স্থপতিরা ইঁটের খিলান রচনা করতে জানতেন।[২৭] তাঁরা ছিলেন ইঁটের কাজে সিদ্ধহস্ত। বাংলাদেশে পাথরের অভাবেই যে ইঁটের মন্দিরস্থাপত্যের ব্যাপক বিকাশ ঘটেছে, ফাগুর্সন প্রভৃতি পণ্ডিতদের এমতও হ্যাভেল অস্বীকার করেন।

Purulia district, Ambikanagar Atbaichandi and Deulbhirya in Bankura, Barakar in Burdwan and Katras and Panrra in Dhanbad. Some of the early images continued to be worshipped even after the 15th century; Shrines at the Siddheswara in Bolara, Sanreswar and Saileswara in Bankura Siddheswara in Barakar are worshipped even to-day." (E.A. Gait, Census of India, 1901, Vol 6, Calcutta (19(2) P.P. 427-30

বিশিষ্ট পুরাতত্ত্ববিদ্ ননীগোপাল মজুমদার ত্রিবেণী-পাণ্ডুয়া-গৌড়ে বিকশিত বঙ্গের মুসলিম্ স্থাপত্যকে চারটি মোটা দাগে বিভক্ত করেছেন (অষ্টম বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলন ঃ বর্ধমান ১৩২১ স্মারক গ্রন্থ)। (১) আদি-পর্যায় বা প্রথম-পর্যায় ১২৯৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে (১২৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিবেনীতে জাফরগাজীর সমাধি নির্মাণ) ১৩৩৮ পর্যন্ত। (২) দ্বিতীয় পর্যায়ে ১৩৩৮-১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। অর্থাৎ বঙ্গদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে আলাউদ্দিন হুশেন শাহের সিংহাসনারোহন পর্যন্ত। ১৩৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশ স্বাধীন হয়ে উঠে। (৩) তৃতীয় পর্যায় হুশেনশাহ্ ও নসরৎ শাহের রাজত্ব কাল। (৪) চতুর্থ পর্যায়, বঙ্গে পাঠান রাজগণের পতনের পর মোগল রাজত্বকালের স্থাপত্য। বলাবাহুল্য চতুর্থপর্যায়ের বঙ্গীয় স্থাপত্যের সাক্ষ্য বহন করছে বিষ্ণুপুরের (বাঁকুড়া জেলা) মন্দির গুলি। বিষ্ণুপুরের মন্দির, অতএব, শুধু বিষ্ণুপুর আর বাঁকুড়ার সম্পদ নয়, বঙ্গীয় স্থাপত্য ধারারই জীবন্ত সাক্ষী। শুধু তাই নয়, পাণ্ডুয়া-গৌড়ের পরে বিষ্ণুপুরে মন্দির স্থাপত্যের যে সমুন্নত বিকাশ ঘটেছে বঙ্গদেশে তা দুর্লভ। বিনয় ঘোষ বলেছেন (পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতি ॥ প্রকাশ-ভবন ॥ পৃষ্টা ৩৪৩) 'বাংলার দেবালয় স্থাপত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাস বিষ্ণুপুর দুর্গের ভিতরেই রচিত হয়ে আছে, নির্মাণকালের দিক থেকে নয়, গড়নের দিক থেকে। যিনি বিষ্ণুপুরের দেবালয় দেখেননি তিনি বাঙালি হয়েও বাংলার শিল্পকলার অমরাবতী দর্শন থেকে বঞ্চিত হয়েছেন বলে আমার বিশ্বাস"। বিষ্ণুপুর এবং তার পাশ্ববর্তী অঞ্চলে সতেরোর শতকে প্রচুর মন্দির নির্মিত হয়েছে। বর্তমানে টিকে থাকা মন্দির গুলির প্রতিষ্ঠাকাল খুঁজিয়ে দেখলে বোঝা যায় সতেরোর শতকের প্রথম-পাদ থেকেই মল্লরাজাদের মন্দির

---

22. There now remains the third and most matured phase of Moslem architecture in Bengal, which beginning about the year 1400 seems to mark not only a change but a clear break with the past. It prevailed during, the fifteenth and for the first half of the sixteenth centuries and depicts the style when it had yielded to the

নির্মাণ শুরু হয়। হয়ত তারপূর্বেও মন্দির হয়েছে—কিন্তু প্রমাণ নাই। রাসমঞ্চকে বীরহাম্বীরের নির্মিত স্থাপত্য-নিদর্শন বলে ধরে নিলে তাই বলতে হয়। বীরহাম্বীর ষোড়শ শতকের শেষ থেকে সপ্তদশ শতকের প্রথম পর্ব পর্যন্ত রাজত্ব করেছেন। কিন্তু রাসমঞ্চের কোন প্রতিষ্ঠা ফলক আজও পাওয়া যায় নাই। তাই এ মন্দিরের নির্মাণকাল নির্দিষ্টভাবে বলা ঠিক হবেনা। তবে সতেরোর শতকের একেবারে সূচনাকালেই যে বিষ্ণুপুরে এক 'কৃষ্ণমন্দির' নির্মিত হয়েছিল তার পাথুরে প্রমাণ রয়েছে বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদের আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনে। এখানে একটি মন্দিরের প্রতিষ্ঠালিপি রয়েছে[১] যেটি ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দের (লিপির পাঠ। শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণঃ। শুভমস্তু। শকাব্দা ১৫৩২। শ্রীশ্রীবীরবিক্রম দেব। ৯১৬। শ্রীশ্রীমন্ত রায় ॥ কামিন্যাসহ)। লিপিটি ব্যাখ্যা করলে দাঁড়ায় ১৫৩২ বিক্রমশকে (শকাব্দা ১৫৩২ এর পরে শ্রীশ্রীবীরবিক্রম দেবের উল্লেখ বিক্রমশকের নির্দেশক) মল্লাব্দ ৯১৬ তে শ্রীমন্তরায় সস্ত্রীক এই মন্দির শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণকে অর্পণ করছেন। রীতি অনুযায়ী মল্লশকের সঙ্গে ৬৯৪ বৎসর যোগ করলে এবং শকাব্দের সঙ্গে ৭৮ বৎসর যোগ করলে খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়। এখানে উভয় নিয়মেই (৯১৬+৬৯৪=১৬১০ ; এবং ১৫৩২+৭৮=১৬১০) মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকাল দাঁড়ায় ১৬১০ খ্রীষ্টাব্দ।

মল্লরাজাদের লিপিযুক্ত প্রথম মন্দির মল্লেশ্বর শিবমন্দিরের পূর্বেই (১৬২২ খ্রীঃ) এই কৃষ্ণমন্দির বিষ্ণুপুরে স্থাপিত হয়েছে। অবশ্য মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা মল্লরাজ পরিবারের বংশতালিকার অন্তর্ভুক্ত কেউ নন বলেই মনে হয়। কিন্তু প্রতিষ্ঠা ফলকের আকার প্রকার দেখে মনে হয়, মন্দিরটি বেশ বড় আকারের ছিল। 'শুভমস্তু' কথাটি আশীর্বাদসূচক। অনেকে মনে করেন অব্রাহ্মণের ক্ষেত্রেই 'শুভমস্তু' কথার ব্যবহার হত। যাইহোক রাজ পরিবারভুক্ত না হ'লেও তিনি হয়ত কোন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী বা রাজন্য ছিলেন বলে মনে

---

environments and adapted itself to the indigenous conditions. (Indian Architecture, Percy Brown Islamic Period)

মনে হয়। মল্লেশ্বর শিব মন্দিরের পূর্বে উক্ত কৃষ্ণমন্দির প্রতিষ্ঠা নানাদিক দিয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু বর্তমান ধরাপাটের মন্দির (লিপি অনুযায়ী) এরও পূর্ববর্তী। ধরাপাটের মন্দিরের তারিখ ১৫২৫ শকাব্দ বা ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দ। এলিপিতে হাম্বীর সিংহ নামেরই শুধু উল্লেখ নাই 'মল্লমহীপতি' বিশেষণও বর্তমান। জন-শ্রুতি মল্লরাজ বীরহাম্বীরের পৃষ্ঠপোষকতায় শ্রীরামদে নামক এ অঞ্চলের কোন এক ব্যক্তি মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর সহধর্মিনীর নাম শ্রীমতী পুষ্প দে। কিন্তু নানা কারণে লিপিটির পাঠ অনেকে বিতর্কিত বলে মনে করেছেন। এ বিষয়ে গবেষণা প্রয়োজন। এ মন্দিরেরও পূর্ববর্তী (১৪৭৫ শকাব্দ বা ১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দ) একটি রামমন্দিরের উল্লেখ করেছেন রাঢ় সংস্কৃতির বিশিষ্ট গবেষক মাণিক-লাল সিংহ তাঁর 'পশ্চিমরাঢ় তথা বাঁকুড়া সংস্কৃতি' গ্রন্থে। মন্দিরটি বাঁকুড়া জেলার সোনামুখী থানার অন্তর্গত অন্যতম প্রসিদ্ধ গ্রাম পাঁচালের (শিবগাজনের জন্য বিখ্যাত) সন্নিকট ইছারিয়া গ্রামে কোন এক শ্রীরামনারায়ণ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত। লিপিতে (শ্রীশ্রীরাম / শাকে ভুবন সমুদ্র/ পঞ্চম সমিতে বর্ষে সুত্তেনাপি / শ্রীরামস্যমুদে সমর্প্য়-মিদং / তৎপাদ পদ্মদ্বয়ে সৌধসুন্দর মন্দিরমু / সুললিতং যত্নেন/ শ্রীরামকনিষ্ঠে রাম সহিত শ্রীরামনারায়ণ শকাব্দা / ১৪৭৫) দেখা যায় প্রতিষ্ঠাতার সঙ্গে উল্লিখিত পরিবারস্থ সকলের নামই রাম বাচক। বিষ্ণুপুর মহকুমার পাত্রসায়ের থানার সদর শহর পাত্রসায়েরের ঘোষাল পরিবারের একরাম মন্দির আছে (পাত্রসায়েরের বিখ্যাত কালঞ্জয় শিব মন্দিরের অদূরে) এই ঘোষাল পরিবারে রামবাচক নাম রাখার পদ্ধতি প্রচলিত। যাইহোক, মাণিকলাল সিংহ মনে করেন ১৪৭৫ শকাব্দে অর্থাৎ ১৫৫৩ খ্রীষ্টাব্দে মল্লরাজ্য বীরমল্লের প্রধানমন্ত্রী ইছেরিয়া গ্রামে বসবাসকারী অনন্তরাম মহাপাত্রের বংশধর জনৈক রামনারায়ণ মহাপাত্র রামবিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত দেবতার জন্য মন্দির নির্মাণ

২৩, ডেভিড ম্যাককাচ্চন বলেছেন (লেট মিডাইভ্যাল টেম্পলস অফ বেঙ্গল : এশিয়াটিক সোসাইটি কলিকাতা) রত্নমন্দিরগুলির সঙ্গে গম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদগুলির আপাতসাদৃশ্য অনুভব করা যায়। একরত্ন মন্দিরের সঙ্গে একগম্বুজ বিশিষ্ট মসজিদের এবং পঞ্চরত্নের সঙ্গে ঐ ধরণের মসজিদের আপাত সাদৃশ্য আভাসিত। পঞ্চরত্ন মন্দিরের সঙ্গে আপাত সাদৃশ্য

করেন। মাণিকবাবুর মতে উক্ত বীরমল্ল (মল্লবংশতালিকা অনুযায়ী বীরহাম্বীরের পিতামহ) বড়জোড়া থানার জগন্নাথপুর গ্রামের বিখ্যাত রত্নেশ্বর শিবের দেউলটি নির্মাণ করান। মাণিকবাবু মনে করেন, বড়জোড়া থানার ঘুটগোড়িয়া গ্রামের শ্যামচাঁদের উড়িষ্যা (খিচিং) রীতির দেউলটিও বীরমল্ল নির্মাণ করেন। বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদের আচার্য যোগেশ চন্দ্র পুরাকৃতি ভবনে সংরক্ষিত এমন একাধিক প্রতিষ্ঠা ফলক আছে, যেগুলিতে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠাতাদের নাম মল্লরাজবংশ তালিকার সম্পূর্ণ বহির্ভূত। একটি ফলকে গঙ্গারাম নামক কোন এক ব্যক্তির নামোল্লেখ দেখা যায়।[২] বিষ্ণুপুরের মাধবগঞ্জ থেকে সংগৃহীত (যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনে সংরক্ষিত) এক শিলালিপিতে রামকৃষ্ণদাসের' নাম রয়েছে।[৩] ইনি ৯৭৮ মল্লশকে বা ১৬৭২ খৃষ্টাব্দে একটি রামমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। এই লিপিটির সঙ্গে পূর্বোক্ত ইছেরিয়া গ্রামের রাম মন্দিরের লিপিটির কিছু তাৎপর্যপূর্ণ পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। ইছেরিয়া গ্রামের লিপিতে শুধু রাম নামই লক্ষ্য করা যায় সীতা নামের কোন উল্লেখ নাই। মাধবগঞ্জ লিপির আরম্ভেই প্রতিষ্ঠাতা, প্রথমেই সীতারামের পদবন্দনা করে মন্দির অর্পন করছেন। এতে যেন, গৌড়ীয় বৈষ্ণবের 'যুগল ভজনের আভাস বর্তমান। অনেকে মনে করেন সপ্তদশশতকে রাধাকৃষ্ণ, শিবদুর্গা, সীতারাম এক পৌরাণিক আবহে একাকার হয়ে গেছলেন। ষোড়শশতকের ইছেরিয়ার লিপি আর সপ্তদশশতকে বৈষ্ণব প্রভাবিত বিষ্ণুপুরের মাধবগঞ্জের লিপি যেন অনেকটাই কালোচিত। যাইহোক, আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনে সংরক্ষিত কিছু লিপিতে মল্লরাজপরিবারের অন্তর্ভুক্ত বলে অনুমিত প্রতিষ্ঠাতাদের ও নামোল্লেখের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বিতর্ক বর্তমান। একটি লিপিতে রঘুনাথ সিংহের নামের সঙ্গে মাধব সিংহ নামক এক ব্যক্তির নামোল্লেখ লক্ষ্য

যুক্ত স্থাপত্যনিদর্শন হিসাবে তিনি গৌড়ের চিকা মসজিদ, বাগেরহাটের মসজিদ এবং বর্ধমানের 'বহরামের' সমাধির কথা বলেছেন।

২৪, It is more logical to assume that the Bengali builders being brick-layers rather than stone-masons had learnt to use the radiating arch whenever it was usefull for constructive

করা যায়। লিপিটি ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দের[৪]। ১৬৫৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম রঘুনাথের পুত্র বীরসিংহ লালজী মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। নিশ্চয়ই তার পূর্বেই তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেছেন। এমতাবস্থায় রঘুনাথের নামোল্লেখ বিস্ময়কর (এক পিতৃত্ববাচক বয়ান বা বিশেষণ ছাড়া)। তাছাড়া মাধব সিংহই বা কে? এসময়ের মল্লরাজবংশ তালিকায় মাধবসিংহ বলে কোন রাজা বা রাজকুমারের নাম পাওয়া যায় না। এক মাধব সিংহকে পাওয়া যায় মল্লরাজবংশের অন্তিমপর্বে। তিনি ব্রিটিশের বিরুদ্ধাচরণ করে কারারুদ্ধ হন। অথচ প্রহেলিকার সাহায্যে লেখা মন্দির লিপিতে ("পয়োধি রসাঙ্কগে ………" অর্থাৎ পয়োধি—৭, রস – ৬, অঙ্ক – ৯, বা ৭৬৯ অঙ্কস্য বামাগতির নিয়মে ৯৬৭ বা ১৬৬১ খ্রীষ্টাব্দ) তারিখ সুস্পষ্ট। বাসুদেবপুর থেকে (বিষ্ণুপুরের সংলগ্ন গ্রাম) সংগৃহীত এবং "আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনে সংরক্ষিত লিপিটিকে[৫] বাসুদেবপুরের বিখ্যাত দেবতা বিষ্ণুবাসুদেবের মন্দিরলিপি বলে মনে করা হয়। বর্তমানে অবশ্য বিষ্ণুবাসুদেবের কষ্টিপাথরের অপরূপ মূর্তিটি একটি চালা ঘরে সুপ্রতিষ্ঠিত। সেখানে এই বিষ্ণু পূজা পাচ্ছেন। বর্তমান চালাঘরটিও বেশ প্রাচীন, দরজার মাথায় কাঠ খোদাই করে যে অপরূপ কৃষ্ণলীলা চিত্রিত হয়েছে তা দারুশিল্পের এক অপূর্ব নিদর্শন। এখানের আটচালার (?) কারুকার্যময় দারুভাস্কর্যের অংশ বিশেষ (কাঠের গজসিংহ) বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদের আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনে (পরিচারকবর্গ তথা গ্রামবাসীর প্রদত্ত) সংরক্ষিত। আলোচ্য বাসুদেবপুরের লিপিটি ৯৩২ মল্লাব্দের বা ১৬২৬ খ্রীষ্টাব্দের। অর্থাৎ মল্লেশ্বর শিব মন্দিরের মাত্র ৪ বছর পরে নির্মিত (মল্লেশ্বর শিব মন্দির হয় ৯২৮ মল্লাব্দ বা ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দে।) বাসুদেবপুরের (পরিষদের মিউজিয়ামে সংরক্ষিত) এই লিপিটির পাঠও বেশ কৌতূহলোদ্দীপক। "লোচনপুর হরলো/চন ল (ণ) বতি গণিতে / ……. নিজ শাকেন (?) দেব/কুষ্ণং শ্রীকৃষ্ণে সম/র্পিতং শ্রী —… /শ- … ৯৩২।)"। মল্লেশ্বরের মতই

purposes long before the Muhammadans came there."

Havell. Indian Architecture; P 56.

(বসুকর নবগণিতে মল্লশকে শ্রীবীরসিংহেন অতি ললিতং দেবকুলং নির্মিতং শিবপাদ পদ্মেষু।) বাসুদেবপুরের লিপিতেও মন্দিরটিকে দেবকুল বা দেউল বলা হয়েছে। সাধারণভাবে সবরীতির মন্দিরকেই দেউল বলা যায়। কিন্তু প্রতিষ্ঠালিপিতে দেবকুল কথার উল্লেখ সচরাচর দেখা যায় না। এমনকি ওন্দা থানার বিক্রমপুরের উড়িষ্যা-রীতির জগমোহন বিশিষ্ট রেখদেউলের প্রতিষ্ঠালিপিতেও উক্ত মন্দিরটিকে 'সৌধগৃহ' বলা হয়েছে। মল্লেশ্বর মন্দিরটি যথার্থই দেউলরীতির। কিন্তু বাসুদেবপুরের মন্দিরের ক্ষেত্রে দেউল আখ্যা কৌতূহলোদ্দীপক। আগেই বলা হয়েছে বিক্রমপুরের (বাঁকুড়া জেলার ওন্দা থানার অন্তর্গত গ্রাম, বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর বাসে ওন্দায় নেমে ৪ মাইল উত্তর-পশ্চিমে মোরাম রাস্তা ধরে যাওয়া যায়) লিপিতেও মন্দিরটিকে দেবকুল বা দেউল বলা হয়নি। এই রেখ দেউলটির লিপির পাঠ : শ্রীরাধিকা কৃষ্ণপদেশকেন ভাবালোক/গে সৌধগৃহং সমর্পিতং শ্রীবীরসীং/হ ক্ষিতিপাল যোষিতামুদাজননী/শ্রীরঘুনাথ শ্রীপতেঃ॥ সকে ৯৬০)। বিক্রমপুরের লিপিটির আর এক বৈশিষ্ট্য হল এটি একটি বিতর্কিত বিষয়ের উপরে আলোকপাত করে। মল্লেশ্বর মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা 'বীরসিংহ' সম্পর্কে একটি বিতর্ক বর্তমান। অনেকে পূর্ব প্রচলিত মতানুসারে মনে করেন মল্লেশ্বর মন্দিরের 'বীরসিংহ' আসলে বীরহাম্বীর। বীর হাম্বীরের আরব্ধ মন্দির তাঁর পুত্র প্রথম রঘুনাথসিংহ সম্পূর্ণ করে প্রতিষ্ঠাকার ক্ষেত্রে পিতার নামই লিপিবদ্ধ করেন এবং যেহেতু রঘুনাথের সময় মল্লরা ক্ষত্রিয়ত্ববাচক 'সিংহ উপাধি লাভ করেন বা গ্রহণ করেন সে কারণে পিতা বীরহাম্বীরকে তিনি (প্রথম রঘুনাথ) বীরসিংহ রূপে এই মন্দিরে আখ্যায়িত করেছেন। কিন্তু অনেকে (West Bengal District Gazetteer Bankura : *Ed.* Amiya Kumar Banerjee : 1968 Edn. P. 96 দ্রষ্টব্য)

25, Raghunath Singh I invariably mentioned him as the son of Birhambir (and not of Birsingh) in the inscriptions of the Shyam Roy, Jore-Bangla and Kalachand temples in Vishnupur Constructed during his reign.

এ যুক্তি মানেন না। তাঁরা বলেন পরবর্তীকালের প্রথম রঘুনাথের প্রতিষ্ঠিত শ্যামরায়, জোড়বাংলা এবং কালাচাঁদ সব মন্দিরেই তাঁর পিতার নামের ক্ষেত্রে 'বীরহাম্বীর'ই বলা হয়েছে। কোথাও বীরসিংহ নাই। অতএব হঠাৎ কেনই বা প্রথম রঘুনাথ সিংহ মল্লেশ্বর মন্দিরেই পিতার নাম বীরসিংহ লিখবেন? এই যুক্তিতে এঁরা সমস্যা নিরসনের জন্য বীরহাম্বীর ও প্রথম রঘুনাথের মধ্যে এক 'প্রথম বীরসিংহ' কে খাড়া করেছেন, এবং রঘুনাথের পুত্র লালজী মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা বীরসিংহকে, দ্বিতীয় বীরসিংহ নামে চিহ্নিত করেছেন।[২৫] কিন্তু অনেক পরবর্তী কালের ৯৬০ মল্লাব্দ বা ১৬৫৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বোক্ত বিক্রমপুরের লিপিটির আলোকে সিদ্ধান্তটি বিতর্কিত হয়ে পড়েছে। এই লিপিতে সুস্পষ্ট ভাবে রঘুনাথ সিংহ (১ম) বীরসিংহের পত্নীর পুত্র (বা বীরসিংহের পত্নী রঘুনাথ সিংহের জননী) রূপে অভিহিত হয়েছেন। ৯৬০ মল্লাব্দে (৯৬০ + ৬৯৪ = ১৬৫৪ খ্রীষ্টাব্দে) মল্লরাজ সিংহাসনে নিশ্চিত ভাবেই প্রথম রঘুনাথ অধিষ্ঠিত ছিলেন। কারণ ১৬৫৫ খ্রীষ্টাব্দে রঘুনাথ সিংহ জোড়বাংলা প্রতিষ্ঠা করেন। রঘুনাথ সিংহ (প্রথম) ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে বিষ্ণুপুর মহকুমার অন্তর্গত পাত্রসায়ের থানার বীরসিংহ গ্রামে বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। বীরসিংহ গ্রামের উক্ত রূপ নামকরণও তাৎপর্যপূর্ণ। এখানে যখন রঘুনাথ সিংহের (১ম) প্রতিষ্ঠিত মন্দির ছাড়া অন্য কোন বীরসিংহের নির্ভর যোগ্য কোন হদিশ পাওয়া যায় নাই তখন এটা মনে হওয়া অসঙ্গত নয় যে, প্রথম রঘুনাথসিংহই পিতার নামে গ্রামের নামকরণ (বীরসিংহ) করে সেখানে এ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। অবশ্য এসবই বিতর্কিত এবং অনুমান মাত্র। সঠিক সিদ্ধান্তের জন্য উপযুক্ত গবেষণা প্রয়োজন। বৃন্দাবনচন্দ্রের মন্দির আজ সম্পূর্ণ ধ্বংস স্তূপে পরিণত। যাই হোক, মল্লেশ্বর মন্দিরের বীরসিংহকে বীরহাম্বীর রূপে গ্রহণের ক্ষেত্রে দ্বিধা বা বাধা থাকলে বিক্রমপুর মন্দিরলিপির বীরসিংহ কে? ইনি নিশ্চয়ই বীরহাম্বীর। কারণ

There is no reason why Raghunath Singh I should not have named his father uniformly in all his inscriptions instead of

বীরহাম্বীর ছাড়া আর কোন রাজার পত্নী প্রথম রঘুনাথের মাতা হতে পারেন না। বীরহাম্বীর এবং প্রথম রঘুনাথের মধ্যবর্ত্তী প্রথম বীরসিংহ বলে কেউ থাকলেও তাঁর সঙ্গে রঘুনাথের পিতা পুত্রের সম্পর্ক হতে পারেনা। সম্পর্কটা বড়জোর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার হতে পারে। অতএব এই বিক্রমপুর লিপি থেকে অধিকতর স্পষ্টভাবে অনুমান করা যেতে পারে যে প্রথম রঘুনাথ সিংহ ক্ষেত্রস্থলে বীরহাম্বীরকে বীরসিংহরূপে আখ্যায়িত করেছেন। বীরহাম্বীর প্রসঙ্গে বাঁকুড়া জেলা গেজেট-ইয়ারে আর একটি বিতর্কমূলক মন্তব্য লক্ষ্য করা যায়। এতে (বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত: অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত) বলা হয়েছে, মানসিংহের প্রথম উড়িষ্যা বিজয়ের কালে (১৫৯০খ্রীঃ) আফগান সর্দার কতলু খাঁর অতর্কিত আক্রমণ থেকে (বিষ্ণুপুর-আরামবাগ অঞ্চলের কোনস্থানে) অগ্রগামী মুঘল বাহিনীর নেতা মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহকে বিষ্ণুপুরের যে মল্লরাজা বা মুঘলের বিশ্বস্ত-জমিদার রক্ষা করেছিলেন তাঁকে বীরহাম্বীরের পিতা (বা পূর্ব্বর্তী রাজা) ধাড়-হাম্বীর মনে করাই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত। অপর পক্ষে আচার্য যদুনাথ সরকার সম্পাদিত এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত হিস্ট্রি অফ্ বেঙ্গল (২য় খণ্ড) এ বলা হয়েছে মল্লরাজ বীরহাম্বীরই উপরোক্ত জগৎসিংহকে আফগান কবলমুক্ত করেন। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ওমেলির গেজেটিয়ারেও (বাঁকুড়া) সহমত পোষণ করা হয়েছে। 'হিস্ট্রি অফ্ বিষ্ণুপুর রাজ (অভয়াপদ মল্লিক) গ্রন্থেও বীরহাম্বীরকেই জগৎ সিংহের রক্ষা কর্তা বলা হয়েছে। এই কাহিনীর অন্যতম উৎস 'আকবরনামাতে জগৎসিংহের রক্ষাকর্তা বিষ্ণুপুরের তথাকথিত রাজভক্ত (মোগলের বিশ্বস্ত) জমিদারের নাম 'হামির' বলা হয়েছে। ধাড়হাম্বীর বা বীরহাম্বীর কিছুই বলা হয় নাই। অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত গেজেটিয়ারে এই 'হামির' আখ্যায় বীরহাম্বীরের পূর্ব্বর্তী (তাঁর পিতা) ধাড় হাম্বীরকেই অভিহিত করতে চাওয়া হয়েছে

---

making a solitary reference about it only in the Malleswara temple. Had there, again, been no prince reigning between Birhambir and Raghunath Singh I the latter

একাধিক কারণে। প্রথম কারণ (১৯৬৮ সালের গেজেটিয়ারের মতে) ১৫৯০ খ্রীস্টাব্দের পূর্ববর্তীকালে মুঘলকর্তৃক কোন উড়িষ্যা অভিযান হয় নাই। দ্বিতীয়তঃ যেহেতু 'আকবরনামায়' উল্লিখিত 'হামির'কে বিষ্ণুপুরের একজন রাজভক্ত বা মুঘলের বিশ্বস্ত জমিদার রূপে আখ্যায়িত বা বিশেষিত করা হয়েছে, এ আখ্যায় বা বিশেষণে মল্লরাজ বীরহাম্বীরকে বিশেষিত করা যায় না। কারণ তিনি বরাবর মুঘলের বিশ্বস্ত-জমিদার ছিলেন না। তা থাকলে ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে জাহাঙ্গীর বীরহাম্বীরের বশ্যতার জন্য সেনাপতি ইসলাম খাঁকে পাঠাতেন না।[২৬]

উপরোক্ত গেজেটিয়ারের মন্তব্যে বিতর্ক বর্তমান। এমন্তব্য সম্পর্কে বিচার-বিশ্লেষণের অবকাশ অস্বীকার করা যায় না। ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে মোগলকর্তৃক কোন উড়িষ্যা অভিযানের সংবাদ পাওয়া যায় না—এটা যথার্থ (হিস্ট্রি অফ্ বেঙ্গল দ্বিতীয়খণ্ড : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : আচার্য যদুনাথ সরকার সম্পাদিত)। কিন্তু ১৯০৮ সালের বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ারে 'ওমেলি' বীরহাম্বীরের রাজত্ব-কাল ১৫৯১ থেকে ১৬১৬ এর মধ্যে নির্দিষ্ট করলেও 'হিস্ট্রি অফ্ বিষ্ণুপুর রাজ' (অভয়াপদ মল্লিক) গ্রন্থে বীরহাম্বীরের সিংহাসনে আরোহণ ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দে নির্দিষ্ট করা হয়েছে। 'ওমেলি' এবং হিস্ট্রি অফ্ বিষ্ণুপুর রাজ' উভয়েরই প্রধান অবলম্বন সূত্র হ'ল মল্লরাজাদের প্রচলিত 'বংশতালিকা (বা কুরাশনামা) এবং পারিবারিক কাগজপত্র। অতএব কে কতটা নির্ভুল তা বলা শক্ত। দ্বিতীয়তঃ মল্লরাজাদের বংশ তালিকা অনুসরণ করলে দেখা যায় বীরহাম্বীরের পিতা বা পূর্ববর্তী রাজা ছিলেন ধাড়ীমল্ল'। ধাড়হামির বা ধাড়ী-হাম্বির নন। বীরহাম্বীরের পূর্ববর্তী সব রাজারাই 'মল্ল' উপাধিতে ভূষিত হতেন দেখা যায়। তাঁদের কারো ক্ষেত্রেই 'হামির' বা 'হাম্বির' উপাধি দেখা যায় না। অনেকে মনে করেন 'হামির' মুঘল জমিদার

---

should have occupied the Malla throne from 1616 to at least 1656 A.D. a period of 40 years which may seem to be too long although there is no concrete evidence to the contrary. (West Bengal District Gazetter Bankura : 1968 P. 96)

'আমির' কথারই অপভ্রংশ। মুঘল আনুগত্য স্বীকারের পরেই বীরহাম্বীর বীরহামির বা বীরহাম্বীর আখ্যায় ভূষিত হন। বীরহাম্বীর আখ্যার মধ্যে অনেকে 'আমির' কথাটির ছায়াপাত লক্ষ্য করেছেন। ধাড়হামির বা ধাড়ীহাম্বীর বীরহাম্বীরের পুত্র ছিলেন। বৈষ্ণব সূত্রেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। ধাড়িহাম্বীর একজন পরমভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। তিনি পিতা বীরহাম্বীরের সঙ্গে অথবা কিছু পরে শ্রীনিবাসের কাছে দীক্ষাগ্রহণ করেন। পিতা বীরহাম্বীরের মতই তাঁর বৈষ্ণব নামকরণও হয়।[২৭]

মধ্যযুগের অস্থির রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে রাষ্ট্রনায়কদের ক্ষেত্রে তথাকথিত অটুট বশ্যতা বিরল। ১৫৯০ এর বীরহাম্বীরের কাছে ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে দীর্ঘকাল পরে, পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে (জাহাঙ্গীরের সময়ে) একই রাজনৈতিক বশ্যতা দাবী করা যায় না। তাছাড়া সমস্ত ঐতিহাসিকই মনে করেন দিল্লী থেকে অনেক দূরবর্তী জঙ্গলাকীর্ণ দুর্গম এঅঞ্চলের রাজাদের বশ্যতায় শিথিলতা ছিল। নিয়মিত খাজনা দেওয়া বা রাজনৈতিক আনুগত্য প্রদর্শন এঁরা নিয়মমাফিক করতেন না।

যাইহোক, 'আকবরনামার' 'হামির' আখ্যার দ্বারা বীরহাম্বীরকে নির্দেশ করা অসঙ্গত নয়। বরং এরদ্বারা ধাড়হামির বা ধাড়হাম্বীরকে নির্দেশ করা অধিকতর বিতর্কমূলক।[২৮]

বিষ্ণুপুরের সন্নিকটে অবস্থিত যাদবনগরের (বিষ্ণুপুর রেল স্টেশনের কাছ থেকে মাইল খানেক উত্তরে এসে বাঁহাতি আলপথে প্রায় দু-মাইল) রত্নমন্দিরটির নির্মাণকাল ৯৫৬ মল্লাব্দ বা ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দ। আচার্য যোগেশ চন্দ্র পুরাকৃতিভবনে (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, বিষ্ণুপুর শাখা) সংরক্ষিত ৯৫৬ মল্লাব্দের মন্দির লিপিটি এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য।[৬] আর একটি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার মন্দিরলিপিতে বেশ কিছু মন্দির শিল্পীর নাম পাওয়া যায়[৭] লিপিটি কোন মন্দির

---

26. Akbarnamah gives the name of this "landholder" with his seat at vishnupur as Hamir with no prefix. J. N. Sarkar (Dacca History of Bengal, Vol II 1948, P 208) refers to the same person as Birhambir. L.S.S, O'Malley

লিপির ভগ্নাংশ। শুধু মন্দির শিল্পীদের নাম-ঠিকানাই অবশিষ্ট আছে। এতে ইলিমপুরের (ছিলিমপুরের ?) সনাতন মিস্ত্রী এবং ভড়া গ্রামের তারাচাঁদ ও নন্দলাল মিস্ত্রীর নাম পাওয়া যায়। ছিলিমপুর এবং ভড়া দুটিই বিষ্ণুপুরের (দ্বারকেশ্বর নদীর ওপারে) উত্তরে বিষ্ণুপুর থানার অন্তর্গত গ্রাম। বিশিষ্ট মন্দির-গবেষক শ্রীতারাপদ সাঁতরা তাঁর একটি প্রবন্ধে এই লিপিটির উল্লেখ করেছেন। তিনি তাঁর এই প্রবন্ধে বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর অঞ্চলের প্রচুর সার্থক মন্দির শিল্পীর নামোল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন বিষ্ণুপুরের অন্তর্গত সোনামুখী (বিষ্ণুপুর মহকুমার অন্যতম থানা) শহরের রামহরি মিস্ত্রী বর্ধমান জেলার কালনার বিখ্যাত প্রতাপেশ্বর শিব মন্দির নির্মাণে অংশগ্রহণ করেছিলেন। মেদিনীপুর জেলার মেঘুলাগ্রামের (থানা গড়বেতা) মন্দির নির্মাণে অংশগ্রহণ করেন প্রেমানন্দ মিস্ত্রী। সোনামুখী, (বিষ্ণুপুর মহকুমার থানা সোনামুখীর প্রধান শহর) বালসী (পাত্রসায়ের থানা) বৈতল (জয়পুর থানা) প্রভৃতি, কয়েকটি গ্রামে বেশকিছু সার্থক মন্দির শিল্পী ছিলেন যাঁরা জেলার বাইরে ও অন্যান্য জেলায় কাজ করেছেন। এসব দৃষ্টান্ত থেকেও এঅঞ্চলে মন্দির-স্থাপত্য-চর্চার এক ঋদ্ধ পরিবেশের সন্ধান পাওয়া যায়।

---

also does so, But it is more logical to assume that Hamir of Akbarnamah refers to Dhar Hambir, for no Mughal invasion took place before the year 1590. If Birhambir was the person referred to in the power, there would have been no need of Jahangir's general Islam Khan's proceeding against him in 1608 A.D. (Baharistan-i- Ghaybi, vol I tr by M. I. Borah Gauhati 1936 P. P. 19—20) Moreover O'malley fixes the reign cf Birhambir between 1591 and 1616 Ad. (West Bengal District Gazetteer ; Bankura Ed. Amiya Kumar Banerjee 1968. P. 93)

২৭. "বৈষ্ণব সাধক রূপে বীরহাম্বীর ও তাঁহার পুত্র ধাড়িহাম্বীরের যে নূতন সাধক নাম হইয়াছিল, সে কথা আগে বলিয়াছি। শ্রীল শ্রীবীরহাম্বীরো মহান্ মল্লমহীপতিঃ। শ্রীজীবগোপালদাসাখ্যোভব্রিলম্পটঃ।। তৎপুত্রো

বিষ্ণুপুরে (সন্নিকটবর্তী অঞ্চলসহ) বর্তমানে টিকে থাকা মন্দিরগুলি ছাড়াও যে আরও মন্দির এ অঞ্চলে ছিল তার কিছুটা আভাস পাওয়া যায় বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদের যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনে সংরক্ষিত মন্দির-লিপিগুলি থেকে।[২৯] এগুলি মল্লরাজাদের রাজ্য কাল তথা ইতিহাসের গবেষণার পক্ষেও যথেষ্ট সহায়ক হবে বলে মনে হয়। লিপিগুলির নিরিখে অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, এ অঞ্চলের প্রচুর দেবালয় বহুপূর্বেই বিনষ্ট হয়েছে। এমনকি সাম্প্রতিককালেও (গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যেও) একাধিক মন্দির বিনষ্ট

ধাড়ি হাম্বীরো যুবরাজঃ প্রিয়াযুতঃ। (গ ৫৬৩৮) বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস। ডঃ সুকুমার সেন। প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ। ইস্টার্ণ পাবলিশার্স। ৪৯৭।

২৮, বীরহাম্বীরের পূর্বে মল্লরাজবংশতালিকায় হাম্বীর বা হাম্মির পদবীযুক্ত কোন নৃপতি দেখা যায় না।

২৯ ১) শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণঃ।।
শুভমস্তু শকাব্দা ১৫৩২
শ্রীশ্রীবীর বিক্রমদেব ৯১৬
শ্রীশ্রীমন্ত রায় ।। কামিন্যাসহ

২) বসুমুন্যঙ্কগে শাকে
রাধাকান্ত পদাম্বুজে
গঙ্গারাম......স
মর্পিতং সৌধমন্দির।

৫) লোচনপুর হরলো
চন ল (ন) বতি গণিতে
নিজে শাকে ।। দেব
কুলং শ্রীকৃষ্ণেঃ সম
পিতং......—
।। শ —......৯৩২

৭) মিশ্রী শ্রীসনাতন নিবাস ছিলিম-
পুর। শ্রীতারাচাঁন্দ মিশ্রী।
ভড়া শ্রীনন্দলাল মিশ্রী
নিবাস ভড়া।।

৩, সীতারাম পদাম্ভোজে
বসুসপ্তাঙ্কগে শকে
শ্রীরামকৃষ্ণদাসেন
সৌধ মন্দির সমর্পিতম। ৯৭৮

৪) শ্রীরাধিকা কৃষ্ণমুদে
পয়োধি রসাকগে
সৌধগৃহ শকাব্দে
দদৌ (কুমারো ?) রঘু
নাথ সিংহ মহী প
তে মাধব সিংহ—
নামা।। ৯৬৭

৬, শ্রীরাধিকাকৃষ্ণ মুদে রসে বান
গ্রহে যুক্তে সৌধগৃহ শকাব্দে
শ্রীবীরহাম্বীর নরেশ সূনুর্দদৌ
নৃপ শ্রীরঘুনাথ সিংহঃ। ৯৫৬

হয়েছে। এর মধ্যে তিনচারটি বিলুপ্ত মন্দিরের টেরাকোটা বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদের আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনে সংরক্ষিত আছে।[৩৩] মদনমোহন মন্দিরের সম্মুখে (বিপরীত দিকে) একটি টেরাকোটা মন্দির (রাধাকান্ত ?) এই সেদিনও (সাহিত্য পরিষদ প্রতিষ্ঠার পরে ৩৫/৪০বছর আগেও) টিকে ছিল। অসংরক্ষিত এবং ভগ্নদশাপ্রাপ্ত এই মন্দিরটি থেকে কিছু টেরাকোটা-টালি তখনই সংগৃহীত হয়েছিল। রাসতলার আর একটি মন্দির (রসিকনাগর) পূর্বেই বিনষ্ট হয়েছিল। এখান থেকেও কিছু টেরাকোটা চিত্র সংগৃহীত হয়। সবশেষ গোপালগঞ্জ অঞ্চলের একটি একরত্ন টেরাকোটা মন্দির থেকেও সংগৃহীত হয়েছিল কিছু টেরাকোটা চিত্র। বর্তমানে এ মন্দির সম্পূর্ণ ধ্বংসস্তূপে পরিণত। মন্দিরের সব টেরাকোটা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি। বিষ্ণুপুরের কেল্লা অঞ্চল থেকেও কিছু বিনষ্ট মন্দিরের টেরাকোটা সংগৃহীত হয়। বিশেষ করে শ্যামকুণ্ড পুষ্করিণীর তীরবর্তী উড়িষ্যারীতির দেউল দুটি থেকে বেশকিছু টেরাকোটা টালি সংগৃহীত হয়েছিল একসময়। এর অধিকাংশই "গজসিংহ-মোটিফ"। একটি অপরূপ দীর্ঘাঙ্গী চামর ধারিণীর মূর্তিও এখান থেকে সংগৃহীত হয়েছে। "গজসিংহ-মোটিফ" উড়িষ্যার প্রভাব প্রসূত বলেই মনে হয়। শাঁখারীবাজার থেকে সংগৃহীত টেরাকোটা চিত্রগুলির মধ্যে "বসুদেবের (কৃষ্ণবক্ষে) যমুনা পার" ইত্যাদি মোটিফগুলি মদনমোহন মন্দির-টেরাকোটার অনুসরণ। গোপালগঞ্জের সাম্প্রতিক কালে বিনষ্ট রত্নমন্দিরটিতে রাসলীলা ছাড়া যে "অনন্তশয়ন বিষ্ণুর" মোটিফ ছিল (বর্তমানে পরিষদের সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত) তার কম্পোজিশন অষ্টাদশ শতকের রাধাশ্যাম মন্দিরের "অনন্তশয্যা" মোটিফটির অনুরূপ।

অষ্টাদশ শতকের শেষ আর ঊনবিংশ শতকের টেরাকোটায় আঞ্চলিকতা শুধু স্টাইলে নয় বিষয়বস্তুতেও আঞ্চলিক (বঙ্গদেশের) মঙ্গলকাব্য পুরাণ ইত্যাদির প্রাধান্য দেখা যায়। চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের "কমলে-কামিনী দর্শন" আর শিবায়নের শিববিবাহ (গুপ্তযুগের "কল্যাণসুন্দর মোটিফ নয়) ঊনবিংশ শতকের জয়পুরের (বিষ্ণুপুর মহকুমার একটি থানা) মন্দিরে, পাত্রসায়েরের (অন্য একটি থানার

প্রধান শহর) ঘোষালদের মন্দিরে, সোনামুখীর শ্রীধর মন্দিরে এবং হদলনারায়ণপুরের (থানা পাত্রসায়ের) জমিদার মণ্ডলদের (বড়তরফের) রাসমঞ্চে উল্লেখযোগ্যভাবে স্থান পেয়েছে। সোনামুখীর শ্রীধর মন্দিরে শিববিবাহের দৃশ্যটি (শিবায়নকাব্যের অনুসরণে নির্মিত হয়েছে। এটি গুপ্তযুগের 'কল্যাণসুন্দর' ভাস্কর্য-মোটিফ নয়) সম্পূর্ণ বাঙ্গালী বিবাহের অনুসরণে রচিত হয়েছে। বর প্রদক্ষিণের জন্য পিঁড়িতে উপবিষ্ট উমার চিত্রটিতে এবং সমবেত এয়োদের বরবরণের আয়োজনে বাঙ্গালী বিবাহের প্রতিচ্ছবি। বরবরণ করতে এসে বিবস্ত্র শিবকে দেখে লজ্জাহত, মেনকার ঘোমটা টেনে সরে দাঁড়ানোতেও শিবায়ন কাব্যের ("মেনকা মাথায় দেলো ঘোমটা" লোকগীতির প্রতিধ্বনি) প্রতিচ্ছবি। হদলনারায়ণপুরের মণ্ডলদের রাসমঞ্চের টেরাকোটায় চিত্রটি একইভাবে চিত্রিত হয়েছে। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের 'কমলে কামিনী' টেরাকোটা চিত্রের কম্পোজিশনে স্থানে স্থানে (পাত্রসায়ের-জয়পুর) দেবীর হস্তী শিশু গলাধঃকরণের পরিবর্তে দেবীকে পটুয়াপটের মত "গণেশজননী" করা হয়েছে। অবশ্য সোনামুখীর শ্রীধর মন্দিরের 'কমলে কামিনী দর্শন" চিত্রে দেবীর হস্তীশাবক গলাধঃকরণ সুস্পষ্ট। গ্রাম্য কীর্তনীয়াদের অনুসরণে (সাজিয়ে দে মা তোর নীলমণি) গোষ্ঠযাত্রার প্রাক্কালে যশোদা কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণকে সাজিয়ে দেওয়ার বাৎসল্য-রসাত্মক সজীব চিত্রটি হদল-নারায়ণপুরের মণ্ডলদের (মেজতরফের) মন্দির টেরাকোটায় অপূর্ব ভাবে চিত্রিত হয়েছে। এখানেই প্রতাপরুদ্রের 'ষড়ভুজ দর্শন' চিত্রটিও তাৎপর্যপূর্ণ। বৃন্দাবনের গোস্বামী সিদ্ধান্তে নমক্রিয়ায় শ্রীচৈতন্য প্রশস্তি থাকলেও শ্রীকৃষ্ণলীলাই সেখানে মুখ্যতত্ত্ব। বৃন্দাবনের গোস্বামী সিদ্ধান্তে শ্রীচৈতন্যের প্রায় অনুল্লেখ প্রসঙ্গে ডাঃ সুকুমার সেন তাৎপর্যপূর্ণ ইঙ্গিত করেছেন। আগেই বলা হয়েছে, বৃন্দাবনের গোস্বামীসিদ্ধান্ত এবং বঙ্গের গৌরাঙ্গবাদীদের মধ্যে গজিয়ে ওঠা সূক্ষ্ম মতানৈক্যের অবসানের জন্যই বৃন্দাবন থেকে গোস্বামী সিদ্ধান্তের পুঁথিসহ তিন বৈষ্ণব আচার্যকে গৌড়ে প্রেরণ করা হয়েছিল। খেতুরীর মহোৎসবে শ্রীচৈতন্যের পূজামূর্তি স্থাপনের মাধ্যমে এই মতানৈক্যর অবসান ঘটে। খেতুরির মহোৎসব বীরহাম্বীরের কালেই

অনুষ্ঠিত হয়। তাই দেখা যায়, মুখ্যতঃ গোস্বামী সিদ্ধান্তের প্রত্যক্ষ প্রণোদনায় নির্মিত বিষ্ণুপুরের সতেরোর শতকের বিখ্যাত টেরাকোটা মন্দিরগুলিতে শ্রীচৈতন্যপ্রসঙ্গ প্রায় অনুল্লিখিত হলেও অতিসংক্ষেপেও আভাসিত হয়েছে। প্রায় গোস্বামীদের নর্মক্রিয়ার মতই। তবে গোস্বামী-সিদ্ধান্তের বিকশিত চিত্ররূপ, শ্যামরায়ের মন্দিরের সর্বাঙ্গে খচিত হাজার হাজার টেরাকোটায়, দু-একটি মাত্র গৌরাঙ্গ-চিত্র থাকলেও এর বার বছরের ব্যবধানে নির্মিত জোড়বাংলা মন্দিরের গর্ভগৃহের দেওয়ালে ষড়্‌ভুজ চিত্র তাৎপর্যপূর্ণ। ষড়্‌ভুজ মূর্তিতে শ্রীচৈতন্য শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণ সমাহৃত। শ্রীচৈতন্য এখানে দেবত্বে বা ভগবৎসত্বায় প্রতিষ্ঠিত পূজামূর্তি রূপে নির্দেশিত। এরপরেই দেখা যায় বীরসিংহ (জোড়বাংলা মন্দিরের প্রতিষ্ঠাতা প্রথম রঘুনাথ সিংহের পুত্র) বিষ্ণুপুরের সন্নিকট তেজপাল মন্দিরে ৯৭৮ মল্লাব্দে ষড়্‌ভুজ গৌরাঙ্গ-নিত্যানন্দ প্রতিষ্ঠা করেছেন। পরবর্তীকালে ১৭৩৪-৩৫ খ্রীষ্টাব্দে মল্লরাজ গোপাল সিংহ বিষ্ণুপুর কেল্লার মধ্যেই মহাপ্রভুর (শ্রীগৌরাঙ্গ) জন্য দ্বিতীয় জোড়বাংলাটি (বর্তমানে ধ্বংস-প্রায়) প্রতিষ্ঠা করেন। জোড়বাংলা রীতির এ মন্দিরটির চূড়া আটচালারীতির। ক্রমশঃ অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকের মন্দির-টেরাকোটায় শ্রীগৌরাঙ্গ-চিত্রের ব্যাপকতর ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। বঙ্গদেশে ক্রমশঃ শ্রীগৌরাঙ্গ আর শ্রীকৃষ্ণের অভেদ কল্পনা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের একটি সরলীকৃত রূপবিকাশ ঘটে। এই সমাহৃত রূপবিকাশের উৎস কবিরাজ গোস্বামীর 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত'। বঙ্গীয় বৈষ্ণবধর্মের এই রূপটির আভাস অষ্টাদশ ঊনবিংশ শতকের মন্দির-টেরাকোটায় উদ্ভাসিত। বাংলা কাব্য-সাহিত্যের প্রেরণা যেমন সক্রিয় ছিল এগুলির বিষয়বস্তুর পশ্চাতে, বাংলার কুমোরদের পুতুল গড়ার স্টাইলটিও তেমনি এযুগের টেরা-কোটার রূপারোপে উদ্ভাসিত হয়েছিল। এযুগের মন্দির এবং

৩০, আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনে (বিষ্ণুপুর) সংরক্ষিত টেরাকোটার তালিকা পরিশিষ্টে দ্রষ্টব্য।

৩১, অষ্টাদশ ঊনবিংশ শতকের মন্দির লিপি :-

১) কোঙারপুর।। (কোতুলপুর থানার অন্তর্গত জয়রামবাটীর অদূরে সিহড় ও কোঙারপুর পাশাপাশি গ্রাম)

মন্দির টেরাকোটার নির্মাতারা যে স্থানীয় এবং আঞ্চলিক তা ১৮-১৯শ শতকের মন্দির লিপিগুলি থেকে সুস্পষ্টরূপেই বোঝা যায়।[৩১] আগেই বলা হয়েছে এসময় বিষ্ণুপুর ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেও বেশ কিছু মন্দির-শিল্পী-কেন্দ্র গজিয়ে উঠেছিল। বাঁকুড়া-জেলার বিষ্ণুপুর মহকুমার অন্তর্গত বালসী, বৈতল, সোনামুখী, বোলাড়া ইত্যাদি অঞ্চলে এবং মেদিনীপুরের চেতুয়া-দাসপুর অঞ্চলে এসব শিল্পী-কেন্দ্রের সন্ধান পাওয়া যায়। বলাবাহুল্য সতেরোর শতকের ছন্দ-গীতিময় সমৃদ্ধ স্টাইলটি এই শতকেই অপসৃত হয়। শ্যামরায় জোড়বাংলার পরই এর অপসৃয়মান দ্যুতির ক্রমহ্রাসায়মান জ্যোতি সতেরোর শতকেরই শেষের দিকের মন্দিরগুলিতে অনুভূত হয়। পশ্চিমবঙ্গের বিষ্ণুপুরের শ্যামরায় মন্দিরে এই স্টাইলটির সমুচ্চ বিকাশ—হাজার হাজার টেরাকোটায় এর বিচিত্র বিস্তার-জোড়বাংলায় তার অভিনব বিবর্তন এবং বিষ্ণুপুরের মদনমোহন মন্দিরে এই ঋদ্ধ কলাকৃতির অবসান। চেলিয়ামার (পুরুলিয়া) শ্রীরাধাগোবিন্দ মন্দিরে এই অন্তরাগেরই আলাপন। সতেরোর শতকের ঘুরিষা (বীরভূম) এবং অনন্তবাসুদেব (হুগলী) মন্দিরেও এই রীতির স্বাক্ষর অনভিজ্ঞ দৃষ্টিতেও অনুভূত হয়। এমন্দিরগুলি সবই সতেরোর শতকের। বিষ্ণুপুরে এর আয়ুষ্কাল ৫০।৬০বছরের, অন্যত্রও ১৬৯৬-৯৭ পর্যন্ত এর অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। কাজে কাজেই মনে হয় এ স্টাইলটি আগন্তুক কোন কেন্দ্রীয় স্টাইল। এ স্টাইলটি রেখায় রঙে সতেরোর শতকের বিষ্ণুপুর অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত পাটাচিত্রে অধিকতর সুস্পষ্ট। বীরহাম্বীরের বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণকে কেন্দ্র করে এ অঞ্চলের

সন ১১৯২ সন। উদযোগী শ্রীকৃষ্ণকান্ত/মুখোপাধ্যায়/শ্রীরামমোহন মিস্ত্রি/ সাং বাখাটি (বাখাটি কোন্নগরপুরের প্রায় ৪।৫ মাইল পশ্চিমে হুগলী জেলার বদনগঞ্জের কাছের এক গ্রাম)।

২) আকুই (থানা ইন্দাস) এর মন্দিরলিপি।। শ্রীশ্রীরাধাকান্ত জিউ/অশীতিতম শকাব্দে শ্রীল শ্রীরাধাকান্তস্য/শ্রীমন্দিরারম্ভ ইতি। সুভমস্তু সকাব্দা। / ১৬৮৩ মাহমাঘ ১৭ রোজ মন্দির আরম্ভ। / মহারাজা শ্রীযুত তিলোকচন্দ্র রায়স্য অধি / কার পরিচারক শ্রীকানুরাম দাস সাকিম / আকুই তস্যজায়া চাপা দাসি শ্রীশ্রী।চরণে য়র্পণ করিলেন।/ কারিগর শ্রীইস্বরি.....।

মিনিয়েচার-চিত্রকলার একটি বিবর্তিত রূপবিকাশ ঘটে। অন্তিম মধ্যযুগে পশ্চিমভারতীয় চিত্রশৈলী ভারতের বিভিন্ন লিরিককাব্যের প্রেরণার স্পর্শে বিবর্তিত হয়ে সরস ও কমনীয় রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল রাজস্থানী রীতিতে। বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন, শুদ্ধ মোগল-রীতির স্পর্শে পশ্চিম ভারতীয় বা গুজরাট-রীতি রাজস্থানীরীতিতে বিবর্তিত হয়। যে সমস্ত লিরিকের স্পর্শে এই রীতি-বিবর্তন সূচিত হয় তার মধ্যে বৈষ্ণব সাহিত্যেরই মুখ্য ভূমিকা। এই বিবর্তনের দৃষ্টান্ত কিছু গীতগোবিন্দের চিত্রে সুস্পষ্টরূপে ধরা যায় (আমেদাবাদের "লালভাই দলপৎ ভাই" সংগ্রহশালার "মেটা-সংগ্রহে" এই রীতি বিবর্তনের ধারাবাহিকতা সুন্দরভাবে দেখানো হয়েছে)। শুধু তাই নয় ষোড়শ সপ্তদশ শতকে নবোদিত রাজস্থানী রীতিতে রাজপুতানার প্রতিটি কেন্দ্রে বৈষ্ণবীয় চিত্রাবলী-অঙ্কণ বিশিষ্ট মাত্রা পেয়েছে দেখা যায়। শ্রীমদ্ভাগবত আর গীতগোবিন্দের শত শত চিত্র অঙ্কিত হয়েছে এই রীতিতে। এই কেন্দ্রীয় রীতি এ সময় ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে বৈষ্ণবকাব্য এবং তারই

সাকিম বল্যাড়া সংস্পূর্ব সকাব্দা ১৬৮৬ ॥

(৩) বাঁশদহ (বিষ্ণুপুর-খড়্গপুর বাসরাস্তার উপর) তাঁতিদের রাধাদামোদর মন্দিরের প্রতিষ্ঠা লিপি :-

শ্রীশ্রীরাধাদামোদর / সকাব্দা ১৭৬৭ মাহ / আশ্বিনে ২৫ রোজ শুক্র / বার দিবসে আরম্ভ / সন ১২৫২ সাল ১৭৬৮ / মাহ আসাড় ২১ রোজে / সণিবারে প্রতিষ্ঠা সন / ১২৫৩ সাল কৃত শ্রীগুরু / চরণ দাস কারিগর দাঁগর / শ্রীনারায়ণ মিস্ত্রি সাকিম বালসি ॥

ভাগলপুর (কোতুলপুর থানা) রায়দের প্রতিষ্ঠিত (৺নবকৃষ্ণ রায় প্রতিষ্ঠিত) কৃষ্ণরায় জীউর দক্ষিণমুখী (১৭১৫ শকাব্দে ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে) ইঁটের দালান মন্দিরের খিলানের উপর নিবদ্ধ তিনটি লিপি। ১) এই দালানের/ মিস্ত্রির শ্রী / সাফল্ব রা / ম দে পরগণে / বায়ড়া সাকি / ম কানপুর। ২) এই দালানের রাজ / মান (?) শ্রীশ্রীকৃষ্ণ / রায় জিউ সকা / ব্দা ১৭১৫ সত্তে / র স / ও পোনের / তে এই দালান / নির্মাণ হইল। ৩) এই দালানের / মোহোরির / শ্রীত্রৈলক্য / রাম রাঅ / সাং বাগলপুর।

আনুষঙ্গিক নায়ক-নায়িকা-চিত্রকে অবলম্বন করে। এই কেন্দ্রীয় স্টাইলটি গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের চিত্রভাষা হয়ে এখানে এসেছিল— যেমন এসেছিল কেন্দ্রীয় ধ্রুপদ তার সাঙ্গীতিক আকাঙখাকে রূপ দিতে। কিংবা ক্লাসিক শাস্ত্র-সাহিত্য সম্ভব করেছিল এর দার্শনিক রূপবিকাশ। ক্লাসিক-সংস্কৃতি-নির্ভর গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম সব ক্ষেত্রেই তার বিকাশের মাধ্যমরূপে কেন্দ্রীয় ক্লাসিক সংস্কৃতিকেই অবলম্বন করেছে একথা আগেই বলা হয়েছে। অন্তিম-মধ্যযুগে বিকশিত "রাজস্থানী-শৈলী"কে যথার্থ ক্লাসিক শৈলী বলা যায় না ঠিকই কিন্তু এতে ক্লাসিক উপাদান সম্পূর্ণ অনুপস্থিত নয়। এই ঋদ্ধ স্টাইলের মধ্যে লোকশৈলীর অনুপ্রবেশ সত্ত্বেও প্রাচীন ক্লাসিক ঐশ্বর্যের ঐতিহ্য দুর্নিরীক্ষ্য নয়।

বিষ্ণুপুরে এই "মিনিয়েচার-চিত্র" যে প্রবর্তিত হয়েছিল কিছু বিবর্তিত রূপে তা এখানের পাটা-চিত্রগুলি থেকেই বোঝা যায়। এ বিবর্তনের কারণ হ'ল পশ্চিমবাংলার পশ্চিমের জেলাগুলিতে যে গুজরাটি বা পশ্চিমভারতীয় অপভ্রংশ-শৈলী বিরাজ করছিল তা এখানে দীর্ঘ অবস্থানের ফলে এখানের লোক শৈলীর সতত সঞ্চরণশীল রেখার প্রভাবে অনেকাংশে কমনীয় ও নমনীয় হয়েছিল। তার আপাত রুক্ষতা এবং কৌণিকতাও হ্রাস পেয়েছিল। বীরহাম্বীরের সময়ের কিছু পাটায় গুজরাটি এবং লোকশৈলীর মিশ্র প্রভাবের আভাস লক্ষ্য করা যায়। একদিকে গুজরাটির বর্ণাঢ্য চারুচিত্রণ

জিরট্যা (বাঁকুড়া জেলার কোতুলপুর থানা : জয়রামবাটীর নিকট) / এখানের রায়দের নির্মিত শ্রীশ্রীদুর্গা মন্দিরের লিপি। এই দালান জগন্নাথ রায়ের যত্নে প্রস্তুত হইল। সমাপ্ত ১২৯৭ সাল। মিস্ত্রি শ্রীপানাউল্যা কাজি দিং। সাং তাজপুর।

ময়নাপুর ।। (কামারপাড়ার কর্মকারদের মন্দির) শ্রীশ্রীরাধাদামোদর জীউ। শকাব্দা ১৭৬৬ শক / সন ১২৫২ সাল তাং / ১৩ চৈত্র সমাপন হ / ইল শ্রীগঙ্গানারায়ণ / মিস্ত্রি কৃত ইতি।

সোনামুখী : শ্রীধর মন্দির।। সকাব্দা ১৭৬৭ বাং ১২৫২ সাল ... শ্রীধর মন্দিরং .... পঞ্চবিংশতিচূড়কং কানাঞি রুদ্রদাসেন তন্তুবায়েন যত্নতঃ নির্মায়িতং বরং সৌধং নানাচিত্র সমন্বিতং ... হরিসূত্রধরেণ বিনির্মিতং।

অন্যদিকে দ্রুত সঞ্চরণশীল রেখার তরঙ্গ ভঙ্গ।[৩২] ক্রমশঃ এই রেখার অস্তিত্ব স্পষ্টতর হয়েছে বিষ্ণুপুরের দশাবতারতাসে এবং এর পূর্ণতম বিকাশ ঘটেছে কালীঘাটের পটে।

যাইহোক, বিষ্ণুপুরের সতেরোর শতকের মন্দির টেরাকোটার অনেক টালিতে অসামান্য নির্মাণ চাতুরীর সঙ্গে প্রবহমান রেখার বিচিত্র বিন্যাস সহজেই লক্ষ্য করা যায়। রেখার তরঙ্গবিভঙ্গে একদিকে যেমন যুদ্ধ তাণ্ডবের উত্তেজনা উন্মাদনা নিঃশব্দ উচ্চারিত হয়েছে, অন্যদিকে ছন্দ-গীতিময় মাধুর্য মণ্ডিত চিত্রগুলিতে তেমনি ছন্দোবদ্ধ সঙ্গীত মূর্ছনা দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপারোপে অনায়াসে আভাসিত হয়েছে। বহিরঙ্গ গুজরাট বা মোগল-পারসিক উপাদান তো ভূরি ভূরি। আগেই বলা হয়েছে এই ঋদ্ধ কেন্দ্রীয় স্টাইলটি সতেরোর শতকের পরে অস্তমিত। মন্দির টেরাকোটায় এবং পুঁথি পাটাচিত্রে। পরিবর্তে তার স্থান নিয়েছে আঞ্চলিক লোকায়ত শিল্পোদ্যোগ। প্রাচীন-কাল থেকেই ভারতে এমনটি দেখা যায়। প্রাচীন যুগেও আগন্তুক কেন্দ্রীয় স্টাইলের পাশাপাশি আঞ্চলিক শিল্পরীতির বিকাশ দেখা যেত। প্রাচীন যুগের এবং মধ্যযুগের প্রচুর লিপিতে ভ্রাম্যমান বহিরাগত এবং স্থানীয় শিল্পীদের নাম থেকে বোঝা যায় উত্তম এবং দক্ষশিল্পীদের মাধ্যমে ভারতের মণ্ডনসমৃদ্ধ এবং ঐতিহ্যমণ্ডিত কেন্দ্রীয় শিল্পশৈলীগুলি সারা ভারতেই ছড়িয়ে পড়ত।

বিষ্ণুপুরের সপ্তদশ শতকের মন্দির-টেরাকোটার মণ্ডলসমৃদ্ধ সুচারু শিল্পশৈলীটির ক্ষণস্থায়ী অবস্থিতির জন্যই শুধু নয় এ যুগের (১৭শ শতকের) মন্দির-টেরাকোটার শিল্পকৃতিকে বহিরাগত বলার অন্য একটি কারণ হল এই চিত্রসজ্জার সামগ্রিক প্রেক্ষাপট। এটি

---

32. "It is also probable that the transition had already started with some of the wooden patas or covers of the time of Birhambir, the Malla king of Vishnupur in the present district of Bankura, which contained Briliantly coloured and gracefully delineated illuminations on Vaisnava subjects. These paintings occupy a pesition half way between the pats drawn in the Gujarab

দিল্লীকেন্দ্রিক মুঘল ভারতের সামন্ততান্ত্রিক প্রেক্ষাপট। একথা সর্বজনবিদিত যে, মধ্যযুগের ভারতের সামন্ততান্ত্রিক প্রেক্ষাপটেই ভক্তিধর্মের সমুচ্চ বিকাশ ঘটে। শ্রীচৈতন্যের গৌড়ীয় ভক্তিধর্মের দার্শনিক বিকাশ তারই এক পরবর্তী পর্যায়। আগেই বলা হয়েছে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম দর্শনকে সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে প্রতিষ্ঠা করার জন্য শ্রীচৈতন্যের নির্দেশেই গোস্বামীরা বৃন্দাবনে কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন।

মধ্যযুগে, দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে, সুলতানী আমলে, মধ্য এবং পশ্চিম এশিয়া থেকে মোঙ্গল, আরব, পারস্য, তুরস্ক, প্রভৃতি দেশের ভাগ্যান্বেষী জনগোষ্ঠী দিল্লীর দরবারে ভিড় করে। প্রথম দিকে এরা দেশীয় মানুষের কাছ থেকে সরে থেকে নিজেদের জাতিগত সাংস্কৃতিক-স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে চাইলেও কালক্রমে দেশীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সংমিশ্রণে একটি মিশ্রসংস্কৃতির বিকাশ ঘটে দিল্লীর দরবারকে কেন্দ্র করে। ইন্দো-পারসিক সংস্কৃতির একটি পরিমণ্ডল ভারতের সংস্কৃতি ক্ষেত্রে আভাসিত হয়। বিষ্ণুপুরের প্রথমের দিকের দুটি প্রধান টেরাকোটা-মন্দিরে এই প্রেক্ষাপট প্রসারিত। নবোদিত ভক্তিধর্মের সমাহারে রচিত এই প্রেক্ষাপট সামন্ততান্ত্রিক হওয়ায় এগুলিতে যুদ্ধ-বিগ্রহেরই প্রাধান্য। টেরাকোটা-চিত্রে পৌরাণিক সমর-সজ্জার যেমন বিপুল বিস্তার, পাশাপাশি তেমনি বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর সৈন্যসামন্তের সমাবেশ। পাদুকা-পাগড়ী-জামা-পায়জামা কোমরবন্ধে মুঘল ভারতের ইন্দো-পারসিক ছাপ। হিন্দু-পুরাণ

---

style and the later pats of Bengal as found during the last few centuries in as much as they resemble the former in their colour scheme but their brush lines are softly curved and not angular or pointed. The traditional Dasavatara playing cards too of Bankura......................
.........display a similarity with the later pats in respect with the technique of painting"

KRISHNA in the traditional painting of Bengal
Bholanath Bhattacharyya. P. 26 1972.

এবং মহাকাব্যের বিশেষ করে রথী-মহারথীদের অঙ্গে ও মস্তকে জামা-পায়জামা আর জাহাঙ্গীরী (বা মুঘলাই) তাজ পরিয়ে মোগল-সামন্ত-তন্ত্রের আনুগত্য লাঞ্ছনে টেরাকোটা-মূর্তিগুলিকে চিহ্নিত করে যেন সামন্ততান্ত্রিক বাতাবরণটিকেই টেরাকোটা-চিত্রজগতে সযত্নে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আনুষঙ্গিকভাবে স্থান পেয়েছে সদম্ভ সামন্ত-শাসন আর তাদের বল্গাহীন ভোগবিলাসের চিত্রগুলি। সমসাময়িককালের দরবার আর হারেমের চিত্র। অনেকে মনে করেন, মোগল যুগে সমসাময়িক পারস্য দরবারের সীমাহীন বিলাস-ব্যসনের অনুসরণে রচিত এক ধরণের চিত্র খুব জনপ্রিয় ছিল। এ ধরণের চিত্র গোলকুণ্ডা বা মোগল-ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রস্তুত একধরণের সুতী পর্দায় চিত্রিত হয়ে বাইরে পারস্য প্রভৃতি স্থানে রপ্তানী হ'ত। আমেদাবাদের (গুজরাট) "ক্যালিকো-মিউজিয়ামে' এর নমুনা দেখা যায়। চারিত্র-বৈশিষ্ট্যে বিষ্ণুপুরের সতেরো-শতকের মন্দির-টেরাকোটার আলোচ্য চিত্রগুলি ঐসব চিত্রের সগোত্র বলেই মনে হয়। এরকম ধারণার অপর একটি সূত্র হ'ল জোড়বাংলা মন্দিরের পশ্চিমের দেওয়ালের প্রায় ভিত্তিসংলগ্ন পাটিতে চিত্রিত "পর্তুগীজ-রণতরী"র চিত্রমালা। "পর্তুগীজ রণতরী" এ যুগের (১৭ শ শতক) এবং পরবর্তীযুগের বহু মন্দিরেই একটি জনপ্রিয় বিষয় রূপে স্থান পেয়েছে। বিভিন্ন মন্দিরে এ সব রণতরীর আকার অবয়ব বিভিন্ন ধরণের। "পর্তুগীজ-রণতরীর" বিষয় অবলম্বন করে নৌশিল্পের নানা ধরণের বিবর্তন-বৈচিত্র্যকে মন্দিরে মন্দিরে আভাষিত করার ও চেষ্টা হয়েছে দেখা যায়। সংগ্রাম সংঘর্ষের চিত্রগুলিকেও বিভিন্নরূপে রচনা করা হয়েছে। এদিক থেকে বিষ্ণুপুরের জোড়বাংলা মন্দিরের সঙ্গে বাঁশবেড়িয়ার অনন্ত বাসুদেবের মন্দির টেরাকোটার পার্থক্য আছে—পার্থক্য আছে পরবর্তীকালের মেদিনীপুর, বর্ধমানের চিত্রগুলিতে। কিন্তু আমাদের প্রসঙ্গ ভিন্ন বিষ্ণুপুরের জোড়বাংলা মন্দিরের "পর্তুগীজ রণতরী" সিরিজের একটি টেরাকোটা-চিত্রের কোণে গীটার জাতীয় একধরণের বাদ্যযন্ত্র হাতে সপক্ষ এক মৎস্যনরের পাগড়ী পরা বিচিত্র মূর্তি লক্ষ্য যায়। এ জাতীয় মূর্তি-চিত্র পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের বঙ্গে প্রস্তুত পর্তুগালের বাজারে রপ্তানীযোগ্য "একরকম" কাপড় বা চাদরে মুদ্রিত বা বোনা

হত। আমেদাবাদের "ক্যালিকো-মিউজিয়ামে" তারও নমুনা দেখা যায়। এসময় (সপ্তদশ-শতকে) বা সমসাময়িককালে গুজরাট এবং বঙ্গদেশের শহরগুলির, ভারতের বস্ত্র ব্যবসায়ে যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল তা সমসাময়িককালের ইতিহাস থেকেও জানা যায়। এই সব সৌখীন সুতী বস্ত্র, রেশম, ভেলভেট ইত্যাদির চাহিদা ভারতের ভিতর এবং বাইরের দরবারগুলিতে যে ক্রমবর্ধমান ছিল তাও ঐতিহাসিক ঘটনা।[33]

জোড়বাংলার ভিত্তিমূল বেষ্টন করে রচিত পটিতে সামন্ত বা অমাত্যদের বিস্তারিত জীবন-চিত্রগুলিতেও সমসাময়িককালের ইতিহাসের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। মোগলযুগের ইতিহাসে অমাত্য জীবনের যে লিপিচিত্র রয়েছে এই টেরাকোটা-চিত্রগুলি যেন তারই প্রতিচ্ছবি। ইতিহাসের বর্ণনায় দেখা যায়, 'পত্নীছাড়া অমাত্যদের পোষাপ্রাণীর সংখ্যাও কম ছিল না। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, দায়ুদ খাঁ তাঁর বাঘ, বাজপাখী, শোনপাখী, প্রভৃতি পোষা প্রাণীগুলির জন্য বৎসরে ২,৫০,০০০ টাকা ব্যয় করতেন। জোড়বাংলা মন্দিরের ভিত্তিমূলের টেরাকোটায় সামন্ত বা অমাত্যদের প্রচুর পত্নী এবং অন্তঃপুরচারিকা বাঁদী ছাড়া বাজপাখী শোনপাখী হাতে রাজপুরুষ বা রমনীদেরও দেখা যায়। পাখীছাড়াও বিভিন্ন ধরণের পোষা-পশুও দেখা যায়। মুঘল-রাজপুত চিত্রের অনুকরণে রচিত বেশ কিছু শিকার-চিত্রও এখানে রয়েছে। শুকর শিকারের' একটি চিত্রে এসব রীতির কোন কোন চিত্রের হুবহু অনুকরণ লক্ষ্য করা যায়।

বার্ণিয়ের লিখেছেন— তাঁদেরকে (অভিজাত অমাত্যদেরকে) কখনও উত্তমবস্ত্র পরিহিত অবস্থা ভিন্ন গৃহের বাহিরে দেখা যায় না। কখনও হস্তী, কখনও অশ্ব, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে অশ্বারোহী ও পদাতিক

---

33. The towns of Gujarat and Bengal, produced a variety of textiles, white cotton, silk, velvet, quilts etc. The cambay cottons here renowned in the textile trade for their quality, abnndance and cheapness. Towns became centres of both internal and external trade. Internal

ভৃত্য পরিবৃত অবস্থায় পাল্কীর মধ্যে দেখা যায়। এসব পাল্কীও ছিল বিশেষ ধরণের (Specially designed palanquin) শ্যামরায় মন্দিরের কেন্দ্রীয় চূড়ার ভিত্তিমূলে (দক্ষিণ দিকে) এবং মদনমোহনের মন্দিরের সম্মুখস্থ নাটমন্দিরের ভিত্তিসংলগ্ন পটিতে এ ধরণের চিত্র দেখা যায়। এগুলি যেন বাণিয়ের উক্তির প্রতিচ্ছবি। সুসজ্জিত অশ্ব (বিশেষ জাতের), বিচিত্র বিদেশী পোষাক-পাগড়ীতে ভূষিত-অশ্বারোহী এবং অশ্ব-ব্যবসায়ী বলে অনুমান করা যায়, এমন একাধিক চিত্রও শ্যামরায়ের কেন্দ্রীয় চূড়ার ভিত্তি মূলে দেখা যায়। এখানের কেন্দ্রীয় চূড়ার ভিত্তি মূলে রয়েছে একটি চিত্তাকর্ষক প্যানেল। প্যানেলটিতে প্রথমেই দেখা যায় ঘোটক-ব্যবসায়ীর (বা অশ্বারোহী) চিত্র। তাঁর পরেই রয়েছে কারুকার্যময় কামিজ ও চোস্ত পরিহিতা অবগুণ্ঠনবতী সম্ভ্রান্ত এক মহিলার পাশে শ্মশ্রু-গুম্ফ মণ্ডিত-বিচিত্র পাগড়ী-পায়জামা-জোব্বা পরিহিত সম্ভ্রান্ত পুরুষ পুরুষটির হাতের মুদ্রায় আবেগাপ্লুত ভঙ্গিমা, রমনীর হাতে সুরাপাত্র (?)। তার পাশেই আর এক বিদেশী সম্ভ্রান্ত (হাতে ছড়ি বা অস্ত্র) মানুষের পাশে জপমালা হাতে এক ফকিরের সঙ্গে এক সারেঙ্গী বাদক। সকলের অঙ্গে এবং মাথায় বিদেশী পোষাক আর টুপি। মোঘল যুগের আগেই পারস্য থেকে কবি-দার্শনিক, সুফী ফকির ভারত তথা বাংলায় আসতো। এই টেরাকোটা মূর্তিগুলি যেন আগন্তুক বিদেশী জনপ্রবাহেরই এক অংশ। বিদেশী-আমীর-ওমরাহ এবং সৈন্যসামন্তের ছবিও প্রচুর। টেরাকোটায় চিত্রিত সৈন্যসামন্তদের পোষাক এবং মুখাবয়বেই যে শুধু বিদেশী (তুর্কী, আফগান, মোঙ্গল ইত্যাদি) ছাপ লক্ষ্য করা যায় তাই নয়, যুদ্ধ চিত্রগুলিতেও তুর্ক-আফগান মেজাজ। অশ্বারোহী সৈন্যের ক্ষিপ্র-আক্রমণ-পদ্ধতি বিচিত্র টেক্‌নিকে পরিস্ফুট করেছেন

---

consumption of luxury articles were increased by growing demand of the court which was emulated by the aristocracy in the provincial capitals and the border kingdoms.— A HISTORY OF INDIA (Vol. I) ROMILA THAPER. (Penguine Books 1986) P. 295.

শিল্পী। অনেক টেরাকোটা-চিত্রে দ্রুত-অশ্ব-চালনার ইঙ্গিত দিতে শিল্পী পারসিক চিত্রের টেক্‌নিক গ্রহণ করেছেন। ছুটন্ত অশ্বের পাশে অনুরূপ গতিতে ছুটন্ত হাউন্ড-কুকুরের চিত্র উৎকীর্ণ করা হয়েছে। হাতীর পিঠে চড়ে যুদ্ধের একাধিক চিত্রও এখানে লক্ষ্য করা যায়। এরই মধ্যে একটি চিত্রে উৎক্ষিপ্ত হস্তীর স্বাভাবিক শক্তিমত্তা শিল্পী অসাধারণ দক্ষতার সঙ্গে ফুটিয়ে তুলেছেন। মাহুতের অঙ্কুশ-বিদ্ধ উত্তেজিত হাতী অবলীলাক্রমে একটি ঘোড়াকে শুঁড়ে জড়িয়ে আছাড় মারতে উদ্যত হয়েছে দেখা যায়। ভারতীয় যুদ্ধ বিগ্রহে হাতীর ব্যবহার সুপ্রাচীন। ঘোড়ার মত ক্ষিপ্র না হ'লেও বিশালদেহী এই প্রাণী তার অসাধারণ শক্তিমত্তা যুদ্ধের উন্মাদনায় এক নূতন-মাত্রা যোগ করে।

টেরাকোটায় পর্তুগীজ রণতরীর কথা আগে একাধিকবার বলা হয়েছে। মোগল যুগের পর্তুগীজ-সমস্যা শাহ্‌জাহানের আমলে নূতন এক মাত্রা পেলেও তারপূর্বে বহুদিন ধরেই ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে পর্তুগীজ-সমস্যা বর্তমান ছিল। ১৪৯৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের পশ্চিম উপকূলেই বাণিজ্য করার উদ্দেশ্য নিয়ে ভাস্কো-ডা-গামার আবির্ভাব। পর্তুগীজরা তাদের বাণিজ্য কেন্দ্র বা উপনিবেশ গড়ার জন্যে যুদ্ধ করতেও প্রস্তুত ছিল। গুজরাট-উপকূল বিশেষ করে কাম্বে, ভরোচ তাদের কাছে লোভনীয় ছিল। এখান থেকে তারা বিদেশে ভারতীয় মাল রপ্তানী করত। বঙ্গদেশের একাধিক টেরাকোটা-মন্দিরে পর্তুগীজ রণতরীর চিত্র থাকলেও বিষ্ণুপুরের জোড়বাংলার চিত্রটি যে ইঙ্গিত-পূর্ণ তা আগেই বলা হয়েছে। এখানে 'রণতরী-প্যানেলের' পাশে গীটার হাতে মৎস্যনারীর চিত্রটি বঙ্গে-প্রস্তুত, পর্তুগালে রপ্তানীযোগ্য বস্ত্রের-উপর ছাপা চিত্রগুলির প্রায় সমগোত্রীয়। আমেদাবাদের ক্যালিকো-মিউজিয়ামে সংরক্ষিত এই বস্ত্র খণ্ড থেকে পশ্চিমভারতের মাধ্যমে পর্তুগীজ বাজারের সঙ্গে বঙ্গের বস্ত্র ব্যবসায়ের ইঙ্গিত পাওয়া যায়।[৩৪] অপরিমিত জাঁক-জমক, বাদশাহ অমাত্যদের বিলাস-ব্যসন আর শক্তিমত্তার দাম্ভিক-প্রদর্শন, পত্নী-উপপত্নীপূর্ণ হারেম,

৩৪. আমেদাবাদের মিউজিয়ামে সংরক্ষিত বস্ত্র খণ্ডের চিত্র সম্বলিত 'ফোল্ডারে' লেখা আছে:—Quilted hanging made for the Portuguese market,

মধ্যযুগের সামন্ত-জগতেরই চিত্ররূপ। এর সূচনা ১৩শ শতকে তুর্ক-আফগান আক্রমণ ও তাদের ভারত বিজয় থেকেই। এই তুর্ক-আফগানদের ভারত-বিজয়ের প্রভাব ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে যাই হোক, সংস্কৃতিক্ষেত্রে তাৎপর্যপূর্ণ এবং সুদূরপ্রসারী হয়েছিল। তুর্ক-আফগান-মোঙ্গল-আবিসিনীয় নানাজাতির ভাগ্যান্বেষী মানুষের ভিড় লেগেছিল সুলতানী যুগের প্রথম থেকেই। সুফী-সন্তদের ভারতে আগমনও মুঘলপূর্ববর্তীকালেই। মুস্লিম বা তুর্কীবিজয় থেকে ভারতের তথা বাংলার সংস্কৃতিতে যে বিচিত্র পরিবর্তন ঘটেছিল তা মোগল যুগে এক বিশিষ্ট পরিণতি বা মাত্রা লাভ করেছিল। তুর্ক-আফগানদের অবিরাম প্রয়াস সত্ত্বেও তারা ভারতবর্ষে কোন সাম্রাজ্য গঠন করতে পারেনি যা সম্ভব হয়েছিল মোগল যুগে। বিষ্ণুপুরের মন্দির এবং মন্দির-টেরাকোটা মোগল যুগের প্রেক্ষাপটেই বিকশিত হয়। এক সর্বভারতীয় কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে বিকশিত হওয়ায়, সুলতানী আমলে বা বঙ্গের স্বাধীন শাসনকর্তাদের আমলের বঙ্গীয়স্থাপত্যের উত্তরাধিকার লাভ সত্ত্বেও বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলি সূক্ষ্ম পার্থক্যের অধিকারী।

আগেই বলা হয়েছে, অবিরাম চেষ্টা সত্ত্বেও আফগানরা সাম্রাজ্য গঠন করতে পারেনি। ফলে আঞ্চলিক বা প্রাদেশিক রাজনীতি বা সংস্কৃতি এসময় এক বিশিষ্ট মাত্রা লাভ করেছিল। এই সময় (১৩-১৫শ) দিল্লী থেকে দূরবর্তী হওয়ায় বঙ্গের শাসনকর্তারা ক্রমশঃ বলিষ্ঠ হয়ে স্বাধীন হয়ে উঠেছিল। বাঙ্গলার সংস্কৃতিও এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব লাভ করে বিকশিত হয়েছিল। আগেই, এ যুগে ত্রিবেনীর জাফরগাজীর মসজিদ (ত্রয়োদশ) এবং চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকের গৌড়-পাণ্ডুয়ার স্থাপত্য শিল্পের বিচিত্র বিকাশের কথা বলা হয়েছে। মুস্লিম যুগে বঙ্গের স্থাপত্যকলাকে যে চারটি অধ্যায়ে যুগ-ভিত্তিক ভাগ করেছেন পুরাতাত্ত্বিকরা, তার চতুর্থ পর্যায়ে, বা মুঘল-রাজত্বে বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলি নির্মিত হয়েছে। তাই এখানের টেরাকোটা

---

cotton, embroidered with wild silk, from Bengal, early 17th century. Calico Museum of Textiles, Ahmedabad. যদিও এই বস্ত্রখণ্ড মুদ্রিত চিত্রের সঙ্গে সূক্ষ্ম পার্থক্য (পক্ষহীন) আছে তবু বিশেষ করে পর্তুগীজ রণতরীর পাশে এই চিত্র তাৎপর্যপূর্ণ।

ভাস্কর্যে এক সর্বভারতীয় সামন্ত-তান্ত্রিক বাতাবরণ।

এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে (ত্রয়োদশ থেকে ষোড়শ-সপ্তদশ) হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির সমন্বয় ঘটেছিল মূলতঃ স্থপতি-ভাস্কর ইত্যাদি সমাজের শিল্পী-সম্প্রদায়ের মধ্যে। সুফী প্রভাবিত-ভক্তিধর্মও মুখ্যতঃ সমাজের তথাকথিত নিম্নবর্গীয় মানুষের মধ্যেই অধিকতর বিস্তার লাভ করেছিল। পারসী শিক্ষায় শিক্ষিত উচ্চবর্গীয় সম্ভ্রান্ত মানুষের মধ্যে উদার সুফীধর্মের প্রভাব পড়লেও এঁদের অধিকাংশ সংস্কৃততে ছিলেন সুপণ্ডিত; তাই ভক্তিধর্মের সহজ রূপটি এঁদের মধ্যে স্থান পায় নাই; তার সংস্কৃতায়ণ ঘটেছিল এবং এইসব মানুষের মধ্যেই স্বাতন্ত্র্য রক্ষার সূক্ষ্মপ্রয়াসও দেখা দিয়েছিল। এঁরা প্রাচীন ক্লাসিক সাহিত্য-সংস্কৃতির দিকেই অধিক আকর্ষণ বোধ করেছেন দেখা যায়। রূপ সনাতন উভয়েই হোসেন শাহের দরবারে উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছিলেন এবং অবশ্যই ফারসীতে সুপণ্ডিত ছিলেন। অনেকে মনে করেন এঁদের উপরেও 'সুফী' প্রভাব পড়েছিল। কিন্তু এঁরা উভয়েই সংস্কৃততেও সুপণ্ডিত ছিলেন। তাই শ্রীচৈতন্যের ভক্তিধর্মে সুফী-প্রভাব পড়লেও তার ষট্‌গোস্বামী কৃত দার্শনিক কলেবরে ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতিরই প্রাধান্য। এই 'গোস্বামী-সিদ্ধান্তের' মুখ্য প্রেরণাতেই বিষ্ণুপুরের মন্দির-টেরাকোটার বিকাশ। তাই এখানের স্থাপত্যেই শুধু 'হিন্দু-রিভাইভ্যাল'এর এক সূক্ষ্ম ইঙ্গিত নেই, মন্দির-টেরাকোটাতেও ক্লাসিক-ব্রাহ্মণ্য–সংস্কৃতির স্মার্ত-পৌরাণিক রূপটির বিকাশ ঘটেছে। বৈষ্ণবধর্মের মাধ্যমে যে ক্লাসিক সংস্কৃতির পুনর্জাগরণ দেখা দিয়েছিল, বিষ্ণুপুরের মন্দির-টেরাকোটায় তা সুস্পষ্ট। কেন্দ্রীয় মোগল শাসনের অধীনে বিকশিত হওয়ায় মল্লভূমের শিল্পকলা আঞ্চলিকতা অতিক্রম করে সর্বভারতীয় আবেদন সৃষ্টি করেছে। মন্দিরগুলির স্থাপত্য-ভাস্কর্যে অতি সূক্ষ্ম হলেও বৈশিষ্ট্য বর্তমান। আগেই বলা হয়েছে, মোগল যুগে এক বিশিষ্ট রাজনৈতিক শাসনের প্রেক্ষাপটে নির্মিত হওয়ায় বিষ্ণুপুরের মন্দিরে বা মন্দির-টেরাকোটায় আঞ্চলিকতার পরিবর্তে অখিল ভারতীয় শিল্প-সাহিত্যের আবেদনই অধিকতর সুস্পষ্ট। যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম আর দর্শনের প্রেরণায় বিষ্ণুপুরের মন্দির আর মন্দির-টেরাকোটার বিকাশ তা বৃন্দাবনে ভক্তিধর্মের

সর্বভারতীয় এক প্রশস্ত প্রেক্ষাপটে জন্মলাভ করেছিল। সর্বভারতীয় পৌরাণিক-চিত্রগুলিকে অবলম্বন করেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের 'গোস্বামী সিদ্ধান্তের' গভীর দার্শনিকতাপূর্ণ 'ভক্তিতত্ত্ব' বিষ্ণুপুরের মন্দির-টেরাকোটায় প্রকাশিত হয়েছে। দানলীলা-নৌকালীলার মত কিছু লোকগীতি জনমনোরঞ্জনের জন্য গৃহীত হলেও মুখ্যতঃ শ্রীমদ্ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারতকে এক বিশিষ্ট আলোকে গ্রহণ করে 'গোস্বামী সিদ্ধান্তের' চিত্ররূপ রচিত হয়েছে এবং বিষ্ণুপুরের মন্দির-টেরাকোটায় তারই প্রতিফলন ঘটেছে। 'রাসলীলা' সারা ভারতের শাস্ত্রীয় ভক্তিধর্মের প্রধান-উপজীব্য। 'রাসমণ্ডলের একাধিক চিত্রদিয়ে রাসলীলার দার্শনিক-তত্ত্বকে ব্যঞ্জিত করে এবং শ্রীমদ্ভাগবতের তাৎপর্যপূর্ণ ভক্তিরসাত্মক চিত্রগুলিকে অবলম্বন করে শ্যামরায়ের মন্দিরে ভারতীয় শাস্ত্রীয় ভক্তিধর্মের তাৎপর্যই শুধু ব্যক্ত করা হয় নাই—সেগুলিকে 'গোস্বামী সিদ্ধান্তের আলোকে যেন বিশিষ্ট টীকা-টিপ্পনি যোগ করে উপস্থাপিত করা হয়েছে। এখানের টেরাকোটায় ব্যবহৃত অনেকগুলি ক্লাসিক চিত্রইগৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্মের নূতন আলোকে ব্যবহৃত হয়েছে। সর্বভারতীয় প্রাচীন ভক্তিধর্ম প্রকাশে আলোচ্য চিত্রগুলি গুপ্ত যুগ থেকেই চিত্র-ভাস্কর্যে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। আগেই বলা হয়েছে, গুপ্ত যুগে, প্রবর্তিত পৌরাণিক ভাগবদ্ধর্মের উত্তরাধিকার অনেকাংশে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে বর্তেছে। বৈষ্ণব-শৈব-শাক্তধর্মের সমন্বয়সূচক এক বাতাবরণ এখানের টেরাকোটার মাধ্যমে তাই উদ্ভাসিত। উমা-মহেশ্বর, হরিহর, মাতৃকাযুদ্ধ ছাড়াও গজেন্দ্র-গ্রাহ (গজেন্দ্র-মোক্ষ) পারিজাতহরণ, কালীয়দমন, প্রভৃতি সর্বভারতীয় ক্লাসিক-বৈষ্ণবীয় চিত্রগুলিকে 'গোস্বামী সিদ্ধান্তের' নূতন আলোকে প্রোজ্জ্বল করে বিষ্ণুপুরের মন্দির-টেরাকোটায় ব্যবহার করা হয়েছে। 'রাসমণ্ডলের' চিত্রছাড়াও শ্রীমদ্ভাগবতের অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ 'গোপীচিত্র'কে অবলম্বন করে 'গোস্বামী-সিদ্ধান্তের' 'দার্শনিক-ভক্তিতত্ত্বকে' উদ্ভাসিত করা হয়েছে এখানের টেরাকোটায়। 'ভারতীয় সঙ্গীতকলার' ক্লাসিক রূপটি ফুটিয়ে তুলতে শুধু ক্লাসিক নৃত্যরীতি বা শাস্ত্রোক্ত প্রাচীন বাদ্যযন্ত্রের (বিভিন্নপ্রকার বীণা, মৃদঙ্গ, মুরলী,) ইঙ্গিতে ক্লাসিক গায়নরীতিকেই

ব্যঞ্জিত করা হয়নি. 'বীণাধর-গন্ধর্ব' জাতীয় কিছু প্রাচীন-ক্লাসিক মোটিফের মাধ্যমে সঙ্গীতের শাস্ত্রীয় বাতাবরণটিকেই (গান্ধর্ববিদ্যা) আভাসিত করা হয়েছে এখানের টেরাকোটায়। বীণাধর-গন্ধর্বের প্রথাগত চিত্রগুলিকে প্রাচীনকাল থেকেই ভারতীয় চিত্র-ভাস্কর্যে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। রামায়ণ-মহাভারতের চিত্রও সুপ্রাচীন কাল থেকেই ভারতের এমনকি বহির্ভারতের হিন্দুমন্দিরের ভিত্তি-অলঙ্করণে প্রথাগতভাবেই ব্যবহৃত হয়েছে, দেখা যায়। বিষ্ণুপুরের মন্দিরেও তা ব্যবহৃত হয়েছে ভক্তিধর্মের বিশিষ্ট মাত্রাযুক্ত হয়ে। বিষ্ণুর কয়েকটি অবতার মূর্তি প্রাচীনকাল (গুপ্তযুগ) থেকেই ভারতীয় ভাস্কর্যে গৃহীত হয়েছে। রাজস্থানের দেওগড়ের মন্দিরে অনন্তশয়ন মূর্তিও দেখা যায়। অবতার মূর্তির পাশে এখানের টেরাকোটা-ভাস্কর্যের একাধিক স্থানে অনন্তশয়ন-বিষ্ণুমূর্তির উপস্থাপন কিন্তু মনে হয় জয়দেবের প্রলয়পয়োধি জলে·· ······ শ্লোকটিকে স্মরণ করেই। সর্বভারতীয় পৌরাণিক চিত্রগুলির পাশাপাশি বৈষ্ণব স্মৃতির উল্লেখও আছে এখানের টেরাকোটায়। হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য-ক্লাসিক মোটিফগুলির নৈষ্ঠিক উপস্থাপনে একদিকে বিষ্ণুপুরের মন্দির-টেরাকোটার আবেদন যেমন আঞ্চলিকতার ঊর্ধ্বে উঠে সর্বভারতীয় হয়েছে. অন্যদিকে তেমনি ক্লাসিক শাস্ত্র-সাহিত্যের বহুল ব্যবহারে নির্মিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের বেনামে উদ্ভূত হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য ক্লাসিক 'রিভাইভ্যাল'এর আভাস এখানে সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শুধু তাই নয়, গভীর তত্ত্বচিন্তা ও অসাধারণ বৈদগ্ধ্যের আলোকে উদ্ভাসিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মজ্জাগত প্রচ্ছন্ন নাগরিক আবেদনটিও এখানে সযত্নে রূপায়িত করার চেষ্টা হয়েছে। গোস্বামী-সিদ্ধান্তের সূক্ষ্ম বিচার বিশ্লেষণেই শুধু নয়, মণ্ডনসমৃদ্ধ রূপারোপেও আভিজাত নাগরিক বৈদগ্ধ্যের স্বাক্ষর সুস্পষ্ট। এটা সর্বজন বিদিত যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের দার্শনিক রূপলাভ ঘটেছিল নবদ্বীপ পুরী, বৃন্দাবনের মত অভিজাত নগরকেন্দ্রের প্রেক্ষাপটে এবং নাগরিক বুদ্ধিজীবীদেরই প্রযত্নে। সংস্কৃত ভাষার অবয়বে নির্মিত মূলতঃ হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির সমুন্নত অভিজাত প্রেক্ষাপটেই এধর্মশাখার বিকাশ এবং শাস্ত্রীয়-বৈষ্ণবধর্মের আনুগত্যেই এর

দার্শনিক পরিপুষ্টি। বিষ্ণুপুরের সপ্তদশ শতকের মন্দিরের টেরাকোটা-ভাস্কর্যে যেমন হিন্দু পুরাণের নৈষ্ঠিক অনুসরণে ক্লাসিক বাতাবরণ সৃষ্টির প্রয়াস, স্থাপত্য-কলাতেও তেমনি পুরাণোক্ত শিখররীতির অনুসরণ। 'শিখর-রীতি' ও তার প্রকারভেদের উল্লেখ আছে মৎস্যপুরাণে। 'মৎস্য-পুরাণে' শিখররীতির উল্লেখ দেখে অনেক পুরাতত্ত্ববিদ্ মনে করেন গুপ্তযুগে এবং তার পূর্ববর্তী-কালেও ভারতবর্ষে 'শিখররীতির' মন্দিরের প্রচলন ছিল। কারণ 'মৎস্যপুরাণের' রচনাকাল ধরা হয় খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতক। বিখ্যাত পুরাতত্ত্ববিদ্ কাশীপ্রসাদ জয়সওয়াল মনে করেন গুপ্ত এবং গুপ্ত-পূর্ব যুগে ভারতে শিখররীতির এক শ্রেণীর ইঁটের মন্দির ছিল। শুধু তাই নয়, জয়সওয়াল মনে করেন এগুলিতে এক বিশিষ্টরীতির 'খিলান' ও 'ভল্টের' ব্যবহারও হয়েছিল।

জয়সওয়াল এ প্রসঙ্গে বিহারের শাহাবাদ জেলার ইঁটের তৈরী দেওবারণক ও মহাদেও-মন্দিরের উল্লেখ করে বলেছেন যাঁরা মনে করেন মধ্যযুগের পূর্বে কোন শিখর মন্দির ছিলনা, গুপ্ত যুগের ইঁটের মন্দিরগুলি তাঁদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়।[৩৫]

যে যুগে শিল্প-সংস্কৃতির একটি সুনির্দিষ্ট 'মান' (Standard) সুস্পষ্টভাবে রূপলাভ করে, একটি দেশের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে তাকেই 'ক্লাসিক-যুগ' বলে। গুপ্ত যুগেই ভারতের স্থাপত্য-ভাস্কর্য তথা হিন্দু শাস্ত্র-সাহিত্যেরও একটি সুনির্দিষ্ট 'মান' নির্মিত হয়। তাই 'গুপ্তযুগ' 'ক্লাসিক যুগ'। যুগ ও কালভেদে এই ক্লাসিক সংস্কৃতির বিবর্তন ঘটলেও এটিই হয়ে ওঠে জাতির সাংস্কৃতিক সংস্কার।

ত্রয়োদশ-শতক থেকে ভারতের স্থাপত্য-ভাস্কর্যে মুসলিম প্রভাব গভীরভাবে পড়লেও এবং পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে বঙ্গে

---

35. Mr. Codrington in his Ancient India (with reference to architecture and plastic art) in describing the style of Gupta temples fixes his attention on only one style of Gupta buildings. When he says "there is no reason to believe that the sikhara............ existed before the medieval period" he ignores completely the brick-temples

মুসলিম স্থাপত্যের বিচিত্র বিকাশ ঘটলেও সপ্তদশ শতকে মুসলিম রীতির অনুসরণ করেও প্রাচীন শিখর-রীতির অনুবর্তন এবং হিন্দু স্থাপত্যরীতির আধিপত্য সূচিত হয়েছে বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের মন্দিরগুলিতে। যেমন সুফী প্রভাবিত মধ্যযুগের ভক্তিধর্মের এক বিবর্তিত রূপ নির্মিত হয়েছে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের গোস্বামী সিদ্ধান্তে হিন্দু-পুরাণ আর স্মৃতির আধিপত্যে। তাই বিষ্ণুপুরের মল্লরাজত্বের শিক্ষা-দীক্ষাতেই শুধু সংস্কৃত শাস্ত্র-সাহিত্যের ব্যাপক আধিপত্য সূচিত হয় নাই, টেরাকোটা-ভাস্কর্যেও ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির স্মার্ত-পৌরাণিক রূপটির সুস্পষ্ট প্রকাশ ঘটেছে। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের এই স্মার্ত-পৌরাণিক বাতাবরণ সামাজিক ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ-প্রভুত্বপূর্ণ শ্রেণীবিভক্ত সমাজ ব্যবস্থারই ইঙ্গিত দেয়। জয়সওয়াল কথিত শিখররীতির মন্দির মধ্যযুগে (নবম থেকে দ্বাদশ শতকে) দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে যে উল্লেখযোগ্যভাবে বিস্তার লাভ করেছে তা আগেই বলা হয়েছে। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের শিল্প (প্রবাসী ১৩৩৬) প্রবন্ধে এ অঞ্চলের কয়েকটি মন্দির-শিখরের সঙ্গে উড়িষ্যার কয়েকটি মন্দির-শিখরের সাদৃশ্যের উল্লেখ করে এখানের শিখর-মন্দিরের উপর উড়িষ্যার প্রভাব সুনির্দিষ্টভাবে দেখিয়েছেন।[৩৬]

শুধু স্থাপত্য নয়, দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের ভাস্কর্যের উপর উড়িষ্যার প্রভাবের অস্তিত্ব, কিছুটা বিতর্কিত হলেও (রাখালদাস তাঁর প্রবন্ধে এ প্রভাব স্বীকার করেন নাই) অনেক ঐতিহাসিক সমর্থন করেন। তাঁরা মনে করেন, উড়িষ্যার প্রভাবে বিকশিত এখানের ভাস্কর্যে একটি মিশ্ররীতির উন্মেষ ঘটেছিল। পুরুলিয়ার বোড়াম বা দেউলঘাটার বিখ্যাত দেবী মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তিতে তাঁরা

---

which were built in that age on definite arch and vault principles with prominent sikharas. If one looks at the Bodh-Gaya plaque printed on the first page of the journal of the Bihar and Orissa Research Society, all such idea about the non-existence of sikhara style before the medieval period will be finally removed.

এই মিশ্ররীতির প্রকাশ দেখেছেন।[৩৭] বিষ্ণুপুরের আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি-ভবনে সংরক্ষিত বৃহদাকৃতি গুরুভার কারুকার্যময় প্রস্তর খিলানের (কোন মূর্তির চালচিত্র বলে অনুমান করা হয়) শীর্ষদেশে লকুলীশ মূর্তির সুস্পষ্ট অবস্থানও নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। খিলানটির অলংকরণে উড়িষ্যার গভীর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। একসময় ডঃ কালিদাস নাগ এই পাথরের খিলানটি 'পরবর্তী-গুপ্ত' কিংবা পালযুগের প্রথম দিকের বলে অভিমত প্রকাশ করেন। এই 'খিলান'টি পাওয়া যায় বিষ্ণুপুরের অন্তর্গত জয়পুর থানার সলদা গ্রাম থেকে। এই সলদা গ্রামেই রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সংক্ষিপ্ত বাঁকুড়া পরিক্রমার কালে ল্যাটারাইট-পাথরে-উৎকীর্ণ একটি অষ্টাদশ শতকের লকুলীশ মূর্তি দেখে বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন। যে লকুলীশ উপাসনা বহুকাল পূর্বেই লুপ্ত হয়েছিল তার এত অর্বাচীন মূর্তি-প্রমাণ রাখালদাসের বিস্ময় উদ্রেক করেছিল। বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক অনেক পরবর্তীকালে সংগৃহীত এই খিলানটি তখন নিশ্চয় রাখালদাসের দৃষ্টিগোচর হয় নাই। মনে হয় খ্রীষ্টীয় নবম দশম শতকের কোন এক সময় উড়িষ্যা থেকেই পাশুপত শৈবধর্ম এ অঞ্চলে প্রবর্তিত হয়। বলাবাহুল্য বর্ধমান জেলার বরাকরের (বেগুনিয়া) প্রাচীনতম মন্দিরটিতেও লকুলীশ মূর্তি উৎকীর্ণ দেখা যায়। বরাকরের মন্দির উড়িষ্যারীতির রেখদেউল। বাঁকুড়া তথা দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গে কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ শৈবমূর্তিও দেখা যায়।[৩৮] বাঁকুড়া জেলার রাণীবাঁধ থানার সারেংগড় থেকে প্রাপ্ত বর্তমানে কলিকাতার "ভারতীয় জাতীয় সংগ্রহ শালায়" সংরক্ষিত হৃষীকেশ-বিষ্ণুমূর্তিটিও (নবমশতক) এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

The sikhara in the Bodh-Gaya plaque has even an arched door whereof the bricks in the fashion of Hindu arch construction is clearly visible in the original (Patna Museum). The plaque which is in terracotta bears an inscription in raised letters of the 2nd century Ad.

—Note on Terracotta Ramayana Panel. K. P. Jayaswal; Modern Review For August 1932 P. 148

মূর্তির পৃষ্ঠপটে বা চালচিত্রে আমলকশীর্ষ দেউলের অলংকরণ এবং পার্শ্বে গজ শার্দূল-জাতীয় মোটিফ উড়িষ্যার প্রভাবজাত বলে মনে করা অসঙ্গত নয়।

যাই হোক, ত্রয়োদশ শতক থেকে ষোড়শ শতক পর্যন্ত বঙ্গে মুস্লিম স্থাপত্য-চর্চার বহুল ব্যাপকতা সত্বেও তারই প্রেক্ষাপটে সপ্তদশ শতকে, বঙ্গীয় স্থাপত্য-চর্চার চতুর্থ পর্যায়ে, উড়িষ্যার প্রথাগত জগমোহন যুক্ত রেখদেউল এবং উড়িষ্যার ঐতিহ্যমণ্ডিত রেখ ও পীঢ়া দেউলের সমন্বয়ে রচিত শিখরযুক্ত রত্ন মন্দিরের প্রতি বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের ব্যাপক পক্ষপাত অনেকটা তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে হয়। উড়িষ্যার প্রাচীন স্থাপত্যরীতির পুনরাগমন যেন হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনেরই সূচক। রত্নমন্দিরে মুস্লিম স্থাপত্য-রীতির খিলান আর 'ভল্টের' উপর পৌরাণিক শিখররীতির আধিপত্য; বিষ্ণুপুরের রাসমঞ্চে চারদিক বেষ্টন করে খিলানের পর খিলান দিয়ে রচিত বারান্দায় 'আদিনা বড়সোনার' আবেদন সুস্পষ্ট হলেও দ্বিতলে পিরামিডাকৃতি শিখর বেষ্টন করে ইঁটের তৈরী দু-চালা, চার-চালা কুটিরের সমাবেশ যেন গম্বুজেরই প্রতিস্পর্ধী রূপান্তর।

মল্লরাজত্বে বিষ্ণুপুরের হাজরাপাড়ায় এবং ওন্দা থানার (বাঁকুড়া) বিক্রমপুরে নির্মিত দুটি জগমোহনযুক্ত রেখ দেউলের কথা আগেই বলা হয়েছে। অনুরূপ একটি জগমোহনযুক্ত রেখ দেউল রয়েছে কোতুলপুর থানার শিহড়ে। শিহড়ের বিখ্যাত শিবদেবতা শান্তিনাথের এই মন্দিরটি গঠনরীতিতে পূর্বোক্ত হাজরাপাড়া এবং বিক্রমপুরের রেখদেউল দুটি থেকে কিছুটা স্বতন্ত্র।

---

৩৬ মন্দিরগুলির শিখরের আকৃতি একেবারেই উড়িষ্যা দেশীয়। বহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের শিখর অসম্পূর্ণ ভগ্নদশা হইলেও মোটামুটি আকৃতি সেই একই রকমের। বর্ধমানের গৌরাঙ্গপুরের ইছাই ঘোষের মন্দিরেও বিশেষত্ব এই। বহুলাড়ার সিদ্ধেশ্বর মন্দিরের সম্মুখের গতানুগতিক বৃহৎ চৈত্য-বাতায়নের সহিত ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজ, কৃত্তিবাস এবং ব্রহ্মেশ্বর মন্দিরের শিখরের বাতায়নের সাদৃশ্য আছে। বিষয়টি নূতন এবং চিত্তাকর্ষক এবং ইহার সম্যক আলোচনা হওয়া দরকার।' —প্রবাসী, মাঘ ১৩৩৬ (২৯ ভাগ ২য় খণ্ড ৪র্থ সংখ্যা) দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের শিল্প: রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়।

মনে হয় উড়িষ্যারীতির জগমোহনযুক্ত দেউলের একটি ধারা মেদিনীপুর হয়ে কোতুলপুর থানায় এসেছিল। কোতুলপুর, সিহড় জিবট্যায় শিবদেউলের গায়ে অথবা সংযুক্ত জগমোহনে কোথাও কোথাও মিথুন মূর্তি'র অস্তিত্ব এ ধারণাকে বলবৎ করে। আর একটি লক্ষণীয় বিষয় ওন্দা-বিক্রমপুর বা বিষ্ণুপুর-হাজরাপাড়ার জগমোহনযুক্ত রেখ দেউলগুলি কৃষ্ণ বা বিষ্ণু মন্দির। কোতুলপুর থানার সিহড়ের মন্দির শিবমন্দির।

কিন্তু সপ্তদশ শতকে শুধু জগমোহনযুক্ত মন্দির রচনাই নয়. মল্লরাজারা এই জগমোহন রচনার ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও লক্ষণীয় বৈচিত্র্য সম্পাদন করেছেন। এসব ক্ষেত্রে উড়িষ্যারীতির জগমোহন রচনায় গৃহীত পীঢ়া-দেউলের পরিবর্তে রেখ দেউলকেই গ্রহণ করা হয়েছে। বিষ্ণুপুরের সন্নিকট মুনিনগরে (থানা বিষ্ণুপুর)

---

37. Before turning to the sculptural development of northern Bengal, mention should be made of a hybrid style complex which developed in some of the south western region of Bengal adjacent to Orissa..........— The district of Purulia (formerly Manbhum) has at various times been a part of Orissa or alternately part of Bengal. A distintive art style leaning heavily on Orissa formulations was in srong evidence in that region in approximately the 10-12 centuries at sites such as Boram. An image of Durga Mahisasura mardini, Purulia district typifies the Orissan influenced style of this region from approximately the late 11th or 12th century. Stiffness with broad heavy body style was frequently seen in the 11th century images from South Bengal."

(Studies in South Asian Culture Vol X the Pala Sena Schools of Sculpture Susan L. Huntington Stone Sculpture of Bengal & Orissa. Interface style P. 175-79)

রাধাকান্ত জীউ বিগ্রহের মন্দির নির্মাণে এই বিচিত্র স্থাপত্য কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে। এখানে উড়িষ্যারীতির রেখদেউলাকৃতি মূলমন্দিরটির সঙ্গে অন্তরালের সাহায্যে আর একটি হ্রস্বতর রেখ-দেউল যোগ করে জগমোহন রচনার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। বর্ধমান জেলার বৈদ্যপুরে অনুরূপ প্রয়াস লক্ষ্য করা গেলেও গঠনরীতিতে আপাত পার্থক্য বর্তমান। পীঢ়া দেউলেরও কিছু বৈচিত্র্য সাধন করা হয়েছে। বাঁকুড়া জেলার ওন্দা থানার অন্তর্গত বহুলাড়া ও সোনাতপল গ্রামের মধ্যবর্তী বেলাটুকুরী গ্রামের (বৌদ্ধগয়ার মূল মন্দিরটির সঙ্গে আকারগত কিছুটা সাদৃশ্যযুক্ত) বিচিত্র মন্দিরটিকে ডেভিড ম্যাককাচ্চন, উড়িষ্যার পীঢ়া-রীতির এক সম্প্রসারিত রূপ বলে অভিহিত করেছেন। মন্দিরটি বিরল বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। পাত্রসায়েরের (বিষ্ণুপুরের অন্তর্গত একটি থানা শহর) প্রসিদ্ধ শিবদেবতা কালঞ্জয়ের মন্দির এবং বিষ্ণুপুরের মুরলীমোহন মন্দিরে স্থাপত্যগত বৈচিত্র্য সৃষ্টির প্রয়াসও লক্ষণীয়। উড়িষ্যার রেখ আর পীঢ়া দেউলকে অবলম্বন করে বিষ্ণুপুরের মল্লরাজারা শুধু অসংখ্য মন্দির নির্মাণই করেননি তাঁদের পৃষ্ঠপোষকতায় এখানের শিল্পীরা মন্দির-স্থাপত্যে উড়িষ্যার উত্তরাধিকার গ্রহণ করেও নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছে। মল্লেশ্বরের প্রসিদ্ধ

---

৩৮ বেশকিছু উল্লেখযোগ্য শৈবমূর্তি দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের বাঁকুড়া-পুরুলিয়া-মেদিনীপুর-বর্ধমান অঞ্চলে দেখা যায়। বিষ্ণুপুরের (বাঁকুড়া) অন্তর্গত পাত্রসায়ের থানার কান্তোড়গ্রামে ষট্চক্রবাহিনী নামে পূজিত পাষাণ-চক্রমধ্যস্থিত অঞ্চলপ্রসিদ্ধ নটরাজ শিবমূর্তি এপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। রাখালদাস তাঁর দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গের শিল্প প্রবন্ধে (প্রবাসী ১৩৩৬) এই চক্রমধ্যস্থ শিবের নৃত্যমূর্তি সম্বন্ধে বলেছেন— 'এটি নবম শতকের পরের নয়।' এ মূর্তির বর্ণনা প্রসঙ্গে তিনি উড়িষ্যার 'কেদার-গৌরী' মন্দির থেকে সংগৃহীত অনুরূপ এক চক্রাকার নৃত্যমূর্তির উল্লেখ করে বলেছেন যে এ মূর্তির চেয়ে পাত্রসায়েরের কান্তোড়ের মূর্তি প্রাচীনতর। বলা বাহুল্য যে ভুবনেশ্বরের বৈতাল-দেউলের গাত্রে চক্রমধ্যে নটরাজের অষ্টভুজ মূর্তি উৎকীর্ণ দেখা যায়। বিষ্ণুপুরের অন্তর্গত জয়কৃষ্ণপুরে (ক্ষয়িত), বাঁকুড়ার ইঁদপুর থানার দেউলভিড়ায়, মেদিনীপুর সাহিত্য পরিষদের

শিব-দেউলটি মূলতঃ রেখদেউল হলেও গঠনে যেন একরত্নের আভাস। শিখর-বিন্যাসের ক্ষেত্রে প্রথমদিকে মুসলিম প্রভাবিত অষ্টকোণাকৃতি শিখর (শ্যামরায় মন্দিরের কেন্দ্রীয়চূড়া) লক্ষ্য করা গেলেও ক্ষিপ্রতার সঙ্গে অব্যবহিত পরেই উড়িষ্যার অনুসরণে 'রথ-পগের ব্যবহার করে উড়িষ্যা-রীতিরই শিখরে পরিণত করা হয়েছে। সপ্তদশ শতকের মুসলিম-প্রভাব-বহুল স্থাপত্যে একটি হিন্দু-সংস্কৃতির সংরক্ষণ প্রয়াস প্রাধান্য লাভ করেছে। শুধু স্থাপত্যেই নয় সপ্তদশ-শতকের টেরাকোটা-ভাস্কর্যেও উড়িষ্যারীতির প্রভাব দুর্নিরীক্ষ্য নয়। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের কেল্লা অঞ্চলে 'শ্যামকুণ্ডু' পুষ্করিনীর তীরে অবস্থিত ইঁটের দেউল-জোড়ার সর্বাঙ্গে একদা বিপুল সংখ্যক গজসিংহ মোটিফ লক্ষ্য করা যেত। উড়িষ্যা তথা ভারতের প্রসিদ্ধ দেবতা জগন্নাথ বলরাম সুভদ্রার টেরাকোটা মূর্তি শ্যামরায় মন্দিরের দক্ষিণের বারান্দায় রথ মধ্যে বিরাজিত। উড়িষ্যার শ্রীশ্রীজগন্নাথের রথযাত্রা মল্লভূমে কৃষ্ণবিগ্রহের সাড়ম্বর রথযাত্রায় পরিণত হয়েছে। এ সবই উড়িষ্যার হিন্দু ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির প্রভাব।

মন্দির-নির্মাণ মল্লরাজাদের শিল্পচর্চার নিদর্শন মাত্র নয়, প্রাচীন এবং মধ্যযুগের রাজা ও সামন্তদের মতই মল্লরাষ্ট্রনীতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। অশোকের ধর্ম-বিজয় আর গুপ্তরাজাদের রাজ্য-জয়ের সাক্ষ্যস্বরূপ বিষ্ণুধ্বজ স্থাপনের মত একই পদ্ধতি। বিষ্ণুপুরের রাজারা তাঁদের দ্রুত অপসৃয়মান প্রভুত্ব এবং ক্ষমতার ক্রমবিলুপ্তির যুগে, আর্থিক সঙ্কটের মধ্যেও প্রচুর সংখ্যায় মন্দির নির্মাণ করেছেন। কেল্লার অভ্যন্তরে রাজপুরীর সন্নিকটে মল্ল-ভূমের প্রখ্যাতদেবতা শ্রীশ্রীরাধাশ্যামের জীউএর অপূর্ব এবং সুবৃহৎ একরত্ন মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করেছেন মল্লরাজ চৈতন্য সিংহ অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে মল্লরাজাদের দুর্দিনে যখন মল্লরাজধানীর পূর্ব-দিকে বর্ধমান-রাজের ক্ষমতা বিকাশের প্রয়াস স্পষ্টতর হচ্ছে।

সংগ্রহে, এবং নারায়ণগড়ের (মেদিনীপুর) সন্নিকট (কাটাইখাল বাসস্টপে নামতে হয়) "বিদিশায়" (ডহরপুর থেকে প্রাপ্ত) এ ধরণের চক্রমধ্যস্থ নৃত্যমূর্তি দেখা যায়। বৃষবাহনের উপর নৃত্যরত শিবমূর্তিও এ অঞ্চলে একাধিক চোখে পড়ে। দুর্গাপুরের (বর্ধমান) সন্নিকট

বিষ্ণুপুরের অন্তর্গত ইন্দাস থানার আকুই গ্রামের কানুরাম দাসের মন্দির-লিপিতে বর্ধমান রাজের প্রভুত্ব বিস্তারের অশনিসংকেত লক্ষ্য করা যাচ্ছে। স্পষ্টই অনুমান করা যাচ্ছে বর্ধমান রাজের দামোদরের অপরতীরে ক্ষমতা সম্প্রসারণের সমুদ্যত প্রচেষ্টার। বলা বাহুল্য কানুরাম দাসের মন্দির-লিপিতে, পূর্বের নির্ভেজাল সংস্কৃত বয়ানের পরিবর্তে, বাংলার অবাধ মিশ্রণ মধ্যযুগের সামন্ত-আভিজাত্যের অবসানে নূতন-জমানার সূচনারই ইঙ্গিত দেয়।

মল্লরাজাদের মন্দির-কেন্দ্রিক রাষ্ট্রনীতিতে ব্রাহ্মণ-প্রভুত্ব সংস্কৃত-চর্চা এবং বর্ণ ব্যবস্থারই ইঙ্গিত। এখান থেকে সংগৃহীত হাজার হাজার সংস্কৃত পুঁথিই তার সাক্ষ্য দেয়। ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির ঐতিহ্যবাহী দার্শনিক তত্ত্বসমাকুল গোস্বামী (ব্রাহ্মণ) গুরুবাদ-প্রধান গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের গোস্বামী-সিদ্ধান্তের আচারনিষ্ঠ স্মার্তপৌরাণিক অত্যুগ্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপটি আদিবাসী অনার্য-কৌম অধ্যুষিত মল্লভূমের জনমানসে স্থান লাভ করে নাই। প্রশাসনে জটিল মোগল-সামন্তপ্রথা যেমন জনবিচ্ছিন্নতা এনে দিয়েছিল প্রতিরক্ষায় বহিরাগত তুর্কী অনুপ্রবেশ তেমনি আঞ্চলিক সামরিক বাহিনীকে অবিন্যস্ত করেছিল। 'আগাডোম বাগডোম' জাতীয় গণসেনার যুগের অবসান ত্বরান্বিত হয়েছিল। টেরাকোটায় তুর্কীসৈন্যের উজ্জ্বল উপস্থিতি থাকলেও ঐসব গণসেনাদের দেখা মেলেনা; সর্বত্র মোগল সামন্ত সংস্কৃতির জয়জয়কার। প্রাচীন যুগের পৌরাণিক যোদ্ধাদের মাথায় 'মোগলাই-তাজের' কথা আগেই বলা হয়েছে। কটিমাত্র বস্ত্র পরিহিত বাঘশিকারীর মাথাতেও (জোড়বাংলা) মোগলাই তাজ।

বামুন-আড়ার বৃষ বাহনোপরি নৃত্যরত ঊর্ধ্বলিঙ্গ অষ্টভুজ শিবের নৃত্যমূর্তি ও পুরুলিয়ার কোশজুড়িতে এই একই ধরণের নৃত্যমূর্তি বর্তমান। বিষ্ণুপুরের আচার্য যোগেশ চন্দ্র পুরাকৃতি ভবনে অনুরূপ একটি নৃত্যমূর্তির নিম্নভাগ লক্ষ্য করা যায়।

এখানের শৈবমূর্তিগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি 'ঘোর' রূপের মূর্তি সলদায় আবিষ্কৃত হয়েছে। সলদা (থানা জয়পুর) থেকে পাওয়া সুবিশাল মহাকাল মূর্তি (বর্তমানে বিষ্ণুপুরের আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনে সংরক্ষিত) সলদার ডোমপাড়ায় ধর্মঠাকুর শঙ্খাসুরের মন্দিরে

কৌমসমাজ ও অর্থনীতির প্রাধান্যযুক্ত মল্লভূমে মোগল-সামন্ত ব্যবস্থা এবং প্রতিরক্ষায় মোগলআধিপত্য এ দেশের আপামর জনসাধারণকে মল্লরাষ্ট্র-কাঠামো থেকে বিযুক্ত করে এক অভিজাত শ্রেণীর কুক্ষিগত করেছিল। এতে মোগলস্বার্থ সুরক্ষিত হলেও মল্লস্বার্থ বিঘ্নিত হয়েছিল প্রচুর। শিক্ষা-দীক্ষা-চর্চা-চিন্তা অভিজাত শ্রেণীর কুক্ষিগত হয়েছিল এবং সর্বতোভাবে দরবারী পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল। মল্লভূমের রাজনীতি আর সংস্কৃতিতে ব্রাহ্মণ-প্রাধান্যের কথা আগেই বলা হয়েছে। প্রশাসনে ব্রাহ্মণ-প্রধানমন্ত্রী, রাজধর্ম—গোস্বামীসিদ্ধান্তে ব্রাহ্মণ্য-গুরুবাদ। মল্লরাজাদের মল্লঅধ্যায়ের ধর্মপূজা ইত্যাদির স্মৃতিটুকু মাত্র অবশিষ্ট রইল। ক্ষেত্রস্থলে ভূমঅঞ্চলের ইন্দ জাতীয় লোকউৎসবের উপর বিষ্ণুপুরে, বৈদিক প্রলেপ দেওয়া হয়েছে। বিষ্ণুপুরের রাজারা নিজেদের আঞ্চলিক বা স্থানীয় পরিচয় লোপ করে ক্ষাত্র-আভিজাত্যের দাবীদার হয়ে স্বাভাবিকভাবে ব্রাহ্মণদের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। ব্রহ্মোত্তরের পরিবর্তে তাঁদেরকে রাজপুত কুলমর্যাদা দিয়ে ব্রাহ্মণরা হিন্দু রাষ্ট্রনীতির ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয় আঁতাতের ছাঁচটি প্রতিষ্ঠা করেছেন। বিষ্ণুপুরের রাজাদের বংশোৎপত্তির বিশেষ কাহিনীটি 'ভূম' অঞ্চলে এবং তার বাইরে প্রায় একইভাবে প্রচলিত।[৩৯] মল্লকাহিনী কালকেতু উপাখ্যানেরই অনেকটা সমগোত্রীয়। কালকেতু কাহিনী মেদিনীপুর-বাঁকুড়ার সন্ধিস্থলেই রচিত বলে অনেকে মনে করেন। মেদিনীপুর জেলার অড়রাতেই (বিষ্ণুপুরের সন্নিকট) মুকুন্দরাম চণ্ডীমঙ্গল রচনা করেন। দ্বিজ মাধবের গ্রন্থেও দেখা যায় দেবী কালকেতুকে 'কংস' (কাঁসাই নদীর তীরে গড় নির্মাণের আদেশ দিচ্ছেন। মুকুন্দরামের কাব্য রচনার কাল অনেকের মতে ষোড়শ শতকের প্রথমার্ধ।

(মন্দিরের বাইরের দেওয়ালে) অবস্থিত শবের উপর নৃত্যরত ভৈরবের ঘোরমূর্তি, এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বিশাল ডোমদীঘির তীরে পড়ে থাকা প্রচুর আমলকের ভগ্নাংশ উড়িষ্যার প্রভাবের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। বৃহদাকার লিঙ্গপ্রতীকগুলিও এ অঞ্চলে বিদ্যমান। শৈব 'ঘোর' মূর্তি সাধারণতঃ শৈবপাশুপতদেরই উপাস্য বলে অনেকে মনে করেন। বলাবাহুল্য লকুলীশ পাশুপত শাখার প্রবর্তক (the kapalikas the kalamukhas

এ সময় এ অঞ্চলে রাষ্ট্রনীতির পটপরিবর্তনে আদিবাসী কৌম-সর্দারদের উচ্চ অবস্থানে 'আরোহণ বা চলাচল' এর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা মুকুন্দরামের কাব্যে প্রভাব বিস্তার করেছিল কিনা আজ বলা কঠিন। মেদিনীপুর অঞ্চলের ইতিহাস প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে এ অঞ্চলের বিভিন্ন রাজবংশের বংশোৎপত্তির সঙ্গে জড়িত পৌরাণিক কাহিনী প্রসঙ্গে ইঙ্গিতপূর্ণ উক্তির সঙ্গে আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় যে 'কালকেতু-কাহিনীর' উল্লেখ করেছেন তাও তাৎপর্যপূর্ণ। অনেকে মনে করেন, মল্লরাজারাও আঞ্চলিক আদিম-কৌম-জনসমাজের থেকে ক্ষমতাশালী হয়ে উন্নত অবস্থানে আরোহণ করেন। অপরিসীম ব্রাহ্মণ-আনুগত্য, নগর নির্মাণ ইত্যাদির দিক থেকে মল্লরাজ কাহিনী অনেকাংশে কালকেতু-কাহিনীর সমগোত্রীয়।[৪০] যাইহোক মল্ল-রাজাদের নির্বিচার ব্রহ্মোত্তর-প্রদানকে কেন্দ্র করে এখানে ব্রাহ্মণ্য শক্তির কেন্দ্রীভূত হওয়ার সুযোগ ঘটে। সংস্কৃত-চর্চা, মন্দির নির্মাণ সবই যে ব্রাহ্মণ্য প্রভুত্বের সূচক তা আগেই বলা হয়েছে। মন্দির বা টোল-চতুষ্পাটীর শিক্ষাব্যবস্থায় অব্রাহ্মণরা বা অনাভিজাতরা শুধু অবাঞ্ছিতই নয় অনধিকারী ছিলেন। ফলে দেশের অগণিত আপামর জনসাধারণ ভূমিদাসে পরিণত হয়ে মল্লরাষ্ট্রনীতির বাইরে নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন।

---

and the other similar Saiva sect of a 'grora' type developed at a fairly early date form the **Pasupata** sect organised by Lakulisa (Development of Hindu Iconography J. N. Banerjee, P. 45—52)

৩৯. কেহ যশস্বী বা কীর্তিমান না হইলে অন্যে তাহার পরিচয় জানিতে চায় না। কুলগৌরব পুরাতন কাল হইতে না থাকিলে বংশধরেরও গৌরবহানি হয়। পূর্বপুরুষ থাকেই থাকে, কিন্তু নগণ্য পূর্ব-পুরুষের গণ্যমান্য বংশধরের আবির্ভাবে প্রকৃতিদেবীর বিশৃংখলা আসিয়া পড়ে। তখন আদি-পুরুষের দৈবীশক্তি কল্পিত হয়। রাজবংশ হইলে আদিপুরুষকে ব্রাহ্মণের রাখাল হইতে, বনে গরু চরাইতে চরাইতে অপরাহ্নে নিদ্রিত হইতে হয়, তখন ফণীকে আসিয়া রাখালের মস্তকের উপরে ফণা বিস্তার করিয়া রবি কিরণ নিবারণ করিতে হয়। অথবা

বহিরাগত বিভিন্ন অভিজাত বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে বহিরাগত উচ্চমানের স্থাপত্যরীতি, টেরাকোটা-ভাস্কর্য এবং পাটাচিত্রে প্রতিফলিত উন্নতমানের অভিজাত-রুচিসম্মত রাজস্থানী-চিত্র-রীতি (দুই চিত্ররীতিই (রাজপুত-মুঘল) নিতান্ত রাজানুগ্রহ নির্ভর ছিল। কামার, কুমার, চাকুরিয়া, ছোট ব্যবসায়ীর পৃষ্ঠপোষকতার উপর আস্থা রাখতনা-ভারতের চিত্রকলা : অশোক মিত্র : পৃঃ ১৯৭) ক্লাসিক কীর্তন, ধ্রুপদগান, এমনকি রাজা, সম্ভোগমনস্ক রাজন্য এবং অভিজাতদের সেবায় নিয়োজিত সূক্ষ্মকারুশিল্প সর্বভারতীয় সংস্কৃতিক্ষেত্রে বিষ্ণুপুরকে প্রতিষ্ঠা দিলেও বিপুল আদিবাসী-অধ্যুষিত বিষ্ণুপুরে এই মার্গসংস্কৃতি স্বক্ষেত্র খুঁজে পায় নাই। দরবারী পৃষ্ঠপোষকতায় বিকশিত এই সংস্কৃতি ও প্রশাসনের সঙ্গে জনমানসের যোগ ছিল না। তাই মল্লরাজত্বের অবসান শুধুমাত্র দুই শরিকের দ্বন্দ্ব-মুখরিত এক পারিবারিক বিপর্যয়ে পর্যবসিত হয়েছিল। বিরাট মল্লভূমের বিপুল জনগোষ্ঠী সেদিন নীরব দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। অথচ মল্লরাজত্বের পতনের পূর্বে এবং পরবর্তী শতাধিক বছর ধরে এই মল্লভূম তথা জঙ্গল-মহলের তথাকথিত চুয়াড়রা (নায়েক, ভূমিজ, সাঁওতাল) বিদ্রোহের পর বিদ্রোহ করে ইংরাজ শক্তির ত্রাসের সঞ্চার করেছিল। মল্লরাজধানীতে আগত বুদ্ধিজীবীদের হাতে সমস্ত ক্ষমতা তুলে দিয়ে রাজা ধর্মকর্মে আত্ম-নিয়োগ করেছিলেন। কমলবিশ্বাস নামক এক কায়স্থের 'ছত্রপতি' উপাধি গ্রহণ এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু জনসংযোগহীন বুদ্ধি-জীবীদের ভাসমান 'সর'টুকু বিষ্ণুপুরে মার্গসংস্কৃতির বিকাশ ঘটালেও মল্লরাজত্বের মহতী বিনষ্টি রোধ করতে পারে নাই।

আদিপুরুষকে গর্ভবতী নারীসহ পুরী যাত্রা করিতে হয়, পথিমধ্যে বিজন বনে আদিপুরুষের জন্ম হয়। আদি পুরুষের আবির্ভাবে অলৌকিক কিছু না থাকিলে কাহিনী হইতে পারে না। কালকেতু ব্যাধকে অভয়া সুবর্ণ-গোধিকা-রূপে দর্শন না দিলে তাহার সাতঘড়া ধনপ্রাপ্তি ও গুজরাট নগরে রাজ্যপ্রাপ্তি সম্ভব হইত না। উপকথায় রাজসিংহাসন শূণ্য হয়, রাজহস্তী বহির্গত হইয়া বিদেশী অজ্ঞাত কুলশীল রাজপুত্রকে পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া সিংহাসনে স্থাপন করে।

বহিরাগত উচ্চজাতি শূদ্রবর্গে স্থানীয় নিম্ন-অবস্থানের অথবা অন্ত্যজদের সঙ্গে শিক্ষা ও সংস্কৃতিগতভাবে নিঃসম্পর্ক ছিলেন তাই নয় মল্লরাজাদের নির্বিচার ভূমিদানের সুযোগ লাভ করে তাঁরা সমাজে যে অর্থনৈতিক আধিপত্য লাভ করেছিলেন, তাতে কঠোর স্মৃতি-শাসিত সমাজ ব্যবস্থায় তথাকথিত নিম্নবর্ণ বা অন্ত্যজরা নিষ্পিষ্ট এবং অবদমিত দাসে পরিণত হয়েছিলেন। মানসিকভাবেও এসব মানুষ সমাজের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন। স্মৃতি-শাসনে সমাজের একশ্রেণীর মানুষকে অস্পৃশ্য করে জন্মগত দাস প্রথাকেই বলবৎ করা হয়েছিল। আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনের ন্যায় স্মৃতির পুঁথিগুলি সে সাক্ষ্যই বহন করছে। একটা বিরাট সংখ্যক মানুষ নিজ দেশে প্রবাসীর মত বাস করতেন। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের বাহনে আগত সর্বভারতীয় জাতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য-

---

কিন্তু সেটা উপকথা শিশুকে ভুলাইতে পারে। বয়স্থকে পারে না। বয়স্থ উপকথায় ভোলেনা কথা চায়। ভবিষ্যতে কোন বংশ প্রসিদ্ধ হইবে জানিতে পারিলে কাহিনীর প্রয়োজন হইত না। (মেদিনীপুরের ইতিহাস প্রসঙ্গে আলোচনা। যোগেশচন্দ্র রায়। প্রবাসী অগ্রহায়ণ ১৩৩৬। পৃষ্ঠা ১৭৭। ত্রৈলোক্য নাথ পালের "মেদিনীপুরের ইতিহাস" এর দ্বিতীয় সংস্করণ এর সমালোচনা।)

৪০. নিম্নোদ্ধৃত উক্তিতে কালকেতুর ব্রাহ্মণ-আনুগত্য লক্ষণীয় :

যতবৈসে দ্বিজবর কার নাহি নিবকর
চাষভূমি বাড়ী দিব ধান।
হইয়া ব্রাহ্মণের দাস সবার পুরিব আশ।
জনে জনে সাধিব সম্মান ।। (চণ্ডীমঙ্গল)

তুলনীয় মল্লরাজ-ইতিহাসের উক্তিঃ So much so, that there is not a single Brahman or High Class family at or near Bishnupur who does not enjoy rent free land even to the present day. —(History of Bishnupur Raj : A. P. Mallick) মল্লরাজত্বের শাসন ব্যবস্থায় পুরোহিত তন্ত্রের প্রভাবেরও আভাস পাওয়া যায়

চেতনায় সামগ্রিক জনস্তরকে উদ্বুদ্ধ করে সামাজিক বা রাষ্ট্রিক সংহতির প্রচেষ্টা বিশেষ কোন মাত্রা পায় নাই। শুধু মল্লভূমেই এমনটি ঘটে নাই, সারা ভারতের অধিকাংশ অঞ্চলেই মার্গ-সংস্কৃতির গতি-প্রকৃতিই এই। বৌদ্ধ, জৈন অথবা আর্য-ব্রাহ্মণ্য ধর্ম-সংস্কৃতির সমুন্নত দর্শন সামান্য কিছু বহিরঙ্গ প্রভাব ছাড়া সামগ্রিক জাতীয়-সংস্কৃতির সর্বভারতীয় নিবিড় ঐতিহ্য-চেতনা দেশের সর্বস্তরে এমন কোন অন্তরঙ্গ প্রভাব ফেলতে পারেনি যাতে রাষ্ট্রিক বা সামাজিক সংহতি গড়ে উঠে। আমাদের দেশের ধর্মগুরুদের অভিলাষ যাই থাক তাঁদের পরবর্তী প্রবক্তারা ঐসব ধর্মের কোনটিরই এমন কোন সার্বজনীন মঞ্চ গড়ে তুলতে পারেননি যা জাতীয় সংস্কৃতি বা রাষ্ট্রিক-চেতনার সহায়ক হয়। ধর্মগুলির মাত্রাতিরিক্ত প্রাতিষ্ঠানিক রূপারোপের তাগিদে তাঁরা দেশের জনসাধারণের পরিবর্তে রাজা কিংবা সামন্তপ্রভুদের উপরেই অধিকতর নির্ভর করেছেন। ভারতের প্রাচীন এবং মধ্যযুগের রাষ্ট্রিক কাঠামোতে সামন্ততন্ত্রের ক্ষেত্র সদাপ্রস্তুত ছিল। বৌদ্ধ-ধর্মের মতই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম বিষ্ণুপুর তথা মল্লভূমে রাজধর্মে পরিণত হয়েছে। তার পূর্বেই রচিত রূপ গোস্বামীর বৈষ্ণবীয় শাস্ত্র সাহিত্যে সামন্ততান্ত্রিক প্রেক্ষাপট অনেকে আবিষ্কার করেছেন। জোড়বাংলার টেরাকোটায় পুরাণ ও বৈষ্ণব-চিত্রাবলীর ধর্মীয়চিত্রের পাশাপাশি সামন্ত-বিলাসের চিত্রে যেন তারই ইঙ্গিত।

উপরোক্ত ইতিহাসেই। The Malla Kings also established a sacred department for the moral and religious davelopment. This development was extremely in the hands of the high priest, who also advised the king in the matter of granting rent free land."

A. P. Mallick—History of Bishnupur Raj

মল্লরাজাদের এক কোন আদিপুরুষ ক্রমশঃ ক্ষমতা সঞ্চয় করে (প্রথমে লাউগ্রাম, তারপর প্রদ্যুম্নপুর অধিকার করেন) দেবীর আদেশে বিষ্ণুপুরে রাজধানী স্থাপন করেন। কালকেতুর মতই এক শিকার কাহিনীও রয়েছে। মল্লরাজাদের এই আদিপুরুষ শিকার করতে এসে এখানের গভীর

অথচ দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে সুফী প্রভাবে নানক-কবীরের নেতৃত্বে এক উদার ভক্তিধর্ম উত্তরভারতে প্রায় আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করেছিল, নাগরিক শিল্পী, গ্রাম্য-চাষী প্রমুখ সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণে ; বিভিন্ন সামন্তরাজ্যে মূলতঃ আঞ্চলিক ভাষার মাধ্যমে বিচ্ছিন্নভাবে এসব ভক্তিধর্ম বিকশিত হলেও, এগুলির মধ্যে একটি মূলীভূত ঐক্য ছিল—তা হ'ল প্রতিষ্ঠান-বিরোধ। প্রতিষ্ঠান বিরোধী এইসব ভক্তিধর্মে এক ধরণের সামাজিক প্রতিবাদ প্রতিধ্বনিত হয়েছিল। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম শ্রীচৈতন্যের পরবর্তীকালে অতিরিক্ত প্রাতিষ্ঠানিক হয়ে পড়ায় জনমানসের স্বতঃস্ফূর্ত প্রবল প্রবাহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এক গভীর দার্শনিক তত্ত্বে পরিণতি লাভ করে বুদ্ধিজীবী উচ্চজাতির মধ্যে আবদ্ধ হ'ল। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী মল্লরাজাদের রাজত্বে 'একাদশী'র আতিশয্য অতিমাত্রায় ব্রাহ্মণ-প্রাধান্য, শিক্ষাব্যবস্থায় সংস্কৃত-আধিপত্য আর সমাজ ব্যবস্থায় অক্ষুন্ন স্মৃতি-শাসন থেকেই এ সত্য প্রতিভাত হয়।

জঙ্গলে এক অলৌকিক দৃশ্য দেখে বিস্মিত হন এবং পরক্ষণেই দেবীর প্রত্যাদেশ হয় এখানে মল্লরাজধানী প্রতিষ্ঠা করার। তদনুযায়ী মল্লরাজারা এখানে গড়প্রতিষ্ঠা করেন এবং গড়রক্ষয়িত্রী দেবী রূপে দেশবিখ্যাত শ্রীশ্রীমৃন্ময়ী দেবীর প্রতিষ্ঠা হয়। ইনি গড়রক্ষয়িত্রী 'মাতৃকা'। বলাবাহুল্য মল্লভূমে একাধিক গড় এবং গড়রক্ষয়িত্রী 'মাতৃকা' রয়েছেন। অধিকাংশ গড় আদিবাসী কৌম জনগোষ্ঠী অধ্যুষিত। উচ্চবর্ণের লোকেরা প্রায় সর্বত্রই বহিরাগত। কালকেতুর মতই মল্লরাজারা নানা দেশ থেকে উচ্চবর্ণের মানুষ এবং শিল্পীশ্রেণীকে এনে মধ্যযুগের নিয়মেই বিষ্ণুপুরে নগর প্রতিষ্ঠা করেন। অস্থায়ী কৌমসংস্কৃতি স্থায়ী বসতিসম্পন্ন বর্ণভিত্তিক গ্রাম সংস্কৃতিতে প্রবেশ করে। বিষ্ণুপুর শহরের গঠনও যেন কালকেতুর নিয়মেই সম্পন্ন হয়েছে। বারেন্দ্র, বৈদিক, মহাপাত্র ব্রাহ্মণরা এখানে স্ব স্ব নির্দিষ্ট পাড়ায় সুপ্রতিষ্ঠিত। কায়স্থ বৈদ্যরাও তাই। বিভিন্ন প্রাচীন অথচ বিলুপ্ত রাজধানী থেকে আগত শিল্পীসংপ্রদায় বসেছেন এক এক পাড়ায়। অধিকাংশ পাড়াতেই মল্লরাজাদের প্রতিষ্ঠিত দেবালয়। শিল্পীদের পাড়ার দেবালয়গুলি হয়ত শিল্পী সংঘ (গিল্ড)এর তত্ত্বাবধানে এবং অর্থে পরিচালিত হ'ত। কারুশিল্পীদের (মান্দারণ্যা, বর্ধমেনা, উত্তরবুলা

শুধু যোগেশচন্দ্র পুরাকীর্তি ভবনের পুঁথিসংগ্রহেই নয়. বিষ্ণুপুরের মন্দির-টেরাকোটাতেও এর সাক্ষ্য সমুজ্জ্বল। পর পর অধ্যায়গুলিতে বিশদভাবে এগুলির আলোচনা করার চেষ্টা করা হবে।

একথা প্রায় সর্বজনবিদিত যে, মল্লরাজগুরু শ্রীনিবাস আচার্য ছিলেন বৈষ্ণব-স্মার্ত গোপালভট্টের শিষ্য। গোপালভট্টের রচিত 'ভাবদভক্তিবিলাস' মূলতঃ একটি বৈষ্ণবীয় স্মৃতিগ্রন্থ। বিষ্ণুপুর তথা মল্লভূমে শ্রীনিবাস আচার্য প্রচারিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের গোস্বামীসিদ্ধান্তের বাহন যেমন ছিল সংস্কৃত, ধাতুপ্রকৃতিতে তেমনি ছিল একটি স্মার্ত-আবেদন। এক কথায়, ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির স্মার্ত-পৌরাণিক আবেদনটির উপরেই মূলতঃ গোস্বামী সিদ্ধান্তের অবস্থান; আগেই বলা হয়েছে, আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনের পুঁথি সংগ্রহ পর্যালোচনা করলে গৌড়ীয় বৈষ্ণব প্রভাবিত মল্লভূমের শিক্ষা-সাহিত্য এবং সমাজের স্মার্ত-পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য রূপটি সহজেই ধরা যায়। এতে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের গোস্বামীসিদ্ধান্তের স্বরূপটিই

প্রভৃতি) 'থাক'গুলি থেকেই তাদের এখানে আগমনের সূত্র পাওয়া যায়।

'দেবীচন্ডী কাল্টের' প্রসঙ্গে একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। বাঁকুড়া-মেদিনীপুর-বর্ধমান তথা দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গে চন্ডীকাল্টের বিকাশ সম্পর্কে একটি সূত্রের প্রতি এখানে প্রাসঙ্গিকভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। মেদিনীপুর জেলার কেশিয়াড়ীর অন্তর্গত মোগলমারি নামক গ্রামের সন্নিকটে অঞ্চলপ্রসিদ্ধা-দেবীজয়চন্ডীর মন্দির। কিছুদূরে মোগলমারীর মাঠ। অনুরূপভাবে দেখা যায়, বর্ধমান-বাঁকুড়ার সন্ধিস্থলে প্রখ্যাত দেবী শ্রীশ্রীবোঁয়াইচন্ডীর মন্দির। অগণিতভক্ত সমাগম হয় প্রত্যহ। এই অঞ্চলেই দীঘলগ্রামে অন্যতম বিখ্যাত চন্ডিকা দেবী 'আমড়াই চন্ডীর অধিষ্ঠান। অদূরে এই অঞ্চলেই (আরামবাগ-বর্ধমান বাস রাস্তার উপর) আর এক মোগলমারি গ্রাম। আই' শব্দ 'মাতৃকা-বাচক'। প্রাচীন 'মাতৃকা কাল্টেরই' দ্যোতক বলে মনে হয়। জোড়বাংলার পশ্চিম দেওয়ালেও বিস্তারিত 'মাতৃকা-প্যানেল'। প্রাচীন এক উৎস থেকে বিভিন্ন বিচিত্র অভিব্যক্তি।

যাইহোক, 'মোগলমারি' (উভয়ক্ষেত্রেই) মনে হয় কোন মোগল-যুদ্ধ বা মোগল-নিধন ক্ষেত্রের সাক্ষ্য বহন করছেনা—এগুলি মোগলমাড়িরই

উদ্ঘাটিত হয়। পদাবলী সাহিত্যের সহস্র কুসুম-বিকাশ বাংলা ভাষার মাধ্যমে সম্ভব হলেও এগুলিতে সংস্কৃত সাহিত্যের উত্তরাধিকার সুস্পষ্ট। শুধু ছন্দ-অলঙ্কার বাক্‌প্রতিমা নির্মাণেই নয় আবেদনেও সংস্কৃত-লিরিকের আভাস। মনোহারিত্বে চমৎকারিত্বে আবেদনে অতুলনীয় হলেও চৈতন্যোত্তর পদাবলী সাহিত্য গোস্বামীদের প্রবর্তিত ছকেই রচিত হয়েছে। বৈষ্ণবপদের বিশাল অংশের উপর রূপ গোস্বামীর বিপুল প্রভাব দুর্নিরীক্ষ্য নয়। রূপ-সনাতনের তিরোধানের পর বঙ্গদেশ থেকে পদকর্তারা তাঁদের রচিত পদ বৃন্দাবনে পাঠিয়ে জীবগোস্বামীর অনুমোদন নিতেন। শুধু ধর্মে নয়, সাহিত্যেও এমনি প্রাতিষ্ঠানিকতার আভাস। শিক্ষা-সাহিত্য এক কথায় গৌড়ীয় বৈষ্ণবসংস্কৃতির সর্বত্রই স্মার্ত-পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির প্রাতিষ্ঠানিক রূপের ইঙ্গিত অনুভব করা কঠিন নয়। বিষ্ণুপুরেও শুধু পুঁথিপত্রেই নয় মন্দির-টেরাকোটাতেও এর সুস্পষ্ট বিকাশ। গোস্বামী-সিদ্ধান্তের তত্ত্ব ছাড়াও বৈষ্ণবের আচরণীয় ব্রত-কর্ম-অনুষ্ঠানের অনুশাসন এখানের মন্দির-টেরাকোটায় আত্মপ্রকাশ করেছে। 'নৃসিংহপরিচর্যা' জাতীয় বৈষ্ণব স্মৃতির অনুশাসন টেরাকোটা-চিত্রে লক্ষ্য করা যায়। এমনি করে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের উদ্দাম প্রবাহ দ্বিধা বিভক্ত হ'ল · তার গতিবেগ ক্রমশঃ

(উভয় ক্ষেত্রেই) মনে হয় কোন মোগল-যুদ্ধ বা মোগল-নিধন ক্ষেত্রের সাক্ষ্য বহন করছেনা—এগুলি মোঘলমাড়িরই (মোগলদের যাতায়াতের পথ) নামান্তর। মনে হয়, মোগল আমলে এই সব অঞ্চলে বিভিন্ন জন-পদের বিকাশকে কেন্দ্র করে এসব অঞ্চলের চণ্ডিকা-দেবতারা দেশ প্রসিদ্ধা হয়ে ওঠেন এবং তাঁদের খ্যাতি প্রতিপত্তি চারিদিকে প্রচারিত হয়। মন্দির প্রতিষ্ঠা করে শাস্ত্রীয় পূজাও প্রচলিত হয়। বিনয় ঘোষ চণ্ডীদেবতাদের বনদেবী রূপেই অনুমান করেছেন। প্রাগার্য সম্প্রদায়ের বনদেবী চণ্ডী (মাতৃকা) ক্রমে দেবী জয়চণ্ডী রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই প্রসিদ্ধি লাভের ক্রমবিবর্তনের কালটি মুকুন্দরামের সমসাময়িক হতে পারে। দেবীচণ্ডী চণ্ডীমঙ্গলে প্রথমে পশুদের রক্ষয়িত্রী দেবতারূপে পরে গোধারূপে এবং সর্বশেষ দেবীদুর্গা রূপে (পরিবার দেবতাসহ) কালকেতুর সম্মুখে আবির্ভূতা হন। এযেন এক ক্রমবিবর্তনেরই চিত্র।

স্তিমিত হয়ে এল। অথচ একদা নবদ্বীপের শাসক-শক্তির ফতোয়ার বিরুদ্ধে সংগঠিত শ্রীচৈতন্যের বিরাট "নগরকীর্ত্তন" প্রায় গণআন্দোলনের রূপ নিয়েছিল যার বিপুলশক্তির কাছে নতি স্বীকার করেছিল নবদ্বীপের কাজী। আত্যন্তিক প্রাতিষ্ঠানিকতা প্রসূত জনবিচ্ছিন্নতা এর জীবনীশক্তিকে ক্রমশঃ ক্ষয় করল। আচারের মরুবালুগ্রস্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রাতিষ্ঠানিক বা গোস্বামী-সিদ্ধান্তের ধারাটি ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির অঙ্গীভূত হল। মন্দির-টেরাকোটায় এবং এ অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত সংস্কৃত-শাস্ত্র সাহিত্যের পুঁথির বিপুল সঞ্চয়ে প্রতিভাত মল্লভুমের শিক্ষা-সংস্কৃতির স্মার্ত-পৌরাণিক প্রেক্ষাপটটিতে সংস্কৃতায়িত এই প্রথমোক্ত ধারার উপস্থিতি ; অপর ধারাটি লোকায়ত সুপ্রাচীন সহজিয়া-ধারাটির সামিল হয়ে ক্রমশঃ বয়ে গেল আউল-বাউল মরমিয়ার দিকে। "লোকায়ত সহজিয়া"র ধারা সুপ্রাচীন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম মল্লভূমে প্রবেশ করার পূর্বেও যে এ ধারার অস্তিত্ব ছিল তার সাক্ষ্য বয়ে বেড়াচ্ছে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পুঁথির প্রাচীনত্বের বিতর্কে প্রবেশ না করেও স্বচ্ছন্দে বলা যায়, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে একটি সুপ্রাচীন লোকায়ত কৃষ্ণকথার আভাস ধরা পড়েছে। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বৌদ্ধ সহজযানের মূল সূত্রগুলি ধরা পড়েছে।[৪১] এঁরা আরও মনে করেন যে বাঙ্গলার আর সব অঞ্চলের কথা যাইহোক রাঢ়ের বাঁকুড়া-বীরভূম অঞ্চলে বজ্রযানের প্রভাব ছিল, আর এসব অঞ্চলে বজ্রযানের পথধরেই বৈষ্ণব-সহজিয়ার উদ্ভব হয়েছিল।[৪২] আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন তাঁর "বাংলার-সাধনা" পুস্তকে লিখেছেন—"শৈবমত বাংলায় বজ্রযানের

---

৪১ ডঃ নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' গ্রন্থে বলেছেন : বাংলার সহজিয়া ধর্ম সিদ্ধাচার্যদের সহজযান হইতেই উদ্ভূত। মধ্যযুগীয় বাংলায় সহজিয়া আদি ও শ্রেষ্ঠ কবি ও লেখক হইতেছেন বড়ু চণ্ডীদাস। তাঁহার শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে সহজযানের মূলসূত্রগুলি ধরিতে পারা কঠিন নয়।

৪২ উক্ত বাঙ্গালীর ইতিহাসেই ডঃ নীহাররঞ্জন রায় বলেছেন যে ইহাও লক্ষণীয় যে, বাঁকুড়া—বীরভূমের যে অংশে মহাযান সক্রিয় সেই অংশেই পরবর্তীকালে বৈষ্ণব সহজিয়া এবং তান্ত্রিক শক্তিধর্মের প্রসার প্রভাব প্রতিপত্তি।"

সঙ্গে মিলে মিশে ছিল। বাংলাদেশে মাটির তৈরী শিবের মাথায় মাটিরগুলি দেওয়া হয়। তার নাম বজ্র।"

আসলে তন্ত্র একটি বিশিষ্ট সাধন প্রক্রিয়া। লোকায়ত অধ্যাত্ম-জগতে তন্ত্রের বিপুল প্রভাব। কৌমধর্মের ভিত্তিমূলে একধরণের আদিম তন্ত্রাচার সদা বিদ্যমান। এই লোকধর্মের সংস্পর্শে এসে সমস্ত শাস্ত্রীয় ধর্মই তান্ত্রিকতা লাভ করেছে। অনেক পণ্ডিত মনে করেন বিশেষভাবে তান্ত্রিক-বৌদ্ধ বা তান্ত্রিক-হিন্দুধর্ম বলতে যা বোঝানো হয় তা'হল তন্ত্রায়িত-বৌদ্ধ বা হিন্দু ধর্ম। তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম মৌলিক কোন ধর্ম নয়। বৌদ্ধধর্মের তান্ত্রিক রূপান্তর মাত্র। এঁরা মনে করেন বুদ্ধের তিরোধানের অনেক পরবর্তীকালে কোন বৌদ্ধ শাখা কর্তৃক তান্ত্রিক সাধনার বিশেষ ধারাটি গৃহীত হয়। অথবা বলা যায়, পরবর্তীকালের বৌদ্ধধর্মের কোন শাখায় তন্ত্রের প্রবেশ ঘটে।[৪৩] তাই তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে তান্ত্রিক বৈষ্ণবধর্মের যেমন ধাতুগত মিল আছে তেমনি শৈবধর্মের সঙ্গেও তান্ত্রিক বৌদ্ধ-ধর্মের কোন গরমিল নেই। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বশীকরণ, সম্মোহন, মারণ ইত্যাদি ক্রিয়ার ব্যবহার শুধু নয়, সুস্পষ্টভাবে সেগুলির

---

43 Let us now see how this Tantric Sadhana was adopted by a school of later Buddhists. Several centuries after the demise of Lord Buddha, the spirit of the revolution which served as the very karnel of all Buddhsitic thought and religion, instead of accelerating with the course of time, was being retarded as a result of slow but continual friction with the current thought and practices. As a result there seems to have developed a spirit of compromise combined with Mahajanic spirit of catholicity in throwing the portals of Buddhism wide open tothe people of various tastes and temperaments was responsible for the absorption of many of the important Hindu practices in to Buddhism itself. This indicates the process by which Tantricism made

উল্লেখও আছে। শ্রীকৃষ্ণ. শ্রীরাধিকাকে বশ করতে বড়াই এর হাতে পান পাঠাচ্ছেন - রাধিকাকে শাস্তি দিতে বাণ মারছেন শ্রীকৃষ্ণ— আবার ঝাড়ফুঁক করে পুনবায় রাধাকে জিইয়ে তুলছেন। এগুলি সবই আদিম তন্ত্রাচার সম্মত প্রক্রিয়া। লোক জগতের একটি সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি যে এখানে প্রতিফলিত হয়েছে তা সহজেই বোঝা যায়। বাঁকুড়া তথা রাঢ়ের বিভিন্ন পরিমণ্ডল থেকে সংগৃহীত এবং আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনে সংরক্ষিত (বিন্যাংশ মাণিকলাল সিংহ কর্তৃক তাঁর "রাঢ়ের মন্ত্রযান" গ্রন্থে সংকলিত) মন্ত্রতন্ত্রের প্রচুর পুঁথিতে নানাধরণের মন্ত্র এবং তান্ত্রিক ক্রিয়া-কর্মের উল্লেখ আছে। এগুলির মধ্যে বশীকরণ (ফুলপড়া) ইত্যাদি ঝাড়ফুঁক প্রভৃতির মন্ত্র আছে। রাধাকৃষ্ণ প্রেমকথা "শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের" মূল বিষয়বস্তু হলেও এর বৈচিত্র্য বা অভিনবত্ব বর্তমান। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রদর্শিত দার্শনিক পথের সঙ্গে এর প্রভেদ অনেক - সে পথের বহু দূরে বহু আগেই এ পথ বেঁকে গেছে। এমনকি চণ্ডীদাস নামাঙ্কিত পদাবলীর ভাববস্তুর সঙ্গেও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মিল নাই।[৪৪] সুপণ্ডিত বড়ুর হস্তাবলেপ সত্ত্বেও এর গোত্রান্তর সম্ভব হয় নাই। অথচ চর্যাপদের সঙ্গে এর ভাবসাজুয্য দুর্নিরীক্ষ্য নয়।

তান্ত্রিক-বৌদ্ধ বা তান্ত্রিক-বৈষ্ণবধর্মের আপাত প্রভেদ থাকলেও একটি ধাতুগত মিল আছে। উভয়ধর্মেই তন্ত্রাচারের মূলীভূত কাঠামোর উপর শুধু উপাদানগত ভাবে বৌদ্ধ বা বৈষ্ণবধর্মের অস্তিত্ব আভাসিত হয়। তাই একদিকে ঐসব ধর্মগুলির দার্শনিক রূপের

---

its way in to Buddhism giving rise to a composite religion popularly known as Tantric Buddhism."

—ASPECT OF INDIAN RELIGIOUS THOUGHT (Some later yogic schools) Page 153, SASHI BHUSAN DAS GUPTA K. L. M. 1977.

৪৪ চণ্ডীদাস পদাবলীর যেভাব ও বস্তু তাহা হইতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের ভাব ও বস্তু প্রায় সম্পূর্ণরূপে পৃথক। বৈষ্ণবীয় নিবন্ধ। ডঃ সুকুমার সেন রূপা ১৯৭০ পৃ ১৭৫।

থেকে তান্ত্রিক রূপের যেমন লক্ষণীয় পার্থক্য ও অভিনবত্ব আছে, অন্যদিকে তেমনি বৌদ্ধ এবং বৈষ্ণব তান্ত্রিকতার মধ্যে ধাতুগত মিলও সুস্পষ্ট। তাই চর্যাপদ ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মধ্যে একধরণের মিল লক্ষ্য করা গেলেও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের দার্শনিক বা স্মার্ত পৌরাণিক রূপের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনের পার্থক্য অনেক।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে যে মারণ, উচাটন, বশীকরণের প্রয়োগ উল্লেখ লক্ষ্য করা যায় তার ঐতিহ্য প্রাগৈতিহাসিক। এই আদিম তন্ত্রাচারের আভাস পণ্ডিতরা খুঁজে পেয়েছেন, প্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক গুহাচিত্রে। যে কোন দার্শনিক ধর্ম থেকে আদিম আভিচারিক ক্রিয়া-কেন্দ্রিক তান্ত্রিক আচার প্রাচীনতর।

আগেই বলা হয়েছে লোকজগতে অধ্যাত্মচিন্তা তন্ত্রপ্রধান। এই তন্ত্রের পথ ধরেই দেহকেন্দ্রিক যোগমার্গী হৃদয়সংবেদ্য প্রেমের পথেই লোকজগতের ধর্মসাধনা সহজ সাধনায় গিয়ে পৌঁছেচে।

দেহের সঙ্গে জন্মেছে হৃদয় আর প্রেম। তাই প্রেম আর 'পিরিতির' সাধনা "সহ-জ"। অপ্রাতিষ্ঠানিক, জটিলতা বা আবর্তহীন এই সহজসাধনা স্বাভাবিক ভাবেই সাধারণ মানুষের সাধনা। 'এই ভাবেই বেদাচার প্রতিবাদী, জ্ঞান ও মনন মার্গ বিরোধী দেহভিত্তিক যোগসাধনা পদ্ধতি সহজসাধনার ভিত্তি রচনা করেছে।"[৪৫] ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মনে করেন দশম শতকের কোন এক সময়ে বৌদ্ধধর্ম ও তন্ত্রাচারের একত্র সমাবেশে কায়া-কেন্দ্রিক যোগমার্গের একধরণের যৌগিকধর্মের যে বিকাশ ঘটে, তাই সহজিয়া বৌদ্ধধর্ম নামে অভিহিত।[৪৬]

---

৪৫ চর্যাপদ পরিচয় : ডঃ সত্যব্রত দে : জিজ্ঞাসা।

46 About tenth century A D. an offshoot of this composite religion developed some tendencies of its own with exclusive stress on a sytem of Joga and this school is popularly known as Sahajea Buddhism".

—ASPECT OF INDIAN RELIGIOUS THOUGHT: Some Later Yogic School : S.B. DAS GUPTA ; Page 153

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় এখানে তন্ত্রাচারের শেষে রাধাবিরহে কবি কায়াকেন্দ্রিক যোগ সাধনার ইঙ্গিত দিয়েছেন। সুস্পষ্টভাবেই শ্রীকৃষ্ণ এখানে বলেছেন "যোগ ধেয়াই"। কায়াসাধনা এবং ষট্‌চক্রভেদের ইঙ্গিতও শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে আছে। সমস্ত কাব্য জুড়ে একটি যৌন-যৌগিক বাতাবরণ বর্তমান।

কবি চণ্ডীদাসের জীবনেও এমনি আধ্যাত্মিক পটপরিবর্তনের উল্লেখ আছে। পদসমুদ্রের একটি শ্লোকে তান্ত্রিক পূজক চণ্ডীদাসের সাধনার পট পরিবর্তনের উল্লেখ আছে।

শালতোড়া গ্রাম অতি পীঠস্থান
নিত্যের আলয় যথা।
ডাকিনী বাসুলী নিত্যা সহচরী
বসতি করয়ে তথা ॥

এই শালতোড়া, বাঁকুড়া জেলার বেলিয়াতোড়ের সন্নিকট একটি গ্রাম, এই গ্রামে নিত্যাদেবী রয়েছেন। তিনি মানবী-সহজযান সম্প্রদায়ভুক্ত কোন সিদ্ধারমণী। গোপেন্দ্রকৃষ্ণ বসু তাঁর বাংলার লৌকিক দেবতা গ্রন্থে ডাকিনী-যোগিনী প্রসঙ্গে শ্রীরমেশচন্দ্র বসু লিখিত বৌদ্ধ ও শৈব ডাকিনী ও যোগিনীদের কথা" (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ১৩৩৩/১ প্রকাশিত) প্রবন্ধের কিছু অংশ উদ্ধৃত করেছেন। অংশটি পুনরুদ্ধৃত করা হল। এতে রমেশচন্দ্র বসু বলেছেন – "যে সব ডাকিনী যোগিনীদের কথা বলিতে যাইতেছি তাঁহারা রক্ত মাংসের মানুষ এবং বৌদ্ধ সহজযান ও বজ্রযান সম্প্রদায়ভুক্ত ধর্মচারিনী নারী— অনেক সময় উঁহাদের আদেশে অনেক তন্ত্রের গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে।" হয়ত এমনি একজন সিদ্ধারমণীর আদেশে চণ্ডীদাস সহজিয়া পদরচনা করেন।

চণ্ডীদাস কহে সে এক বাসুলী
প্রেমপ্রচারের গুরু
তাহার চাপড়ে নিদ্ ভাঙ্গিল
পীরিতি হইল সুরু ॥

প্রেমদাসের বংশীশিক্ষায় (রচনাকাল ১৬৩৮ শকাব্দ, বা ১৭১৬ খ্রীষ্টাব্দ) চণ্ডীদাস ভণিতা যুক্ত বারো-তেরটি রাগাত্মিক পদ আছে। প্রেমদাস ছিলেন বাঘনাপাড়ার গোস্বামী গোষ্ঠীর শিষ্য।

বাঘনাপাড়া পাটেরই অন্যতম শিষ্য অকিঞ্চন রচিত বিবর্ত-বিলাসে চণ্ডীদাসের কাহিনী সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে। 'এতেও নিত্যের আদেশে বা বাশুলী চলিল' ইত্যাদি পদের উদ্ধৃতি লক্ষ্য করা যায়। এইসব পদের উদ্ধৃতির পূর্বে কবি যে উপক্রমণিকা করেছেন তাতেও চণ্ডীদাসের সংক্ষিপ্ত জীবনীর আভাস পাওয়া যায়। এতেও নিত্যা-দেবীর আদেশে চণ্ডীদাসকে শিক্ষা দেবার কথা লক্ষণীয়!

বাণের সাধন মহাজনের বচন।
বাসুলী আদেশে চণ্ডীদাসের কথন।
যোগমায়া ভগবতী নিত্যের আদেশে
চণ্ডীদাসে শিক্ষা দিলা হইয়া প্রকাশে।

বিষ্ণুপুর অঞ্চলে প্রাপ্ত ১০০৯ মল্লাব্দে অর্থাৎ ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত একটি পুঁথিতে চণ্ডীদাস ভণিতার চৌদ্দটি রাগাত্মিকপদ পাওয়া গিয়েছিল (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, পঞ্চম ভাগ পৃঃ ১৭৯-১৮০) মুকুন্দদাস রচিত "সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়" একখানি সাধনতত্ত্ব নিবন্ধ।[৪৭] বইটির রচনাকাল সপ্তদশ শতকের শেষে অথবা অষ্টাদশ শতাব্দীর কোন একসময়ে বলে ডঃ সুকুমার সেন অনুমান করেছেন। সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে অনেকগুলি রাগাত্মিক পদ আছে তার অধিকাংশই তরুণীরমণ বা তরণীরমণ ভণিতাযুক্ত। সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে চণ্ডীদাস রজকিনী এবং বিদ্যাপতি লছিমার কাহিনীর উল্লেখ আছে। এগুলি পরকীয়া সাধনার কথা। তরুণীরমণের 'সহজ উপাসনা তত্ত্ব' নামক রসসাধনার ব্যাখ্যায় উপক্রমণিকারূপে চণ্ডীদাসের কাহিনী বলা হয়েছে।[৪৮] এসবই পরকীয়া তত্ত্বের উপর আরোপিত 'সহজ সাধনা'। বিষ্ণুপুর অঞ্চলে প্রাপ্ত একটি পুঁথিতে কয়েকটি পদে তরুণীরমণের উক্ত চণ্ডীদাস

৪৭, সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ের পুঁথি যোগেশচন্দ্র সংগ্রহশালায় রয়েছে (পুঁথির নং ৩৩২ লিপিকাল সন ১২২৩ সাল : পত্র ১-২১)।

৪৮ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা ত্রয়বিংশ ভাগ, পৃঃ ১৭২-৮০ (বৈষ্ণবীয় নিবন্ধ : চণ্ডীদাস সমস্যা ১৮১ পৃঃ।

কাহিনীর অনুক্রমে, চণ্ডীদাসের জাতে ওঠা ঘটনার বিবরণ আছে।[৪৯] রজকিনী রামীকে 'অবলম্বন করে পরকীয়া সহজসাধনার জন্য চণ্ডীদাস জাতে পতিত হন। বিষ্ণুপুর অঞ্চলে প্রাপ্ত আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনে সংরক্ষিত (মাণিকলাল সিংহ কর্তৃক পশ্চিম রাঢ় তথা বাঁকুড়া গ্রন্থে উল্লিখিত) একটি পুঁথিতে পরজাতকত্বের উল্লেখ (জন্মান্তর) কবে বিদ্যাপতি-লছিমার পরজাতকরূপে শ্রীনিবাস হেমলতাকে আখ্যাত করার মধ্যে পরকীয়া সাধনের ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যায়। হেমলতা (শ্রীনিবাস কন্যা) নামাঙ্কিত 'মানবিবিলাস'ও (বিষ্ণুপুরের আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনে সংরক্ষিত শ্রীপ্রদীপ সিংহ কর্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত) এমনি এক 'সহজসাধনা' বা সহজিয়া পুঁথি।

"সিদ্ধান্ত চন্দ্রোদয়ে" চণ্ডীদাসের পিরীতি সাধন সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। ডঃ সুকুমার সেন তাঁর বৈষ্ণবীয় নিবন্ধে চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির দুটি গল্প উদ্ধৃত করে সেগুলি ঐ দুই কবির রচিত দুটি প্রসিদ্ধ কৃষ্ণলীলার পদের উৎস বলে নির্দেশ করেছেন। সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়েই এদুটি গল্প পাওয়া যায়। সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে পাঁয়ষট্টিটি সম্পূর্ণ পদ ও দুটি পদাংশ পাওয়া গেছে। এই পাঁয়ষট্টিটি পদের মধ্যে পাঁয়তাল্লিশটিই তরুণীরমণের পদ। ডঃ সেন যে পদাংশটি উদ্ধৃত করেছেন[৫০] তা পিরিতির ব্যাখ্যা যুক্ত পদ। তিনি বলেছেন এই পদাংশটি কিছু পাঠভেদ সহ চণ্ডীদাসের নামে পাওয়া যায়।[৫১] তরুণিরমণের নামাঙ্কিত সহজ উপাসনা তত্ত্বের কথা আগেই বলা হয়েছে। বসন্ত রঞ্জন রায় 'সহজ উপাসনা তত্ত্ব' নামে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় যে গ্রন্থ ছেপেছেন তাতে তরুণীরমণের নিজের কতক-গুলি পিরীতি সাধনার পদ আছে। পদকল্পতরুতে তরুণীরমণের ব্রজবুলিপদ একটি আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিতে চণ্ডীদাস আর তরুণীরমণ প্রায় একাকার। চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত আর একটি পদ তরুণীরমণের (বা তরণি রমণের) বলে জানা

৪৯, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা পঞ্চমভাগ পৃষ্ঠা—১৭২—৭৮

৫০, বৈষ্ণবীয় নিবন্ধ ডঃ সুকুমার সেন পৃঃ ২২৫।

৫১, পৃঃ ২২৫

গেছে। সে যাইহোক পিরিতি সাধন সহজসাধনেরই নামান্তর। এই পিরিতি সাধন বা সহজসাধনার ধারা লোকজগতে সাম্প্রতিক-কালেও প্রবাহিত হয়েছে বাউল জাতীয় গানে।[৫২] কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের 'রত্নসার' নামক পুঁথিতে পিরিতের উৎপত্তি সম্পর্কিত যে পদটি আছে তা যেভাবেই হোক বিষ্ণুপুর অঞ্চলে 'কৃষ্ণযাত্রায়' ব্যবহৃত হতে শুনেছি। লোকজগতে এই সহজসাধনার ধারা সর্বত্র জনপ্রিয় ছিল বলেই মনে হয়।

যাইহোক, সাধনতত্ত্ব বা সাধন সঙ্গীত ছাড়াও বৈষ্ণবদের একটি সমৃদ্ধ সাহিত্যের দিক আছে। কৃষ্ণলীলা সাধু সাহিত্যে গৃহীত হবার পূর্বে লোক ব্যবহারে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল বলে ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন। তিনি বলেছেন (বৈষ্ণবীয় নিবন্ধ ঃ রূপা) প্রথম দিকে শিশু কৃষ্ণের অদ্ভূত বাল্যলীলা পূতনা বধ গোবর্ধনধারণ কালিয়দমন, কংসবধ ইত্যাদি সাধু সাহিত্যে গৃহীত হয়েছে। পরে নেওয়া হয়েছিল গোপীলীলা। ব্রজগোপীদের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের প্রেম কাহিনী গৃহীত হতে অনেকদিন লেগেছে। ডঃ সেন মনে করেন নবম শতক থেকে ষোড়শ শতক পর্যন্ত সময়ে এই কাহিনী গৃহীত হয়েছে। অবশ্য ষোড়শ শতকে শ্রীচৈতন্য এর যে তত্ত্বরূপ দান করেছেন ষট্-গোস্বামীর আদর্শে তারই সাহিত্যরূপ পদাবলীতে প্রকাশ পেয়েছে। সংস্কৃত ও প্রাকৃতে কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কবিতা খ্রীস্টীয় সপ্তম শতক থেকে দ্বাদশ শতক পর্যন্ত আর্যাবর্তের বিভিন্ন অংশে প্রচলিত ছিল বলে ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন। বৈষ্ণব পদাবলীর অব্যবহিত পূর্বতন রূপটি বিদ্যমান ছিল 'অবহট্‌ঠে'—অবহট্‌ঠ কবিতায় বৈষ্ণব পদাবলীর বিষয়ঘটিত পূর্বসূত্র পাওয়া যাচ্ছে "প্রাকৃত পৈঙ্গলের" নৌকালীলার

---

৫২. চণ্ডীদাস আর রজকিনী, বিল্বমঙ্গল চিন্তামনি
ভালবাসার চূড়ামনি দেখনা বিচার করে
কালাপাগলা কয় সে ভালবাসা
জীবের ভাগ্যে হয় দুরাশা
মিটাইতে কামপিয়াসা পিরিতি সবাই করে।
শ্যামচোর কালাপাগলা লিখিত (মৈধরা সেবাশ্রমসংঘ হাটআশুড়িয়া বাঁকুড়া) মাণিকলাল সিংহ কর্তৃক সংগৃহীত।

কবিতায় এবং কুঞ্জলীলা বিষয়ক পদে।[৫২] শুধু বস্তুরূপ নয়, গীতি কবিতার পূর্বরূপও অবহট্‌ঠে পাওয়া যায়। "গীতগোবিন্দ"এর ভাষা সংস্কৃত কিন্তু ঠাট অবহট্‌ঠের বলে মনে করেন ডঃ সুকুমার সেন। এমনকি অবহট্‌ঠে রচিত এক বজ্রগীতিতে কৃষ্ণলীলার 'মান' পর্যায়ের পূর্বাভাসও লক্ষ্য করেছেন ডঃ সেন।[৫৩]

কিন্তু অবহট্‌ঠ সাহিত্য বা লোকসাহিত্যের বস্তুরূপের সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা গেলেও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবপদাবলী-সাহিত্যের সঙ্গে তার পূর্ববর্তী বৈষ্ণবসাহিত্যের ধাতুগত ব্যবধান বর্তমান। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্মে কৃষ্ণলীলা এক সাধনতত্ত্বের মাত্রাযুক্ত হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছে। পদাবলী-সাহিত্যেও তার প্রতিভাস দুর্নিরীক্ষ্য নয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সমস্ত সাধনা এবং সাহিত্য শাস্ত্রীয়-বৈধী-পথের পথিক। গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ভগবৎ-চিন্তা রস-পরিকল্পনা যাতে একটি বিধিবন্ধ পথে পরিচালিত হয়, সেইজন্যে রূপগোস্বামী ভক্তিরসামৃত সিন্ধু রচনা করেন। শুধু ভক্তিরসামৃত সিন্ধুই নয়—গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের বিশেষ করে গোস্বামী-সিদ্ধান্তের সমস্ত কিছুই বৈধী বা শাস্ত্রীয়মতের অনুসারী। শাস্ত্রীয় অনুশাসন, অনুষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠান এঁরা শ্রদ্ধার সঙ্গে মেনে চলেন। অপরদিকে সহজিয়ারা অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠান বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ্য-শাস্ত্রানুশাসনের বাইরে স্বতঃস্ফূর্ত সহজ প্রেমের পথেই সাধনার পক্ষপাতী। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবধর্ম যোষিৎ সংসর্গ সম্বন্ধে সতর্কতার কথা বলেছেন। স্বকীয়া ধর্মপত্নীর সহিত শাস্ত্র-মতে ধর্মীয় ক্রিয়া-কলাপ সাধনভজনের অতিসাবধানী নির্দেশ থাকলেও পরকীয়া নিষিদ্ধ-অপরাধ। যোষিৎ সংসর্গকে গৌড়ীয় মতে দ্বিতীয় দুঃসঙ্গ বলা হয়েছে।[৫৪] পরকীয়া সম্ভাষণ অপরাধ। সহজিয়াদের 'পিরীতি-সাধনা'র প্রধান অবলম্বন পরকীয়া-প্রেম।

৫২, রাধা যমুনা পার হচ্ছেন শ্রীকৃষ্ণের নৌকায়। মাঝ নদীতে শ্রীকৃষ্ণভয় দেখাচ্ছেন নৌকা টলমলিয়ে

ক) আরে রে বাহিহি কাহ্ন নাব ছোড়ি
ডগমগ কুগতি না দেহি।
তই ইথি নঈ হি সন্তার দেঈ
যো চাহসি সো লেহি

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের গোস্বামী-সিদ্ধান্তে রাধাকৃষ্ণলীলা বস্তুরূপ ত্যাগ করে তত্ত্বরূপ লাভ করেছে। বৈষ্ণবপদাবলী সাহিত্যের উপর রূপগোস্বামীর নিবিড় প্রভাব দুর্নিরীক্ষ্য নয়। অনেক গবেষক চুলচেরা বিচার করে চৈতন্যোত্তর পদাবলী সাহিত্যে রূপ তথা গোস্বামী-সিদ্ধান্তের নিবিড় প্রভাব দেখিয়েছেন। এ সাহিত্যে ভক্তিতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্বের নানা জটিল কুটিল স্তর রয়েছে। সর্বত্রই কিন্তু বিধিসম্মত বৈধী পথের অনুসরণ। বৈষ্ণবেরা ভক্তিকে অন্যতম রসরূপে প্রতিষ্ঠা করেছেন। প্রকৃত-মানব-মানবীর শৃঙ্গাররসের মাধ্যমে ভক্তিকে এক রসরূপে প্রতিষ্ঠা করা গোস্বামীদের এক স্মরণীয় কীর্তি হলেও শাস্ত্র এবং শাস্ত্রীয় অলঙ্কারের বৈধী পথেই তা সম্পন্ন হয়েছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মেও সাহিত্যে শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীরাধা, গোপীলীলা এবং কুঞ্জলীলা যথাক্রমে কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, গোপীভাব এবং কুঞ্জসেবা রূপে পরিণত হয়েছে। সবই সাধন তত্ত্ব। গোপীতত্ত্বের আবার একাধিক স্তর, গোপী আর মঞ্জরী। গোপী লীলারসহায়ক তাঁদের সঙ্গে কৃষ্ণের লীলার অসম্ভব নয়-এঁরা গৌড়ীয় মতে শ্রীরাধার কায়াব্যূহ; কিন্তু মঞ্জরীরা শুদ্ধধী। তাঁরা লীলার দর্শিকা নৈষ্ঠিক সাধিকামাত্র।

রূপকে এই মঞ্জরীভাবের প্রবর্তক বলে মনে করা হয়। ছয়গোস্বামী এক এক মঞ্জরী আখ্যায় ভূষিত ছিলেন।[৫৫] শ্রীনিবাস এই মঞ্জরীভাব-সাধনার অন্যতম প্রবর্ত্তক। বিষ্ণুপুরের মন্দির-টেরাকোটায় মঞ্জরীভাব সাধনা সুস্পষ্ট। শুধু তাই নয়, শ্রীনিবাসের শিষ্য প্রশিষ্যের মাধ্যমে যে এই মঞ্জরী ভাব সাধনা প্রসার লাভ করেছিল তারও একাধিক দৃষ্টান্ত বর্তমান।

খ) এক প্রাচীন ছন্দোগ্রন্থে এক বাঙ্গালী লেখক অপভ্রংশ ছন্দের উদাহরণ বলে একটি কবিতা উদ্‌ধৃত করেছেন। এটি বাঙ্গালাদেশে অবহট্‌ঠে লেখা রাধাকৃষ্ণ লীলার সবচেয়ে পুরানো ও দুর্লভ নমুনা। কৃষ্ণ এসেছেন রাধার কাছে। রাধা তাঁকে লক্ষ্য করে ছড়া কাটলেন। তাতে জানিয়ে দিলেন কৃষ্ণ যেন বৃন্দাবনের বিশেষ কোন একটি নিভৃত নিকুঞ্জে গিয়ে অপেক্ষা করেন তিনি একটু পরে গিয়েই মিলিত হবেন।

রাই দোহড়ী পঢ়ণ শুনি হসিউ কাহ্নু গোআল।
বৃন্দাবন ঘন কুঞ্জ ঘর চলিউ কমন রসাল।।

সম্প্রতি বিশ্বভারতী প্রকাশিত "সাহিত্য-প্রকাশিকা" সিরিজে (সাহিত্য প্রকাশিকা ২য়খন্ড) শ্রীদুর্গেশ বন্দ্যোপাধ্যায় 'শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লী" নামে একটি গ্রন্থ সম্পাদনা করে প্রকাশ করেছেন। গ্রন্থটি রূপ গোস্বামীর ভক্তিরসামৃত সিন্ধুর অনুসরণে লিখিত। গ্রন্থটিতে মঞ্জরীভাব সাধনার সুস্পষ্ট প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। শুধু তাই নয় এই গ্রন্থটি গোস্বামী-সিদ্ধান্তের আলোকে রচিত। গ্রন্থের লেখক রসময় দাসকে সঙ্গতকারণেই শ্রীনিবাসের শিষ্য বলে মনে করা হয়েছে।[৫৬] গ্রন্থের আলোচ্য বিষয় ভক্তির বিভিন্ন স্তর বিন্যাস প্রসঙ্গ— রূপ গোস্বামী তথা গোস্বামী-সিদ্ধান্তের আলোকেই লেখক গ্রন্থ রচনা করেছেন।

গ্রন্থকর্তা রসময় দাস গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতেরই শুধু নয় গোস্বামী-সিদ্ধান্তের একজন পরিপোষক এবং এই মতের একজন সাধকও ছিলেন বলে মনে হয়। তাঁর লেখায় মঞ্জরী ভাবসাধনার যে আন্তরিক এবং নৈষ্ঠিক পর্যালোচনা দেখা যায় তাতে সেই ধারণাই জন্মে। তাঁর গ্রন্থের পদাংশগুলি থেকে সম্পাদক সমীচীনভাবেই মনে করেছেন তিনি "সখীভাবক" বা "সখীভেকী" সম্প্রদায়ভুক্ত সাধক ছিলেন।[৫৭] এই সম্প্রদায়ের সাধকরা পুরুষ হয়েও শ্রীকৃষ্ণের সখীজ্ঞানে নারী বেশ বা 'ভেক' ধারণ করেন। পঞ্চাশ-ষাট বছর পূর্বেও বিষ্ণুপুরে এ ধরণের এক বা একাধিক মন্দির-সেবক দেখা যেত।

শুধু তাই নয়, এই গ্রন্থটি থেকেও গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের গোস্বামী সিদ্ধান্তের নৈষ্ঠিক স্মার্ত পৌরাণিক রূপটি সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। "নিবন্ধকার তাঁর এই গ্রন্থে (শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লী) গীতা, ভাগবত,

---

রাইয়ের দোঁহা পড়াশুনে কানু গোয়াল হাসলেন আর বৃন্দাবনের কোন এক নিভৃত কুঞ্জঘরের দিকে কেমন আনন্দে চললেন।

৫৩. বৈষ্ণবীয় নিবন্ধ : ডঃ সুকুমার সেন : (রূপা)

৫৪, গৌড়ীয় বৈষ্ণব মতে "চতুর্বিধ দুঃসঙ্গ" এর কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে প্রথম হ'ল অভক্ত সংসর্গ। যাঁহারা ভগবানের অনুগত নন তাঁহারাই অভক্ত। দ্বিতীয় দুঃসঙ্গ যোষিৎ সংসর্গ। যোষিৎ সংসর্গও অনিষ্টকর সনাতনের প্রতি প্রভুর উপদেশ এই—অসৎসঙ্গত্যাগ—এই বৈষ্ণব আচার।

স্ত্রী সঙ্গী—এক অসাধু; কৃষ্ণাভক্ত আর।। (চৈঃচঃঅঃ ২।১২০)

পদ্মপুরাণ কূর্মপুরাণ, নৃসিংহ পুরাণ, দুর্গমসঙ্গমনী টীকা (শ্রীজীব-গোস্বামী) তন্ত্র, স্মৃতি-শাস্ত্র, উজ্জ্বল নীলমণি ও ভক্তিরসামৃত সিন্ধু, এই প্রমাণ গ্রন্থগুলির উল্লেখ করেছেন।[৫৮] এ থেকেও প্রমাণ হয় গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের আসল রূপটি প্রাচীন আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে গঠিত।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের রাধাতত্ত্বেও অনেকে সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্বের প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। এই মতে বৈভবে গৌরবে ক্রিয়াশীলতায় রাধাতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বকে অতিক্রম করেছে। নিরাসক্ত পুরুষকে এই অনন্তশক্তিরূপিনী প্রকৃতি বা শক্তি ক্রিয়াশীল করে তোলেন। শ্রীকৃষ্ণের অনন্তস্বরূপের যেমন নন্দ-নন্দন শ্রীকৃষ্ণস্বরূপই সচ্চিদানন্দময় স্বয়ং ভগবান, তেমনি শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের পূর্ণ-স্বরূপ শক্তি বা পরাশক্তি শ্রীমতী রাধিকা।[৫৯]

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রেক্ষাপটে অবস্থিত আর্যব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটটি হল রাজতন্ত্র বা সামন্ততন্ত্র। মূলতঃ রাজতন্ত্র বা সামন্ত-তন্ত্রের প্রেক্ষাপটে আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বিকাশ এবং বিস্তার। এ সংস্কৃতিতে রাজা আর ব্রাহ্মণই সমাজের নিয়ামক শক্তি। শুধু সুসমৃদ্ধ সংস্কৃত ভাষাই নয়—লৌহপ্রযুক্তি আর্যদের অনার্য তাম্র-প্রযুক্তির উপর সহজ প্রভুত্ব দিয়েছে। লৌহপ্রযুক্তি দিয়েছে প্রচুর উৎ-পাদন প্রচুর উদ্বৃত্ত সম্পদ ; স্বাভাবিকভাবেই বড় বড় রাজ্য গড়ে উঠেছে। রাজতন্ত্র-সামন্তবাদের গোড়া শক্ত হয়েছে। মৌর্য যুগ থেকেই ব্রহ্মোত্তর

স্ত্রী সঙ্গী এবং কৃষ্ণাভক্ত (কৃষ্ণের অভক্ত) দুই অসাধু। (শ্রীগৌড়ীয় পত্রিকা ৩৪বর্ষ শ্রাবণ ১৩৮৯ নবদ্বীপ)

৫৫, মঞ্জরী সাধন :

শ্রীরূপমঞ্জরী আর শ্রীরতিমঞ্জরী শ্রীগুণমঞ্জরী আর লবঙ্গ মঞ্জরী।
শ্রীমঞ্জরী আদি রসের আকর কুঞ্জে রাধাকৃষ্ণসেবা করে নিরন্তর'।
কৃষ্ণ সেবা যত ইহা সভার গোচর ইহা সভার আজ্ঞা বিনে শ্রবণ দুষ্কর।
ইহা সভার অনুগত আজ্ঞাকারী হৈব সদা রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিব।
তার ভাবসিন্ধ হঞা জন্মিব গোকুলে রাধাকৃষ্ণ সেবন করিব কুতূহলে।

উপরোক্ত মঞ্জরীরাই এক একজন বৈষ্ণব গোস্বামী।

সেবাপরায়ণী, একজনী, অনুগা. অনুচরী ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগের

প্রদানের নীতির আভাস সুস্পষ্ট—গুপ্তযুগে এর পাথুরে প্রমাণ প্রচুর লেখমালা। সীমাতিরিক্ত ব্রহ্মোত্তর প্রদান রাজধর্মের অঙ্গ হওয়ায় রাজা-ব্রাহ্মণ (বা বুদ্ধিজীবী) সমাজের নিয়ামক শক্তিতে পরিণত হয়েছে। ক্রমশঃ আর্য-ব্রাহ্মণ্য বৈদিক ছাঁচটি দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। বেদ-ব্রাহ্মণ-রাজার প্রতি প্রশ্নহীন আনুগত্যের অনুশাসন প্রাচীন শাস্ত্র-সাহিত্যে বর্তমান ; মহাভারতের অনুশাসন পর্বে একদিকে যেমন ব্রাহ্মণকে ভুমিদান রাজার কর্তব্যরূপে নির্দেশিত হয়েছে।[৬০] অন্যদিকে বেদকে অভ্রান্ত এবং অপৌরুষেয় বলে নির্দ্বিধায় মেনে নেওয়ার অনুশাসনও রয়েছে। হেতুবাদ বা যুক্তিবাদকে নিন্দা করা হয়েছে এবং যুক্তিবাদী বা বেদনিন্দককে কুক্কুরের মত হেয় বলা হয়েছে।[৬১] রাজা-সামন্ত-অথবা শাস্ত্রের কাছে আত্মসমর্পনের এই বাতাবরণ সমাজে দাস্যভাবকেন্দ্রিক শরণাগতির বিশিষ্ট ভক্তিদর্শনটির সহজ বিকাশ ক্ষেত্র হয়েছে স্বাভাবিকভাবে।[৬২]

বিষ্ণুপুরে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবসংস্কৃতির সামগ্রিক প্রেক্ষাপটটিতে যথানিয়মে প্রাচীন ভারতের আর্য-ব্রাহ্মণ্য বা ক্লাসিকসংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের আভাস উপস্থিত। শত শত টোলে ব্যাপক সংস্কৃত চর্চার

ফলে 'ভক্তিবল্লীর' পদে 'সখীভেকী'র দ্যোতনা। (দ্রঃ ৫৭) সখীভেকী সম্প্রদায়ের কথাই শুধু নয় এইসব পদে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের গোস্বামী-সিদ্ধান্তের সাধনপ্রণালীও ব্যক্ত হয়েছে।

৫৬, রসময় দাস শ্রীনিবাসের নাম পুনঃ পুনঃ ব্যবহার করিয়াছেন। 'গদাধর পন্ডিত ঠাকুর শ্রীনিবাস / ভক্তি দিঞা কর মোরে আপনার দাস। বা শ্রীনিবাস আচার্য ঠাকুর মহাশয় /তোমার পদারবিন্দে করিব বিনয়। কিন্তু অন্য বৈষ্ণব মহাজনদের উল্লেখ একবার মাত্রই করিয়াছেন এবং শ্রীনিবাসের পরবর্তী অন্যকোন বৈষ্ণব আচার্যের উল্লেখ করেন নাই। ইহাতে অনুমান হয় রসময় দাস শ্রীনিবাস আচার্যের ভক্ত বা মন্ত্র শিষ্যছিলেন। (শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিবল্লীরভূমিকা : শ্রীদুর্গেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত : সাহিত্য প্রকাশিকা দ্বিতীয় খন্ড : ১৩৬৩ বিদ্যাভবন শান্তিনিকেতন)

৫৭, রসময়দাস 'সখীভেকী' সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন বলে মনে করার কারণ হিসাবে সম্পাদক গ্রন্থের কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করেছেন।

প্রিয় নর্মসখীগণ সেবাপরায়ণী তারমধ্যে আপনি হইব একজনী
বহুযত্ন করি কৃষ্ণ সেবা মাগি নিব সময় উচিত সেবা যতনে করিব ॥

সাক্ষ্য দিচ্ছে হাজার হাজার পুঁথি যেগুলির মধ্যে ন্যায় স্মৃতি, পুরাণ মহাকাব্যের শত শত প্রতিলিপিতে একদিকে যেমন বর্ণবিভক্ত-সমাজের ইঙ্গিত, অন্যদিকে তেমনি ক্লাসিক সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের আভাস।

যাইহোক, একথা অনস্বীকার্য যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম সমাজের উচ্চবর্ণভুক্ত মানুষের মধ্যে অর্থাৎ সমাজের উপরিকাঠামোর মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল।[১৩] এর সঙ্গে তাই সমাজের তথাকথিত নিম্নকাঠামো থেকে উদ্ভূত সহজিয়া বৈষ্ণবধর্মের পার্থক্য ছিল প্রচুর। একটি সমাজের উপরি-কাঠামো (সুপার স্ট্রাকচার) অন্যটি অন্তর্গূঢ় নিম্নকাঠামো (ডীপ-ইনফ্রাস্ট্রাকচার) থেকে উদ্ভূত। একটি উচ্চ অবস্থানের বুদ্ধিজীবীদের তীক্ষ্ম মেধাপ্রসূত উচ্চ এবং জটিল দার্শনিক তত্ত্ব সমন্বিত অনেকাংশে সূক্ষ্ম অভিজাত নাগর-সংস্কৃতি প্রভাবিত অন্যটি সমাজের তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মানুষের সহজ হৃদয়াবেগ সম্ভূত অনেকাংশে গ্রামীণ লোকসংস্কৃতি সঞ্জাত। প্রথমটির প্রকাশ মাধ্যম পরিশীলিত সালঙ্কারা সংস্কৃতভাষা অন্যটি সাদামাঠা অনেকাংশে আদিমতাগন্ধী এবং অমার্জিত মাতৃভাষা।

৫৭, আর এক কথা কহি জ্ঞানের সার — কুঞ্জে সেবা পাইতে পরম অধিকার
প্রিয় নর্মসখী কুঞ্জসেবা অধিকারী — গুরু আজ্ঞায় তা সভার হব অনুচরী।
অতএব শ্রীরূপ অনুগা হৈতে চাই……

৫৮. শ্রীকৃষ্ণভক্তিরসবল্লীর (রসময় দাস : শ্রীদুর্গেশ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত : সাহিত্য প্রকাশিকা দ্রষ্টব্য)

৫৯, শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণ একাত্মা এবং রসপুষ্টিহেতু দুইদেহে প্রতিভাত। তাঁরা পৃথক হয়েও অপৃথক। এ তত্ত্বের মূলেও উপনিষদ। শ্রীরাধাকে কেন্দ্র করে শক্তিতত্ত্বর অবতারণাও তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রীমতী রাধিকাই কৃষ্ণের অনন্ত শক্তির অধিকারিণী ও কৃষ্ণলীলার সহায়কারিণী। বৃন্দাবনের একমাত্র অধিশ্বরী প্রেমস্বরূপিনী শ্রীরাধা রাসক্ষেত্রে নিজে নাচেন ভক্তকে নাচান এবং কৃষ্ণকেও নাচান।

কৃষ্ণেরে নাচায় প্রেমা ভক্তেরে নাচায়।
আপনে নাচায়—তিনে নাচে এক ঠাঁই (চৈঃ চঃ)

শ্রীরাধিকা ব্রজধামে সর্বদা কৃষ্ণসকাশে থেকে কৃষ্ণের আনন্দ বিধান করেন। পূর্ণস্বরূপ শক্তিরূপ। শ্রীরাধিকা ক্রিয়া করবার উদ্দেশ্যে চিচ্ছক্তি,

কিন্তু এই দুই পৃথক মেরুর মধ্যে আপাত ব্যবধান সত্ত্বেও মানুষের (তৃণমূল থেকে উৎসারিত) চিরায়ত আদিম রসতৃষ্ণা উপরিকাঠামোর সযত্ন রচিত ধর্মদর্শন স্মৃতিপুরাণের অনুশাসন উপেক্ষা করে পরিশীলিত সাধুসাহিত্যে প্রতিভাসিত হয়। অধিকাংশ সময় পরিবর্তিত প্রাসঙ্গিকতায় বা ''কনটেক্সট''এ। এই মানবিক রসতৃষ্ণার চাপেই জয়দেবের সংস্কৃতভাষার শৃঙ্খল শিথিল হয়েছে—পূর্ব'ত প্রমাণ দ্বিধা সত্ত্বেও গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে পরকীয়া প্রেম আপনার স্থান করে নিয়েছে—শ্রীমদ্ভাগবত বা গীতগোবিন্দের বহির্ভূত হয়েও লৌকিক দানলীলা ও নৌকালীলা নৈষ্ঠিক গোস্বামী-সাহিত্যে সিঁদ কেটে অনুপ্রবেশ করেছে রসের উল্লাসকে ঘনীভূত করতে। মানুষের অকৃত্রিম এবং সহজ হৃদয়াবেগ প্রসূত শিল্পসাহিত্য ধর্মতত্ত্ব বা সাধনদর্শন থেকে অধিকতর দীর্ঘজীবী। তাই দেখা যায়, ধর্মীয়-পূজাপাঠ কিংবা উপাসনার সম্পূর্ণ অবসানের পরও মন্দির-মসজিদের স্থাপত্য-ভাস্কর্য কিংবা চিত্রশিল্প তার আপন মহিমায় হাজার হাজার বছর ধরে মানুষের রসতৃষ্ণা-সৌন্দর্যপিপাসা চরিতার্থ করে।

৬০, মোদতে চ সুখং স্বর্গে দেবগন্ধর্ব পূজিতঃ।
যো দদাতি মহীং সম্যগ বিধিনেহ দ্বিজাতয়ে ।। ৮৭

যিনি যথাবিধানে ও সমীচীনভাবে ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করেন তিনি স্বর্গে যাইয়া দেবগণও গন্ধর্বগণকর্তৃক সম্মানিত হইতে থাকিয়া আনন্দসুখ অনুভব করিয়া থাকেন। (মহাভারত : অনুশাসন পর্ব : হরিদাস সিদ্ধান্ত-বাগীশ সম্পাদিত)

৬১, ভবেৎ পণ্ডিতমানী যো ব্রাহ্মণো বেদনিন্দকঃ।
আন্বীক্ষিকীং তর্কবিদ্যামনুরক্তো নিরর্থিকাম ।। ১২
হেতুবাদান ব্রুবন্ সৎসু বিজেতা হেতুবাদিকঃ। ইত্যাদি

"যে ব্রাহ্মণ নিজেকে পণ্ডিত মনে করে, বেদের নিন্দা করিয়া থাকে, যুক্তিবাদ সমন্বিত অনর্থক তর্কবিদ্যায় অনুরক্ত হয় সজ্জনগণের মধ্যে হেতুবাদের অবতারণা করে হেতু বলিয়া বিপক্ষকে জয় করে থাকে" তাদেরকে অন্যব্রাহ্মণের প্রতি ক্রোধী মূঢ় এবং বালকসুলভ চপল ব্যক্তিদের সমগোত্রীয় করে কুকুরের সমতুল্য বলা হয়েছে। এই উক্তিতে বেদনিন্দা এবং যুক্তিবাদের বিরোধিতাই প্রতিভাত।

বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত টেরাকোটা-মন্দির শ্যামরায় আর জোড়বাংলায় পুজার্চনা বহুপূর্বেই বন্ধ হয়েছে—একই অবস্থা বিরল-স্থাপত্য-কীর্তিরাসমঞ্চের। তবু দুর্লভ শিল্প নিদর্শনরূপেই এগুলি আজও শিল্প রসিক দর্শকের আকর্ষণের বস্তু। একইভাবে ত্রিবেণী-গৌড়-পাণ্ডুয়া হাজার হাজার দর্শকের আকর্ষণ স্থল।

বিষ্ণুপুরের মন্দির-টেরাকোটার পিছনে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের, বিশেষকরে, গোস্বামী-সিদ্ধান্তের তত্ত্ব প্রচারের প্রেরণাই ছিল মুখ্য। শিল্পের বাহনে ধর্মপ্রচারের ঐতিহ্য দেখা যায় ভাগবদ্ধর্মে গুপ্তযুগেই। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের ধাতু প্রকৃতিতে নিহিত ক্লাসিক সংস্কৃতি বা প্রাতিষ্ঠানিক (বৈধী) আর্য-ব্রাহ্মণ্য বৈদিক সংস্কৃতির সর্বাত্মক প্রকাশই এখানে ঘটেছে। মন্দির-টেরাকোটায় এর শৈল্পিক প্রকাশ ছাড়াও ব্রাহ্মণ্য প্রভাবপূর্ণ মল্লরাজ্যের রাষ্ট্রনীতিতে রাজনৈতিক, স্মৃতি শাসিত বর্ণবিভক্ত সমাজ ব্যবস্থায় সামাজিক, ক্লাসিক শাস্ত্র-সাহিত্যের ব্যাপক অনুশীলনে এর সাংস্কৃতিক এবং ব্রাহ্মণ্যগুরুবাদ (গোস্বামী-গুরুবাদ) প্রধান গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে এর ধর্মীয় প্রকাশ ঘটেছে। এক কথায় শিল্প, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি, পঠন-পাঠন সর্বত্র ক্লাসিক-সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন প্রয়াস এখানে পরিলক্ষিত হয়। সমসাময়িককালে ক্লাসিক সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন প্রয়াসের অন্য এক চর্চাকেন্দ্র নবদ্বীপের প্রভাব এখানের পুঁথি সংগ্রহে প্রচুর। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সপ্তদশ শতকে বিষ্ণুপুরের সাংস্কৃতিক বিকাশের অন্যতম কারণরূপে, নবদ্বীপের সঙ্গে বিষ্ণুপুরের নিবিড় সংযোগের কথা বলেছেন। পরবর্তী অধ্যায়ে এ বিষয়ে আলোকপাতের চেষ্টা করা হ'ল।

---

৬২. আনের কি কথা বলদেব মহাশয়।
যাঁর ভাব—শুদ্ধসখ্য বাৎসল্যাদিময়।।
তেঁহো আপনাকে করেন দাসভাবনা।
কৃষ্ণদাস ভাববিনু আছে কোনজনা।। —(চৈতন্য চরিতামৃত)

৬৩. Infact that movement of Caitanya was supported mostly by the liberal Brahmanas should not be ignored. Of four hundred and ninety companions of Caitanya, two hundred and thirty nine were Brahmanas thirty seven were Vaidyas, twenty nine were Kayasthas .... It was therefore essentially a movement of Brahmanas and upper sudras...—"

Vaisnavism in Bengal ; Ramakanta Chakrabarty.



বৈষ্ণব-সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে মল্লভূমের চর্চা-চিন্তায় নবদ্বীপের প্রভাব

বৈদিক-আর্য সংস্কৃতির বর্ণবিভক্ত পিতৃতান্ত্রিক সমাজ-ব্যবস্থার ধারা প্রতিষ্ঠার অন্যতম মাধ্যম হল ক্লাসিক শাস্ত্র-সাহিত্য। বৈদিক আর্যরা অনার্যদের উপর আধিপত্য বিস্তার করেছিল দুটি উপায়ে: একটি শস্ত্রপাণি হয়ে অন্যটি শাস্ত্রপাণিরূপে। দ্বিতীয় উপায়েই তাদের সাংস্কৃতিক বিজয় সম্পন্ন হয়েছিল একথা আগেই বলা হয়েছে। আর্যদের সাংস্কৃতিক বিজয় নিশ্চিতরূপে অমোঘ—যা আজও ভারত-সংস্কৃতির ধাতু প্রকৃতিতে গভীরভাবে নিহিত আছে।

ভারতসংস্কৃতির মূলধারা দুটি; একটি সিন্ধুতীরের প্রাগার্য মাতৃতান্ত্রিক ধারা, অন্যটি গাঙ্গেয়-উপত্যকায় বিকাশপ্রাপ্ত পিতৃতান্ত্রিক আর্য সংস্কৃতির ধারা। বৈদিক আর্যরা তাদের সমস্ত সাংস্কৃতিক উপাদানের শিরা উপশিরা দিয়ে বৈদিক সংস্কৃতির মর্মভিত্তি বর্ণাশ্রম আর পিতৃতন্ত্র সমাজের সর্বত্র সঞ্চারিত করেছে। ন্যায়-স্মৃতি বা ব্যবহার শাস্ত্র এমনি এক একটি মাধ্যম। প্রাচীন বঙ্গ থেকেই এসমস্ত শাস্ত্র-সাহিত্যের অনুশাসনের আভাস থাকলেও ব্রাহ্মণ্যসংস্কৃতির ক্রমবিকাশকে কেন্দ্র করে এগুলির ব্যাপক বিস্তার আর প্রতিষ্ঠা দৃঢ়তর হয়েছে। প্রাচীনকালে স্মৃতি-শাস্ত্রের নাম ছিল ধর্মশাস্ত্র। স্মৃতির অনুশাসনে বর্ণাশ্রম যেমন সুনির্দিষ্টভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল দায়শাস্ত্রের মাধ্যমে উত্তরাধিকার নিয়ন্ত্রণের ফলে পিতৃতান্ত্রিকতা তেমনি সুদৃঢ় ভিত্তিলাভ করেছিল। সম্বন্ধ প্রায়শ্চিত্ত শ্রাদ্ধাদি বিচারের অনুশাসনে একদিকে যেমন বর্ণাশ্রমের ইঙ্গিত, বিবাহাদির নিয়ম-শৃঙ্খলার মধ্যে তেমনি উত্তরাধিকার নির্ণয় এবং পিতৃতান্ত্রিকতার বিস্তারে প্রচেষ্টা

লক্ষ্য করা যায়। উত্তরাধিকার সুনিশ্চিত করার জন্যে 'নিয়োগ-প্রথায়' নিঃসন্তান বিধবার গর্ভে দেবর বা অনুরূপ সম্পর্কের আর কেও সন্তান উৎপাদন করতে পারতেন যে পুত্রের পিতৃ পরিচয় হ'ত শাস্ত্রীয় নিয়মে বিবাহিত স্বামীর পরিচয়ে। তাঁর রাজ্য-সম্পদের উত্তরাধিকারী হ'ত এই সন্তান। উত্তরাধিকারের প্রশ্নে সতীত্ব-অসতীত্বের সংস্কারও অতিক্রম করা হ'ত শাস্ত্রীয় অনুশাসনেই।

কিন্তু অনার্য মাতৃতান্ত্রিকতার উপর আর্য-পিতৃতান্ত্রিকতার সম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠা একদিনে সম্ভব হয় নাই। অনেক সময় লেগেছে। বেদের যুগে শাস্ত্রীয় বিবাহ আজকের মত আবশ্যিক ছিলনা বলে পণ্ডিতরা মনে করেন; মহাকাব্যের যুগেও স্বয়ম্বর পদ্ধতিতে নারী স্বাধীনভাবে পতি নির্বাচন করতেন। শুধু তাই নয়, বহু স্বাধীনপতিকা রমণী সর্তসাপেক্ষ চুক্তিবিবাহে মিলিত হতেন (উর্বশী পুরুরবা — শান্তনু গঙ্গা ইত্যাদি) চুক্তিভঙ্গে সহজ এবং স্বাভাবিকভাবেই বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটত। মহাকাব্যের যুগেও (মহাভারত) বহু নারী-ব্যক্তিত্বের সাক্ষাৎ মেলে যাঁরা পুরুষ-ব্যক্তিত্বের সমান এমনকি ক্ষেত্রস্থলে সমধিক তেজস্বিনী। শস্যপ্রসবিনী মাটির মত সন্তান প্রসবিনী নারীকে অস্বীকার করা যায়নি সহজে। সংহিতায় মাতৃকা ও মৃত্তিকাকে সমগোত্রীয় করে নারীর ত্রুটি মার্জনা করার কথাও বলা হয়েছে। পুরুষ বা পিতৃতন্ত্রের সমান্তরালে ভারতীয় ধর্মসংস্কৃতিতে তাই শক্তি-তত্ত্বের উজ্জ্বল উপস্থিতি। উর্বরতা শক্তিই এই শক্তিতত্ত্বের মূলে। কঠোর শাস্ত্রীয় অনুশাসনকে অতিক্রম করে এই শক্তিতত্ত্ব আদিমকাল থেকে আধুনিককাল পর্যন্ত আপন মহিমায় প্রসারিত। মাতৃকা আর মৃত্তিকা উর্বরতার প্রতীক। উর্বরতা শক্তির প্রচন্ডতাই শক্তি তত্ত্বের মূলে। শক্তি আর চণ্ডী অভিন্ন। পুরাণে অসুর কর্তৃক পরাজিত দেবতারা নিজ নিজ তেজ দিয়ে এক শক্তিমূর্তি নির্মাণ করেছিলেন, যিনি প্রচণ্ডাচণ্ডীর অপরিমেয় শক্তিতে অসুর নির্মূল করেছিলেন। সেই প্রাচীন যুগ থেকে বৈষ্ণব যুগ পর্যন্ত শক্তিতত্ত্বের অপ্রতিহত গতি। বৈষ্ণবের যুগলতত্ত্ব, তন্ত্রের যামলতত্ত্বের অনুরূপ। শ্রীরাধিকা শ্রীকৃষ্ণের পরাশক্তি হলেও গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্বে সমধিক গুরুত্ব বা মাত্রা পেয়েছেন। রাধাতত্ত্ব আপন মহিমায় উদ্ভাসিত।

রাধাতত্ত্ব গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের শক্তিতত্ত্বের আকর। এরই ব্যঞ্জনায় বৈষ্ণব মন্দিরের টেরাকোটায় শত শত শক্তিমূর্তির বিপুল সমারোহ। শ্যামরায় মন্দিরের দশাবতার-প্যানেলের সমান্তরালে দশমহাবিদ্যা প্যানেলের উপস্থাপনেই শুধু নয়. জোড়বাংলায় দেবীযুদ্ধও মাতৃকা-প্যানেলেও শাক্তচিত্রের উজ্জ্বল উপস্থিতি। মাতৃকা প্যানেলগুলিতে শুধু বাৎসল্য রসের বিকাশ ঘটে নাই অমিত শক্তিময়ী প্রচণ্ডাচণ্ডীর যুযুধান রূপেরও সমধিক বিকাশ ঘটেছে। সৃজনশীল সৃষ্টির প্রতীক এই মাতৃকাশক্তি সৃষ্টির হন্তারক অসুরের মুণ্ডপাত করছেন। শস্যে শষ্পে পরিপূর্ণ করে এই মাতৃকাশক্তি সৃষ্টিকে রক্ষা করছেন। অমোঘ সৃষ্টি শক্তির মূর্তপ্রতীক "যা দেবী সর্বভূতেষু সৃষ্টিরূপেন সংস্থিতা"—তাঁকে প্রণাম করেছেন ঋষি। সৃষ্টি শক্তি উর্বরতাবাদেরই নামান্তর।

শুধু বিষ্ণুপুরে নয়, বৈষ্ণব-টেরাকোটা মন্দিরের সর্বত্র এই শক্তিচিত্রের বা মাতৃকা প্যানেলের বহুল উপস্থাপন। বিষ্ণুপুরের বৈষ্ণব মন্দিরে রামসীতা, উমামহেশ্বর, লক্ষ্মীনারায়ণ রাধাকৃষ্ণ ছাড়াও অধিকাংশ দেবতা স্ব স্ব শক্তিসহ বর্তমান দেখা যায়। কানপুরের ভিতরগাঁও-এর টেরাকোটা মন্দিরেও উমামহেশ্বর চিত্রের সাক্ষাৎ পেয়েছেন গবেষকরা। শুধু বৈষ্ণবের যুগল তত্ত্ব আর তন্ত্রের যামলতত্ত্বই নয় সুপ্রাচীন কাল থেকে ভারতীয় অধ্যাত্মদর্শনে দ্বৈতবাদ আর লীলাবাদের প্রাধান্য থেকে এটা মনে করা অসঙ্গত নয় যে, প্রাগার্য সংস্কৃতির মাতৃকাতন্ত্রের উপর আর্যরা পিতৃতন্ত্রের শাস্ত্রীয় অনুশাসন আরোপ করে মাতৃকাতন্ত্রকে কিছুটা অবদমিত করলেও অপ্রতিরোধ্য এই প্রচন্ড উর্বরতা-শক্তিকে অবলুপ্ত করতে পারেনি। একদা শুধু ভারতে নয়, সমগ্র ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে প্রবর্তিত এই উর্বরতার প্রতীক মাতৃকাপূজো আর্যব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করে তারও সমধিক বিবর্তন ঘটিয়ে দ্বৈতবাদের তথা লীলাবাদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করেছে। উপনিষদ থেকে বৈষ্ণবদর্শন পর্যন্ত তারই অভিব্যক্তি। সাংখ্যের প্রকৃতি পুরুষেও তারই ব্যঞ্জনা। মাতৃকা আর মৃত্তিকার অমোঘ শক্তি আর্য-ব্রাহ্মণ্য দর্শনকেও পরিবর্তিত করে এক শক্তিশালী তন্ত্র শাখার বিকাশ ঘটিয়েছে একথা মনে করা

অসঙ্গত নয়। ভারত সংস্কৃতির সর্বত্র এই আর্য-অনার্য সংস্কৃতির সংঘর্ষ এবং সমন্বয় সর্বদা উচ্চারিত।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মাধ্যমে এক অধ্যাত্ম-সাম্যবাদ প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেও ষট্‌গোস্বামী প্রণীত গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শন বা গোস্বামী-সিদ্ধান্ত ভারতীয় ক্লাসিক-সংস্কৃতির স্মার্ত-পৌরাণিক পথেরই অধিকতর অনুগামী হয়ে পড়েছিল। মূলতঃ প্রেমভক্তির সহজ ভিত্তির উপর পরিকল্পিত হয়েছিল চৈতন্যের গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম। তাই গোস্বামী সিদ্ধান্তের নৈষ্ঠিক স্মার্ত-পৌরাণিক বিবর্তনে এর অনুষ্ঠান-প্রধান প্রাতিষ্ঠানিক বিবর্তন ঘটলেও চৈতন্যের ভক্তিধর্মের স্বভাব-দ্রাব্যতাহেতু প্রাতিষ্ঠানিক গোস্বামী সিদ্ধান্তের বিপরীতে সহজসাধনার এক প্রবল ধারা সার্বজনীন বৈষ্ণবধর্মের রূপে শত শত সাধারণ মানুষ বিশেষ করে বর্ণ-গোত্রহীন মানুষের আশা-আকাঙ্খা এবং রসতৃষ্ণা চরিতার্থ করেছে। এই সহজ সাধনার ধারা অনুসরণ করে বৈষ্ণবধর্মের প্রচুর উপশাখা বিকাশ লাভ করেছে খ্রীষ্টীয় ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতকে। আউল-বাউল-মরমিয়া-কর্তাভজা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। বাঘনাপাড়ার সহজসাধনার ধারার কথা আগেই আলোচিত হয়েছে। সাধারণভাবে প্রেমভক্তির আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত হলেও এসব সহজ-সম্প্রদায় স্ব স্ব সাধন দর্শন নিয়ে বিকশিত হয়েছিল। সহজিয়া ধর্মের বিবর্তনের পশ্চাতে তাত্ত্বিক বা দার্শনিক প্রেরণার চেয়ে সামাজিক প্রভাবই বেশী। বুদ্ধিজীবী মনীষা প্রসূত জটিল বিচার-বিশ্লেষণ-বিজড়িত উচ্চমানের দার্শনিক তত্ত্বসমাকীর্ণ নৈষ্ঠিক আচার-অনুষ্ঠান-প্রধান প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মদর্শনের পাশ কাটিয়ে লোক সাধারণের রসতৃষ্ণা চরিতার্থ করার জন্যে ভারতের প্রায় সব ধর্ম-দর্শনেরই সহজিয়া লোকায়ত বিবর্তন ঘটেছে। তাই সহজিয়া ধর্ম-দর্শন বা সাহিত্যের স্ব স্ব মতাদর্শ থাকলেও তাতে আদিম তন্ত্রাচারের প্রভাব দুর্নিরীক্ষ্য নয়। বৌদ্ধধর্মের একই অবস্থা হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক বৌদ্ধধর্ম যখন শ্রেষ্ঠী রাজা তার সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর পক্ষপাতী হয়েছে লোকসাধারণ তা থেকে নিজ নিয়মে পথ কেটে সহজিয়া রূপের বিবর্তন ঘটিয়েছে। বৈষ্ণবধর্মের গোস্বামী সিদ্ধান্ত সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর অনুগামী হলে স্বাভাবিক নিয়মে তার সহজিয়া

বিবর্তন ঘটেছে। সমাজের উচ্চ এবং নিম্ন দুই অবস্থান পার্থক্যই সব ধর্ম-দর্শনেরই স্তর বিভাগের মূলে কাজ করেছে। সমাজ-সংস্কৃতির সর্বত্রই এই মেরুবিভাজন। এককথায় সহজিয়া বৈষ্ণবধর্ম তথা বৌদ্ধধর্ম অনেকাংশে গোত্রহীন-বিত্তহীন মানুষের লোকমার্গ। পণ্ডিততন্ত্রের বিরুদ্ধে এক সূক্ষ্ম প্রতিবাদও এতে বর্তমান। ভারত-সংস্কৃতির উচ্চস্তরে চিন্তাশীল মনীষার অত্যাশ্চর্য দার্শনিক বিকাশ ঘটলেও দেশের অধিকাংশ মানুষের কাছে তা অর্থহীন। এইসব উচ্চমার্গের ভাবাদর্শ দিয়ে দেশের সর্বস্তরকে প্রভাবিত করে জাতীয় সংহতির সুদৃঢ় এবং সুপ্রশস্ত পথরচনা সম্ভব হয় নাই। ভারতের বুদ্ধিজীবী মনীষার মনন-চিন্তন দেশের অবক্ষয় রোধে কোন ভূমিকাই পালন করে নাই। গজদন্ত-মিনারে নির্বাসিত থেকেছে। শুধু বৌদ্ধধর্ম বা বৈষ্ণবধর্মই নয়—সংস্কৃত শিক্ষা এবং ইংরাজী শিক্ষা কিছু 'এলিট' গোষ্ঠীর বিকাশ সম্ভব করলেও এতে দেশের সর্বাত্মক বিকাশ সম্ভব হয় নাই।

বিষ্ণুপুরে, নিষ্ঠাবান স্মার্তপণ্ডিত গোপালভট্টের শিষ্য শ্রীনিবাস আচার্যের প্রযত্নে যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের 'গোস্বামী সিদ্ধান্ত'ই রাজধর্মরূপে বিকাশ লাভ করেছিল পূর্বেই তার ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে। ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতি-নির্ভর গোস্বামী-সিদ্ধান্তের প্রভাবে মল্লরাজাদের রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রেই শুধু ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের প্রাধান্য ঘটেনি, সামাজিক এবং শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রেও আর্য-ব্রাহ্মণ্য ছাঁচটি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে দেখা যায়। বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদের বিপুল পুঁথি সংগ্রহ তারই সাক্ষ্য বহন করছে। মন্দির-টেরাকোটাতেও গোস্বামী-সিদ্ধান্তের অনুষ্ঠান-প্রধান-প্রাতিষ্ঠানিক রূপটিই প্রাধান্য লাভ করেছে। গোস্বামী-সিদ্ধান্তের সাধন-দর্শনের অনুসরণেই টেরাকোটা-অলঙ্করণ রূপায়িত হয়েছে এবং এই চিত্রগুলিতে অনেকাংশে সর্ব-ভারতীয় স্তরের চিত্রভাস্কর্যের অনুবর্তন ঘটেছে—অবশ্যই গোস্বামী সিদ্ধান্তের আলোকে।

বঙ্গে সংস্কৃত চর্চার মূলকেন্দ্র নবদ্বীপে সেন রাজত্বকালে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির যে অভ্যুত্থান ঘটেছিল সপ্তদশ শতকে 'ক্লাসিক-রিভাইভ্যাল'এ তারই পুনরুজ্জীবন প্রয়াস পরিলক্ষিত হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের

বিশেষতঃ গোস্বামী-সিদ্ধান্তের উৎপত্তি ও বিকাশ ক্ষেত্র ছিল সংস্কৃত ভাষা ও আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি-নির্ভর। অধিকাংশ গোস্বামী গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত এবং প্রাচীন সংস্কৃত-সাহিত্যের সুভাষিতাবলীর উদ্ধৃতি সম্বলিত। সপ্তদশ-শতকে বঙ্গে সংস্কৃতচর্চার অন্যতম অনুপ্রেরণা ছিল গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম। এসময় নবদ্বীপে বহু নৈয়ায়িক এবং স্মার্তপণ্ডিত বৈষ্ণবগ্রন্থ এবং টীকা-টিপ্পনি রচনা করেছেন। অনেকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের অনুরাগীও ছিলেন।

যাইহোক, বিষ্ণুপুরের পুঁথি সংগ্রহে ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের নবদ্বীপের নব্যন্যায় এবং নব্যস্মৃতির প্রভাব সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। এগুলি প্রাচীন-স্মৃতি ও ন্যায়েরই নবকলেবর বা পুনরুজ্জীবন। হাজার হাজার সংগৃহীত পুঁথি থেকে মনে হয় সপ্তদশ শতকের থেকে নবদ্বীপের সঙ্গে বিষ্ণুপুরের নিবিড় যোগ ছিল। অধিকাংশ পুঁথি দু'শ আড়াইশ বছরের প্রতিলিপি হলেও এগুলি পূর্বপ্রচলিত পুঁথিরই কপি মনে করা অসঙ্গত নয়। তিন-চার শ' বছরের পুঁথিও অনেক রয়েছে। অতএব এগুলি ষোড়শ-সপ্তদশ শতক থেকে নবদ্বীপের সঙ্গে বিষ্ণুপুরের সাংস্কৃতিক যোগই প্রমাণ করে।

'বিষ্ণুপুর আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনে' সংরক্ষিত পুঁথিগুলি বিশ্লেষণ করলে সেন যুগের ব্রাহ্মণ্য অভ্যুত্থানের চিত্রও যেমন পরিস্ফুট হয়, কুমুদনাথ মল্লিক রচিত নদীয়া কাহিনীতে উল্লিখিত নবদ্বীপের ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের ক্লাসিক চিন্তা-চর্চার সঙ্গে বিষ্ণুপুরের মিলটিও তেমনি ফুটে উঠে।

সেন রাজত্বের কবি জয়দেবের গীতগোবিন্দের যে এ অঞ্চলে একদা বহুল চর্চা হয়েছিল তার একাধিক সূত্র আগেই দেখানো হয়েছে। এ যুগের অন্যতম বিখ্যাত কবি ধোয়ীর পবনদূতের একটি প্রামাণ্য প্রতিলিপিও একদা বিষ্ণুপুরের রঘুরাম শিরোমণির চতুষ্পাটীর সংগ্রহ থেকে মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদশাস্ত্রী কর্তৃক সংগৃহীত হয়েছিল। (সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা বঙ্গাব্দ ১৩৩০ প্রথম সংখ্যা পৃঃ১৭)

হলায়ুধের স্মৃতিসর্বস্ব (বিষ্ণুপুর আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনের পুঁথির নং ৪৫৫৭) পক্ষধর মিশ্রের "সামান্য লক্ষণা" ন্যায়ের টীকাও বিষ্ণুপুর যোগেশ চন্দ্র পুরাকৃতি ভবনে রয়েছে।

এ ছাড়া মথুরানাথ তর্কবাগীশের "দীধিতির টীকা" ও অন্যান্য গ্রন্থ (তর্ক মাথুরী ইত্যাদি). পরমবৈষ্ণব বিশ্বনাথ পঞ্চানন কৃত প্রসিদ্ধ "সিদ্ধান্তমুক্তাবলীর" (ভাষা পরিচ্ছেদ) টীকা, বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর (ইনিও বৈষ্ণব ছিলেন) "অলঙ্কার কৌস্তুভ" (অলঙ্কার কৌস্তুভে চৈতন্যানন্দ উল্লিখিত) প্রভৃতিগ্রন্থ বিষ্ণুপুরের সংগ্রহে দেখা যায়। রুদ্ররাম তর্কবাগীশের টীকা বা "রৌদ্রী" জগদীশ তর্কালঙ্কার ও গদাধর ভট্টাচার্যের বহু গ্রন্থ এই সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত। শ্রীকৃষ্ণ তর্কালঙ্কার রচিত জীমূতবাহনের "দায়ভাগের" টীকা 'দায়ক্রমসংগ্রহ বা "ক্রমসংগ্রহ"ও এ সংগ্রহে বর্তমান। গোপাল পঞ্চাননের শুদ্ধি-নির্ণয়, 'অশৌচনির্ণয়', ভট্টাচার্য শিরোমণিকৃত 'নঞবাদ' (পুঁথি নং ৪৭৫৩) নৈয়ায়িক গদাধরের 'চিন্তামণি আলোকের টীকা' 'বৌদ্ধাধিকার চিন্তামণি (পুঁথি নং ৩৬৪৭) মহামহোপাধ্যায় শূলপাণির ব্রতকাল বিবেক (নং ৪২২২ ; ব্রতসম্পাদনের কাল নির্ণয় এর উপজীব্য) রঘুনন্দনের একাদশীতত্ত্ব (পুঁথি নং ৪১৬১ বিঃসাঃপঃ) প্রভৃতি গ্রন্থগুলি বিষ্ণুপুরের সংগ্রহে লক্ষ্য করা যায়। রঘুনন্দনের প্রায় সব গ্রন্থগুলিই এই পুঁথি সংগ্রহে আছে। রঘুনন্দের ব্যবহার তত্ত্বের একাধিক পুঁথি (৩৯৪০, ৫৮৫৮ নং ইত্যাদি) ছাড়াও বিবাহ তত্ত্ব (বা সম্বন্ধতত্ত্বের) তিথিতত্ত্ব, আহ্নিক তত্ত্ব, শুদ্ধিতত্ত্বও বৃক্ষাদি প্রতিষ্ঠা বিষয়ক প্রচুর পুঁথি এই সংগ্রহের অন্তর্গত। বিবাহতত্ত্ব বা সম্বন্ধতত্ত্বের একটি পুঁথিতে মল্লাব্দের উল্লেখ দেখা যায় (পুঁথি নং ৩৯৩১ঃ লিপিরিয়ং রাজচন্দ্রদেব শর্ম্মণঃ পুস্তকমিদং শাকে বিক্রমভূপতিঃ ১৭৩৬ শাকে মল্লমহীপতে সন ১১২০)। সাহিত্যদর্পণ, কাব্যপ্রকাশ ইত্যাদি অলঙ্কারের প্রসিদ্ধগ্রন্থগুলিও এখানে আছে। একটি সাহিত্যদর্পণের পুঁথিতে মল্লরাজ দ্বিতীয় রঘুনাথের চেতুয়াবরদা জয়ের উল্লেখের কথা আগেই বলা হয়েছে। রঘুনন্দনের তিথিতত্ত্ব, আহ্নিকতত্ত্ব, যজুর্বেদীয় শ্রাদ্ধ, সামবেদী শ্রাদ্ধ এবং শূদ্রশ্রাদ্ধের বেশকিছু পুঁথি এ সংগ্রহে বর্তমান। এগুলি সামাজিক বর্ণ বিভাগের নির্দেশক।

রঘুনন্দনের স্মৃতিতত্ত্বের একটি পুঁথিতে (৩৮২৪ নং প্রতিলিপি) মল্লশকের উল্লেখ রয়েছে (বন্দ্যঘটীয় হরিহর ভট্টাচার্য্যাত্মজ শ্রীরঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য কৃত ; মহীরাম তর্কেন্দুযুক্তে শকাব্দে জগন্নাথ শর্ম্মা

মল্লমহীপতি শক ১০৬৫, বলাবাহুল্য মল্লশকের নিয়মানুযায়ী ১০১ বছর যোগ করলে বাংলা সন পাওয়া যায়। পুঁথিটি অতএব ২৫০ বছরের প্রাচীন)। মহেশ্বর ন্যায়ালঙ্কারের সুপ্রসিদ্ধ কাব্য প্রকাশের টীকাও (৪০৩৬) এখানে রয়েছে। শ্রীকৃষ্ণতর্কালঙ্কারের দায়ভাগ টিপ্পনী (৩৮৪০ নং) গ্রন্থের প্রতিলিপি এ সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত। দায় ভাগ টিপ্পনির একটি ক্রোড়পত্রও (পুঁথি নং ৪০৩৭ ক্রোড়পত্রমিদং ১-৭৫ পৃঃ ১৭৭৫ শক) এখানে বর্তমান। একটি পুঁথিতে (৪৭৯৩ নং দ্রোণ, আড়ক, পণ, কার্যাপণের এবং শূলপাণি ও ভবদেব ভট্টের উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। শূলপাণির প্রায়শ্চিত্ত বিবেক (৩৮২০ নং: পুষ্পিকাঃ শূলপাণি বিরচিত প্রায়শ্চিত্ত বিবেকে সংসর্গ প্রায়শ্চিত্ত সমাপ্ত বেদত্তুসিন্ধুধরণী গণিতে শকে। কাশীপুর নিবাসী শ্রীমধুসূদন ····· লিপি। শকাব্দা ১৭৬৪ : ৯ এবং ১-৪২ পৃষ্ঠা) এবং শ্রাদ্ধ-বিবেকও (৩৮২২) বিষ্ণুপুরের এই সংগ্রহে রয়েছে। ব্যাকরণের ক্ষেত্রে দেখা যায় ক্রমদীশ্বর প্রণীত সংক্ষিপ্তসার ব্যাকরণের সংখ্যাই সমধিক হলেও শীঘ্রবোধ এবং ব্যাকরণ দীপিকার সংখ্যা কম নয়। হরিনামামৃত বৈষ্ণব ব্যাকরণও (পুঁথির নং ৪১১৭ : ৬ই বৈশাখ সমাপ্ত হইল লিখন। ১০২৪ সাল) এ সংগ্রহে বর্তমান। অলঙ্কার এবং কোষগ্রন্থও রয়েছে একাধিক। বৈষ্ণব আলঙ্কারিক পীতাম্বর দাসের 'রসমঞ্জরী'র কপি রয়েছে অনেকগুলি। ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে ১মখণ্ড পূর্বার্ধ) সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে এই বৈষ্ণব অলঙ্কার গ্রন্থ 'রসমঞ্জরী' রচিত হয়েছিল। বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদের রস-মঞ্জরীর একটি প্রতিলিপির লিপিকাল ১৬২৫ শক বা ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দ। অর্থাৎ মূল গ্রন্থ রচনার থেকে এই প্রতিলিপির লিপিকাল খুব দূরবর্তী নয়। ব্যাকরণের প্রচুর টীকা টিপ্পনি এখানের চর্চা-চিন্তার ব্যাপকতা ও গভীরতা প্রমাণ করে।

ন্যায় পঞ্চানন রচিত ব্যাকরণের টীকার প্রচুর প্রতিলিপি রয়েছে। ব্রাহ্মণ এবং বৈদ্য সন্তানরা প্রচুর সংখ্যায় ব্যাকরণের প্রতিলিপি রচনা করেছেন। এর থেকে বোঝা যায় সংস্কৃতশিক্ষা ব্রাহ্মণ এবং বৈদ্যদের মধ্যে অধিক প্রচলিত ছিল। ব্রাহ্মণরা অধ্যাপনা এবং যজন-যাজনের জন্য অন্যদিকে বৈদ্যরা আয়ুর্বেদ পাঠের জন্য সংস্কৃত শিক্ষা করতেন।

আয়ুর্বেদের সংখ্যা এবং প্রকারভেদও এই সংগ্রহে প্রচুর। এখানে রয়েছে চরক, সুশ্রুত, মাধবকর, নিশ্চলকর এর প্রসিদ্ধ সব পুঁথি। চরক-সংহিতার চিকিৎসাস্থান, সূত্রস্থান, শারীরস্থান, প্রভৃতি বিভিন্ন পর্যায়ের প্রচুর প্রতিলিপিও এই সংগ্রহে লক্ষ্য করা যায়। 'সুশ্রুত সংহিতার' উপর রচিত চক্রদত্তের "ভানুমতী টীকা"ও এখানে রয়েছে একাধিক। মাধবকরের রুগ্বিনিশ্চয় বা নিদানের পুঁথিও রয়েছে প্রায় ত্রিশখানি। বিজয় রক্ষিতের একাধিক ব্যাখ্যামধুকোষের প্রতিলিপিও এ সংগ্রহের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া রয়েছে চক্রপাণি দত্তের "সারসংগ্রহ" অষ্টাঙ্গহৃদয়ের উপর সিংহগুপ্তের টীকা, পর্যায়মুক্তাবলী, রত্নাবলী, রত্নমালার একাধিক কপি—রয়েছে রসায়ণের প্রচুর পুঁথি। তাছাড়া বেশকিছু আয়ুর্বেদের পরিভাষা ও কোষগ্রন্থও রয়েছে এ সংগ্রহে। টীকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল "যোগামৃত টীকা", বিজয় রক্ষিতের রচিত টীকা, দ্রব্যভাষ্য টীকা, আয়ুর্বেদের উপর শংকর সেনের টীকা; কাশীরাজকৃত মৃতমঞ্জরীর পুঁথির প্রতিলিপিও রয়েছে এখানে—লিখেছেন মতিরাম ভিষক্ (ইতি কাশিরাজ কৃতা মৃতমঞ্জরী সমাপ্তঃ-লিখিতং মতিরাম ভিষক্ ১১০২)। এখানে সংগৃহীত বিপুল আয়ুর্বেদের পুঁথি একদিকে যেমন মল্লভূমে ব্যাপক আয়ুর্বেদ চর্চার সাক্ষ্য বহন করছে, অন্যদিকে তেমনি এখানে এক বিশাল বৈদ্যসমাজ গড়ে ওঠার ইঙ্গিত দিচ্ছে। এই বিপুল বৈদ্য সমাজের অধিকাংশ মানুষ ছিলেন গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের আশ্রিত। শ্রীনিবাস বন্দনার একটি শ্লোকে তাঁর কিছু বৈদ্যশিষ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়।

যোসৌ শ্রীবলরামনাম ভিষজং শ্রীমোহনাখ্যং তথা
শ্রীরাধাবল্লভাখ্যং তদনুজ মথুরাদাস সংঙ্গং স্বপাদং।
শ্রীরাধাকৃষ্ণদাসং তদনু রমনকং রামদাসঃ নয়ন্ যঃ
সোহসং মে করুণানিধি বিজয়তে শ্রীশ্রীনিবাসঃ প্রভুঃ॥ ৮৫

(যিনি বলরাম ও মোহনদাস নামক বৈদ্যদের, শ্রীরাধাবল্লভ, শ্রীমথুরাদাস, ও শ্রীমথুরাদাসের ভ্রাতাকে, শ্রীরাধাকৃষ্ণদাস ও তাঁহার বন্ধু শ্রীরামদাসকে স্বপদে আনিয়াছিলেন, সেই আমার করুণানিধি শ্রীনিবাস প্রভুর জয় হউক। — "আচার্য শ্রীনিবাস" শ্রীপ্রদীপ কুমার সিংহ। ১ম সংস্করণ ঃ ১৯৮২ বিষ্ণুপুর (বাঁকুড়া) দ্রষ্টব্য)

ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ঃ প্রথম খণ্ড অপরাধ পৃঃ ১০৭) শ্রীনিবাসের শিষ্য মোহন দাস ও বল্লভ দাস কতকগুলি পদ লিখেছিলেন। বলাবাহুল্য বিষ্ণুপুরের শ্যামরায় মন্দিরের গর্ভগৃহে টেরাকোটা-ফলকে শ্রীকৃষ্ণ পদসেবারত শ্রীরাধা (বা লক্ষ্মী) চিত্রের নীচে শ্রীমোহন দাস ও শ্রীমথুরাদাস দুটি নাম উৎকীর্ণ দেখা যায় (এই গ্রন্থে আলোকচিত্র দ্রষ্টব্য)। বিষ্ণুপুরের কবিরাজপাড়ায় (বৈদ্যপাড়ার কবিরাজপাড়া নামকরণ ও তাৎপর্যপূর্ণ) বিশেষভাবে বৈদ্যদের কুলদেবতা শ্রীশ্রীরাধাদামোদর জীউ এর সিংহাসনের পাশে সংরক্ষিত ও পূজিত একজোড়া কাষ্ঠপাদুকার কথা আগেই বলা হয়েছে।

শত শত টোল চতুষ্পাটীর ইঙ্গিতবাহী বিষ্ণুপুরের এই বিপুলপুঁথি সংগ্রহ এবং বিশেষভাবে সংস্কৃতচর্চা চিন্তা, নবদ্বীপের সঙ্গে বিষ্ণুপুরের নিবিড় সম্পর্ক ছাড়াও এখানের সামাজিক গঠনটিকেও সুস্পষ্ট করে তোলে। সমাজতত্ত্ববিদরা মনে করেন কোন অঞ্চলে প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথির অস্তিত্ব সেখানের বর্ণবিভক্ত সমাজ ব্যবস্থা এবং মন্দিরাদির ইঙ্গিত বহন করে। বিষ্ণুপুরের এই বিপুল সংস্কৃত পুঁথির অস্তিত্বতার প্রেক্ষাপটে বর্ণবিভক্ত সমাজ ব্যবস্থা এবং মন্দিরের অস্তিত্বকেই প্রতীয়মান করে। প্রাচীনকালে ক্রমবর্ধমান ব্যবসা-বাণিজ্য এবং প্রচুর ধনাগমের ফলে দেশের বিভিন্ন স্থানে স্বাভাবিকভাবে নগরায়ণ হ'ত। সেখানে মুদ্রা-অর্থনীতি এবং খোলাবাজারের কল্যাণে একধরণের নগর বা নগরসমাজ গড়ে উঠত। তারসঙ্গে মধ্যযুগের সর্দার বা ভূম্যধিকারী সামন্তদের প্রযত্নে কৃত্রিমভাবে গঠিত নগরায়ণ বা নরগনির্মাণের ধাতুগত পার্থক্য ছিল। রাজা বা ব্রাহ্মণকে শীর্ষদেশে রেখে তাদের কেন্দ্র করে পারস্পর নির্ভরতা এবং ব্যক্তিগত সম্পর্কে গ্রথিত একবর্ণ-বিভক্ত স্তরবিন্যস্ত সমাজ ব্যবস্থাই হ'ল এধরণের নগরের নীতিনির্দিষ্ট গড়ন। মঙ্গলকাব্যে এ ধরণের বর্ণ এবং শ্রেণীভিত্তিক 'নগর-নির্মাণ-কথা' ছিল একটি সুনির্দিষ্ট এবং প্রথাবদ্ধ অধ্যায়। ভূমিকেন্দ্রিক অর্থনীতিতে পরস্পর আনুগত্যের ভিত্তিতে রচিত এই ধরণের সামান্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থাই ছিল মধ্যযুগের 'শরণাগতিমূলক প্রেমধর্ম বিকাশের প্রশস্তক্ষেত্র'। আগেই বলা হয়েছে যে এই ভক্তিধর্ম রাষ্ট্রিক

ও সামাজিক অবস্থা ভেদে দ্বিধাবিভক্ত। একদিকে শুধু দেহ বা কায়া-সম্বল সর্বহারার কায়কেন্দ্রিক অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানহীন তন্ত্র বা সহজ-সাধনা—অন্যদিকে বুদ্ধিজীবী উচ্চবর্ণের সম্ভ্রান্ত জনসমাজের ন্যায়-স্মৃতি অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানে আকীর্ণ উচ্চমার্গের দার্শনিক ও স্মার্ত-পৌরাণিক ভক্তিধর্ম।

বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদের পুঁথি সংগ্রহে ন্যায়-স্মৃতির পুঁথির আধিক্যে একদিকে যেমন ব্যাপক জ্ঞানচর্চার পরিচয় পাওয়া যায় তেমনি স্মার্ত-পৌরাণিক বৈষ্ণবধর্মের উপাদানগুলিরও সাক্ষাৎ মেলে। সবচেয়ে বড় কথা ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতকে মল্লভূমে ক্রমবর্ধমান এক রক্ষণশীল বৈষ্ণব বুদ্ধিজীবি সমাজের বিকাশও পরিলক্ষিত হয়। ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন, এখানে সংস্কৃত শিক্ষাবিস্তার বৈষ্ণবধর্মের উদ্যোগেই সম্ভব হয়েছিল। সেকথা যাইহোক, নবদ্বীপের প্রভাবে এখানে যেমন জ্ঞানচর্চা বেড়েছে তেমনি একটি হিন্দু-রিভাইভ্যালের বীজও উপ্ত হয়েছে একথা মনে করা অসঙ্গত নয়। রাজার অধিকাংশ ভূমি ব্রাহ্মণ সেবায় নিয়োজিত হয়েছে। শুধু অধ্যাত্মমার্গেই নয় সমস্ত রাষ্ট্রিক ব্যবস্থাতেও ব্রাহ্মণ্য-আধিপত্য। বিষ্ণুপুরের ইতিহাসে (হিস্টি অফ বিষ্ণুপুর রাজ) বলা হয়েছে, রাজ্যের প্রধান পুরোহিতের অধীনে একটি 'ধর্মীয় উপবিভাগ'ও গঠিত হয়েছিল যার পরামর্শে রাজা ব্রহ্মোত্তর দান করতেন। রাজা গোপাল সিংহ ধর্মচর্চা আবশ্যিক করেছিলেন— যাকে 'গোপাল সিংহের বেগার' বলা হয়। এইসব ব্যবস্থার মাধ্যমে ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব ও আধিপত্য প্রচুর বৃদ্ধি পেয়েছিল।★

★ The moral and religious development of the people was placed under the care of the hight priest. ...we have already taken notice of the compulsory religious service of Gopal Singha ('Gopal Singher. Begar') It was the high priest who made the compulsion effective by establishing an elaborate system of espionage." H.O.B.R

শুধু ব্রাহ্মণ নয়, ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থ এককথায় উচ্চবর্ণের বুদ্ধিজীবী মানুষের এক বিশাল সমাজ যে আদিবাসী অধ্যুষিত মল্লভুমে, বৈষ্ণবরাজাদের আনুকূল্যে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকে ক্রমবিকশিত হয়েছে তার ইঙ্গিত ও বহন করছে এই পুঁথিগুলি। অথচ যেসব আদিবাসী আদিমল্লকে সিংহাসনে বসিয়ে ইঁদ পরবের দিন তাঁর অভিষেক করেছিল নাচে গানে উন্মত্ত হয়ে, তারা কোথায় হারিয়ে গেছে। শিক্ষাদীক্ষার ক্ষেত্র থেকে নির্বাসিত হয়ে তারা যে সমাজের ও নিম্নস্তরে নিক্ষিপ্ত হয়েছে ন্যায়-স্মৃতি-পুরাণভিত্তিক শিক্ষার প্রতীক এই সব সংস্কৃত পুঁথি তারও সাক্ষ্য বহন করছে।

ব্রাহ্মণ-বৈদ্য ছাড়াও বহু কায়স্থ সন্তান বৈষ্ণবগ্রন্থের প্রতিলিপি প্রস্তুত করেছেন দেখা যায়। বিষ্ণুপুরের শ্যামরায় মন্দিরের টেরাকোটায় যে এক বিষ্ণুদাস সরকারের নাম লক্ষ্য করা যায়, তিনি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন কিনা জানিনা, তবে বিষ্ণুপুরের সন্নিকট চাবড়া (থানা ওন্দা, জেলা বাঁকুড়া) গ্রামের সরকার (কায়স্থ) পরিবারের অনেকেই (কুঞ্জবিহারী, নিমানন্দ, বিশ্বরূপ ইত্যাদি) যে প্রচুর বৈষ্ণব পুঁথির প্রতিলিপি প্রস্তুত করেছিলেন তারও সাক্ষ্য মেলে বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদের পুঁথি সংগ্রহে। মল্লভুমের বুদ্ধিজীবী বৈষ্ণব সমাজের বড় সাক্ষ্য এইসব পুঁথিপত্র।

বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদের এই পুঁথি সংগ্রহে অথবা এখান থেকে সংগৃহীত অন্যত্র সংরক্ষিত পুঁথিগুলি থেকে মল্লভুমে বৈষ্ণবধর্মের মাধ্যমে ব্যাপক বঙ্গসাহিত্য-চর্চার পরিচয় মেলে। অবশ্য ব্রাহ্মণ্য প্রভাব পুষ্ট গোস্বামী সিদ্ধান্তের সংস্কৃত অনুগত চিন্তাচর্চাই এখানে যে প্রাধান্য লাভ করেছে একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। এ চিন্তা-চর্চা রাজা থেকে সম্ভ্রান্ত প্রজাসমাজেও ব্যাপকভাবে প্রসারিত হয়েছে।

বিষ্ণুপুরে রাজা বীরহাম্বীর শুধু গতানুগতিকভাবে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করেননি, তিনি একজন নিবেদিত প্রাণ বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁর রচিত বৈষ্ণব পদগুলি তাঁর গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের বিশেষ করে গোস্বামী সিদ্ধান্তের উপর নিবিড় চর্চা-চিন্তার পরিচয় বহন করছে। তাঁরই ভাবধারায় অনুপ্রাণিত হয়ে রাজপরিবারের অনেকেই বৈষ্ণব ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। বীরহাম্বীর থেকে চৈতন্য সিংহ পর্যন্ত অনেকেই

পদরচনা করেছেন দেখা যায়। চৈতন্যসিংহের রচিত পদের উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। গোপাল সিংহের যে রচনাটি পাওয়া গেছে তাতে পুরাণের রীতিতে এবং গোস্বামী গ্রন্থের অনুসারে রাধাকৃষ্ণলীলা বর্ণিত ("উজ্জ্বল গ্রন্থানুসারে করি নিবেদন, পরম দুর্লভ কথা শুন ভক্তজন ।") গোপাল সিংহের ভণিতা ঃ -

গাইল গোপাল সিংহ মল্লাবনীনাথ।
শ্রীগুরুপদারবিন্দে করি প্রণিপাত ॥

(বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস । ডঃ সুকুমার সেন ঃ প্রথম খণ্ড অপরার্ধ ঃ পৃষ্ঠা ৩৭●)

অষ্টাদশ শতকের দিকে বুদ্ধিজীবীর সংখ্যা যে ক্রমশঃ বেড়েছে তার প্রমাণও এই পুঁথি সংগ্রহ। অধিকাংশ পুঁথির প্রতিলিপি অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি বা শেষের দিকে ; অবশ্য সতেরো শতকের পুঁথিও কম নেই। ষোড়শ শতকের পুঁথির সংখ্যা খুব বেশী নয়। অষ্টাদশ শতকে বিষ্ণুপুরের চিন্তা-চর্চা নানাদিক দিয়ে বেড়েছে। অষ্টাদশ-শতকে কবিচন্দ্র প্রচুর সার্থক রচনা উপহার দিয়েছেন। তিনি শুধু প্রচুর গ্রন্থই রচনা করে নাই, তাঁর গ্রন্থের প্রভাব সুদূরপ্রসারী হয়েছে। কৃত্তিবাসের রামায়ণে কবিচন্দ্রের বহু অধ্যায় ঢুকে পড়েছে বলে ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন। এই শঙ্কর কবিচন্দ্র গোপালসিংহের সভাকবি ছিলেন। শঙ্কর কবিচন্দ্র রামায়ণ পাঁচালী ছাড়া (রামায়ণ পাঁচালী লিখেন গোপালের জ্যেষ্ঠভ্রাতা রঘুনাথের আমলে) খণ্ডে খণ্ডে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল পুঁথিরচনা করেন। এই গ্রন্থের খণ্ড বা পালগুলির বিশেষ করে প্রহলাদ চরিত্র, দাতাকর্ণ, গুরুদক্ষিণা, কপিলামঙ্গল, সারা পশ্চিমবঙ্গেই প্রচুর পাওয়া গেছে। (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ১ম খণ্ড অপরার্ধ ঃ সুকুমার সেন) বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদের পুঁথি সংগ্রহে সবকটি খণ্ডেরই একাধিক করে কপি বর্তমান।

বিষ্ণুপুরের উত্তমদাস গোপালসিংহের রাজ্যকালে ১৬৬১ (নিশাপতি রসঋতু আর দ্বিজরাজে) শকাব্দে (১৭৩৯-৪০ খ্রীঃ) রাঘবের শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশরত্ন অনুবাদ করেন। শ্রীকৃষ্ণ প্রকাশরত্ন ছাড়াও ইনি চারিরত্ন ভাষা গ্রন্থ রচনা করেন। উভয় গ্রন্থ বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদে আছে। উত্তমদাসের ভণিতা ঃ

সেই বিষ্ণুপুরে মোর সদত বসতি
বৈষ্ণব আজ্ঞায় লিখি পরম পিরীতি।
শ্রীকৃষ্ণপ্রকাশরত্ন রাঘব রচিত
নানাশাস্ত্রবাক্যে তাহা করিল বিদিত।
বৈষ্ণব ঠাকুরের পায় মজাইয়া মন
চারি-রত্ন ভাষা কহে এদাস উত্তম।

বৈষ্ণব অনুবাদ গ্রন্থের সংগ্রহও এই পুঁথিশালায় কম নয়।

ক্ষণদা চিন্তামণির রচয়িতা বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ভাগবতের টীকা লিখেন বৃন্দাবনে। তাঁর ভাগবতের টীকা সহ বিভিন্ন নিবন্ধের অনুবাদ করেন তাঁর প্রিয় শিষ্য কৃষ্ণদাস। এগুলির মধ্যে রসামৃত সিন্ধু বিন্দু (পুঁথি নং ৪৫৯) ভাগবতামৃতকণা (পুঁথি নং ১১৭) এবং উজ্জ্বল নীলমণি কিরণ (নং ৯৪) বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদের সংগ্রহে রয়েছে। নরসিংহ দাসের অনূদিত হংসদূতের অনুবাদও এখানে বর্তমান।

বিষ্ণুপুরে অথবা বিষ্ণুপুরকে কেন্দ্র করে অনুবাদ সাহিত্যের বিকাশও কম হয় নাই। মোহন পুজারীর তিনখণ্ডে ভক্তমাল গ্রন্থখানির অনুবাদ এবং চৈতন্যদাসের বালবোধনী টীকা ও তার বঙ্গানুবাদের কথা আগেই বলা হয়েছে।

যদুনন্দন দাস বৈষ্ণব সাহিত্যের অনুবাদকদের মধ্যে অগ্রগণ্য। এঁর অনূদিত প্রায় সব বৈষ্ণবগ্রন্থগুলিই এ সংগ্রহে বর্তমান। ইনি শ্রীনিবাস কন্যা হেমলতার মন্ত্রশিষ্য। গোবিন্দদাস কবিরাজের নাতি, দিব্যসিংহের পুত্র ঘনশ্যাম কবিরাজ ছিলেন শ্রীনিবাসের পুত্র গতি-গোবিন্দের শিষ্য। এঁর রচিত গুরুপুষ্পাঞ্জলি 'গোবিন্দ রতি-মঞ্জরী' বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদের সংগ্রহে একাধিক বর্তমান। শ্রীনিবাস সমকালীন বৈষ্ণব জগতের মধ্যমণি ছিলেন। বিষ্ণুপুরে তাঁর পাট তো ছিলই, তাঁর পুত্র গোবিন্দগতি এবং কন্যা হেমলতারও পাট ছিল এখানে। গুরুসূত্রে যদুনন্দন ও ঘনশ্যামের তদানীন্তন বিশিষ্ট বৈষ্ণব-সংস্কৃতি কেন্দ্র বিষ্ণুপুরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ থাকারই কথা। বিশেষতঃ যদুনন্দন রচিত কর্ণানন্দে মল্লরাজ বীরহাম্বীর ও শ্রীনিবাস শিষ্য রামচন্দ্র সম্পর্কে প্রচুর উল্লেখ আছে। বিষ্ণুপুর অঞ্চলে প্রাপ্ত

(বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদের সংগ্রহ) অষ্টাদশ শতাব্দের একটি পুঁথিতে বিষ্ণুপুরের রাজবংশীয় বলে মনে হয় এমন কয়েকজনের ভণিতায় বাঙ্গালা ও ব্রজবুলির পদ লক্ষ্য করা যায়। এর থেকে ডঃ সুকুমার সেন অনুমান করেন যে বিষ্ণুপুর রাজসভায় ও সম্ভ্রান্ত প্রজা-সভায় পদাবলীর চর্চা তখনও লুপ্ত হয় নাই। (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ঃ প্রথমখণ্ড ঃ অপরার্ধ পৃঃ ৯৮)

অষ্টাদশ শতকেই বিষ্ণুপুরের সঙ্গীতাচার্য রামশঙ্কর ভট্টাচার্যের বিকাশ। ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ পর্যন্ত দু'শ বছর ধরে সংস্কৃত ছাড়াও বৈষ্ণব পদাবলী এবং গোস্বামী গ্রন্থ ইত্যাদির বঙ্গানুবাদের মাধ্যমে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের নিবিড় চর্চাচিন্তার এখানে যে ঋদ্ধ প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছিল রামশঙ্করের বাংলা ধ্রুপদ তাঁরই স্বাভাবিক ফলশ্রুতি। শুধু তাই নয় হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ধ্রুপদী ধারার এক বঙ্গীয় রূপায়ণও এই সূত্রে সম্ভব হয়েছিল।

একথা সর্বজন বিদিত যে, দ্বাদশ শতকের শেষে, মহম্মদ ঘোরীর ভারত বিজয়কে কেন্দ্র করে, চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতক নাগাদ প্রাচীন ভারতীয় ক্লাসিক সংস্কৃতির উপর তুর্ক-আফগান প্রভাব পড়ে "হিন্দুস্থানী" রীতির বিকাশ ঘটে। হিন্দু-মুসলিম সংস্কৃতির মিশ্রণে উদ্ভূত এই হিন্দুস্থানী ধারা ভারত-সংস্কৃতির সর্বত্র প্রসার লাভ করে। এধারা বিশেষ করে হিন্দু বা মুশ্লিম কোন ধারা নয়,—দু'য়ের মিশ্রণে বিকশিত এক তৃতীয় ধারা। কালক্রমে এই 'হিন্দুস্থানী রীতি''র প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক বিবর্তন ঘটে আঞ্চলিক ধারাগুলির প্রভাবে। ক্ষেত্রবিশেষে এর হিন্দুমুশ্লিম উপাদান কমবেশী স্পষ্ট-ভাবে অনুভূত হয়। মুসলমান সংখ্যাধিক্য হেতু দিল্লীর "হিন্দুস্থানী রীতি"তে মুশ্লিম প্রাধান্য সূচিত হ'লেও পশ্চিমভারতে এ ধারায় স্থানীয় গুজরাটী রীতিরই প্রাধান্য দেখা যায়। বঙ্গদেশেও আঞ্চলিক প্রভাবে এ রীতির বঙ্গীয়-বিবর্তন সূচিত হয়। স্থাপত্য-ভাস্কর্য-সঙ্গীত-সাহিত্য সর্বক্ষেত্রেই এই বিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। বঙ্গের স্থাপত্য-ভাস্কর্যে ইট আর টেরাকোটার কাজ প্রাধান্য লাভ করে। বঙ্গের গৌড়-পান্ডুয়া এবং বিষ্ণুপুরের স্থাপত্য-ভাস্কর্যে প্রায় একই ভাবে ইট আর টেরাকোটা চিত্রের ব্যবহার দেখা যায়। পরিবেশ মাহাত্ম্যে গৌড়-পান্ডুয়ায় মুশ্লিম ভাবধারা এবং বিষ্ণুপুরে হিন্দুভাব-ধারা অধিকতর স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

স্থাপত্য-ভাস্কর্যের মত সঙ্গীত ও সাহিত্যেও একই নিয়মে বিবর্তন সূচিত হয়েছে। ভারতীয় সঙ্গীতের সংস্কৃত-কেন্দ্রিক ধাতুপ্রকৃতির উপর উর্দুর (আরবী-ফার্সী-তুর্কীভাষার প্রভাব স্পর্শে গঠিত) প্রভাব পড়ে সাঙ্গীতিক ক্ষেত্রে এক মিশ্র প্রকাশ-মাধ্যম বিকশিত হয়। কালক্রমে ঐতিহাসিক নিয়মেই স্থাপত্য-ভাস্কর্যের মত হিন্দুস্থানী সঙ্গীতেরও বঙ্গীয় বিবর্তন যথারীতি সূচিত হয়েছে। আর তা সম্ভবতঃ হয়েছে বাংলার বৈষ্ণব-সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করেই।

আগেই বলা হয়েছে, ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ দু'শ বছর ধরে বঙ্গে বিষ্ণুপুরই ছিল বৈষ্ণব সংস্কৃতির প্রধান কেন্দ্র। শিক্ষা-দীক্ষা. চর্চা চিন্তা, স্থাপত্য-ভাস্কর্যে এর ছিল এক অগ্রগণ্য ভূমিকা। এই সূত্রেই বিষ্ণুপুর সঙ্গীতেরও এক পীঠস্থান হয়ে উঠেছিল। হিন্দুস্থানী সঙ্গীতেরও বঙ্গীয় বিবর্তনে তাই বিষ্ণুপুরের এক অগ্রগণ্য ভূমিকা সঙ্গত কারণেই অনুমান করা যায়। অনেকে মনে করেন (বিশিষ্ট সঙ্গীত সমালোচক ও বিষ্ণুপুর ঘরানা গ্রন্থের লেখক দিলীপকুমার মুখোপাধ্যায়) অষ্টাদশ শতকে বিষ্ণুপুরের রামশঙ্কর ভট্টাচার্যই তাঁর ধ্রুপদ সাধনার মাধ্যমে ভারতের হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের মূলধারার সঙ্গে বঙ্গীয় মার্গ সঙ্গীত চর্চার সংযোগ সাধন করেন। বৈষ্ণব-সংস্কৃতির প্রেরণায় একদিকে বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের নিবিড় চর্চা অন্যদিকে পদাবলী কীর্তন আর ধ্রুপদী কথকতা (ভাগবতপাঠ) রামশঙ্করের ধ্রুপদ চর্চা বিশেষতঃ তার বাংলা রূপায়ণের প্রেক্ষাপট রচনা করেছিল এমন মনে করা যেতে পারে। রামশঙ্করের বাংলা ধ্রুপদে সংস্কৃতের অবাধ মিশ্রণ লক্ষ্য করা যায়। এই অষ্টাদশ শতকে বাংলা ও সংস্কৃতের মিশ্র ভাষায় (ভাষামিশ্র পদ্ধতি) পদাবলী বা কবিতা রচনার একাধিক দৃষ্টান্ত দিয়েছেন ডঃ সুকুমার সেন তাঁর বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাস (অপরার্ধ) গ্রন্থে। রামশঙ্করের বেশ কিছু ধ্রুপদে সংস্কৃত সন্ধি সমাস বহুল বাক্যবন্ধ পরিলক্ষিত হয়। *

যাই হোক, বৈষ্ণব সংস্কৃতি কেন্দ্র বিষ্ণুপুরের সাহিত্যিক ও সাঙ্গীতিক প্রেক্ষাপটে রামশঙ্করের তথা বঙ্গীয় ধ্রুপদের এক অভিনব বিবর্তনও বিকাশ সুগম হয়েছিল, এটা মনে করা অসমীচীন নয়। সাহিত্য এবং সঙ্গীতের যৌথ ধারায় পরিপ্লুত মল্লভূমের জনচিত্ত

রঞ্জনের স্বাভাবিক প্রয়াসেই রামশঙ্করের বাংলা ধ্রুপদের প্রবর্তন ত্বরান্বিত হয়েছিল বলেই মনে হয়। সঙ্গীতাচার্য রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় "বিষ্ণুপুর দ্বিতীয় দিল্লী" নামক গ্রন্থে রামশঙ্করের সঙ্গীত প্রতিভার বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেছেন ভাবপূর্ণ উচ্চাঙ্গের গীত রচনাতেও তিনি সাহিত্য ও সঙ্গীতের এক অপূর্ব সমন্বয় সাধন করেছিলেন।................ বাঙ্গলা ভাষায় রচিত উচ্চ ভাবপূর্ণ গীত যে কতদূর প্রীতিপ্রদ ও মর্মস্পর্শী হইতে পারে এবং ভাষাগত গাম্ভীর্য তাহাতে কি পরিমাণে প্রকাশ পায় —সঙ্গীতগুরু রামশঙ্করের রচিত প্রত্যেক গানে সুস্পষ্টরূপে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।" বৈষ্ণবসংস্কৃতি কেন্দ্র বিষ্ণুপুরে সাহিত্য ও সঙ্গীতের দুইধারার অফুরন্ত রস সিঞ্চনে রচিত এক ভাবাপ্লুত বিশিষ্ট প্রেক্ষাপটই যে রামশঙ্করের উচ্চমানের সঙ্গীত রচনা সম্ভব করেছিল একথা আগেই বলা হয়েছে। সঙ্গীতের কথা বাদ দিলেও রচনাগুলির অসামান্য কাব্যগুণও উল্লেখযোগ্য। রামশঙ্করের রচিত এই অসামান্য সঙ্গীতগুলিই বিষ্ণুপুরী ধ্রুপদের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ চরিত্র এবং গতিপথ নির্মাণ করে দিয়েছে। ভাবগম্ভীর

★ রামশঙ্কর ভট্টাচার্য রচিত কিছু ধ্রুপদ ঃ

১

প্রণমামি শঙ্কর শম্ভু শিব স্মরমথন ত্রিপুর বিণাশকং
জয় চন্দ্রভাল ভূজঙ্গমাল, কৃপাল কালনিবারকং
জয় কৃত্তিবাস নিবাস কৈলাস ত্রাস প্রহারকং
সুর-মুকুট-মণিগণ-কিরণ-রঞ্জিত চরণযুগ জগ-তারকং।

২

অজ্ঞান-তম-নিকরে গাঢ়ময়ি পতিতে
জ্ঞান কিঞ্চিত বিতর জগদম্বে।
কলুষ পূরিত মম কলেবর অশেষ কুৎসিত কর্ম তৎপর
স্থিরমতি সংসার জলবিম্বে॥
তব মায়াময় মোহ গর্ত্তে অন্ধ অতিশয় নয়ন সত্ত্বে,
শর্করা সম বাস বিষয় নিম্বে॥
তব চরণ কভু মননে নাহি ধরে এমন দুর্ম্মতি রামশঙ্করে
কুরু কৃপাময়ি কৃপা অবিলম্বে॥

এই রচনাগুলি থেকেই এগুলির অসামান্য সাঙ্গীতিক আবেদন যেন স্বতঃস্ফূর্তভাবেই আভাসিত ও বিচ্ছুরিত হয়। মণ্ডনসমৃদ্ধ রচনা শৈলী রামশঙ্করের এক দুর্লভ কবিমানসকেও উদ্ঘাটিত করে। শুধু কলা-নৈপুণ্যই নয়, ভাবসম্পদই যে বিষ্ণুপুরী ধ্রুপদের প্রাণবস্তু তা সহজেই ধরা পড়ে।

কথকতা আর পদাবলী কীর্তন বৈষ্ণবসূত্রে বিষ্ণুপুরে ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ দুশ বছর ধরে প্রচলিত ছিল। প্রথম দিকে এই দুই শিল্পই ছিল শাস্ত্রীয় সঙ্গীতনির্ভর। দুটিতেই উচ্চাঙ্গের সংবেদনশীল সাহিত্য এবং সঙ্গীতের যুগল মিলন। সুরময়তায় কথকতা পদাবলী কীর্তনের চেয়ে কিছু কম ছিলনা। ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন পদাবলী কীর্ত্তনের বিবর্তনের গোড়ার দিকের তৃতীয় বড় প্রভাব ছিল ভাগবত পাঠের পদ্ধতির। রঘুনাথ ভট্টের ভাগবত পাঠের এই সুরময় পদ্ধতির একটু ইঙ্গিত চৈতন্যচরিতামৃতে পাই,— 'এক শ্লোক পড়িতে ফিরায় তিন চারি রাগ।'' বিষ্ণুপুরের ধ্রুপদগান সহযোগে ভাগবত পাঠের ঐতিহ্যমণ্ডিত যে ধারাটি সঙ্গীতাচার্য সত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়দের পরিবারে প্রচলিত ছিল, তার উৎস সুপ্রাচীন বলেই মনে হয়। আগেই বলা হয়েছে ভাগবতপাঠের মাধ্যমেই শ্রীনিবাসের মল্লরাজ-সভা বিজয়-এর স্মৃতি বহন করছে পুঁথিপাঠের কিছু টেরাকোটা চিত্র মদনমোহন আর রাধাবিনোদ মন্দিরে।

রামশঙ্করের রচিত ধ্রুপদ :

৩

কে জানে তোমার মায়া শক্তিরূপ শিবজায়া
স্থূল সূক্ষ্মাতীতা কায়া বেদাগমে অগোচরা।
রামশঙ্কর মূঢ় জ্ঞানহীন মহাজড়
মনে করে আছে দৃঢ় তুমি নিস্তারিবে তারা ॥

৪

ঈষৎ ভব লীলায় শচীপতি হয় যায়।
দশশত বদন প্রণত সদাযার পায়
কি ভার তোমার রামশঙ্কর দ্বিজে তারিতে ॥

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বিষ্ণুপুর শাখার সংগৃহীত পুঁথি থেকে এই ধরণের কথকতায় ব্যবহৃত কিছু রাগ-সঙ্গীতের নমুনা পূর্বেই দেওয়া হয়েছে এখন এই সংগ্রহ থেকেই পদাবলী-কীর্ত্তনের কিছু নমুনা দেওয়া যেতে পারে। এই পদগুলির মধ্যে অনেকগুলিই বিষ্ণুপুরের মল্লিকঠাকুর বংশের কিছু প্রতিভাবান কবির। এঁরা তাঁদের আদি বাসস্থান খানাকুল থেকে এখানে এসে বিষ্ণুপুরে ও সন্নিহিত গ্রাম চাকদহে বসবাস করেন। বিষ্ণুপুরের রাজারা এঁদের মল্লিকঠাকুর উপাধি দেন।

সম্প্রতি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বিষ্ণুপুর শাখার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মাণিকলাল সিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান প্রদীপকুমার সিংহ মনোহরদাস সহ মল্লিকঠাকুর বংশের বেশ কিছু কবির পদ সাহিত্য পরিষদের পুঁথি সংগ্রহ থেকে চয়ন করে "রাঢ়ের পদাবলী" নামে একটি সংকলন গ্রন্থ প্রকাশ করেছেন। সংকলনে পরমেশ্বর মল্লিক, রামকৃষ্ণ মল্লিক, ধরণিধর মল্লিক, শ্যাম মল্লিক প্রভৃতির পদ আছে।

রামকৃষ্ণ মল্লিকের পদ : (অংশ বিশেষ)

১

প্রতিলোমে আঁখি সখি বিধি দিত জবে।
মনের সহিতে রূপ দেখিতাম তবে॥
রামকৃষ্ণ মল্লিক ভাবে রূপের অবধি।
কত অপরাধে আঁখি দুটি দিল বিধি॥

২

কি পেখব রে সখি রাধিকার অঙ্গ।
দশচারি ভুবন করল গৌর রঙ্গ॥
ভুবনমোহন অঙ্গ কিবা অনুপাম।
তার ছটায়ে হৈলা গৌর নবঘনশ্যাম॥

৩

প্রকাশিলা সুধামুখী কিবা নিজ অঙ্গ।
উথরল রূপ সিন্ধু ছুটল তরঙ্গ॥
কাঁচাকণক জিনি কান্তি অধিক।
ছটায়ে উজর কৈল কিবা দশ দিগ॥

পরমেশ্বর মল্লিকের বন্দনায় এক বৈষ্ণবভক্ত সনাতন মল্লিকের উল্লেখ পাওয়া যায়। এ'দের মধ্যে রামকৃষ্ণ মল্লিকের পদ সংখ্যাই সর্বাধিক। ইনি অন্যদের তুলনায় প্রতিভাবান কবি। শুধু তাই নয়, রামকৃষ্ণ মল্লিক কৃষ্ণলীলার সমস্ত পর্যায়ের পদ লিখেছেন। রাধা-গৌরাঙ্গ অভিন্ন বিষয়ক পদও তাঁর একাধিক রয়েছে। মনে হয় বঙ্গীয় গৌরাঙ্গ-বাদীদের প্রভাব যথানিয়মে তাঁর উপর পড়েছে। অবশ্য খেতুরির মহোৎসবেই এই বিতর্কের সমাধান হয় এবং বিষ্ণুপুরে গৌরপারমা-বাদের আভাস পরিলক্ষিত হয়। যাই হোক রামকৃষ্ণ মল্লিক প্রার্থনার পদ থেকে আরম্ভ করে নন্দোৎসব, বাল্যলীলা, পূর্বরাগ, অনুরাগ (রূপানুরাগ), দানলীলা, অভিসার, মিলন, মান, মাথুর, বিরহ, ভাবসম্মিলন সমস্ত পর্যায়ের পদ লিখেছেন। পদগুলিতে রাগ সন্নিবেশও লক্ষ্য করা যায়। সুইদেশ, বরাড়ী, কামোদ, পঠমঞ্জরী, ধানসি, কেদার, বসন্ত, ইত্যাদি রাগই প্রধানতঃ ব্যবহৃত হয়েছে। রাগযুক্ত উক্ত পদগুলি কীর্ত্তনরূপে গাওয়া হ'ত বলে মনে হয়।

রামকৃষ্ণ মল্লিকের মানের পদ—

৪

তোমার হৃদয়খানি দারু পাষাণ জিনি
দ্রবিলে না দ্রবে এক তিলে।
(অথবা)
এ শুভ রজনি রঙ্গে আছিলে যাহার সঙ্গে
তার যেন থাকে কুলশীল ॥

৫

রামকৃষ্ণ মল্লিকের হোলির পদ ঃ বসন্তরাগ

হোরি খেলত রসিক রাজ
অপরূপ মনোহর খেলত চাঁচর
রমনি বৃন্দ সমাঝ ॥
চৌদিকে রঙ্গিনি কর এ মঙ্গল ধনি
কেহ কেহ প্রেম পরকাস ॥

বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদের পুঁথিশালার বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বিষ্ণুপুর সঙ্গীত ঘরানার উৎস সন্ধানে এখানে সংরক্ষিত কিছু পুঁথি থেকে কথকতা ও পদাবলীর কিছু উল্লেখ ও উদ্ধৃতি দেওয়া গেল। কিন্তু শুধু বিষ্ণুপুর ঘরানা, কথকতা এবং পদাবলী গানই নয়, এখানে সমসাময়িক বৈষ্ণব জগতের বহু সূত্রেরই সন্ধান পাওয়া যায়। গোস্বামী গ্রন্থ ছাড়াও 'গৌরাঙ্গপারম্যবাদের' নিদর্শন, গৌরপারম্যবাদী প্রবোধচন্দ্র সরস্বতীর রচিত চৈতন্য চন্দ্রামৃত (চৈতন্য চন্দ্রামৃতং ঃ পুঁথি নং ২১২ ঃ শকাব্দ ১৬৭১ + ৭৮ = ১৭৪৯) এই সংগ্রহে বর্তমান। গৌরপারম্যবাদীরা শ্রীগৌরাঙ্গকে পরমেশ্বর বলে মানতেন। আগেই বলা হয়েছে, বৃন্দাবন থেকে গোস্বামী গ্রন্থ প্রেরণের একটি উদ্দেশ্য ছিল বঙ্গের গৌরাঙ্গবাদী এবং গোস্বামী সিদ্ধান্তের সমন্বয় সাধন। বলাবাহুল্য শ্রীনিবাস নরোত্তম প্রমুখ যাঁরা গোস্বামী সিদ্ধান্তের পুঁথিগুলি বৃন্দাবন থেকে বহন করে গৌড়ে এনেছিলেন মুখ্যতঃ তাঁদের উদ্যোগেই খেতুরীর মহোৎসবে দুইদলের মিলন ঘটে। এই ঐতিহাসিক ঘটনা বীরহাম্বীরের সমসাময়িক বলে অনেকে মনে করেন। বীরহাম্বীরের পরবর্তীকালে শ্রীকৃষ্ণ-গৌরাঙ্গ সমন্বয় চিন্তা ক্রমশঃ এ অঞ্চলেও প্রসার লাভ করে। অষ্টাদশ-উনবিংশ শতকের টেরাকোটায় বা পাটাচিত্রে শ্রীচৈতন্যের যতটা উল্লেখ পাওয়া যায় সপ্তদশ শতকের বিষ্ণুপুরের মন্দির-টেরাকোটা বা পাটাচিত্রে ততখানি পাওয়া যায়না। বিষ্ণুপুরের জোড়বাংলা মন্দিরের গর্ভগৃহে শুধু 'ষড়ভুজ' মূর্তিই নয়, কেল্লা অঞ্চলে জোড়বাংলার অনুকরণে নির্মিত মহাপ্রভুর মন্দির এবং নিত্যানন্দ গৌরাঙ্গের অপূর্ব দারুবিগ্রহ এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালের মন্দিরে গৌরাঙ্গ প্রসঙ্গ বৃদ্ধি পেয়েছে দেখা যায়। সহজিয়া বৈষ্ণব সাধনার পুঁথি 'সিদ্ধান্ত চন্দ্রোদয়ের (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বিষ্ণুপুর শাখার পুঁথি নং ৩৩২) পুঁথির কথা আগেই বলা হয়েছে। 'সিদ্ধান্ত চন্দ্রোদয়' ছাড়াও সহজসাধনের বেশকিছু পুঁথির পাতা এই সংগ্রহে পাওয়া যায়।

গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের বিভিন্ন সাধনার স্তরগুলি ছাড়াও সমকালীন বৈষ্ণব জগতেরও অনেক খবর পাওয়া যায় এই পুঁথিসংগ্রহ থেকে। এই পুঁথিশালায় সংরক্ষিত নিত্যানন্দ প্রভুর বংশ বিস্তার' পুঁথিখানি ডঃ সুকুমার সেন নির্ভরযোগ্য বলে মনে করেছেন। এবং এই

পুঁথিখানি, তিনি নবীনচন্দ্র আঢ্য প্রকাশিত (১৭৯৬শকাব্দ) বা বিপিন-বিহারী গোস্বামী প্রকাশিত (১৮০৯শকাব্দ) নিত্যানন্দপ্রভুর বংশবিস্তার বইখানির আলোচনায় (ডঃ সেন) একান্ত নির্ভরযোগ্য নিদর্শনরূপে গ্রহণ করেছেন। তিনি তাঁর বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে লিখেছেন (প্রথমখণ্ড পূর্বাধ পৃ-৩৪২) "বইখানির আলোচনায় পুঁথিটিই (বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদের পুঁথি) নির্ভরযোগ্য। লিপিকাল অষ্টাদশ শতাব্দের প্রথম পাদের পূর্বে বলিয়া বিবেচনা করি। এই আলোচনায় পুঁথিই ব্যবহার করিয়াছি। বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক মাণিকলাল সিংহের সৌজন্যে পুঁথিটি ব্যবহার করিতে পারিয়াছি।" অনেকে এই গ্রন্থটিকে চৈতন্য ভাগবতের পরিশিষ্ট বলে মনে করলেও ডঃ সুকুমার সেন তা সঙ্গত কারণেই অস্বীকার করেছেন। যাইহোক, এই পুঁথিতে নিত্যানন্দের তিরোভাবের পর বাঙ্গলাদেশের বৈষ্ণবধর্ম প্রচারের এবং বিশেষ করে জাহ্নবাদেবীর, নিত্যানন্দ অনুচরদের ও বীরভদ্রের প্রচেষ্টার ইতিহাস "বংশবিস্তার" পুঁথি থেকে অনেকটাই জানা যায়। বৃন্দাবনের গোস্বামী ছাড়াও বঙ্গের বৈষ্ণব জগতের দর্পণস্বরূপ এই গ্রন্থগুলি নিঃসন্দেহে মূল্যবান। গত ১৯৫৮ খ্রীষ্টাব্দে আচার্য সুকুমার সেন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বিষ্ণুপুর শাখার সমাবর্তন উৎসবে ভাষণ দিতে এসে এর পুঁথিশালা দেখে যথেষ্ট প্রশংসা করেন। তখন মাত্র পাঁচ-ছয় বৎসর (১৯৫১সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও ১৯৫৩-৫৪ থেকে যথার্থ কর্মারম্ভ) কাজ চলছে সমস্ত পুঁথিও গুছানো হয় নাই। তারই মধ্যে বেশকিছু পুঁথি তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি লিখেছেন—"পুঁথিগুলি এখনও গুছানো হয় নাই। যে কয়টি গুছানো হইয়াছে তাহার মধ্যে দুই চারিটি অত্যন্ত মূল্যবান রচনা পাইলাম। পাঁচবছরের মধ্যে পরিষদের কর্মীরা এমন মূল্যবান সংগ্রহ সঞ্চয় করিয়া অসাধ্য সাধন করিয়াছেন।"

আগেই বলা হয়েছে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম প্রাচীন ভারতীয় ক্লাসিক সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবিত প্রেক্ষাপটেই আপন ধর্মসংস্কৃতির সমৃদ্ধ জগৎ রচনা করেছিল। ডঃ সুকুমার সেন বলেন "সনাতন ও রূপ বৃন্দাবনে বসিয়া নব-বৈষ্ণব-মতের যে শাস্ত্র ও সাহিত্য রচনা করিলেন তাহার ভাষা সংস্কৃত। তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন বাঙ্গলাদেশের বাহিরে

সংস্কৃত আশ্রয় না করিলে কোন নূতন চিন্তা ও আদর্শ গৃহীত হইবেনা। তাঁহারা ইহাও বুঝিয়াছিলেন যে সংস্কৃতে নূতন শাস্ত্র চালাইতে হইলে তাহা পুরাতন শাস্ত্রের অনুবৃত্তি রূপেই উপস্থাপিত করিতে হইবে ; সুতরাং শ্রীচৈতন্যকে কৃষ্ণের অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াও তাঁহারা কৃষ্ণলীলা স্মরণের ও কৃষ্ণ উপাসনারই ব্যবস্থা দিলেন··· ····এই কারণে গোস্বামীদের শাস্ত্র ও অনুশাসন—

আসিন্ধু নদীতীর আর হিমালয়
বৃন্দাবন মথুরাদি যতদেশ হয়

সর্বত্র ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।" (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস প্রথমখণ্ড পূর্বার্ধ পৃঃ—৩২৪)

বৈষ্ণব গোস্বামীরা বৃন্দাবনে তথা বহির্বঙ্গে যে সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল রচনা করেছিলেন গোড়ীয় বৈষ্ণবধর্মকে কেন্দ্র করে, সারা-ভারতে তার প্রতিষ্ঠা এবং প্রসারের জন্য সঙ্গত কারণেই সংস্কৃত ভাষা এবং প্রাচীন শাস্ত্র-সাহিত্যকে আদর্শরূপে গ্রহণ করেছিলেন। সংস্কৃত ভাষায় প্রাচীন ক্লাসিক শাস্ত্র-সাহিত্যের অনুবৃত্তি রূপেই গোস্বামী সিদ্ধান্তের অবয়ব রচিত হয়েছিল। সনাতন ও রূপ বৈষ্ণবের আচার এবং সাধন-মননকৃত্যের এবং অধ্যাত্ম-চিন্তার উপযোগী সাহিত্য-সঙ্গীতাশ্রিত কৃষ্ণলীলা রসাস্বাদনের যে পথনির্দেশ করেছিলেন তার দার্শনিক প্রেক্ষাপটে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্র-সাহিত্যের প্রভাব দুর্নিরীক্ষ্য নয়। জীবগোস্বামী এপথে সর্বাধিক অগ্রসর হয়েছিলেন। ''তিনি গোড়ীয় বৈষ্ণব অধ্যাত্ম চিন্তাকে ভারতীয় দর্শন শাস্ত্রের বিচারে আনিয়া একটি নূতন ধর্মগোষ্ঠীর উপযোগী বিদ্যার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিলেন ছয়টি সন্দর্ভ ও কয়েকটি টীকাগ্রন্থ ও অন্যান্য কয়েকটি বই লিখিয়া (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ঃ প্রথমখণ্ড পূর্বার্ধ ঃ ডঃ সুকুমার সেন)।" শুধু তাই নয়, শ্রীচৈতন্য নিজেও শ্রুতি বা প্রাচীন শাস্ত্রাদিকে মান্য করতেন। "প্রাচীন হিন্দুধর্মে যে সকল গ্রন্থ বা মত গ্রাহ্য শ্রীচৈতন্যদেবও সেইসকল গ্রন্থ ও মতানুবর্তন করিয়াছেন এবং তিনি উপনিষদও শ্রুতি ও আর্ষঋষি প্রণীত ধর্মার্থ সমুদয়ের গৌণার্থ ত্যাগ করিয়া মুখ্যার্থ অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন।

যথা শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে—

প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি প্রমাণ প্রধান।
শ্রুতি যে মুখ্যার্থ কহে সেইত প্রমাণ ॥"

(নদীয়া কাহিনী নিখিলনাথ রায় পৃঃ ১৭৮)

শুধু ধর্মসংস্কৃতির ক্ষেত্রেই নয়, বৈষ্ণবযুগে শিক্ষার ক্রপাঠমও যে ক্লাসিক শাস্ত্র-সাহিত্য নির্ভর ছিল তার প্রমাণ বিষ্ণুপুরের সাহিত্য পরিষদের 'পুঁথি সংগ্রহ'। এই 'পুঁথি সংগ্রহ' বৈষ্ণব যুগের বিষ্ণুপুরে পরিচালিত শত শত টোল-চতুষ্পাটীরই স্মৃতি এবং ঐতিহ্যের ধারা বহন করছে। শুধু তাই নয়, বৈষ্ণবমতাবলম্বী ব্রাহ্মণ-বৈদ্য-কায়স্থরাও যে এই পাঠ্যক্রমেই শিক্ষালাভ করতেন তার প্রমাণও বহন করছে এই পুঁথিগুলি। তদানীন্তনকালে বঙ্গ তথা ভারতের শিল্প-সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ কেন্দ্র নবদ্বীপের সঙ্গে বিষ্ণুপুরের নিবিড় যোগ সে তার চর্চা-চিন্তার ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতীয় ক্লাসিক সংস্কৃতিকে সুপ্রতিষ্ঠিত করে বিষ্ণুপুরকে সুসমৃদ্ধ করেছে এটাও পুঁথি সংগ্রহ থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়।

মন্দির টেরাকোটাতেও যে গোস্বামী-সিদ্ধান্তের অনুশাসনের মাধ্যমে প্রাচীন ভারতীয় ক্লাসিক সংস্কৃতির আদর্শ অনুসরণ করে অলংকরণের রূপরেখা প্রস্তুত করা হয়েছে পরবর্তী অধ্যায়ে তা আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে। সুপ্রাচীনকালের ঐতিহ্য অনুসরণ করে একদিকে যেমন রামায়ণ-মহাভারতের কাহিনীচিত্র সন্নিবেশিত হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি কৃষ্ণলীলার চিত্রণে সারা ভারতের বৈষ্ণবধর্মের আকরগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতকেই অনুসরণ করা হয়েছে, অবশ্যই গোস্বামী সিদ্ধান্তের আলোকে। প্রাচীন ক্লাসিক রীতি অনুযায়ী পঞ্চোপাসনার আদর্শে শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণব-ইত্যাদি হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন শাখাসমন্বয়ের একটি বাতাবরণও মন্দির অলংকরণে রচিত হয়েছে। সমসাময়িক-কালের (মোগল যুগে) প্রেক্ষাপটে সর্বধর্ম সমন্বয়ের আদর্শটিও এখানে একটি বিশিষ্ট মাত্রা পেয়েছে। পরবর্তী পরিচ্ছেদে বিষ্ণুপুরের মন্দির-টেরাকোটার তাৎপর্য বিশ্লেষণকালে বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করা যাবে।

—০—



বিষ্ণুপুরের মন্দির-টেরাকোটার পশ্চাদ্বর্তী তত্ত্বতাৎপর্য ঃ

বিষ্ণুপুরের মন্দির ও মন্দির-টেরাকোটা মল্লরাজদের নিছক আভিজাত্য প্রদর্শনের প্রতীক বা রাজকীয় কলাচর্চা মাত্র নয়, মোগল-যুগের এক ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে একটি বিশিষ্ট ধর্মদর্শনের প্রত্যক্ষ প্রেরণায় এগুলির রূপবিকাশ।

মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাসে মোগলযুগ নানা কারণে গুরুত্ব-পূর্ণ। বিশাল মোগল-সাম্রাজ্যের সার্বভৌম কেন্দ্রীয় শাসন যখন প্রাদেশিকতা আর আঞ্চলিকতার অবসান ঘটিয়ে দেশে এক ধরণের রাষ্ট্রিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করেছিল, তখন সেই রাজনৈতিক পরিবর্তনের পথ ধরে মোগল-ভারতের কেন্দ্রীয়-সাংস্কৃতিক ভাবধারাও, শিরা-উপশিরার রক্ত প্রবাহের মত, মোগল অধিকৃত দেশগুলিতে স্বাভাবিকভাবেই ছড়িয়ে পড়েছিল। বিভিন্ন সুবায় বিভক্ত, মনসবদার বা সামন্ত-জমিদার শাসিত মোগল-ভারতের কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রিক বা সাংস্কৃতিক ভাবধারা সহজেই প্রতিটি প্রত্যন্ত প্রদেশেও পৌঁছেছিল। যদিও স্থাপত্য-ভাস্কর্য চিত্রকলা তথা অন্যান্য শিল্পক্ষেত্রে আঞ্চলিক প্রভাব কালক্রমে আপন অধিকার বিস্তার করেছে, দেখা যায়।

পাঠান যুগের শেষ থেকেই সর্বভারতীয় সংস্কৃতিক্ষেত্রে একটি পরিবর্তন সূচিত হয়। পারস্য তথা বহির্ভারতের নানা জাতিগোষ্ঠীর মানুষ এবং সুফী-সাধকরা ভারতে এসে জুটতে থাকে। এপ্রসঙ্গ আগেও আলোচিত হয়েছে। মধ্যযুগে, মোগল ভারতের সুপ্রতিষ্ঠিত

কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক শাসনের সুবাদে ষোড়শ সপ্তদশ শতকের বঙ্গেও তাদের গমনাগমন সুরু হয়— মোগল সেনাবাহিনীর অনুসরণ করে। বহির্ভারতের ভাবধারা যেমন অনায়াসে বঙ্গে এসে প্রবেশ করেছিল, বঙ্গদেশও তেমনি অনায়াসে বহির্বঙ্গের সংস্কৃতি ক্ষেত্রে নিজেকে প্রসারিত করতে পেরেছিল। বহির্বঙ্গ তথা বহির্ভারতের সাংস্কৃতিক জগতের উন্মুক্ত খোলা হাওয়ার স্পর্শে বঙ্গের সংস্কৃতিক্ষেত্রে এক নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল বলে অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন।[1] ধর্মজগতেও এই খোলা হাওয়ায় হিন্দু-মুসলমান অনেকাংশে পরস্পরের সমীপবর্তী হতে থাকে। উভয় শ্রেণীর ভাবধারার নির্বাধ-আদান প্রদানের ফলে রক্ষণশীলতাও অনেকটা শিথিল হয়। নূতন ভাবধারায় নূতন কিছু ধর্মদর্শনেরও বিকাশ ঘটে। অনেকে মনে করেন নানক-কবীর-শ্রীচৈতন্যের ধর্মমতে সুফী প্রভাব পড়েছিল। মুসলিম-সুফী ও বঙ্গের বৈষ্ণব-ভাবধারার সহজ বিনিময়ে ভারত তথা বঙ্গের সর্বত্র একটি উদার প্রশস্ত ধর্মীয় বাতাবরণ রচিত হয়েছিল এসময়।

বিষ্ণুপুরের মন্দির-টেরাকোটায় ধর্মসমন্বয়ের এই ইঙ্গিত দুর্নিরীক্ষ্য নয়। এখানের টেরাকোটাচিত্রে. বিশেষকরে শ্যামরায়-জোড়-বাংলা, দুটি প্রধান মন্দিরে, সুফী-সাধকদের চিত্রে এবং বিভিন্ন ধর্মযাজকদের একত্র সমাবেশের "গ্রুপ" ছবিতে এ ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। উপরোক্ত দুটি মন্দিরের টেরাকোটায় জপমালা হাতে পায়জামা-আলখাল্লা পরিহিত সুফীদের একাধিক চিত্রে এবং শ্যামরায় মন্দিরের দক্ষিণ দিকের বারান্দা থেকে গর্ভগৃহে প্রবেশের সুড়ঙ্গ পথের শেষপ্রান্তে ডানদিকে, বিভিন্ন বিচিত্র পোষাক পরিচ্ছদ পরিহিত (দিগম্বর জৈন সম্প্রদায়ের একটি

---

1 In one word during the first century of Mughal rule (1575-1675 A.D.) the outer world came to Bengal and Bengal went out of herself to the outer world, and the economic, social and cultural changes that grew out of this mingling of peoples mark a most important and distinct stage in the evolution of modern Bengal". History Of Bengal (Vol, II : Muslim Period : Dacca University).

মূর্তি এই গ্রুপে রয়েছে) সাধু-সন্তদের একটি সম্মিলিত "গ্রুপ চিত্রে" এই ধর্ম সমন্বয়ের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত। চিত্রগুলিতে মোগল ভারতের বিশিষ্ট এক ধর্মচিন্তার বিচিত্র রূপবিকাশই যেন আভাসিত হয়েছে। আকবর বাদশাহের দীন-ই-ইলাহী ধর্মচিন্তারই যেন ব্যঞ্জনা বহন করছে চিত্রগুলি।

মোগল সামন্ত জগতে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী সভাসদ ও সামন্তদের পরধর্মমত-সহিষ্ণুতা বিশেষভাবে বর্তমান ছিল বলে অনেক গবেষক মনে করেন।[২] নিজধর্মে আস্থাশীল থেকেও মোগল আমীর-ওমরাহ বা সামন্তরা অপরের ধর্মকে শ্রদ্ধা করতেন বলে তাঁরা মত প্রকাশ করে থাকেন। প্রসঙ্গক্রমে বলা হয়েছে, মোগল অনুগত সেনাপতি এবং প্রভাবশালী মোগল সামন্তরাজা মানসিংহ আকবরের দীন-ই-ইলাহী ধর্ম বিশ্বাসীদের অন্তর্ভুক্ত হতে অস্বীকার করলেও লাহোরে একাধিক মসজিদ নির্মাণে সহযোগিতা করেন। অপরপক্ষে প্রচুর মুসলমান-মনসবদার বা আমীর-ওমরাহ, হিন্দু সামন্ত বা অমাত্য-দের সঙ্গে নিবিড় এবং আন্তরিক বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন। ঐতি-হাসিকরা মনে করেন মোগল দরবারে মোগল-সভাসদদের মধ্যে ভারতীয়

---

2 On the whole under the great Mughals remarkable degree of religious harmony existed among the nobles. While strictly adhering to their own faiths, the Hindu and Muslim nobles generally showed the utmost tolerance and respect for each other's religions. Man singh, who had boldly turned down Akbar's offer to enrol him as one of the followers of Din-i-illahi, is credited with building mosques at Lahore and Rajmahal.

On the other hand, we have the examples of Mahabat Khan, an Irani, who manned his contingent exclusively with Rajput.........or of an Afghan noble of Aurangzeb, who was a great devotee of Lachhaman......" Mediaeval Society In Indian History By Iqtidar Alam Khan ; The Illustrated Weekly Of India. May 18, 1980.

ও অভারতীয় বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষের সমাগমের ফলে একটি আন্তর্জাতিক (কসমোপলিট্যান) সংস্কৃতির বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছিল।[৩]

অনেকে মনে করেন, দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির প্রেক্ষাপটেই সর্বপ্রকার সাম্য-মৈত্রী-সমন্বয়ের বিকাশ সম্ভব হয়। জাতীয় জীবনে অর্থনৈতিক তথা সামাজিক সংকট গভীর হলে, উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হলে, কোন ঐক্যই সম্ভব হয় না। ঐতিহাসিকরা মনে করেন, সপ্তদশ শতকের শুরুতে বঙ্গ তথা ভারতে মোগল শাসন ব্যবস্থা সুপ্রতিষ্ঠিত হয় এবং বঙ্গদেশ একটি সুবায় পরিণত হয়। ফলে এ সময়ের বঙ্গদেশও কৃষি শিল্পে সমৃদ্ধ হয়ে উঠে।[৪] মোগলযুগে এককেন্দ্রিক বা কেন্দ্রীয় শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায় প্রাদেশিক বিচ্ছিন্নতা বা আঞ্চলিক বিভাগের অনেকাংশে অবসান ঘটে। বিরাট মোগল সাম্রাজ্যের সর্বত্র ব্যবসা-বাণিজ্য ও শাসন ব্যবস্থা একই ভাবে বিস্তারের জন্য প্রাদেশিক মুদ্রা ও ওজন ব্যবস্থার প্রচলন রহিত করে আভ্যন্তরীণ বিভেদ দূর করে একটি সামগ্রিক অর্থ ও বাণিজ্যনীতিও চালু করা হয়েছিল। ফলে আভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যের এমনকি বহির্বাণিজ্যের পথও সুগম হয়। সুসমৃদ্ধ প্রদেশগুলি আভ্যন্তরীণ তথা বহির্বাণিজ্যে নির্বাধ অংশ গ্রহণ করতে সক্ষম হয় এবং দেশীয় পণ্যের নির্বাধ চলাচলের ফলে দেশের সামগ্রিক সমৃদ্ধির সূচনা হয়। সপ্তদশ শতকে লিখিত বণিকের বিবরণ থেকে জানা যায় এযুগে বঙ্গদেশ আভ্যন্তরীণ এমন কি বহির্বানিজ্যেও প্রভূত উন্নতিলাভ করেছিল। এ সময় খাদ্যশস্যে পারস্যের যে বিপুল স্বাচ্ছল্য তার মূলে ছিল বঙ্গদেশের খাদ্য-শস্যের যোগান। এখানের চাল এবং খাদ্য-শস্য সমুদ্রপথে মসলিপত্তন, করমণ্ডল এমনকি সিংহল এবং মালয়ের উপকূলবর্তী বন্দর গুলিতে চালান যেত। বঙ্গে উৎপন্ন চিনি গোলকোণ্ডা ও দক্ষিণ-ভারতের কর্ণাটক এমন কি আরব-পারস্যেও রপ্তানী হ'ত। প্রচুর

---

3 From the beginning of the 16th Century, the class of imperial officers became increasingly a cosmoplitan group with a composite cultural milieu." Mediaeval Society In Indian History : Iqtidar Alam Khan : Illustrated Weekly of India, May 18, 1980.

পরিমাণে উন্নত সূতা এবং রেশমজাত বস্ত্রশিল্পের সম্ভার ভারতের বিভিন্ন অংশে এমন কি ইউরোপ ও জাপানে রপ্তানী হ'ত। বাংলার মসলিন পৃথিবীর সর্বত্র সমাদৃত হত। বঙ্গদেশে নৌশিল্পও এই সূত্রে বিকশিত হয়েছিল। জাহাজ শিল্পী সূত্রধরেরা ঢাকা শহরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বাস করত।[৫]

সপ্তদশ শতকে বঙ্গ তথা ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্যের বিপুল প্রসার ঘটে। এসময় বঙ্গদেশ সমৃদ্ধির শিখরে উঠে বলে অনেকে মনে করেন। ইউরোপীয় বিভিন্ন জাতি যথা, ইংরেজ, ফরাসী, ওলন্দাজ বণিকেরা বঙ্গদেশে ব্যাপক বাণিজ্য বিস্তার করে। এর ফলে, দেশে প্রচুর অর্থাগম হয়। ১৬৮০-৮৪ খ্রীষ্টাব্দ, এই চার বৎসরে কেবল ইংরেজ, ব্যবসায়ীরাই এদেশ থেকে ষোল লক্ষ টাকার জিনিষ কেনে। ওলন্দাজদের ক্রয়ের পরিমাণ কিছু কম ছিলনা। এই দুটি কোম্পানীর মাধ্যমেই প্রতি বৎসর ষাট লক্ষ রূপার টাকা বঙ্গদেশে আসত।[৬] সুপ্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রীয় মোগল শাসনের ফলে বিরাট সাম্রাজ্যের সর্বত্র পরিবহন ব্যবস্থার সুযোগে এক স্থানের সম্পদ অন্যত্র চলাচলের কোন অসুবিধা ছিল না। সমস্ত সাম্রাজ্যের উদ্বৃত্ত সম্পদ সহজেই কেন্দ্র কর্তৃক আহৃত হতে পারত। দেশের সমস্ত উদ্বৃত্ত সম্পদ মোগল সম্রাট এবং অভিজাত অমাত্যদের বিলাস-ব্যসনে খরচ হওয়ায়

---

4 At the beginning of the 17th Century Mughul administration was firmly established in Bengal which was converted in to a suba .... with the cessation of hostility and the establishment of peace and introduction of an efficient administrative system during the Mughul period, agriculture, trade, and industry again flourished. Trade carried on by English, French and Dutch enriched the country." History Of Mediaeval Bengal By R. C, Majumdar. G. Bharadwaj & Co. 1974. Reprint (Page 176—78 Economic Condition.)

5 History of Mediaeval Bengal. R. C. Majumdar (Economic Condition).

দেশের মানুষের এক বিরাট অংশে দারিদ্র চিরস্থায়ী ছিল বলে অনেকে মনে করেন। বঙ্গের বিপুল বাণিজ্য-লব্ধ সম্পদও কালক্রমে কেন্দ্রে অতিমাত্রায় পাচার হওয়ায় বঙ্গদেশের এক শ্রেণীর মানুষ দারুণ দারিদ্রে দিনাতিপাত করত! মনসামঙ্গল পুঁথিতে যেমন বঙ্গের বিপুল বাণিজ্য-যাত্রার খবর মেলে, চণ্ডীমঙ্গলে তেমনি সমাজের নিম্নকোটি মানুষের অকথ্য দারিদ্রের খবর পাওয়া যায়।

যাই হোক, সপ্তদশ শতকে শুধু বঙ্গদেশ নয়, সারাভারতেই ব্যবসা বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। আগেই বলা হয়েছে, গুজরাট এবং বঙ্গের বস্ত্র ব্যবসায়ে প্রচুর শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। বস্ত্র ব্যবসায়ে নানা কারণে কাপের খ্যাতি সুদূর প্রসারিত হয়। সপ্তদশ শতকের প্রথম দিকে গোলকোণ্ডায় প্রস্তুত এবং মোগল ভারতের সামন্ত জগতে ও পারস্যের বিভিন্ন দরবারের অভিজাত মহলে প্রচলিত এক ধরণের সুতীপর্দার কথাও আগে বলা হয়েছে। এসব পর্দার উপর মুদ্রিত চিত্রগুলিতে মূলতঃ ইস্পাহানের (পারস্য) সাফাভিদ দরবারে ও দাক্ষিণাত্যের মুসলিম দরবারের সম্ভ্রান্ত-অমাত্যদের ও সামন্তদের রুচিমাফিক বিলাস ব্যসন, পান-ভোজন এবং হারেমের বল্গাহীন কামকেলির চিত্রগুলি মুদ্রিত থাকত অভিজাত-অমাত্য খদ্দেরদের মনোরঞ্জনের জন্য। জোড়বাংলার মন্দিরের উত্তর দিকের দেওয়ালের ভিত্তি সংলগ্ন পটিতে উৎকীর্ণ চিত্রগুলি প্রায় উপরোক্ত চিত্রগুলির সমধর্মী।[৭] একথা মনেকরা অসঙ্গত নয় যে, উক্ত অমাত্য ও সামন্তদের জগতে সমসাময়িক কালে প্রচলিত এই ধরণের চিত্রাবলী আভিজাত্যের নিদর্শনরূপে বঙ্গের মোগলসামন্ত-জমিদাররাও অনুকরণ করত। যেমন ইংরাজ আমলের বহুমন্দির-টেরাকোটায় মেমসাহেবদের বিলাসচিত্র আভিজাত্যের নিদর্শনরূপে স্থান পেয়েছে।) এই চিত্রগুলি মোগল ভারতে সামন্ত জগতে প্রচলিত উপরোক্ত পর্দাগুলির মাধ্যমে অথবা অন্যকোন সূত্রে এখানে এসে পৌঁছেছে। ছাপা পর্দার মাধ্যমে চিত্রগুলি এখানে আসার কথা মনে হওয়ার একটি কারণ হ'ল

---

6 History of Mediaeval Bengal. Dr. R. C. Majumdar. C. Bharadwaj & Co. 1974.

7 Golconda Cotton Paintings of the Early Seventeenth Century. John Irwin (Lalit-Kala April 1959)

এই জোড়বাংলার পশ্চিমদিকের ভিত্তি সংলগ্ন (ঐ পটিতেই) পটিতে উৎকীর্ণ 'পর্তুগীজ-রণতরী'র পাশে গীটার হাতে মৎস্যনরের চিত্রটি। এই ধরণের চিত্র পর্তুগালের বাজারের জন্য বঙ্গে প্রস্তুত এক ধরণের বস্ত্রখণ্ডের উপর ছাপা চিত্রগুলির প্রায় সমগোত্রীয়। এপ্রসঙ্গও আগে আলোচিত হয়েছে। মোগল যুগে বস্ত্র ব্যবসায়ের সূত্রে প্রাসঙ্গিক ভাবেই বিষয়টি পুনরালোচিত হ'ল।

সপ্তদশ শতকের মোগল ভারতে বঙ্গদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের যে বিপুল অগ্রগতি, তাতে বিষ্ণুপুরের যে একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল এটা মনে করা অসঙ্গত নয়, কারণ মল্লরাজধানী বিষ্ণুপুরের গঠনটিই অতীত শিল্প-নগরীর সাক্ষ্য দেয়। মূলতঃ তন্তুবায়, কর্মকার আর শংখ-শিল্পীদের অধ্যুষিত এই নগরে ঢাকা-মুর্শিদাবাদের মতই রেশমশিল্প শংখশিল্প আর বাসনশিল্পের সমন্বিত বিকাশ ঘটেছিল।[৮] বিশেষতঃ যে রেশম শিল্পকে কেন্দ্র করে বাংলার বহির্বাণিজ্য ফেঁপে ফুলে উঠেছিল সেই রেশম বয়নের একটি প্রাচীন কেন্দ্র বিষ্ণুপুর। সেই ঐতিহ্য আজও উজ্জ্বল। প্রাচীন বালুচরী (মুর্শিদাবাদের) বস্ত্রের সার্থক পুনরুজ্জীবনে বিষ্ণুপুরের উৎকর্ষ পূর্ব ঐতিহ্যেরই ফলশ্রুতি। শংখ-শিল্পের কারুকর্মে বিষ্ণুপুর তথা বাঁকুড়া আজও ভারতবর্ষে একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র। শাঁখারীবাজার সংলগ্ন "উড়িয়াপাড়া" অঞ্চল এবং বিষ্ণুপুরের বোলতলার এক শ্রেণীর তন্তুবায় সম্প্রদায়ের পাঠান-তাঁতি আখ্যা উড়িয়া এবং পাঠানদের সঙ্গে ব্যাপক ব্যবসা-বাণিজ্যেরই ইঙ্গিত দেয়। বিষ্ণুপুরের সর্বজন পূজ্য তিনটি দেবতা-বিগ্রহ শ্রীশ্রীমদন মোহন, শ্রীশ্রীমদনগোপাল ও শ্রীশ্রীরাধালালজীউ-এর অধিষ্ঠান কেল্লার বাইরে যথাক্রমে কারুশিল্পী অধ্যুষিত শাঁখারীবাজার, মাধবগঞ্জ ও কৃষ্ণগঞ্জ অঞ্চলে। লালজীউ বিগ্রহের মন্দির কেল্লার অভ্যন্তরে স্থাপিত হলেও এই বিগ্রহের অবস্থিতি এবং পূজা কৃষ্ণগঞ্জে। শাঁখারীবাজারের শংখশিল্পী, মাধবগঞ্জের তন্তুবায় এবং কৃষ্ণগঞ্জের

8 Bishnupur is an industrial town. The bulk of the population of this town are weavers, blacksmith, and Sankharies" Ruins of A Bengal District. P. C, Roy. Modern Review: September 1932, Page262-264.

কর্মকার শিল্পীদের, আলোচ্য দেবতাদের সেবা পূজায়, মুখ্য ভূমিকা ছিল এমন মনে করা অসঙ্গত নয়। এসবই বিষ্ণুপুরে একাধিক সুপ্রসিদ্ধ এবং সমৃদ্ধশালী শিল্পী-সংঘের (ক্রাফটগিল্ড) ইঙ্গিত দেয়। বিষ্ণুপুরের বাঁধগুলির মাধ্যমে সুপরিকল্পিত সেচ ব্যবস্থাও মল্লভূমের রাজাদের কৃষি-কার্যের উন্নয়ন-চিন্তারই দ্যোতক।[১০]

মুখ্যতঃ আদিবাসী অধ্যুষিত মল্লভূমিতে সমৃদ্ধ কৃষির কল্যাণে এখানের এক ব্যাপক অংশে ব্রাহ্মণ তথা উচ্চবর্ণের বর্ণহিন্দু জনসমষ্টির স্থায়ী বসতি গড়ে উঠে। প্রাচীন হিন্দুরাজাদের (রাজপুত) অনুসরণে ক্রমশঃ ব্রাহ্মণ-প্রধান সমাজ ব্যবস্থাও গড়ে উঠে এবং এঅঞ্চলের আর্যীকরণ পাকাপোক্ত হয়। হাজার হাজার (পুরাণ-ন্যায়-স্মৃতি-জ্যোতিষ-আয়ুর্বেদ) সংস্কৃত পুঁথি এ সাক্ষ্য বহন করছে। অনেকে মনে করেন এই সংস্কৃতায়ণ বা ব্রাহ্মণ্য-বিবর্তনের ফলে, মল্লরাজাদের

---

9 Silk cloth industry is perhaps the most prominent industry in the district of Bankura. Hundreds of families live upon the earnings of silk looms. Red. yellow, blue, violet, green Silk sarees and marriage Jors are manufactured by the weavers of Bishnupur, Sonamukhi and Birsingba. These Silk cloths are sent out to various places of India by local mahajans. These sarees and Jors are largely used by the middle class people on the occasion of marriage. Five or Six years ago each family of weavers used to earn from Rs. 2 to 3 per day in one loom." The Ruins Of A Bengal District. P. C, Roy. Modern Review: September 1932, Page—262-264. এই বিবরণ যদিও আধুনিক কালের তবু এর দ্বারা শিল্পনগরী বিষ্ণুপুরের ধাতুপ্রকৃতিটি উদ্ঘাটিত হয়। এই রেশম-শিল্পই বিষ্ণুপুরের অর্থনৈতিক উত্থান পতনের অন্যতম সূচক। একদা বিশ-ত্রিশের দশকে যে শিল্পের দুরবস্থার কথা আলোচ্য রিপোর্টে এ দেখা যায়—বর্তমানে পুনরুজ্জীবিত বালুচরীর প্রায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী উৎকর্ষে তা অনেকাংশে অপসৃত হয়েছে।

সঙ্গে তাঁদের আসল ক্ষমতার উৎস, এ অঞ্চলের আদি জনগোষ্ঠীর, নিবিড় পূর্ব-সম্পর্ক শিথিল হয়ে পড়ে এবং তৃণস্তরে মল্লরাজশক্তি দুর্বল হয়। ফলে মল্লরাজশক্তির পতন ত্বরান্বিত হয়।[১১] আদিবাসী জনসমষ্টির বিশেষ ধরণের গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজ ও অর্থনীতির উপর স্থায়ী-বসতি-সম্পন্ন গ্রাম-সমাজ ও অর্থনীতির আধিপত্যের ফলে স্বাভাবিকভাবে বর্ণভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার ও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে।

শুধু প্রাচীন পুঁথিই নয়, মল্লরাজাদের কীর্তিরাজির মধ্যেও ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন প্রয়াসের আভাস দুর্নিরীক্ষ্য নয়। অতএব এক তাৎপর্যপূর্ণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিবর্তনের প্রেক্ষাপটেই মল্লভূমির মন্দির-স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের সূচনা হয়েছে।

যাই হোক, উন্নত কৃষি-ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে কুটির শিল্পের সমুন্নত বিকাশে বিষ্ণুপুর শুধু বঙ্গদেশে নয়, পূর্বভারতের এক সমৃদ্ধ শিল্প নগরীতে পরিণত হয়।[১২]

---

10. No where was the system of irrigation tanks and bunds constructed with such systemetic thoroughness and far-seeing wisdom as was done in Bankura and other parts of western Bengal, covered by the old land of Mallabhumi by its old benevolent landlords and by the Raja of Bishnupur who ruled over it." G. S. Dutta Magistrate and collector of Bankura, Quoted by Sir P. C. Roy in his article. The Ruin Of A Bengal District : Modern Review. For September 1932 P. 262—264.

11 Bankura Old English correspondence, to Acting Register of Nizamat Adalat from Ernst dt. 30 Sept, 1806.

"The Jungle Zamindars were mostly tribal chieftains (who had sanskritized themselves as Rajput or Kshatriya Rajas) ruling over aboriginal tribes with whom their ethnic and ritual association was close. Presumably the Rajas of Bishnupur, suspected to have been Bagdis in

ভারতের ইতিহাসের এক যুগসন্ধিকালে, মোগলবঙ্গের এক সমৃদ্ধ শিল্পনগরী বিষ্ণুপুরের প্রেক্ষাপটে, বিকশিত এই মন্দির ও মন্দির-টেরাকোটা শুধু মল্লরাজত্বের শিল্প-সৌকর্যের নিদর্শন মাত্র নয়, বাঙ্গালীর শিল্প ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট অধ্যায়েরও জীবন্ত সাক্ষী। বঙ্গদেশের অন্তিম-মধ্যযুগীয় শিল্প (লেইট মিডাইভ্যাল) বিকাশের উজ্জ্বলস্মৃতিও বহন করছে এই মন্দিরগুলি।

আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন—(বৃহৎবঙ্গ দ্বিতীয়খণ্ড) "বন-বিষ্ণুপুরকে কেন্দ্র করে দুই শতাব্দীকাল বাংলার শিল্প-সাহিত্য ও সমাজ নূতনভাবে গড়িয়া উঠিয়াছিল এবং এদেশের শিক্ষাদীক্ষার যে ঘৃতের প্রদীপটি নিবু নিবু হইয়া জ্বলিতেছিল, বিষ্ণুপুরের রাজবংশ তাহা প্রোজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছিলেন।"

---

origin, at one time belonged to this Jungle Raja type. But in historical times claim to Kshatriya status was well established, probably due to their patronage of large number of Brahmans who were encouraged to settle in their country and civilize its inhabitants. The basis of their power had shifted from chieftaincy over tribals to kshatriya Kingship over a settled agricultural population of Brahman, and other castes. Under such circumstances, personal ties charetaristic of a tribal situation could not survive". Co.respondence. Vol. I, 1800—1808. (Vide Change In Bengal Agrarian Society Ratnalekha Ray, Monohar Publications. 1979. (New-Delhi)

12 A number of art and crafts grew up which made Vishnupur famous all over Northern India—Weaving of exquisite silk-stuffs with embroideries, carving of conch-shell bangles and other articles, making of brass and other utensils, and lac ; besides perfumed tobacco. These are somehow maintaining a faint echo of a glorious past when the city was in the heyday of its glory. "Modern Review : For March 1933. Page—348

আগেই বলা হয়েছে যে, ভারতের শিল্পকলার ইতিহাস বিশ্লেষণ করে, শিল্প-সমালোচক তথা গবেষকরা দেখিয়েছেন যে, প্রাচীন ক্লাসিক যুগ থেকে যতই কাল গত হয়েছে ততই ভারতীয় স্থাপত্য-ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে ক্রমাগত বিবর্তনের ফলে জটিলতা ও কুটিলতা বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রাচীন যুগের শিল্প-কলায় যে সরল সহজ স্বাভাবিক আবেদন লক্ষ্য করা যায়, মধ্যযুগের শিল্পকলায়, নানা শাস্ত্র-সাহিত্যের অনুশাসনে এবং আঞ্চলিক প্রভাবে, তা বিঘ্নিত হয়েছে, দেখা যায়। কেন্দ্রীয় শাসন এবং অনুশাসনের অভাবে, আঞ্চলিক প্রভাব-প্রাধান্যে ক্রমাগত বিবর্তিত মন্দির-স্থাপত্য মধ্যযুগে যেমন বিচিত্র-বিবর্তন লাভ করেছে, মূর্তি-শিল্পও, তেমনি নানা শাস্ত্রীয় অনুশাসন ও আঞ্চলিক প্রভাবে, মস্তক ও অঙ্গ-প্রত্যাঙ্গাদির সংখ্যাবৃদ্ধি জনিত জটিলতার শিকার হয়েছে, দেখা যায়।

অন্ত্য-মধ্যযুগে, যোড়শ-শতকে, মোগলদের ভারতে আগমনকে কেন্দ্র করে ভারতের শিল্পকলা 'ক্লাসিক-উত্তর' (পোষ্টক্লাসিক্যাল) মধ্যযুগের দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রবেশ করে। এসময় ব্যাপক মিলন-মিশ্রণ চলতে থাকলেও স্থাপত্যকলার ক্ষেত্রে অরাজক-বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় নাই। দেশ-বিদেশের বিশিষ্ট ও কৃতবিদ্য শিল্পীদের অংশগ্রহণে, মোগল যুগে, ভারতের শিল্পকলার ক্ষেত্রে যে ঋদ্ধ বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছিল, তার প্রেক্ষাপটে স্থাপত্য-ভাস্কর্যে সংযত সৌষ্ঠব-বিন্যাসের নীতিনির্দিষ্ট নান্দনিক শালীনতা বিঘ্নিত হয় নি। কিন্তু পরবর্তীকালে, আধুনিক যুগে, শিল্পক্ষেত্রে এই সংযত-শালীনতার পরিবর্তে যথেচ্ছ মিলন-মিশ্রণে স্থাপত্য-ভাস্কর্যের শিল্প জগতে সমধিক বিশৃঙ্খলা দেখা যায়। সুনির্দিষ্ট নির্মাণরীতির নৈষ্ঠিক অনুবর্তনের অভাবে সীমাহীন প্রকারভেদ মন্দির-স্থাপত্যের জগতে অরাজকতা সৃষ্টি করেছে।

মোগলযুগের শিল্প-সংস্কৃতির সুবর্ণময় প্রেক্ষাপটে বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলি নির্মিত হয়েছিল। বিষ্ণুপুরের অধিকাংশ বিখ্যাত মন্দির শাহজাহানের সমকালীন হলেও অনেকে মনে করেন, এখানের অতুলনীয় স্থাপত্য-কীর্তি "রাসমঞ্চ" বীরহাম্বীরের সময়ে নির্মিত। আজ পর্যন্ত কোন নিবেদন-লিপির সন্ধান না পাওয়া গেলেও, অনেকে

মনে করেন ১৬০০-১৬১০ খ্রীষ্টাব্দে এই মন্দির নির্মিত হয়। ডেভিড ম্যাক্‌কাচচনের মতে ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি কোন সময়ে সৌধটি নির্মিত হয়েছে। রাসমঞ্চ সম্পর্কে ডেভিড ম্যাক্‌কাচচনের অনুপুঙ্খ বিবরণে এর বিশিষ্ট স্থাপত্যরীতির পরিচয় খানিকটা মেলে।[১৩] কার্তিক মাসে রাসযাত্রার সময় এখানে সমস্ত কৃষ্ণ বিগ্রহের সমাবেশ হত বলে মনে করা হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, বিষ্ণুপুর শাখার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ডঃ মাণিকলাল সিংহ মনে করেন এখানে রাসউৎসব উপলক্ষে যাত্রাভিনয় হ'ত।

রাসমঞ্চ প্রায় ৬ ফুট উঁচু এবং দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ৮০ ফুট ৩ ইঞ্চি এক ঝামাপাথরের বিরাট বেদীর উপর স্থাপিত। রাসমঞ্চ সম্পর্কে মাণিকলাল সিংহ লিখেছেন— "পিরামিড-আকৃতি চূড়ামূলের চারদিক বেষ্টন করিয়া ৫১/৫২ ধাপ সিঁড়ির শেষ পর্যায়ে প্রতি কোণায় একটি করিয়া চারিটি চারচালা নীচের প্রকোষ্ঠগুলির দুইপার্শ্বের স্তম্ভগুলির আচ্ছাদন খিলানের উপর প্রতিদিকে চারিটি করিয়া দো-চালা আকারের ইমারত। দূর হইতে দেখিলে মনে হয় যেন একটি পাহাড়ের কোলে একটি বাংলা গ্রাম গড়িয়া উঠিয়াছে। মূল সৌধকে বেষ্টন

---

13 All other important temples in Bishnupur are in the various 'Bangla' styles, beginning with the extra ordinary rasmancha built by Bir Hambir around 1600. Here is one of the earliest extant uses of the 'bangla' do-chala above a series of cusped arches on sturdy pillars opening on to a Verandah which runs round all four sides. The Central structure is a larze pyramid unique in Bengal, beneth which a series of passage-ways surround a central chamber where all the images are said to have been brought at the time of the ras festival. A few terraeottas on the eastern wall are earliest examples of the Bishnupur style extant, embodying the basic rhythmic forms (The Temples Of Bankura District : by David Mc. Cutchion : Writers Workshop : P.—18.)

করিয়া বেদীটি চারিদিকে সমান প্রশস্ত। রাসমঞ্চের দক্ষিণে প্রশস্ত সমতল ভূমি, পূর্বপার্শ্বেও অপেক্ষাকৃত কম প্রশস্ত ভূমি। সমস্ত মিলাইয়া দেখিলে মনে হয়, রাসমঞ্চের ৫ফুট উচ্চ বেদীতে রাসযাত্রা ভিনয় হইত। আর দক্ষিণ ও পূর্বের সমতল জায়গায় বসিয়া দর্শকগণ যাত্রাভিনয় দর্শন করিত।" (মল্লভূমের প্রথম রাসযাত্রাভিনয়ঃ মাণিকলাল সিংহ ঃ বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে বিষ্ণুপুর নিখিল-বঙ্গ শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত আণ্ডার গ্রাজুয়েট ফ্যাকাল্টি ইমপ্রুভমেণ্ট টিচার-এডুকেশন সেমিনার উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক পত্রিকা১৯৭৮) রাজা বৈজলের আজ্ঞায় জগন্মোহন পণ্ডিত "ষট্পঞ্চাশৎ দেশাবলী নামক এক গ্রন্থ রচনা করেন। এই পুথি থেকে তিনশত বৎসর পূর্বে বঙ্গদেশের বেশকিছু বিবরণ পাওয়া যায় (অবশ্য সবক্ষেত্রে নির্ভুল নয়) এই পুঁথিতে বিষ্ণুপুর সম্পর্কে যে বিবরণ পাওয়া গেছে তাতেও রাসমঞ্চের উল্লেখ আছে। তিনি লিখেছেন— "দারিকেশী নদী পর্যন্ত মল্লভূমি .... জঙ্গলে আবৃত বিষ্ণুপুরীর রাজাগণ বিষ্ণু ভক্তি পরায়ণ। বীরসিংহ মহারাজা (বীরহাম্বীরের পৌত্র, প্রথম রঘুনাথ সিংহের পুত্র) তথায় প্রস্তর মন্দির ও দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন। .... মৃন্ময় দুর্গমধ্যে রাজবাটী দেবালয় প্রভৃতি সম্বলিত চতুঃক্রোশ বেষ্টিতা পুরী। কার্ত্তিক পৌর্ণমাসীতে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা হয়। পর্বতাকার রাসমঞ্চ তিনশত দ্বারসংযুক্ত (যদিও আসলে দ্বার-সংখ্যা একশতের কিছু বেশী)"। এই রাসমঞ্চে যে কয়েকটি টেরাকোটা ফলক বর্তমানে দেখা যায় তা সবই নাচের। রাসমঞ্চে অনুষ্ঠিত রাসপর্ব বা রাসযাত্রাভিনয় বর্তমানে কল্পনার বস্তু হলেও "রাসলীলার" উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের সাক্ষ্য দিচ্ছে শ্যামরায় মন্দিরের শত শত টেরাকোটা চিত্র বিশেষতঃ ৪০/৪২টি রাসমণ্ডল। শ্যামরায় মন্দিরটি পঞ্চরত্ন [বা পাঁচচূড়া] মন্দির। আদি মন্দির রাসমঞ্চে দো-চালা আর চারচালার অলঙ্করণ বিন্যাস লক্ষ্য করা গেলেও এবং দুটি দোচালা [শীর্ষদেশে চারচালা] একত্র সংযুক্ত করে বিখ্যাত জোড়বাংলা মন্দির নির্মাণ করলেও মল্লরাজারা ছিলেন 'রত্নমন্দিরের' [শিখর মন্দির] অধিকতর অনুরাগী।

মল্লরাজারা 'রত্নমন্দিরের' অধিকতর অনুরাগী হলেও, কার্যক্ষেত্রে

দেখা যায় তাঁরা পঞ্চরত্নের বেশী কোন রত্ন মন্দির নির্মাণ করেন নি। একরত্ন মন্দিরের সংখ্যাই সর্বাধিক। এই দুই শ্রেণীর রত্ন বা শিখর মন্দির পরিচ্ছন্ন গঠন সৌকর্যে যতটা সুঠাম ও সুন্দর রূপ লাভ করে শিখরের অযথা সংখ্যাবৃদ্ধি করে চূড়ার অরণ্যসৃষ্টি করলে সে ধরণের সুশৃঙ্খল ছন্দোবন্ধ পরিচ্ছন্ন আবেদন সৃষ্টি সম্ভব হয়না। অমিয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ("বাঁকুড়ার মন্দির" ঃ সাহিত্য সংসদ ঃ ১৯৬৪) মনে করেন " মন্দির স্থাপত্যে পরিমিত অঙ্গসন্নিবেশের মধ্য দিয়ে একটি চিত্তাকর্ষক রূপারোপে স্থপতিরা যখন অপারগ হন, তখনই অনাবশ্যক অলঙ্করণের সাহায্যে দর্শককে অভিভূত করার প্রয়োজন দেখা দেয়। সাবেক স্থাপত্য রীতির অনাড়ম্বর লালিত্য (grace) যতই ম্লান হয়ে পড়ে ততই এজাতীয় চটকদার বাহুল্যের প্রবর্তন হতে থাকে।

চালাঘরের অনুসরণে রচিত ধনুকাকৃতি প্রান্তভাগ যুক্ত ছাদের কেন্দ্রস্থলে একটি চূড়া বসিয়ে যেমন একরত্ন নির্মিত হয়, তেমনি একটি কেন্দ্রীয় চূড়ার চারদিকে চারটি শিখর বসিয়ে পঞ্চরত্ন বা পাঁচচূড়া মন্দির নির্মিত হয়। বিষ্ণুপুর ও তার আশে-পাশের সপ্তদশ শতকের রত্নমন্দিরগুলির সুগঠিত পরিচ্ছন্ন এবং স্থাপত্যগত শৃঙ্খলায় ছন্দো-বদ্ধ রূপারোপ দেখে মনে হয়, কিছু সুনির্দিষ্ট অনুশাসন মেনেই মন্দিরগুলি নির্মিত হয়েছিল। পঞ্চরত্নের শিখর সন্নিবেশ সম্বন্ধে অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন (বাঁকুড়ার মন্দির) ''প্রান্তবর্তী শিখরগুলি মন্দিরেয় বিভিন্ন তলে ছাদের কোণায় এমনভাবে সংস্থাপিত হবে যে, তাদের দুটি দেওয়াল যেন মন্দিরের সেই কোণ-উৎপন্নকারী দুটি দেওয়ালের সমান্তরাল হয়। রত্নমন্দিরের প্রতি কোণায় একটি মাত্র শিখর সংস্থাপিত হওয়াই বিধি।'' রত্ন বা শিখরগুলির আনুপাতিক আয়তন সম্পর্কে তিনি (অমিয়কুমার বন্দোপাধ্যায় ঃ বাঁকূড়ার মন্দির) লিখেছেন—''কোণের শিখরগুলির আয়তন কেন্দ্রীয় চূড়াটির থেকে অল্পাধিক ছোট হবে।'' বিষ্ণুপুর তথা বাঁকুড়া জেলার সমসাময়িক কালের (১৭শ শতক) মন্দিরগুলিতে উক্ত বিষয়গুলি প্রায়ই অনুসৃত হয়েছে, দেখা যায়। দেশবিখ্যাত অপূর্ব শ্রীসম্পন্ন শ্যামরায় মন্দিরটি (অপরূপ টেরাকোটা মন্দির) মল্লভূমে অদ্বিতীয় হলেও বিষ্ণুপুরের

মল্লরাজারা বিষ্ণুপুরে এবং বিষ্ণুপুরের বাইরে যে ব্যাপক সংখ্যক রত্ন মন্দির নির্মাণ করেছেন আকার-আয়তনে-অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ গঠনে সেগুলির বৈচিত্র্যও কম নয়। মন্দিরগুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ পূর্বেই দেওয়া হয়েছে। ডেভিড ম্যাক্‌কাচ্চন, সুপ্রসিদ্ধ এবং অনবদ্য শ্যামরায় মন্দিরটিই মল্লভূমের পঞ্চরত্ন মন্দিরের ক্ষেত্রে সবাধিক পুরানো কিনা সে প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন এবং সেই সঙ্গে স্থাপত্য-গত বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন কিছু পঞ্চরত্নের বিবরণও দিয়েছেন। প্রাসঙ্গিক কারণেই তা উদ্ধৃত করা হ'ল।[14] মল্লরাজাদের 'রত্নমন্দির' নির্মাণের দুটি সুস্পষ্ট পর্যায় লক্ষ্য করা যায়। পঞ্চরত্ন মন্দিরগুলির প্রায়

---

14 Apart from the Shyam Ray temple......the Mallas built a number of other Pancha-ratna temples, all of laterite with stucco decoration before this type was finally displaced in their favour by the ek-ratna. An intriguing question is whether the Shyam Ray temple is the first of their Pancha-ratna designs. It seems not, for the Brindaban Chandra temple at Birsingha in Patrasayer P. S. was built by Raghunath Singha five years earlier in 1638 (?). This is now no more than a heap of tumbled blocks, but is more likely to have been a Pancha-ratna than any other design, It stood in a monumental enclosure with corridor all round, turrets above the enclosure corner (a unique feature) and Gateway with Nahabat Khana. At Gokulnagar about ten miles east of Bishnupur is another large stone enclosure containing ruinous sub-sidiary building and the Pancha-ratna temple of Gakul Chand which still stands. A unique feature of this temple is that the corner towers are on four pillars like dol-mancha which may indicate an earlier date than the Shyam Ray temple or else an experiment. —Temples Of Bankura District : David Mc. Cutchion. P-23.

সমকালীন হলেও অব্যবহিত পরবর্তীকালে নির্মিত হয়েছে 'একরত্ন'গুলি। ক্রমশঃ দেখা যায় যে কোন কারণেই হোক একরত্ন মন্দির-নির্মাণ প্রাধান্য লাভ করেছে। অবশ্য অনেক পরবর্তীকালে ঊনবিংশ শতকেও বেশকিছু ছোট ছোট মাপের পঞ্চরত্ন মন্দির নির্মিত হয়েছে। সেগুলি শুধু মাপেই ছোট নয়, মর্যাদাতেও অনেক খর্ব। এগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নূতন যুগের জমিদার বা সম্পন্ন গৃহস্থের নির্মিত। সপ্তদশ শতকের পর থেকেই যে মল্লভূমের স্থাপত্য শিল্পে অপেক্ষাকৃত অবনতি দেখা দিয়েছিল তার একটি জীবন্ত দৃষ্টান্ত গোপাল সিংহ নির্মিত মহাপ্রভুর "দ্বিতীয় জোড়বাংলা" (বর্তমানে ধ্বংসপ্রাপ্ত) মন্দিরটি। প্রথম জোড়বাংলা (১৬৫৫) মন্দিরটির সঙ্গে তুলনা করলেই এর স্থাপত্যগত স্থূলতা সহজেই ধরা পড়ে।

একরত্ন মন্দিরের মধ্যে বিষ্ণুপুরবাসীর প্রাণের ঠাকুর মদনমোহনের মন্দিরটি উল্লেখযোগ্য। ডেভিড ম্যাক্‌কাচচন মন্দিরটির যে অনুপুঙ্খ বিবরণ দিয়েছেন, তাতে এই মন্দিরটির একটি সম্পূর্ণ লিপিচিত্র পাঠকের চোখের সামনে ফুটে উঠে। প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় তাঁর বর্ণনাটি উদ্ধৃত করা গেল।[১৫]

কিন্তু রত্নমন্দিরের ক্ষেত্রে একটি মুখ্য ভূমিকা রয়েছে চারচালা ছাদটির। চূড়া বা রত্নগুলির ভিত্তিভূমি এই 'বাংলা-চালার' আদলটি

---

15 Durjan Singha built the famous Madan Mohan temple also an ekratna, but reverting to brick and terracottas. Only the south facade is decorated, although the vitality and detailed care are undiminished. This is particulary evident in the drummers on the columns, or in friezes of cows and ducks...... The Quadruple row across the top consists entirely of battle scenes, as also the archway panels, which are unusual in presenting the battles of Kurukshetra rather than of Lanka. The lower panels include Krishnalila on the left and the incarnations of Vishnu on the right." Temples Of Bankura District : by David Mc. Cutchion : Writers Workshop.

রত্ন মন্দিরের স্থাপত্য শৈলীকে উল্লেখযোগ্য অভিনবত্ব দান করেছে। অনেকে দক্ষিণ ভারতের মহাবলীপুরম্ বা মামল্লপুরমের দ্রৌপদী রথের সঙ্গে বাংলা-চালার সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন।[১৬] প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রাতে কিছু কুটিরের চিত্র পাওয়া যায়। ভারতীয় স্থাপত্য-শিল্পের কাঠ-পাথরের আগের যুগকে কুটিরের (Thatch-Period) যুগ বলা হয়ে থাকে। প্রাচীনকালে ঋষিরা অবশ্যই কুটিরে বাস করতেন। কিন্তু এসব কুটির বিশেষভাবে 'বাংলা-চালা' বলে মনে হয় না। মহাবলীপুরমের (মামল্লপুরম) 'দ্রৌপদী-রথ' বা পাথরের তৈরী চারচালা ঘরটির চালের প্রান্তভাগ ধনুকের মত বাঁকানো আকৃতির (যা বাংলা-চালার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য) নয় —অনেকটা সরলরেখার মত। 'বাংলা-চালা' বা 'বাংলা-মন্দির-স্থাপত্যের' লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যই হ'ল খড়ের চালের মত ধনুকাকৃতি ছাদ গঠন। 'বাংলা-চালাকৃতি' মন্দিরে বঙ্গের মাটির প্রভাব প্রেরণাই যেন স্বতোচ্চারিত হয়েছে। পার্শি ব্রাউন বলেছেন— " It speaks of the soil itself, and few things can be more fundamentally influential than the nature of one's native soil".

বাংলার সাধনার একটি নিজস্ব ধারা আছে। হৃদয়সংবেদ্য এই সহজ-সাধনার ধারা যতটা না আধ্যাত্মিক তার চেয়ে অনেক বেশি মানবিক। মানবধর্মের উপরেই এর ভিত্তি। এ সাধনার আবেদন বহুলাংশে সাংস্কৃতিক। আগেই বলা হয়েছে এ অঞ্চলের যথার্থ মাটির সন্তান সহজ সরল সাধারণ মানুষগুলির দেহে বা জীবনে কোন অলঙ্কার

---

16 A group of brick temples at Vishnupur, Bankura District, Bengal, due to the Vaisnava Rajas of Mallabhum and dating between 1622-1758 is characterised by the use of a simple curved roof reproducing the form of the bamboo and thatch roofs of Bengali and Orissan cottages and recalling that of the Draupadi Ratha at Mamallapuram and further by an abundance of fine moulded brick work."

History Of Indian And Indonesian Art. Page 116. by A K, Coomarswamy.

বাহুল্য নাই— অথচ আছে আদিম শৌর্যে ভরা বাহুল্যহীন দেহ সৌষ্ঠব সবল ঋজু শালগাছের মত কিংবা জগমোহন হীন রেখ দেউলের মত। অন্তরে আছে অনুষ্ঠানহীন শুদ্ধাভক্তি। এরা সব আরাধনাকেই প্রাণের সহজ-সাধনায় রূপান্তরিত করে গ্রহণ করেছে সহজভাবে। হৃদয়াবেগের অফুরন্ত আকূতিতে; যে অকুণ্ঠ হৃদয়োচ্ছ্বাস চৈত্র গাজনে লক্ষ লক্ষ ভক্তের কণ্ঠে শিবের স্তুতি-গর্জনে উৎসারিত হয়, তাই আবার খোল-মাদলের সঙ্গে রাধাকৃষ্ণ নাম গানে প্রেম ভক্তির ধারা হয়ে ঝরে পড়ে; চণ্ডী মনসার ভজনে একইভাবে সহস্র চিত্ত ভক্তিবিহ্বলতায় আত্মহারা হয়। প্রেমভক্তির অন্তহীন হৃদয়োচ্ছ্বাসে উৎসারিত এদের ধর্ম চিন্তা সাম্প্রদায়িকতাহীন। বিষ্ণুপুর সাহিত্য পরিষদের পুঁথি সংগ্রহে শত শত মন্ত্রতন্ত্রের পুঁথি আছে যেখানে হিন্দু-দেবদেবীর সঙ্গে আল্লার দোহাই দেওয়া হয়েছে নির্বিকার চিত্তে। এই সহজ-সাধনার ধারাই মধ্যযুগের দিগন্তে এসে 'দেবতারে প্রিয় করি—প্রিয়েরে দেবতা' রূপে ভজনা করার বাঞ্ছায় আশা-আকাঙ্খা আর প্রেম-মমতায় ভরা আপনার কুটিরখানি দেবতার পায়ে সমর্পণ করেছে—আত্যন্তিক ভালবাসায়। কুটিরের আদলে রচিত বাংলার দেবায়তন বা দেবমন্দিরের গঠনটির আবেদন অনাধ্যাত্মিক বা 'সেক্যুলার'—হিন্দু-মুসলমান উভয়েরই বাসগৃহের আদলে গঠিত এই স্থাপত্যরীতির গ্রহণযোগ্যতা অবিসংবাদিত। এর কোথাও কোন ধর্মীয় স্পর্শ নাই। তাই হিন্দু মুসলমান সমানভাবে জাতীয় উত্তরাধিকার রূপে এই স্থাপত্যরীতিকে নিজ নিজ প্রয়োজনে স্বচ্ছন্দে গ্রহণ করেছে। শুধু তাই নয়, রাধাকৃষ্ণের লীলাকেন্দ্রিক, বাংলার বৈষ্ণবীয় সহজ-সাধনার সাংস্কৃতিক আবেদন, প্রেমভক্তির এক প্রতীকরূপে একই সঙ্গে হিন্দু-মুসলমানেয় রসতৃষ্ণা চরিতার্থ করেছে দেখা যায়।[১৭] রাধাকৃষ্ণলীলা সহজ-সাধনায় এক

---

১৭ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুকে অবলম্বন করিয়া ষোড়শ-শতাব্দীতে বাংলা-দেশে বৈষ্ণবধর্ম ও সাহিত্যের যে অভিনবপ্রসার ঘটিয়াছিল, তাহারই ফলে পরবর্তীকালে রাধাকৃষ্ণের লীলা অথবা গৌরাঙ্গ-লীলা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে বাঙলার জনগণের নিকট একটা সামাজিক উত্তরাধিকাররূপে দেখা দিয়াছিল। শশিভূষণ দাশগুপ্ত (লালন গীতিকার ভূমিকা)।

ভাব-সম্পদরূপে হিন্দু মুসলমানের যৌথ উত্তরাধিকারে পরিণত হয়েছে। সাংস্কৃতিক আবেদনের ধাতুপ্রকৃতিতে নিহিত মানবিকতা অবলীলাক্রমে সাম্প্রদায়িকতাকে অতিক্রম করে।

হিন্দু-মুসলমান শিল্পী একত্রে মন্দির গড়ে—মসজিদ বানায়। স্থাপত্য-ভাস্কর্যে তাই শিল্পরীতির বিনিময় চলে অবলীলাক্রমে। জাতীয় সম্পদ বৃদ্ধি পায়। ডেভিড ম্যাক্‌কাচ্চন মনে করেন ত্রয়োদশ শতকে আক্রমণকারী মুসলিম শক্তির আগমন, কালক্রমে মন্দির স্থাপত্যের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। তাই পরবর্তী তিনটি শতকের, মন্দির স্থাপত্যে মুসলিম প্রভাব গভীরভাবে অনুভূত হয়। তিনি বলেছেন খিলান, ভল্ট, খিলানবাহী বিচিত্ররীতির স্তম্ভ, বাঁকানো কার্ণিশযুক্ত মন্দিরের ছাদ প্রভৃতি উপাদানগুলি যদিও প্রাচীনকালে ভারতীয় স্থাপত্য-শিল্পে কোন না কোন ভাবে বর্তমান ছিল, তবু একথা সত্য যে, ষোড়শ-শতকের অব্যবহিত পূর্ববর্তী মুসলিম স্থাপত্যে এগুলির বিকাশ ও ব্যবহাররীতি উন্নততর হয়েছে—এবং অন্তিম মধ্যযুগের (লেইট-মিডাইভ্যাল) মন্দির স্থাপত্যে এগুলি সরাসরি মুসলিম-স্থাপত্যরীতি থেকেই গৃহীত হয়েছে এবং পরীক্ষিত ও পরিণত এই স্থাপত্যরীতির স্বচ্ছন্দ এবং বহুল ব্যবহার সম্ভব হয়েছে।[১৮]

চালা মন্দিরের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ সম্পর্কে 'বাঁকুড়ার মন্দিরের' লেখক অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডেভিড ম্যাক্‌কাচ্চন বিশদ আলোচনা

---

18 The arrival of the Muslim invaders at the beginning of the 13th century, brought about a sharp break in the history of temple architecture in Bengal. For the next three centuries the architecture is almost wholly Islamic of which the most important remains are at the ancient capitals of Gour and Pandua in Malda district. These mosques and mousaleums establish several features which are subsequently incorporated in to the Bengali late style of temple architecture—interior vaulting—pointed arches with cusps a sturdy pillar with many facets, and

করেছেন। চতুষ্কোণ ভিত্তিবেদীর উপর স্থাপিত চারিটি দেওয়ালের কূর্মপৃষ্ঠাকৃতি ছাদ একত্র মিলিত হলে তাকে 'চারচালা-বাংলা' মন্দির বলা হয়। চারচালা খড়ের ঘরের অনুকরণে নির্মিত। দোচালা বা একবাংলা মন্দিরও বাংলাদেশের দো-চালা কুটিরের অনুসরণে নির্মিত। দুটি দো-চালা একসঙ্গে যুক্ত হলে তাকে "জোড়বাংলা" বলা হয়।

মল্লরাজাদের নির্মিত উল্লেখযোগ্য বাংলা-চালা মন্দিরের প্রসঙ্গে আগেই রাসমঞ্চের দো-চালা আর চারচালার কথা বলা হয়েছে। মন্দিরের প্রাকার-তোরণ বা ভোগমণ্ডপের ক্ষেত্রে হুবহু দো-চালার অনুসরণ কোথাও কোথাও দেখা গেলেও মূল মন্দিরের ক্ষেত্রে শুধু দোচালার ব্যবহার কম, চারচালা আছে। দুটি দো-চালার একত্র সংযোগে রচিত বিষ্ণুপুরের জোড়বাংলা মন্দিরটি তার শীর্ষদেশের চারচালা চূড়াটির জন্য বঙ্গদেশের 'জোড়বাংলা-মন্দির-স্থাপত্যের' ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করেছে। একই মন্দিরে দো-চালা আর চারচালার দৃষ্টান্ত এখানে বর্তমান। বিষ্ণুপুরের খড়বাংলা পল্লীর শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ মন্দিরটি আটচালা মন্দির—যদিও নীচের মূল চারচালা মন্দিরটির তুলনায় উপরের চারচালাটি অনেক ছোট আকারের—অনেকটা চূড়ার মত। কিন্তু অন্যান্য রেখদেউলাকৃতি রত্নমন্দিরের চূড়ার মত মোটেই নয়। পরিষ্কার ধনুকাকৃতি প্রান্তভাগযুক্ত খড়ের চালার মত ছাদের গঠন। বিশেষ করে যে পাড়াতে মন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত তার নাম 'খড়বাংলা'। সংলগ্ন পাড়াটির উক্ত নামকরণ মন্দিরের স্থাপত্যরীতির পরিচয় বহন করছে—এমন

---

terracotta decoration,—antecedents may bc found in previous Hindu art, but the Muslims developed the specific forms and specific uses of the late mediaeval tradition. The curved cornice was taken from the bent bamboo curves of the village hut, and is the most characteristic feature of the Bengal Style."

Temples Of Bankura District : David Mc. Cutchion.

মনে করা অসঙ্গত নয়। কেউ কেউ খড়বাংলার এই মন্দিরটিকে (ভারতীয় আর্কিওলজিক্যাল-সার্ভে'র-পূর্ববিভাগের এককালীন সুপারিনটেনডেন্ট ডি. বি, স্পুনারের ১৯১০-১১ খ্রীষ্টাব্দের বার্ষিক বিবরণ অনুসরণ করে অমিয়কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়) চারচালা-একচূড় পর্যায়ভুক্ত করেছেন। কিন্তু ডেভিড ম্যাক্‌কাচ্চন এটিকে সঙ্গতভাবেই আটচালা বলে অভিহিত করেছেন। একথা সত্য, অন্যান্য "বিষ্ণুপুরী আটচালার" গঠনরীতি কিছুটা ভিন্ন ; 'বিষ্ণুপুরী আটচালায়' উপর ও নীচের চারচালার মধ্যে যে ব্যবধান-স্বল্পতা তা এখানে নেই। ডেভিড ম্যাক্‌কাচ্চন বলেছেন যে খড়বাংলার মন্দিরটি নীচু চূড়ার আটচালা নয়। নীচুচূড়ার আটচালার দৃষ্টান্ত প্রসঙ্গে তিনি গোস্বামী পাড়ায় অবস্থিত শ্রীনিবাস কন্যা হেমলতার প্রাণের ঠাকুর শ্রীশ্রীরাধারমণ জীউ বিগ্রহের আটচালা মন্দিরটির কথা বলেছেন।[১৯] এ মন্দিরের কয়েকটি টেরাকোটা-চিত্র গঠন-চারুতায় অপূর্ব। বিশেষ করে এ মন্দিরের উত্তর পশ্চিমকোণায় সন্নিবেশিত পুঁথি পাঠের (বা ভাগবত পাঠ) চিত্রটি তাৎপর্যপূর্ণ। এখানের মন্দির সম্মুখস্থ পূর্বদিকের মূল দালানটি বহুদিন আগেই ধ্বংসে গেছে। বর্তমানে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব বিভাগ কর্তৃক পুনর্নির্মিত হয়েছে। এই দালানের ত্রিখিলান প্রবেশ পথের সর্বদক্ষিণটির (উত্তরপূর্বকোণের প্রবেশ পথের) ডানদিকে স্থাপিত "গজেন্দ্রমোক্ষ" চিত্রটি শ্যামরায় মন্দিরের দক্ষিণের বারান্দা থেকে

---

19 Curiously enough there is in Bishnupur a large richly decorated at-chala temple of 1659 built by the wife of Raghunath Singha which is not of this low-towered type. This is the Radha-Binod temple in Kharbangla para of which the facade has unfortunately collapsed. The only low-towered at-chala design in Bishnupur is also in this para the Radha Ramon temple of 1687 an unpretentious plain brick structure now abandoned and overgrown."

The Temples Of Bankura District : David Mc. Cutchion Page 24.

গর্ভগৃহে প্রবেশের সুড়ঙ্গ পথের শেষ মাথায় স্থাপিত ঐ একই চিত্রের চেয়ে কারিগরিতে অনেক উৎকৃষ্ট এবং উজ্জ্বল।

মন্দির দেওয়ালে টেরাকোটা-চিত্রগুলি স্থাপন করার ক্ষেত্রেও একটি সুনির্দিষ্ট রীতি-নীতি অনুসৃত হ'ত বলেই মনে হয়। এর জন্য প্রচুর হিসাব-নিকাশ করে কাজ করতেন শিল্পীরা। টেরাকোটা বসানোর ক্ষেত্রে মন্দিরের সম্মুখভাগ সর্বাধিক গুরুত্ব পেলেও, অনেক সময় মন্দিরের চারদেওয়াল এমনকি ছাদের শিলিং পর্যন্ত টেরাকোটা-চিত্র দিয়ে ছেয়ে দেওয়া হত। শ্যামরায় ও জোড়বাংলায় এমনি অফুরন্ত অলঙ্করণ লক্ষ্য করা যায়। সাধারণতঃ মন্দিরের ভিত্তি থেকে সুরু করে মন্দিরের বাঁকানো তলদেশ পর্যন্ত টেরাকোটা-টালি দিয়ে ছেয়ে দেওয়াই ছিল নিয়ম। কার্ণিশের বক্ররেখা অনুসরণ করে ঠিক তার নীচে দুই বা ততোধিক সারিতে উজ্জ্বল টেরাকোটা চিত্রগুলি নিবদ্ধ করাই প্রচলিত প্রথা ছিল। অনেক সময় অলঙ্কৃত-অগভীর কুলুঙ্গির মধ্যে ফ্রেমে আঁটা ছবির মত পাশাপাশি টেরাকোটা চিত্রগুলি বসিয়ে সারিগুলি রচিত হত। এই সারিগুলির নীচে ত্রিখিলান প্রবেশ-পথের মাথায় এবং দুপাশে উৎকৃষ্ট চিত্রগুলির সন্নিবেশ করা হত। ত্রিখিলানের ভারবাহী দুটি পূর্ণ ও দুটি অর্দ্ধস্তম্ভের গায়ে সবচেয়ে সূক্ষ্মকারুকার্যময় চিত্রগুলি বসানো হ'ত। শ্যামরায় মন্দিরের স্তম্ভের চিত্রগুলি গজদন্তের উপর নিপুণ-তক্ষণ-চাতুর্যের বিস্ময়কর কারু-কৃতিকেই যেন স্মরণ করিয়ে দেয়। ত্রিখিলানের ভারবাহী এই হ্রস্ব অথচ অপরিসীম ভারবহনক্ষম স্তম্ভগুলি বঙ্গের স্থাপত্যকলায় স্থপতিদের এক অভিনব সংযোজন। পার্শিব্রাউন এই ধরণের স্তম্ভগুলির ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।[২০] আয়তনগত কিছু পার্থক্য থাকলেও গৌড় পাণ্ডুয়ার এই জাতীয় স্তম্ভগুলিকে বিষ্ণুপুর-মন্দিরের পূর্বসুরী বলা যায়। বিষ্ণুপুরের মন্দিরে দেখা যায় এই স্তম্ভগুলির গায়ে নৃত্য-গীতিময় কৃষ্ণলীলার চিত্রগুলি বিশেষভাবে স্থান পেয়েছে।

20. Pillars are remarkable, as they are not only exceptional in their proportions, but these massive supports found favour in most of the different phases of architecture as developed in other places in Bengal. In no part in India

মন্দির-গাত্রের একই সমতলে শত শত টালির বৈচিত্র্যহীন সমাবেশ না ঘটিয়ে দেওয়াল থেকে উদ্গত অভিক্ষিপ্ত (Projected) হ্রস্ব-দীর্ঘ পলকাটা অর্ধস্তম্ভ (Pillasters) সৃষ্টি করে, মন্দিরের ছাদের ধনুকাকৃতি কার্ণিশের অনুকরণে ত্রি-খিলান দ্বারের মাথায় উদ্গত অভিক্ষিপ্ত দ্বিতীয় কার্ণিশ সৃষ্টি করে শিল্পী সমতল মন্দির-গাত্রে উচ্চাবচ ভূমি রচনা করেছেন এবং সেগুলিতে টেরাকোটা-চিত্রের সন্নিবেশ করেছেন। ঐসব অভিক্ষিপ্ত অংশগুলির উদ্গমনের ফলে মন্দির গাত্রের সমতল জমিনের উপর উদ্ভূত ছোটবড় খোপগুলিতে সুদৃশ্য অলঙ্কৃত ফ্রেমে নিবদ্ধ করে টেরাকোটা-চিত্রগুলিকে সুনির্দিষ্ট নক্সা-মাফিক দুই বা তিনসারিতে সন্নিবেশিত করা হয়েছে। বিন্যাস-সৌকর্যে টেরাকোটা চিত্রগুলি অধিকতর নয়নাভিরাম হয়েছে। স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যের এই অপরূপ মেলবন্ধনে মন্দিরগুলিকে কেন্দ্র করে অসামান্য শিল্প-সৃষ্টি করেছেন শিল্পীরা।

অন্তিম-মধ্যযুগের বিষ্ণুপুর তথা বঙ্গের মন্দির-স্থাপত্যে হিন্দু-মুসলিম শিল্পরীতির স্বচ্ছন্দ মিলন ঘটেছে। শিল্প সৃষ্টিধর্মী—প্রত্যক্ষ সৃষ্টির আনন্দে শিল্পীমন উদার প্রসন্ন আনন্দলোকে সহজেই উধাও হয় কোথাও কোন রক্ষণশীলতা বা সীমাবদ্ধতা থাকেনা। ধর্মদর্শনও উদার—মানবিক কল্যাণেই উৎসর্গীকৃত। কিন্তু তাকে প্রাতিষ্ঠানিক করতে হলে—আচার-অনুষ্ঠানের অনুশাসনে প্রতিষ্ঠান-বদ্ধ বা সম্প্রদায়গত করতে হয়। স্থাপত্য-ভাস্কর্য তথা সর্ববিধ শিল্পকলাও শাস্ত্রানুশাসনে প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মীয় রূপ পরিগ্রহ করে। অনেকে মনে করেন, আধ্যাত্মিকতাই ভারতীয় স্থাপত্য-ভাস্কর্যের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। বিশেষতঃ ভিত্তিগাত্রের সর্বাংশ আচ্ছাদিত করে

---

have such ponderous piers have been employed so that this abnormally wide and often short type of pillar is specially characteristic of the building art in this eastern region."

Indian Architecture (Islamic Period) Percy Brown : B. D. Taraporevala Sons & Co. Bombay (Sixth Reprint : 1975)

ভারতের অসংখ্য পুরাণ-ধর্মগ্রন্থ-মহাকাব্য আর অসীম সমুদ্র সদৃশ কথাকাহিনীর অন্তহীন আড়ম্বরকে রূপায়িত করার যে বিপুল আয়োজন তার ধাতুগত অলৌকিক তথা পৌরাণিক আবেদন এই ধর্মীয় ব্যঞ্জনাকে অধিকতর গভীর করে তুলে।[২১]

একথা সর্বজন বিদিত যে স্থাপত্য-ভাস্কর্যের মূল উপাদানগুলির উৎস সাধারণ মানুষের বাসগৃহ বা তার জীবন যাপনের আদিম উপকরণ; কুটিরের চাল কিংবা বাঁশ-কাঠের বেড়া, মন্দির-স্থাপত্যে ধনুকাকৃতি ছাদ কিংবা রেলিং রূপে ব্যবহৃত হয়েছে। সাঁচীর রেলিং থেকে বিষ্ণুপুরের জোড়বাংলা পর্যন্ত মন্দির-স্থাপত্যে বাঁশ আর কাঠের কাঠামোর আদল সুস্পষ্ট। গৌড়-পাণ্ডুয়ার মসজিদেও যে এ দৃষ্টান্ত বিরল নয় তা আগেই বলা হয়েছে। অতএব একথা মনে করা অসঙ্গত নয় যে, আদিম "অনাধ্যাত্মিক" বা "সেকুল্যার" উৎস থেকেই ধর্মীয় স্থাপত্য-ভাস্কর্যের রূপ বিবর্তন ঘটেছে। বাসগৃহের দেওয়াল চিত্রিত করার প্রাচীন বা আদিমরীতি আজও আদিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত। মন্দির বা মসজিদের ভিত্তি অলঙ্করণের উৎসও

---

21 In the same way the outstanding quality of the architecture of India is its spiritual content. This characteristic of Indian architecture is emphasized by the treatment of its wall surfaces. The scheme of sculpture which often covers the whole of the exterior of the building is notable not only for the richness of its decorative effect but for the deep significance of its subject matter,

Here is not only the relation of architecture to life but transcendent life itself plastically respresented. Carved in high or low relief are depicted all the glorious gods of age old mythology of the country, engaged in their well known ceremonials, an unending array of imagery steeped in symbolism, thus producing an "Ocean of story" of absorbing interest." —Indian Achitecture (Buddhist And Hindu) by Percy Brown.

মনে হয় এমনি কোন এক লোকসংস্কৃতির অনুবর্তন। রাসনৃত্য, আদিবাসী নৃত্যের গোত্রান্তরিত রূপ বলে অনেক পণ্ডিত মনে করেন। আদিম 'মন্ত্রাচার'ও গোত্রান্তরিত হয়ে উন্নত-দার্শনিকতাপূর্ণ ধর্মীয় রূপলাভ করেছে বলে মনে করা হয়। 'ইন্দ্রধ্বজ-পূজার' শাস্ত্রীয় অনুষ্ঠানের পশ্চাতে একাধিক সমগোত্রীয় আদিবাসী উৎসবের (ইন্দ-করম-ছাতা) প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। প্রাগৈতিহাসিক মাতৃকা পূজাই নানাভাবে বিবর্তিত হয়ে শক্তিতন্ত্রের দার্শনিক রূপলাভ করেছে —এবং প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের বিকাশকাল পর্যন্ত নানাভাবে ভারতীয় ধর্ম-দর্শনকে প্রভাবিত করেছে, এটাও অবাস্তব কল্পনা নয়। আদিম তন্ত্রাচার স্বরূপে অথবা রূপান্তরে যে অভিজাত-ধর্ম-সংস্কৃতিতে অনুপ্রবেশ করেছে এটাও প্রচলিত মত। কাম-দেবের ফুলশর এবং তার সম্মোহন ক্রিয়ার পশ্চাতে-আদিম সম্মোহন-বশীকরণ-মারণ উচাটনের প্রভাবও অস্বীকার করা যায় না। অভিজাত শাস্ত্র-সাহিত্যে শুধু আদিবাসী লোকসংস্কৃতির উৎসব-অনুষ্ঠানের বিষয়গত উপাদানই নয় বহু আদিম-ভাবধারা বা লোকচিন্তা অভিজাত ধর্ম-দর্শনের উপরেও প্রভাব বিস্তার করেছে। এই নিবিড় সাংস্কৃতিক সম্পর্কেই মানুষের আদিম যৌথ জীবনের ইঙ্গিত দেয়।

অথচ, সমাজ বিকাশের বিচিত্র ধারায় মানুষের সংস্কৃতি অভিজাত অনভিজাত দুটি ভাগে বিভক্ত হয়েছে। প্রাতিষ্ঠানিক অনুশাসনে মানুষের সাংস্কৃতিক সাম্যের অবসানই শুধু ঘটেনি স্পৃশ্যাস্পৃশ্য, এবং বর্ণ-শ্রেণী বিচারের প্রাতিষ্ঠানিক ও সামাজিক বাধা দুই স্তরের ব্যবধান ক্রমশঃ দুস্তর করে মানব সম্পদের যৌথ উত্তরাধিকার থেকে এক সংখ্যা-গরিষ্ঠ শ্রেণীকে নির্বাসিত করেছে। সামাজিক পার্থক্য আর শ্রেণী-ভেদ সাংস্কৃতিক শ্রেণীভেদও রচনা করেছে। একের ধ্যান-ধারণা-দর্শন অনেক ক্ষেত্রে অন্যের বিরুদ্ধাচারী হয়েছে – সামাজিক ক্ষত সাংস্কৃতিক অপঘাতকে টেনে আনছে।

অবশ্য এই প্রাতিষ্ঠানিক বাধা দূর করে মানবের পুনর্মিলনের সাধনা উভয় ক্ষেত্রেই চিরন্তন। দুই পক্ষের মনীষীরাই স্মরণাতীত কাল থেকেই এই সাধনা করে চলেছেন। তথাকথিত অনভিজাত লোকসাধনা কিংবা অভিজাত ধর্মদর্শন উভয়ের ধাতুপ্রকৃতিতেই রয়েছে

মিলন প্রয়াস। জীবনে জীবন যোগ করাই সব সাধনার লক্ষ্য। জীবনের সঙ্গে যুক্ত হ'তে না পারলে কাব্য-সাহিত্য-ধর্ম-দর্শন সবই প্রাণহীন ব্যর্থ হয়ে পড়ে। প্রতিটি প্রবর্তকের প্রধানলক্ষ্য তাই মানব মিলন। যে তাৎপর্যেই বলা হোক 'সবার উপরে মানুষ সত্য' কিংবা 'যা নাই ভাণ্ডে তা নাই ব্রহ্মাণ্ডে' উক্তিগুলি যেমন একবিশিষ্ট ধর্মসাধনারই পথ নির্দেশ 'যত্রজীব তত্র শিব'ও তেমনি এক ধর্মীয় আপ্তবাক্য। এসমস্ত প্রবচনেই ধর্মীয় ঐক্যচিন্তাই প্রকাশ পেয়েছে। উচ্চ স্তরের দার্শনিক তত্ত্বযুক্ত না হলেও লোকধর্ম আর লোকসংস্কৃতি সহস্র জীবনের সংযোগে তত্ত্বপ্রধান অভিজাত ধর্মের চেয়ে, অধিকতর প্রাণবন্ত ও বেগবান।

প্রতিটি ধর্ম-প্রবর্তকের লক্ষ্য তাই সার্বজনীন জীবন সাধনা। তাঁরা তাঁদের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব আর হৃদয় বেগ প্রসূত অনুভূতিকে অবলম্বন করে অনায়াসে অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানের বেড়া ডিঙ্গিয়ে সার্বজনীন লোক জীবনের সঙ্গে যুক্ত করে ধর্মে প্রাণ ও গতিবেগ সঞ্চার করতে চান। কিন্তু এই সব ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব অপ্রকট হলে, আচার-অনুষ্ঠান অবলম্বন করেই তাঁদের ধর্মকে টিকিয়ে রাখা হয়। টীকা-টিপ্পনিই তখন ধর্মদর্শনের স্থান গ্রহণ করে।

নানক-কবীরের মত শ্রীচৈতন্যও চেয়েছিলেন মানবিকতার বেদীতে তাঁর ধর্মকে প্রতিষ্ঠা করতে। হিন্দু আচার-অনুষ্ঠানকে সম্পূর্ণ অস্বীকার না করলেও, অনেকাংশে অতিক্রম করে তিনি তাঁর ধর্মকে মুখ্যতঃ মানবমুখী করতে চেয়েছিলেন তত্ত্ব আর পাণ্ডিত্যকে এড়িয়ে। শ্রীচৈতন্যের এই ধর্ম মূলতঃ হৃদয়াবেগ প্রসূত সাবন ধর্ম।

কিন্তু স্বল্পায়ু চৈতন্যের তিরোধানের পর বৃন্দাবনের ষট্-গোস্বামীরা, বিদ্বজ্জন সমাজের শাস্ত্রীয় অনুশাসন মেনে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মকে প্রকারান্তরে হিন্দুধর্মের সঙ্গেই যুক্ত করে দেন। তাঁদের হাতে শ্রীচৈতন্যের ভক্তিধর্ম প্রাতিষ্ঠানিক এক হিন্দু-পৌরাণিক ব্রাহ্মণ্যধর্মে পরিণত হয়।[22] সনাতন হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্বই ঘোষিত

---

22 In should be noted that bhakti as preached by Chaitanya and his followers was too emotional to become a subject of intellectual discourse, It was the negation of intellect and

হয়েছে গোস্বামী গ্রন্থে। শ্রুতির (বেদের) মুখ্যার্থকেই শ্রেষ্ঠ প্রমাণ-রূপে নির্দেশ করেছেন শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত। চরিতামৃত বলেছেন :

প্রমাণের মধ্যে শ্রুতি প্রমাণ প্রধান।
শ্রুতি যে মুখ্যার্থ কহে সেইত প্রমাণ ॥

"ভক্তি রসামৃত সিন্ধুর" অনুশাসন উদ্ধৃত করে পূর্বেই বলা হয়েছে যে, গোস্বামী সিদ্ধান্ত অনুসারে শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-আর পঞ্চরাত্র আগমের বিধি অবজ্ঞা করে সাধনা করলে সেই ঐকান্তিকী নিষ্ঠাপ্রাপ্ত সাধন ভক্তিও শ্রেয় সাধক হয় না। এই সব অনুশাসনে পৌরাণিক হিন্দু ধর্মের অনুবর্তনের আভাস। শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্র মতবাদকে মান্য করে প্রাতিষ্ঠানিক ভক্তি সাধনার এই অনুশাসন গোস্বামী সিদ্ধান্তের ধাতু প্রকৃতিটিকেই উদ্ঘাটিত করে। শ্রীচৈতন্যের ভক্তিধর্ম ক্রমশঃ পৌরাণিক হিন্দুধর্মের অঙ্গীভূত হয়েছে দেখা যায়।

বিষ্ণুপুরের মন্দির-টেরাকোটা বিশ্লেষণ করলেও দেখা যায় একটি সুবিস্তীর্ণ পৌরাণিক বা স্মার্ত-পৌরাণিক প্রেক্ষাপটে কৃষ্ণলীলা বর্ণিত হয়েছে। কৃষ্ণলীলা চিত্রণের পশ্চাতে হিন্দু-পৌরাণিক চিত্রাবলীর বিপুল এবং বর্ণাঢ্য সমাবেশ। রামায়ণ-মহাভারতের যুদ্ধবিগ্রহ ছাড়াও নানা পৌরাণিক দেবতার সমাবেশ ঘটেছে এখানে। শ্রীকৃষ্ণ-শ্রীরাধিকা ছাড়াও, বিষ্ণু-লক্ষ্মী-সরস্বতী, শিব-শক্তি, গণপতি, দশাবতার-দশমহা-বিদ্যার সমাবেশ। নানা পৌরাণিক কাহিনীর উজ্জ্বল উপস্থিতি। এখানে হিন্দু-ধর্মের বিভিন্ন শাখার সমন্বয় সূচক বাতাবরণটিতেও পৌরাণিক প্রভাবেরই ইঙ্গিত। সেই পৌরাণিক সমন্বয় চিন্তা সুস্পষ্টভাবে পরিস্ফুট হয়েছে শ্যামরায় মন্দিরের উমা-মহেশ্বর আর হরিহর চিত্র-গুলিতেও (শ্যামরায় মন্দিরের দ্বিতলে মূল শিখরের অভ্যন্তর ভাগে সন্নিবেশিত)।

ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত শিবায়ন কাব্যের ভূমিকায় হিন্দু ধর্মের এই পৌরাণিক সমন্বয়ের কথা সুন্দর করে বলেছেন। তিনি বলেছেন "পৌরাণিক যুগে দেখিতে পাই, একটি সমন্বয়ের ফলে বেদান্তের ব্রহ্ম ও মায়া সাংখ্যের পুরুষ ও প্রকৃতি, বৈষ্ণবগণের বিষ্ণু ও লক্ষ্মী তন্ত্রের

---

and scholasticism ...... The makers of Gaudiya Vaisnava philosophy were also deeply motivated by their urge to forge a link between pedestrian Vaisnava bhakti and the great tradition of Hinduism, the most commonly known expressions of which were the mythologics and rituals"

"Vaisnavism in Bengal" Ramakanta Chakraborty : Culture Through Ages : Burdwan University : Page 287

শিব ও শক্তি মহেশ্বর ও উমাকে একই তত্ত্বের দ্যোতক বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে। তাহার পরে আবার যখন শ্রীকৃষ্ণের সহিত রাধার প্রতিষ্ঠা হইল তখন সেই যুগলের সহিত কৃষ্ণরাধা এবং রামসীতাও যুক্ত হইয়া গেলেন, যাঁহারা উমা-মহেশ্বর তাঁহারাই যে রাধাকৃষ্ণ এই তত্ত্বটি সপ্তদশ অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতকে অতিসহজভাবে গৃহীত দেখিতে পাই। শিবায়ণ কাব্যগুলির মধ্যে এই সহজ সত্যটি নানাভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। রামেশ্বর (অষ্টাদশ শতক) তাঁহার শিবায়ণে বলিয়াছেন একই যুগলমূর্তি ভক্তের আকাঙ্খা অনুসারে রাধাশ্যাম, সীতারাম, ভবানী শঙ্কর প্রভৃতি অনন্ত মূর্তি ধারণ করিয়া অভিব্যক্ত হইয়াছেন।

কেহ বলে রাধাশ্যাম কেহ বলে সীতারাম
কেহ বলে শঙ্কর ভবানী
ভূতলে ভকত ধন্য যাঁহার ভজন জন্য
এক মূর্তি অনন্তরূপিসী।

বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের মন্দির-স্থাপত্যের মতই এখানের মন্দির টেরাকোটাতেও হিন্দু-পৌরাণিক রিভাইভ্যাল" এর আভাস। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজাদের "রত্নমন্দির"গুলিতে পৌরাণিক শিখর মন্দিরের প্রভাব সুস্পষ্ট। মৎস্যপুরাণে উক্ত শিখর মন্দির প্রসঙ্গ আগেই আলোচিত হয়েছে। অনেক সময় উড়িষ্যার শিখর মন্দিরকে যে বর্ণাশ্রমের আলোকে বিশেষিত করা হয় যে তাও পূর্বে বলা হয়েছে। মন্দির-স্থাপত্যের মত টেরাকোটা-ভাস্কর্যেও পৌরাণিক বাতাবরণ দুর্নিরীক্ষ্য নয়।

ডাঃ শশিভূষণ দাশ গুপ্ত পৌরাণিক যুগে-ভারতের ধর্ম-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে বিকশিত এক সমন্বয় প্রবণতার কথা উল্লেখ করে বাঙ্গালার সপ্তদশ-অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকের মঙ্গলকাব্যে তার প্রতিফলনের যে ইঙ্গিত দিয়েছেন বিষ্ণুপুরের সপ্তদশ শতকের মন্দির-টেরাকোটায় তার পূর্ণ সমর্থন লক্ষ্য করা যায়। রাধাকৃষ্ণের প্রীত্যর্থ নিবেদিত বিষ্ণুপুরের শ্যামরায় মন্দিরের দ্বিতলের মূলচূড়ার অভ্যন্তরভাগে সন্নিবেশিত উমা মহেশ্বর চিত্রে যেন এই পৌরাণিক বিশ্বাসেরই প্রতিধ্বনি।

সুপ্রাচীন কাল থেকেই ভারতের সংস্কৃতি ক্ষেত্রে এক সমন্বয় প্রবণতা ফল্গুধারার মতই প্রবহমান। খ্রীষ্টপূর্বাব্দ কাল থেকে ভারতভূমিতে নানা বিদেশী জাতি-গোষ্ঠীর গমনাগমনকে কেন্দ্র করে স্বাভাবিক ভাবেই এখানে সমন্বয়ের এক বিস্তৃত প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছে।

সমন্বয় প্রবণতা ভারতসংস্কৃতির এক ধাতুগত উপাদানে পরিণত হয়েছে সেই স্মরণাতীত কাল থেকেই। এই দুর্লভ আত্তীকরণ শক্তিই ভারতকে মহাভারতে পরিণত করেছে। এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে যারাই এসেছে ভারত তাদের সকলকেই দুবাহু বাড়িয়ে সাগ্রহে গ্রহণ করেছে।

অনার্য বা প্রাগার্য সংস্কৃতি নূতনরূপে বিবর্তিত হয়েছে। বেশীদিন কেউ আপনার স্বাতন্ত্র্য নিয়ে দূরে থাকতে পারে নাই। প্রাগার্য মাতৃকাতন্ত্র আর্য সংস্পর্শে পিতৃতন্ত্রে বিবর্তিত হয়েছে। দেব-দেবীদের পরিণয় ও পরিবার বন্ধনে আবদ্ধ করে এক পৌরাণিক সমীকরণের মাধ্যমে প্রাগার্য যুগের প্রধান ধর্ম মাতৃকাপূজাকে ক্রমশঃ আর্য প্রাধান্যে এক সহযোগী ধর্মে বা'কাল্টে'পরিণত করা হয়েছে। কিন্তু অনার্য মাতৃকাতন্ত্র সূক্ষ্মরূপে হলেও প্রায় প্রতিটি ভারতীয় ধর্মের চালিকা শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠিত। এই শক্তি বা শাক্তচিন্তা স্বরূপে বা রূপান্তরে পিতৃতান্ত্রিক আর্যধর্ম সংস্কৃতিতে আপন প্রাধান্য বিস্তার করেছে। আর্য-অনার্য সংস্কৃতির সংমিশ্রণে ভারত-সংস্কৃতি বারবার আলোড়িত হওয়ায় প্রায় ঐতিহাসিক যুগেই একটি সমন্বয় সমীকরণের মাধ্যমে পৌরাণিক হিন্দুধর্মের বিকাশ ঘটেছে।

খ্রীষ্টশতকের প্রথমভাগে বেদধর্মের বিপর্যয়ের কাল থেকেই অবৈদিক দেবতা দিগকে আর্যচেতনার অঙ্গীভূত করে নেবার আকাঙ্খা থেকেই প্রধানতঃ পুরাণ শাস্ত্রের অভ্যুদয় ঘটেছিল।"

বিশিষ্ট পুরাতত্ত্ববিদ্ জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর "পঞ্চোপাসনা" গ্রন্থে এই সমন্বয়ের একাধিক দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। তিনি বিহার প্রদেশ থেকে প্রাপ্ত বর্তমানে কলকাতার ভারতীয় যাদুঘরে সংরক্ষিত একটি শিবলিঙ্গের চারদিকে উৎকীর্ণ বা খোদিত গণপতি, বিষ্ণু, পার্বতী ও সূর্যের মূর্তির দৃষ্টান্ত দিয়েছেন। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় কাশী এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে প্রাপ্ত কিছু ভাস্কর্য নিদর্শনের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। এগুলির আয়তন তিন-চার ফুট রেখ মন্দিরের মত। এগুলির শিখরের নিম্ন-ভাগের চারপাশে চারটি প্রকোষ্ঠ। এই প্রকোষ্ঠগুলির মধ্যে যথাক্রমে গণপতি, বিষ্ণু, সূর্য ও উমা মহেশ্বরের মূর্তি। এই ক্ষুদ্রকৃতি

ভাস্কর্য নিদর্শনগুলি পশুোপাসনারই প্রতীক সেবিষয়ে তিনি (জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়) নিঃসন্দেহ। মধ্যযুগের (মধ্য ও পূর্ব ভারতে যেসব মন্দির-সংস্থা আছে তাদের অনেকগুলিই স্মার্ত-পৌরাণিক পূজো বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেয়। প্রতিষ্ঠাতার উপাস্য দেবতাকে মধ্যস্থলে রেখে তাঁর মন্দিরের চারপাশে অপর চার দেবতার মন্দির নির্মাণের দৃষ্টান্ত বিরল নয়। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায় তান্ত্রিক-দীক্ষার মধ্যেও এই সমন্বয়ের সুরটি লক্ষ্য করেছেন।

এই সমন্বয়-সমীকরণের বিচিত্র পদ্ধতিতেই বিকশিত হয়েছে বিরাট পৌরাণিক দেবজগৎ। বহু স্বতন্ত্র দেবতার একত্র পরিবারবদ্ধ হওয়ার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেবীদুর্গার প্রতিমা। মহিষাসুর মর্দিনীর মধ্যে এক আদিম দেবতার বিবর্তন দুর্নিরীক্ষ্য নয়। খিচিং (ময়ূরভঞ্জ) সংগ্রহশালার মহিষমর্দিনীতে দেবী দুইহাতে মহিষ বধ করছেন দেখা যায় — এই মহিষমর্দিনী দেবী প্রতীকী ব্যঞ্জনায় ব্যঞ্জিত হয়ে পরবর্তী-কালে মহিষাসুরমর্দিনী হয়েছেন বলে মনে করা হয়। আরও বহুপরে এই মহিষাসুর মর্দিনীকে কেন্দ্র করে লক্ষ্মী-সরস্বতী, কার্তিক-গণেশ পরিবার বদ্ধ হয়েছেন। অনার্য-নাগকাল্টের উপর আর্য আধিপত্য স্থাপনের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত "কালীয়দমন"। এটি ভক্তির ব্যঞ্জনায় পৌরাণিক রূপলাভ করেছে। অনেক পরবর্তীকালে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্মের আলোকে এই কালীয়দমন অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্বেও বিধৃত হয়েছে।

প্রাগার্য যুগে শিকার খাদ্যান্বেষণের আদিমস্তরভুক্ত অস্থায়ী বসতি-সম্পন্ন মানুষের বহুদেবতা পরবর্তীকালে উন্নত কৃষিকর্মের কল্যাণে উন্নত অবস্থানে উন্নীত হয়ে স্থায়ী বসতিসম্পন্ন মানুষের আচরিত আর্য-ব্রাহ্মণ্য গ্রামীণ সংস্কৃতির পর্যায়ভুক্ত হয়েছেন। প্রস্তর এবং তাম্রযুগের দেবতারা লৌহযুগে কৃষির বিপুল বিস্তারকে কেন্দ্র করে এবং ক্রমশঃ আর্যীকরণ ও সংস্কৃতায়ণের মাধ্যমে প্রতীকী ব্যঞ্জনায় ব্যঞ্জিত হয়ে উন্নত দার্শনিক ধর্মতত্ত্বের আলোকে বিশোধিত হয়েছেন। শৈব এবং শাক্ত দেবতাদের হস্তধৃত তীর, ধনু, পাশ প্রভৃতি আয়ুধগুলিতে এখনও আদিম জীবনের বিভিন্ন স্তরগুলির ইশারা লুকিয়ে আছে বলে মনে করা হয়। পণ্ডিতেরা মনে করেন আদিমযুগে স্বতন্ত্রভাবে পূজিত বহুজীবজন্তুকে পরবর্তীকালে বিভিন্ন দেবতার বাহনরূপে গ্রহণ করে বিভিন্ন সহযোগী

কান্টের উদ্ভব ঘটেছে। অবতার তত্ত্বের মধ্যেও আদিম যুগের নানা জাতিগোষ্ঠীর বিচিত্রসব কুলকেতু একই আর্য দেবতার সঙ্গে সমাহৃত হওয়ার মধ্যেও এক পৌরাণিক সমন্বয় লক্ষ্য করেছেন পণ্ডিতরা। অনার্য (বা প্রাগার্য) এবং আর্য-ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ক্রমশঃ পৌরাণিক-হিন্দু ধর্মের সমন্বয় প্রবণতায় সমাহৃত ও সমীকৃত হয়ে নব নব রূপলাভ করেছে। ভক্তিধর্ম এই সমন্বয় ক্রিয়ায় যোজকের কাজ করছে। ফলে ভারত-সংস্কৃতি বহু তীব্র এবং বিধ্বংসী সংঘর্ষ এড়াতে পেরেছে। অনেকে ভগবান শিবের মধ্যে আর্য-অনার্য দুই স্তরের সমন্বয় দেখেছেন। সদাশিবের হস্তধৃত মৃগমূর্তি ও আয়ুধগুলি (মৃগ-কুঠার ইত্যাদি) এবিষয়ে উল্লেখযোগ্য। আর্য-ব্রাহ্মণ্য দার্শনিক ব্যঞ্জনায় এগুলির তাৎপর্য ভিন্ন হলেও এগুলির বস্তুরূপে প্রাগার্য বা অন-আর্য শিকারী গোষ্ঠীর প্রভাব চিন্তা করা সম্পূর্ণ অসমীচীন নয়। এক বিষ্ণুর মধ্যে যেমন বহু দেবতার পূজা সমাহৃত হয়েছে—কৃষ্ণের মধ্যেও তেমনি বহু দেবতা সমাহৃত হয়েছেন।[২৩] গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মেও অবতার তত্ত্বের একটি বিশিষ্ট অভিধা বর্তমান। এটিও সমন্বয় সূচক।

পূর্ণ ভগবান অবতরে যেই কালে।
আর সব অবতার তাতে আসি মিলে॥
নারায়ণ চতুর্ব্যূহ মৎস্যাদ্যবতার।
যুগমন্বন্তরাবতার যত আছে আর॥
সবে আসি কৃষ্ণ অঙ্গে হয় অবতীর্ণ।
ঐছে অবতারে কৃষ্ণ ভগবান পূর্ণ॥
অবতার বিষ্ণু তখন কৃষ্ণের শরীরে।
বিষ্ণু-দ্বারে করে কৃষ্ণ অসুর সংহারে।

বিষ্ণুপুর মন্দির টেরাকোটায় কৃষ্ণমূর্তির পাশাপাশি বিষ্ণুর শয়ান-স্থানক এবং আসীন মূর্তি ছাড়াও বিষ্ণুর অবতার মূর্তি ও ব্যূহ মূর্তির প্রচুর সমাবেশ। গোস্বামী-সিদ্ধান্তের আকরগ্রন্থ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের উপরোক্ত তাৎপর্যময় উদ্ধৃতির আলোকেই বিষ্ণুপুরের টেরাকোটায় সন্নিবেশিত কৃষ্ণ-বিষ্ণুর সম্পর্ক ও সমন্বয় চিন্তা বিশ্লেষণ

করাই অধিকতর প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। জোড়বাংলা মন্দিরে শ্রীকৃষ্ণ বলরাম কর্তৃক বৃন্দাবনলীলায় একাধিক অসুর-নিধনও এই আলোকেই বিচার করা সমধিক সমীচীন বলেই মনে করা যেতে পারে। শ্রীকৃষ্ণ এখানে বিষ্ণুর কর্মই সম্পাদন করছেন বলা যায়; যেহেতু গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের গোস্বামী সিদ্ধান্তে শ্রীকৃষ্ণই পূর্ণভগবান এবং এঁর অবস্থানকালে বিভিন্ন প্রকারভেদ সহ বিষ্ণু এবং তাঁর অবতার গোষ্ঠী তাঁতেই মিলিত বা সমাহৃত হন বলে 'গোস্বামীসিদ্ধান্ত' মনে করেন।

বিষ্ণুপুরের মন্দির-টেরাকোটায় রূপায়িত ভগবান বিষ্ণুর দশাবতার প্যানেলটি জয়দেবের গীতগোবিন্দের অনুসরণ এবং বৈদিক ধর্মেরই অনুগমন। মন্দির-টেরাকোটায় (শ্যামরায় মন্দিরের দক্ষিণ দিকের সুড়ঙ্গাকার প্রবেশ পথের বাঁদিকে) প্রলয়পয়োধিজলে অনন্তনাগোপরি শায়িত অনন্তশয়ন বিষ্ণুমূর্তি এবং এই মন্দিরেরই পশ্চিম দিকের বারান্দায় জয়দেবের দশাবতার স্তোত্র অনুযায়ী রচিত দশাবতার টেরাকোটা-প্যানেল এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য। এই দশাবতার প্যানেলের প্রায় সমান্তরালে দেবীর দশমহাবিদ্যা প্যানেলটি উল্লেখযোগ্য; একইরূপে সমন্বয় সাধিত হয়েছে বৈষ্ণব আর শাক্ত চিন্তায়।

শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতায় উক্ত : যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥

এবং শ্রীশ্রীচণ্ডীতে উক্ত : "ইত্থং যদা যদা বাধা দানবোত্থা ভবিষ্যতি।
তদা তদাবতীর্যাহং করিষ্যাম্যরি সংক্ষয়ম্ ॥

যেন একই চিন্তার দুই প্রকার ভেদ মাত্র।

---

23 Like the Avataras of Vishnu-Narayana, the various Krishna gathered many different worship in to one without doing any violence, to any, without smashing and antigonizing"—. Myth And Reality by D. D. KOSAMBI

পৌরাণিক হিন্দু বা ব্রাহ্মণ্যধর্ম, আর্য-অনার্য মিলন-মিশ্রণে উদ্ভূত এক মিশ্র ধর্ম-সংস্কৃতি। অস্ট্রিক-দ্রাবিড়-নেগ্রিটো প্রমুখ অনার্য জাতিগোষ্ঠীর সঙ্গে মিলে আর্যভাষী আদি-নর্ডিকরা এক বিচিত্র সংস্কৃতি-গড়ে তুলেছিল বলে পণ্ডিতরা মনে করেন। এই সমন্বিত জনই যেমন ভারতীয় জন, তেমনি বৈদিক আর্যধর্ম পূর্বতন অনার্য ধর্ম-সংস্কৃতির সঙ্গে মিলে মিশে যে নূতন ধর্ম-সংস্কৃতির বিকাশ ঘটিয়েছিল তার নামই পৌরাণিক হিন্দু বা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম-সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতিও কোন বিশুদ্ধ আর্যসংস্কৃতিরূপে আপনার অস্তিত্ব রক্ষা করতে পারেনি। "বিচিত্র (অনার্য) সভ্যতার উপাদান-উপকরণ আহরণ করিয়া তাহার এক নূতন রূপ পৃথিবীর দৃষ্টির সম্মুখে ফুটিয়া উঠিল; এই নূতন সভ্যতার নামই ভারতীয় সভ্যতা। আর সেই সংস্কৃতিই কি বেদ ব্রাহ্মণের সংস্কৃতি থাকিতে পারিল? তাহার মানসলোকে কত যে পূর্বতন জন ও সংস্কৃতির সৃষ্টি-পুরাণ, দেবতাবাদ, ভয়-বিশ্বাস, ভাব-কল্পনা, স্বভাব-প্রকৃতি, ইতিকাহিনী, ধ্যান-ধারণা, আশ্রয়লাভ করিল তাহার ইয়ত্তা নাই। সকলকে আশ্রয় দিয়া সকলের মধ্যে আশ্রয় পাইয়া, সকলকে আত্মসাৎ করিয়া, সকলের মধ্যে বিস্তৃত হইয়া এই সংস্কৃতিও এক নূতন সমন্বিত রূপলাভ করিল; তাহার নাম ভারতীয় সংস্কৃতি। আজ আবার গত সাতশত বৎসর ধরিয়া আর এক বৃহৎ সমন্বয় চলিতেছে, এবং তাহার ফলে আমাদের এই বৃহৎ দেশখণ্ডে আর এক নূতন জন, ধর্ম, সভ্যতা ও সংস্কৃতি রূপলাভ করিতেছে।'

'দেওয়া-নেওয়া'র মাধ্যমে ভারতের মহাভারতীয় সংস্কৃতির চলমান গতিপ্রবাহে নানা বিচিত্র উপাদান ভেসে এসেছে। উপাদানগুলি নানা বিভেদ-সমন্বয়ের পথ ধরে নব নব রূপে মানব দৃষ্টির সমীপবর্তী হয়েছে। অন্ত্য-মধ্যযুগে, সপ্তদশ শতকের বিষ্ণুপুরের মন্দির টেরাকোটাতেও সেই সমন্বিত বিশাল ভারতীয় সংস্কৃতির এক রূপ-বিকাশ পরিদৃশ্যমান। তাই রাসনৃত্যে ডালটন যখন সাঁওতাল-নাচের

---

২৪ বাঙালীর ইতিহাস: নীহাররঞ্জন রায় (আদিখণ্ড) পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি। প্রথম সাক্ষরতা সংস্করণ (তৃতীয় সংস্করণ) ইতিহাসের গোড়ার কথা ৭৯-৮০।

আভাস পান তা সম্পূর্ণ অলীক বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। তেমনি আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধির রাসযাত্রা সম্পর্কে জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্মত ব্যাখ্যাও সমধিক কৌতূহল উদ্রেক করে।[25] ডালটন পুষ্পে অলঙ্কার এবং ময়ূরপক্ষে সুসজ্জিত সাঁওতাল নরনারীর চক্রাকার ঝুমুর নৃত্যের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ ও গোপীদের রাসনৃত্যের (মণ্ডলাকারে) সমগোত্রীয়তা লক্ষ্য করেছেন। আচার্য যোগেশচন্দ্রের মন্তব্য সমধিক কৌতূহলোদ্দীপক। তিনি একদিকে যেমন এই রাসনৃত্যের সঙ্গে সাঁওতাল নরনারীর মধ্যে প্রচলিত 'কারাম' নৃত্যের সাদৃশ্যের ইঙ্গিত দিয়েছেন। অন্যদিকে তেমনি এই মণ্ডলাকার রাসনৃত্যের এক জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্মত ব্যাখ্যাও দিয়েছেন।[26] তিনি মনে করেন এক সময় রাস পূর্ণিমায় বর্ষ আরম্ভ হত। কার্তিকী পূর্ণিমার মধ্যরাত্রে রাস পূর্ণিমায় নবমাস ও নববর্ষ প্রবেশ। এ সময় সূর্য বিশাখা নক্ষত্রে। বিশাখার প্রাচীন নাম 'রাধা' হওয়াই স্বাভাবিক বলে আচার্য বিদ্যানিধি মনে করেন। কারণ বিশাখার পরের নক্ষত্রের নাম 'অনুরাধা। যজুর্বেদের কালে যখন নক্ষত্রদের নাম হয়েছিল তখনই এই বিশাখা নক্ষত্রের রাধা নাম হয়েছিল বলে তিনি মনে করেন। তিনি এও বলেছেন যে অথর্ববেদে বিশাখার নাম রাধা আছে। বিশাখার পর অনুরাধার উদয় হয়। অনুরাধা বিশাখার অনুগমন করে। কার্তিক পূর্ণিমার রাত্রে সূর্য বিশাখার সঙ্গে মিলিত হন। কার্তিকী পূর্ণিমাতে শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রা। সেদিন সূর্যরূপ কৃষ্ণ বিশাখা অর্থাৎ রাধা নক্ষত্রে থাকেন।

যাইহোক, এসব থেকে এটা মনে করা অসঙ্গত নয় যে, অনার্য বা লোকায়ত বিষয় বস্তুগুলিকে রূপকায়িত করে আর্য-দর্শনে এক বিশিষ্ট এবং বিচিত্র রূপান্তর ঘটানো হ'ত। এই রূপান্তর সম্পাদনের ক্ষেত্রে জ্যোতির্বিদ্যার ব্যবহার প্রশস্ত ছিল বলেই মনে হয়। শুধু রাসোৎসব বা রাসনৃত্যের ক্ষেত্রেই নয়, সঙ্গীত নৃত্যের বহু চিত্র-ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে বৃত্তাকার বা উপবৃত্তাকার প্রেক্ষাপট পরিলক্ষিত হয়। বাঁকুড়া জেলার পাত্রসায়ের থানার কাস্তোড়ে ষট্‌চক্রবাহিনী জ্ঞানে পূজিত 'নটরাজ শিব' এর মূর্তির কথা আগেই বলা হয়েছে। রাখাল দাস

25. Descriptive, Ethnology of Bengal.E. T DALTON
26. পূজাপার্বন ঃ যোগেশচন্দ্র রায় (বিশ্বভারতী প্রকাশিত)

এই মূর্তির প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে বলেছেন, যে. এটি নবমশতকের পরের নয়। এই মূর্তিও এক পাষাণচক্র ফলকে (বা মেডেলিয়ানে) উদ্গত। ইঁদপুর থানার (বাঁকুড়া) দেউলভিড়ার মন্দিরে (সম্প্রতি অপহৃত ও নিখোঁজ) একটি চক্রাকার প্রস্তরখণ্ডের উভয় পৃষ্ঠে উদ্গত এমনি এক নটরাজ শিব মূর্তি দেখা যেত। মেদিনীপুর জেলার নারায়ণগড়ের সন্নিকট (খড়্গপুর-নারায়ণগড় বাস রাস্তার পাশে অবস্থিত 'কাটাইখাল' বাসষ্টপে নামতে হয়) 'বিদিশা' নামক আদিবাসী শিক্ষায়তনের বাগানে চক্রাকার এক বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের উভয় দিকে উদ্গত এক নটরাজ মূর্তি লক্ষ্য করা যায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত এমনি এক চক্রাকার প্রস্তরখণ্ডে নৃত্যরত এক বিষ্ণুমূর্তি (বা কৃষ্ণমূর্তি) চোখে পড়ে।

নৃত্যমূর্তি সম্বলিত এই চক্রাকার প্রস্তরপট বা মেডেলিয়নগুলি যেন সুর-তাল-লয়-ছন্দের আবর্ত্তন প্রবণতারই দ্যোতনা বহন করছে। শাস্ত্রীয় সঙ্গীত বা নৃত্যের স্বচ্ছন্দ-বিহার কোনক্রমেই বিশৃঙ্খল নয়—এক আবর্তনধর্মী শৃঙ্খলায় আবদ্ধ। তাই শাস্ত্রীয়-সঙ্গীত নৃত্য যতই বিচিত্রবিহারী হোক, ফিরে ফিরে তাকে কেন্দ্রে বা 'সমে' পৌঁছাতে হয়--নইলে তাল ভঙ্গ হয়। এই আবর্তন-ক্রমটিকে অক্ষত অব্যাহত রেখে শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বা নৃত্যের বিচিত্র কলেবর রচিত হয়। এমনটা মনে হবার কারণ হ'ল নৃত্যমূর্তির অনেকগুলিতেই দেখা যায়, নৃত্যমূর্তিটি উপরের দুটি হাতে তালি দিয়ে তালরক্ষায় রত। এই তালরক্ষাপ্রণালী নৃত্যের একটি মুদ্রায় পরিণত হয়েছে। শাস্ত্রীয় সঙ্গীত নৃত্যের মূলীভূত তাললয়ের নিখুঁত হিসাবই এতে স্পষ্টীকৃত। নিখিল বিশ্বের বহুবৈচিত্র্যের মধ্যে একটি ঐক্য চেতনা (cosmics) আর্য-সংস্কৃতিতে যে উচ্চ দার্শনিকতার প্রবর্তন করেছে-তা তার শিল্প-সাহিত্যে তথা সমগ্র সংস্কৃতিতে প্রভাব বিস্তার করেছে। তার এই চেতনা অনেকাংশে জ্যোতির্বিজ্ঞানের অভিজ্ঞতা প্রসূত। কিন্তু লোকস্তরেও ঋতুচক্র এবং শস্যোৎপাদনের সমাবর্তন এমনি এক আবর্তন চেতনা সূচিত করেছে বলে মনে হয়। চিন্তা-চেতনার রূপ যাইহোক মার্গ এবং লোকস্তরে লেনদেন যে অব্যাহত ছিল তা মনে করা অসঙ্গত নয়। রাজস্থানের (বীজনোর) লোকশিল্পের নিদর্শন একধরণের টেরাকোটা

টালিতে চক্রাকারে নৃত্যরত দশটি মূর্তি দেখা যায়। কৃষ্ণলীলার সাঁওতালী পটেও রাসমন্ডল চিত্রিত হয়েছে।

যাইহোক, রাসলীলার দার্শনিকতা বাদ দিলে যে বস্তুরূপ পাওয়া যায়, তা শরৎকালের পূর্ণিমায়, অমলিন জ্যোৎস্নার উৎফুল্ল যামিনীর প্রেক্ষাপটে যৌথনৃত্যের এক বর্ণাঢ্য সমারোহ। জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রজনীতে বিশেষ করে বনস্থলীতে অনুষ্ঠিত এই নৃত্যে আদিবাসী নৃত্যের প্রভাব অনুমান অসঙ্গত নয়। বিশেষতঃ বৈষ্ণব আচার্য বা পদকর্তাদের বর্ণিত "হল্লীশক-নৃত্যের" উল্লেখে এই জাতীয় নৃত্যকেই যেন ইঙ্গিত করে। রূপগোস্বামীর সংগৃহীত ও সংকলিত 'কোন এক ব্যক্তির রচিত' বলে উল্লিখিত রাসনৃত্যের বর্ণনায় 'হল্লীশক' নৃত্যের উল্লেখ দেখা যায়।

লক্ষ্মীং মধ্যগতেন রাসবলয়ে বিস্তারয়ন্নাত্মনা,
কস্তুরী সুরভি বিলাসমুরলী বিশবস্থ বক্রেন্দুনে।
ক্রীড়াতাণ্ডব মণ্ডলেন পরিতো দৃষ্টেন তুষ্যন্দৃশা
ত্বাং হল্লীশক শঙ্কুসঙ্কুলপদা পায়াদ্বিহারী হরিঃ॥

(যিনি রাসমণ্ডলে মধ্যগত হইয়া আপনার দ্বারা শোভা বিস্তার করত কস্তুভসৌরভশালিনী বিলাস মুরলী মুখচন্দ্রে-বিন্যস্ত করিয়া যিনি ক্রীড়াতাণ্ডবমণ্ডলে সর্বতোভাবে দৃষ্ট হইয়া প্রসন্ননেত্রদ্বারা এবং হল্লীশ অর্থাৎ স্ত্রীলোকদিগের মণ্ডলাকারে নৃত্য বিশেষরূপ শঙ্কুসঙ্কুলপদ-দ্বারা বিহারশীল হরি তোমাকে রক্ষা করুন)

বিষ্ণুপুর শ্যামরায় মন্দিরের রাসমণ্ডল-টেরাকোটায় এই বর্ণনা যেন মূর্ত হয়ে উঠেছে। এখানে দেখা যায়, রাসচক্রের মধ্যবর্তী মুরলীধর কৃষ্ণের একক মূর্তি। তিনি যেন রাসমণ্ডলের মধ্যবর্তী হয়ে কৌস্তুভসৌরভশালিনী বিলাসমুরলী মুখচন্দ্রে বিন্যস্ত করে বংশীধ্বনি করছেন। এই বংশীধ্বনি শ্রবণে বিহ্বলা গোপীরা যে যেমন অবস্থায় ছিলেন সেই অবস্থাতেই আত্মহারা হয়ে ছুটে এসেছেন রাসস্থলীতে।

বহুকান্তার মণ্ডলীবন্ধ নৃত্যই রাসনৃত্য। এই লীলায় অন্য গোপীদের উপস্থিতি না থাকলে রাসরসের সম্যক স্ফূর্তি হয়না।

॥ বহুকান্তা বিনা নহে রাসের উল্লাস ।
লীলার সহায় লাগি বহুত প্রকাশ ॥

এই রাসলীলায় গোপীদের মনোরঞ্জন করতে শ্রীকৃষ্ণের 'বহুত' প্রকাশ ঘটেছে। প্রতি-গোপীর পাশে একজন করে কৃষ্ণ। 'একই' 'অনেকে' বিভক্ত—মূলে এক। রাসমণ্ডল টেরাকোটার কেন্দ্রে মুরলী বাদনরত একক কৃষ্ণমূর্তি যেন তারই দ্যোতনা বহন করছে। তাঁকে কেন্দ্র করে একাধিক বৃত্তে শতশত কৃষ্ণ গোপী নেচে চলেছেন 'হল্লীশক নৃত্যে'

চঞ্চল নৃত্যের গতি সর্ব সমাধান মতি
সর্বনারী জানে মোর কাছে।
ব্রজাঙ্গণা হৃদিহার মাঝে যে নায়ক সার
নীলমণিপ্রায় শোভিয়াছে।
রাসমধ্যে এক অঙ্গে বহু ব্রজাঙ্গণা সঙ্গে
বিলসিয়া সর্ব বাঞ্ছা পূরে ॥[২৭]

প্রত্যক্ষতঃ অনেকের বহুধা প্রকাশের মূলে বা কেন্দ্রে একমেবাদ্বিতীয়ম্ একই পরম সত্বা বহুধা বিভক্ত। এই টেরাকোটা চিত্রটির 'কম্পোজিশনে' এই তত্বই যেন প্রকাশ পেয়েছে। সৃষ্টির বহু বিচিত্র লীলাস্পন্দনের মধ্যে এক অনাদি অনন্ত সত্বার অচঞ্চল স্থিতি। গতিচঞ্চল নৃত্যের বা সঙ্গীতের সুর-তানের অফুরন্ত স্বরজালের অবিরাম আবর্তনের মাঝে এ যেন সমের সবিরাম নির্বিকল্প স্থিতি।

এই যে গ্রীষ্ম-বর্ষা-শরৎ-হেমন্ত-শীতবসন্ত চক্রাকারে নৃত্যরঙ্গে আবর্তিত হচ্ছে. এই আহ্নিকগতি, বার্ষিকগতির আবর্তন বা সমাবর্তনের পিছনে বা কেন্দ্রে রয়েছে এক অপরিবর্তনীয় নিয়ম।—জন্ম মৃত্যু, সৃষ্টি-লয়ের আবর্তনেও নিয়ম স্থির।

শিব নৃত্যের বা শিবতাণ্ডবের পশ্চাতেও এমনি এক দার্শনিক আবেদন, এমনি এক বিশ্বতত্বের (Cosmic) আরোপ করেছেন মণীষীরা।—শিব নৃত্যের চক্রাবর্তনেও প্রকৃতি বা জীবনচক্রের ঘূর্ণী বা আবর্তন অনুভব করেছেন দ্রষ্টা-দার্শনিকরা।[২৮] তাঁরা দেখেছেন

---

২৭ শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতের যদুনন্দন কৃত ভাবানুবাদ (ভাবানুবাদ)।

28 The symbolism of the dance of Siva appears to be poetic in that highest sense in which poetry

এখানেও এক জীবনচক্রের ঘূর্ণি[২৯] এবং তার আবর্তন-পরিবর্তনের মাঝে এক সনাতন শাশ্বত সত্তা, মৌলিক-নিয়ম বহুরূপে বর্তমান। **এই সনাতন** নিয়ম **বা** সত্তা স্থির অচঞ্চল নিবাত নিষ্কম্প। **শিব** তাই দুটি রূপে শিল্প ও সাহিত্যে ধরা পড়েছেন। তাণ্ডবলীলায় নৃত্য-রত উদ্দাম আত্মহারা শিবই রূপান্তরিত হন মহাযোগী মহেশ্বরে। ইলোরায় যিনি নৃত্যের বিচিত্র ছন্দে লীলা-চঞ্চল, আবেগে উত্তাল, উদয়গিরি (মধ্যপ্রদেশ) কোহ্‌ (বর্তমানে এলাহাবাদ সংগ্রহশালায় সংগৃহীত ও সংরক্ষিত) কিংবা উচহারের শিবলিঙ্গে (মুখলিঙ্গে) দেখা যায় তাঁরই প্রগাঢ় প্রশান্তিময় আত্মমগ্ন মুখমণ্ডল। ঐ সব মুখলিঙ্গস্থ শিবাননে অপার ধ্যানমগ্নতা যা সারনাথ-বুদ্ধের সমগোত্রীয়। শিবনৃত্যে এক অস্থির জঙ্গম শক্তির বিপরীতে বুদ্ধে স্থিতি-স্থবিরত্ব। মহাকালচক্রের ঘূর্ণর মাঝে একটি যতি। কল্পান্তে মহাস্থিতি, নূতন আর এক সৃষ্টির উপক্রমণিকা মাত্র। শিবনৃত্য কিংবা রাসনৃত্য উভয় ক্ষেত্রেই সৃষ্টির ইঙ্গিত। আগেই বলা হয়েছে ভারতীয় শিল্পের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লক্ষ্য করা যায় অন-আর্য বস্তুরূপের উপর আর্য চিন্তার প্রক্ষেপে এক অভিনব দার্শনিক এবং প্রতীকী বিবর্তন। এই দার্শনিক ব্যঞ্জনা প্রায় সর্বত্রই বিশ্বপ্রকৃতি ও সৃষ্টিতত্ত্বের প্রেক্ষাপটে অনুভূত ব্রহ্মাণ্ডজ্ঞাপক এক বিশিষ্ট বীক্ষণ। এই সৃষ্টির আদিতে আছে আনন্দ তাই তাণ্ডবের এক পর্যায়কে আনন্দতাণ্ডব বলা হয়। শিবতো শুধু ধ্বংসের দেবতা নন, তাঁর পঞ্চভাবের অর্থাৎ সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, তিরোভাব অনুগ্রহের পরও আছে আনন্দরূপ। "যিনি এক, যিনি অবর্ণ তিনিই বহুধা শক্তিযোগে নানারূপে প্রকাশমান।" – (শিবভাবনা) শুধু তাই নয় কাশ্মীরের শৈব প্রত্যভিজ্ঞা দর্শনে বলা হয়েছে, ভগবান আপনাকে স্ফুরণ ও সংকোচ করে চলেছেন। তিনি আপনাকে বহুধা বিভক্ত করে জীব সৃষ্টি করছেন— যত্রজীব তত্রশিব। আবার নিজের মধ্যে সবকিছুকেই শোষণ করছেন। প্রতি জীবই স্বরূপে শিব।[৩০] জীব আর শিবের মিলনেই সৃষ্টির

---

is a perception of specific significance and beauty that informs an idea or thing and renders it alive and vital e.g. procession of seasons, cycles of seedtime and

সম্পূর্ণতা। প্রায় একই ভাবে রাসনৃত্যে সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যঞ্জিত হয়েছে।

বৈষ্ণব দার্শনিকরা রাসতত্ত্বের মূলেও এমনি এক সৃষ্টিতত্ত্ব অনুভব করেছেন। রাসেও এককৃষ্ণ বহু হয়েছেন। সেই যত্র জীব তত্র শিবেরই ব্যঞ্জনা। রাসস্থলীতে শ্রীকৃষ্ণ গোপীদের মনোরঞ্জনের জন্য বহুতে পরিণত হয়েছেন। এখানেও এক সৃষ্টিতত্ত্ব এবং তার মূলে এক লীলার আনন্দেরই ইঙ্গিত। একটি শ্লোক উদ্ধার করে বলা হয়েছে — যিনি বিশ্বকে অনুরঞ্জন করেন যাঁহার ইন্দীবর শ্রেণীর মত সুন্দর, শ্যামল, শীতল, কোমল, নিত্যনূতন প্রতি অঙ্গ অনঙ্গের উৎসবভূমি, সেই মূর্তিমান শৃঙ্গাররস স্বচ্ছন্দে ব্রজসুন্দরীগণের প্রত্যঙ্গ আলিঙ্গনে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাদের আনন্দ উদ্দীপন করিতেছেন।"[৩১]

শৃঙ্গার রসের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা শ্রীকৃষ্ণ। অধিষ্ঠানভূত রসে অধিষ্ঠাতারই একাধিপত্য। ইহাই সকলরসের আদি— আদিরস।

---

harvest --- Life disolving in to death giving rise to life a succession of pictures and images in a total integrity''.

২৯. In whirl of the dance he sees the primal energy which gives life to all existence and so sustains the universe." The Heart of Aryavarta-Lord Ronaldshay.

৩০ শিব ভাবনা গ্রন্থে কাশ্মীরের শৈব প্রত্যভিজ্ঞা দর্শন সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা: ভগবান বিশ্বশরীর বটে, কিন্তু পরম শিবভট্টারক (মহত্বে ও গৌরবে ভট্টারক) স্ফুরণ ও সংকোচ করে চলেছেন— নিজেকে ব্যাপ্ত করেছেন, নিজেকে গুটিয়ে নিচ্ছেন—এই তাঁর খেলা, এই তাঁর লীলা, এই তাঁর নৃত্য- উদ্দাম হচ্ছে আবার সমে ফিরে আসছে। স্পন্দশাস্ত্রে তাই তিনি সর্বগত শুধু নন, সর্বময় চমৎকারময়। কিন্তু এই দুই এর সমাবেশ চাই......প্রতি জীবই স্বরূপে শিব, সুপ্ত শক্তির উন্মীলনেই তাঁর পরিচয়, তখন ইদং-ই-অহং জীবনের যা চক্র চোখের সামনে উদ্ঘাটিত হয়ে পড়ে — তিনিই হন চক্রেশ্বর তখনই। "বিগ্রহ বিগ্রহী চৈব সর্ব বিগ্রহ বিগ্রহী—" শিবভাবনা : সুধাংশু মোহন বন্দ্যোপাধ্যায় : রবীন্দ্র ভারতী : চৈত্র সংক্রান্তি—১৩৭৯।

সকল রসের আদি শ্রীভগবান "রসো বৈ সঃ"। তিনি রসের আদি আধারও বটেন। আনন্দ এই রসেরই বিলাস। বিশ্বের মূলে এই আনন্দ। নিখিল ভূতগ্রাম আনন্দ হইতে উদ্ভূত। বিশ্বের আদি-মধ্য-অন্তে আদিরস। এই আদিরসের আনন্দেই বিশ্বের সৃষ্টি। রসের কামনার জন্যই রসস্বরূপের কামনা জাগ্রত হয়। সত্যসংকল্প ভগবান সংকল্প করেন— একোহহং বহুস্যাং প্রজায়েয় ...

"বহু হয়ে জনমিব এই ইচ্ছা করি,

আত্মতপে তপ্ত হয়ে সগুণত্ব ধরি।

এ সমস্ত যাহা কিছু অখিল ভুবন

স্বইচ্ছায় ইচ্ছাময় করিল সৃজন।"

বিষ্ণুপুরে শ্যামরায় মন্দিরের রাসমণ্ডল টেরাকোটায় একদিকে যেমন গোপীমনোরঞ্জনের জন্য শ্রীকৃষ্ণের বহুধা বিভক্ত মূর্তিগ্রহণে সৃষ্টিতত্ত্বের প্রকাশ তেমনি নৃত্যগীতের অসংখ্য চিত্রে আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে উক্তির বিশিষ্ট ব্যঞ্জনা। শ্যামরায় আর জোড়বাংলায় কৃষ্ণগোপীর অসংখ্য নৃত্যগীতের চিত্র। কত ছন্দে আনন্দে গোপীরা শ্রীকৃষ্ণের আনন্দ বিধান করছেন দেখলে স্তম্ভিত হতে হয়। কোথাও মুরলীধর কৃষ্ণ বাঁশীতে সুর দিচ্ছেন ধুনুচি নাচ নাচছেন গোপী ৩২। কোথাও গোপীরা নাচছেন নাচাচ্ছেন কৃষ্ণকে। কৃষ্ণের আনন্দেই তাঁদের আনন্দ। আগেই বলা হয়েছে ছোটবড় চল্লিশটি রাসচক্রে একটি বিশিষ্ট দার্শনিক মাত্রায় ভূষিত করা হয়েছে শ্যামরায় মন্দিরকে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্বের দ্যোতনাও এখানে লক্ষ্য করা যায়। ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়—কিন্তু লীলার কারণে তিনি আপনাকে বহুধা বিভক্ত করেন। এক সত্বার এক থেকে বহুত্বে পরিণতি—এই ভেদাভেদ অচিন্ত্য। এই সংশয় দূর করতে গোস্বামী-সিদ্ধান্তের ভাষ্য—

---

৩১ বিশ্বষামনুরঞ্জনেন জনয়ন্নানন্দমিন্দীবর
শ্রেণী শ্যামল-কোমলৈরুপনয়ন্নঙ্গৈরনঙ্গোৎ সবম্।
স্বচ্ছন্দং ব্রজসুন্দরীভিরভিতঃ প্রত্যঙ্গনা লিঙ্গিতঃ
শৃঙ্গার সখি মূর্ত্তিমানিব মধৌমুগ্ধো হরিক্রীড়তি ॥

"অবিচিন্ত্য শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান।
ইচ্ছায় জগৎরূপে পায় পরিণাম ॥
তথাপি অচিন্ত্য শক্ত্যে হয় অধিকারী।
প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত ধরি ॥
নানারত্নরাশি হয় চিন্তামণি হইতে।
তথাপিহ মনিরহে স্বরূপে অবিকৃতে ॥
প্রাকৃতবস্তুতে যদি অচিন্ত্য শক্তি হয়।
ঈশ্বরের অনন্ত শক্তি ইথে কি বিস্ময় ॥

(প্রাকৃত বস্তু চিন্তামণি' আপনি অবিকৃত থেকে তার থেকে নানারত্নরাশি প্রসব করে। প্রাকৃত বস্তুতে এ শক্তি থাকলে ঈশ্বরে এ শক্তি অসম্ভব হবে কেন? অন্যভাবে বলা যেতে পারে একদিকে বিশ্বের পরমপুরুষ আর একদিকে বিশ্বপ্রকৃতি অর্থাৎ তাঁর সৃষ্টি। এই দুই বস্তু ভিন্ন নয়, আবার অভিন্নও নয়। ইহাদের যুগপৎ ভেদ ও অভেদের সম্পর্ক ইহা অচিন্ত্য - মানববুদ্ধির অতীত। রবীন্দ্রনাথের কথায় বলা যায়--সীমার মধ্যে অসীমের আভাস বর্তমান— সসীম ব্যক্তি বা বস্তু যেমন সত্য, তার মধ্যে অসীমত্বের আস্বাদনও তেমনি সত্য। কিন্তু এই ভেদাভেদ চিন্তার অতীত।

যাইহোক, শৈব দর্শনেও এই ভেদাভেদ তত্ত্বের আভাস বর্তমান। স্পন্দ শাস্ত্র মতে ভৈরবের ত্রিশির, অপর-পরাপর-পর। অপরে ভেদ, পরাপরে ভেদাভেদ, পরাবস্থায় অভেদ। ভারতীয় ঋষির চিন্তা— রূপের মধ্যে অরূপের চিন্তা, বহুর মধ্যে একের চিন্তা— কিন্তু শুধু জ্ঞানযোগ নয়, লীলাবাদী ভক্তিযোগের প্রেক্ষাপটে তাঁরা বিশ্বপ্রকৃতি এবং পরমপুরুষ দুই সত্তাকে আপাত স্বীকার করলেও মূলতঃ যে ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয় তা কখনও বিস্মৃত হন নাই। তাই একই-ভাবে একই দর্শনে সহজেই বাঁধা পড়েছেন শিব এবং বিষ্ণু— হরি এবং হর।

"আলিঙ্গনে যুগল শরীর হইল এক
অর্ধভস্মভূষা হইল কস্তুরী অর্ধেক
অর্ধজটাজুট অর্ধ চিকুর চাঁচর
অর্ধেক কিরীটি অর্ধেক ফণি দণ্ডধর
কস্তুরী তিলক অর্ধ-অর্ধশশিকলা
অর্ধগলে হাড়মালা অর্ধফুলমালা।

শ্যামরায় মন্দিরের শিবতলের মূল চূড়ার অভ্যন্তরে 'হরিহর' টেরাকোটা চিত্র এই সমন্বয় ধর্মের দ্যোতক। গৌড়ীয় বৈষ্ণবরা রাধিকাকে শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তিরূপে প্রতিষ্ঠা করেছেন। বৈষ্ণবের রাধাতত্ত্ব শক্তিতত্ত্বের নামান্তর। রাধাকৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলা বৈষ্ণবদের একমাত্র আরাধ্য বস্তু। বৈষ্ণব মতে রাধা কৃষ্ণের শক্তি, যেমন লক্ষ্মী বিষ্ণুর শক্তি অথবা পার্বতী শিবের শক্তি। শ্যামরায় মন্দিরের শিবতলের অষ্টকোণাকৃতি মূল চূড়ার অভ্যন্তরে উমা-মহেশ্বর চিত্র বৈষ্ণবের শক্তি-তত্ত্বের ব্যঞ্জনা বহন করছে এমন মনে করা অসঙ্গত নয়।

বৈদিক আর্য-সমাজে ভগবানের শক্তিকল্পনা অনার্য প্রভাবের ফল এবং আর্য-অনার্যের মিশ্রণেই হিন্দুধর্ম। আগেই বলা হয়েছে প্রাগার্য মাতৃকা-পূজা আর্য সমাজে শক্তি তত্ত্বের প্রচলন ঘটিয়েছে এমন চিন্তা অমূলক নয়। বৈষ্ণব মন্দিরে প্রচুর শাক্ত টেরাকোটা গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মে শক্তিতত্ত্বের প্রাধান্যকেই যেন সূচিত করে।

একথা অস্বীকার করা যায়না যে, চৈতন্যযুগে বা গোস্বামী সিদ্ধান্তেই কৃষ্ণলীলা এক বিশিষ্ট অধ্যাত্মদর্শনের সাধন-সরণির অনুসরণ করে 'সিম্বলে' পরিণত হয়েছিল। ডঃ সুকুমার সেন শ্রীমদ্ভাগ-বতের শ্লোক উদ্ধৃত করে বলেছেন "নায়ক কৃষ্ণ বিষ্ণুর অবতার হইলেও ব্রজবিলাস গানের সঙ্গে অধ্যাত্ম চিন্তার কোন সম্পর্ক ছিল না। এ প্রসঙ্গে তিনি আরও বলেছেন যে, "কালিদাসের সময়েও ব্রজলীলা গ্রাম্যগীতির বিষয় ছিল বলিয়াই বোধ হয় তিনি কৃষ্ণলীলাকে কাব্যের বিষয় করেন নাই। ক্রমে বহু নারী বিলাসের পরিবর্তে একনারী বিলাস আদৃত হইতে থাকিলে কৃষ্ণের গোপীলীলার কথা সংস্কৃত সীমানায় ধরা দেয়। ইহার দৃষ্টান্ত জয়দেবের গীতগোবিন্দ। তিনি বলেছেন ইহাতে আধুনিক আর্যভাষার সাহিত্যে কৃষ্ণলীলার গানে ভক্তিরসের রঙ কিছুটা গাঢ় হইয়াছিল বটে কিন্তু চৈতন্যের স্বীকৃতির দ্বারাই আদিরসের ক্লেদ একেবারেই ঘুচিয়া গেল। কৃষ্ণরাধার প্রেমলীলায় মানবজীবনের গূঢ়তম আশা-আকাঙ্খার প্রতিফলনও সিম্বল বলিয়া গৃহীত হইল। রামানন্দ রায়ের সঙ্গে কথোপকথন প্রসঙ্গে কৃষ্ণদাস কবিরাজ ইহারই ইঙ্গিত করিয়াছেন।

গান মধ্যে কোন গান জীবের নিজধর্ম ?
রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি যে গীতের মর্ম।[৩৩]

দেবায়ন সম্পূর্ণ হইল চৈতন্যের ধর্মে, ঈশ্বর বিরহের তীব্র ব্যাকুলতা যখন মূর্তিমান হইল শ্রীচৈতন্যের আচারে ভাবে ভঙ্গিতে, তখনই প্রত্যক্ষের মাহাত্ম্য পরোক্ষকে ছাপাইয়া গেল। কৃষ্ণ সিম্বল রহিয়া গেল কিন্তু মানব রাধার বিরহ বিলাপ ভাবুকের চিত্তে সকরুণ গুঞ্জনধ্বনি তুলিতে লাগিল। তাহার পরে রাধাকৃষ্ণ এক হইয়া গেল এবং বৈষ্ণব কবিতা হৃদয় হইতে মনের উপর তলে উঠিয়া আসিল। ভাবের বিষয় সাধনার বস্তু হইল।" সখিরা বিশিষ্ট সাধনতত্ত্বের দ্যোতনাবাহী হল (সখীভাব সাধনা)। এই সখীভাবেরও এক পরিশুদ্ধ বিবর্তন দেখা দিল শুদ্ধধী মঞ্জরীতে। রাধাকৃষ্ণের মিলনকুঞ্জ 'কুঞ্জসেবার' সিম্বলে পরিণত হ'ল।

রাসলীলা শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রেষ্ঠলীলা। রাসলীলাকে কেন্দ্র করেই বৈষ্ণবের প্রেমভক্তির দার্শনিক চিন্তার বিকাশ। এই রাসলীলাকে আদর্শ করে গোপী বা সখিভাব সাধনা- কুঞ্জসেবা, ইত্যাদি। এই রাসলীলার মুখ্য তত্ত্ব হ'ল নিঃসঙ্কোচ আত্মনিবেদন - গীতায় উক্ত শরণাগতির বিচিত্র রূপায়ণ। গোপীদের নিঃসঙ্কোচ আত্মনিবেদনের মহিমায় রাসলীলায় সহজেই এক অধ্যাত্ম মাত্রা যোগ করা সম্ভব হয়েছে। আত্মসুখ বিসর্জন দিয়ে কৃষ্ণসুখের জন্য এই আত্মনিবেদন সহজেই লোকস্তর থেকে অলৌকিক স্তরে উন্নীত হয়েছে। এই অসাধারণ গোপীপ্রেম সম্বন্ধে শশিভূষণ দাশগুপ্ত বলেছেন—' উন্মত্ত অভিসার ও শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে বাদানুবাদের মধ্যে গোপীভাবের যে বীজাঙ্কুর লক্ষ্য করা যায়, গোপীদের বিরহ বিলাপের মধ্যে সেই অঙ্কুর বিকশিত।"

---

32 In Rajasthani paintings from 16th century to 18th century, dance music are depicted in several ways. We have example of the illustrations of Dasamaskanda of Bhagavata where krishna danced with the Gopis. We have also illustrations of krishna dancing and playing flute to the accompaniment of Ektara and Mridanga". Lalit Kala. 1960

৩৩ বৈষ্ণব পদাবলীর গোড়ার কথা : পরিচয় পত্রিকা শারদীয় সংখ্যা ভাদ্র-আশ্বিন ১৩৬৬।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন— "পৃথিবীতে যে ভালবাসার কোন যুক্তি সঙ্গত হেতু দেখা যায় না, যাহার সহিত পূর্বকৃত কোন সম্বন্ধ বন্ধন নাই- এমন কি যাহা সমস্ত বন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া দুরূহ দুরাশায় আত্ম-বিসর্জন করিতে চায় বৈষ্ণব কবিগণ পৃথিবীর সেই ভালবাসাবেই পরমাত্মার প্রতি আত্মার নিগূঢ় ভালবাসার আদর্শরূপক স্বরূপ ব্যবহার করিয়াছেন।"

স্বাভাবিকভাবেই এই অকৃত্রিম অলৌকিক অপার্থিব গোপীপ্রেম কেন্দ্রিক 'গোপীভাবই' গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের প্রেমভক্তি বা কৃষ্ণভক্তির ভিত্তি এবং প্রবেশ দ্বার। এই গোপী বা সখিভাবই তাই গৌড়ীয় বৈষ্ণবের প্রেমভক্তি সাধনার চাবিকাঠি—

রাধাকৃষ্ণের লীলা এই অতি গূঢ়তর,
দাস্যবাৎসল্যাদি রসের না হয় গোচর ॥
সবে এই সখীগণের ইহা অধিকার।
সখি হইতে হয় এই লীলার বিস্তার
সখি বিনু এই লীলার পুষ্টি নাহি হয়।
সখি লীলা বিস্তারিয়া সখি আস্বাদয় ॥

শ্যামরায় মন্দিরে রাসলীলার অজস্র টেরাকোটায় নৃত্যগীত, কৃষ্ণ-সন্দর্শন, কৃষ্ণমিলনের লীলায় শত শত গোপীর সমাবেশ বিভিন্ন রঙ্গে ভঙ্গে কৃষ্ণবিনোদন এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সখিরা নানা রঙ্গে নানা পর্যায়ে কৃষ্ণলীলার বিস্তার করে নিজেরাই আস্বাদন করছেন।

গোপীরা রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার বিস্তার সাধনে সমর্থা বলেই তাঁদের সখি বলা হয়। "উজ্জলনীলমণির" সখিপ্রকরণে আছে, প্রেমলীলা বিস্তারাণাং সম্যক বিস্তারিণী সখী।" এই সখী বিশ্বাসরূপ রত্নের আধার পেটিকা "বিশ্রম্ভরত্নপেটী" অলঙ্কার কৌস্তুভ বলেন—এই সখীরা—

নিরূপাধি প্রীতিপরা সদৃশী সুখ দুঃখয়োঃ।
বয়স্যভাবাদন্যোহন্যং হৃদয়জ্ঞা সখীভবেৎ ॥

এঁরা প্রেমিক যুগলের সুখে দুঃখে সমদুঃখভাগিনী এবং বয়স্যভাব বশতঃ তাঁরা পরস্পরের হৃদয় জানেন। শ্রীরাধার কায়াব্যূহ স্বরূপিনী যে গোপীরা নিত্যসিদ্ধা, নিত্যপ্রিয়া তাঁদের কৃষ্ণ প্রেম সাধনলব্ধ নয়

স্বরূপগত। তাঁরা স্বরূপশক্তির মূর্তবিগ্রহ তাই স্বরূপ শক্তির বৃত্তি-বিশেষ প্রেম তাঁদের স্বভাবেই নিহিত আছে। সেবার প্রকারভেদে এই সখীদের যে দুটি শ্রেণী আছে তা আগেই বলা হয়েছে। ললিতা বিশাখা প্রভৃতি সখী, কারণ তাঁদের সেবায় শ্রীরাধিকার মত স্বাতন্ত্র্য আছে। অপর এক শ্রেণীর গোপী আছেন যাঁদের সাধনসিদ্ধা মঞ্জরী বলা হয়। এই সাধনসিদ্ধ গোপীতত্ত্ব বা মঞ্জরী তত্ত্বই জীবের সাধ্য। নিত্যসিদ্ধ গোপীত্ব জীবের সাধ্যবস্তু নয়। জীবের প্রবেশাধিকার রয়েছে উভয় কোটিতে, অর্থাৎ জীব কোটিতে এবং ভগবৎ কোটিতে। সাধনভজনের বলে জীব ভগবানের স্বরূপভূত ধামে প্রবিষ্ট হয়ে সাধনোপযোগী লীলাপরিকরত্ব লাভ করে। সাধনসিদ্ধা গোপীদের দুটি শ্রেণী 'শ্রুতিচরী' এবং 'ঋষিচরী'।

শ্রুত্যভিমানিনী দেবীগণ গোপীজনপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের সেবালাভে সাধনাদির সহায়তায় ব্রজে গোপীদেহ লাভ করেন, তাঁদের সাধনা এবং মঞ্জরীদেহপ্রাপ্তি সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত বলেন ঃ

নিভৃতমরুন্মনোহক্ষ দৃঢ়যোগযুজো হৃদি য-
ন্মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ।
স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্ত ধিয়ো
বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রিসরোজ সুধাঃ॥

শ্রীমদ্ভাগবত, ১০।৮৭।২৩

প্রাণমন ও ইন্দ্রিয়গ্রাম দৃঢ়যোগের দ্বারা সংযমিত করে মুনিগণ যোগসমাধিতে যে বস্তুর ধ্যান করেন (শ্যামরায় মন্দিরের যোগধ্যানে মগ্ন ঋষিদের চিত্র দ্রষ্টব্য) বৈরিভাবাপন্ন শিশুপালাদিও নিরন্তর চিন্তা করার ফলে সেই বস্তু লাভ করেছেন। আলিঙ্গন প্রাপ্তির জন্য সর্পরাজ দেহতুল্য আপনার বাহুযুগলে যাঁদের চিত্ত অভিনিবিষ্ট ছিল, সেই গোপীগণও কামনাপর হয়ে চিন্তামণি আপনাকে লাভ করেছেন, তেমন-ভাবে মন্ত্রাভিমানিনী দেবতা আমরাও আপনার শ্রীচরণকমল সম্যকরূপে ধ্যান করে তা প্রাপ্ত হয়েছি। সর্বপ্রকারের অধিকারীই আপনার নিকট সমান। শ্রুতিগণই ভগবত্তত্ত্ব প্রচারের দ্বারা পরব্রহ্ম ভগবানের সেবায় নিরত আছেন। অধিকন্তু গোপীজনপ্রিয়ের রূপগুণ মাধুর্যা-দির দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে তাঁরা ভিন্ন স্বরূপে নিজ নিজ নির্ধারিত সেবার

অতিরিক্ত ব্রজগোপীসুলভ সেবাধিকার প্রাপ্ত হয়ে শ্রুতিচরী সাধনসিদ্ধা গোপীআখ্যা লাভ করেছেন।

এপ্রসঙ্গে শ্যামরায় মন্দিরের টেরাকোটা চিত্রাবলীর দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যেতে পারে। শ্যামরায় মন্দিরের পূর্বদিকের ত্রিখিলান প্রবেশ দ্বারের ডাইনে এবং বাঁয়ে গোপী ও কৃষ্ণলীলার দুটি উজ্জ্বলচিত্র যেন শ্রীমদ্ভাগবতের উপরোক্ত শ্লোকেরই চিত্ররূপ। এতে দেখা যায় সর্পরাজের দেহতুল্য (উরগেন্দ্রভোগভূজদণ্ড) কৃষ্ণের দুই আজানুলম্বিত বাহুর আলিঙ্গনে আবদ্ধ নৃত্যপরা গোপীদ্বয়ের চিত্র (এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত টেরাকোটা চিত্র দ্রষ্টব্য)। আলোচ্য মন্দিরের দক্ষিণের বারান্দার দক্ষিণপূর্ব দিকের কোণে এবং জোড়বাংলা মন্দিরের একই স্থানে ধ্যানী এবং দৃঢ়যোগে আবিষ্ট যোগীদের চিত্র-গুলিকেও এই শ্লোকে উক্ত সাধনভজনের অন্যতম প্রকারভেদ রূপেও গ্রহণ করা যেতে পারে। ঈশ্বর সাধনার বিভিন্ন দিকের ইঙ্গিত দিয়েই চিত্রাবলী রচিত। পদ্মপুরাণ থেকে পাওয়া যায়, দণ্ডকারণ্যবাসী ঋষিগণ কান্তাভাবে গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করে ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের সেবার উপযোগী দেহ লাভ করেছিলেন। এই ঋষি-চরী গোপীগণ জীবতত্ত্ব, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের জীবশক্তির অংশ। প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের জীবমাত্রই বিহিত ভজনের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ সেবার উপযোগী গোপীদেহ লাভ করতে পারেন। এই সাধনসিদ্ধা গোপীগণও নিত্যসিদ্ধাদের মত মহাভাববতী। ব্রজগোপীগণ মহাভাব গোপন বা রক্ষা করেন বলে তাঁদের গোপী বলা হয়। প্রিয়তমকে সম্যকরূপে মহা-ভাবের দ্বারা স্ববশে রক্ষা করেন এই মহিমময়ী পরমপ্রেমবতীরা। রসস্বরূপ পরব্রহ্ম এই প্রেমভক্তির দ্বারা সর্বতোভাবে বশীভূত। শ্রুতি বলেন, "ভক্তিবশঃ পুরুষঃ। ভক্তিরেব ভূয়সী।" চৈতন্য-চরিতামৃত বলেন,

পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্তি এই প্রেমা হইতে।
এ প্রেমার বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে ॥

…ব্রজগোপীদের কৃষ্ণপ্রেম সর্বপ্রকারে স্বসুখবাসনালেশশূণ্য, সম্পূর্ণ ঐশ্বর্যজ্ঞানহীন কেবলপ্রীতি। কৃপাধন্যা সাধনসিদ্ধা গোপীরাও এই ঐশ্বর্যজ্ঞানহীন কেবলাপ্রীতির অধিকারিণী হন।

রুক্মিনী-সত্যভামাদি দ্বারকার মহিষীগণও শ্রীরাধারই অংশ, স্বরূপশক্তির মূর্তবিগ্রহ। মহিষীদের কৃষ্ণপ্রেমের ব্রজদেবীগণের প্রেম হতে ন্যূনতার দুটি কারণ। তাঁদের কৃষ্ণপ্রেম ঐশ্বর্যজ্ঞানের সঙ্গে মিশ্রিত কেবলাপ্রীতি নয়; কিন্তু ঐশ্বর্যমিশ্রা হলেও সেখানে মাধুর্যেরই আধিক্য। দ্বিতীয়তঃ মহিষীদের প্রেমে স্বসুখবাসনারও কিছু সংযোগ মাঝে মাঝে দেখা যায়। ব্রজগোপীর মহাভাব তাই মুকুন্দ-মহিষীগণের অতি সুদুর্লভ। ....বৈকুণ্ঠ প্রেয়সীগণের প্রেমেও ঐশ্বর্যজ্ঞানের প্রাবল্য। সুতরাং গোপীপ্রেম সর্বোৎকৃষ্ট, তার মধ্যে আবার শ্রীরাধার প্রেম সর্ববরীয়ান সর্বভাবোদ্‌গমোল্লাসী।[৩৪]

শ্যামরায় এবং জোড়বাংলা মন্দিরগাত্রের টেরাকোটা-চিত্রগুলি অভিনিবেশের সঙ্গে লক্ষ্য করলে দেখা যায়, কৃষ্ণলীলার নৃত্যগীত, বেণুবাদ্য ইত্যাদির বিভিন্ন বিচিত্র উজ্জ্বল চিত্রগুলির পাশাপাশি মুনি-ঋষিদের বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় অনুষ্ঠিত দুশ্চর-কঠোর যোগাভ্যাস ও নানাধরণের সাধনভজনের চিত্র। নানাদিক দিয়ে এগুলি তাৎপর্য-পূর্ণ। একদিকে এগুলি যেমন প্রচলিত কঠোর দুশ্চর যোগাভ্যাসের দ্বারা ঈশ্বরপ্রাপ্তির বা মোক্ষলাভের সাধনার বিপরীতে গৌড়ীয় গোস্বামী সিদ্ধান্তের বিশিষ্ট সাধন রাগানুগার ধাতুপ্রকৃতিটি উদ্ঘাটিত করে—অন্যদিকে তেমনি জপতপে মোক্ষলাভের চেয়ে লক্ষ লক্ষ জন্মগ্রহণ করে কৃষ্ণলীলা আস্বাদনের অভীপ্সাও এতে ব্যঞ্জিত হয়। দণ্ডকারণ্যের ঋষিরা গোপীদেহ লাভ করে গোপীভাবে কৃষ্ণসেবার অধিকার পাওয়ার জন্য যে তপস্যা করেছিলেন এই চিত্রগুলিতে তারও পরোক্ষ ইঙ্গিত থাকতে পারে। এককথায় বিষ্ণুপুরের শ্যামরায় মন্দির ও জোড়বাংলা মন্দিরের পূর্ব-দক্ষিণ কোণে মন্দির গাত্রে) উৎকীর্ণ যোগী-ঋষিদের টেরাকোটা চিত্রগুলি গোপীপ্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশের প্রেক্ষাপটরূপেও গৃহীত হতে পারে। শ্রীরূপ গোস্বামী সংগৃহীত ও সংকলিত পদ্যাবলীর নিম্নলিখিত শ্লোকগুলিতে এ ধরণের আভাস ইঙ্গিত বর্তমান বলে মনে করা অসঙ্গত নয়। এগুলি বৈধী এবং রাগানুগা ভক্তির তারতম্যের ব্যঞ্জনাবাহীও হ'তে পারে।

---

৩৪ শ্রীরাধাতত্ত্ব ও শ্রীচৈতন্যসংস্কৃতি : শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী : কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় : ১৯৭২

যোগশ্রুত্যুপপত্তি নির্জনবনধ্যানাধ্ব সংভাবিতাঃ
স্বারাজ্যং প্রতিপদ্য নির্ভয়মমী মুক্তা ভবন্তু দ্বিজাঃ।
অস্মাকন্তু কদম্বকুঞ্জকুহর প্রোন্মীলদিন্দীবর
শ্রেণী শ্যামলধাম নাম যুষতাং জন্মাস্তু লক্ষাবধি ॥ ১৮ ॥
শ্রীমদীশ্বরপুরীপাদানাং ॥ ৩ ॥

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য প্রভৃতি দ্বিজাতিগণ অষ্টাঙ্গযোগ (শ্যামরায় ও জোড়বাংলার টেরাকোটা চিত্র দ্রষ্টব্য) বেদানুশীলন, নির্জন বনে উপবেশনপূর্বক ধ্যান এবং তীর্থপর্যটন দ্বারা সম্ভাবিত নির্ভয়রূপ স্বরূপানুভব প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ ব্রহ্মসাক্ষাৎকার করিয়া মুক্ত হয়েন, হউন কিন্তু আমরা কদম্বকুঞ্জ কুহরে উদয়শীল ইন্দীবর শ্রেণীতুল্য শ্যামসুন্দরের নাম সেবক, অতএব আমাদের লক্ষাধিক জন্ম হউক তাহাতে ক্ষতি নাই।

অথবা

(অন্য একটি শ্লোকে বৈষ্ণব সাধনার ধাতুপ্রকৃতি অধিকতর পরিস্ফুট)

স্বর্গার্থীয়া ব্যবসিতিরসৌ দীনয়ত্যেব লোকান্
মোক্ষাপেক্ষা জনয়তি জনং কেবলং ক্লেশভাজং।
যোগাভ্যাসঃ পরমবিরসস্তাদৃশৈঃ কিং প্রয়াসৈঃ
সর্বং ত্যক্ত্বা মমতু রসনা কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি রৌতু ॥ ২৭ ॥
কস্যচিৎ ॥ ১২ ॥

স্বর্গপ্রাপ্তির অনুষ্ঠান কেবল লোকসকলকে দীনভাবাপন্ন করে, মোক্ষের অপেক্ষা, অর্থাৎ আমি মুক্ত হইব এই বলিয়া যে অভিলাষ, তাহা জনকে কেবল ক্লেশভাগী করে এবং যোগের অভ্যাস অতিশয় বিরস, অতএব ঐসকল অভ্যাসে কোন প্রয়োজন নাই, তৎসমুদায় পরিত্যাগ করিয়া আমার রসনা কেবল কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলিয়া কীর্ত্তন করুক ॥ ২৭ ॥ এই শ্লোক কোন মহাত্মার।

কঠোর-কঠিন তপশ্চর্যার প্রেক্ষাপটে সখি বা গোপীভাবের বৈশিষ্ট্য প্রতিপন্ন করা গোস্বামী সিদ্ধান্তের মুখ্য প্রতিপাদ্য। চৈতন্য-চরিতামৃতে নানাভাবে এই গোপীভাব বা সখিপ্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হয়েছে।

এই গোপী বা সখিভাব গৌড়ীয় বৈষ্ণবের সাধনার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। আগেই বলা হয়েছে বৈষ্ণবদর্শনে লোকায়ত সমস্ত বিষয়বস্তু এক বিচিত্র সাধনার প্রেক্ষাপটে নানা প্রতীকী অবয়ব লাভ করে এক বিশিষ্ট সাধনদর্শন নির্মাণের সহযোগী হয়েছে। তাই এই গোপী বা সখিভাবের সঙ্গে "কুঞ্জসেবা" স্বাভাবিকভাবে যুক্ত হয়েছে। কারণ সখিরাই কৃষ্ণলীলার প্রধান সহায়িকা। কুঞ্জে মিলিত শ্রীরাধাকৃষ্ণই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের উপাস্য। "গোপীভাব" বা "সখিভাব" সাধনার অন্যতম পর্যায় তাই 'কুঞ্জসেবা'। গোপীভাবে কৃষ্ণসেবার সহযোগী-রূপেই 'কুঞ্জসেবা' অবশ্য আচরণীয়। সখিভাবে ভাবিত ভক্তই শুধু কুঞ্জসেবার অধিকার পায়। এ সাধনায় অন্যকোন উপায় নাই। সখি বিনা এই লীলায় অন্যের গতি নাই।

সখি বিনু এই লীলায় নাই অন্যের গতি।
সখিভাবে তাঁরে যেই করে অনুগতি ॥
রাধাসাধ্য কুঞ্জসেবা সাধ্য সেই পায়।
সেই সাধ্য পাইতে আর নাহিক উপায় ॥

শ্যামরায় মন্দিরের দক্ষিণের দেওয়ালের টেরাকোটায় শুধু নেতের পতাকাশোভিত একাধিক কুঞ্জকুটিরের চিত্রই সন্নিবেশিত হয় নাই কুঞ্জেমিলিত শ্রীরাধাকৃষ্ণের মূর্তির সম্মুখে করজোড়ে দণ্ডায়মান ভক্তের চিত্রে 'কুঞ্জসেবার' ইঙ্গিতও সুস্পষ্ট। কুঞ্জদ্বারে দণ্ডায়মান ভক্তের টেরাকোটা-চিত্রকে সাধনসিদ্ধ "মঞ্জরী"র চিত্ররূপে গ্রহণ করা যেতে পারে। দুদিকের দেওয়ালে চারচালা এবং আটচালা একাধিক কুঞ্জ কুটির রচিত হয়েছে টেরাকোটায়।

এপ্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মঞ্জরী ভাবসাধনার (শ্রীমদ্ভাগবতে উক্ত) প্রবক্তা রূপ হলেও, রূপগোস্বামী তথা গোস্বামী সিদ্ধান্তের অনুগামী শ্রীনিবাসগোস্বামী ছিলেন এর অন্যতম প্রধান প্রচারক। তাঁর সতীর্থ সুহৃদ নরোত্তমের পদেও এই মঞ্জরীভাব সাধনা পরিস্ফুট হয়েছে। সম্প্রতি বিশ্বভারতী থেকে প্রকাশিত "সাহিত্য প্রকাশিকা" সিরিজে (সম্পাদনা পঞ্চানন মণ্ডল) রসময় দাসের "কৃষ্ণভক্তিবল্লী" নামে একটি গ্রন্থ টীকা-টিপ্পনী সহ প্রকাশিত হয়েছে। পুঁথির সম্পাদক নানা বিচার-চর্চার মাধ্যমে

সঙ্গতভাবেই প্রতিপন্ন করেছেন রসময় দাস শ্রীনিবাসের শিষ্য ছিলেন। রসময় দাসের গ্রন্থেও মঞ্জরী ভাব সাধনার কথা আছে। 'ভক্তিরসামৃত সিন্ধু' ইত্যাদি গ্রন্থের উল্লেখ আছে। সম্পাদক প্রশ্ন তুলেছেন - ইনিই রসময়ীদাসী কিনা? এবং তিনি "সখিভেকী" সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন কিনা? কারণ 'সখিভেকী' সম্প্রদায়ভুক্ত ভক্তরা নিজেকে কৃষ্ণের সখী বা গোপী বলে মনে করেন এবং স্বাভাবিকভাবেই নারীনামে নিজেদের চিহ্নিত করেন। সখীভাবের প্রতীক এই ধরণের নারীবেশী একাধিক পুরুষ পঞ্চাশ ষাট বছর পূর্বেও বিষ্ণুপুরে দেখা যেত। আগেই বলা হয়েছে শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লীতে গোস্বামী সিদ্ধান্তের সুস্পষ্ট প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। ভক্তিরসামৃত সিন্ধুর অনুসরণে যেমন ভক্তির বিভিন্ন স্তরের কথা বলা হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি সাধন স্তরগুলিও গোস্বামী সিদ্ধান্তের অনুসরণেই উল্লিখিত হয়েছে। কুঞ্জসেবা সম্বন্ধে এই গ্রন্থে বলা হয়েছে ঃ—

আর এক কথা কহি ভজনের সার
কুঞ্জে সেবা পাইতে পরম অধিকার।
প্রিয় নর্ম্য সখি কুঞ্জসেবা অধিকারী।
গুরু আজ্ঞায় তা সভার হব অনুচরী॥

শ্রীকৃষ্ণের নর্ম্যসখীদের অনুগা বা আজ্ঞাবহ হয়ে সেবাই "মঞ্জরী ভাব সাধনা"। রসময় দাসের শ্রীকৃষ্ণভক্তিবল্লী বলেন ঃ

শ্রীরূপমঞ্জরী আর রতিমঞ্জরী
শ্রীগুণমঞ্জরী আর লবঙ্গ মঞ্জরী।
শ্রীরসমঞ্জরী আদি রসের আকর
কুঞ্জে রাধাকৃষ্ণ সেবা করে নিরন্তর।
কুঞ্জসেবা যত ইহা সভার গোচর
ইহা সভার আজ্ঞা বিনে সেবন দুষ্কর।
ইহা সভার অনুগত আজ্ঞাকারী হৈব,
সদা রাধাকৃষ্ণ সেবা মানসে করিব।
রাগানুগা ভজনে মিলিব কুঞ্জসেবা,
দেখিব দোঁহার রূপ ভরি রাত্রি দিবা।

শ্যামরায় মন্দিরের দক্ষিণের ত্রিখিলান প্রবেশ দ্বারের দুপাশের দেওয়ালের টেরাকোটা-চিত্রে কুঞ্জকুটিরের সম্মুখে দণ্ডায়মান মঞ্জরীদের সতৃষ্ণনয়নে রাধাকৃষ্ণের যুগল মিলন দর্শনের চিত্রগুলিতে যেন এই আকাঙ্খারই মূর্ত প্রকাশ। জয়দেবের গীতগোবিন্দে কুঞ্জে মিলিত রাধাকৃষ্ণের প্রসঙ্গ আছে-"চলসখি কুঞ্জং" ইত্যাদি। প্রাকৃত-অপভ্রংশ কবিতায় 'রাই' এর দোহড়ী-পঢ়ন শুনে বা ছড়া কাটার ইঙ্গিতে কানুর রসাল ভঙ্গীতে কুঞ্জে গমনের কথাও আগে বলা হয়েছে— কিন্তু এইসব কুঞ্জ মিলনকে অধ্যাত্ম মহিমায় অভিষিক্ত করার চেষ্টা পূর্বে হয় নাই। এখানের টেরাকোটা চিত্রে কুঞ্জে মিলিত রাধাকৃষ্ণের সম্মুখে করজোড়ে দণ্ডায়মান ভক্তের উপস্থিতিতে সেই অধ্যাত্মমাত্রাই যুক্ত হয়েছে। অতএব টেরাকোটা চিত্রগুলি যে গোস্বামীসিদ্ধান্তের প্রতিরূপ তা বলা অসমীচীন নয়।

মঞ্জরীদের তালিকায় কিছু কিছু তারতম্য দেখা যায়। সম্প্রতি প্রকাশিত ডঃ সুখেন্দু সুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়ের "গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ভূমিকা" গ্রন্থে প্রদত্ত মঞ্জরীদের তালিকা ও পরিচয় নিম্নরূপ। তিনি অষ্টমঞ্জরীর নাম ও পরিচয়ের তালিকা দিয়েছেন তাঁর গ্রন্থে।

অষ্টমঞ্জরী

১। শ্রীরূপমঞ্জরী—শ্রীরূপ গোস্বামী
২। শ্রীনবমঞ্জরী— শ্রীসনাতন গোস্বামী
৩। শ্রীঅনঙ্গ মঞ্জরী—শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামী
৪। শ্রীরসমঞ্জরী — শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী
৫। শ্রীবিলাসমঞ্জরী—শ্রীজীব গোস্বামী
৬। শ্রীপ্রেমমঞ্জরী - শ্রীভূগর্ভ গোস্বামী
৭। শ্রীলীলা মঞ্জরী—শ্রীরঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী
৮ শ্রীকস্তুরী মঞ্জরী—শ্রীকৃষ্ণদাস গোস্বামী।[৩৫]

লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, এই তালিকায় রতিমঞ্জরী, গুণমঞ্জরী, লবঙ্গমঞ্জরী নামগুলি অনুপস্থিত। তালিকায় শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীকে অনঙ্গমঞ্জরী আখ্যায় অভিহিত করা হয়েছে। অথচ শ্রীমান প্রদীপ সিংহ (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, বিষ্ণুপুর শাখার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক মানিকলাল সিংহের জ্যেষ্ঠপুত্র) তাঁর 'আচার্য'

শ্রীনিবাস গ্রন্থে (প্রকাশক মানিকলাল সিংহ, দলমাদল রোড বিষ্ণুপুর ১৯৮২) শ্রীনিবাসের যে পাঁচটি পদ উদ্ধৃত করেছেন তার দুটিতে দেখা যায় শ্রীনিবাস তাঁর গুরু গোপাল ভট্টের বন্দনা করেছেন। তাতে দেখা যায় শ্রীনিবাস তাঁর গুরু গোপালভট্টকে গুণমঞ্জরী আখ্যায় অভিহিত করেছেন। ২

প্রেমক পুঞ্জরী পুণ গুণমঞ্জরী
তুঁহু সে সকল শুভদাই।..........''
তুঁহারি গুণ-গণ চিন্তই অনুক্ষণ
মঝু মন রহল বিকাই ॥
হরি হরি কবে মোর শুভদিন হোয়।
কিশোরী কিশোর পদ মিলন সম্পদ।
তুয়া সনে মিলব মোয়।

৩

তুঁহু গুণমঞ্জরী রূপে গুণে আগরী
মধুর মাধরী গুণধামা।............'

ঐ সব মঞ্জরীরা কুঞ্জে নিরন্তর রাধাকৃষ্ণ সেবা করেন। এসবার অনুগত হয়ে মানস মন্দিরে রাধাকৃষ্ণ সেবাই ভক্তদের আকাঙ্খিত। এই সেবার ফলে একদিন ভাবসিদ্ধ হয়ে গোকুলে জন্মগ্রহণ করাই ভক্তের পরম আকাঙ্খা। রাগানুগা ভজনে কুঞ্জসেবার অধিকার পেলে নর্ম্যসখীদের সঙ্গে নিরবধি অবস্থান করার সৌভাগ্য মিলবে। সখী বা গোপীদের প্রেম সাধনসিদ্ধ নয়। মঞ্জরীরা সাধনার দ্বারাই সিদ্ধদেহ লাভ করেন। গোপীদের অনুগা না হলে এ সাধন লাভ করা যায় না। সখী বা গোপীরা কৃষ্ণপ্রেম আস্বাদনের আধার এবং আধেয়। গোপীভাব অঙ্গীকার করেই সিদ্ধদেহ লাভ করা যায়।

অতএব গোপীভাব করি অঙ্গীকার
রাত্রি দিনে চিন্তি রাধা কৃষ্ণের বিহার
সিদ্ধদেহ চিন্তি করে তাহাই সেবন।
সখী ভাবে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ ॥

৩৫, গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনের ভূমিকা : ডঃ সুখেন্দুসুন্দর গঙ্গোপাধ্যায়। সোনারতরী প্রকাশন ১৯৯৭

অথবা

সেই গোপীভাবামৃতে যার লোভ হয়।
বেদধর্ম সব ত্যজি সে কৃষ্ণেরে ভজয় ॥

শ্যামরায় মন্দিরের সর্বত্র এই সব গোপীদের সমাবেশ দেখা যায় কৃষ্ণকে ঘিরে। তাঁদের এই লীলা বিচিত্র। বিন্দুমাত্র আত্মসুখের জন্য নয়, সমস্তই কৃষ্ণসুখের জন্য।

নিজেন্দ্রিয় সুখবাঞ্ছা নাহি গোপিকার।
কৃষ্ণে সুখ দিতে করে সঙ্গম বিহার ॥

অথবা

সখীর স্বভাব এক অকথ্য কথন।
কৃষ্ণসহ নিজ লীলায় সখির নাহি মন ॥
কৃষ্ণসহ রাধিকার লীলা সে করায়।
নিজ কেলি হৈতে তাহে কোটীসুখ পায় ॥

এই অত্যাশ্চর্য প্রেম তাই অলৌকিক। এ প্রেম দুর্লভ। গোপীভাব বা রাগানুগাভক্তির প্রকৃষ্ট প্রকাশ হয়েছে রাসলীলায়। গোপীভাব বা রাগানুগাভক্তির শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশই রাসলীলার উপজীব্য, তাই এতে গোপী-ছাড়া আর কারও প্রবেশাধিকার নাই। শ্রুতিরা গোপীদের অনুগত হয়ে বাহ্যান্তরে গোপীদেহ লাভ করে র সক্রীড়ার অধিকার পান।

রাসোৎসবে কৃষ্ণভুজদণ্ডে আলিঙ্গিতা লব্ধকামা ব্রজসুন্দরীগণ যে প্রসাদ লাভ করেছিলেন পদ্মিনী সুরললনাগণের শ্রেষ্ঠা নারায়ণ বক্ষ-স্থলস্থিতা লক্ষ্মীদেবীও তাহা প্রাপ্ত হন নাই। এই গোপীভাবই সাধনার তৃতীয়াবস্থা। একমাত্র গোপীগণই বলতে পারেন "স ত্বে বাহং" অর্থাৎ তুমিই আমি। এ অহংগ্রহ নয়, রাসে কৃষ্ণহারা গোপীগণে এটি প্রত্যক্ষীভূত হয়েছে। গোপিকাসহ রাধা কৃষ্ণের লীলা এমনি করে এক সমুচ্চ দার্শনিক স্তরে উন্নীত হয়েছে এবং এর বীজ বা অঙ্কুর রয়েছে শ্রীমদ্ভাগবতে।

"গোপজাতি কৃষ্ণ গোপী প্রেয়সী তাঁহার।
দেবী বা অন্যস্ত্রী কৃষ্ণ না করে অঙ্গীকার ॥
লক্ষ্মীচাহে সেই দেহে কৃষ্ণের সঙ্গম।
গোপীরাগানুগা হয়ে না কৈল ভজন ॥

অন্যদেহে না পাইয়ে রাস বিলাস।
অতএব নায়ং শ্লোকে কহে বেদব্যাস ॥

(২)

নায়ং শ্রিয়োঽঙ্গ উ নিতান্তরতেঃ প্রসাদঃ।
স্বর্যোষিতাং নলিনীগন্ধরুচাং কুতোঽন্যাঃ ॥
রাসোৎসবেঽস্য ভুজদণ্ডগৃহীত কণ্ঠ
লব্ধশিষাং য উদ্গাদ্ ব্রজবল্লবীনাম ॥ (১০।৩৭।৬০)

রাসোৎসবে আপনভুজদণ্ডে ব্রজবল্লবীদের কণ্ঠ আলিঙ্গন করে নৃত্যরত শ্রীকৃষ্ণের টেরাকোটা-চিত্র বিরাজ করছে শ্যামরায় মন্দিরের পূর্বদিকের ত্রিখিলান প্রবেশ পথের দুপাশের দেওয়ালে রাসচক্র সহ। (এই গ্রন্থে ঐ চিত্রের ছবি দেওয়া হল) চিত্রগুলি যেন উপরোক্ত শ্লোকেরই প্রতিরূপ। এমন কি শ্রীকৃষ্ণের আজানুলম্বিত ভুজদ্বয় বিশেষ গুরুত্বের সঙ্গে নির্মাণ করা হয়েছে। অন্যত্র নানা শ্লোকে এই আজানুপ্রলম্বিত বাহুকে অহি বা সর্পরাজের সঙ্গেও তুলনা করা হয়েছে দেখা যায়। রাসস্থলী থেকে কৃষ্ণের অন্তর্ধানকে কেন্দ্র করে গোপীদের তীব্র বিরহ বেদনা যে ভাবে প্রকাশ পেয়েছিল তা অলৌকিক প্রেমেরই অভিব্যক্তি। গোপীবিলাপের টেরাকোটাগুলি রয়েছে শ্যামরায় মন্দিরের দক্ষিণ দিকের ত্রিখিলান প্রবেশ দ্বারের মাঝের দুটি পূর্ণস্তম্ভের বাঁদিকের (প্রবেশ পথের) স্তম্ভটির নীচের দিকে।

আগেই বলা হয়েছে, যে প্রায় চল্লিশটি রাসমণ্ডলের টেরাকোটা-চিত্র বসিয়ে মন্দিরটিকে রাসলীলার উদ্দেশে যেন নিবেদন করা হয়েছে। শুধু তাই নয় গোপীদের আত্মনিবেদন বা শরণাগতির বিশিষ্ট ভাবটির ব্যঞ্জনাবাহী আরও একাধিক চিত্র সন্নিবেশিত হয়েছে এই মন্দিরে। এই মন্দিরের দক্ষিণদিকের (বারান্দা থেকে) সুড়ঙ্গ পথ দিয়ে গর্ভগৃহে প্রবেশের মুখে মাথার উপরে "গজেন্দ্রমোক্ষ" বা "গজেন্দ্র গ্রাহ" টেরাকোটা চিত্রটি গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের গোস্বামী সিদ্ধান্তের এক বিশিষ্ট অভিব্যক্তির ভাবানুরঞ্জিত। 'শরণাগতির' এক বিশিষ্ট ব্যঞ্জনা বহন করছে এই টেরাকোটা চিত্রটি। শ্যামরায় মন্দিরের দক্ষিণের বারান্দা থেকে সুড়ঙ্গ পথে গর্ভগৃহে প্রবেশ পথের মাথায় খচিত ঐ গজেন্দ্র মোক্ষ' টেরাকোটা-চিত্রটি যেন রূপগোস্বামী সংকলিত

পদ্যাবলীর নিম্নলিখিত শ্লোকেরই চিত্ররূপ

অতন্দ্রিতচমূপতিপ্রহিতহস্তমস্বীকৃত
প্রণীত মণিপাদুকং কিমিতি বিস্মৃতান্তঃপুরং।
অবাহনপরিচ্ছদং পতগরাজমারোহতঃ
করিপ্রবরবৃংহিতে ভগবত স্তরায়ৈ নমঃ ॥ ৫০ ॥
দাক্ষিণাত্যস্য ॥ ৫ ॥
দ্রৌপদীত্রাণে তদ্বাক্যং ॥ ···· ····

গজেন্দ্র স্তব করিলে পর ভগবান অনলস সেনাপতির বিস্তৃতহস্ত ও মণিপাদুকা স্বীকার না করিয়া কে আমাকে হঠাৎ আহ্বান করিল, আমি শীঘ্র সেইস্থানে গমন করিব, এই বলিয়া অন্তঃপুর বিস্মৃত হওত বাহন ও পরিচ্ছদ পরিত্যাগ পূর্বক গরুড়ের উপর ভগবান যে ত্বরায় আরোহণ করেন সেই ত্বরাকে নমস্কার ॥ ৫০ ॥ এই শ্লোক কোন দাক্ষিণাত্য পণ্ডিতের। দ্রৌপদীত্রাণেও একই ত্বরায় শ্রীকৃষ্ণ শরণাগতা দ্রৌপদীকে সভাস্থলে দুর্মতিদুঃশাসনের বিবস্ত্র করার ঘৃণ্য প্রয়াস থেকে রক্ষা করেছিলেন। পদ্যাবলীর ৫১ নং শ্লোকে (উপরোক্ত শ্লোকের পরবর্তী শ্লোকে) এই ব্যঞ্জনাই প্রকাশ পেয়েছে। বলা হয়েছে যিনি অন্ধকারে উদয়শীল সূর্যের মত, জলমগ্নগণের নৌকার মত, তৃষিত-ব্যক্তিদের অমৃতবর্ষী মেঘের মত নির্ধনব্যক্তির নিধির মত এবং তীব্র দুঃখ রূপ রোগ সকলের সদ্বৈদ্যতুল্য, সেই শ্রীকৃষ্ণ আমাদিগকে কুশল দিবার নিমিত্ত আগমন করিতেছেন।

রাসস্থলীতে আগত গোপীদের আত্মনিবেদন বা শরণাগতির ভাবটিই শ্যামরায় মন্দিরের 'গজেন্দ্র-মোক্ষ' টেরাকোটা চিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। শ্যামরায় মন্দিরের পশ্চিমের বারান্দার বড় আকারের গজ-কচ্ছপের যুদ্ধ চিত্রটিও ভাবের দিক থেকে প্রায় সমগোত্রীয়।

শ্রীমদ্ভাগবতের অনুসরণে 'শ্রীগীতগোবিন্দম্' এও গোপীদের শরণাগতির একই চিত্র আঁকা হয়েছে।

বিপুলপুলকভুজ পল্লববলয়িতবল্লব যুবতি সহস্রম্
করচরণোরসি মণিগণভূষণকিরণবিভিন্নতমিস্রম্ ॥

পুলকে বিপুল তাঁর ভুজপল্লবে আজ বাঁধা পড়েছে সহস্রবল্লব যুবতী করেতে কংকণ চরণে নূপুর মেখলায় মণিহার—আলিঙ্গনের ছন্দে

উঠে দুলে, ঠিকরে পড়ে আলো, রতন ভূষণের আলো। সে আলোয় ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় কুঞ্জের আঁধার।

বলাবাহুল্য 'গজেন্দ্র মোক্ষ' উত্তরপ্রদেশের দেওগড়ে অবস্থিত গুপ্তযুগের ষষ্ঠশতকের একটি উল্লেখযোগ্য ভাস্কর্য নিদর্শন। তবে শ্যামরায় মন্দিরের টেরাকোটাটি যে দেওগড় বা ঐজাতীয় ভাস্কর্য নিদর্শনের অনুসরণ নয়, গোস্বামী গ্রন্থেরই ভাবাশ্রিত তা এর কম্পোজিশনের বিষয়বস্তুতেই বোঝা যায়। দেওগড়ের চিত্রে হস্তীর পায়ে জড়িয়ে আছে একটি সাপ বা ঐজাতীয় সরীসৃপের মত কোন প্রাণী গোস্বামী শ্লোকে পরিস্কার কুমীরের কথাই বলা হয়েছে। রূপ-গোস্বামীর সংকলিত পদ্যাবলীর আর একটি পদেও এই গজেন্দ্র-গ্রাহ বিষয়টিকে সংসার সলিলে চিন্তাসূত্রবন্ধ চিত্তের প্রতীকরূপে বর্ণনা করতে দেখা যায়।

সংসারাম্ভসি সংভৃত ভ্রমভরে গভীরতাপত্রয়
গ্রাহেণাভিগৃহীতমুগ্রগতিনা ক্রোশন্তমন্তর্ভয়াৎ। ...

হে হরে! অতিশয় ভ্রমপূরিত সংসার সলিলে চিন্তাসূত্রবন্ধ আমার চিত্তরূপ হস্তীশ্রেষ্ঠ উগ্রগতি তাপত্রয়স্বরূপ গ্রাহ (কুম্ভীর) কর্তৃক গৃহীত হইয়া অন্তর্ভয়ে চীৎকার করিতেছে। বলাবাহুল্য শ্যামরায় মন্দিরের গজেন্দ্রমোক্ষ চিত্রটিতে একটি কুমীর কর্তৃক আক্রান্ত গজেন্দ্রের চিত্রই লক্ষ্য করা যায়। স্বাভাবিকভাবেই মনে হয়, শ্যামরায় মন্দিরের টেরাকোটা চিত্রটিতে সুস্পষ্টভাবে পদ্যাবলী বা বৃন্দাবন-গোস্বামীদের চিন্তাই প্রতিফলিত হয়েছে।

শুধু এ ক্ষেত্রেই নয় এমন একাধিক টেরাকোটা চিত্র শ্যামরায় আর জোড়বাংলায় রয়েছে যেগুলিতে গোস্বামী চিন্তার সুস্পষ্ট ছায়াপাত অনুমান করা অসঙ্গত নয়।

শ্যামরায় মন্দিরের দক্ষিণদিকের ত্রিখিলান প্রবেশদ্বারের ডানদিকের দেওয়ালে বিরাট রাসমণ্ডলের নীচে শ্রীকৃষ্ণের বেনুবাদরত একগুচ্ছ চিত্রের পাশাপাশি কিছু চিত্রে রাধার অধরসুধা পানোন্মুখ শ্রীকৃষ্ণের একাধিক টেরাকোটা চিত্র দেখা যায়। এ যেন রূপ গোস্বামী সংকলিত পদ্যাবলীর মঙ্গলাচরণেরই চিত্ররূপ।

নমো নলিননেত্রায় বেণুবাদ্য বিনোদিনে।
রাধাধরসুধাপানশালিনে বনমালিনে॥

যাঁহার লোচনযুগল কমলসদৃশ, যিনি বেণুবাদ্য ক্রীড়ায় তৎপর এবং যিনি শ্রীরাধার অধরসুধাপানে অনুরক্ত সেই বনমালিকে নমস্কার।

জয়দেবের মঙ্গলাচরণেও রাধাধর-সুধাপানে পরিতৃপ্ত বনমালীর মুখের হাসিতে সব অমঙ্গল দূর হয়ে যাওয়ার প্রার্থনা রয়েছে।

রাসোল্লাসভরেণ বিভ্রমভৃতামাভীরবামভ্রুবাম্

অভ্যর্ণে পরিরভ্য নির্ভরমুরঃ প্রেমান্ধয়া রাধয়া।

সাধু-ত্বদ্বদনং সুধাময়মিতি ব্যাহৃত্য গীতস্তুতি

ব্যাজাদুদ্ভটচুম্বিতঃ স্মিতমনোহারী হরিঃ পাতু বঃ ॥ ৪৯ ॥

রাসোল্লাসে বিহ্বলা গোপীদের সামনেই প্রেমান্ধ শ্রীমতী বাহুপাশে বন্ধ করেন মাধবকে। শ্রীমতীর মুখের দিকে চেয়ে স্তুতিছলে বলেন মাধব—সুধার ভাণ্ডার ঐ তব শ্রীমুখ অধরে তুলে নেন সে সুধার ভার তখন পরিতৃপ্ত মাধবের মুখে ফুটে উঠে যে হাসি সেই হাসির আলোয় দূর হোক সব অকল্যাণের ভার।

নৃত্যগীত আর আত্মনিবেদনে কৃষ্ণসেবা 'রাগানুগা' ভক্তির শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। শ্যামরায় মন্দিরের দক্ষিণের (ত্রিখিলান প্রবেশপথের ডানদিকে) দেওয়ালে এমনি বেণুবাদনরত এবং শ্রীরাধার অধরসুধা-পানোন্মুখ শ্রীকৃষ্ণের একাধিকচিত্র (দক্ষিণের দেওয়ালে ডানদিকে বৃহদাকার রাসমণ্ডলের নীচে) লক্ষ্য করা যায়। রাগ-অনুরাগে সাধনার বিশিষ্ট অভিব্যক্তি আনন্দ-পুলকাশ্রিত নর্তনধর্মী চিত্রমালায়। কৃষ্ণ প্রীত্যর্থে নৃত্যগীত রাগানুগার অন্যতম প্রকাশ মাধ্যম। শ্যামরায় ও জোড়বাংলায় অসংখ্য নৃত্যগীতের চিত্র এই বিশিষ্ট সাধনারই সাক্ষ্য বহন করছে। কৃষ্ণলীলার চিত্র-ভাস্কর্য বিশেষভাবে নর্তনধর্মী। এমনকি রূপারোপের ক্ষেত্রে চিত্র-ভাস্কর্যগুলির অধিকাংশই এক লয়ের মূর্ছনায় ছন্দিত। কৃষ্ণলীলার ধাতুপ্রকৃতিই তাঁর চিত্ররূপের স্টাইলটির নিয়ামক। গীতগোবিন্দের শ্লোকগুলির নীরব অনুরণনকে দৃশ্যমান করে তোলার প্রবল প্রয়াস কৃষ্ণলীলা চিত্রগুলিকে বিশেষভাবে এক সাঙ্গীতিক রূপবন্ধে বেঁধেছে। নৃত্যগীত এ লীলা প্রকাশের শ্রেষ্ঠ অভিব্যক্তি। রাগানুগা সাধনের রূপকই যেন এই নৃত্যগীত। একথার সমর্থন পাওয়া যায় ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর (রাগানুগা ভক্তির

দৃষ্টান্তস্বরূপ) নিম্নলিখিত শ্লোকটিতে—

ইত্থং মনোরথং বালা কুর্ব্বতী নৃত্য উৎসুকা ।
হরিপ্রীত্যা চ তাং সর্ব্বাং রাত্রিমেবাত্যবাহয়ৎ ॥
(ভক্তিরসামৃতসিন্ধু । পূর্ব ৩য় লহরী)

এই প্রকার মনোরথ করিতে করিতে সেই নৃত্যোৎসুকা কিশোরী শ্রীহরির প্রীতির জন্য নৃত্য করিয়া সমস্ত রাত্রি অতিবাহিত করিয়াছিলেন ।" টীকায় বলা হয়েছে— "মনোরথ পূর্বকনৃত্যমত্র রাগানুগা……… " ইত্যাদি । যে ভাব বিনাসাধনে সহসা উৎপন্ন হয় তাহাকে কৃষ্ণ-তদ্ভক্তপ্রসাদজ ভাব বলে । আগেই বলা হয়েছে যে, বৈধী ও রাগানুগ মার্গভেদে 'সাধনাভিনিবেশজ' ভাব দুই প্রকার । নৃত্যরতা বালা সম্পর্কিত উপরোক্ত শ্লোকটি রাগানুগ সাধনাভিনিবেশজ ভাব বা "শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদজভাব" এর দৃষ্টান্ত ।

রাগমার্গের এই বিশিষ্ট সাধনা একই সঙ্গে ধর্ম এবং শিল্পকলার বাহন । শৃঙ্গাররসাত্মক এই ভক্তিসাধনা সর্বতোভাবে কলামার্গকে অবলম্বন করে রূপ-রস-গন্ধে পরিপূর্ণ এক ভাবের জগৎ সৃষ্টি করেছে যা সীমা অসীমের মধ্যবর্ত্তী হয়ে একদিকে যেমন ম্যনবিক রসতৃষ্ণা চরিতার্থ করেছে অন্যদিকে তেমনি অধ্যাত্মভাবে আবিষ্ট হয়ে অসীমে উধাও হয়েছে । বৈষ্ণবের কৃষ্ণপ্রসঙ্গ প্রায় সর্বত্রই রূপরসে অভিব্যক্ত হতে চেয়েছে । শ্রীমদ্ভাগবতে বৈষ্ণবের সারতত্ত্ব ব্যক্ত হয়েছে রাসনৃত্যে । গোপীরা বিশুদ্ধ শাস্ত্রীয় সঙ্গীত বা ধ্রুপদ গেয়ে কৃষ্ণের প্রীতি সম্পাদন করেছেন । শ্রীরাধিকার অধরসুধা পানোন্মুখ বা রাধাধর সুধাপানে পরিতৃপ্ত শ্রীকৃষ্ণের উজ্জ্বল মুখমণ্ডলেরই জয়ধ্বনি করা হয়েছে মঙ্গলাচরণে । শৃঙ্গাররসাত্মক ভক্তির এই বিচিত্র সাধনায় কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে লাস্যময়ী গোপিকার আত্মনিবেদনই সর্বসাধ্যসার । নৃত্যগীতে উজ্জ্বল রসের প্রকৃষ্ট প্রকাশ । তাই নৃত্যগীতই এই সাধনার শ্রেষ্ঠ মাধ্যম । যেখানেই কৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গ সেখানেই নাচ ।

শ্রীমদ্ভাবতের তত্ত্ব শ্রীগীতগোবিন্দে যে বিশিষ্ট রূপলাভ করেছে তাতে ধর্ম আর শিল্প অবিনাবদ্ধ । গীতের মাধ্যমে গোবিন্দলীলামৃত পরিবেশন করেছেন জয়দেব অসামান্য দক্ষতায় । প্রতিটি শ্লোকে কৃষ্ণলীলার রূপারোপে চিত্রের সঙ্গে নৃত্যগীতের অদৃশ্য উপস্থিতি ।

এক একটি শ্লোক তাই এক একটি উৎকৃষ্ট উজ্জ্বল মিনিয়েচার'। গীতগোবিন্দে জয়দেব এক নূতন 'কৃষ্ণ-কাল্টের' প্রতিষ্ঠা করেছেন বলে অনেকে মনে করেন।[৩৬] তাঁরা বলেন শ্রীগীতগোবিন্দে উদ্বেলিত যৌবনান্দে হর্ষোৎফুল্ল উল্লাসিত এক কৃষ্ণকে জয়দেব আবিষ্কার করেছেন। নৃত্য-গীতেই যাঁর আনন্দ। তাই গীতগোবিন্দকে কেন্দ্র করে শত শত মিনিয়েচার চিত্রের জন্ম হয়েছে। 'মিনিয়েচার-চিত্রকলার' ক্ষেত্রে জয়দেবের গীতগোবিন্দের অবদান কম নয়। উজ্জ্বল এবং মধুররসের চিত্রগুলিতে নৃত্যগীতিময় আবেদন সৃষ্টি করে জয়দেব মিনিয়েচার চিত্রকলার এক প্রশস্ত ভিত্তিভূমি রচনা করেছেন। কি কৃষ্ণ কর্ণামৃত, কি গীতগোবিন্দ উভয় ক্ষেত্রেই কৃষ্ণলীলাকে চাক্ষুষদর্শন করে বর্ণনার পদ্ধতিটি অবলম্বন করেছেন লীলাশুক এবং জয়দেব। জয়দেবে দর্শনযোগ্য করে ছবি আঁকার প্রবণতা সমধিক। শুধু দর্শনীয় করেই নয় ধ্বনিময় এক সাঙ্গীতিক আবেদন যুক্ত করে চিত্র-গুলিকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলতে চেয়েছেন জয়দেব। জয়দেবের কথা বলতে গিয়ে ডঃ সুশীল কুমার দে তাঁর গ্রন্থে এই দিকটি তুলে ধরেছেন।[৩৭] তাই বলা যেতে পারে জয়দেব তাঁর কাব্যে শুধু এক নূতন কৃষ্ণকেই আবিষ্কার করেন নাই, কৃষ্ণকথা বর্ণনার নূতন এক রীতিরও আবিষ্কার করেছেন। ছন্দে-সঙ্গীতে কৃষ্ণলীলা বর্ণনার ক্ষেত্রে তাই জয়দেবের অবদান অভিনব। ছন্দের প্রকৃষ্ট প্রকাশ নৃত্যে; তাই কৃষ্ণলীলার সঙ্গে নৃত্যের সম্পর্ক যেন সহজাত। শুধু প্রাচীনকালে নয় আধুনিক কবি মধুসূদন রাধাকৃষ্ণলীলা আস্বাদন করতে চেয়েছেন জয়দেবেরই মাধ্যমে। মধুসূদনের কবিতাতেও রাধাকে বামে নিয়ে শিখিপুচ্ছ চূড়াশিরে নৃত্যশীল কৃষ্ণের বর্ণনাই লক্ষ্য করা যায়।

---

36. Gita Govlnda has thus became the new testament of the cult of other Krishna the youthful krsna who had brought Joy and mirth, love and bliss to spread over the whole of the subcontinent giving a a new direction to the Vaisnava cult."—"Aspect of Art And Culture" S. K. Saraswati Commemoration Volume : Editors Jayanta Chakraborty & D. C. Bhattacharyya Riddhi India. Calcutta

চল যাই জয়দেব গোকুল ভবনে
তব সঙ্গে, যথারঙ্গে তমালের তলে
শিখিপুচ্ছ চূড়াশিরে, পীতধড়া গলে,
নাচে শ্যাম বামে রাধা সৌদামিনী ঘনে।
না পাই যাদবে যদি, তুমি কুতূহলে
পূরিও নিকুঞ্জরাজি বেণুর স্বননে।

নৃত্যগীতে নিবেদিত কৃষ্ণলীলা আর জয়দেব যেন অভিন্ন। পরম-বৈষ্ণব হরিদাস স্বামীর (ষোড়শ-শতক) একটি গান বিষ্ণুপুরে গাওয়া হয়। এখানেও ত্রিভঙ্গ শ্রীকৃষ্ণের নৃত্যমূর্তির বর্ণনা। ভীমপলশ্রী রাগে, তেওরা তালে দ্রুতগতির এই গানটি হল—

নাচত ত্রিভঙ্গ য়ে নন্দনন্দন বৃন্দাবন যমুনাতট
অমিত মনমথ মদবিমর্দন মৃদুল অভিনব জলদ সুন্দর অঙ্গ।....

তাই বলা যায় যেখানে কৃষ্ণলীলা সেখানেই নৃত্যগীত ও ছন্দ। ত্রিভঙ্গ শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গভঙ্গিতেই এক ছন্দিত আবেদন। কৃষ্ণলীলার ধাতুপ্রকৃতিতেই নৃত্য এবং সঙ্গীতের একত্র স্থিতি।

বিষ্ণুপুরের মন্দির-টেরাকোটাতেও নৃত্যগীতের অসংখ্য চিত্রের মাধ্যমে কৃষ্ণলীলা রূপলাভ করেছে। নানা ধরণের নৃত্য নানা ধরণের মুদ্রা। নানা বাদ্যযন্ত্রেরও বর্ণাঢ্য উপস্থিতি। জোড়বাংলার দক্ষিণের বারান্দায় শত শত নৃত্য চিত্র ছাড়াও শ্যামরায়-জোড়বাংলার নানাস্থানে মন্দির টেরাকোটায় নাচের ছবি অগণিত। এগুলির মাধ্যমে মন্দিরের

---

37. Jayadev's achievement lies more in direction of forms than in the subject of his poems. It presents hardly any new ideas, it scarcely describes any situation or emotion which earlier love poets have not familiarized ....but in pictorial and musical effect, which brings out underlying emotions in a perfect blending of sound and sense his work is a beautiful and finished production." Indian Erotics And Erotic Literature. Dr. Sushil Kumar De. Page 55—56.

সর্বাঙ্গে যেন ছন্দ আর লয়ের হিল্লোল বইয়ে দিতে চেয়েছেন শিল্পী। টেরাকোটা টালিতে উদ্গতমূর্তিচিত্রগুলির কোন স্বতন্ত্র বা পৃথক আবেদনের পরিবর্তে শিল্পী সুরও ছন্দের এক উচ্ছ্বসিত সামগ্রিক আবেদনে যেন বাঁধতে চেয়েছেন বিভিন্নধর্মী চিত্রগুলিকে। শিকারীরা শিকার করে ফিরছেন সেখানেও ছন্দের আমেজ। সর্বত্র ছন্দ আর লয়ের উজ্জ্বল বিস্তার। আগেই বলা হয়েছে, নৃত্য চিত্রের মুদ্রায়, ভঙ্গিমায় যেমন আকর্ষণীয় বৈচিত্র্য, সহযোগী বাদ্যযন্ত্রেরও তেমনি অসংখ্য প্রকারভেদ। বীণা, মুরলী, ঢোল, খঞ্জনী মৃদঙ্গ। বীণাই একাধিক রকমের। মূর্তিচিত্রগুলির অঙ্গের বসন-ভূষণও ছন্দ-মাত্রা-লয়কে সযত্নে রক্ষা করে সুচারুরূপে বিন্যস্ত হয়েছে। সারেঙ্গী আর মালা হাতে সুফীসাধকদের চিত্রগুলিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কারণ নৃত্যগীতে ঈশ্বরউপাসনা সুফীমতেও প্রচলিত। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের উপর সুফী প্রভাবের সাক্ষ্যই হয়ত এই চিত্রগুলি বয়ে বেড়াচ্ছে। সুফী সাধকদের চিত্র মোগল-চিত্রকলায় কম নেই।[৩৮]

যাইহোক, আগেই বলা হয়েছে, কলা মার্গের বৈষ্ণবধর্মে কৃষ্ণ-লীলার বর্ণনায় ধর্ম আর শিল্পকলা প্রায় সর্বত্রই হাতধরাধরি করে চলেছে। এই লীলাচিত্রণে নাট্যশাস্ত্র ও সঙ্গীতশাস্ত্রকে বৈষ্ণব আচার্যরা সম্যকভাবে অবলম্বন করেছেন 'রসের উল্লাস সৃষ্টির জন্য এবং রাগা-নুগা'র ইঙ্গিতকে মূর্ত করার অভিপ্রায়ে। গীতাবলীর ১৩ সংখ্যক গীত বা শ্লোকে নৃত্যশীল কৃষ্ণকে কলাকুশলী বা কলা সম্বন্ধে সুপণ্ডিত বলা হয়েছে।

মণ্ডিতহল্লীশকমণ্ডলাং
নটয়ন রাধাং চঞ্চলকুণ্ডলাং ।
নিখিলকলাসম্পদি পরিচয়ী
প্রিয়সখি পশ্য নটতি মুরজয়ী ॥

(হে প্রিয় সখি, দেখ নিখিল কলাসম্পদে সুপণ্ডিত মুরজয়ী শ্রীকৃষ্ণ রাসমণ্ডলস্থিতা চঞ্চলকুণ্ডলা রাধাকে নৃত্য করাইতে করাইতে স্বয়ং নাচিতেছেন।)

সুগভীর রাধাপ্রেমের উদ্দীপনায় উল্লসিত কৃষ্ণ নিজেকে নটের সঙ্গে তুলনা করেই বিচিত্র ঐ প্রেমচাঞ্চল্যের প্রকৃতিকে প্রকাশ করেছেন।

শ্রীরাধার প্রেমগুরু আমি শিষ্য নট।
সদা মোরে নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট ॥
অথবা
কৃষ্ণেরে নাচায় প্রেমা ভক্তেরে নাচায়।
আপনে নাচয়ে তিনে নাচে এক ঠাঁই।

রাধিকার প্রেমই শ্রীকৃষ্ণকে নাচায়। নৃত্যের মধ্যে আছে এক আনন্দের আত্মপ্রকাশ। রাধিকা শুধু কৃষ্ণের শক্তি নন— হ্লাদিনী শক্তি। শ্রীকৃষ্ণের আনন্দদায়িনী এই শক্তি সর্বদা কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে আত্মনিবেদিত। বিষ্ণুপুরের টেরাকোটা মন্দিরগুলিতে নৃত্যচিত্রের প্রকারভেদ আর সংখ্যাধিক্য গৌড়ীয় লীলাদর্শনের এই মতাদর্শকেই বিশেষভাবে প্রকটিত করে। রাধা প্রশ্ন করেছেন-কৃষ্ণকে নৃত্য শেখায় কে? উত্তর এসেছে— 'প্রতি তরুলতার পশ্চাতে তোমার যে প্রতিমূর্তি বিরাজ করছে, তাই কৃষ্ণকে নৃত্যশিক্ষা দেয়।"(বাংলার সাধনা ঃ ক্ষিতি-মোহন সেন)

শুধু কৃষ্ণলীলা চিত্রণের এক প্রকৃষ্ট মাধ্যমরূপেই নৃত্যকে গ্রহণ করা হয় নাই, শ্রীপতির অগ্রে করতালি দিয়ে নৃত্য করা যেকোন ভক্তের পক্ষে পুণ্যকর্ম বলে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতেও নির্দেশিত হয়েছে—

নৃত্যতাং শ্রীপতেরগ্রে তালিকাবাদনৈর্ভৃশম্।
উড্ডীয়ন্তে শরীরস্থাঃ সর্বে পাতকপক্ষিণঃ ॥ ১২৬ ॥

(যাঁহারা করতালি সহকারে শ্রীপতির অগ্রে পুনঃ পুনঃ নৃত্য করেন, তাঁহাদের শরীরস্থ পাপরূপ পক্ষিসকল উড়িয়া পলাইয়া যায়)।

---

38. "Devine worship by means of songs and chants and with music nothing new in India. But an almost franzid worship through sining music and dancing seems to have been a new thing in the mediaeval religious life of India, Particularly in vaisnava Bengal; and although I do not insist that here we have an incidence of influence from sufism on Bergal Vaisnavism........' Islamic Mysticism, Iran & India P. P. 29. INDO-IRANICA.

জোড়বাংলা-মন্দিরের দক্ষিণের বারান্দায় যে শতাধিক নৃত্য-চিত্র রয়েছে, 'করতালি-মুদ্রা' তার অনেকগুলিতেই লক্ষ্য করা যায়। শুধু তাই নয়, বৃন্দাবনের নিসর্গেও নৃত্যের প্রভাব সঞ্চারিত হয়েছে, দেখা যায়। ব্রজের নরনারী তো বটেই জীববন্তু এমনকি বৃক্ষ-লতাও যেন কৃষ্ণপ্রেমে আপ্লুত। কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর বৃন্দাবনের সহকার বৃক্ষের 'শাখার দ্বারা নৃত্যের' উল্লেখে মানবিক প্রতিক্রিয়াই ধরা পড়েছে একটি শ্লোকে। (নৃত্যন্ বায়ুবির্ঘূর্ণৈতৈঃ সুবিটপৈগ্রায়ন্নলীনাং রুতৈঃ........ইত্যাদি)। যার বঙ্গানুবাদ করলে দাঁড়ায়— "হে মুকুন্দ, তোমাকে স্মরণ করিয়া বৃন্দাবনস্থ আম্রবৃক্ষ বায়ুবির্ঘূর্ণিত শাখা দ্বারা নৃত্য করিতেছে।"

গোপীভাবের নিবিড় বাতাবরণে ব্রজের সকলেই কৃষ্ণলীলার পরিকর।

বিরাজতীম্ অভিব্যক্তাংব্রজবাসিজনাদিষু।

রাগাত্মিকামনুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে॥

ব্রজবাসি পরিকরদের রাগমার্গের অনুসরণে যে ভক্তির উদয় হয়, তাই রাগানুগা ভক্তি। বৃন্দাবনের গাভীকুল, মৃগশ্রেণী সকলেই কৃষ্ণলীলার বিচিত্র ভাবপরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত। শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনিতে গোপী, ধেনু আর মৃগ সমানভাবেই আকৃষ্ট হয়।

সায়ং ব্যাবর্ত্তমানাখিলসুরভিকুলাহ্বানসঙ্কেতনামা
ন্যাভীরীবৃন্দচেতোহঠকরণকলাসিদ্ধমন্ত্রাক্ষরাণি।
সৌভাগ্যং বঃ সমন্তাদ্দধতু মধুভিদঃ কেলিগোপালমূর্ত্তেঃ
সানন্দাকৃষ্টবৃন্দাবনরসিকমৃগশ্রেণয়ো বেণুনাদাঃ॥৫॥

(যাহা সায়ংসময়ে ধেণুগণের পরাবর্ত্তন বিষয়ে সঙ্কেত নাম স্বরূপ ও গোপীগণের চিত্তহরণ বিষয়ে সিদ্ধমন্ত্রস্বরূপ এবং যদ্দ্বারা শ্রীবৃন্দাবনের রসজ্ঞ মৃগকুল পরমানন্দে আকৃষ্ট হইয়াছিল, হে ভক্তগণ! শ্রীকৃষ্ণের সেই বেণুধ্বনি তোমাদের সর্ব্বতোভাবে মঙ্গলবিধান করুন।

জোড়বাংলার পশ্চিমদিকের ভিত্তিসংলগ্ন টেরাকোটা চিত্রে বেণুবাদনরত শ্রীকৃষ্ণের অনুসরণ করে গাভীগণের গোষ্ঠ থেকে প্রত্যাবর্ত্তনের প্যানেলটিতে সারিবদ্ধ গোপীদের উপস্থিতিও লক্ষ্য করা যায়। শ্যামরায় মন্দিরের দক্ষিণের দেওয়ালে বৃহদাকার -

রাসমণ্ডলের টেরাকোটা-চিত্রে বৃক্ষের বাঁশীতে আকৃষ্ট হয়ে রাসস্থলীতে সমাগত রসিক মৃগদের চিত্র সহজেই দর্শকের নজর কেড়ে নেয়। কৃষ্ণলীলার পাটাচিত্রেও অনুরূপ ভাবব্যঞ্জক প্রেক্ষাপট চোখে পড়ে। কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত চিত্র দেখা যায় জোড়বাংলার ভিত্তি সংলগ্ন প্যানেলের কিছু টেরাকোটা-চিত্রে। এগুলিতে দেখা যায়, নিরীহ হরিণদের উপর লাফিয়ে পড়ে তাদের উদর বিদীর্ণ করে রক্তলোলুপ নেকড়ে বাঘের দল উদর পূর্তি করছে। একান্ত বাস্তব হলেও কম্পোজিশনে এই বীভৎস বিকট আবেদন প্রধানতঃ অধ্যাত্ম-আদর্শে উদ্ভাসিত অঞ্চলের গভীর দার্শনিক চেতনা-নিয়ন্ত্রিত ভারতীয় নন্দনচিন্তার পক্ষে স্বাভাবিক নয়। বিশ্বচরাচরের আপাত বিচ্ছেদ-বিরোধ-হনন-সংহারের অন্তরালে মূলীভূত এক সৃষ্টিশীল আনন্দময় ঐক্যের অনুসন্ধানই তার নন্দনচিন্তায় গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। এ নন্দনচিন্তায় মূলতঃ সব রূপসৃষ্টিই ভাবাশ্রিত— বাস্তব জগতের প্রতিচ্ছবি নয়। রাজপুত চিত্রগুলিতে রাধাকৃষ্ণের রাসলীলার চিত্রগুলির প্রেক্ষাপটে দেখা যায় হরিণ-ময়ূর ছাড়াও বৃক্ষের উপর পাখী এমনকি মধুমক্ষিকাও অত্যন্ত যত্নের সঙ্গে আঁকা হয়েছে। চিত্রের মূলীভূত ভাবের আবেদন-প্রেক্ষাপটে প্রসারিত। দেবীযুদ্ধের হনন-সংহারের মধ্যেও সৃষ্টির ব্যঞ্জনা—সৃষ্টির শত্রু অসুর নাশ করে সৃষ্টি রক্ষার আবেদনই এখানে মাত্রা লাভ করেছে; তাই দেবীযুদ্ধের সংহার-লীলার নীচেই মাতৃকা-মূর্তিগুলি সন্নিবেশিত হয়েছে। বাৎসল্য রসাত্মক অন্যান্য চিত্রগুলিও লক্ষ্য করা যায় জোড়বাংলার পশ্চিম দেওয়ালে – স্কন্দমাতা-গণেশজননী, সন্তানক্রোড়ে দশরথ-কৌশল্যা-কৈকেয়ী-সুমিত্রা, অন্যত্র যশোদা-রোহিনী। রক্তলোলুপ নেকড়ে বাঘের এই হিংস্র লোলুপ চিত্রে বিশিষ্ট চিত্র-সমালোচকরা অভারতীয় প্রভাব অনুভব করেছেন। তাঁরা মনে করেন পারসিক বা ইংরাজ উপনিবেশিকদের চিত্রচিন্তার প্রভাব পড়েছে এগুলির উপর।[৩৯]

প্রায় অনুরূপ গোত্রের আর একটি টেরাকোটা-চিত্র দেখা যায় জোড়বাংলা মন্দিরের সামনের দিকের চালাটির ভিত্তিসংলগ্ন দক্ষিণ-পশ্চিম কোণার প্যানেলে। এক বাবুর্চি খানা তৈরীর জন্য এক হরিণের গ্রীবা-ছেদন করছে। পোষাক-আশাক চেহারায় বাবুর্চিটির জাতিগত

বৈশিষ্ট্য সুস্পষ্ট। আসলে বহিরাগত নানা জাতি-গোষ্ঠীর সমাগমে ও তাঁদের চর্চা-চিন্তার প্রভাবে আবর্তিত বিচিত্র মোগলভারতের প্রেক্ষাপট বিষ্ণুপুরের সতেরো-শতকের মন্দির-টেরাকোটায় স্বাভাবিক ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছে — এ ইঙ্গিত আগেও দেওয়া হয়েছে।

মোগল যুগের সামন্ত-জীবন—তাদের ভোগবিলাস, আমোদ-প্রমোদ ছাড়াও—বন্দুকধারী তুর্কী সৈন্য, ষাঁড়ের লড়াই, পালোয়ানদের কুস্তি-প্রদর্শনী — এ সবের মধ্য দিয়ে বিশেষভাবে এ যুগের সামন্ত ভাবধারার সুস্পষ্ট চিত্র তুলে ধরা হয়েছে। তাছাড়া পর্তুগীজ-উপদ্রবের মত মোগল যুগের কিছু রাজনৈতিক সমস্যাও টেরাকোটায় চিত্রিত করে একটি ঐতিহাসিক মাত্রা যোগ করা হয়েছে।[৪০]

---

39 In the Jor-bangla temple, there is an interesting frieze whose parallel is hardly to be found elsewhere. It shows fleeing deer closely followed by tigers. Here and there in this panel the tigers are seen overpowering their unfortunate victims. The scene speaks of such brute force that it cannot fit in the context in which the dominant note is an intense love of nature .... Calm and quiet contemplation raising our level of reverence, from the empirical to the ideal, from observation to vision, from an auditory sensation to audition decides what Indian art should be. Such an attitude cannot accomodate a theme like that the present one. It seems to be essentially alien in its origin and inspiration. It may either have come through the Mughuls whose art was largely influenced by Persia or through European settlers in India." – Foreign Influence on a Bishnupur Terracotta Panel (Foreigners In Ancient India And Laksmi And Sarasvati In Art And Literature) by D. R. Das. Calcutta University Publication.

অধিকাংশ টেরাকোটা-মন্দিরেই দেখা যায়, ভিত্তি-সংলগ্ন প্যানেল-গুলিতে সমসাময়িককালের ঘটনা-চিত্রণ একটি প্রচলিত রীতি। বিষ্ণুপুরের জোড়বাংলা মন্দিরের ভিত্তিসংলগ্ন আলোচ্য চিত্রগুলিও ঐ রীতিরই অনুবর্তন। তা সত্ত্বেও এগুলির গুরুত্ব অপরিসীম। এগুলির পিছনে একটি সমকালীন বাস্তব অভিজ্ঞতার উষ্ণ-প্রেরণা বর্তমান। মোগল যুগে, এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক অধ্যায়ে মল্লরাজধানীর বিকাশ। বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলি শাহজাহানের সমসাময়িককালে নির্মিত। গড়দরজা এবং রাসমঞ্চকে যদি বীর-হাম্বীরের কীর্তি বলে ধরা হয় তবে স্বচ্ছন্দে বলা যায়, মোগলযুগের বিষ্ণুপুরে আকবরের সমসাময়িককালেই মন্দির স্থাপত্যের এক বিস্ময়কর বিকাশই শুধু সূচিত হয় নাই, এটি এক গুরুত্বপূর্ণ সামন্ত-রাজধানীতেও পরিণত হয়েছিল। বলাবাহুল্য মল্লরাজা বীরহাম্বীর আকবরের প্রায় সমসাময়িক। জোড়বাংলার ভিত্তি-সংলগ্ন চিত্রগুলি অর্থহীন অনুকরণ মাত্র নয় — বিশেষভাবে এগুলি মল্লরাজাদের জীবন-যাত্রার চিত্র না হলেও এগুলি মোগলভারতে সামন্ত আভিজাত্যের প্রতীক। এই ধরণের জীবনযাত্রাকে ঘিরে সামন্ত জগতের সকলেরই আভিজাত্যাকাঙ্খা আবর্তিত হ'ত। না হলে বৈষ্ণব মন্দিরের গায়ে নির্দ্বিধায় এগুলি চিত্রিত হ'তনা।

পর্তুগীজ-উপদ্রব তো জোড়বাংলা মন্দিরের প্রায় সমসাময়িক কালেরই ঘটনা। শাহজাহানের সময়ে এই জোড়বাংলা মন্দির নির্মিত হয়। পর্তুগীজ উপদ্রব তখন প্রায় তুঙ্গে উঠেছে। জোড়বাংলা

---

৪০ মোগলযুগের একটি ঐতিহাসিক এবং রাজনৈতিক সমস্যা হয়ে উঠেছিল পর্তুগীজ-উপদ্রব। রাজ্যজয়, নৌবহরের অপ্রতিহত গতিবিধি, এবং বাণিজ্যিক ক্রিয়াকাণ্ডের মাধ্যমে ভারত তথা এশিয়ায় পর্তুগীজ-প্রতিপত্তি সতেরো-শতকে একটি বিশিষ্ট মাত্রালাভ করেছিল। যদিও এই শতকের মধ্যভাগ থেকেই এই প্রতিপত্তিতে ভাটার টান দেখা দিয়েছিল। পর্তুগীজদের "ক্রুশ-ক্রাউন-কমার্স" ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। অর্থনৈতিক এবং বাণিজ্যিক ক্রিয়াকর্মের এমন কোন শাখাই ছিলনা যাতে জেসুইট-পাদ্রীদের আধিপত্য না ছিল। এমনকি জেসুইট

মন্দিরের পশ্চিমদিকের অগ্রবর্তী দো-চালার ভিত্তি সংলগ্ন পাটিতে, ঠিক মাতৃকা-প্যানেলের নীচে টেরাকোটা ফলকে উৎকীর্ণ তিনটি পর্তুগীজ রণতরী, বলতে গেলে, ঐতিহাসিক দলিলের মর্যাদা লাভ করার যোগ্য। নৌকা তিনটির উপর সারিবদ্ধ বন্দুকধারী যোদ্ধার চিত্র। চিত্রগুলি তৎকালীন বাংলা তথা ভারতের একটি জাতীয় আতঙ্কের ইঙ্গিত বহন করছে বলেই মনে হয়। এগুলি মগ বা পর্তুগীজ জলদস্যুদের চিত্র হওয়াই স্বাভাবিক। সুদীর্ঘ কাল ধরে বাংলার উপকূল ভাগ মগ-পর্তুগীজদের অত্যাচারে সদা-শঙ্কিত ছিল। ষোড়শ সপ্তদশ শতকে এই আতঙ্ক বহুলাংশে বৃদ্ধি পেয়েছিল। আকবরের রাজ্যকালেই বাংলার উপকূল ভাগকে মগ আর পর্তুগীজ দস্যুদের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য 'পাহারাদার নৌবহর প্রতিষ্ঠিত হয়। মোগল যুগে, ঢাকা ছিল এই নৌবহরের প্রধান কেন্দ্র ; এপ্রসঙ্গে প্রখ্যাত

আধিপত্য পর্তুগীজ রাজশক্তির চেয়েও প্রবল ছিল। Portuguese India In The Midst Of Seventeenth Century (by C. R. Boxer Oxford University Press : (1980) তে বলা হয়েছে—Conquest Nagviation, and Commerce in practice so closely intertwined that they were insaparable—Cross and Crown, Throne and Altar, Faith and Empire, God and Mammon. As a Jesiut missionary wrote from Goa to a friend in Portugal in 1631, God's purpose in inspiring the Portuguese sea-borne trade, with India, was to increase the harvest of souls. But their relative importance varied with time place and circumstance. They can conveniently be considered in tripartite division which is a dopted here within the time-span 1640– 68.

বলাবাহুল্য সতেরো শতকের মধ্যভাগে (১৬৫৫ খ্রী) জোড়বাংলা মন্দির নির্মিত হয়। প্রায় সমসাময়িক কালে নির্মিত বাঁশবেড়িয়ার অনন্তবাসুদেব মন্দিরেও এমনি এক জলযুদ্ধের ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যায়।

ঐতিহাসিক রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায় তাঁর 'A History Of Shipping And Meritime Activity From The Earliest Times' গ্রন্থে লিখেছেন— The naval establishment at Dacca was necessitated by the depredations of Arakan pirates, both Magg and Feringi, who used constantly to come by the water route and plunder Bengal." মগ-ফিরিঙ্গি জলদস্যুদের অত্যাচারের কথা সমসাময়িক শিল্প-সাহিত্যে একটি বিশেষ মাত্রা লাভ করেছে দেখা যায়। এ থেকেই সমস্যাটির তীব্রতা সহজেই অনুভূত হয়। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে এর প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

ফিরিঙ্গির দেশখান বহে কর্ণধারে।
রাত্রিতে বাহিয়া যায় হারমাদের ডরে ॥

'হারমাদ' শব্দ পর্তুগীজ 'আরমাডা' শব্দেরই অপভ্রংশ।

জোড়বাংলার রণতরীর চিত্রগুলিতে যেন ঘটমান কোন যুদ্ধ বা সংঘর্ষের আভাস রয়েছে। বিপরীত দিকের (দৃশ্যপটে অদৃশ্য) শত্রুপক্ষের রণতরী থেকে নিক্ষিপ্ত গুলিতে আহত বা নিহত দস্যু বা সৈন্যরা জলে পড়ে কুমীরের আহারে পরিণত হচ্ছে। চিত্রটির কম্পোজিশনে নাটকীয়তা উল্লেখযোগ্য। কুমীর জাতীয় জলচর প্রাণীর চিত্রগুলি বড় নদী বা সমুদ্রের ইঙ্গিতবহ।

কিন্তু শুধু জলদস্যুতাই নয়, সপ্তদশ শতকে ধর্মপ্রচার-নৌবাণিজ্য-রাজ্যজয়ের মাধ্যমে (ক্রুশ-ক্রাউন-কমার্স) পর্তুগীজরা ভারত তথা এশিয়ায় যে প্রভাব বিস্তার করেছিল তাতে পর্তুগীজ-প্রসঙ্গ এক ঐতিহাসিক মাত্রা লাভ করে পাদপ্রদীপের সম্মুখে এসে পড়েছিল। জোড়বাংলা মন্দিরের রণতরীর (বাঁ দিক থেকে প্রথমটির) একটিতে, কোণার দিকে, একটি গীটারবাদনরত মৎস্যনরের চিত্র দেখা যায়। এই মৎস্যনরের চিত্রটি দেবদূতের মত সপক্ষ। আগেই বলা হয়েছে ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে বাংলা থেকে পর্তুগালে রপ্তানী-যোগ্য কাপড়ের পর্দায় গীটার হাতে মৎস্যনরের (আমেদাবাদের ক্যালিকো-মিউজিয়ামে সংরক্ষিত নিদর্শন দ্রষ্টব্য) চিত্র মুদ্রিত থাকত। এখানের পর্তুগীজ-রণতরীর টেরাকোটা-চিত্রের সঙ্গে

দেবদূতের অনুকরণে নির্মিত সপক্ষ-গীটার-বাদক মৎস্যনরের মূর্তিটিতে ধর্মীয় ইঙ্গিত আছে বলেই মনে হয়। কারণ দুই স্কন্ধে যুক্ত দুই পাখা দেবদূতের ক্ষেত্রেই দেখা যায়। উপরোক্ত ক্যালিকো মিউজিয়ামে সংরক্ষিত, একদা পর্তুগালে রপ্তানীযোগ্য বস্ত্রখণ্ডের নিদর্শনটিতে মুদ্রিত গীটারবাদক মৎস্যনরেদের স্কন্ধে কোন পাখা নাই। সর্বোপরি জোড়াবাংলার টেরাকোটায় উৎকীর্ণ গীটার-হাতে সপক্ষ মৎস্যনরের শিশুসুলভ কমনীয় মুখমণ্ডল দেবদূতেরই সমগোত্রীয়। পর্তুগীজদের সমস্ত ক্রিয়াকর্মে ক্রশ-ক্রাউন-কমার্স শুধু ওতপ্রোতভাবে জড়িতই ছিলনা, 'ক্রশ' বা খ্রীষ্টান মিশনারীর প্রভাবই ছিল সমধিক। পর্তুগীজ সম্রাটের চেয়েও চার্চ বা মিশনারীর প্রভাব দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল; পর্তুগীজ অধিকৃত ভারত তথা এশিয়ায় (Church had a most lasting influence than the crown – Portuguese India in the Mid-Seventeenth Century. C. R. Boxer Oxford University Press.) সপ্তদশ-শতকে পর্তুগীজ শক্তি যখন ভারতে একটি ঐতিহাসিক মাত্রা লাভ করেছিল, বলতে গেলে, প্রায় তখনই নির্মিত হয়েছিল এই জোড়বাংলা মন্দির। এ সময় অর্থাৎ শাহ্‌জাহানের রাজত্বকালে মোগল-রাজকীয় নৌবাহিনীকে মগ-পর্তুগীজদের প্রতিপত্তি খর্ব করতে একাধিকবার জলযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হয়েছে। জলযুদ্ধে পর্তুগীজদের গতি ছিল অপ্রতিহত। জয় হয়েছিল সহজলভ্য অবশ্যম্ভাবী ; এর কারণ তাদের নৌবাহিনীর শ্রেষ্ঠত্ব (The portuguese were largely successful in this venture, because of the superior power of their ships whose guns could blow most of the country ships of the the time out of water.)

পর্তুগীজরা তাদের উপকূলভাগের ঘাঁটিগুলি থেকেই আক্রমণ চালাত। হুগলীর এমনি একটি পর্তুগীজ-উপনিবেশকে শাহ্‌জাহান দমন করেছিলেন। হুগলী জেলার বাঁশবেড়িয়ার অনন্ত বাসুদেব মন্দিরেও (১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দ) এমনি নৌযুদ্ধের চিত্র আছে। এতবড় আকারের নয়—ছোট। এখানে সংঘর্ষ মুখোমুখি।

জাহাজ বা রণতরীর আকার-আয়তনও পৃথক। হুগলীর (বাঁশবেড়িয়া) অনন্তবাসুদেব মন্দিরের রণতরী গুলি যে ক্ষিপ্রগতি তা তাদের চেহারাতেই বোঝা যায়। এখানের মন্দিরের ভিত্তি-চিত্রে কিছু বিদেশী সৈনিকের চিত্রও লক্ষ্য করা যায়। এগুলি পর্তুগীজদেরও হতে পারে।

পর্তুগীজ জলদস্যু সিবাস্তিয়ান গঞ্জালেশের ৮০ খানি অস্ত্র-শস্ত্র বোঝাই রণতরী ছিল বলে শোনা যায়। বিষ্ণুপুর কিংবা বাঁশবেড়িয়ার মন্দিরে সমকালীন বঙ্গদেশের এক-জাতীয়-আতঙ্কের স্মৃতিকেই যেন শিল্পী মন্দিরগাত্রে ধরে রাখতে চেয়েছেন। চিত্রটি তখনকার দিনের একটি জীবন্ত স্মৃতিপট।

বিষ্ণুপুরের টেরাকোটা মন্দিরের অনন্য বৈশিষ্ট্য হল মন্দিরগাত্রে বিচিত্র বিষয় আর ঘটনার সমাবেশে এক বিশাল-বিরাট প্রেক্ষাপট রচনা। হাজার হাজার চিত্রিত টালি বসিয়ে এখানে যে টেরাকোটার জগৎ সৃষ্টি করা হয়েছে সেখানে শুধু পর্তুগীজ প্রসঙ্গই নয় ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের জাতীয় এমনকি আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পরিবর্তন-বিবর্তনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাও চিত্র রূপলাভ করেছে। এযেন সমকালীন ভারতের রাজনৈতিক আর সাংস্কৃতিক ইতিহাসের চিত্ররূপ। একদিকে মোগলভারতের বিচিত্র প্রেক্ষাপট অন্যদিকে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের সূত্রধরে আসা প্রাচীন ভারতীয় ক্লাসিক সংস্কৃতির পৌরাণিক বাতাবরণ। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের প্রেরণায় পুনরুজ্জীবিত ক্লাসিক সংস্কৃতির মাধ্যমে ভারতীয় সংস্কৃতির ধাতু প্রকৃতিটি যেমন একদিকে উন্মোচিত হয়েছে অন্যদিকে তেমনি মোগল সূত্রে আগত বহির্ভারতের আন্তর্জাতিক সংস্কৃতির আভাস বঙ্গদেশের প্রত্যন্ত প্রদেশে অবস্থিত বিষ্ণুপুরের মন্দিরগাত্রে এসে পৌঁছেচে। এযুগের বিরাট সংস্কৃতি জগতটির আভাসটুকু দেবার জন্যই শিল্পীকে টেরাকোটায়-চিত্রের এই বিরাট জগৎ রচনা করতে হয়েছে হাজার হাজার চিত্রিত টালির সমাবেশে। বৈচিত্র্যে এবং বিপুলতায় এজগৎ বিস্ময়কর।

তাই এখানের মন্দির-টেরাকোটায় ড্রাগনের চিত্র কিংবা নবনারী-কুঞ্জরের মত মোটিকগুলি বিস্ময়কর হলেও অর্থহীন বা অপ্রাসঙ্গিক নয়। মোগল-পারসিক চিত্রকলার সূত্রধরে ড্রাগনের চিত্র এখানে এসে পৌঁছেচে বলেই মনে হয়। পারসিক চিত্রকলার প্রথম বা আদিপর্বে তার উপর মোঙ্গল প্রভাব পড়েছিল। মোগল সম্রাটদের কারো কারো

পোষাক-পত্রে ড্রাগনের চিত্র লক্ষ্য করা যায়। মোগল-রাজপুত চিত্রকলার সূত্র ধরেই এসব মোটিফ বিষ্ণুপুরের মন্দির-টেরাকোটায় এসে পৌঁছেচে বলেই মনে হয়। এটি মোগল চিত্রকলার পারসিক উত্তরাধিকার। অনেক পণ্ডিত-গবেষক মনে করেন পারসিক-চিত্রকলা তার প্রথম পর্যায়ে মোগল-চিত্রকলার গভীর স্পর্শ লাভ করেছিল শুধু ড্রাগনের চিত্রই নয়, শ্যামরায় মন্দিরের (উপর তলার) দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের চূড়ার ভিত্তিমূলে কিছু বিচিত্র পোষাক পরিচ্ছদে ভূষিত বিদেশী জাতি গোষ্ঠীর মানুষের টেরাকোটা-মূর্তি চোখে পড়ে, যাদের অঙ্গের ডোরাকাটা জামা আর মাথার বিচিত্র ধরনের শিরস্ত্রাণ সহজেই নজর কাড়ে। পশ্চিম ভারতীয় (বা গুজরাটি) চিত্রকলার "কালকাচার্য-কথা"--চিত্রের কোথাও কোথাও শাহীদের মাথায় এমনি বিচিত্র ধরনের টুপি বা শিরস্ত্রাণ (ওল্টানো কচুরপাতা বা পদ্মপাতার মত এক ধরনের টুপি) চোখে পড়ে। আলোচ্য মূর্তিচিত্রগুলির শ্মশ্রুগুম্ফযুক্ত মুখমণ্ডলে সুস্পষ্ট বিদেশী ছাপ এক নজরেই ধরা পড়ে। শ্যামরায় মন্দিরের কেন্দ্রীয় চূড়াটির ভিত্তিমূলের টেরাকোটা ফলকে উদ্গত মনুষ্যমূর্তিগুলির বিচিত্র বিদেশী সাজ পোষাকের (জুতা-শিরস্ত্রাণ-জামা-পায়জামা) কথা আগেই বলা হয়েছে।

জোড়বাংলা মন্দিরের ভিত্তিসংলগ্ন (বিশেষ করে উত্তরদিকের দেওয়ালের ভিত্তিমূলে) পটিতে তথাকথিত 'ইন্দো-পারসিক' চরিত্রের চিত্রগুলির বর্ণনাও পূর্বে দেওয়া হয়েছে। পূর্বপ্রসঙ্গ পুনরুল্লেখের কারণ হ'ল মোগল-পারসিক আভিজাত্য অনুসরণের পশ্চাতে মল্লরাজাদের তাৎপর্যপূর্ণ মানসিকতার ইঙ্গিত দেওয়া। আঞ্চলিক সামন্ত-আভিজাত্যের পরিবর্তে সাম্রাজ্যবাদী মোগল-আভিজাত্যের অনুসরণে আঞ্চলিকতার উর্ধ্বে উঠে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উত্তরণ আকাঙ্খা এগুলির পশ্চাতে কাজ করেছে বলে মনে করা অসঙ্গত নয়। তাছাড়া সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতি ও সংস্কৃতি সর্বদাই আঞ্চলিক সামন্ততন্ত্রের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে। জন আরউইন গোসকুণ্ডায় প্রস্তুত পারস্যের বাজারে বিক্রয়যোগ্য এক ধরণের সুতী-পর্দার উপর চিত্রিত পারস্যের সাফাভিদ দরবারের লাম্পট্য-পানাসক্তি-বিলাসম্ভোগের

অনুসরণে পরিকল্পিত যে চিত্রাবলীকে ইন্দো-পারসিক আখ্যায় ভূষিত করেছেন (Golconda Cotton Paintings Of The Early Seventeenth Century : Lalit Kala : April 1959) জোড়-বাংলার উত্তর দিকের দেওয়ালের চিত্রগুলি তারই সমগোত্রীয়। আলোচ্য সুতীপদ'র চিত্রগুলিতে মোগল-পারসিক উপাদান বাহুল্যের জন্যই জন আরউইন এই ধরণের চিত্রগুলিকে 'ইন্দো-পারসিক' আখ্যায় ভূষিত করেছেন।[৪১] জোড়বাংলার উক্ত টেরাকোটা চিত্রগুলিতে জামা-পায়জামা, 'জাহাঙ্গীরী-তাজ', মোটা-তাকিয়া, ময়ূরপুচ্ছের চামরের মত (কাপড়ের তৈরী) পাখা, আতরদান, নারী অঙ্গে বিচিত্র জামা-পায়জামা-ওড়না প্রভৃতিতে ভারতীয় এবং পারসিক সজ্জা উপ-করণের অবাধ মিশ্রণ দর্শক মাত্রেরই কৌতূহল উদ্রেক করে। এমনকি ছুটন্ত অশ্বের গতির দ্রুততার ইঙ্গিত দিতে পাশাপাশি ছুটন্ত 'হাউন্ড-কুকুরের' চিত্রবিন্যাসও পারসিক চিত্রের অনুসরণ বলেই মনে হয়।

শুধু তাই নয়, জোড়বাংলা মন্দিরের ভিত্তিসংলগ্ন এই প্যানেলটিতে সামন্ততান্ত্রিক প্রেক্ষাপটটিও সুস্পষ্ট। সম্ভোগমনস্ক অর্থনীতি প্রসূত দরবারী বিলাসজীবনের এখানে অসঙ্কোচ আত্মপ্রকাশ। সামন্ততান্ত্রিক বিলাস ব্যসন, যুদ্ধ-বিগ্রহ, বিচিত্র জাঁকজমকপূর্ণ জীবন যাপন— বল্গাহীন কামকেলি আর রমণীসম্ভোগের পাশাপাশি যুদ্ধায়োজন, ষাঁড়ের লড়াই, ক্রুদ্ধ ষাঁড়ের পায়ের তলায় নিষ্পিষ্ট হতভাগ্য মানুষের অসাড়-অসহায় প্রাণহীন দেহ, যেন সামন্ততন্ত্রের বিশিষ্ট বাতাবরণ-কেই তুলে ধরেছে। এই প্যানেলেরই একাংশে (জোড়বাংলার পশ্চিম দিকের দেওয়ালের সর্বনিম্ন ভিত্তি সংলগ্ন অংশে) রয়েছে নিরীহ হতভাগ্য এক হরিণের উদরবিদীর্ণ করে নৃশংস নেকড়ে বাঘের

---

41 Scenes of drinking and debauchery, characteristics of the Indo-Persian group are a fair reflection of tastes and habits both at contemporary safavid court at Isfahan and at the Islamic court of Deccan"—Golconda Cotton Paintings Of Early Seventeenth Century : Lalit Kala : April 1959

পোষাক-পত্রে ড্রাগনের চিত্র লক্ষ্য করা যায়। মোগল-রাজপুত চিত্রকলার সূত্র ধরেই এসব মোটিফ বিষ্ণুপুরের মন্দির-টেরাকোটায় এসে পৌঁছেচে বলেই মনে হয়। এটি মোগল চিত্রকলার পারসিক উত্তরাধিকার। অনেক পণ্ডিত-গবেষক মনে করেন পারসিক-চিত্রকলা তার প্রথম পর্যায়ে মোগল-চিত্রকলার গভীর স্পর্শ লাভ করেছিল শুধু ড্রাগনের চিত্রই নয়, শ্যামরায় মন্দিরের (উপর তলার) দক্ষিণ-পশ্চিম দিকের চূড়ার ভিত্তিমূলে কিছু বিচিত্র পোষাক পরিচ্ছদে ভূষিত বিদেশী জাতি গোষ্ঠীর মানুষের টেরাকোটা-মূর্তি চোখে পড়ে, যাদের অঙ্গের ডোরা-কাটা জামা আর মাথার বিচিত্র ধরনের শিরস্ত্রাণ সহজেই নজর কাড়ে। পশ্চিম ভারতীয় (বা গুজরাটি) চিত্রকলার "কালকাচার্য-কথা"--চিত্রের কোথাও কোথাও শাহীদের মাথায় এমনি বিচিত্র ধরনের টুপি বা শিরস্ত্রাণ (ওল্টানো কচুরপাতা বা পদ্মপাতার মত এক ধরনের টুপি) চোখে পড়ে। আলোচ্য মূর্তিচিত্রগুলির শ্মশ্রুগুম্ফযুক্ত মুখমণ্ডলে সুস্পষ্ট বিদেশী ছাপ এক নজরেই ধরা পড়ে। শ্যামরায় মন্দিরের কেন্দ্রীয় চূড়াটির ভিত্তিমূলের টেরাকোটা ফলকে উদ্গত মনুষ্যমূর্তিগুলির বিচিত্র বিদেশী সাজ পোষাকের (জুতা-শিরস্ত্রাণ-জামা-পায়জামা) কথা আগেই বলা হয়েছে।

জোড়বাংলা মন্দিরের ভিত্তিসংলগ্ন (বিশেষ করে উত্তরদিকের দেওয়ালের ভিত্তিমূলে) পটিতে তথাকথিত 'ইন্দো-পারসিক' চরিত্রের চিত্রগুলির বর্ণনাও পূর্বে দেওয়া হয়েছে। পূর্বপ্রসঙ্গ পুনরুল্লেখের কারণ হ'ল মোগল-পারসিক আভিজাত্য অনুসরণের পশ্চাতে মল্লরাজাদের তাৎপর্যপূর্ণ মানসিকতার ইঙ্গিত দেওয়া। আঞ্চলিক সামন্ত-আভিজাত্যের পরিবর্তে সাম্রাজ্যবাদী মোগল-আভিজাত্যের অনুসরণে আঞ্চলিকতার উর্দ্ধে উঠে সর্বভারতীয় রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উত্তরণ আকাঙ্খা এগুলির পশ্চাতে কাজ করেছে বলে মনে করা অসঙ্গত নয়। তাছাড়া সাম্রাজ্যবাদী রাজনীতি ও সংস্কৃতি সর্বদাই আঞ্চলিক সামন্ততন্ত্রের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করে। জন আরউইন গোলকুণ্ডায় প্রস্তুত পারস্যের বাজারে বিক্রয়যোগ্য এক ধরণের সুতী-পর্দার উপর চিত্রিত পারস্যের সাফাভিদ দরবারের লাম্পট্য-পানাসক্তি-বিলাসম্ভোগের

অনুসরণে পরিকল্পিত যে চিত্রাবলীকে ইন্দো-পারসিক আখ্যায় ভূষিত করেছেন (Golconda Cotton Paintings Of The Early Seventeenth Century : Lalit Kala : April 1959) জোড়-বাংলার উত্তর দিকের দেওয়ালের চিত্রগুলি তারই সমগোত্রীয়। আলোচ্য সুতীপর্দার চিত্রগুলিতে মোগল-পারসিক উপাদান বাহুল্যের জন্যই জন আরউইন এই ধরণের চিত্রগুলিকে 'ইন্দো-পারসিক' আখ্যায় ভূষিত করেছেন।[৪১] জোড়বাংলার উক্ত টেরাকোটা চিত্রগুলিতে জামা-পায়জামা, 'জাহাঙ্গীরী-তাজ', মোটা-তাকিয়া, ময়ূরপুচ্ছের চামরের মত (কাপড়ের তৈরী) পাখা, আতরদান, নারী অঙ্গে বিচিত্র জামা-পায়জামা-ওড়না প্রভৃতিতে ভারতীয় এবং পারসিক সজ্জা উপ-করণের অবাধ মিশ্রণ দর্শক মাত্রেরই কৌতূহল উদ্রেক করে। এমনকি ছুটন্ত অশ্বের গতির দ্রুততার ইঙ্গিত দিতে পাশাপাশি ছুটন্ত 'হাউন্ড-কুকুরের' চিত্রবিন্যাসও পারসিক চিত্রের অনুসরণ বলেই মনে হয়।

শুধু তাই নয়, জোড়বাংলা মন্দিরের ভিত্তিসংলগ্ন এই প্যানেলটিতে সামন্ততান্ত্রিক প্রেক্ষাপটটিও সুস্পষ্ট। সম্ভোগমনস্ক অর্থনীতি প্রসূত দরবারী বিলাসজীবনের এখানে অসঙ্কোচ আত্মপ্রকাশ। সামন্ততান্ত্রিক বিলাস ব্যসন, যুদ্ধ-বিগ্রহ, বিচিত্র জাঁকজমকপূর্ণ জীবন যাপন— বল্গাহীন কামকেলি আর রমণীসম্ভোগের পাশাপাশি যুদ্ধায়োজন, ষাঁড়ের লড়াই, ক্রুদ্ধ ষাঁড়ের পায়ের তলায় নিষ্পিষ্ট হতভাগ্য মানুষের অসাড়-অসহায় প্রাণহীন দেহ, যেন সামন্ততন্ত্রের বিশিষ্ট বাতাবরণ-কেই তুলে ধরেছে। এই প্যানেলেরই একাংশে (জোড়বাংলার পশ্চিম দিকের দেওয়ালের সর্বনিম্ন ভিত্তি সংলগ্ন অংশে) রয়েছে নিরীহ হতভাগ্য এক হরিণের উদরবিদীর্ণ করে নৃশংস নেকড়ে বাঘের

---

41 Scenes of drinking and debauchery, characteristics of the Indo-Persian group are a fair reflection of tastes and habits both at contemporary safavid court at Isfahan and at the Islamic court of Deccan"—Golconda Cotton Paintings Of Early Seventeenth Century : Lalit Kala : April 1959

উদরপূর্তির বীভৎস দৃশ্য—এই প্যানেলেরই দক্ষিণ-পশ্চিম কোণায় তীক্ষ্ণছুরিকা দিয়ে হরিণের গলাকেটে বাবুর্চির খানা বানানোর চিত্রটিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

একদিকে মন্দির-টেরাকোটায়, বংশীধ্বনিতে আকৃষ্ট রাসমন্ডলে আগত উর্ধ্বমুখ রসজ্ঞ মৃগ (গোস্বামী গ্রন্থে বৃন্দাবনের মৃগদের রসজ্ঞ মৃগ বলা হয়েছে) অন্যদিকে একইভাবে বন্যশ্বাপদ আর সম্ভোগলিপ্সু সামন্তপ্রভুদের অন্তহীন লালসার শিকার এই মৃগদের চিত্রগুলি তাৎপর্য-পূর্ণ। জোড়বাংলার পূর্ববর্ণিত উত্তরদিকের ভিত্তিসংলগ্ন পটিতে উদ্গত সামন্ত প্রভুদের ভোগবিলাস আর মদমত্ততার পাশাপাশি মদমত্ত হস্তীযূথের প্রচন্ড উল্লাসের চিত্রাবলীও যেন একই ব্যঞ্জনায় অর্থবহ হয়ে উঠেছে। হস্তীযূথের বিচিত্র মদমত্ত উল্লাসের স্টাডিটি কোণারকের প্রস্তরভাস্কার্যের প্যানেলটিকে স্মরণ করিয়ে দেয়। মোগল-চিত্রকলাতেও জান্তব উল্লাসে প্রমত্ত বা তাপপ্রবাহে উন্মত্ত হস্তীযূথের বিচিত্র উন্মাদনার প্রকাশ একাধিকস্থানে লক্ষ্য করা যায়।[৪২]

সাম্রাজ্যবাদী মোগল রাজত্বে কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার মত সংস্কৃতির ধারাও সারা দেশের শিরা-উপশিরা দিয়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। ষোড়শ-সপ্তদশ খ্রীষ্টাব্দে মোগলভারতের স্থাপত্য চিত্রকলার বিচিত্র প্রভাব মোগল দরবারের বাইরে মোগল শাসিত ভারতের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। মোগল দরবারী চিত্ররীতির একটি জনপ্রিয় ধারা রাজস্থানের দরবার গুলির মাধ্যমে সারা দেশে প্রসারিত হয়েছিল বলে পন্ডিত-গবেষকরা মনে করেন।[৪৩]

42 এ প্রসঙ্গে 'আয়ার-ঈ দানীশ' এরহস্তী যূথের চিত্রগুলি উল্লেখ-যোগ্য। "The treatment of elephants in Ayyar-I-Danish shows the inclination of the Painters towards large brushstrokes, delineating action in the context of the persian rectangle. "যদিও আয়ার-ঈ-দানীশে ক্ষিপ্র গতিশীল রেখার মাধ্যমে অঙ্কিত হস্তীযূথের 'অ্যাকশন' চিত্রগুলি পারসিক রীতির আয়তাকার ক্ষেত্রের মধ্যে চিত্রিত হয়েছে তবু এগুলিতে ভারতীয় মেজাজ সুস্পষ্ট।

শুধু বিষ্ণুপুরের জোড়বাংলার ভিত্তিসংলগ্ন (উত্তরদিকের দেওয়ালের) পটিতেই নয়, সামন্ত বিলাসজীবনের ইন্দো-পারসিক রীতির চিত্র ত্রিপুরা থেকেও সংগৃহীত হয়েছে। ত্রিপুরা থেকে অধ্যাপক যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত অনুরূপ এক পাটাচিত্র সংগ্রহ করেছিলেন এক সময়। অধ্যাপক গুপ্তের রচিত প্রবাসী (১৩৩৫পৌষ সংখ্যায়) প্রকাশিত "একটি প্রাচীন পুঁথির মলাট চিত্র" শীর্ষক প্রবন্ধে এ চিত্রের বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়। পাটাচিত্রটি অধ্যাপক গুপ্ত ত্রিপুরার কোন একগ্রাম থেকে সংগ্রহ করেছিলেন বলে তাঁর এই প্রবন্ধ থেকেই জানা যায়। এখান থেকে তিনি যে পাটাচিত্র সংগ্রহ করেছিলেন তার একটিতে উক্ত সামন্তবিলাসের ইন্দো-পারসিক রীতির চিত্র ছিল। তাঁর বর্ণনা থেকেই এ তথ্য পাওয়া যায়। চিত্র সম্বন্ধে অধ্যপক গুপ্ত লিখেছেন -"অপর খানার মাঝের চিত্রখানি বেশ স্পষ্ট, অনেকটা উঠিয়া গেলেও এইটি বেশ চিনিতে পারা যায়। চিত্রমধ্যে একজন সম্ভ্রান্ত মুসলমান (বোধহয় কোন নবাব বা বাদশাহের আদর্শ লইয়া ছবিটি আঁকিয়াছেন) গালিচার উপর সুখোপবিষ্ট। চিত্রিত মনুষ্যটি তাকিয়ায় ঠেসান দিয়া একহাতে নলটি ধরিয়া লম্বানলে তামাক খাইতেছেন। অপর হাতখানা তাকিয়ার উপর রক্ষিত ও ছোরা ধরিয়া অবস্থিত। মাথায় পাগড়ি মোগল বাদশাহের মত। চিত্র দেখিলে অনেকটা শাহজাহান বাদশাহের কথা মনে পড়ে। ছবির পিছনে একটি শিকারী পাখী তার দক্ষিণদিকে শিকার চিত্র। পাটার বয়স সম্বন্ধে লেখক বলেছেন— "মোটামুটি-ভাবে ধরিতে গেলে এই মলাটচিত্রের বয়স প্রায় ২৫০ শত বৎসর হইতে

---

43 The history of Seventeenth century painting outside the Mughal court but within the sphere of political control presents an interesting situation. A style known as 'Provincial' or 'Popular' Mughal, neither title being descriptive of its nature, spread through The courts of Rajasthan." —Indian Painting : Text by Douglas Barret And Basil Gray Introduction. Page 114.

৩০০শত বৎসরের মধ্যে একথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।" ১৩৩৫ সালের এই উক্তি পর্যালোচনা করলে দেখা যায় চিত্রটি প্রায় বিষ্ণুপুরের জোড়বাংলার সমসাময়িক কালের। অধ্যাপক গুপ্ত তাঁর চিত্রবর্ণনায় যে শিকারী পাখী এবং শিকার চিত্রের কথা বলেছেন তদনুরূপ এক চিত্রও জোড়বাংলায় দেখা যায়। সুনিশ্চিতভাবে কিছু বলা না গেলেও চিত্রটিকে সমগোত্রীয় বলেই মনে হয়। জোড়-বাংলা মন্দিরের উত্তর দিকের তথাকথিত সামন্ত বিলাসজীবনের প্যানেলেই রয়েছে এই টেরাকোটা চিত্রটি। চিত্রটিতে দেখা যায়, জামা-পায়জামা আর ওড়না পরিহিতা এক সম্ভ্রান্ত রমণী মোটা তাকিয়া ঠেস দিয়ে উচ্চাসনে সদম্ভে উপবিষ্ট। হাতে মুক্তপক্ষ এক শিকারী পাখী। রাজকীয় গরিমায় উচ্চাসনে উপবিষ্ট এই রমণীর আদব-কায়দা দেখে একে কোন আমীর-ওমরাহ ঘরণী বলে মনে হয়। পাশে অনুরূপ শিকারী পাখী হাতে দণ্ডায়মান পাইক-বরকন্দাজ বা অনুচর-বৃন্দ। সকলের পরণেই মোগলাই পোষাক। জগদীশ মিত্তাল ললিত-কলা পত্রিকায় (এপ্রিল ১৯৬৭) প্রকাশিত প্রবন্ধে বলেছেন— 'মোগল শাসনকর্তাদের রমণীরা অনেক সময় শিকারী-বাজপাখী দিয়ে শিকার করতেন। এসব শাসনকর্তারা তাঁদের অধীনে যেসব পাহাড়ী চিত্রকরদের রাখতেন তাঁরাই চিত্রে ধরে রাখতেন, মোগল শাসন কর্তাদের ঘরণীদের এইসব খেয়ালখুশীর মুহূর্তগুলি।[৪৪] জোড়-বাংলার এই প্যানেলেরই পশ্চিমদিকে এক মোগল রাজপুরুষ (বা যুবরাজ) কে শিকারী পাখী বা কবুতর হাতে দেখা যায়। আকবর বাদশাহের যুবাবয়সের এমনি একটি ছবি দেখা যায়। বলাবাহুল্য মোগল বাদশাহ আর বেগম মহলের কাছাকাছি "কবুতরখানার" অস্তিত্ব

44 The ladies of the court of the Mughal Governors of the hills must also have gone out hawking and such Mughal Governors may also have retained pahari artists in their employ." The Early Guler Paintings : Page 32. Lalit Kala : April 1962.

আজও লক্ষ্য করা যায়। ফতেপুর সিক্রীর বাদশাহী মহলে এমনি এক কবুতরখানার ধ্বংসাবশেষ আজও দেখা যায়। কবুতররা যুদ্ধে এবং অন্যান্য বিভিন্ন সময়ে একমহল থেকে অন্যমহলে পত্র সরবরাহ করত এমন কাহিনীও শোনা যায়।

জোড়বাংলার আলোচ্য উপরোক্ত প্যানেলে বেশ কয়েকটি আমীর-ওমরাহ বা রাজা-বাদশাহের চিত্র আছে। এই সব টেরাকোটা চিত্র-গুলিতে চিত্রগ্রহণের জন্য সচেতনভাবে প্রস্তুত ভঙ্গিমায় নির্মিত মূর্তিগুলিতে পোট্রেটের আবেদন সুস্পষ্ট। মোগল চিত্রকলার অন্যতম বিশিষ্ট অবদান 'পোট্রেট' বা প্রতিকৃতি চিত্রণ। সম্রাট আকবরের সময়েই প্রতিকৃতি চিত্রণের ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্ব আরোপের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ রীতিটির প্রবর্তন লক্ষ্য করা যায়।[৪৫]

---

45 Portrait : প্রতিকৃতি বা 'পোট্রেট' (Portrait) চিত্রণ মোগল চিত্রকলার একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন। ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতকের, আকবর এবং জাহাঙ্গীরের আমলের অনেক পোট্রেট পাওয়া যায়। জাহাঙ্গীরের এ্যালবামেও বেশ কিছু Portrait বা 'প্রতিকৃতি'র সংগ্রহ রয়েছে। ষোড়শ শতকের বলে নির্দিষ্ট একটি তানসেনের প্রতিকৃতি পাওয়া যায়। Abul Fazal has recorded that Akbar had started to from a collection of portraits of the leading men of his time ; ....Of the earlier looking portraits in the Jahangir album, several are represented standing or seated in front of building or in interiors and this may be a fashion of the Akbar period in contrast to the later styles. আগেই বলা হয়েছে জোড়-বাংলা মন্দিরের পশ্চিমের দিকের ভিত্তি সংলগ্ন পটিতে বেশ কিছু এই জাতীয় চিত্র দেখা যায়। দুহাতে শিকারী পাখী বা কবুতর সহ এক মোগল যুবাপুরুষ (যুবক আকবরের একটি প্রতিকৃতির অনুরূপ) এবং দক্ষিণ-পশ্চিম কোণায় তাকিয়া বালিশ কোলে আমীর ওমরাহ ধরণের কোন এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির চিত্রে পোট্রেটের আবেদনই অনুভূত হয় (এই গ্রন্থের চিত্র দ্রষ্টব্য)।

আগেই বলা হয়েছে, মোগল চিত্রকলার একটি জনপ্রিয় (বা প্রাদেশিক) সংস্করণ রাজস্থানের বিভিন্ন দরবারের মাধ্যমে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। বহুল প্রচারিত এই জনপ্রিয় মোগল চিত্ররীতিই রাজস্থানী চিত্রকলার বিকাশে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করে বলে পণ্ডিতরা মনে করেন।[৪৬] একথাও মনে করা হয় যে জনপ্রিয় মোগল রীতির প্রভাবে পশ্চিম ভারতীয় (গুজরাটি) চিত্ররীতির যে বিবর্তন ঘটেছে তারই ফলশ্রুতি এই 'রাজস্থানী রীতি।[৪৭]

রাজস্থানী রীতির সঙ্গে মোগল রীতির বিশেষ করে জনপ্রিয়-মোগল-চিত্ররীতির উপাদানগত যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় তা মোগল রীতির প্রভাবেরই ফলশ্রুতি।[১৮] বিষ্ণুপুরের মন্দির-টেরাকোটায় যে ইন্দো-পারসিক উপাদান লক্ষ্য করা যায় তা রাজস্থানী-চিত্ররীতির মাধ্যমেই এখানে এসে পৌঁছেচে।

---

46 Being produced in large numbers, popular Mughal paintings naturally received greater circulation in the country and took a leading part in emergence of typical Rajasthani styles. Particularly during the period of Ad. 1610 - 1625, when its strength was great and to which dates the important works of Salivahana belong." —Lalit Kala : Pramode Chandra : Ustad Salivahana The Development Of Popular Mughal Art.

47 That what is known as Early Rajasthani is the outcome of the impact of Moghul Painting on the Gujarati or Western Indian School as practised in Rajasthan, Mandu, Jaunpur, Delhi and other places in Central and Northern India." Lalit Kala : Oct. 1959 Page 10. A Consideration of An Illustrated Ms From Mandapa Durga (Mandu) date 1439 A.D.

ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে বিকশিত মল্লরাজ্যের উপর গভীর মোগল প্রভাব তর্কাতীত। আগ্নেয়াস্ত্র নির্মাণের ব্যাপক ব্যবস্থা সহ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা থেকে আরম্ভ করে মন্দির-স্থাপত্য, টেরাকোটা-ভাস্কর্য, মিনিয়েচার (পাটাচিত্র). চিত্রকলা, সঙ্গীত প্রভৃতি শিল্পকলা বিকাশের সর্বক্ষেত্রে মোগল প্রভাব একনজরে চোখে পড়ে. ক্ষুদ্র আকারে হলেও মোগল দুর্গ বা কেল্লাগুলির অনুসরণেই রচিত হয়েছে মল্লরাজধানীর কেল্লা অঞ্চল। এর মধ্যে রাজপ্রাসাদের (বিভিন্ন মহলসহ) সুউচ্চ মিনার, বিরাট প্রাকারের ভগ্নাবশেষ, মল্লরাজার বিরাট "সাতেতলা" পুষ্করিণী, রাজদরবার ছাড়াও রয়েছে বিখ্যাত দেবমন্দিরগুলি। মাটির তৈরী গড়ের পাড় আর গড়খাই দিয়ে কেল্লা বা দুর্গের বেষ্টনী রচিত হয়েছে। এরপর দুটি প্রস্তর নির্মিত দুর্গদ্বারে বা পাথর-দরওয়জার স্থাপত্যে নির্ভেজাল মুঘল স্থাপত্য রীতির অনুসরণ। মোগলবঙ্গের দুই রাজধানী ঢাকা এবং মুর্শিদাবাদে অবস্থিত যথাক্রমে দুটি কামান কালে খাঁ আর জাহানকোষার সমগোত্রীয় বিষ্ণুপুরের দলমাদলের কথা আগেই বলা হয়েছে।

কিন্তু এই পরিপূর্ণ মোগল প্রভাবের মধ্যেও হিন্দু রাজ্য মল্লভূম তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় উদাসীন ছিলনা। মন্দির স্থাপত্যে খাঁজকাটা খিলান, বিচিত্ররীতির স্তম্ভ, ভল্ট প্রভৃতি মুস্লিম উপাদানের পূর্ণ ব্যবহার করেও হিন্দু পুরানো শিখর মন্দিরের প্রতিই অধিকতর পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করেছেন মল্লরাজারা। মল্লরাজাদের রত্নমন্দির-গুলির চূড়া যে হিন্দু 'রেখ' আর পীঢ়া দেউলের অনুসরণে রচিত তা পূর্বেই বলা হয়েছে। টেরাকোটা-ভাস্কর্যে ক্লাসিক শাস্ত্র-সাহিত্যের

---

48 The similarities that one notices between Rajasthani and Imperial, and to a greater extent, popular-Mughal paintings are due to the simple fact that Mughal influence trickled down to the indigenous styles existing at the period through the medium of Popular Mughal Painting."

পূর্ণ প্রতিফলন। শিক্ষা-দীক্ষা, সমাজ-ব্যবস্থায় প্রাচীন ক্লাসিক সংস্কৃত ভাষা ও স্মৃতির শাসন সুস্পষ্ট। প্রশাসনে ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ভারতীয় প্রাচীন ঐতিহ্যকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

ষোড়শ সপ্তদশ শতকে পূর্ণ মোগল আধিপত্যের মধ্যেও একটি হিন্দুরাজ্যের স্বপ্ন দেখেছিলেন মল্লরাজারা। এ বিষয়ে স্বাভাবিকভাবে রাজপুতানা বা রাজপুতরাজারা ছিলেন তাঁদের আদর্শস্থানীয়। শুধু বংশকৌলীণ্য নয়, রাজপুত সংস্কৃতিকেও যে তাঁরা বহুলাংশে অনুসরণ করেছেন তা সাম্প্রতিক কালেও দুনিরীক্ষ্য নয়। কিন্তু মল্লরাজাদের এই রাজপুত অনুসরণ সত্ত্বেও অনেকে মনে করেন তাঁরা মূলে রাজপুত ছিলেন না। তাঁরা আঞ্চলিক কৌমসদার ছিলেন।[৪৯] পরে প্রবল পরাক্রান্ত হয়ে মোগল সহযোগিতায় একদিকে যেমন তাঁদের রাজনৈতিক মানোন্নয়ণ ঘটে অন্যদিকে তদানীন্তন কালের সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে সুপ্রতিষ্ঠিত সুসমৃদ্ধ গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও সংস্কৃতিকে অবলম্বন করায় তাঁদের সাংস্কৃতিক গোত্রান্তর সম্পন্ন হয়। তাঁদের আঞ্চলিক কৌম ধর্ম ও সংস্কৃতিকে তাঁরা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম-সংস্কৃতির অন্তরালে আচ্ছাদিত করে সর্বভারতীয় সংস্কৃতি ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভের প্রয়াসী হ'ন। ভারতীয় ক্লাসিক সংস্কৃতির অনুসরণে মল্লসংস্কৃতি একটি বিশিষ্ট রূপ লাভ করে পূর্ব ভারতের অন্যতম বিশিষ্ট কলানগরীতে পরিণত হয়—কাশী, মাদুরা, ইত্যাদি হিন্দুধর্ম ও কলাকেন্দ্রগুলির সমগোত্রীয় করে বিষ্ণুপুরকে দেখেছেন ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়। সমাজের তথাকথিত নিম্নঅবস্থান থেকে উচ্চ অবস্থানে আরোহণের যে পথটি মল্লরাজারা অনুসরণ করেছিলেন তা ভারতের ইতিহাসে এক প্রচলিত পন্থা। প্রতাপশালী কৌমসদাররা আদিকালেই এই পথ অনুসরণ করেই ব্রাহ্মণদের সহযোগিতায় ক্ষত্রিয়ত্ব লাভ করতেন এবং হিন্দুশাস্ত্র মতে গ্রামভিত্তিক শ্রেণী বিভক্ত সমাজ গড়তেন। অনেকে মনে করেন রাজপুতরাও এই পথ অনুসরণ করেছিলেন। আমরা পূর্বেই মঙ্গল চণ্ডীকাব্যের কালকেতুর দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছি মল্ল-রাজাদের সামাজিক উত্তরণকে বিশ্লেষণ করতে। বলাবাহুল্য মল্লভূমের

অপরে বসে কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম তাঁর চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। তাঁর কাব্যে গৌড়বঙ্গ উৎকল-অধিপ রূপে মানসিংহের উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। ষোড়শ শতকের শেষভাগে (ইতোপূর্বে ভ্রমবশতঃ ষোড়শ-শতকের প্রথম ভাগে লেখা হয়েছে) মানসিংহের সহযোগিতা লাভ করার ফলেই বীরহাম্বীরের রাজনৈতিক গোত্রান্তর ঘটে।

---

৪৯ নানা কারণে এটা মনে করা অসঙ্গত নয় যে, মল্লরাজারা আদিতে কোন কৌম সর্দার ছিলেন। এঁদের আদিপর্ব অনিশ্চয়তার কুয়াশায় ঢাকা। বিষ্ণুপুরের অন্যতম নির্ভরযোগ্য মল্লরাজ কাহিনী "History of Bishnupur Raj" এর লেখকও মল্লদের আদিপর্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব থেকেছেন। তাঁর মতে মল্লভূমের আদিপর্বে এক ধর্মপূজার ব্যাপক বিস্তৃতি ছাড়া নিশ্চিতভাবে আর কোন নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজারা যে আদিতে ধর্মপূজক ছিলেন নানাকারণে তা মনে করা অসঙ্গত নয়। মল্লরাজবংশে ধর্মঠাকুরের উল্লেখ-যোগ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সাম্প্রতিক কালেও লক্ষ্য করা গেছে। বিজয়ায় "বিজয়া-সওয়ারী" করে (বিজয়া উপলক্ষে রাজকীয় শোভা-যাত্রা। 'সওয়ারী' কথাটা মোগল মনসবদারদের 'সওয়ার' আখ্যার স্মৃতিবাহকও হতে পারে) গুরুপ্রণাম করতে যাওয়ার সময় মল্ল-রাজারা সর্বাগ্রে শাঁখারীবাজার মহল্লায় সুপ্রতিষ্ঠিত বিখ্যাত বুড়াধর্মরাজের "মাড়ো" বা মন্দিরে প্রণাম নিবেদন করতেন। এটি প্রথাগত অনুষ্ঠান বলেই মনে হয়। অনেকে মনে করেন এই "মাড়ো"কে কেন্দ্রকরেই সংলগ্ন এক বিরাট মহল্লার নাম হয়েছে মাড়ুইবাজার (মাড়োরবাজার)।

প্রতি বৎসর মল্লরাজাদের "অভিষেক-বার্ষিকী" অনুষ্ঠিত হ'ত ইঁদ পরবের দিন। পূর্বে ঐদিন বিষ্ণুপুরের ইঁদতলায় আদিবাসী সাঁওতাল নরনারীদের বর্ণাঢ্য নৃত্যগীত এই মেলার উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানরূপে পরিগণিত হত। "ইঁদপরব"কে শাস্ত্রমতে আর্যীকরণ আর সংস্কৃতায়ণের দ্বারা "ইন্দ্র" ধ্বজপূজায় পরিণত করা হ'লেও আসলে এ পর্বটি বাঁকুড়া-পুরুলিয়ায় বহুল সংখ্যায় অনুষ্ঠিত

আগেই বলা হয়েছে, মোগল যুগের বিশিষ্ট হিন্দুরাজ্যে রাজস্থান তথা রাজপুত রাজারা ছিলেন মল্লরাজাদের আদর্শস্থল। এ সময় (ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে) রাজস্থানের সাংস্কৃতিক জগৎ যে বৈষ্ণব ভাবধারায় আপ্লুত হয়েছিল তা বোঝা যায় রাজস্থানী চিত্রকলার জগতটি পর্যালোচনা করলে। শ্রীনির্মল কুমার ঘোষ রাজস্থানী চিত্রকলার আলোচনা প্রসঙ্গে তাঁর "ভারত শিল্প" গ্রন্থে লিখেছেন— 'বিকানীর কিষেণগড়, যোধপুর, জয়পুর, মেওয়ার বুন্দি প্রভৃতি রাজপুতানার সবপ্রান্তে এবং বুন্দেলখণ্ডে নবচিত্র বিকশিত হয়। এইসব উপশাখা দিয়েই রাজস্থানী চিত্রধারা প্রবাহিত হতে থাকে।" এই সময় রাজস্থান ছিল গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের অন্যতম প্রসিদ্ধ কেন্দ্র। আচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় তাঁর ভারত সংস্কৃতি গ্রন্থে "বৃহত্তর বঙ্গ" প্রবন্ধে লিখেছেন— "রাজপুতানার কতকগুলি রাজ্যে মথুরা, বৃন্দাবন হইতে

"করম" আর "ছাতা"র সমগোত্রীয় এক জনপ্রিয় লোক উৎসব। বিষ্ণুপুরে ইন্দ পরব উঠে গেলেও বাঁকুড়া-মানভূম-সিংভূমের কৌমগোষ্ঠীর রাজা বা "মানকি" এ অনুষ্ঠান যথারীতি পালন করেন। এই ইন্দ পরবের দিনই মল্লরাজাদের বাৎসরিক অভিষেক অনুষ্ঠানকে উপলক্ষ করে নূতন "মল্লশক" ঘোষিত হ'ত। শাঁখারীবাজারের বিখ্যাত ধর্মরাজ বুড়োধর্মের পুরোহিত কর্মকার পণ্ডিত মেঝেতে হাতুড়ি ঠুকে নূতন 'মল্লশক' ঘোষণা করতেন। এ প্রসঙ্গে আর একটি অনুষ্ঠানের উল্লেখ করা যেতে পারে— এটি হ'ল মল্লরাজা তথা মল্লরাজধানীর অধিবাসীদের অনুষ্ঠিত "শিকারোৎসব" বা "এখান-শিকার"। রাজকীয় "এখান-শিকার" বর্তমানে লুপ্ত হলেও বিষ্ণুপুরবাসীরা প্রায় সকলে আবশ্যিক-ভাবে মাংসাহার করে পূর্বস্মৃতির রোমন্থন করেন। অনেকে মনে করেন "এখান-শিকার" কথাটা "আখেটিক" বা ব্যাধবাচক শব্দ থেকেই এসেছে। মল্লরাজাদের রাজধানী স্থাপনের সঙ্গে এমনি এক শিকার কাহিনীও জড়িত আছে। কালকেতুর মতই শিকার করতে এসে পথভ্রান্ত হ'ন মল্লরাজা। তারপর কালকেতুর মতই দেবীর বর লাভ করে বিষ্ণুপুরে রাজধানী স্থাপন করেন।

বাঙ্গালী গোস্বামীদের অধিষ্ঠান হইল।" রাজপুত চিত্রকলার জগতে বৈষ্ণবধর্মের প্রভাব নব নব রূপে বিকশিত হ'ল। কৃষ্ণলীলার লিরিক আবেদন এইসব চিত্রকলার অন্যতম প্রধান বিষয়ে পরিণত হল। "Its most absorbing themes being furnished by the cult of Krishna."

মোগল চিত্ররীতির স্পর্শে পশ্চিমভারতীয় চিত্ররীতির বিবর্তনে রাজস্থানী রীতির বিকাশের সুস্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় কিছু বৈষ্ণব কৃষ্ণলীলা চিত্রেই। এপ্রসঙ্গে মেবারে অঙ্কিত কিছু গীতগোবিন্দ চিত্রের উল্লেখ করা যেতে পারে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের আকরগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের রাজপুতানায় বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। এসময়ের একাধিক চিত্রিত শ্রীমদ্ভাগবতের পুঁথি রাজস্থান থেকে পাওয়া গেছে। শ্রীএম, আর, মজুমদার শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্দের চিত্রিত এক পুঁথির উপর লিখিত (ললিত কলা ঃ নং ৮ ঃ অক্টোবর ১৯৬০ পত্রিকায় প্রকাশিত) তাঁর প্রবন্ধে বলেছেন — ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের রাজস্থানে শ্রীমদ্ভাগবত চিত্রণ যে খুবই জনপ্রিয় ছিল তা এ সময়ের প্রচুর সংখ্যক রাজস্থানী-চিত্রিত পুঁথি থেকে বোঝা যায়। এর মধ্যে যোধপুর থেকে প্রাপ্ত ১৬১১ খ্রীষ্টাব্দের চিত্রিত পুঁথিকেই তিনি প্রাচীনতম বলে মনে করেছেন।[৫০]

এ সময় রাজপুতানার সমস্ত কেন্দ্রে যে কৃষ্ণলীলা-চিত্রণ সমধিক প্রাধান্য পেয়েছিল তা মুলুকরাজ আনন্দের লেখা থেকেও বোঝা যায়। তিনি তাঁর "এ্যালবাম অফ্ ইন্ডিয়ান পেইনটিং" (পৃষ্ঠা ১১৫) গ্রন্থে

---

50. The Bhagavata was very popular in the 16th and 17th Century A.D. appears from the large number of illustrated Mss. of this work bearing dates of that period, of which the earliest example so far known is Jodhpur Ms. painted in 1611." Two Illustrated Mss. Of The Bhagavata Dasamaskandha : (Lalit Kala : No. 8 : October 1960)

লিখেছেন—ষোড়শ-সপ্তদশ শতকের মেবার চিত্রকলা থেকে বোঝা যায়, এ সময় জয়দেবের গীতগোবিন্দ, ভাগবতপুরাণ, রাগরাগিনী-চিত্র মেবার কেন্দ্রে প্রচুর সংখ্যায় রচিত হচ্ছিল। মূলতঃ এগুলিই ছিল এখানের চিত্রকলার প্রধান উপজীব্য। [৫১] বিকানীরে এই একই বিষয়কে কেন্দ্র করে বিচিত্র সব চিত্রকলা সৃষ্টি হচ্ছিল। বিকানীর চিত্রকলা সম্বন্ধে এই এ্যালবামেরই অন্যত্র মুলুকরাজ লিখেছেন—রাজস্থানের সমসাময়িক কলাকেন্দ্রগুলির মতই বিকানীর কলাকেন্দ্রেও ভাগবত পুরাণ, রসিকপ্রিয়া, রাগরাগিনী চিত্রগুলি অঙ্কিত হচ্ছিল।[৫২] সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মনে করেন- "সপ্তদশ অষ্টাদশ শতকের রাজপুতানা, বুন্দেল খণ্ড, বসহোলী, কাংড়া প্রভৃতি স্থানের "অর্বাচীন হিন্দী" চিত্ররীতিতে ও উড়িষ্যা ও বাংলাদেশ, নেপাল ও অন্ধ্রদেশের চিত্ররীতিতে গীতগোবিন্দের অনুসারী রাধাকৃষ্ণলীলার যথেষ্ট ছবি পাওয়া যায়।

জয়দেবের গীতগোবিন্দকে অনেকে বলেছেন 'গীতিনাট্য', অতএব এটি শুধুমাত্র কাব্য কিংবা গানের মাধ্যমেই পরিবেশিত হ'ত না। নাট্যের মাধ্যমেও রূপলাভ করত। এর সঙ্গে যে নৃত্যও যুক্ত ছিল, সে প্রমাণ উল্লেখ করেছেন ডঃ সুকুমার সেন তাঁর বাঙ্গলা সাহিত্যের ইতিহাসে (প্রথম খণ্ড : পূর্বার্ধ); তিনি বলেছেন নৃত্যগীত সহযোগে এই গীতগোবিন্দকে রূপদান করা হ'ত। অতএব স্বাভাবিকভাবেই গীতগোবিন্দ থেকে কৃষ্ণলীলার ছন্দোবদ্ধ গীতিময় রূপকল্পগুলি সৃষ্টি হওয়ার অবকাশ ছিল। অর্থাৎ কাব্য থেকেই গৃহীত হয়েছে কৃষ্ণলীলা চিত্রণের বিশেষ স্টাইলটি যা নৃত্যে ছন্দে ছন্দিত। বিষ্ণুপুর মন্দির-টেরাকোটায় কৃষ্ণলীলা চিত্রণের স্টাইলটি অনুরূপ

51. "Many of the devotional books of the Hindus including the Gita Govinda of Jaydev, Bhagavata Purana and Raga Raginis came to be illustrated. These constitute the main content of 17th century Mewar Painting.— Album of Indian Paintings by Mulkraj Anand. Page 115.

নৃত্যছন্দে ছন্দিত একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। কৃষ্ণলীলা চিত্রণের ক্ষেত্রে এই স্টাইলটি প্রায় প্রথাবন্ধ সংস্কারের মতই গৃহীত হয়েছে। রাগরাগিনীর শ্লোক বা রূপকল্পের মধ্যেও এই ছন্দোবন্ধ লিরিক আবেদনটি থাকায়, তাও একই সঙ্গে চিত্রের বিষয় হয়ে উঠেছে। রাগমালা প্রসঙ্গে বিখ্যাত শিল্প-সমালোচক অর্ধেন্দ্র শেখর গাঙ্গুলী (ও. সি. গাঙ্গুলী) বলেছেন— "আর দেখলাম এই শ্লোক ও কবিত্বের মধ্যেই আছে সেই চিত্রাপিত রাগ-রাগিনীর ধ্যান উৎস ও রূপকল্পনার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত অথবা প্রাঞ্জল বর্ণনা ··· রাগরাগিনীর চিত্রমালা ব্যাপকভাবে অনুশীলন করে আমিও এই সত্য উপলব্ধি করেছিলাম যে, কাব্য-সাহিত্য, চিত্রকলা, সঙ্গীত এই ত্রয়ী বিদ্যার সুমধুর মিলন সাধিত হয়েছে চিত্রাবলীতে।" বিশিষ্ট শিল্প সমালোচক শ্রীপ্রতাপাদিত্য পাল নেপাল থেকে সংগৃহীত লস্ এঞ্জেলস্ মিউজিয়ামের (সপ্তদশ শতকের) যে "নায়িকা চিত্রগুলির আলোচনা করেছেন সেগুলিও ধাতুপ্রকৃতিতে উপরোক্ত চিত্রগুলির সমগোত্রীয়। সমসাময়িক কালের বিষ্ণুপুর মন্দির টেরাকোটায় কৃষ্ণলীলা চিত্রণের ক্ষেত্রে প্রায় প্রথাবন্ধ রীতিতেই নৃত্যছন্দে ছন্দিত রাজস্থানী চিত্ররীতিই অনুসৃত হয়েছে। মল্লভূমের সর্বজন পূজ্যা দেবী শ্রীশ্রীমৃন্ময়ী মন্দিরের শুভগাত্রে রাগিনী চিত্রের উপস্থিতি ও সমসাময়িক কালের রাজস্থানী চিত্রকলার প্রভাবই সূচিত করে।

রাজস্থানের চিত্রকলার মতই বিষ্ণুপুরের প্রসিদ্ধ টেরাকোটা মন্দিরগুলিতেও শ্রীমদ্ভাগবত বিশেষ করে দশমস্কন্ধের কৃষ্ণলীলাই চিত্রিত হয়েছে। শ্যামরায়ে রাসলীলা জোড়বাংলায় বৃন্দাবনের বাল্য-লীলা সবিস্তারে চিত্রিত হয়েছে। মদনমোহন মন্দিরের টেরাকোটায় সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে জন্মাষ্টমী-কথা। পুঁথির যে সংক্ষিপ্ত তালিকা আলোচ্য গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে তাতেও দেখা যায় আচার্য যোগেশ

52. "Like their contemporaries, they preferred the Bhagavata Purana, Rasika Priya of Kesabdas and Ragini Pictures"
MULK RAJ ANAND. Album of Indian Paintings.

চন্দ্র পুরাকৃতি ভবনে সংগৃহীত পুঁথির মধ্যে শ্রীমদ্ভাগবতের এবং গীতগোবিন্দের সংখ্যা প্রচুর। শুধু তাই নয়, শ্রীমদ্ভাগবতের মধ্যে বিশেষ করে 'দশমস্কন্ধ' এর প্রতিলিপিই অনেকগুলি। একই চিত্র পাওয়া যায় আমেদাবাদের বি, জে, ইনস্টিটিউটের পুঁথি সংগ্রহে। পূর্ব পশ্চিমে একই ভাবে প্রসার লাভ করেছে এই ধর্ম। শাস্ত্র-সাহিত্য এবং শিল্পকলা উভয় মাধ্যমেই এর প্রচার। প্রাকৃত প্রেমের রূপকে অধ্যাত্মচিন্তার বিচিত্র পথনির্দেশের ফলে বৈষ্ণবের ধর্মজগৎ আর শিল্পজগৎ একত্র সংযুক্ত। সাহিত্য-সঙ্গীত-চিত্রকলা এধর্ম প্রচারের সার্থক বাহন। রাজস্থান-গুজরাটের মতই বৈষ্ণবধর্মের প্রেরণায় বিষ্ণুপুরেও যে মিনিয়েচার চিত্রকলার বিকাশ ঘটেছিল তার দৃষ্টান্ত প্রচুর। রাশি রাশি পুঁথির পাটা-চিত্র (মলাটপাটা) বিষ্ণুপুর থেকে সংগৃহীত হয়ে ভারতের বিভিন্ন সংগ্রহশালায় স্থান পেয়েছে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালা পুঁথির পাটাচিত্রের যে ১২ খানি আলোকচিত্র পোষ্টকার্ড রূপে প্রকাশ করেছেন তার অর্ধেকগুলিই বাঁকুড়া বা বিষ্ণুপুর থেকে সংগৃহীত। এই পাটাচিত্রগুলির প্রশংসাসূচক মন্তব্যের আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, মিঃ জে, সি, ফ্রেঞ্চ (বাঁকুড়ার প্রাক্তন জেলা শাসক) ইণ্ডিয়ান আর্ট এণ্ড লেটার্স (ভল্যুম-১; ১৯২৭) পত্রিকায় প্রকাশিত তার 'Land of Wrestlers' প্রবন্ধে বাঁকুড়া থেকে সংগৃহীত দুখানি পাটাচিত্রের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা নিঃসন্দেহে কৌতুহলোদ্দীপক ও তাৎপর্যপূর্ণ। প্রথম পাটাচিত্র সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন "The work is an example of primitive Hindu Art which sprang up after the storm of the Muhammadan invasion had subsided." এই পাটাচিত্রের অঙ্কনরীতিতে তিনি এক আদিম জীবনী শক্তি অনুভব করেছেন। মিঃ ফ্রেঞ্চ এই পাটাচিত্রের নির্মাণ কাল ১৪৯৯ বলে নির্দিষ্ট করেছেন। একথা সত্য হলে বলতে হয় প্রাচীনত্বের দিক দিয়েও এই দশাবতার পাটাচিত্রটির গুরুত্ব প্রচুর। দ্বিতীয় পাটাচিত্রটি অনেক পরবর্তীকালের, ১৭৯৯খ্রীষ্টাব্দের। পাটাটির অঙ্কণ শৈলীও

নিম্নমানের। এ পাটাচিত্রটি সম্বন্ধে লেখা হয়েছে 'The line is hard and colour crude and the result definitely inferior to the work of the preceding century" (J.C. French : Land of Wrestlers.'' অনেকে মনে করেন— (Eastern Indian Manuscript Painting : R. Das Gupta - Taraporevala Bombay 1979) এ চিত্রশৈলীর উৎস উড়িষ্যা তথা অপভ্রংশ শৈলী। অপভ্রংশ শৈলী বাংলার পশ্চিমদিকের জেলাগুলিকে বিশেষভাবে স্পর্শ করেছিল। অবশ্য কর্কশ রুক্ষ অপভ্রংশ শৈলী বাংলায় দীর্ঘ অবস্থানের ফলে অনেকাংশে নমনীয় এবং কমনীয় হয়েছিল। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজা বীরহাম্বীরের বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণকে কেন্দ্র করে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের মত এখানেও "মিনিয়েচার চিত্রকলার'' উদ্ভব হয় পুঁথির মলাট পাটাকে অবলম্বন করে। পাল চিত্রকলার পরে দীর্ঘ বিরতির পর এই চিত্রকলার উদ্ভব।[৫৩] বৈষ্ণব সংস্কৃতির সঞ্জীবনী প্রভাবে

---

53 After the Palas there was a long interlude until the curtain finally rises in the early 16th century when once more painting developed in small principality of Vishnupur, situated in mountaine-ous tracts of Western Bengal, which correspon-ded to ancient Vardhamanabhukti of Bengal. Here too, miniature painting confine only to wooden Patas as was usually the case in Pala-days It was the turn of the neo-vaisnavism of Caitanya Deva to inspire a school of miniatures just as Buddhism had done patronised by Buddhist Pala-Kings." -- Eastern Indian Manuscript Painting : R. Dasgupta : Department Of History. Beneras Hindu University : First Published 1973.

এখানের প্রাচীন চিত্র শৈলীতে এক নূতন প্রাণস্পন্দন অনুভূত হয়। "In the 16th and 17th centuries of course the style changes but again conforms to western Indian art traditions modified by Mughal influence" (Eastern Indian Manuscript Painting by R. Das Gupta).

পশ্চিমভারতীয় চিত্ররীতির (বা গুজরাটি রীতির) উপর মোগল প্রভাব পড়েই যে রাজস্থানী চিত্ররীতির উদ্ভব হয় তা আগেই বলা হয়েছে। বঙ্গদেশের পশ্চিমদিকের জেলাগুলিতে সীমাবদ্ধ কিছু পাটাচিত্রের কথা বলতে গিয়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ চিত্রশালার প্রতিষ্ঠাতা-কিউরেটার অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষ ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে বঙ্গের চিত্রকলার বিচিত্র বিবর্তনে বিষ্ণুপুরের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা বলেছেন। তিনি মনে করেন বঙ্গের পশ্চিমের জেলাগুলিতে সীমাবদ্ধ সপ্তদশ-অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকের পাটাচিত্র (পুঁথির চিত্রিত মলাটপাটা) পূর্বভারতের অমূল্য সম্পদ। যদিও এগুলি এদের গুজরাটি বা পশ্চিমভারতীয় প্রতিরূপের মত ততটা প্রখ্যাত নয়। তিনি মল্লরাজ বীরহাম্বীরের সময়ের এই ধরণের রাসলীলার একটি পাটাচিত্রে রাজস্থানী রীতির ক্রমবিবর্তন লক্ষ্য করেছেন।[৫৪] একই অঞ্চলে সমসাময়িককালে বিকশিত চিত্রভাস্কর্যে নির্মাণ শৈলী বা রীতিগত সাদৃশ্য থাকে। শিল্পকলার ইতিহাসে এটা স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার। অতএব এটা মনে করা অসঙ্গত নয় যে, সমসাময়িক কালে রচিত বিষ্ণুপুরের মন্দির-টেরাকোটায় কিছু বিবর্তিতরূপে হলেও রাজস্থানী চিত্ররীতির প্রভাব স্বাভাবিক ভাবেই পড়েছে। প্রোফাইল ভঙ্গীতে 'বেস-রিলিফে' উদ্গত বিষ্ণুপুরের মন্দির-টেরাকোটার চিত্রধর্মিতা একনজরেই ধরা পড়ে। বিশিষ্ট চিত্রসমালোচক শ্রীঅশোক মিত্র তাঁর অসামান্য গ্রন্থ ভারতের চিত্রকলায় বিষ্ণুপুরের মন্দির-টেরাকোটাকে মধ্যযুগের চিত্রকলার পরিপূরক বলে নির্দেশ করেছেন।[৫৫] আগেই বলা হয়েছে, ষোড়শ-সপ্তদশ শতক রাজস্থানী চিত্রকলার সুবর্ণসুযোগ।

এ সময় ভারতের সর্বত্র স্বরূপে অথবা রূপান্তরে রাজস্থানী রীতি নানাভাবে তার প্রভাব বিস্তার করেছে। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৩৬ (মাঘ) সালের প্রবাসীতে প্রকাশিত তাঁর "দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের শিল্প" প্রবন্ধে বিষ্ণুপুর থেকে সংগৃহীত যে তিনখানি মোটা কাঁগজে আঁকা চিত্র প্রকাশ করেছেন সেগুলির উপর মোগল-রাজপুত প্রভাব সুস্পষ্ট। এগুলি তিনি তদানীন্তন বাঁকুড়ার জেলা শাসক মিঃ ফ্রেঞ্চের কাছে দেখেছিলেন। এই একই ধরণের চিত্র কলিকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পক্ষে ব্যোমকেশ মুস্তাফী বিষ্ণুপুর থেকেই সংগ্রহ করেছিলেন।[৫৪]

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বিষ্ণুপুর শাখার প্রতিষ্ঠাকালের অব্যবহিত পরেই এ ধরণের কিছু চিত্র কুচিয়াকোল রাজবাড়ী থেকে

---

54 Patas or painted manuscript-covers of about the 17th, 18th and 19th centuries mainly confined to the western districts of Bengal are considered to be the treasures of East Indian art though less known than thair Gujarati counterparts. The gradual transition from the mediaeval or Rajasthani classical idiom of 17th century is visible in the topmost 'pata' representing Raslila from Bankura full of lively actions and swaying rhythm of undulating tints and contrasting colours. Transition from painstaking details and finesse of the mediaeval style to the easy unsophisticated folk mannerism. of pata is apperent to the discerning eye.". Folk Art Of Bengal : By D.P. Ghosh : Visva Bharati : Booklet Page 7.

(বিষ্ণুপুরের অন্তর্গত জয়পুর থানার কুচিয়াকোল গ্রাম, মল্লরাজবংশের একটি শাখা এখানে গিয়ে প্রতিষ্ঠিত হন) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বিষ্ণুপুর শাখা কর্তৃক সংগৃহীত হয়। রাজস্থানী রীতি প্রভাবিত এই চিত্রগুলি মল্লরাজাদের আভিজাত্যেরই সূচক। বিষ্ণুপুরে প্রচলিত সমসাময়িক চিত্রকলার মত মন্দির-টেরাকোটাতেও স্বাভাবিকভাবেই রাজস্থানী চিত্ররীতির প্রভাব পড়েছে বলে মনে হয়।

---

৫৫ "স্বাভাবিক আলোয় তোলা ফটোতে ভারতীয় বেস রিলিফে ছবিত্ব সুলভ গুণ খুব নজরে পড়ে.................. অবার যে সব খোদাই বেস-রিলিফের চেয়ে কম গভীর, যেমন পূর্বভারতের মন্দিরের টালি বা পাটা, যথা বাংলার মন্দিরের টালি তা সে পাহাড়পুরের হোক বা বিষ্ণুপুরেরই হোক সে সবে ছবিত্বগুণ ভাস্কর্যগুণকে ছাপিয়ে গেছে। সুতরাং একথা অনায়াসে বলা যায় যে, মধ্যযুগের চিত্রের নমুনা খুব কম থাকলেও তার চরিত্র এবং গুণাগুণ কি রকম ছিল তার আন্দাজ আমরা ভারতীয় মন্দিরের বেস রিলিফে বিলক্ষণ জানতে পারি। —ভারতের চিত্রকলা শ্রীঅশোক মিত্র।

৫৬ "রাখাল দাস তাঁর দক্ষিণ পশ্চিমবঙ্গের শিল্প" প্রবন্ধে লিখছেন (১৩৩৬ মাঘ প্রবাসী পৃঃ ৫৭০-৭২) যে কলকাতায় ১৯০৬ সালে যখন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস উপলক্ষে একটি প্রদর্শনী হয় তখন বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের তরফ থেকে ব্যোমকেশ মুস্তফী একটি ষ্টল খোলেন। এই ষ্টলে রাখালদাস কিছু চিত্র দেখেছিলেন। চিত্রগুলি সম্বন্ধে উক্ত প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন - "শক্ত কাগজের উপর আঁকা এই চিত্রগুলি বিষ্ণুপুর হইতে আনা হইয়াছিল। - ...আবার আঠার বৎসর পরে আমি ফ্রেঞ্চের কাছে ঠিক সেই ধরণের তিনটি ছবির আলোক চিত্র পাই।" ফ্রেঞ্চের কাছে দেখা যে তিনটি চিত্র তিনি প্রবাসী পত্রিকায় প্রকাশ করেছেন তার উপর রাজস্থানী এবং মোগল চিত্রের গভীর প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। ঠিক একই রকম চারখানি চিত্র একসময় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বিষ্ণুপুর শাখার পক্ষে কুচিয়াকোল রাজবাড়ী থেকে সংগৃহীত হয়। ব্যোমকেশ মুস্তফী, মিঃ ফ্রেঞ্চ এবং ৫২ —৫৩ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বিষ্ণুপুর শাখা প্রায় একই

আগেই বলা হয়েছে, ষোড়শ-সপ্তদশ শতক রাজস্থানী চিত্ররীতির বিকাশ ও বিবর্তনের এক গৌরবময় অধ্যায়। ক্রমশঃ এ রীতি যে সারা ভারতে, বিশেষ করে মোগলঅধিকারভুক্ত অঞ্চলে বিস্তার লাভ করেছে তারও উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। বঙ্গদেশের পশ্চিমের জেলাগুলিতে অবস্থানের কালে এই মধ্যযুগীয় রীতি যে বঙ্গের লোকায়ত চিত্ররীতির স্পর্শে একটি সাবলীল রূপান্তর লাভ করেছে তাও চিত্র সমালোচকরা লক্ষ্য করেছেন বীরহাম্বীরের সময়ের কিছু চিত্রিত পাটায়।

ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে রাজস্থানী চিত্রকলার গৌরবময় যুগে (এবং মোগল-গরিমার মধ্যাহ্নকালে) বিষ্ণুপুর গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও সংস্কৃতির সমুন্নত বিকাশ ঘটে। আগেই বলা হয়েছে, ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে রাজস্থানী চিত্রকলার সর্বাধিক জনপ্রিয় বিষয় ছিল শ্রীমদ্ভাগবত আর আর শ্রীগীতগোবিন্দ কেন্দ্রিক কৃষ্ণলীলা। বিশেষভাবে শ্রীমদ্ভাগবত আর গীতগোবিন্দ-কেন্দ্রিক গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম-সংস্কৃতির তদানীন্তন বিশিষ্ট কেন্দ্র বিষ্ণুপুরের পাটাচিত্র আর টেরাকোটা-ভাস্কর্যে রাজস্থানী চিত্ররীতি তার স্বক্ষেত্র খুঁজে পেয়েছিল।

একথা সর্বজনবিদিত যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের বেনামে ভারতীয় প্রাচীন ক্লাসিক-সংস্কৃতিরই পুনরুজ্জীবন ঘটেছিল। এই অন্তিম মধ্যযুগেও তাই শুধু ভাষা সাহিত্যেই নয়, শিল্পকলাতেও ক্লাসিক স্মৃতিচারণ লক্ষ্য করা যায়। এই অন্তিম মধ্যযুগে বিকশিত বিশিষ্ট সংস্কৃতিকেন্দ্র বিষ্ণুপুরের শিল্পকলায় ক্লাসিক ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন প্রয়াসের প্রতিচ্ছবি দুর্নিরীক্ষ্য নয়। বলাবাহুল্য এই সময় বৈষ্ণব-সংস্কৃতির প্রেরণায় বিষ্ণুপুরে ক্লাসিক সঙ্গীতেরও বিকাশ ঘটে। ক্লাসিক সঙ্গীতের মতই এই মধ্যযুগীয় ক্লাসিক-উত্তর (Post-classic) শিল্পধারা বৈষ্ণব-সংস্কৃতিরই সঙ্গী হয়ে উত্তর ভারত থেকে বিষ্ণুপুরে প্রবেশ করে। তাই মিনিয়েচার-চিত্রকলার মতই এখানের টেরাকোটা

শ্রেণীর চিত্র। এগুলি মল্লরাজবংশের আভিজাত্য কামনারই দ্যোতক।

ভাস্কর্যে ক্লাসিক-স্মৃতিবাহী ক্লাসিক-উত্তর (Post-classic) রাজস্থানী চিত্ররীতির প্রভাব স্বাভাবিক ভাবেই অনুভূত হয়। শুধু পাটাচিত্রে নয় শক্ত কাগজে আঁকা একধরণের রাজস্থানী চিত্ররীতি প্রভাবিত পট-চিত্রের কথাও আগে বলা হয়েছে।

বলাবাহুল্য বিষ্ণুপুরের রাজারা রাজস্থানী আভিজাত্যেরই ধ্বজাধারী ; তাঁদের আদিপুরুষের জন্ম বৃত্তান্তের সঙ্গেও রাজপুতানার স্মৃতি জড়িত। তাঁদের আদিম কৌমধর্ম আর সংস্কৃতিকে আচ্ছাদিত করার জন্যই হয়ত তাঁরা বিশেষভাবে তদানীন্তন সর্বভারতীয় অভিজাত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম ও সংস্কৃতির (প্রাচীন ক্লাসিক সংস্কৃতির নামান্তর) আশ্রয় নিয়েছিলেন।

বিষ্ণুপুরের সপ্তদশ শতকের টেরাকোটা ভাস্কর্যে বিকশিত ঋদ্ধ পরিশীলিত সুষমামণ্ডিত শিল্পরীতির সঙ্গে পরবর্ত্তীকালের অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকের মন্দির-টেরাকোটার রীতি বা আঙ্গিকগত পার্থক্য একনজরেই ধরা পড়ে।

প্রথমোক্ত (সপ্তদশ-শতকের) শ্রেণীর মন্দির-টেরাকোটায় প্রোফাইল ভঙ্গীতে বেস-রিলিফে উদ্গত চিত্রে দারু-ভাস্কর্যের যে আবেদন লক্ষ্য করা যায়, পরবর্তীকালের মন্দিরে অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকের সম্মুখগত ভঙ্গীতে সুউচ্চ-রিলিফে উদ্গত কুমোর শিল্পীদের পুতুল-প্রতিমার অনুরূপ চকচকে 'বনক' দেওয়া (Slip) টেরাকোটা মূর্তিতে তা বিরল।

কিন্তু শুধু আঙ্গিকে নয়, ছন্দে, লিরিক-মূর্চ্ছনায়, স্পন্দমান রেখার তরঙ্গভঙ্গে বিকশিত প্রথমোক্ত সতেরো-শতকের টেরাকোটায় ক্লাসিক ঐতিহ্যবাহী যে প্রাণচাঞ্চল্য আর গতিচাঞ্চল্যের সজীব অভিব্যক্তি দেখা যায়, কম্পোজিশন এমনকি বিষয়বস্তু নির্বাচনে যে মুন্সীয়ানা লক্ষ্য করা যায়, দ্বিতীয় স্তরের (অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকের) মন্দির-টেরাকোটায় তা অনুপস্থিত। বিষয়বস্তু নির্বাচনে কম্পোজিশনে প্রথম স্তরের টেরাকোটায় ক্লাসিক ঐতিহ্যের স্মৃতি আভাসিত। বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে দেখা যায়, ক্ল্যাসিক বা পৌরাণিক বিষয়গুলি মুখ্যতঃ গোস্বামী-সিদ্ধান্তের দার্শনিক আলোকে তত্ত্ববহ হয়ে বিষ্ণুপুরের মন্দির-টেরাকোটায় স্থান লাভ করেছে।

শ্রীমদ্ভাগবতের জনপ্রিয় এবং জাতীয় বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সুপরিচিত একাধিক চিত্র এখানে নির্বাচিত হয়েছে। অধিকাংশই এসেছে রাজস্থানী চিত্রকলার মাধ্যমে। সুসমৃদ্ধ স্টাইলটির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করে নির্বাচিত বিষয়বস্তু এবং তাদের কম্পোজিশনে একটি ক্লাসিক বাতাবরণ রচনার প্রয়াস সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়।

শ্যামরায় মন্দিরের দক্ষিণের বারান্দায়, গর্ভগৃহে প্রবেশের গলি-পথের ডানদিকে পারিজাত হরণের বড় আকারের টেরাকোটা-চিত্রটি এমনি এক ঐতিহ্যবাহী চিত্র। বাদামী গিরিগুহায় ভিক্টোরিয়া এলবার্ট মিউজিয়ামে সংরক্ষিত মোগল চিত্রে, অঙ্কোরভাটে এর সাক্ষাৎ মেলে। চিত্রে-ভাস্কর্যে, ভারত বহির্ভারতে এর সমান জনপ্রিয়তা।

চিত্রে দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণ গরুড়ের উপর এবং ইন্দ্র ঐরাবতের উপর চড়ে ঘোরতর যুদ্ধে রত। মাঝে অনেকটা লতার আকারে উৎকীর্ণ পারিজাত বৃক্ষ। টেরাকোটা-চিত্রটির সরলীকৃত ব্যঞ্জনাবহ রূপটি দেখে মনে হয়, এটি কোন রাজপুত-মোগল চিত্রেরই অনুসরণ। অঙ্কোরভাটের ভাস্কর্যে পারিজাতহরণ বিশদভাবে উৎকীর্ণ।[৫৭]

---

57 There is a graphic representation at Badami where his riding Garuda fighting Indra, bringing Pari-jata, and planting it in Satyabhama's courtyard forms a long narrative frieze. The theme is so appealing that it is represented again in several paintings. There is the beautiful Mughal painting in Victoria and Albert museum illusrating the fight between Indra and Krishna, the one from his elephant and other from his Garuda. The latter getting the better of the elephant by his supreme strength: The Kangra School has also several representations of the theme including the planting of tree in the palace courtyard of Satyabhama which gave her supreme satisfaction

কৃষ্ণলীলা চিত্রণের ক্ষেত্রে রাজস্থানী চিত্রকলায় সমধিক জনপ্রিয় আর একটি চিত্র হল "শ্রীকৃষ্ণের গাভী দোহন" ; চিত্রটির টেরাকোটা রূপান্তর লক্ষ্য করা যায় শ্যামরায় মন্দিরের উপরতলার অষ্টকোণাকৃতি কেন্দ্রীয় চূড়াটির দক্ষিণ (পূর্বদিক ঘেঁসে) দিকের ভিত্তি সংলগ্ন ফ্রিজে। চিত্রটি শ্রীকৃষ্ণের গোদোহন চিত্র। মনে হয় চিত্রটি গোস্বামী সিদ্ধান্তের সূত্রেই এখানে সন্নিবেশিত হয়েছে, গোস্বামীগ্রন্থের একটি শ্লোককে অনুসরণ করে। শ্লোকটি রূপ গোস্বামীর পদ্যাবলীর একটি শ্লোক। শ্লোকটি হ'ল—

অঙ্গুষ্ঠাগ্রমযন্ত্রিতাঙ্গুলি রসৌ পাদার্ধ-নীরুদ্ধভূ
রাদ্রীকৃত্য পয়োধরাঞ্চলমলং সদ্যঃ পয়োবিন্দুভিঃ।
ন্যগ জানুদ্বয়মধ্যে যন্ত্রিতঘটী বক্ত্রান্তরালস্থল—
দ্ধারাধ্বনি মনোহরং সখি পয়ো গাং দোগ্ধি দামোদরঃ ॥

(সখি ! বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রে অন্যঅঙ্গুলি সংযত করিয়া পাদার্ধ দ্বারা পয়োধরের অঞ্চলকে আদ্রীকৃত করিলেন ও পরে জানুদ্বয়ের মধ্যে

---

and Joy in the reassurance of Krishna's immense affection for her, which made possible even the celestial tree to be brought to the earth fighting no less a person, than the lord of the celestials .... the theme is so great that in the vast and unlimited representation of various exploits, of Vishnu in the largest temple of Vishnu in Asia, at Angkor-Vat, there is the carrying away of Parijata from heaven by Krishna on Garuda represented in low relief. In his recent book on the life of Krishna in Indian art, Dr. P. Banerjee has enlivened his interesting description by well-chosen pictures to illustrate the theme.

Fragrance And Parijata Harana : by Sivaramamurti Aspect of Indian Art And Culture : Riddhi India : Calcutta 1983.

সংবৃতঘটীর মুখের অন্তরাল হইতে প্রক্ষালিত দুগ্ধধারার মনোহর শব্দ উদ্গত হইতে লাগিল। এইরূপে দামোদর দুগ্ধদোহন করিতেছেন অবলোকন কর (পদ্যাবলীর ২৬৩নং এই শ্লোক শরণের)।

এমনি আর একটি টেরাকোটা-চিত্রে শোনা যায় গোস্বামী গ্রন্থের অন্য একটি শ্লোকের প্রতিধ্বনি। এই চিত্রটি রয়েছে জোড়বাংলা মন্দিরের দক্ষিণের বারান্দায়। যেখানে শত শত নৃত্যচিত্র রয়েছে সারা বারান্দার দেওয়াল জুড়ে। মন্দিরের দক্ষিণের এই বারান্দা থেকে গর্ভগৃহে প্রবেশদ্বারের ডানদিকের দেওয়ালে রয়েছে চিত্রটি। শ্রীকৃষ্ণ মুরলীতে সুর দিচ্ছেন— আর সেই সুরে বীণা বাঁধছেন এক গোপী। চিত্রটি স্মরণ করিয়ে দেয় রূপগোস্বামীর পদ্যাবলীর একটি শ্লোক। শ্লোকটি হ'ল ঃ —

সখি স বিজিতো বীণাবাদ্যৈঃ কয়াপ্যপরস্ত্রিয়া ...... পদ্যাবলী

(সখি কোন কামিনী বীণা বাদ্যের দ্বারা তাঁহার মন হরণ করিয়াছে।) শুধু এই টেরাকোটা চিত্রটিই নয় বীণাবাদ্যে এবং নৃত্যগীতে কৃষ্ণচিত্ত বিনোদনের শতাধিক চিত্র পাওয়া যাবে বিভিন্ন মন্দির খুঁজলে। সঙ্গীত নৃত্যের মাধ্যমেই রাগানুগাভক্তির সফল প্রকাশ। বিষ্ণুপুরের প্রায় প্রতি মন্দিরেই উচ্ছ্বল নৃত্যগীত আর উজ্জ্বল রাধাকৃষ্ণলীলার পাশাপাশি শত শত সাধু সন্ন্যাসীর বিভিন্ন প্রক্রিয়ায় জপ-তপের চিত্র দিয়ে মোটা দাগে গোস্বামীমতে বৈধী আর রাগানুগাভক্তির প্রকারভেদ দেখানো হয়েছে বলেই মনে হয়। জোড়বাংলা মন্দিরের দক্ষিণপূর্ব কোণায় বেশকিছু "রাধাকৃষ্ণলীলা" চিত্র রয়েছে। বস্ত্র-হরণ, কালীয়দমন, জলকেলি নৌকালীলা ইত্যাদি। পৌরাণিক আর অপৌরাণিক চিত্রগুলির একত্র সমন্বয় ঘটেছে। গোস্বামী সিদ্ধান্তের মাধ্যমে এই দুইধারা মিলিত হয়েছে। দানলীলা-নৌকালীলা অপৌরাণিক কাহিনী। শ্রীমদ্ভাগবতে নাই কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আছে। কাহিনীগুলি পৌরাণিক না হলেও কপোলকল্পিত নয়। পরবর্তীকালে ভাগবতের অনুবাদ সূত্রে এই অপৌরাণিক লীলা-কাহিনীগুলি বিভিন্ন কৃষ্ণায়ণ ও প্রেমামৃত কাব্যে অনুপ্রবেশ করেছে।

কাহিনীগুলি ভিত্তিহীন নয় বা গ্রন্থবিশেষের উদ্ভাবনও নয়। হরিবংশে নৌকাবিহার, গর্গসংহিতায় দানলীলা, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ভারখণ্ড, প্রভৃতির উল্লেখ দেখা যায়। আগেই বলা হয়েছে গোস্বামীসিদ্ধান্তের মাধ্যমেই শ্রীকৃষ্ণলীলা কাহিনীতে পৌরাণিক অপৌরাণিক দুটি ধারার মিলন ঘটেছে—মূলতঃ সিদ্ধান্তসূত্রেই এগুলির টেরাকোটায় স্থান লাভ। জলকেলির চিত্রটি রয়েছে জোড়বাংলা মন্দিরের দক্ষিণপূর্ব কোণায় (পূর্বদিকের কোনার উপরের দিকে)। চিত্রটির পশ্চাতে রূপগোস্বামীর "পদ্যাবলী"র একটি শ্লোকের প্রেরণা অনুমান করা যায়। শ্লোকটি হল ঃ—

জলকেলি তরল করতলমুক্ত পুণঃ পিহি রাধিকা বদনঃ।
জগদবতু কোকযুনোর্বিঘটন সংঘটন কৌতুকী কৃষ্ণঃ ॥

জলকেলিতে তরল করতল দ্বারা শ্রীরাধিকার বদন মোদন এবং পুনরায় তাহাকে আচ্ছাদন করেন চক্রবাকচক্রবাকী দ্বয়ের সংঘটন ও বিঘটনে কৌতুকী সেই শ্রীকৃষ্ণ জগৎকে রক্ষা করুন। জলকেলির পাশাপাশি প্রায় একই স্থানে রয়েছে (দক্ষিণ-পূর্ব কোণের দক্ষিণ দিকে) নৌকালীলার সুন্দর চিত্রটি। চর্যার ১৩নং পদে নৌকাযাত্রার রূপকে মহাসুখ সিদ্ধিকথা বর্ণিত। নিজের দেহ হইল করুণা, শূণ্যই স্ত্রী, অর্থাৎ নিজের দেহে শূণ্য ও করুণার যুগনদ্ধরূপ উপলব্ধ হইয়াছে। (চর্যাগীতি পরিচয় ঃ ডঃ সত্যব্রত দে) শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের নৌকাখণ্ডে নৌকালীলা এবং জলমধ্যে রাধাকৃষ্ণের যৌন মিলনে মহাসুখের ব্যঞ্জনা বিদ্যমান। ডঃ নীহাররঞ্জন রায় সঙ্গতভাবেই শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে বৌদ্ধ সহজিয়ার প্রভাব লক্ষ্য করেছেন। জোড়বাংলার পূর্বদক্ষিণ কোণায় পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে যে কৃষ্ণলীলা চিত্রগুলি সন্নিবেশিত হয়েছে তাদের সন্নিবেশের ক্রমটিতেও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রভাব অনুভূত হয়। বিশেষতঃ কালীয়দমন আর বস্ত্রহরণ প্রায়ই একই সঙ্গে যুক্ত। শুধু চিত্র দুটির অবস্থান মন্দিরের কোণের দিকে হওয়ায় একটি চিত্র পূর্ব দিকের দেওয়ালে অন্যটি দক্ষিণের দেওয়ালে পড়েছে। চিত্রদুটির একত্র সংযুক্তি দেখে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন সম্পর্কে ডঃ সুকুমার সেনের মন্তব্য স্মরণ হয়। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথমখণ্ড পূর্বার্ধ) গ্রন্থে

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের আলোচনা প্রসঙ্গে একস্থানে তিনি বলেছেন— "অপিচ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে বস্ত্রহরণ আর কালীয়দমন সমাহৃত হইয়াছে, আদি-রসের কিছু রঙ্ রাখিবার জন্য।" দানলীলার যে চিত্রটি (জোড়বাংলার ত্রিখিলান প্রবেশদ্বারের মাঝের দ্বারটির ডানদিকে একেবারে ভিত্তিসংলগ্ন পটিতে) দেখা যায় ক্ষয়ে গিয়ে অস্পষ্ট হলেও তাতে বড়াইসহ রাধাকৃষ্ণের চিত্রটি বেশ বোঝা যায়। চিত্রে দুরন্ত কৃষ্ণের রাধিকার প্রতি রতিলিপ্সু আচরণ সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। শ্রীরাধিকার বক্ষস্থলের বস্ত্র আকর্ষণে উদ্যত দুর্দান্ত কৃষ্ণের চিত্রটিতে দানখণ্ডের রাধার আক্ষেপোক্তি যেন ফুটে উঠেছে বাহু মোর মোড়িয়াঁ বলয় সব ভাঁগিলেক / ভাঁগিলেক তনের অঞ্চলে।"

শ্যামরায় মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশের গলিপথের বাঁদিকে দেখা যায় সংকীর্তনকারী বৈষ্ণবের পায়ে লুণ্ঠিত জনৈক ভক্ত। চিত্রটি যেন বৈষ্ণবস্মৃতি "নৃসিংহ পরিচর্যার" একাদশ পটলে বিবৃত শ্লোকটির প্রতিচিত্র। বৈষ্ণবকৃত্য নির্দেশ করতে গিয়ে গ্রন্থে বিবৃত শ্লোকে বলা হয়েছে ···

বৈষ্ণবো বৈষ্ণবং দৃষ্ট্বা দণ্ডবৎ প্রণমেদ্ভুবি।
উভয়োরন্তরা বিষ্ণুঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ ॥

বৈষ্ণবব্যক্তি বৈষ্ণবকে দর্শন করিয়া ভূমিতে দণ্ডের ন্যায় পতিত হইয়া প্রণাম করিবেন যেহেতু শঙ্খচক্র গদা পদ্মধারী বিষ্ণু উভয়ের অন্তরে বিদ্যমান আছেন।

ভক্তিগ্রন্থ পাঠ ও শ্রবণ বৈষ্ণবধর্মের অন্যতম অনুশাসন। একথা সর্বজনবিদিত যে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের দ্বারাই শ্রীনিবাস গোস্বামী মল্লরাজসভা বিজয় করেন। মদনমোহন মন্দিরের একটি টেরাকোটা চিত্র এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। চিত্রটি নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ। চিত্রটি রয়েছে মন্দিরের (দক্ষিণ দিকের দেওয়ালে) সম্মুখভাগের ভিত্তিসংলগ্ন (দক্ষিণের বারান্দায় প্রবেশের ত্রিখিলান প্রবেশদ্বারের সবচেয়ে বাঁদিকের শেষ খিলান-দরজাটির বাঁদিকে) সবচেয়ে নীচের পটিতে। চিত্রটি পুঁথি পাঠের। চিত্রটিকে "শ্রীনিবাসের মল্লরাজসভা বিজয়ের"

ঐতিহাসিক ঘটনাটির প্রতিচিত্র বলেই মনে হয়। পুঁথি আর শ্রীনিবাস অভিন্ন হয়ে উঠেছিলেন। মল্লভূমে পুঁথি লুঠকে কেন্দ্র করে শ্রীনিবাসের বিষ্ণুপুরে আবির্ভাব, শ্রীমদ্ভাগবতের পুঁথিপাঠ করেই তাঁর মল্লরাজ সভা বিজয়। চিত্রটিতে দেখা যায় জটাজুটধারী একসন্ন্যাসী বা বৈষ্ণব আচার্যের পাশে বসে পাঠ শুনছেন এক রাজপুরুষ। মনে হয় জটাজুট সমন্বিত এই ধরণের মূর্তি বৈষ্ণব আচার্যদের প্রথাবদ্ধ চিত্ররূপ (বা প্রতিমা লক্ষণ) লাভ করেছিল বিষ্ণুপুরের মন্দির-টেরাকোটায়; এমনি এক জটাজুটধারী গ্রন্থপাঠরত আচার্যের টেরাকোটা-চিত্র রয়েছে বিষ্ণুপুরের রাধাবিনোদ মন্দিরে(খড়বাংলা), সামনে বসে পাঠ শুনছেন এবং মালা জপছেন দুই স্ত্রীলোক। পুঁথিপাঠরত এই গোস্বামী-চিত্রে রূপগোস্বামী রচিত ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর একটি শ্লোকের প্রতিধ্বনি শোনা যায়।

বৈষ্ণবানি তু শাস্ত্রাণি যে শৃণ্বন্তি পঠন্তিচ।
ধন্যাস্তে মানবা লোকে তে স্বাং কৃষ্ণঃ প্রসীদতি॥ ২০৫
(শ্রীচৈতন্য সারস্বত মঠ শ্রীধাম নবদ্বীপ প্রকাশিত ॥ ১২ই চৈত্র ১৩৫৪ সাল)

শ্লোকার্থ : যাঁহারা বৈষ্ণবশাস্ত্র শ্রবণ করেন বা পাঠ করেন সংসারে তাঁহারাই ধন্য। তাঁহাদের প্রতি শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হন॥ ২০৫

আগেই বলা হয়েছে উপরোক্ত গ্রন্থপাঠরত গোস্বামী সমীপে দুই নারী গ্রন্থপাঠ শ্রবণ করছেন এবং মালাজপ করছেন। এই মালাজপও বৈষ্ণব স্মৃতির অন্যতম অনুশাসন— "ত্রিসন্ধ্যা জপমালার দ্বারা জপ করিবে" মালাজপ সম্পর্কে এই বিধানটি খড়বাংলা মন্দির-টেরাকোটায় (দুই নারীর পাঠ শ্রবণের সঙ্গে মালা জপের চিত্র) প্রতিফলিত হয়েছে বলেই মনে হয়। বৈষ্ণব স্মৃতি শাস্ত্রোক্ত 'নৃসিংহ পরিচর্যায়' মালাজপ সম্পর্কে বলা হয়েছে।

শঙ্খরৌপ্যময়ীমালা কাঞ্চনী নীরজোৎপলৈঃ।
পদ্মাক্ষৈশ্চাপি রুদ্রাক্ষৈ বিদ্রুমৈ র্মণিমুক্তকৈঃ।
নির্ম্মিতেন্দ্রাক্ষকৈর্ম্মালা তথৈবাঙ্গুলিপর্ব্বভিঃ।
পুত্রজীবময়ী মালা শস্তা বৈ জপকর্ম্মণি॥ ইতি ॥ ১৯

শঙ্খময়ী, রৌপ্যময়ী, কাঞ্চনময়ী, পদ্মময়ী, কুমুদময়ী, পদ্মবীজ রুদ্রাক্ষ বিদ্রুম্ (প্রবাল) মণি মুক্তা এবং পুত্রজীবময়ী মালা জপকর্মে এই সকল প্রশস্ত হয়।

উক্ত নৃসিংহপরিচর্যায় মালা সংস্কারের একটি বিধি আছে। তাতে বলা হয়েছে—

ক্ষালয়েৎ সদ্যোজাতেন বামদেবেন ঘর্ষয়েৎ।
ধূপয়েদ্বাপ্যঘোরেণ লেপয়েৎ পুরুষেণ তু।
মন্ত্রয়েৎ পঞ্চমেনৈব প্রত্যেকন্তু শতং শতং।
মেরুঞ্চ পঞ্চমেনৈব তথা ঘোরেণ মন্ত্রয়েৎ।

সদ্যোজাত মন্ত্রদ্বারা মালাকে ক্ষালন করিবে, বামদেব মন্ত্রদ্বারা ঘর্ষণ করিবে, অঘোর মন্ত্রদ্বারা ধূপন করিবে, তৎপুরুষ মন্ত্রদ্বারা লেপন করিবে এবং পঞ্চম অর্থাৎ ঈশাণাদি মন্ত্রদ্বারা প্রত্যেক এক এক-শতবার অভিমন্ত্রিত করিবে।

বলাবাহুল্য উপরোক্ত সদ্যোজাত, বামদেব, অঘোর, তৎপুরুষ ও ঈশান পঞ্চানন শিবের পঞ্চমুখ। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের স্মার্ত অনুশাসনোক্ত অনুষ্ঠান"নৃসিংহপরিচয্যায়" শিবের পঞ্চমুখের ধ্যানমন্ত্র দ্বারা মালাক্ষালনের যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তারই চিত্ররূপ রয়েছে শ্যামরায় মন্দিরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণার প্রকোষ্ঠে পঞ্চবক্ত্র শিবের বড় আকারের টেরাকোটা চিত্রের নীচে উৎকীর্ণ হিরণ্যকশিপু বধরত নৃসিংহদেবের চিত্রটিতে। এই দুই চিত্রকে ঘিরে টেরাকাটায় জোড়হস্ত ভক্তের সারি উৎকীর্ণ করে পূজা বা ব্রত উদযাপনের ইঙ্গিতটিই যেন মূর্ত করা হয়েছে।

আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনের সংগ্রহে একটি তাৎপর্য-পূর্ণ টেরাকোটা-ফলক রয়েছে। শাঁখারীবাজার এবং রাসতলার দুটি ভগ্নমন্দির (বর্তমানে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত) থেকে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বিষ্ণুপুর শাখা প্রতিষ্ঠার (পঞ্চাশের দশকে) পরেই সংগৃহীত হয়েছিল বেশকিছু টেরাকোটা-ফলক। এরই একটিতে দেখা যায় মা-যশোদা শিশুকৃষ্ণকে দুষ্টুমি করার জন্য দুটি হাতে রজ্জু দিয়ে

বাঁধছেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের শুদ্ধাভক্তির অন্যতম অভিব্যক্তি শুদ্ধ-বাৎসল্যের দৃষ্টান্ত এটি। এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়—

মাতা মোরে পুত্ররূপে করেন বন্ধন।
অতি হীন জ্ঞানে করে লালন পালন॥
সখা শুদ্ধ সখ্যে করে স্কন্ধে আরোহণ।
তুমি কোন বড়লোক তুমি আমি সম॥

শুধু রজ্জু দিয়ে শিশু কৃষ্ণকে সাধারণ শিশুর মত বন্ধনের চিত্রই নয় জোড়বাংলা মন্দিরের পশ্চিমের আর দক্ষিণের দেওয়ালে যথাক্রমে রাম-লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্ন এবং কৃষ্ণ-বলরামের বাল্যলীলার চিত্রগুলিতে শুদ্ধ-বাৎসল্যরসের চিত্রগুলি লক্ষ্য করা যায়। জোড়বাংলা মন্দিরের পশ্চিমের দেওয়ালে কৌশল্যা-কৈকেয়ী সুমিত্রার কোলে যথাক্রমে রাম-ভরত-লক্ষ্মণ আর শত্রুঘ্নকে(সুমিত্রার দুই সন্তান লক্ষ্মণ আর শত্রুঘ্ন) সাধারণ মানুষের শিশুর মতই মায়েদের কোলে লালিত হতে দেখা যায়; ঠিক পাশেই দেখা যায় রাম-লক্ষ্মণ অলৌকিক বীরত্ব সহকারে তাড়কা বধ করছেন।

অনুরূপভাবে দেখা যায় মন্দিরের (সম্মুখভাগে) দক্ষিণ দিকের ত্রিখিলান প্রবেশদ্বারের সর্বদক্ষিণেরটির ডানদিকের দেওয়ালে কৃষ্ণ-বলরামের অসুরবধের দৃশ্যগুলি। নীচেই রয়েছে মাতৃক্রোড়ে কৃষ্ণ-বলরামের টেরাকোটা-চিত্র। সখারা প্রত্যহ গোষ্ঠে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণের অলৌকিক শক্তির পরিচয় পেতেন অসুর বধ ইত্যাদি কর্মে। কিন্তু তা বিস্মৃত হয়ে নির্দ্বিধায় শ্রীকৃষ্ণের মুখে উচ্ছিষ্ট ফল (শ্যামরায় মন্দিরের ত্রিখিলানের দুটি পূর্ণ স্তম্ভের বাঁদিকেরটির ভিত্তিমূলে, ভিতরের দিকে) তুলে দিচ্ছেন - শুদ্ধ-সখ্যের নিদর্শন। রাম-লক্ষ্মণ এবং কৃষ্ণ-বলরাম একদিকে অমিত পরাক্রমে, অলৌকিক দৈবী শক্তিতে অসুর আর রাক্ষসী বধ করছেন— আবার তাঁরাই সাধারণ শিশুর মত মাতৃক্রোড়ে লালিত হচ্ছেন।

জোড়বাংলা মন্দিরের দেওয়াল জুড়ে দেবীযুদ্ধ। পুরাণে কথিত আছে শুম্ভ-নিশুম্ভ আর তাদের সেনাপতি চণ্ডমুণ্ডের সঙ্গে

দেবীর যুদ্ধে সহায়তা করার উদ্দেশে বিভিন্ন দেবতার এবং স্বয়ং দেবীর দেহোদ্ভূত শক্তিগুলি বিভিন্ন মাতৃকার রূপ পরিগ্রহ করে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। রণরঙ্গিনী মাতৃকাদের প্রচণ্ড যুদ্ধোন্মাদনা করধৃতপাত্রে চণ্ডমুণ্ডের ছিন্ন মুণ্ড সহ শিব বা শববক্ষে দণ্ডায়মানা লোলজিহ্বা, ভীষণা, ভয়ঙ্করী দেবী কালিকার রক্তলোলুপ-জিঘাংসা যেন শিল্পীর অভূতপূর্ব কৃতি-কুশলতায় জীবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে সংঘর্ষ-সংঘাতে গতিময় এই যুদ্ধ প্যানেলেই যুদ্ধরত মাতৃকা মূর্তি-গুলির নীচের দিকে গণেশ-জননীর (গণেশকে কোলে নিয়ে দেবী দুর্গার মাতৃমূর্তি) মূর্তি, অদূরে কার্তিকেয়ের চিত্র। গণেশ জননী স্কন্দমাতার এই চিত্রে প্রচণ্ড চণ্ডিকার শুদ্ধ-বাৎসল্যের অভিব্যক্তি। মাতৃকা প্যানেলের যুদ্ধরত উগ্র শক্তিমূর্তিগুলির মাতৃকা আখ্যা সপ্রমাণ করার জন্যই মনে হয় কার্তিক-গণেশ সহ জননীরূপিনী দেবীর এই স্নেহময়ী চিত্র এখানে সন্নিবিষ্ট হয়েছে। যিনি অমিত শক্তিরূপিনী প্রচণ্ড-চণ্ডিকা – তিনিই গণেশ জননী স্কন্দমাতা-স্নেহময়ী জননী। একই ভাবে রাম আর কৃষ্ণের দেবীলীলার পাশাপাশি মনুষ্যোচিত শুদ্ধ বাৎসল্যের চিত্রগুলির সন্নিবেশে একদিকে যেমন শুদ্ধাভক্তির ইঙ্গিত দেওয়া হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি এগুলিতে দেবীসত্বার মানবিক লীলার মধ্যে যে এক অচিন্ত্যভেদাভেদও বর্তমান তার আভাস চিন্তা দেওয়া হয়েছে বলে মনে হয়।

একসময় (১৯৫৮ ?) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ বিষ্ণুপুর শাখার সমাবর্তন ভাষণ দিতে এসে, জোড়বাংলা মন্দির পরিদর্শনকালে ডঃ সুকুমার সেন জোড়বাংলা মন্দিরের উত্তর দিকের দেওয়ালের (নকল ত্রিখিলান দরজার) বাঁদিকে উৎকীর্ণ অবতার প্যানেলের অন্তর্ভুক্ত একটি নধরকান্তি মূর্তিকে শ্রীনিবাসের মূর্তি বলে সনাক্ত করেন। সম্ভবতঃ মূর্তির হাতে একগোছা পুঁথির উপস্থিতিই এই অনুমানের কারণ বলে মনে হয়। আগেই বলা হয়েছে পুঁথির সূত্রেই শ্রীনিবাসের বিষ্ণুপুরে আগমন এবং পুঁথিপাঠের মাধ্যমেই তাঁর মল্লরাজসভা বিজয়। তাই হয়ত পুঁথি আর শ্রীনিবাস একাকার হয়ে গিয়েছিলেন।

গোবিন্দ দাস রচিত শ্রীনিবাস বন্দনার পদে বলা হয়েছে—

যুগল-ভজন-গুণ লীলা আস্বাদন
গ্রন্থ-কলপ-তরু হাতে।

বৈষ্ণব জগতে শ্রীনিবাস অবতারস্বরূপ পুরুষ রূপেই খ্যাত ছিলেন। গোবিন্দ দাসের শ্রীনিবাস বন্দনার পদেও এই অবতারত্বের ইঙ্গিত বর্তমান। তিনি লিখেছেন—

প্রেম নাম কহি কহত ভাগবতে
ঐছে বরণ তনু সাজে॥"

টীকায় বলা হয়েছে— শ্রীমদ্ভাগবতের দশমস্কন্ধের অষ্টম অধ্যায়ে গর্গমুনি শ্রীকৃষ্ণের প্রেম নাম কীর্ত্তন করে একটি শ্লোকের মাধ্যমে যুগভেদে ভগবানের বিভিন্ন দেহবর্ণের যে বর্ণনা দিয়েছেন, সেই বর্ণনানুসারে কলিযুগে ভগবানের জন্য নির্দিষ্ট পীতবর্ণের সঙ্গে শ্রীনিবাসের দেহবর্ণের মিল ছিল। মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের প্রতিশ্রুতির প্রবাদ স্মরণ করে, এবং নানাবিধ অদ্ভুত মহিমা দেখে পরবর্তী বৈষ্ণব ভক্তগণ শ্রীনিবাস আচার্যকে মহাপ্রভুর অন্যতর অধঃস্তন অবতার বা আবেশ অবতাররূপে গণ্য করতেন। মনে হয় বৈষ্ণব ভক্তগণের মধ্যে প্রচলিত এই সংস্কার অনুযায়ী শ্রীমন্মহাপ্রভু তথা বিষ্ণুর অবতাররূপে কল্পিত হয়েই শ্রীনিবাস আলোচ্য মন্দিরের অবতার প্যানেলের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন।

মন্দির-টেরাকোটার অবতার প্যানেলে আর একটি কৌতুহলোদ্দীপক ব্যাপার দেখা যায় অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতকে। অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকের বেশ কিছু মন্দির-টেরাকোটার অবতার প্যানেলে বুদ্ধের স্থানে জগন্নাথ মূর্তির অবস্থান চিত্তাকর্ষক।

বিষ্ণুপুর এবং তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের সপ্তদশ শতকের মন্দিরে দেখা যায় বুদ্ধদেব যথাস্থানে অর্থাৎ অবতারদের নবম স্থানে যথারীতি বর্তমান। অবশ্য মন্দির-টেরাকোটা এবং সমকালীন পাটাচিত্রে বুদ্ধের মূর্তিটি একটি প্রথাবদ্ধ বিশিষ্ট (Stylized) রীতিতে চিত্রিত দেখা যায়। বুদ্ধের চিরপরিচিত ভাস্কর্য রূপের সঙ্গে এই মূর্তির পার্থক্য প্রচুর। এ মূর্তির মাথায় এক ধরণের সর্পিল জটা এবং গায়ে

নক্সাকরা জ্যাকেট বা জামা (অনেকে এই জামাকে উত্তরীয় বলেছেন)। শুধু বিষ্ণুপুরেই নয়, অধ্যাপক যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ত্রিপুরা থেকে দশাবতারের যে পাটাচিত্রটি একসময় সংগ্রহ করেছিলেন এবং প্রবাসী পত্রিকায় (১৩৩৫ পৌষ) এর উপর যে প্রবন্ধটি ("একখানা প্রাচীন পুঁথির মলাট চিত্র") প্রকাশ করেছিলেন তাতে লিখেছেন "এই দশাবতার চিত্রের মধ্যে বুদ্ধের চিত্রটির একটু বিশেষত্ব আছে বুদ্ধের মাথায় জটা ঝুঁটি করিয়া বাঁধা। হাত দুখানি বৈষ্ণবদের মত উত্তরীয় বস্ত্রের মধ্যে প্রবিষ্ট। কৌপীন পরিহিত পদ্মাসনোপবিষ্ট -- ... ।" পাটার বয়স সম্বন্ধে অধ্যাপক গুপ্ত বলেছেন "মোটামুটিভাবে বিচার করিতে গেলেও এই মলাটচিত্রটির বয়স প্রায় ২৫০শত বৎসর হইতে ৩০০শত বৎসরের মধ্যে, ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে।" অতএব পাটাচিত্রটির বয়স মোটামুটি বিষ্ণুপুরের মন্দিরগুলির সমসাময়িক। যাইহোক, বিষ্ণুপুরের সপ্তদশ শতকের মন্দিরে এবং সমসাময়িক এই সব পাটাচিত্রে বিষ্ণুর দশাবতার প্যানেলে দেখা যায়, যথারীতি বুদ্ধমূর্তিই অঙ্কিত বা উৎকীর্ণ হয়েছে।

কিন্তু বিষ্ণুপুরের অষ্টাদশ শতকের মল্লরাজ চৈতন্য সিংহ নির্মিত শ্রীশ্রীরাধাশ্যাম মন্দিরে (১৭৫৮ খ্রীঃ) বা বিষ্ণুপুরের বসু পাড়ার শ্রীধর মন্দিরে (১৮শ শতকের শেষে কিংবা ১৯শ শতকের গোড়ার দিকে) এবং পার্শ্ববর্তী বেশকিছু ১৮শ-১৯শ শতকের মন্দিরে বুদ্ধের স্থানে জগন্নাথ মূর্তি লক্ষ্য করা যায়। জয়পুরের (বিষ্ণুপুরের অদূরবর্তী একটি থানা) কুয়াতলা বাস স্টপে নেমে হাটতলা দিকে অগ্রসর হলে পথের বাঁদিকে প্রাকার বিশিষ্ট একটি মন্দির চোখে পড়ে। এ মন্দিরেও সম্মুখভাগে অবতার প্যানেলে বুদ্ধের স্থানে জগন্নাথদেবকে দেখা যায়। কোতুলপুরের (বিষ্ণুপুর মহকুমার একটি থানা) চৌমাথা থেকে অদূরে হাটতলা যাবার পথে ডানদিকের গলির ভেতরে অবস্থিত 'রম' পদবীধারী এক পরিবারের একটি ছোট মন্দিরেও বুদ্ধের স্থানে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে দেখা যায়। এই গ্রামেই একটি দালান মন্দিরের (করদের পাড়ায় ?) পাথরের টেরাকোটা প্যানেলে অনুরূপ দৃশ্য

দেখা যায়। আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনে সংরক্ষিত একটি রঙীন পাটাচিত্রেও বুদ্ধের স্থানে জগন্নাথকে দেখা যায়। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হ'ল বিষ্ণুপুরের চক্রাকার দশাবতার তাসে বুদ্ধের স্থানে জগন্নাথের উপস্থিতি।

যদি ধরেও নেওয়া যায় যে, উড়িষ্যা থেকে এই খেলা বিষ্ণুপুরে এসেছে এবং সেই সূত্রে জগন্নাথদেবের চিত্র দশাবতার তাসে সংযোজিত হয়েছে, তবু প্রশ্ন থেকে যায় ঠিক বুদ্ধের পরিবর্তেই বা এই সংযোজন কেন? দ্বিতীয়তঃ সপ্তদশ শতকের শেষ ভাগেও বিষ্ণুপুরের শ্রীশ্রীমদন-মোহন মন্দিরে (১৬৯৪ খ্রীঃ) যথারীতি বুদ্ধ রয়েছেন।

তাহলে কি অষ্টাদশ শতকেই বুদ্ধ-জগন্নাথের অভিন্নত্বসূচক কোন চিন্তা বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছিল এবং এই সময়ের চিত্রে অথবা মন্দির-টেরাকোটায় কি তারই প্রতিফলন ঘটেছে? এ সম্পর্কে কয়েকটি সূত্রের উল্লেখ করা যেতে পারে।

শূণ্য পুরাণের (শ্রীভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত। ফার্মা কে, এল, এম, প্রাইভেট লিমিটেড ঃ ১৯৭৭ সংস্করণ) আদ্যডাক বা সৃষ্টিপত্তন অধ্যায়ে দশাবতারের বন্দনায় নবম স্থানে জগন্নাথের উল্লেখ আছে।

নবম মূর্তেতে হরি জগন্নাথ নাম ধরি
জলধির তীরে কৈলা বাস

জলধির তীরবর্তী এই দেবতা যে বৌদ্ধ দেবতা এমন ইঙ্গিতও এই শূণ্য পুরাণের উক্ত অধ্যায়ে আছে।

জলধির তীরে বাস বোদ্দরূপে ভগবান
হয়্যা তুমি কৃপাবলোকন।

এই শূণ্য পুরাণের রচনাকাল ও লিপিকাল সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে সম্পাদক (শ্রীভক্তিমাধব চট্টোপাধ্যায়) লিখেছেন ঃ আমার অনুমান মূল রচনা ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দী ধরে নিলেও বর্তমান শূণ্যপুরাণের কাঠামো ষোড়শ শতাব্দীর এবং যে পুঁথি বা পুঁথিগুলি থেকে শূণ্য পুরাণ সম্পাদিত তাদের লিপিকাল ও স্থানবিশেষে অংশগুলির রচনাকাল ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দের অন্ততঃ কয়েক বৎসর পূর্বে এর অধিক

প্রাচীন নয়। ডঃ সুকুমার সেন "শূণ্য পুরাণ" ও "রামাই পণ্ডিত" সম্পর্কে তার বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে (প্রথম খণ্ড, অপরার্ধ) লিখেছেন – তথাকথিত শূণ্যপুরাণ এই "ব্যক্তিরই" রচিত বলিয়া এখনও কেহ কেহ বিশ্বাস করেন। সংজাত পদ্ধতির ছড়া ও পদগুলিতে সাধারণতঃ ভণিতা পাই— "শ্রীযুত রামাঞি অথবা পণ্ডিত শ্রীরাম (রামাই)" পৌরাণিক শ্রীরাম নামটির পিছনে আসল রচয়িতা রামাই ও অন্যান্য ব্যক্তি আত্মগোপন করিয়া গিয়াছেন। ধর্মপূজার ছড়া ও ও নিবন্ধগুলি ধর্মপূজার প্রবর্তক কোন একটি "শ্রীরামাই" পণ্ডিতের লেখা হইতে পারেনা। এগুলি যেসব পুঁথিতে পাওয়া গিয়াছে তাহার অধিকাংশ ঊনবিংশ শতকে গ্রন্থবদ্ধ। সবচেয়ে পুরানো পুঁথিগুলিও অষ্টাদশ শতাব্দের মধ্যভাগের আগে লেখা নয়। একথাও সত্য যে, ছড়ার কোন কোন অংশ বেশ পুরাণো। কিন্তু সে অংশের ভাষা অপর অংশের ভাষার মতই আধুনিক, অর্থাৎ অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দের। আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয়ের মতে ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রচনা আরম্ভ এবং অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এতে সংযোজন ঘটেছে।

বিশেষভাবে মল্লরাজা ও রাজন্যবর্গের খেলার জন্য রাজশিল্পী ফৌজদার (রাজদত্ত উপাধি) বা সূত্রধরদের প্রস্তুত এই তাসে বিধৃত "বুদ্ধ-জগন্নাথ" (বুদ্ধের স্থলে জগন্নাথ) চিন্তার কোন প্রতিফলন বিষ্ণুপুরের সপ্তদশ শতকের মন্দির টেরাকোটায় হল না কেন ? এটা সত্যিই আশ্চর্যজনক, অথচ পরবর্তীকালের বা অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকের বিষ্ণুপুর বা তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বহু মন্দিরের টেরা-কোটায় (দশাবতার প্যানেলে) বুদ্ধের স্থলে জগন্নাথ (নবম স্থানে) চিত্রিত হয়েছেন দেখা যায়। এই বৈচিত্র্য দেখে প্রশ্ন জাগে যে, যখন বিষ্ণুপুরের সপ্তদশ শতকের মন্দিরগুলি নির্মিত হয় তখনকি দশাবতার তাসের প্রচলন বিষ্ণুপুরে হয় নাই ?

বিষ্ণুপুরের ইতিহাসের একটি পাণ্ডুলিপিতে (পাত্রসায়ের থানার বামিরা নিবাসী প্রমথনাথ সেনগুপ্তের রচিত এবং তাঁর পুত্র নিত্যানন্দ সেনগুপ্তের দ্বারা পুনর্লিখিত) দেখা যায়, বিষ্ণুপুরের মল্লরাজা গোপাল সিংহের (অষ্টাদশ শতক) দরবারে এ খেলার প্রথম

প্রচলন হয়। অবশ্য বর্তমানে প্রচলিত তাসের চিত্রগুলিতে মোগল চিত্ররীতির প্রভাব সুস্পষ্ট। নির্দিষ্ট করে কিছুই বলা সম্ভব নয়—এ প্রসঙ্গে গবেষণা প্রয়োজন।

শ্যামরায় মন্দিরের দক্ষিণের বারান্দায়, গর্ভগৃহে প্রবেশের গলি পথে ঢোকার মুখে ডানদিকের দেওয়ালে, টেরাকোটায় রথমধ্যে জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রার শ্রীমূর্তি, "ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর" নিম্নলিখিত শ্লোকটিরই যেন চিত্ররূপ ঃ

রথেন সহ গচ্ছন্তি পার্শ্বতঃ পৃষ্ঠতোহগ্রতঃ।
বিষ্ণুনৈব সমাঃ সর্বে ভবন্তি শ্বপচাদয়ঃ ॥

চণ্ডাল কুলে উৎপন্ন ব্যক্তিগণও যদি শ্রীভগবানকে রথারোহণে গমন করিতে দেখিয়া পার্শ্বে পশ্চাতে বা অগ্রে রথের সহিত গমন করেন তবে তিনি বিষ্ণুতুল্যত্ব (সারূপ্য, সার্ষ্টি) প্রাপ্ত হন।

নবদ্বীপ পুরী (উড়িষ্যা) এবং বৃন্দাবন তদানীন্তনকালের তিনটি প্রধান নগরেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের বিকাশ বিবর্তন এবং পরিণতি ঘটে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের চর্চা-চিন্তা এবং গবেষণায় এই তিনটি প্রাচীন হিন্দু সংস্কৃতি-কেন্দ্রের প্রভাব সুগভীর। শ্রীজগন্নাথের রথযাত্রা শ্রীচৈতন্যের জীবনে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। তাঁর জীবনের শেষদিক পুরীতেই কাটে। তাই রথে অধিষ্ঠিত জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রার শ্রীমূর্তি তাঁর প্রবর্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মেও গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল।

শ্যামরায় মন্দিরের দক্ষিণের বারান্দার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল, এখানের টেরাকোটায় উড়িষ্যার প্রভাব। নানাভাবে উড়িষ্যার প্রভাব এখানে পড়েছে। শুধু শ্রীজগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রা মূর্তিই নয়, কিছু টেরাকোটায় ওড়িশি বা গুজরাটি চিত্রের ছায়াপাতও অনুভূত হয়। এই দেওয়ালেই শ্রীজগন্নাথের চিত্রের পাশেই রামরাজার চিত্রটিতে অনুরূপ একটি ওড়িশি পটের সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। গর্ভগৃহে প্রবেশের গলিপথের (ভিতরে) বাঁদিকের দেওয়ালের অনন্ত-শয্যা চিত্রটিও ওড়িশি পটচিত্রের অনুসরণ বলেই মনে হয়। উড়িষ্যার প্রভাব সবচেয়ে সুস্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে গর্ভগৃহের মূলপূজাবেদীর

পশ্চাদ্‌বর্তী রাসমণ্ডলটির বিচিত্র কম্পোজিশনে। এটিতে হুবহু কোণারক মন্দিরের চাকার অনুকরণ লক্ষ্য করা যায়। এক নজরেই এমিল ধরা পড়ে।

শুধু তাই নয়, দক্ষিণের বারান্দার (গর্ভগৃহে প্রবেশের পূর্বে) বাঁদিকের দেওয়ালে কৃষ্ণ-বলরামের পার্শ্ববর্তী নৃত্যরতা গোপী বা নর্তকীদের বসন, ভূষণ, বেণীবন্ধনে ওড়িষি প্রভাব সুস্পষ্ট। এখানে একইভাবে লক্ষ্য করা যায় গুজরাটি চিত্রের কিছু উদ্‌বৃত্ত উপকরণ। এই দক্ষিণের বারান্দায় প্রবেশের ত্রিখিলান দ্বারের সবচেয়ে বাঁদিকে অবস্থিত (দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে) প্রবেশ-খিলানটির বাঁদিকের দেওয়ালের সংলগ্ন অর্ধ স্তম্ভটির ভিতরের দিকের কোণে গুজরাটি চিত্রের ধরণের হাত-পাখা এবং কাঠের বিচিত্র তে-পায়া বিশিষ্ট পীঠিবার উপস্থিতি এপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এখানের এবং মদনমোহন মন্দিরের একাধিক টেরাকোটা-চিত্রের উপস্থাপনে প্রাচীন গুজরাটি চিত্রের মতই চিত্রে উপরে নীচে ভিন্ন (অবশ্য ধারাবাহিক) দৃশ্যের সন্নিবেশ দেখা যায়।

সমকালীন উড়িষ্যার চিত্রকলায় যে প্রাচীন গুজরাটি চিত্রের প্রভাব পড়েছিল একথা "হিস্ট্রি অফ দি আর্ট অফ উড়িষ্যা" গ্রন্থে চার্লস ফ্রেব্রি সুস্পষ্টভাবেই লিখেছেন। তিনি প্রকার এবং রীতিভেদে উড়িষ্যার মিনিয়েচার চিত্রকলাকে দুটি মোটা দাগে ভাগ করেছেন; একটি হল তালপাতার পুঁথির উপর সূচাগ্র লেখনী বা "স্টাইলাস" দিয়ে আঁকা কৌণিক রীতির চিত্রাবলী অন্যটি পুঁথির পাটা বা শক্ত কাগজে (বা কাপড়ে আঁকা পটে) আঁকা বলিষ্ঠ সাবলীল এবং সহজ সঞ্চরণশীল রেখাবন্ধে রচিত মিনিয়েচার চিত্রাবলী।[৫৮] দুধরণের চিত্রের উপরেই জৈন মিনিয়েচার (বা গুজরাটি চিত্ররীতি) চিত্ররীতির প্রভাব বর্তমান।

---

58 History Of The Art Of Orissa গ্রন্থে (Charles Louis Fabri) উড়িষ্যার চিত্রকলার বিশ্লেষণ করে তার আটটি প্রকারভেদ বা লক্ষণ দেখিয়েছেন। মোটামুটি এখানের চিত্রকলাকে দুটি মোটা ভাগে ভাগ করেছেন। একটি তালপাতার পুঁথির উপর সূচাগ্র লেখনী বা

পার্শ্ববর্তী উড়িষ্যা থেকে যে স্থাপত্য-ভাস্কর্যে প্রভাব বিষ্ণুপুরে বা বঙ্গের পশ্চিমের জেলাগুলিতে পড়েছিল তা আগেই বলা হয়েছে। চিত্রকলা, বিশেষ করে এ অঞ্চলের মিনিয়েচার-চিত্রকলার প্রেরণাও মোটামুটি সেখান থেকেই এসেছে বলে অনেকে মনে করেন (ইস্টার্ণ ইণ্ডিয়ান ম্যানুস্ক্রিপ্ট পেইন্টিং) এই প্রভাবই এখানের পটে-পাটায় টেরাকোটায় রূপে অথবা রূপান্তরে আভাসিত হয়েছে এমন মনে করা অসঙ্গত নয়। বঙ্গের বিশিষ্ট লোকশৈলীর প্রভাবে বিষ্ণুপুরের "দশাবতার তাসে" লোক-চিত্রকলার স্বভাবসিদ্ধ বলিষ্ঠ সাবলীল রেখা-বন্ধে পরিস্ফুট মূর্তিগুলির অবয়ব-আঙ্গিকে সরলীকরণ, অঙ্কণগত বৈচিত্র্য এবং পার্থক্য থাকলেও এই তাসের প্রেরণা যে মূলতঃ উড়িষ্যা থেকে এসেছে এটা অস্বীকার করা যায় না।[৫৯]

আগেই বলা হয়েছে, সপ্তদশ-শতকে কেন্দ্রীভূত মোগল শাসনের প্রভাব প্রায় সারা ভারতেই অনুপ্রবেশ করেছিল। সাম্রাজ্যবাদী মোগল রাজত্বের প্রভাব সারা ভারতের সর্বত্র, কি রাজনৈতিক, কি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছিল। মূল-মোগল চিত্ররীতির প্রচুর অনু-শীলনের ফলে উদ্ভূত "জনপ্রিয় মোগল শৈলী" প্রায় সারা ভারতের মোগল আধিপত্যাধীন রাজ্যগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে। এরই সঙ্গে প্রাচীন পশ্চিম ভারতীয় চিত্ররীতির মিশ্রণে যে রাজস্থানী রীতির বিকাশ ঘটে এবং রাজস্থানের রাজদরবারগুলির মাধ্যমে বিশেষ করে ভারতের হিন্দু রাজ্যেগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে, একথাও পূর্বে বলা হয়েছে।

---

৫৮ বা স্টাইলাস দিয়ে আঁকা কৌণিক ধরণের চিত্রাবলী—অন্য ধারাটি হ'ল পুঁথির পাটা বা শক্ত কাগজ ইত্যাদির উপর আঁকা সাবলীল এবং স্বচ্ছন্দ সঞ্চরণশীল বলিষ্ঠ রেখাবন্ধে আঁকা চিত্রাবলী। তিনি বলেছেন—"both of which can be claimed to be characteristically Orissan, though both have a great-deal of kinship with ancient Gujarati illuminations, once called Jaina miniature paintings"

—History Of The Art Of Orissa : Charles Louis Fabri. Orient Longman Ltd. 1974.

কেন্দ্রীভূত সর্বগ্রাসী এই মুঘলশক্তি ভারতের সংস্কৃতি ক্ষেত্রে নানাভাবে প্রভাব বিস্তার করে। মোগল দরবারী আভিজাত্য যে সারা ভারতে মোগলের অধীন রাজ্যগুলিতে প্রসারিত হয়েছিল, তা বিষ্ণুপুরের জোড় বাংলার (ভিত্তিসংলগ্ন পটীতে) দৃষ্টান্তসহ আগেই উল্লেখ করা হয়েছে।

এই প্রভাবশালী মুঘল সংস্কৃতি রাজনৈতিক ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত হয়ে অপ্রতিহত হয়ে উঠেছিল। ফলে সমকালীন (ষোড়শ-সপ্তদশ-অষ্টাদশশতক) হিন্দুরাজ্যগুলিতে একটি সূক্ষ্ম প্রতিক্রিয়াশীল আত্মনিয়ন্ত্রণী বা 'আত্মনির্ধারণী' চেতনা প্রসূত রিভাইভ্যাল' চিন্তা স্থাপত্যে ভাস্কর্যে চিত্রকলায় আভাসিত হয়। এই হিন্দু রিভাইভ্যালে মল্লভূমের চিন্তা-চর্চা-শিক্ষা-দীক্ষার ক্ষেত্রে যেমন নবদ্বীপের একটি বিশিষ্ট ভূমিকায় দেখা যায়—বিষ্ণুপুর তথা মল্লভূমের হাজার হাজার সংস্কৃত পুঁথির সংগ্রহে—অন্যদিকে এখানের স্থাপত্য-ভাস্কর্য চিত্রকলায় তেমনি উড়িষ্যার মুখ্য ভূমিকা উপলব্ধি করা যায়। দশাবতার তাসের প্রচলনও মুঘল তাসের প্রবর্তন ও প্রচলনের প্রতিক্রিয়া প্রসূত বলে মনে করা অসঙ্গত নয়। মল্লভূম থেকে সংগৃহীত (১৪৯৯ খ্রীঃ) দশাবতার পাটাচিত্র সম্পর্কেও প্রায় এই ধরণের এক প্রতিক্রিয়ার আভাস দিয়েছেন জে, সি, ফ্রেঞ্চ। (This work is an example of primitive Hindu art which sprang up after the storm of the Muhammadan invasion had subsided. (J.C. French Land of Wrestlers – Indian Art & Letters Vol No. I, 1927, vide Eastern Indian Manuscript

---

59. Apparently influenced in technique and presentation by its Orissan neighbour the swelling forms of the Vishnupur Cards are however stylistically different from popular Ganjifa of Orissa. The two dimensional linear conception bulging out in bold and robust rhythm is typical of Bengali folk idiom."

—Folk Art Of Bengal. D. P. Ghosh. Visva-Bharati Publication.

Printing) যদি উক্ত পাটাচিত্রের সময় যথার্থভাবে ১৪৯৯খ্রীঃ হয় তবে মোগল রাজত্বের পূর্বের ঘটনা এবং পরিস্থিতিও পৃথক। যাইহোক, মুশ্লিম যুগে হিন্দু-প্রতিক্রিয়ার এটি একটি পরোক্ষ দৃষ্টান্ত রূপেই ধরা যেতে পারে।

পাল-সেন যুগে উড়িষ্যা থেকে রেখ ও পীড়া দেউলের একটি ধারা মূলতঃ মল্লভূমের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল। তারই পুনরুজ্জীবন ঘটল রূপান্তরে মল্লরাজাদের রত্ন মন্দিরে। স্থাপত্যক্ষেত্রে এটি একটি রিভাইভ্যাল; টেরাকোটা-ভাস্কর্যে বিরাট পৌরাণিক জগতের হাজার হাজার মূর্তিচিত্র· বিমূর্ত মুশ্লিম চিত্র-ভাস্কর্যেরও যেন অনেকটা প্রতিক্রিয়া জাত। একথাও মনে করা হয়, একদা যেমন উড়িষ্যা থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমবঙ্গে স্থাপত্য-শিল্পের একটি ধারা প্রবাহিত হয়েছিল, ভাটার টানে তাই আবার উড়িষ্যায় ফিরে গিয়েছিল। উড়িষ্যার বাল্লেশ্বর জেলার ইঁটের তৈরী কিছু টেরাকোটা মন্দির সম্বন্ধে নির্মলকুমার ঘোষ একথা বলেছেন। তিনি তাঁর "ভারতশিল্প গ্রন্থে (ফার্মা কে. এল. মুখোপাধ্যায়ঃ কলিকাতাঃ ১৯৭৩) লিখেছেন- "মুশ্লিম রাজত্বকালে বালেশ্বর জেলায় ইঁটে তৈরী একাধিক মন্দির নির্মিত হয়েছিল। সেই মন্দিরে সুন্দর সুন্দর অলঙ্করণের কাজও দেখা যায়; কিন্তু তাকে ওড়িষি-শিল্পের নিদর্শন বলা ঠিক নয়। যে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যরীতি একদা ওড়িষ্যা থেকে পশ্চিমবঙ্গে প্রবাহিত হয়েছিল, ভাটার টানে সেই প্রবাহই যেন উজানে ফিরে এসেছিল। মেদিনীপুর, বাঁকুড়ার বাস্তুকারেরাই নিয়োজিত হয়েছিল এইসব মন্দির নির্মাণে। মন্দিরের ভাস্কর্যের ধাঁচ দেখে এ রকমই মনে হবে। (ভারতশিল্প পৃঃ ১৩৫)

বিশিষ্ট শিল্প-সমালোচক চার্লস ফেব্রি তাঁর "হিস্ট্রি অফ দি আর্ট অফ উড়িষ্যা" গ্রন্থে ময়ূরভঞ্জ জেলার বারিপদার সন্নিকট হরিপুরের "রসিক রায়ের" টেরাকোটা-ইঁটের মন্দিরের প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে বিষ্ণুপুরের টেরাকোটা-মন্দিরের উল্লেখই শুধু করেননি সেগুলির উৎকর্ষও স্বীকার করেছেন।[৬০] এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে "পার্শি ব্রাউন" রচিত গ্রন্থে বিষ্ণুপুরের মন্দিরের কালনির্ণয়ের ক্ষেত্রে অনবধানতাপ্রসূত কিছু ভ্রমপ্রমাদ লক্ষ্য করা যায়।

ময়ূরভঞ্জের হরিপুরে (বা হরিপদায়) অবস্থিত রসিকরায় মন্দিরের টেরাকোটা-চিত্রের সঙ্গে পার্শিব্রাউন বিষ্ণুপুর (বাঁকুড়া) মন্দিরের টেরাকোটা-চিত্রের সমধর্মিতার কথাও উল্লেখ করেছেন। তাঁর বর্ণনায় এবং তাঁর "হিষ্ট্রি অফ দি আর্ট অফ উড়িষ্যা"গ্রন্থে প্রকাশিত হরিপুরের রসিকরায় মন্দিরের টেরাকোটার চিত্র থেকে উভয় মন্দিরের টেরাকোটা চিত্রাবলীর বিষয়বস্তুগত মিল লক্ষ্য করার মত। রসিকরায় মন্দিরের কৃষ্ণলীলা চিত্রগুলি তো বটেই মন্দিরের ভিত্তিসংলগ্ন পটিতে (বেসমেণ্ট ফ্রিজে) জোড়বাংলার উত্তরদিকের ভিত্তিসংলগ্ন পটির মতই মোগল সামন্ত-আভিজাত্যের প্রতীকী চিত্রাবলী (দরবার, হারেম, যুদ্ধযাত্রা) একইভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে দেখা যায়।[৬১]

---

60 Some comparison with brick temples in Bengal spring to the mind. A number of those have been discovered, some well published, but hardly any go back to a period earlier then 17th or 18th century. Percy Brown has already drawn attention to an 18th century brick temple with curvilinear roof at Vishnupur in his Indian Architecture, Vol-I. P-188. but which differs rather conspicuously from our Rasikaraya in the surface decoration, full of Bankura's skilled terracotta work.

61 Very few of the figurative panels (Rasik Roy Temple of Orissa) can be seen well enough to judge of the quality of the modelling but their kinship to such terracotta panels as those on the Buddhist temple of Paharpur or the 19th century(?) Bankura shrines is evident.-- ....At the very base are scenes from a court or darbar." – History of the Art of Orissa. Charles Louis Fabri. (P-180) Orient Longman Ltd. 1974.



৬

বিষ্ণুপুরের মন্দির-টেরাকোটায় কৃষ্ণলীলার রূপায়ণ-বৈচিত্র্য

বিষ্ণুপুরের মন্দির-টেরাকোটায় গোপীকৃষ্ণ বা রাধাকৃষ্ণের নৃত্যগীতের চিত্রগুলির ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ। কৃষ্ণলীলার আধ্যাত্মিক উৎস শ্রীমদ্ভাগবত হলেও তার শিল্পরূপের উৎস শ্রীগীতগোবিন্দ। গীতগোবিন্দের শ্লোকগুলি যে কৃষ্ণলীলার চিত্র-ভাস্কর্যের অন্যতম আদি উৎস বা 'আর্কিটাইপ' একথা আগেই বলা হয়েছে। অধ্যাত্ম রসের সঙ্গে সঙ্গীত আর শৃঙ্গাররসের মিশাল দিয়ে জয়দেব যে মানবিক আবেদন সৃষ্টি করেছেন তা থেকেই উৎসারিত হয়েছে কৃষ্ণলীলার ছন্দোময় গীতিময় চিত্রগুলি। জয়দেবের গীতগোবিন্দের শ্লোকগুলিতে এক একটি 'মিনিয়েচার' চিত্র নিহিত আছে একথা আগেই বলা হয়েছে। গীতগোবিন্দের শেষ শ্লোকটিতে এর ধাতুপ্রকৃতির আভাস মেলে।

যদগান্ধর্ব্বকলাসু কৌশলমনুধ্যানঞ্চ যদ্বৈষ্ণবং
যচ্ছৃঙ্গারবিবেকতত্ত্বমপি যৎ কাব্যেষু লীলায়িতম্
তৎ সর্ব্বং জয়দেবপণ্ডিতকবেঃ কৃষ্ণৈকতানাত্মনঃ
সানন্দাঃ পরিশোধয়ন্তু সুধিয়ঃ শ্রীগীতগোবিন্দতঃ ॥ ২৭ ॥

হে সুধী! যদি সঙ্গীত শাস্ত্রের রাগরাগিণীতে থাকে তোমার প্রীতি,

সর্বব্যাপী বিষ্ণুর ধ্যানে যদি থাকে তোমার আগ্রহ, বিবেকতত্ত্ব আর শৃঙ্গাররসকাব্যে নিপুণতা লাভের যদি থাকে বাসনা, তাহলে আনন্দের সঙ্গে কর পাঠ, কৃষ্ণগতপ্রাণ কবিপণ্ডিত জয়দেবের রচনা এই শ্রীগীতগোবিন্দ।

গান্ধর্ব-বিদ্যা বা মার্গসঙ্গীত ও নৃত্যকলা যে গীতগোবিন্দের কৃষ্ণলীলা চিত্রণের অন্যতম মাধ্যম তা কবি নিজেই বলেছেন। এপ্রসঙ্গে বিষ্ণুপুরের জোড়বাংলা মন্দিরের দক্ষিণের বারান্দায় প্রবেশের ত্রিখিলান প্রবেশ-পথের ডান দিকের (শেষের) দরজার খিলানের (ভেতরের দিকে) মাথায় উৎকীর্ণ বীণাধর গন্ধর্বদের চিত্রগুলি উল্লেখযোগ্য। প্রাচীন প্রথাবদ্ধ রীতিতে উৎকীর্ণ এই ধরণের চিত্রগুলি ভারতীয় শিল্পকলায় অজন্তা গুহাচিত্রের কাল থেকেই লক্ষ্য করা যায়। অর্ধেক পক্ষী এবং অর্ধেক মানুষের আঙ্গিকে উৎকীর্ণ "বীণাধর-গন্ধর্ব"দের এই চিত্রগুলি মার্গ সঙ্গীতের দ্যোতকরূপে এখানে উৎকীর্ণ হয়েছে বলেই মনে হয়। এখানের বারান্দায় শত শত নৃত্যচিত্র এবং বেশকিছু উজ্জ্বল গীতবাদ্যের চিত্র লক্ষ্য করা যায়। একটি চিত্রে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনির সঙ্গে সুর মিলিয়ে জনৈক গোপী বীণা বাঁধছেন। এ যেন মার্গসঙ্গীতের শুদ্ধ সুরারোপের বিষয়টিরই আভাস। এ প্রসঙ্গ পূর্বে আলোচিত হয়েছে। প্রাচীন ভারতীয় সঙ্গীত শাস্ত্রে গান্ধর্ব-সঙ্গীত বলতে মার্গসঙ্গীতকেই বোঝায়—কল্লিনাথের টীকায় এ মন্তব্য সুস্পষ্ট।[৬২]

---

৬২ কল্লিনাথের মন্তব্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় 'গান্ধর্ব সঙ্গীত" বৈদিকত্বের সম্মান পাবার যোগ্য। মার্গসঙ্গীতও তাই। কাজেই সাদৃশ্যের দিক থেকে গান্ধর্ব ও মার্গ সমপর্যায়ভুক্ত ও অভিন্ন। নাট্য-শাস্ত্রকার ভরত এই গান্ধর্বগানকে গন্ধর্বদের একমাত্র প্রিয় সঙ্গীত বলেছেন। "গন্ধর্বাণামিদং যস্মাৎ তস্মাদ্ গান্ধর্বমুচ্যতে" (নাট্যশাস্ত্র) এই গন্ধর্বদের দেশ ছিল নাকি গান্ধার অর্থাৎ বর্তমান কান্দাহারে। ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে বা কাবুলে। ... ... — গান্ধর্ব সঙ্গীতের রূপ সম্বন্ধে পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন গান্ধর্ব স্বর, তাল ও পদের সংমিশ্রণে সৃষ্ট— 'গান্ধর্বমিতি বিজ্ঞেয়ং স্বরতাল পদাশ্রয়ম্।

নৃত্যগীতের চিত্রগুলিতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শনেরও একটি দিক আভাসিত হয়েছে বলে মনে করা অসঙ্গত নয়। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বলা হয়েছে :

পূর্ণানন্দময় আমি চিন্ময় পূর্ণতত্ত্ব।
রাধিকার প্রেমে আমায় করায় উন্মত্ত ॥
না জানি রাধিকার প্রেমে আছে কত বল।
যে বলে আমাকে করে সদাই বিহ্বল ॥
রাধিকার প্রেম গুরু আমি শিষ্য নট।
সদা মোরে নানা নৃত্যে নাচায় উদ্ভট ॥

ছন্দে আর নৃত্যে যেন "হ্লাদিনী-শক্তির" লীলাবৈচিত্র্যেরই আভাস। আগে বহুবার বলা হয়েছে বৈষ্ণব ধর্মের গোস্বামী-সিদ্ধান্ত প্রাচীন ভারতীয় শাস্ত্র-সাহিত্যের ক্লাসিক প্রেক্ষাপটেই নির্মিত। উপনিষদের ব্রহ্ম-মায়া, কিংবা সাংখ্যের পুরুষ প্রকৃতির প্রভাবই এখানে আভাসিত। মূলতঃ শ্রীকৃষ্ণ পরমব্রহ্ম নির্বিকার, নিরাসক্ত অচঞ্চল। তাঁর হ্লাদিনী শক্তি শ্রীরাধা বা গোপীদের প্রেমই এই নির্বিকার ব্রহ্মের চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে অথবা বলা ভাল হ্লাদিনী শক্তির লীলা চাঞ্চল্যই এই নির্বিকার অচঞ্চলের উপর প্রতিবিম্বিত হয়। যেমন রক্তপুষ্পের সংস্পর্শে বর্ণহীন স্ফটিক রক্তবর্ণ ধারণ করে।

এদিক থেকে ভরত গান্ধর্বকে স্বরতাল ও পদ হিসাবে তিনভাগে ভাগ করেছেন। তাছাড়া আর একটি লক্ষ্য করবার বিষয় যে, গান্ধর্বগানের উৎপত্তি হয়েছে বীণা ও বংশ থেকে "অস্য যোনির্ভবেদ্ গানং বীণাবংশস্তথৈবচ।" (নাট্যশাস্ত্র)। অনেকের মতে গান্ধর্ব গানই মার্গ-সঙ্গীত। টীকাকার কল্লিনাথও স্বীকার করেছেন—"গান্ধর্বং মার্গঃ। ……মোটকথা কল্লিনাথ গান্ধর্বকে মার্গসঙ্গীতের আভিজাত্য দিয়ে গানের সঙ্গে পৃথক করে দেখিয়েছেন।" বিষ্ণুপুরের জোড়বাংলা মন্দিরের দক্ষিণ দিকের বারান্দায় ত্রিখিলান প্রবেশদ্বারের ডানদিকেরটির মাথার উপরে খিলানে উৎকীর্ণ বীণাধর গন্ধর্ব চিত্রগুলি থেকে বৈষ্ণব যুগের বিষ্ণুপুরে মার্গসঙ্গীত প্রবর্তনের একটি ক্ষীণ আভাসও মেলে।

নৃত্যেই হ্লাদিনী-শক্তির লীলা প্রকাশের শ্রেষ্ঠ মাধ্যমরূপে গৃহীত হয়েছে টেরাকোটায়। ভারতের মন্দির ভাস্কর্যে সর্বত্রই নৃত্যভঙ্গির ভূমিকা অবিসংবাদিত। কারণ, শাস্ত্রীয় নৃত্য মানেই ছন্দ। শুধু নৃত্য নয় চিত্র তথা সর্বপ্রকার শাস্ত্রীয় বা মার্গ শিল্পকলায় ছন্দই প্রাণ। শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ বলেছেন (ভারতশিল্পে ষড়ঙ্গ) "ছন্দকে অভিধানে বলা হইয়াছে আহ্লাদয়তি ইতি—ইনি হ্লাদিত করেন, ইনি হ্লাদিনী শক্তি।

সত্তত্ত্বমাশ্রিতা শক্তিঃ কল্পয়েৎ সতি বিক্রিয়াঃ।
বর্ণাভিত্তিগতা ভিত্তৌ চিত্রং নানাবিধং যথা॥
—পঞ্চদশী, ভূতবিবেক, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, শ্লোক ৫৯

স্বভাবতঃ বর্ণহীন-ভিত্তিতে সংগত হইয়া, বর্ণসকল ভিত্তিটিকে যেমন নানারূপে চিহ্নিত করিতেছে, তেমনি স্বভাব-নিষ্ক্রিয় যে সৎ তাঁহাতে সংগত হইয়া শক্তি তাঁহাকে বিক্রিয়া দিতেছেন। কাজেই দেখিতেছি, হ্লাদিনী যে শক্তি তিনি একদিকে গতি বা মুক্তি, আর এক দিকে স্থিতি বা বন্ধন—এই দুই পারের দুই আলিঙ্গনে সৎ যে তাঁহাকে দোলা দিয়া বিক্রিয়া দিতেছেন। হ্লাদিন্যা সাম্বিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ। সৎ যে বস্তুটি স্বভাবতঃ নিষ্ক্রিয় তিনি হ্লাদিনীর শক্তির সচেতন আলিঙ্গন পাইয়া চিৎ এবং আনন্দরূপে নন্দিত হইয়া উঠিতেছেন বা ছন্দিত হইতেছেন। (ভারতশিল্পে ষড়ঙ্গ : অবনীন্দ্রনাথ : বিশ্ববিদ্যা সংগ্রহ—বিশ্বভারতী : বৈশাখ ১৩৫৪ : পৃঃ ৫১)

এই ছন্দই কৃষ্ণলীলা প্রকাশের বিশিষ্ট মাধ্যম হয়েছে কি কাব্যে কি চিত্র-ভাস্কর্যে। আর এই ছন্দোবন্ধে কৃষ্ণকথার লিরিক ধাতু প্রকৃতিটি উদ্ঘাটিত করার বিচিত্র পথটির আবিষ্কারক জয়দেব।

"যেহেতু গীতগোবিন্দের বিষয় কৃষ্ণলীলা, বোধহয় সেই কারণেই প্রত্যেকটি ছবি যেন নাচের ছন্দে সংযত, তরঙ্গায়িত প্রতিটি প্রাণী যেন নৃত্যের ছন্দে জীবন্ত। স্পষ্ট বোঝা যায় যে পনেরো, শতকের শেষভাগে আর ষোল শতকের প্রথম ভাগে সারা পশ্চিমভারতে বৈষ্ণবধর্মের যে ঢেউ খেলে যায় গীতগোবিন্দের ছবি তারই সাক্ষ্য বয়ে বেড়াচ্ছে। ভারতের চিত্রকলা : অশোক মিত্র পৃঃ ১৫০-৫১।"



৭

বিষ্ণুপুরের মন্দির-ভাস্কর্যে কবিচন্দ্রের প্রভাব

টেরাকোটা মন্দির না হলেও ঐতিহাসিক কারণে বিষ্ণুপুরের হ্রদসদৃশ বিখ্যাত সরোবর লালবাঁধের দক্ষিণতীরে কালাচাঁদ-রাধামাধব একরত্ন মন্দিরের যে গ্রুপটি রয়েছে তার মধ্যে জোড়মন্দির উল্লেখযোগ্য। একই সঙ্গে একই চৌহদ্দির মধ্যে রয়েছে তিনটি ল্যাটারাইটের বা মাকড়া-পাথরের মন্দির। এগুলিকেই জোড়মন্দির বলা হয়। সবচেয়ে উঁচু অবস্থানে এই মন্দির তিনটি অবস্থিত। তিনটি মন্দিরই অষ্টাদশ শতকের। মন্দিরগুলি মল্লরাজ গোপাল সিংহের আমলের। গোপাল সিংহের রাজ্যকাল ১৭১২-১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দ জোড়মন্দির নির্মিত হয় ১৭২৬ খ্রীষ্টাব্দে।

এই গোপাল সিংহের আমলে তাঁর সভাকবি ছিলেন স্বনামধন্য শঙ্কর কবিচন্দ্র। অনেকে মনে করেন কবিচন্দ্র দীর্ঘজীবি ছিলেন। তাঁদের মতে তিনি চারজন মল্লরাজার রাজ্যকাল জুড়ে সাহিত্য চর্চা করেন। তাঁর সাহিত্য চর্চা আরম্ভ হয় মল্লরাজ বীরসিংহের আমলে শেষ হয় গোপাল সিংহের রাজ্যকালে। মাঝে দুজন মল্লরাজা রাজত্ব করেন, প্রখ্যাত মদনমোহন মন্দির নির্মাতা দুর্জন সিংহ ও লালবাঈ

খ্যাত দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহ। তাঁর প্রথমকাব্য শিবমঙ্গল রচিত হয় বীরসিংহদেবের রাজত্বকালে (১৬৫৬-১৬৮২)।

বীরসিংহ মহারাজা অবনীতে মহাতেজা
সদামতি ভক্তের চরণে
সংকীর্তন অভিলাষী তাঁহার দেশেতে বসি
দ্বিজ কবিচন্দ্র রসভণে।

কিন্তু ডঃ সুকুমার সেন লিখেছেন (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ঃ প্রথমখণ্ড অপরার্ধ ঃ দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৬৫ পৃঃ ৩৫৭) "কবিচন্দ্র" মল্লরাজাদের সভাকবির উপাধি বলিয়া মনে হয়। কবিচন্দ্র ভণিতা থাকিলেই তাহা শঙ্কর চক্রবর্তীর রচনা মনে করিলে ভুল হইবে। এই ভুল করিয়াছেন কবিচন্দ্রের ভাগবতামৃত বা গোবিন্দমঙ্গলের সঙ্কলয়িতা। বীরসিংহের রাজ্যকালে (১৬৫৬-৮১) যে "দ্বিজ"কবিচন্দ্র শিবায়ন কাব্য রচনা করিয়াছিলেন তিনি স্বতন্ত্র ব্যক্তি।"

কবিচন্দ্র রামায়ণ রচনা করেন দ্বিতীয় রঘুনাথ সিংহের সময় (১৭০২-১৭১২) এবং তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায়। তাঁর রচিত রামায়ণ "বিষ্ণুপুরী রামায়ণ" নামে খ্যাত। 'এই রামায়ণ এক সময় সমগ্র পশ্চিমবঙ্গে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল ('কবিচন্দ্র'—সুখময় চট্টোপাধ্যায়)।' সুকুমার সেন লিখেছেন—"পশ্চিমবঙ্গে প্রাপ্ত কৃত্তিবাসের রামায়ণের পুঁথিতে এবং প্রচলিত সংস্করণে কবিচন্দ্রের রচনা বিস্তর ঢুকিয়াছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণের কয়েকটি বিশিষ্ট অংশ (যেমন 'অঙ্গদের রায়বার'ও তরণীসেন বধ ইত্যাদি) কবিচন্দ্রেরই রচনা। (বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস)।

গোপাল সিংহ দেবের আমলে নির্মিত জোড়মন্দিরে (একই চৌহদ্দিভুক্ত তিনটি মন্দিরের সবচেয়ে উত্তরেরটি) "অঙ্গদের রায়বার" কাহিনী সুস্পষ্টভাবে দেখা যায়। সিংহাসনে উপবিষ্ট লঙ্কেশ্বর রাবণের সম্মুখে আপন লাঙ্গুলের দ্বারা নির্মিত সমধিক উচ্চাসনে উপবিষ্ট অঙ্গদ রাবণকে তাঁর হেঁয়ালিপূর্ণ সংলাপে বিদ্রূপ করছেন। ডঃ সুকুমার সেনের বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের মন্তব্য যে অভ্রান্ত তা এই অকাট্য পাথুরে প্রমাণের নিরিখে অনায়াসে নির্ধারণ করা যায়। এ মন্দিরের ল্যাটারাইট চিত্রে (একসময় পঙ্খের প্রলেপ ছিল) মল্লরাজ

মল্লরাজ পরিবারের আরাধ্যা মল্লভূমের সর্বজনপূজ্যা শ্রীশ্রীদেবী মৃন্ময়ীর প্রতিমার বিশেষ ক্রমটিও জোড়মন্দিরের ল্যাটারাইট (পঙ্খের) ভাস্কর্যে উৎকীর্ণ দেখা যায়। দেবীর মহিষাসুর মর্দিনী মূর্তির দুপাশে পার্শ্বদেবতার ক্রমটি বর্তমানে প্রচলিত ক্রমের থেকে পৃথক। এখানে দেখা যায়, দেবীর ডাইনে উপরের দিকে গণেশ, নীচের দিকে লক্ষ্মী (বর্তমানে প্রচলিত ক্রমে বিপরীত ; উপরে লক্ষ্মী নীচে গণেশ) বামে উপরে কার্ত্তিক নীচে সরস্বতী (বর্তমানে প্রচলিত ক্রমে উপরে সরস্বতী নীচে কার্তিক)। শ্রীশ্রীমৃন্ময়ীদেবীর এই বিশেষ ক্রমটি মল্লভূমের একাধিক স্থানে পটে (বিষ্ণুপুরের সন্নিকটস্থ শুণ্ডিনগরের সুরালদের পুরোহিত বাড়ীতে) এবং প্রতিমায় (বিষ্ণুপুরের সন্নিকট লায়েকবাঁধে) লক্ষ্য করা গেলেও এত সুস্পষ্টভাবে মন্দির গাত্রে উৎকীর্ণ দেখা যায় নাই। এই ক্রমটি যে মল্লরাজ-পরিবার এবং মল্লভূমে গোপালসিংহের সময়ে ও তাঁর রাজত্বকালের পূর্বে প্রচলিত ছিল তা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

এই বিশেষ ধরণের ক্রমযুক্ত মল্লভূমের সর্বজনপূজ্যা শ্রীশ্রীমৃন্ময়ীদেবীর প্রতিমার অনুরূপ দুর্গা প্রতিমার প্যানেলের উপরেই রয়েছে "অঙ্গদের রায়বার'' চিত্রটি।

গোপালসিংহের নির্মিত এই জোড়মন্দিরে বিশেষভাবে 'অঙ্গদের রায়বার' চিত্রটি তাৎপর্যপূর্ণ। গোপালসিংহের পূর্বে শঙ্কর-কবিচন্দ্রের সাহিত্যচর্চার প্রমাণ পাওয়া গেলেও গোপালসিংহের আমলেই তাঁর পূর্ণবিকাশ। তাঁর মহাভারতের ভণিতায় তিনি লিখেছেন —

শ্রীযুত গোপাল সিংহ, প্রবল প্রতাপ
যার কীর্তি দেখিলে ঘুচয়ে মনস্তাপ।
নৃপশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবাগ্র্য সবাকার মান্য
পরমদেবতা সদা মানেন শ্রীচৈতন্য।
হেন রাজা সমাদরে লইয়া আমারে
বীরবৌলী নিজে দিলা পরম সাদরে।
তারপর মহারাজা দিয়া ভূমিদান
আদেশিলা রচ মহাভারত পুরাণ।

শ্রীগুরুবৈষ্ণবপদ করিয়া ভাবনা
দ্বিজ কবিচন্দ্র কৈল ভারত বর্ণনা।

তাঁর রচিত ভাগবতামৃত বা গোবিন্দমঙ্গল সম্বন্ধে ডঃ সুকুমার সেনের মন্তব্যটিও প্রণিধানযোগ্য। এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন— "ভাগবতামৃত" বা "গোবিন্দমঙ্গল"এর সর্বাপেক্ষা প্রাচীন পুথি হইতেছে সপ্তম স্কন্ধের অন্তর্গত "প্রসাদ চরিত্র" (অর্থাৎ প্রহ্লাদ চরিত্র) পালার। ইহার লিপিকাল হইতেছে ১৬৬২ শকাব্দ ১১৪৭সাল (=১৭৪০ খ্রীঃ)। তখন গোপাল সিংহ বিষ্ণুপুরের রাজা। কবির সমসাময়িক এই পুথিতে দিগ্‌বন্দনার মধ্যে বিষ্ণুপুরের মদনমোহনের বৃত্তান্ত আছে—

পূর্বেতে আছিলা প্রভু ব্রাহ্মণের ঘরে
মল্লবংশে কৃপা করি আইলা বিষ্ণুপুরে। ... - ইত্যাদি

কবির প্রায় সমসাময়িককালে নির্মিত এই মন্দিরের ল্যাটারাইট ভাস্কর্যে উৎকীর্ণ বিশেষভাবে 'অঙ্গদের রায়বার' চিত্রটি বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের একটি প্রতিপাদ্যকে প্রায় অবিসংবাদিতভাবে প্রমাণ করে। চিত্রটির ঐতিহাসিক মূল্য কম নয়।

আর একটি দিক দিয়ে মল্লরাজাদের রাজ্যকাল বিশেষ করে গোপালসিংহ-চৈতন্য সিংহের রাজ্যকাল বঙ্গ তথা ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ইতিহাসের একটি ক্রান্তিকাল রূপেও তাৎপর্যপূর্ণ। এ সময় ইংরেজ রাজত্ব পাকাপাকিভাবে কায়েম না হলেও বাণিজ্যিক আধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত। ইউরোপীয় বিভিন্ন জাতি, ইংরেজ, ফরাসী ওলন্দাজ বাংলাদেশে ইতোমধ্যেই বাণিজ্য বিস্তার করেছে। তার ফলে দেশে তখন প্রচুর অর্থাগম হচ্ছে। ১৬৮০-৮৪ খ্রীষ্টাব্দে, এই চার বছরেই, কেবল ইংরেজ-ব্যবসায়ীরাই ষোল লক্ষ টাকার জিনিষ কিনেছিল, ওলন্দাজদের ক্রয়ের পরিমাণ কিছু কম ছিলনা। এই দুটো কোম্পানীর মাধ্যমেই প্রতি বৎসর প্রায় আট লক্ষ রূপার টাকা বাংলায় আসত। শুধু তাই নয়, নিজেদের ব্যবসায়ের স্বার্থে ইউরোপীয় কোম্পানীগুলি বাংলার উৎপাদনকে সুসংগঠিত ও সুনিয়ন্ত্রিত করেছিল। মালপত্র ক্রয়বিক্রয়ের জন্য নানা ধরণের এজেন্ট নিয়োগ করে উৎপাদনকারীকে দাদন দিয়ে, শ্রমিকদের

জন্য কারখানা খুলে —এদেশের শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশ থেকে দক্ষ কারিগর এনে ব্যবসা-বাজারকে অনেকটা প্রণালীবদ্ধ করেছিল।

অথচ তার পাঁচিশ ত্রিশ বছর পরেও বিষ্ণুপুরে অটুট সামন্ততন্ত্র বিরাজ করছে দেখা যায়। গোপালসিংহ ভূমিদান করে কবিচন্দ্রকে পুরাণ রচনার আদেশ দিচ্ছেন। ভূমিকেন্দ্রিক অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে মধ্যযুগের পুরাণকেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক-বাতাবরণ অবিচল রয়েছে। কলিকাতা ও তার পাশাপাশি অঞ্চলে এ সময়ে সামন্ততন্ত্র থাকলেও তার চরিত্র ছিল পৃথক। একে আধা-ফিউডাল, আধা-মার্কেন্টাইল বলেছেন অনেক গবেষক। মূলতঃ বঙ্গতথা ভারতের সাংস্কৃতিক ধাতু প্রকৃতিতে সামন্ততান্ত্রিক ভাবধারা প্রায় চিরস্থায়ী। তার নান্দনিক এবং সাহিত্যিক মূল্যবোধেরক্ষেত্রে প্রেমভক্তির সামন্ততান্ত্রিক প্রভাব আধুনিক যুগের শিল্প-সাহিত্যেও দুর্নিরীক্ষ্য নয়।



৮

সার-সমীক্ষা



ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে বিষ্ণুপুরের সমুন্নত শিল্প বিকাশের মূলে ছিল ভারতীয় ক্লাসিক-শিল্পকলার মধ্যযুগীয় এক প্রাদেশিক বিবর্তনের প্রভাব।[১] অবস্থান বৈশিষ্ট্যে সুপ্রাচীনকাল থেকেই উত্তর ও দক্ষিণ-ভারতের সঙ্গে বিষ্ণুপুরের যোগছিল সুনিবিড়। তাই অন্তিম-মধ্যযুগেও শিল্প সংস্কৃতির সর্বভারতীয় ধারাটিই রূপে অথবা রূপান্তরে মল্লভূমকে সহজেই স্পর্শ করেছে।[২]

বিষ্ণুপুরের মন্দির-স্থাপত্যের পূর্বসূরীরূপে ত্রিবেণী-গৌড়-পাণ্ডুয়ার স্থাপত্যকলাকে চিহ্নিত করা হলেও মোগলযুগের বঙ্গে হিন্দুরাজ্য বিষ্ণুপুরের স্থাপত্যকলায় একটি 'রিভাইভ্যাল'-জাত বৈচিত্র্য সুস্পষ্ট। মুশ্লিম তথা মোগল সংস্কৃতির মধ্যে অবস্থান করেও এবং তার প্রভাব পূর্ণভাবে গ্রহণ করেও হিন্দু ভাবধারার একটি অতি সূক্ষ্ম প্রতিক্রিয়া-চেতনা মল্লরাজ সংস্কৃতির সর্বত্র বিদ্যমান। শুধু শিল্পকলায় নয়, শিক্ষা-দীক্ষা, সমাজ-বিন্যাস এখানকার সর্বত্রই এই একই চিত্র।

স্থাপত্য কলায় প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্যরূপে বাঙ্গালা-চালার আদর্শটিকে

মূলভিত্তিরূপে গ্রহণ করেও মুশ্লিম তথা মোগল-স্থাপত্য-রীতির উপাদানগুলির (খিলান, ভল্ট, ত্রিখিলান-দরজা, বিশেষ ধরণের স্তম্ব অথচ স্থূল এবং প্রচুর ভারবহনক্ষম স্তম্ভ বা Piers, টেরাকোটা-অলঙ্করণ, দোলমঞ্চের মত সরুস্তম্ভের উপর নির্মিত গম্বুজ বা Kiosk) পূর্ণ সদ্ব্যবহার করেও মন্দিরগুলিকে ক্লাসিক-মর্যাদা দেবার জন্য রত্ন মন্দিরের ক্ষেত্রে উড়িষ্যারীতির রেখ ও পীঢ়া দেউলের সংমিশ্রণে নির্মিত রত্ন বা শিখরগুলি সংযোজিত হয়েছে। এটা সর্বজন বিদিত যে মল্লরাজারা রত্ন বা শিখর মন্দিরেরই অধিকতর পক্ষপাতী ছিলেন। শুধু তাই নয়, দশম-একাদশ শতকে নির্মিত রেখদেউলের লুপ্তধারা সপ্তদশ শতকের মল্লরাজ্যে পুনরুজ্জীবিত হয়েছে দেখা যায়। এমনকি জগমোহনও যুক্ত হয়েছে (ওন্দা থানার বিক্রমপুরের দেউল, বিষ্ণুপুর হাজরাপাড়ার অধুনালুপ্ত শ্রীশ্রীশ্যামচাঁদ মন্দির) এবং বিষ্ণুপুরের সন্নিকট মুনিনগরের শ্রীশ্রীরাধাকান্ত জীউ এর মন্দিরে এই জগমোহন নির্মাণে এক বিরল স্থাপত্য রীতিও অবলম্বন করা হয়েছে, দেখা যায়।

শিখর মন্দির হিন্দু-শাস্ত্রানুমোদিত স্থাপত্যরীতি। এসবই স্থাপত্য কলায় ক্লাসিক রিভাইভ্যালেরই প্রয়াস।

টেরাকোটা অলঙ্করণেও মোগল পারসিক বা ইন্দোপারসিক চিত্রাবলীর পাশাপাশি ক্লাসিক-পৌরাণিক চিত্রাবলীর বিপুল বিস্তারও এই ক্লাসিক সংস্কৃতিতে প্রত্যাবর্তন কামনারই আর এক দৃষ্টান্ত।

---

1. Two centuries from the close of the 16th to the close of the 18th saw the magnificent flor- aison of Bengali art and culture a late provincial phase of our pan-Indian mediaeval art and culture in and around Vishnupur, in the tract known as Mallabhum of which ample architectural remains are found in fine series of temples numbering over a dozen in the town of Vishnupur itself, temples in brick and stone, with their fine carving specially in terracotta which is as characteristic of post-

মোগল যুগের মধ্যাহ্নকালে, মোগল আধিপত্যের মধ্যে, বিষ্ণুপুরের মত একটি হিন্দু রাজত্বের বিকাশ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ আর গুরুত্বপূর্ণ।

একথা আগেই বলা হয়েছে যে, মোগলদের বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যা অভিযানেরকালে মোগল সেনাপতি মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহকে পাঠান সর্দার কতলুখাঁর কবল থেকে মুক্ত করার জন্য মল্লরাজ বীরহাম্বীর মোগল সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে এক ক্ষমতাশালী জমিদারে পরিণত হন[৩] এবং শুধু তাই নয় উড়িষ্যা থেকে আফগান আক্রমণ প্রতিহত করার[৪] জন্য সীমান্তবর্তী বিষ্ণুপুর রাজ্যকে মোগলরা নিজ স্বার্থে শক্তঘাঁটিতে পরিণত করেন। এজন্য ব্যাপকভাবে আগ্নেয়াস্ত্র নির্মাণের অনুমতিও মোগল দরবার থেকে পাওয়া যায়। বঙ্গের দুই মোগল রাজধানী যথাক্রমে ঢাকা ও মুর্শিদাবাদের দুই বিশালকায় কামান কালেখাঁ ও জাহানকোষার সমকক্ষ দলমাদল কামান এখানে নির্মিত হয়। বর্তমানের মোগলাই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার (গড়, গড়খাই দিয়ে সুরক্ষিত দুর্গ, মোগলরীতির দুর্গদ্বার, কেল্লা সংলগ্ন অঞ্চলে কামান-ঢালার প্রান্তর) ধ্বংসাবশেষ দেখলে বিষ্ণুপুরের অতীত রাজনৈতিক গুরুত্ব সহজেই অনুমান করা যায়।

Muhammadan architecture. Vishnupur became a seat of Vaisnava religion and literature and Vaisnava art after the conversion of Bir Hambir (reigned 1587-1620) the ruling prince to Vaisnavism of the Gaudiya or Bengal School."—The Music School At Vishnupur. By S.K.C, The Modern Review For March, 1933 P-348.

Vishnupur lies on the highway to Puri from North India, and there was therefore no lack of communication with North Indian culture and advancement, and thus stagnation was avoided."—The Music School At Vishnupur, By S. K. C. The Modern Review For March 1933. P-348.

কিন্তু শুধু প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা বা রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রেই নয় সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও সাম্রাজ্যবাদী মোগলের প্রভাব যথারীতি এরাজ্যটির উপরেও পড়েছিল। প্রাক্-আধুনিক যুগে, ভারতে মোগলদের মত বিশাল সম্রাজ্য এবং এমন কেন্দ্রীভূত বা এককেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থা বড় একটা দেখা যায় না। এই কেন্দ্রীভূত শাসন বাহ্যিক ছত্রছায়া মাত্র ছিলনা, নিজ অধিকারভুক্ত অঞ্চলগুলিতে, তার প্রভাব ও প্রভুত্ব ছিল নিবিড় এবং গভীর।[৫] কেন্দ্রীভূত এই মোগল শাসনের গভীর প্রভাব পড়েছিল বিষ্ণুপুরেও। শুধু এখানের স্থাপত্য-ভাস্কর্য-চিত্রশিল্পেই যে প্রভাব পড়েছিল তাই নয়—অন্যান্য নানাস্তরেও এই প্রভাব গভীরভাবে পড়েছিল। বিষ্ণুপুরে প্রচলিত দশাবতার ও নক্সতাসে এ প্রভাব গভীরভাবে অনুভূত হয়। শুধু তাসের অঙ্কনেই নয় খেলার প্রণালীতেও এ প্রভাব আভাসিত। মোগল তাসের মতই দশাবতারের সর্বোচ্চ তাসকে বলে রাজা এবং পরবর্তী তাসটিকে বলে উজীর।[৬]

৩। ৯৯৭ বঙ্গাব্দে রাজা মানসিংহ বিহার প্রদেশের বিদ্রোহীদের দমন করিবার পর ঝাড়খণ্ডের পথে উড়িষ্যা জয় করিবার জন্য রওনা হইলেন ··· ··· ··· ভগলপুর ও বর্ধমান হইয়া জেহানাবাদে (বর্তমান আরামবাগে) পৌঁছিয়া তথায় শিবির স্থাপন করিলেন। ········ — — কুৎলু খাঁ লোহানি তখন ধরপুর বা ধীরপুরে অবস্থান করিতেছিলেন। এই স্থানটি মানসিংহের শিবির হইতে ২৫ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। সেখান হইতে কুৎলু নিজ সেনাপতি বাহাদুর কুরুকে প্রকাণ্ড সৈন্যদল সহ রাইপুরে পাঠাইলেন। বাহাদুর শয়তানি ও চালাকির দ্বারা এই অনভিজ্ঞ যুবককে ভুলাইতে লাগিলেন। ২১শে মে ১৫৯০ খ্রীষ্টাব্দে জগৎসিংহ যখন মদের নেশায় ঘুমাইয়াছিলেন তখন কুৎলুর সৈন্যরা তাঁহাকে হঠাৎ আক্রমণ করিল ও পরাস্ত করিল। বিসন্তপুরের (গড় বিষ্ণুপুরের) জমিদার হামির প্রমত্ত যুবক জগৎসিংহকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে উদ্ধার করিয়া নিজ রাজধানী বিষ্ণুপুরে আনিলেন।

(আকবরনামা ৩য় খণ্ড মূলের ৫৮০ পৃষ্ঠার অনুবাদ)

মোগল তাসের মতই বিষ্ণুপুরের নক্স তাসে অশ্বপতি আর গজপতির চিত্র লক্ষ্য করা যায়। টেরাকোটায় মোগলাই পাগড়ী-পাদুকা আর পোষাক-পত্র প্রচুর দেখা যায়। জামা-পায়জামা, 'জাহাঙ্গীরী তাজ' এখানের টেরাকোটায় এক নজরেই চোখে পড়ে। বাজ ও শিকারী পাখী হাতে রাজপুরুষ, সামন্তরমণী ছাড়াও মোগল-সামন্ত আভিজাত্যের ইন্দো-পারসিক ভাবধারা প্রভাবিত প্রচুর চিত্র এখানের টেরাকোটায় দুর্নিরীক্ষ্য নয়। বিষ্ণুপুরে বিকশিত মিনিয়েচার চিত্রে (পাটাচিত্রে)ও মুঘল প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

মোগলযুগের রাজনৈতিক ঘটনাগুলিও এখানের টেরাকোটায় মাত্রা পেয়েছে। বিষ্ণুপুরের জোড়বাংলা মন্দিরের নির্মাণকাল শাহ্‌জাহানের সমসাময়িক। শাহ্‌জাহানের সময়ে পর্তুগীজ উৎপাত এবং মোগলদের সঙ্গে তাদের সংঘর্ষের প্রসঙ্গ জোড়বাংলার পশ্চিমের দেওয়ালের সংলগ্ন ফ্রিজে যথেষ্ট গুরুত্বের সঙ্গে ঠাঁই পেয়েছে।

বর্তমানে বিলুপ্তপ্রায় বিষ্ণুপুরের অম্বরীতামাক একদা ছিল বঙ্গ বিখ্যাত। নামটি তাৎপর্যপূর্ণ। শ্যামরায় মন্দিরের টেরাকোটায়

---

4. The struggle between the Afghans and the Mughal was prolonged from 1576, the date of the death of Daud Shah kararani at the battle of Rajmahal till the final return of Raja Man Singh from the North eastern Subhas in 1606." —History Of Orissa. Vol-II, Page 1 by R. D. Banerjee.

5. The Mughal empire was one of the largest centralized states known in pre-modern world history. As well as military success, the Mughal emperors displayed immense wealth and ceremonies, etiquette, music, poetry, and excuisitely executed paintings.........................The uniform practices and ubiquitous presence of the Mughals left an imprint upon society in every locality and region of the subcontinent."

The Mughal Empire : John F. Richards

তামাক সেবনের চিত্র প্রচুর রয়েছে—এ গুলি মোগল প্রভাবেরই ফল বলে মনে হয়।[৭]

মোগল যুগের ইতিহাসে দেখা যায়, ১৬০০খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন এক সময়ে ভারতের চাষীরা (কৃষক) তামাক চাষ আরম্ভ করে। বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত শ্যামরায় মন্দিরের নির্মাণকাল ১৬৪৩; এ দিক থেকে এই মন্দিরের টেরাকোটায় তামাকু সেবনের চিত্রগুলি তাৎপর্যপূর্ণ বটে। জোড়বাংলা মন্দিরে পর্তুগীজ রণতরীর উজ্জ্বল টেরাকোটা-চিত্রগুলিও তখনকারই এক জ্বলন্ত সমস্যার চিত্ররূপ। শাহ্‌জাহানের রাজ্যকালে জোড়বাংলা (বা শ্রীশ্রীকৃষ্ণরায়ের মন্দির) মন্দির নির্মিত হয়েছিল। শাহ্‌জাহানের রাজ্যকালের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা হ'ল পর্তুগীজ সংঘর্ষ। পর্তুগীজ উৎপাত এসময় প্রায় চরমে উঠেছিল। পর্তুগীজদের অস্ত্রশস্ত্র বোঝাই প্রচুর রণতরী ছিল—

---

6 The highest Card represents a king on horse back resembling the king of Delhi with the umbrella (chat) the standard (salam) and other Imperial ensigns. The second highest card of the same suit represents a Vazir on horse back and after the card comes ten others of the same suit with pictures of horses from one to ten." A-INI AKBARI. Translated from the Original Persian by H. Blochman M.A. Vol I Page 318.

দশাবতার তাস খেলা ভগবান বিষ্ণুর দশাবতার কেন্দ্রিক খেলা হলেও এতে সর্বোচ্চ তাসকে রাজা এবং তার পরবর্তী তাসকে "উজীর"ই বলেন খেলোয়াড়রা। তাছাড়া দশাবতার তাসেও রাজা বা উজীর তাসগুলির পরবর্তী তাসগুলিতে প্রতীক চিহ্নের লাঞ্ছন লক্ষ্য করা যায়। এক এক স্যুট এর এক এক রকম। অবতারের রাজা ও উজীর তাসেই মূর্তি লক্ষ্য করা যায়। রাজা তাসের মূর্তির অবস্থান মণ্ডপের মধ্যে। ঐ দুই তাস ছাড়া বাকী দশখানি তাসে প্রতীক অঙ্কিত দেখা যায়।

পর্তুগীজ জলদস্যু সিবাস্তিয়ান গঞ্জালেশের ৮০ খানি অস্ত্র বোঝাই রণতরী ছিল বলে শোনা যায়। অতএব জোড়বাংলা মন্দিরের "পর্তুগীজ রণতরী" মোগল ভারতের অন্যতম রাজনৈতিক সমস্যারই ঐতিহাসিক চিত্র। কবিকঙ্কণচণ্ডীতে শোনা যায় এই আতঙ্কের প্রতিধ্বনি :

ফিরিঙ্গির দেশখান বহে কর্ণধারে।

রাত্রিতে বাহিয়া যায় হারমাদের ডরে ॥" চণ্ডীমঙ্গল মুকুন্দরাম "হারমাদ" পর্তুগীজ আরমাডা শব্দেরই অপভ্রংশ।

মোগল সাম্রাজ্যের গৌরবগরিমার মধ্যাহ্নকালে নির্মিত বিষ্ণুপুরের মন্দির টেরাকোটাতে যেমন সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাগুলিরই প্রতিফলন ঘটেছে, তেমনি অথবা ততোধিক গভীরভাবে পড়েছে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের, বিশেষ করে গোস্বামী সিদ্ধান্তের, প্রভাব। কারণ ঘটনাচক্রে বৃন্দাবনের পর বিষ্ণুপুরই হয়ে উঠেছিল গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের এক প্রধানকেন্দ্র।

---

7 Indian peasants were quick to sieze upon profitable new crops. Between 1600 and 1650 new world crops, tobacco and maize, were widely adopted by cultivators throughout Mughal India." The Mughal Empire : The New Cambridge History of India : John F. Richards, Cambridge University Press 4th Reprint 1998. বিষ্ণুপুরে ষোড়শ সপ্তদশ শতকে বিকশিত নানাধরণের চারু ও কারুশিল্পের বিকাশ সম্বন্ধে বলতে গিয়ে (The Music School At Vishnupur (by S.K.C Modern Review For 1933 March)এর লেখক বিষ্ণুপুরের প্রসিদ্ধ সুগন্ধি তামাকেরও উল্লেখ করেছেন "A number of arts and crafts grew up which made Vishnupur famous all over Northern India— Weaving of exquiste silk staff with embroideries, carving of conch-shell bangles and other articles, making of brass and other utensils and lac ; besides perfumed tobacco."

এ সময় সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম একটি পরিণত এবং সমৃদ্ধ ধর্মদর্শনরূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল।[৮] গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের এটি একটি সন্ধিকালও বটে। বঙ্গের চৈতন্যবাদীদের সঙ্গে বৃন্দাবনের গোস্বামী-সিদ্ধান্তের ক্রমবর্ধমান ব্যবধান দূর করার জন্য বৃন্দাবন থেকে গৌড়ে প্রেরিত গাড়ী-ভর্তি গোস্বামীগ্রন্থ বিষ্ণুপুরের কাছেই লুণ্ঠিত হয়। পুঁথি উদ্ধারকে কেন্দ্র করে মল্লরাজ বীরহাম্বীরের বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ এবং শ্রীনিবাসের মল্লরাজসভা বিজয়। সমসাময়িককালেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের দুই সম্প্রদায়ের মিলন প্রয়াসেরই ফলশ্রুতি খেতুরির মহোৎসব। অনেকে মনে করেন খেতুরীর মহোৎসবে মল্লরাজ বীরহাম্বীর উপস্থিত ছিলেন। বৃন্দাবন থেকে যে গোস্বামী-গ্রন্থ আসছিল তার সঙ্গে আসছিলেন শ্রীনিবাস-নরোত্তম ও শ্যামানন্দ। অতএব শ্রীনিবাসের নেতৃত্বে বিষ্ণুপুর তথা মল্লরাজ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের গোস্বামী সিদ্ধান্তই যে প্রচারিত হয়েছিল—এই অনুমান সঙ্গত।

একথা পূর্বেই বলা হয়েছে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের গোস্বামী সিদ্ধান্তকে কেন্দ্র করে মূলতঃ ভারতের ক্লাসিক সংস্কৃতিরই পুনরুজ্জীবন ঘটে। এই ক্লাসিক সংস্কৃতির স্বাক্ষর লক্ষ্য করা যায় তদানীন্তন মল্লভূমির শিক্ষা-সংস্কৃতির সর্বক্ষেত্রে। এখান থেকে সংগৃহীত হাজার হাজার সংস্কৃত পুঁথির (প্রাচীন ভারতের ক্লাসিক কাব্য, নাটক, মহাকাব্য, স্মৃতি, ন্যায় এককথায় সর্বপ্রকার প্রাচীন শাস্ত্র-সাহিত্যের)

---

৮ ষোড়শ শতাব্দীর শেষাশেষি ও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বৈষ্ণবশাস্ত্র সমূহ লেখা সমাপ্ত হইয়াছে। ……—……প্রায় সমসাময়িককালে অনুষ্ঠিত খেতুরির মহোৎসবের সমস্ত ব্যয়ভার বহন করেন নরোত্তমের জ্ঞাতিভ্রাতা সন্তোষ দত্ত। বৈষ্ণব জগতে খেতুরির মহোৎসবের একটি তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা আছে। এই যুগটি একটি সন্ধিক্ষণ। এই সময়ে বাঙ্গলায় গৌড়ের সুলতানদের অবসান হইয়া উহা (বাঙ্গালা) মুঘলদের শাসনাধীনে আসে। ভূঁইয়া রাজা বীরহাম্বীর যিনি খেতুড়ির মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন, তিনি শেষে মুঘলদের পক্ষাবলম্বন করেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে সমাজতত্ত্ব ॥ ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত ॥ ভারত সাহিত্য ভবন ॥ ১৯৪৫ ॥

নিরিখে এখানের টোল চতুষ্পাটীতে যেমন প্রাচীন ক্লাসিক শিক্ষা-দীক্ষার পরিচয় মেলে, তেমনি হাজার হাজার টেরাকোটা-টালির সমাবেশে রচিত এক প্রশস্ত প্রেক্ষাপটে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম তথা গোস্বামী সিদ্ধান্তের ক্লাসিক-পৌরাণিক রূপটিও মূর্ত হয়ে উঠে।

হাজার হাজার টেরাকোটা-টালির মাধ্যমে শুধু সংখ্যা প্রাচুর্য বা অলঙ্করণ সমৃদ্ধিই প্রদর্শন করা হয়নি, এগুলির মাধ্যমে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের দার্শনিক এবং তাত্ত্বিক বাতাবরণটিকেও উজ্জ্বল করার চেষ্টা হয়েছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের আকরগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবতের অনুসরণে কৃষ্ণলীলার পৌরাণিক রূপটিকেই পরিস্ফুট করে তোলা হয়েছে। এক এক মন্দিরে কৃষ্ণলীলার এক একটি অধ্যায়— শ্যামরায় মন্দিরে কৃষ্ণলীলার সার রাসলীলার অভিব্যক্তি; জোড়বাংলায় বৃন্দাবনলীলা বা কৃষ্ণের বাল্যলীলা এবং মদনমোহনে কৃষ্ণজন্মকথা বিধৃত হয়েছে টেরাকোটা চিত্রে।

রাসলীলা কৃষ্ণলীলার সারতত্ত্বই শুধু নয়—বৈষ্ণবধর্মেরও সারাৎসার। কুঞ্জসেবা, গোপীভাব সর্বোপরি আত্মনিবেদন তথা শরণাগতির তত্ত্ব এই রাসলীলাতেই ব্যক্ত। গোপীভাবের অসামান্য, প্রায় অপার্থিব কামনাহীন প্রেম—"কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা" ইত্যাদি সবকিছুর অভিব্যক্তি এই রাসলীলাকে কেন্দ্র করেই। শ্যামরায় মন্দিরে এই রাসলীলা বা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের দার্শনিক সারমর্মই টেরাকোটা চিত্রে রূপায়িত হয়েছে। বিভিন্ন পৌরাণিক-ক্লাসিক চিত্রের মাধ্যমে শরণাগতির ভাবটি যেমন ফুটে উঠেছে (ক্লাসিক গজেন্দ্র মোক্ষ, গজকচ্ছপ যুদ্ধ ইত্যাদি) কৃষ্ণসহ গোপীদের নৃত্যগীতের অসংখ্য চিত্রে "হ্লাদিনী" শক্তির প্রকাশ এবং কৃষ্ণের প্রীতিবিধানের চিত্রগুলিও তেমনি রূপ পেয়েছে। পাশাপাশি সন্ন্যাস ও কৃচ্ছ্রসাধনের চিত্রগুলির সমাবেশে বৈষ্ণবের প্রেমসাধনার উৎকর্ষ প্রতিপাদন করা হয়েছে বলেই মনে হয়। যে কোন মুক্তির চেয়ে জন্ম জন্ম ধরে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণ বৈষ্ণবের অধিকতর কাম্য। একাধিক কুঞ্জকুটির এবং দ্বারপ্রান্তে করজোড়ে দণ্ডায়মান মূর্তিগুলি থেকে লীলাদর্শন তথা মঞ্জরীভাব সাধনা যেমন

প্রকাশ পেয়েছে 'কুঞ্জসেবা' মূলক বৈষ্ণবসাধনার ধারাটিও তেমনি ব্যক্ত হয়েছে।

পৌরাণিক সমন্বয় সূচিত হয়েছে উমা-মহেশ্বর, রামসীতা এবং কৃষ্ণ রাধিকা বা বিষ্ণু-লক্ষ্মী চিত্রগুলিতে। এপ্রসঙ্গে হরিহর টেরাকোটাও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই মন্দিরের গর্ভগৃহে প্রবেশের দক্ষিণের গলিপথের ডানদিকে উৎকীর্ণ সমস্ত ধর্মসম্প্রদায়ের সাধুদের একত্র সমাবেশও ধর্ম সমন্বয়েরই সূচক।

গোস্বামী গ্রন্থের বিশেষ করে রূপগোস্বামী সঙ্কলিত পদ্যাবলীর শ্লোকগুলিও এ মন্দিরের (শ্রীশ্রীশ্যামরায় মন্দিরের) বিভিন্ন অংশে দেখা যায়। রাসস্থলী থেকে কৃষ্ণের সহসা অন্তর্ধানকে কেন্দ্র করে গোপীদের আকুল ক্রন্দন (দক্ষিণদিকের বারান্দায় ত্রিখিলান প্রবেশদ্বারের মাঝের দুটি স্তম্ভের নীচের দিকে) ইত্যাদি সবকিছু দৃশ্যই লক্ষ্য করা যায়।

বৈষ্ণব আর শাক্ত প্যানেলগুলির পাশাপাশি সহাবস্থান থেকে বৈষ্ণব ধর্মের সঙ্গে শাক্তধর্মের যোগসূত্র লক্ষ্য করা যায়।

এই সব বৈষ্ণবমন্দির গুলিতে রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত এবং শাক্ত চিত্রগুলির সমন্বয় ও সমাবেশে একটি ক্লাসিক-পৌরাণিক বাতাবরণ সুস্পষ্ট।

ভারতবর্ষ নানা সংস্কৃতির মিলন ক্ষেত্র হলেও আর্য-ব্রাহ্মণ্য বা বৈদিক সংস্কৃতিই ভারতীয় মার্গসংস্কৃতির-ধাতুপ্রকৃতিতে নিহিত। আর্য ব্রাহ্মণ্য বা বৈদিক সংস্কৃতির এই প্রাধান্যের কারণ, আর্যরা শুধু 'রথ-অশ্ব আর লোহা নিয়েই ভারতে আসেনি একটি সুসমৃদ্ধ ভাষার অধিকার নিয়ে এদেশে আবির্ভূত হয়েছিল। অন-আর্য সিন্ধু সভ্যতার নাগরিক প্রেক্ষাপট যতই সমৃদ্ধ হোক—এ সভ্যতা বোবা।

আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ভিত্তি হ'ল ভূমিকেন্দ্রিক সামন্ততান্ত্রিক অর্থনীতি। এ অর্থনীতির সূচনা হয়েছে ব্রাহ্মণকে ভূমিদানের অনুশাসনে। মনুর ধর্মশাস্ত্রে ও মহাভারতে বলা হয়েছে ব্রাহ্মণকে ভূমিদান রাজার অবশ্য কর্তব্য। মৌর্যযুগ থেকে, অন্তিম মধ্যযুগের মধ্যভূমে অনুসৃত হয়েছে একই সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রনীতি ও ভূমিকেন্দ্রিক অর্থনীতি।

মৌর্য শুঙ্গ যুগে ব্যবসা বাণিজ্যের সমুন্নত বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নগরবিকাশ দ্রুততর হয় এবং অন্যান্য ব্যবসার মত টেরাকোটা-শিল্পেরও বাণিজ্যিক উন্নতি ঘটে। কিন্তু গুপ্ত যুগে ব্যবসা বাণিজ্যের অবনতি ঘটলে রাষ্ট্র এবং সমাজে সামন্ততন্ত্র সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

আগেই বলা হয়েছে, ভূমিকেন্দ্রিক সামন্ত-অর্থনীতি ভারতীয় আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির মেরুদণ্ড— এবং বেদের যুগ থেকেই এর সূচনা হয়েছে। ক্রমে এটিই ভারতীয় মূল সংস্কৃতি রূপে প্রতিভাত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ প্রাচীন ভারতের স্বরূপ বর্ণনা করতে গিয়ে ব্রাহ্মণ মহিমা এবং ক্ষত্রিয় গরিমারই উল্লেখ করেছেন। অর্থ এবং শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত থাকায় অন্যান্য সংস্কৃতিগুলি ব্রাত্য স্তরেই থেকে গেছে। রচিত হয়েছে এক প্রশস্ত ব্যবধান।

মল্লরাজাদের নির্বিচার ব্রহ্মোত্তর প্রদানকে কেন্দ্র করে মল্লভূমে সামন্ততন্ত্র এবং প্রাচীন ক্লাসিক আর্য ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিরই বিকাশ ঘটেছিল। টোল-চতুষ্পাটীতে সংস্কৃত শিক্ষার পত্তন হয়েছিল। আদিবাসী কৌম অধ্যুষিত মল্লভূমে মল্লরাজাদের উদ্যোগে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মের বেনামে আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি এবং বর্ণবিভক্ত ব্রাহ্মণ প্রধান জাতিরাষ্ট্র বা নগর সমাজ প্রতিষ্ঠার ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ বিপুল সংখ্যক আদিবাসী সম্প্রদায় তথা জনসাধারণ যারা আদিতে মল্লরাজাদের অবলম্বন ছিল তারা দূরে সরে যায়। বিপুল জনজীবন থেকে মল্লরাজশক্তি বিচ্ছিন্ন হয়। বর্ণবিভক্ত সমাজে আদিবাসী অব্রাহ্মণরা অস্পৃশ্য অপাংক্তেয় হয়ে পড়ে। সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও দেখা যায়, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের গভীর দুরূহ দার্শনিক তত্ত্ব এখানের আদিবাসী অধ্যুষিত বিপুল জনসমাজে প্রবেশ করতে পারেনি।

ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে বিষ্ণুপুর শুধু মল্লভূমেই নয়, সারা পূর্ব ভারতে একটি শিল্পনগরীরূপে বিকশিত হয়েছিল বলে অনেকে মনে করেন। একথা পূর্বেই যথাযোগ্য উদ্ধৃতি সহকারে বলা হয়েছে এবং তার কারণও আলোচিত হয়েছে।

রেশম-শিল্প, কাঁসা-পিতলের বাসন এবং শঙ্খশিল্পের মত সূক্ষ্ম কারুশিল্পগুলির যে এখানে সমুন্নত বিকাশ ঘটেছিল তার দৃষ্টান্ত আজও দুর্লভ নয়। এদিক থেকে সমকালীন বঙ্গের দুই মোগল

রাজধানী ঢাকা আর মুর্শিদাবাদের সমতুল্য এবং সমগোত্রীয় ছিল বিষ্ণুপুর।

এইসব সূক্ষ্মশিল্পের বিকাশে এবং বহুল প্রসারে একদিকে যেমন প্রচুর প্রতিভাবান শিল্পীর অসামান্য ভূমিকা ছিল, অন্যদিকে তেমনি এগুলির সার্থক উৎপাদনের জন্য কাঁচামাল যোগান দেওয়ার প্রয়োজনে প্রচুর অর্থলগ্নী করা এবং এগুলির কেনাবেচার উপযুক্ত বাজার তৈরী করার ব্যাপারে সুদক্ষ "ব্যবসায়ী" বা "মহাজন"দের অবদানও ছিল প্রচুর।

শিল্পনগরী হিসাবে বিষ্ণুপুরের অতীত ঐতিহ্য আজও অম্লান। এখানের বয়নশিল্পীদের (রেশমশিল্পী) অসামান্য প্রতিভা এখনও ভাস্বর মুর্শিদাবাদের অধুনালুপ্ত বালুচরী শাড়ী বর্তমানে বিষ্ণুপুরে সগৌরবে পুনরুজ্জীবিত হয়ে বিশ্ববিজয়িণীর মর্যাদা লাভ করেছে। বিষ্ণুপুরের প্রাচীন ক্লাসিক সঙ্গীতের পরম্পরাগত উত্তরাধিকারের মতই চারু ও কারুশিল্পের প্রবহমান ধারা সার্থক এবং সমুন্নত এক শিল্পনগরীরূপে বিষ্ণুপুরের অতীত গৌরবকে বর্তমানের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে। শঙ্খশিল্পীদের অসামান্য কৃতিত্বও ভারতভিত্তিক প্রতিযোগিতার দরবারে পুরস্কৃত হচ্ছে। মল্লভূমের শিল্পীরা আজও সমান এমনকি ক্ষেত্রস্থলে সমধিক প্রতিভার পরিচয় দিচ্ছেন। মল্ল-রাজধানী বিষ্ণুপুর তথা বাঁকুড়া এবং মল্লভূমের শিল্প-চর্চার উজ্জ্বল বর্তমান তার অতীত গৌরব এবং ধারাবাহিকতারই সাক্ষী।

তাছাড়া আজও বিষ্ণুপুর শহরের মূল অধিবাসীদের অধিকাংশই শিল্পী সম্প্রদায়ের মানুষ। মল্লরাজধানী বিষ্ণুপুর শহরের জন-সংখ্যার একটা বড় অংশ জুড়ে আছেন এঁরাই। বিষ্ণুপুর যে অদূর অতীতেও মূলতঃ একটি বিশিষ্ট শিল্পনগরীরূপে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত ছিল তা আজকের বিষ্ণুপুরকে দেখলে সহজেই বোঝা যায়।

মল্লরাজাদের রাজধানী নির্মাণের কালে তাঁদেরই উদ্যোগে একদা বিভিন্ন বিলুপ্ত বা বিনষ্ট রাজধানী কেন্দ্র (বা শিল্পকেন্দ্র) থেকেই ভাগ্যান্বেষণে দক্ষ শিল্পীরা বিষ্ণুপুরে এসে সমবেত হয়েছিলেন

বলেই মনে হয়। এ সম্পর্কে তন্তুবায় বা অন্যান্য শিল্পী শ্রেণীর মধ্যে একদা প্রচলিত 'থাক' বা গোষ্ঠীর ভাগগুলি উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে মান্দারণ্যা, বর্ধমেন্যা, উত্তরকুল্যা থাকগুলি লক্ষণীয়। "হিস্ট্রি অফ্ বিষ্ণুপুর রাজ" গ্রন্থে বলা হয়েছে—যথাক্রমে মান্দারণ, বর্ধমান, উত্তরকূল (অর্থাৎ মুর্শিদাবাদ) কেন্দ্র থেকে এঁরা এসে বিষ্ণুপুরে সমবেত হয়েছিলেন। অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতকের বঙ্গেই ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ফলাও ব্যবসায়ে বিষ্ণুপুর তথা বাঁকুড়ার একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল বলে ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত "বাঁকুড়া ডিস্ট্রিক্ট গেজেটিয়ার" মনে করেন।[9] বিষ্ণুপুর এবং সোনামুখীতে রেশম ব্যবসার মূল এবং সমৃদ্ধ দুটি কেন্দ্র ছিল। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে, সোনামুখীর পাঁচিশচূড়া বিশিষ্ট বিখ্যাত এবং সর্বজন পরিচিত শ্রীধর মন্দিরটি তন্তুবায় সম্প্রদায়েরই কানাথ্রে রুদ্র দাস নামে জনৈক ব্যক্তির প্রতিষ্ঠিত। মন্দিরটির চার-দিকের দেওয়ালে সমৃদ্ধ টেরাকোটা-অলঙ্করণ প্রতিষ্ঠাতার উল্লেখযোগ্য ধন-সম্পদেরই সাক্ষ্য দেয়। জয়পুরের দে আর দত্তদের অনবদ্য টেরাকোটা-অলঙ্করণযুক্ত দুটি রত্নমন্দির আজও শ্রীসৌন্দর্যে দর্শকদের নজর কেড়ে নেয়। মন্দির দুইটি ঊনবিংশ শতকের। শোনা যায় দে আর দত্তদের জমিজমা আর বনজঙ্গল ছাড়াও কারো-কারো "কুৎনী" (কেটে বা মটকায় প্রস্তুত) কাপড়ের ব্যবসা ছিল।

অষ্টাদশ ঊনবিংশ শতকের ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসায় বিশেষতঃ রেশম বস্ত্রের ব্যবসায় বিষ্ণুপুরের উজ্জ্বল ভূমিকা যে তার অতীত ঐতিহ্যেরই পরম্পরাগত অভিব্যক্তি তা আগেই বলা হয়েছে। বিষ্ণুপুর যে একদা (ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে) পূর্ব ভারতের

---

9 In the eighteenth and early part of the nineteenth century Bankura played an important role in the commerce of East India Company owing to the high appreciation of Bankura Silk in the foreign markets— Bankura District Gazetteer : Ed. Amiya Kr. Banerjee 1968.

অন্যতম সমৃদ্ধ শিল্প-নগরীতে পরিণত হয়েছিল তা অত্যুক্তি নয়। শুধু অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকেই নয়, অতি সাম্প্রতিককালেও বিষ্ণুপুর তথা বাঁকুড়ার শিল্পকলার গৌরবোজ্জ্বল ধারা অম্লান। এ হেন বিপুল শিল্পী অধ্যুষিত শিল্পনগরীতে শিল্পের ব্যবসারও প্রসার ঘটেছিল। এখানে মধ্য যুগীয় প্রথায় শিল্পী সংঘ (ক্রাফট্ গিল্ড) এবং শিল্প-ব্যবসায়ী সংঘের অস্তিত্ব অনুমান অসঙ্গত নয়। কারণ এত বড় একটি শিল্প-নগরীতে দীর্ঘদিন ধরে সফল শিল্পসৃষ্টি এবং তার সার্থক ব্যবসায়ের পিছনে চালিকা শক্তিরূপে সুনির্দিষ্ট সংগঠন অবশ্যই ছিল এবং অন্তিম-মধ্যযুগের এক বিশিষ্ট বৈষ্ণব-সংস্কৃতি ক্ষেত্রে এই 'শিল্পী' এবং 'শিল্পী সংঘের' কিছু ভূমিকাও ছিল।

বিষ্ণুপুরের কয়েকটি বিখ্যাত কৃষ্ণ বিগ্রহের মন্দির কারুশিল্পীদের পাড়াতেই অবস্থিত। তন্তুবায় ও কর্মকার অধ্যুষিত মাধবগঞ্জ ও কৃষ্ণগঞ্জ মহল্লায় যথাক্রমে শ্রীশ্রীমদনগোপালজীউ ও শ্রীশ্রীরাধালাল জীউ বিগ্রহের সেবাপুজো চলছে। শ্রীশ্রীরাধালালজীউ বিগ্রহের মন্দির রাজার দরবার বা 'কেল্লা' অঞ্চলে অবস্থিত হলেও সেবাপুজো উৎসব-অনুষ্ঠানে আয়োজনে, কৃষ্ণগঞ্জের (বৃহদাকার পিতলের রথ এবং পুর্ণযাত্রা উৎসবের বিরাট ধুমধাম এপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এই উৎসব উপলক্ষে প্রতিবৎসর কৃষ্ণগঞ্জ তথা আটপাড়া অঞ্চলের প্রতিটি মানুষ উদ্দীপনায় উত্তাল হয়ে ওঠে) এবং এ অঞ্চলের সমস্ত মানুষের দেবতার প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ ও নিষ্ঠার একটি সুপ্রাচীন ঐতিহ্যমণ্ডিত নিবিড় সম্পর্কের যে আভাস পাওয়া যায় তাতে মনে হয় শ্রীশ্রীরাধালাল জীউ বিগ্রহের সঙ্গে কৃষ্ণগঞ্জবাসী তথা আটপাড়ার মানুষের নাড়ীর যোগ আজকের নয়। শ্রীশ্রীমদনগোপালজীউ বিগ্রহের সুবৃহৎ পাঁচচুড়া ল্যাটারাইটের মন্দির অবশ্য প্রথমাবধি মাধবগঞ্জেই অবস্থিত। শাঁখারীবাজার (শঙ্খশিল্পীদের পাড়া) বা মদনমোহনগঞ্জেই মল্লরাজ পরিবার তথা বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত দেবতা শ্রীশ্রীমদনমোহন জীউ বিগ্রহের ইঁটের তৈরী টেরাকোটা অলঙ্কৃত অপরূপ রত্ন-মন্দিরটি ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দ মল্লরাজ দুর্জন সিংহ কর্তৃক স্থাপিত হয়েছে। এই সব পল্লীগুলিতে শুধু শিল্পীদের বসবাসই ছিলনা-তাদের শিল্প

দ্রব্যগুলি নিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্যেরও প্রশস্ত ক্ষেত্রছিল এইসব পাড়াগুলি।

একটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, বিষ্ণুপুরের শিল্পী অধ্যুষিত পল্লীগুলির নামকরণ হয়েছে কৃষ্ণের এক একটি নামের সঙ্গে 'গঞ্জ' শব্দ যুক্ত করে। যেমন কৃষ্ণগঞ্জ, মাধবগঞ্জ, গোপালগঞ্জ প্রভৃতি। গোপালগঞ্জে মন্দির নেই, কিন্তু বাসন শিল্পীদের ঘনসন্নিবেশ। 'গঞ্জ' শব্দে ব্যবসা-বাণিজ্য বা শিল্প দ্রব্যের বেনা-বেচার সুনির্দিষ্ট স্থানকেই বোঝায়। শাঁখারীবাজার (মদনমোহনগঞ্জ) সংলগ্ন 'উড়িয়া-পাড়া' অঞ্চলটি ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্রে উড়িষ্যার ব্যাপারীদের এখানে এসে বাস করার সাক্ষ্য বহন করছে বলেই মনে হয়। অনেকে মনে করেন উড়িষ্যা থেকে শাঁখার-ব্যাপারীরা এখানে এসে বাস করতেন। এখানে তৈরী চওড়া কাণা-উঁচু একধরণের শাঁখার (দেবী-প্রতিমার হাতে যেমন লক্ষ্য করা যায়) উড়িষ্যায় ভালো বাজার ছিল। এগুলিকে কঙ্কণ বা 'কাঁকনি' বলা হত। বিষ্ণুপুরের আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনে এই রকম একখণ্ড শাঁখা চোখে পড়ে। বিষ্ণুপুরের মন্দির-টেরাকোটায় এ ধরণের শাঁখা লক্ষ্য করা যায়।

তাঁতিদের মধ্যে "পাঠান তাঁতি" নামে একটি শ্রেণী বর্ত্তমান। এঁরা রেশম কাপড়ের প্রখ্যাত ব্যবসায়ী। পাঠানদের সঙ্গে এঁদের 'পাগড়ীর কাপড়ের' ব্যবসার সূত্রে তাঁদের এ ধরণের নামকরণ হয়েছে বলে মনে করা হয়।

রেশম বা শঙ্খের এ অঞ্চলে উৎপাদন হয় না। দক্ষিণ ভারত থেকে শঙ্খশিল্পের জন্য শাঁখ এবং মালদা প্রভৃতি অঞ্চল থেকে রেশম বস্ত্রের জন্য কাঁচা মাল আসত। সঙ্গত কারণেই মনে করা যেতে পারে বিত্তবান এক শ্রেণীর মানুষ এসব মহার্ঘ কাঁচামাল এখানে আনা নেওয়া করতেন। এইসব মহাজনেরাই ব্যবসার বাজারও নিয়ন্ত্রণ করতেন। শিল্পীরা দরিদ্র হলেও, বিভিন্ন শিল্পী সম্প্রদায়ের মধ্যেই এক শ্রেণীর বিত্তবান মানুষ লক্ষ্য করা যায়। শিল্প ব্যবসায়েই এঁরা অর্থলাভ করে সম্পদশালী গৃহস্থে পরিণত হয়েছেন। শিল্পী শ্রেণীর বাইরেও বহু সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর মানুষ এখানে উৎপন্ন শিল্পের ব্যবসা করতেন। এইসব ব্যবসায়ীদের লাভের একটা অংশ দেবসেবায় ব্যয়

হত। বিশেষভাবে শিল্পীদের পল্লীতে স্থাপিত দেবতার মন্দিরগুলির নিরিখে এমন অনুমান অসঙ্গত বা অযৌক্তিক নয়।

পশ্চিম ভারতে দেখা যায়, 'শিল্পী-সংঘ' (ক্রাফ্‌ট গিল্ড) বা শিল্প ব্যবসায়ী 'মহাজন-সংঘের' (ট্রেডার্স গিল্ড) লাভের একটা অংশ দেব-সেবায়, ধর্মকর্মে অথবা অসহায় পশু-চিকিৎসায় ব্যয় হত। বিশেষ করে বৈষ্ণব ও জৈন সম্প্রদায়ের ব্যবসায়ীদের মধ্যে এ প্রথার প্রচলন ছিল। বল্লভাচার্য বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের রাজাদের প্রতিষ্ঠিত দেবমন্দিরের সেবা পূজায় শিল্প-ব্যবসায়ীদের লাভের একটা অংশ ব্যয় করার নজির আছে। ° অনুরূপভাবে এবং সঙ্গত কারণেই মনে করা যায় এতবড় শিল্পনগরী বিষ্ণুপুরে 'শিল্পী-সংঘ' এবং শিল্প-ব্যবসায়ী-সংঘের অস্তিত্ব ছিল এবং তাদের লাভের একটা বড় অংশ বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী মল্লরাজাদের মন্দিরের দেবসেবায় ব্যয় হ'ত। শিল্প-নগরী বিষ্ণুপুরের তথা মল্লভূমের খ্যাতিও সমৃদ্ধিতে একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা থাকলেও এখানের শিল্পী শ্রেণী ছিল সর্বাধিক দরিদ্র এবং প্রতিপত্তি-হীন ; সাম্প্রতিক কালের রিপোর্টগুলি থেকে যে দারিদ্রেরও সামাজিক নিষ্পেশনের বিবরণ পাওয়া যায় তা থেকে সহজেই মনে করা যেতে পারে অতীতেও এদের অবস্থার বিশেষ কোন পার্থক্য ছিলনা।

মূলতঃ শিল্পী-অধ্যুষিত এবং প্রধানতঃ পূর্বভারতের এক বিশিষ্ট শিল্প নগরীরূপে বিকশিত বিষ্ণুপুরের শিল্পীদের এবং শিল্পী শ্রেণী থেকে উদ্ভূত শিল্প-ব্যবসায়ীদেরও রাষ্ট্রিক বা সামাজিক ক্ষেত্রে যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি, ছিল বলে মনে হয় না। ব্রাহ্মণ এবং উচ্চ শ্রেণীর মানুষের মত এদের রাজদত্ত কোন সম্পদ সম্পত্তি চিহ্নমাত্র দেখা যায় না।

এর কারণ সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থা এবং বর্ণবিভক্ত সমাজ ব্যবস্থার কঠোর কাঠামো ভেদ করে রাজা ও ব্রাহ্মণের মধ্যবর্তী কোন তৃতীয় শক্তির উত্থান বা বিকাশ সম্ভব ছিল না। বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্ত শক্তির বিকাশ ছাড়া সামাজিক-আলোড়ন সৃষ্টি করে সামন্ততন্ত্রের কায়েমী-স্বার্থকে নাড়া দেওয়া সম্ভব না হওয়া পর্যন্ত সামন্ততান্ত্রিক আধিপত্য সমাজ এবং রাষ্ট্রে অচল এবং অটল হয়ে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে।

বিষ্ণুপুরেও তাই ছিল ; ভারতে ইউরোপীয় বণিক শক্তির আবির্ভাব এবং মুদ্রা অর্থনীতির বিপুল প্রচলনের পরেও দেখা যায় অন্তিম মধ্যযুগের শেষভাগে গোপাল সিংহ তাঁর সভাকবি কবিচন্দ্রকে ভূমি-দান করে মহাভারত পুরাণ রচনার নির্দেশ দিচ্ছেন। সামন্ততান্ত্রিক ভূমিকেন্দ্রিক অর্থনীতি ও পৌরাণিক সংস্কৃতির বাতাবরণ মল্লভূমে তখনও অটুট।

বর্ণবিভক্ত সমাজের নিষ্পেষণে দরিদ্র উচ্চ শিক্ষায় বঞ্চিত (ব্রাহ্মণছাড়া সংস্কৃত শিক্ষালাভ অসাধ্য ছিল) শিল্পীশ্রেণী মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি।[১১] বর্তমানকালের রিপোর্টেও শিল্পীদের যে

---

10 Most of the money was spent on social and religious activities ; in the guilds of Western India (where they prevailed chiefly among the Vaishnavas and Jainas of Gujarat) the greater part of the fund was spent on charities and particulary, charitable hospitals of sick and domestic animals, and also the temples of the Maharajas of the Ballavacharya sect of Vaisnavas ; while almost simlar things may be said of the Maharajas in other parts of India as well.

—The Economic Importance of Trade and Craft Guilds in India" The Modern Review For March 1933 By N. Das I. C. S. Page 283.

11 But in the traditional rural industries, castes still govern the callings, although considerable economic stratification within a caste group engaged in the same occupation is observed particularly among the Nabasakh artisan castes.

—District Gazetteer. Bankura 1968. Ed. Amiya Kr. Banerjee. P. 191.

অসহায় অবস্থা সুস্পষ্টরূপেই দেখা যায়, অতীতের অবস্থা এর চেয়ে মন্দ বই ভাল ছিল না। কারণ সুদূর অতীতে সমাজে বর্ণভেদ এবং সামাজিক ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণের প্রতিপত্তি কঠোরতর ছিল। মল্লরাজত্বে প্রচুর ভূসম্পত্তি লাভ করে ব্রাহ্মণ হয়ে উঠেছিল অপ্রতিহত শক্তি। প্রধানমন্ত্রী ছিলেন ব্রাহ্মণ-মহাপাত্র ; 'হিস্ট্রি অফ্ বিষ্ণুপুর রাজ'এর মতে রাজ্যের প্রধান পুরোহিতের অধীনে একটি 'ধর্ম-পরিষদ' ছিল ; প্রধান পুরোহিত ও তাঁর পরিষদের নির্দেশেই ব্রহ্মোত্তর প্রদান করা হ'ত। এক কথায় ব্রাহ্মণের এই অপ্রতিহত ক্ষমতার কাছে প্রতিভাশালী শিল্পীরাও ছিল নতমস্তক। শ্রেণী ও বর্ণ বিভাগের এই নিষ্পেশনে শিল্পীদের দারিদ্র্যও অক্ষয় হয়েছিল। একই বর্ণের মধ্যে আবার বিত্ত ভিত্তিক শ্রেণী সৃষ্টি হয়েছিল। একই বর্ণের মধ্যে বিত্তশালীরা অর্থের বলে শিল্পের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করত এবং শিল্পীরা সামান্য মজুরী (বা বাণি)তে ক্রীতদাসের মত বেগার খাটতেন।"[১২] অন্যদিকে রাজদত্ত প্রচুর ভূসম্পত্তি লাভ করে ব্রাহ্মণ এবং একশ্রেণীর মানুষ পুরুষানুক্রমে সম্পদশালী হয়ে স্বাভাবিকভাবে সমাজের উচ্চ স্তরে সুপ্রতিষ্ঠিত থেকেছেন দেখা যায়।

---

11 But in the traditional rural industries, castes still govern the callings, although considerable economic stratification within a caste group engaged in the same occupation is observed particularly among the Nabasakha artisan castes."

—District Gazetteer Bankura 1968 Ed. Amiya Kr. Banerjee. P. 191

12 In the traditional handicrafts, the artisans work under a system of advances offered by urban traders in lieu of stipulated quantities of products to be delivered to them within a fixed period. This seemingly contructual relation may be in the case of well-off artisans who have the capacity and the

শুধু মল্লরাজত্বেই নয়, ভারতের ইতিহাসেও এই একই চিত্র। রাজা আর ব্রাহ্মণের আঁতাত ভেদ করে শিল্পী, বণিক, শ্রেষ্ঠী বা অন্য তৃতীয় শক্তির বিকাশ এখানে স্থায়ী হয়ে সমাজ বা রাষ্ট্রযন্ত্রে কোন গভীর প্রভাব প্রসারিতকরে কোন ধরণের কোন আলোড়ন বা সফল আন্দোলন সৃষ্টি করতে পারেনি। আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ছাঁচেই এখানের ছোটবড় হিন্দু রাজ্যগুলি রূপলাভ করেছে এবং তাদের রাজনীতি বা রাষ্ট্রনীতি ব্রাহ্মণ্য অনুশাসনেই আবহমানকাল ধরে নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। এমনকি আদিবাসী কৌম সর্দার-শাসিত রাজ্যগুলি ক্ষমতাশালী হয়ে সামাজিক বা রাষ্ট্রিক চলাচলের ধারায় উলম্ব-উত্তরণের (Vertical Mobility)মাধ্যমে আপন-জাতিগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে উর্ধ্বগতি লাভ করেও সনাতন হিন্দু ব্রাহ্মণ্য রীতিতেই রাজ্যপাট নির্মাণ করেছে। ব্রাহ্মণ্য রীতিতেই নানা দেশ-বিদেশ থেকে ব্রাহ্মণ এবং সম্ভ্রান্তশ্রেণীর মানুষদের সসম্মানে আহ্বান জানিয়ে নূতন নগর সমাজ গঠন করেছে। পৌরাণিক নির্দেশে ব্রাহ্মণদের প্রচুর ভূমিদান করে ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির বীজবপন করেছে। ব্রাহ্মণের প্রভুত্ব গভীরভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে রাষ্ট্রে সমাজ ব্যবস্থায় আর শিক্ষা ব্যবস্থায়। যথানিয়মে ব্রাহ্মণ্য নিয়ন্ত্রিত বর্ণভিত্তিক সমাজ সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সংস্কৃত কেন্দ্রিক উচ্চশিক্ষা যথারীতি ব্রাহ্মণের কুক্ষিগত হয়েছে। ভারত-ইতিহাসের রাজ্য গঠনের সনাতন পথেই সব রাজ্যই গঠিত হয়েছে—মল্লরাজ্য তার ব্যতিক্রম নয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্মের নামান্তরে হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের প্রেক্ষাপটেই মূলতঃ মল্লভূমের রাজ্য-রাজপাট রূপলাভ করেছে।

---

means to undo their indebtedness but for a large number of the poorer craftsmen who work with small fixed capitals and can only produce just enough to keep themselves above subsistence levels. The system often reduces itself to that type of relationship which exists between a master and his bondsmen." – Bankura District Gazetteer. A. K. Banerjee, 1968. P. 191.

আগেই বলেছি, শুধু মল্লভূমেই নয়, ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির এই ইস্পাত দৃঢ় কঠিন কাঠামো ভেদ করে ভারতে কোন যুগে কোন তৃতীয় শক্তির বিকাশ হয়নি। ব্রাহ্মণ্য অনুশাসিত ভূমি-অর্থনীতি, শিক্ষা ও উত্তরাধিকার-রীতির শক্তপোক্ত বাতাবরণ ভেদ করে কোনভাবেই তা সম্ভব হয় নাই। শুধু তাই নয়, সমাজ-অর্থনীতি ও শিক্ষার পূর্ণ অধিকারের উপর দৃঢ়প্রতিষ্ঠ এই আর্য-ব্রাহ্মণ - সংস্কৃতি তার অনুষঙ্গী রাজতন্ত্র বা সামন্ততন্ত্রকে দীর্ঘস্থায়ী করেছে- শুধু সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতির বনিয়াদের উপরেই নয় একটি অধিকতর সুদৃঢ় সাংস্কৃতিক বনিয়াদের উপরেওএর ভিত্তিস্থাপন করেছে। শাস্ত্র সাহিত্যে সাংস্কৃতিক মূল্যবোধে আজও আর্য-ব্রাহ্মণ্য বৈদিক সংস্কৃতির আসন প্রায় অক্ষয়।

আগেই বলা হয়েছে শুধু শিল্পনগরী বিষ্ণুপুরের স্বল্প-পরিসর ক্ষেত্রে নয় ভারতবর্ষের ইতিহাসের বিশালক্ষেত্র থেকেও প্রাচীন, মধ্য এমনকি অন্তিম-মধ্য যুগেও কোন শিল্পী-শ্রেষ্ঠী-বণিক শ্রেণী রাষ্ট্রযন্ত্রে বা সামন্ততন্ত্রের দুর্গে চাপ সৃষ্টি বা প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি।

প্রায় মৌর্যযুগ থেকেই ভারতের ক্রমবর্ধমান ব্যবসা-বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে শিল্পের ও শিল্পীর ব্যাপক প্রসার ঘটছিল। এ সময় এবং পরবর্তী শুঙ্গ-কুষাণ যুগ থেকে (খ্রীষ্টপূর্বাব্দ ২০০—৩০০ খ্রীষ্টাব্দ) শিল্প-বিকাশ এবং নগর-বিকাশ দ্রুত তালে চলছিল। এই ধারায় টেরাকোটা শিল্পেরও যে ব্যাপক প্রসার এবং বিপুল বিস্তার ঘটেছিল তা আমরা বিশিষ্ট গবেষক শ্রীমতী দেবাঙ্গণা দেশাই এর অনুসরণ করে গ্রন্থের প্রথম দিকেই দেখানোর চেষ্টা করেছি। এই শিল্প বিকাশের ফলে যে বিপুল সংখ্যক শিল্পীর বিকাশ ঘটে তারা আপনাদের স্বার্থে নিজেদের সংগঠিত করার জন্য "সংঘ" বা "গিল্ডবদ্ধ" হতে থাকেন। ক্রমশঃ গিল্ডগুলির সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। উৎপাদনের ক্ষেত্রে এবং সামাজিক ক্ষেত্রে এইসব গিল্ডের প্রভাব প্রতিপত্তিও বৃদ্ধি পায়। মৃৎশিল্পী—কুম্ভকার, ধাতুশিল্পী, দারুশিল্পীদের "সংঘ" বা "গিল্ডগুলিই" অগ্রগণ্য ছিল। এইসব

গিল্ডগুলির আর্থিক সহযোগিতায় বৌদ্ধ-মঠ-স্তূপ ইত্যাদিও নির্মিত হয়েছে দেখা যায়। বিদিশার গজদন্ত শিল্পীরা সাঁচীর স্তূপের অসাধারণ তোরণগুলির নির্মাণে আর্থিক সহযোগিতা করেছিলেন বলে শোনা যায়। এই সব ব্যবসা-বাণিজ্যকে কেন্দ্র করে সমাজে প্রচুর বণিক-শ্রেষ্ঠীর উদ্ভব হয়। ডাঃ নীহাররঞ্জন রায় মনে করেন সাঁচীর তোরণগুলির উপর খোদিত লাস্যময়ী যক্ষী মূর্তি গুলিতে সম্ভোগ-মনস্ক শ্রেষ্ঠী আর বণিকদের রুচির প্রভাব গভীরভাবে পড়েছে। গবেষকরা মনে করেন এ সময় বৌদ্ধ মঠ ও বিহারগুলি এইসব নব বিকশিত নাগরিক শ্রেষ্ঠী ও বণিকদের পৃষ্ঠপোষকতায় পরিচালিত হত। কিন্তু এসব যুগেও এসব বিকাশমান শিল্পী বণিকদের সামাজিক প্রতিপত্তি থাকলেও রাষ্ট্রযন্ত্রে বা রাষ্ট্রিক ক্ষেত্রে এঁদের কোন প্রভাব পরিলক্ষিত হয় না।

নাসিক গুহালিপিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যাকালে বিশিষ্ট ঐতিহাসিক শ্রীমতী রোমিলা থাপার (হিস্ট্রি অফ, ইণ্ডিয়া : প্রথম খণ্ড : পেঙ্গুইন বুকস্ : ১৯৮৬ পৃষ্ঠা ১১১) দেখিয়েছেন যে যদিও গিল্ডগুলি এসময় বিশেষ প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিল তবু তারা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব-প্রসারে আগ্রহী ছিলেন না। রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা লাভ এর একটা কারণ হতে পারে, বলে তিনি মনে করেন। রাষ্ট্রিক-ক্ষমতা লাভে অপারগতার আর একটি উল্লেখযোগ্য কারণ হিসাবে তিনি বর্ণবিভক্ত সমাজ ব্যবস্থায় বিভিন্ন শিল্পীসংঘের পরস্পর বিছিন্নতার কারণটিও উল্লেখ করেছেন। এক সম্প্রদায়ের শিল্পীর সঙ্গে বর্ণগত বিভেদে অন্য সম্প্রদায়ের শিল্পীদের খাওয়া-দাওয়াও নিষিদ্ধ ছিল।[১৪] বলাবাহুল্য বিষ্ণুপুরের শিল্পী মহলেও যে এককালে এই সমস্যা অত্যান্ত উগ্র-ছিল-'হিস্ট্রি অফ্ বিষ্ণুপুর রাজে' তার উল্লেখ আছে।

আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি বা বৈদিক সংস্কৃতির ব্যাপ্তি-বিস্তার আর গভীরতা ছিল অপরিসীম। রাষ্ট্রে-সমাজে-শিক্ষায় ছিল এর অমোঘ প্রতিষ্ঠা। আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ইস্পাত কঠিন কাঠামো ভেদ করে শুধু শিল্পী বা বণিকই নয়, কোন ধরণের কোন প্রতিবাদী বা

প্রগতিবাদী তৃতীয় শক্তির বিকাশ ভারতের কোন প্রান্তেই সম্ভব হয় নাই--তাই এই সংস্কৃতির নিত্যসঙ্গী রাজতন্ত্র বা সামন্ততন্ত্র এখানে দীর্ঘস্থায়ী হয়েছে। শুধু রাজনীতিগত ভাবেই নয়, এখানে সামন্ততন্ত্র একটি সাংস্কৃতিক রূপলাভ করেছে শিক্ষাদীক্ষা সাহিত্য এবং সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের মাধ্যমে। পূর্বেই বলা হয়েছে ভারতের সংস্কৃতির প্রকৃতি নির্ণয়ের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ আধুনিক কালেও ব্রাহ্মণ মহিমা আর ক্ষত্রিয় গরিমার উল্লেখ করেছেন সমগ্র ভারতের 'শিষ্ট সংস্কৃতির' ধাতু প্রকৃতিতে আর্য-ব্রাহ্মণ্য বৈদিক সংস্কৃতির প্রভাব গভীর। মৌর্যযুগ থেকে বিষ্ণুপুরের মল্লযুগ পর্যন্ত তাই একই চিত্র দেখা যায়। প্রধানতঃ ভূমি কেন্দ্রিক অর্থনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ্য প্রভাবিত রাষ্ট্রব্যবস্থা. ব্রাহ্মণ-প্রভুত্বে পরিচালিত বর্ণবিভক্ত সমাজ ব্যবস্থা - ব্রাহ্মণ্য স্মৃতি-শাসিত উত্তরাধিকার-পদ্ধতি, ব্রাহ্মণের কুক্ষিগত সংস্কৃত-কেন্দ্রিক প্রথাগত উচ্চশিক্ষা এই আর্য-ব্রাহ্মণ্য-বৈদিক সংস্কৃতির সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠাকে সারাভারতের সংস্কৃতি ক্ষেত্রে একইভাবে সম্ভব করেছে।

---

14 Two interesting points emerge from the cave inscription at Nasik quoted above. The first concerns the political importance of guilds. Although guild leaders were powerful figures in urban life, there is little sign of a desire to obtain political influence, politics being regarded as the prerogative of the King A possible explanation for this is that the King appears to have had financial interests in the guilds. - ---- Royal support in a tangible form and the lack of opposition from the King may have dulled the edge of political ambition amongst the guild leaders. Furthermore the seizing of political power on the part of a given guild would require that it first ally itself with other

মূলতঃ এই সংস্কৃতির মূলবাহন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য ভারতের সমস্ত প্রান্তে একইভাবে একই শিক্ষাক্রম এবং বিভিন্ন চিন্তা-চর্চার বিকাশ ঘটিয়ে আর্যব্রাহ্মণ্য বা প্রকারান্তরে বৈদিক সংস্কৃতির ভারত জোড়া দিগ্বিজয় অনায়াসে সম্পন্ন করেছে।

ভারতের সবপ্রান্তে একই সঙ্গে একই সাংস্কৃতিক বাতাবরণ বিস্তারের দৃষ্টান্ত আমরা ইতোপূর্বে বিষ্ণুপুর আর আমেদাবাদের (পূর্ব-পশ্চিম দুই প্রান্তে অবস্থিত) পুঁথির নিরিখে দেখাবার চেষ্টা করেছি। এমন কি অন্তিম মধ্যযুগে বৈষ্ণব সংস্কৃতির বিশিষ্ট বিকাশের ধারাটিও ভারতের দুইপ্রান্তে অবস্থিত দুটি বৈষ্ণব কেন্দ্রে যে প্রায় একই রকম ছিল ঐ পুঁথির তালিকা থেকে তাও প্রতিভাত হয়। এই সব পুঁথির নিরিখে এই দুই প্রান্তের দুই বৈষ্ণব সংস্কৃতি-কেন্দ্রের চর্চা চিন্তা, শিক্ষাদীক্ষার ক্লাসিক পরিমণ্ডলটিও সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। বৈষ্ণব সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করে অন্তিম মধ্যযুগে যে ভারতীয় ক্লাসিক (বা পৌরাণিক) সংস্কৃতিরই পুণরুজ্জীবন ঘটেছিল তা সহজেই প্রতীয়মান হয়। সমাজ আর রাষ্ট্র ব্যবস্থার আদর্শটিও সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। "বৈষ্ণব সাহিত্যে সমাজতত্ব" পুস্তিকায় ডঃ ভুপেন্দ্রনাথ দত্তের মন্তব্য এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।[১৫] মুসলমান শাসনেও ভারতে মূল আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অবস্থান প্রায় অপরিবর্তিতই ছিল।

ভারতের ইতিহাসের প্রায় প্রতিটি পর্বে এই দুরতিক্রম্য আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রভাব প্রভুত্ব প্রায় একইভাবে লক্ষ্য করা যায়। এই সংস্কৃতির অখণ্ড প্রভাব অতিক্রম করে কোন প্রতিবাদী ও প্রগতিবাদী

---

guilds in order to obtain their loyalty, without which no political ambitions were likely to be achieved. Such co-operation may have been effectively prevented by caste rules, such as that forbidding eating together, which was as effective barrier between guilds of different caste." —History Of India (The Rise of the Mercantile Community) by Romila Thapar. Penguine Books. 1986. Page. 112.

তৃতীয় শক্তির স্থায়ী বিকাশ সম্ভব হয় নাই। যখনই এই সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে বা এ ধরণের শক্তি মাথা তুলে আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিকে আচ্ছন্ন করেছে—অতি স্বল্পকালের মধ্যেই প্রবল গতিতে সনাতন ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পুণরুজ্জীবন ঘটেছে ভারতের শিষ্ট সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠ-পোষকতায়। শিক্ষা-দীক্ষা বিশেষতঃ বর্ণ-প্রাধান্যে বা কৌলীণ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত এই শিষ্ট বা উচ্চ সম্প্রদায়ের প্রত্যক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রতিবাদী ও প্রগতিবাদী কোন ধর্ম সংস্কৃতিই স্বরূপে আত্মরক্ষা করতে পারেনি ক্রমশঃ মূল স্রোতেই লীন হয়েছে।

ভগবান বুদ্ধ বা শ্রীচৈতন্যের প্রতিবাদী ধর্মমতও স্বরূপে দীর্ঘকাল স্থায়ী হতে পারেনি।

বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের অব্যবহিত পরবর্ত্তীকাল থেকেই বুদ্ধ-বচন বা বৌদ্ধ অনুশাসনের প্রকৃত অর্থ-বিচারকে কেন্দ্র করে মত পার্থক্যের সূচনা হয় এবং তারই ভিত্তিতে একাধিক ধর্মমহাসভার (বৌদ্ধ সঙ্গীতি) অনুষ্ঠান হয়। রক্ষণশীল 'থেরবাদের' (পালি ভাষায় বৌদ্ধ-বচন সংগ্রহ করে রূপলাভ করেছিল) একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র হয়ে উঠে কৌশাম্বী। মথুরা থেকে উদ্ভূত "সর্বাস্তিবাদ" শাখা উত্তরাপথে বিস্তার লাভ করে শেষ পর্যন্ত মধ্য-এশিয়ায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয় মূলতঃ সংস্কৃত ভাষায় বৌদ্ধ-অনুশাসন একত্রিত করে। নানা মতবাদ বিকাশের ফলে বৌদ্ধধর্ম ক্রমশঃ পরিবর্তিত হতে থাকে। ক্রমশঃ বুদ্ধের উপর ঈশ্বরত্বের আরোপ করে পূজামূর্তি নির্মিত হয় (খ্রীষ্টাব্দের প্রথমেই)। সমসাময়িক কালেই বোধিসত্ত্ব-তত্ত্বচিন্তার

---

১৫ বৈষ্ণব সাহিত্যে সমাজতত্ত্ব পুস্তিকায় (ভারত সাহিত্য ভবন : কলিকাতা ১৯৪৫) ডঃ ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত, দুর্গাচন্দ্র সান্যাল এর অভিমত অনুসরণ করে লিখেছেন বাঙ্গালাদেশ মুসলমানদের দ্বারা অধিকৃত হইলেও দেশের অভ্যন্তরে হিন্দুরাজ্যই চলিতেছিল। (বাঙ্গালার সামাজিক ইতিহাস ১০ম সংস্করণ পৃঃ ৪৬ দুর্গাচন্দ্র সান্যাল) শুধু বঙ্গদেশেই নয় সারাভারতেই একই চিত্র। মুসলমান শাসনও তার বর্ণ- শ্রেণী বিভক্ত সমাজ ও স্মার্ত-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিকে স্পর্শ করতে পারে নাই।

উন্মেষ ঘটে। জাতক এবং বোধিসত্ত্ব-চিন্তার ক্রমশঃ ব্যাপক প্রসারের ফলে বৌদ্ধধর্মের আদি চিন্তা (বোধিচিত্তের বিকাশ ও নির্বাণলাভ) বা মূল স্রোত থেকে এ ধর্ম অনেকখানি সরে এল। কঠোর তপস্যা এবং অন্তর্মুখী প্রজ্ঞার দুরূহ অনুশীলনের পরিবর্তে একাধিক জন্মে শুভকর্মের মাধ্যমে মোক্ষলাভ সম্ভব এবং নির্বাণ লাভের পরিবর্তে জনকল্যাণ বোধিসত্ত্ব-তত্ত্বে অধিকতর আদরণীয় বলে গৃহীত হওয়ায়, এ ধর্মে সম্ভোগমনস্ক ধনী, শ্রেষ্ঠী-বণিক, রাজা-মহারাজাদের ঢল নামল। এঁরা বৌদ্ধ স্তূপ, মঠ, বিহার নির্মাণ করে এবং তার পৃষ্ঠপোষকতা করে পুণ্য সঞ্চয় করতে লাগলেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের কষ্ট কৃচ্ছ্রের অবসান হ'ল। এমনি করে ক্রমশঃ বৌদ্ধধর্ম একটি অভিজাত শ্রেণীর কুক্ষিগত হ'ল। সাধারণ মানুষ থেকে বৌদ্ধধর্মের মূল ধারাটি সরে গেল।[১৭]

একটি দ্বিতীয় ধারা তন্ত্রের পথ ধরে নিম্নবর্গীয় মানুষের লোকস্তরে অবতরণ করল বজ্রযান-সহজযানের মাধ্যমে। এই সাংস্কৃতিক বিভাগ যতটা আধ্যাত্মিক তার চেয়ে অনেকবেশী আর্থ-সামাজিক। এই ধারার সিদ্ধাচার্যদের ধর্মআন্দোলনকে অনেকে একটি সামাজিক বা রাজনৈতিক পটভূমিকায় রেখে বিচার করেছেন। পালযুগে কেন্দ্রীয় শাসন এবং ক্লাসিক বাতাবরণ লুপ্ত বা অনেকাংশে অপসারিত হ'লে সূজ্যমান বাংলা ভাষার আলোকে বাংলার নিম্নকোটি মানুষের মুখ ক্ষণিকের জন্য হলেও উদ্ভাসিত হয়ে উঠে। গবেষদের কেউ কেউ এ যুগের কৈবর্ত্ত আন্দোলনের সঙ্গে প্রায় সমগোত্রীয় করে দেখেছেন এই সিদ্ধ-আন্দোলনকে। সংস্কৃত ভাষার মোহময়ী ক্লাসিক আবরণে এই প্রাদেশিক সংস্কৃতি প্রায় আচ্ছন্ন ছিল, সূজ্যমান বাংলা ভাষার আলোকে নিম্নকোটি মানুষের জগৎ উদ্ভাসিত হ'ল। এই পাল যুগে কৈবর্ত্ত বিদ্রোহকে রাজনৈতিক আন্দোলনরূপে চিহ্নিত করা হলে— সিদ্ধাচার্যদের প্রতিবাদী অধ্যাত্ম-চিন্তাকে তার সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট-রূপে গ্রহণ করা খুব অযৌক্তিক নয়।

বৌদ্ধধর্ম মূলতঃ বেদ বিরোধী হলেও পাল রাজারা যে বেদজ্ঞ

ব্রাহ্মণদের প্রচুর ভূমি দান করেছিলেন বা রাষ্ট্র ব্যবস্থাতেও বেদজ্ঞ পণ্ডিতরা যে প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিলেন, এযুগের লেখমালাই তার প্রধানসাক্ষী। বুদ্ধদেব যজ্ঞ নিন্দা করতেন এটা সর্বজন বিদিত। তারানাথের বিবরণ[১৬] থেকে জানা যায় রাজ্যের পরমায়ু বৃদ্ধির জন্য পাল রাজারা বিরাট যজ্ঞ আরম্ভ করেছিলেন। অর্থাৎ পাল রাজাদের ইষ্টধর্ম ভারতীয় হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য রাজধর্মকে অতিক্রম করতে পারেনি। বৌদ্ধধর্ম তখন অনেকটা শক্তিহীন হয়েছে এবং সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর কুক্ষিগত হয়ে ক্রমশঃ জনবিচ্ছিন্ন হয়েছে। তাছাড়া রাষ্ট্র বা সমাজে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব বড় একটা পড়ে নাই। বৌদ্ধধর্ম ক্রমশঃ বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়েছে। মহাযানের বিরাট দেবতাজগৎ, পূজাপাঠ, সবমিলে তখন হিন্দু-পৌরাণিকধর্মের প্রায় সমগোত্রীয় হয়ে পড়েছে। মহাযান বৌদ্ধশাস্ত্রগুলি সংস্কৃত ভাষায় রচিত হওয়ার সূত্রে হিন্দু শাস্ত্রের সঙ্গে এগুলির সহজ মিলন পথও রচিত হয়। ক্রমশঃ এই পৌরাণিক বাতাবরণে আসল বৌদ্ধধর্ম আচ্ছাদিত হয়।

---

১৬ প্রচলিত মতে অবশ্য পাল রাজারা মহাযান বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠ-পোষক ছিলেন। মহাযানের কয়েকটা মূল কথা বলতে মৈত্রী, করুণা, বোধিচিত্ত-উৎপাদন (বা প্রাণী মাত্রেরই পরম হিতসাধনের সংকল্প) মহাকরুণাময় অবলোকিতেশ্বরের পূজোপাঠ। অবশ্যই তার সঙ্গে কর্মফলও – যদিও উৎপন্নক্রম, সম্পন্নক্রম প্রভৃতির আলোচনা তুলে মতটা ঢের বেশী জমকালো করবার আয়োজন। তবে পাল রাজারা শুধু বিশুদ্ধ মহাযানেরই সমর্থক ছিলেন কিনা — এ বিষয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ওঠবার কথাও। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিশেষতঃ যাগযজ্ঞের ব্যাপারে—তাঁরা নেহাত উদাসীন ছিলেন না। তারানাথের বর্ণনায় তাই বিক্রমশীল বিহারে 'বলি আচার্য' 'হোম আচার্য' প্রভৃতির প্রায় রাজকীয় বর্ণনা। এবং তারানাথ ফলাও করেই বলেছেন পাল রাজ-বংশের পরমায়ু যাতে সুদীর্ঘ হয় এই আশায় স্বয়ং ধর্মপাল এমনই এক বিশাল যজ্ঞের আয়োজন করেন যার জন্যে নিদেন পক্ষে নগদ ন' লক্ষ দু'হাজার রৌপ্যমুদ্রা খরচা হয়।" সিদ্ধ আন্দোলন ও কৈবর্ত বিপ্লব ॥ অনুষ্টুপ শারদ সংখ্যা ১৩৯৫ ইং ১৯৮৮ ॥ দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যের গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মেও অনুরূপ অবস্থা ঘটে। চৈতন্য তাঁর প্রবর্তিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-ধর্মে -একটি বিপ্লবাত্মক গতিবেগ সঞ্চার করতে চেয়েছিলেন। তাঁর এই আন্দোলনমুখী ধর্মচর্যার সবচেয়ে উদ্দীপক মাধ্যম ছিল সম্মেলক কীর্ত্তন। এরই দ্বারা তিনি জাতি-ধর্ম-বর্ণহীন একটি সংগঠন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। এই কীর্তন আন্দোলন উদ্দাম হয়ে কাজীর শাসনকেও আঘাত করেছিল।[১৮]

কিন্তু এই উন্মাদনা আর উদ্দীপনাকে স্থায়ীভাবে ধরে রাখার মত কোন সংগঠন গড়ে তোলা শ্রীচৈতন্য বা তাঁর পার্ষদদের পক্ষে সম্ভব হয় নাই। ধর্মীয় আন্দোলনের উত্তাল উদ্দীপনাকে সাংগঠনিক রূপ দেওয়া অসম্ভবও বটে। তাছাড়া শ্রীচৈতন্যের ধর্মমত ঠিক বেদবিরোধী বা আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির প্রতিবাদীও ছিল না। শ্রীচৈতন্য এবং তাঁর পার্ষদরা সকলেই ছিলেন সংস্কৃত পণ্ডিত।

---

17 Buddhism hovers in the background of most activities in this period (B. C. 200 to 300 A. D.) and it enjoined the support of the rich and powerful elements, It is not to be wondered at, therefore that the Buddhist Order became affluent and respected. Some of the monasteries had such large endowments that they had to employ slaves and hired labour the monks alone not being able to cope with the work. Gone were the days when the Buddhist monks lived entirely on the alms which they collected in the morning hours for now they ate regular meals —— secluded monastaries were sufficiently well endowed to enable the monks to live comfortably. The Buddhist Order thus tended to move away from the common people and isolate itself which in turn deminished much of it religious strength : A History of India. Thapar.

শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পর এধর্মেও একাধিক শাখা উদ্গত হ'ল। বৃন্দাবনের গোস্বামীরা সংস্কৃত ভাষায় আর্য-ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির পৌরাণিক প্রেক্ষাপটে গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের যে দার্শনিক কলেবর রচনা করেন তা ভারতের ক্লাসিক হিন্দু-সংস্কৃতিরই নামান্তর।[১৯] শ্রীচৈতন্য এবং তাঁর অভীষ্ট গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মকে বৃন্দাবনের গোস্বামীরা মূলতঃ ব্রাহ্মণ্য-ক্লাসিক সংস্কৃতির পটাবরণে আচ্ছাদিত করেছিলেন। আগেই বলেছি ভারতের সমাজ বা সংস্কৃতি ক্ষেত্রে প্রচলিত আর্য-ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির সনাতন নিস্তরঙ্গ ক্ষেত্রে যখনই কোন প্রতিবাদী ধর্ম-দর্শন ঈষৎ আন্দোলনের সূচনা করেছে, তখনই ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতি শতফণা উদ্যত করে তাকে অবিলম্বে গ্রাস করেছে। এ শুধু ধর্মীয় বা দার্শনিক মতভেদের জন্যই নয় —রাজা এবং ব্রাহ্মণ তথা সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ের স্বার্থ সংরক্ষণের প্রশ্নই এখানে সমধিক। বলা বাহুল্য আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সমুন্নত উৎকর্ষ আর ঔজ্জ্বল্যের পশ্চাতে আছে রাজা আর

১৮ সর্ব নবদ্বীপে আজি করিমু কীর্তন।
দেখোঁ মোরে কোন কর্ম করে কোনজন

ভাঙ্গিয়া কাজির ঘর কাজীর দুয়ারে।
কীর্তন করিমু দেখোঁ কোন কর্ম করে॥
তিলার্দ্ধেকো ভয় কেহ না করিহ মনে।

১৯ সনাতন ও রূপ বৃন্দাবনে বসিয়া নব-বৈষ্ণব মতের যে শাস্ত্র ও সাহিত্য রচনা করিতে লাগিলেন তাহার ভাষা সংস্কৃত। তাঁহারা বুঝিয়া ছিলেন যে বাঙ্গালা দেশের বাহিরে সংস্কৃত আশ্রয় না করিলে কোন নূতন চিন্তা ও আদর্শ গৃহীত হইবে না। তাঁহারা ইহাও বুঝিয়া ছিলেন যে সংস্কৃতে নূতনশাস্ত্র চালাইতে হইলে তাহা পুরাতন শাস্ত্রের অনুবৃত্তিরূপেই উপস্থাপিত করিতে হইবে। সুতরাং চৈতন্যকেই কৃষ্ণের অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়াও তাঁহার কৃষ্ণলীলা স্মরণের ও কৃষ্ণ-উপাসনারই ব্যবস্থা দিলেন, এবং চৈতন্যলীলা বর্ণনার ও চৈতন্য পূজার দিক দিয়া গেলেন না।

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস॥ প্রথম খণ্ড পূর্বার্ধ॥ সুকুমার সেন ইস্টার্ণ পাবলিশার্স। কলিকাতা॥ পঞ্চম সংস্করণ ১৯৭০ পৃঃ ৩২৪।

ব্রাহ্মণ তথা সামন্ততন্ত্রের অস্তিত্ব বা আত্মরক্ষার অকৃত্রিম এ অবিচল প্রয়াস।

শ্রীচৈতন্যের জাতি-ধর্ম-বর্ণ সংস্কারহীন ধর্মান্দোলনের চিহ্নটুকু পর্যন্ত মুছে গেল গোস্বামী সিদ্ধান্তের মাধ্যমে সৃষ্ট ক্ল্যাসিক ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে। বিষ্ণুপুরের সতেরোর শতকে নির্মিত বিখ্যাত শ্রীশ্রীশ্যামরায়, জোড়বাংলা, খড়বাংলার (অপূর্ব আটচালা) রাধাবিনোদ মন্দিরের টেরাকোটায় শ্রীচৈতন্য প্রায় উহ্য। শ্রীশ্রীশ্যামরায় মন্দিরের হাজার হাজার টেরাকোটার মধ্যে (উত্তরদিকের বারান্দায়) শ্রীচৈতন্যের অল্প এবং যৎসামান্য উল্লেখমাত্র দেখা যায়। এ মন্দিরের ক্ল্যাসিক ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পটাবরণে শ্রীচৈতন্যদেব প্রায় সম্পূর্ণ ঢাকা পড়েছেন। ভারতের অন্যান্য মন্দিরের মতই পৌরাণিক কাহিনীগুলি এখানের মন্দির-টেরাকোটায় একটি সামন্ততান্ত্রিক প্রেক্ষাপটে যথারীতি স্থান লাভ করেছে। বিশেষভাবে শ্রীচৈতন্যের বা চৈতন্যলীলার কোন উল্লেখ নাই।

আপন ধাতুপ্রকৃতির তাগিদে বা প্রবণতায় আর্য-ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির পক্ষে রাজা-ব্রাহ্মণ তথা সম্ভ্রান্ত ও সম্পদশালী মানুষের পৃষ্ঠপোষকতা লাভে আগ্রহী থাকাটা স্বাভাবিক। আপন-আপন স্বার্থ তথা রাজতন্ত্র বা সামন্ততন্ত্রের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য পরস্পরের এ আগ্রহ যে অকৃত্রিম এবং বেদের যুগ থেকে চলে আসছে এটা আগেই বলা হয়েছে।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম নামান্তরে ক্ল্যাসিক হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য বা আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি দুশ বছর ধরে মল্লরাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল এবং মল্লরাজারা প্রাচীন হিন্দু-ব্রাহ্মণ্য আদর্শেই মল্লরাজ্যকে রূপ দিয়েছিলেন। আগেই বলা হয়েছে যে রাজতন্ত্র বা সামন্ততন্ত্রই আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অনুষঙ্গী রাষ্ট্রিক কাঠামো। ভারতের অন্যান্য অঞ্চলেরই মতই মল্লরাজারা তাঁদের সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রীয় কাঠামো অক্ষুন্ন এবং অটুট রাখার জন্য এ রাজ্যের অন্তিম বা সঙ্কটকালেও নিরলস প্রয়াস চালিয়েছেন।

মল্লরাজত্বের অন্তিমপর্বে মল্লরাজ গোপাল সিংহ (১৭১২-১৭৫০) এবং তাঁর পরবর্তী রাজা চৈতন্যসিংহের (১৭৫১-১৮০৬) আমলেও এই

মল্লরাজ্যের সামন্ততান্ত্রিক কাঠামো অক্ষুন্ন রাখার প্রয়াস দুর্নিরীক্ষ্য নয়। মল্লরাজ্যের এই সঙ্কটকালেও এই দুই মল্লরাজা প্রচুর ব্রহ্মোত্তর প্রদান করেছেন[20] এবং মন্দিরের পর মন্দির নির্মাণ করেছেন দেখা যায়। চৈতন্য সিংহের সময়ের নির্বিচার ব্রহ্মোত্তর দানকে কেন্দ্র করে মল্লভূমে নাকি একটি প্রবাদ প্রচলিত হয়েছিল। রাজদত্ত-ভূসম্পত্তিহীন ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্বে সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করত না। ইউরোপীয় বণিকদের প্রবল প্রতাপ যখন দেশের চারদিকে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হচ্ছে এবং মুদ্রা অর্থনীতি বাজার দখল করেছে তখনও মল্লরাজারা তাঁদের সভাকবিদের ভূসম্পত্তি দান করে পুরাণ রচনায় উৎসাহিত করে চলেছেন। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন (বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথমখণ্ড অপরার্ধ) যে পুরাণের রীতিতে এবং গোস্বামী গ্রন্থের অনুসারে লেখা গোপাল সিংহদেবের একটি গ্রন্থ পাওয়া গিয়েছে। ইউরোপীয় ধনতন্ত্র তথা বণিক-অর্থনীতির মুখে দাঁড়িয়ে এযেন সামন্ততন্ত্রের অস্তিত্ব রক্ষার এক অন্তিম প্রয়াস।

বৌদ্ধধর্ম উচ্চশ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে আপামর জনসাধারণ থেকে দূরে সরে গেলে এ ধর্মের একটি লোকায়ত শাখা উদগত হয়ে সমাজের নিম্নবর্গীয় সমাজে প্রবাহিত হয়। এরই নাম বৌদ্ধ-সহজিয়া। অনুরূপভাবে বৈষ্ণবধর্ম, আর্য-ব্রাহ্মণ্য পৌরাণিক সংস্কৃতির কবলিত হয়ে ব্রাহ্মণ তথা সম্ভ্রান্তগোষ্ঠীর কুক্ষিগত হলে সহজিয়া

---

20 Report on the survey and settlement Operations in the District of Bankura 1917-1924 Cal 1926 P. 106 গোপাল সিংহ এবং চৈতন্যসিংহের আমলে অনেকগুলি মন্দির নির্মিত হয় :— জোড় মন্দির : নির্মাতা গোপাল সিংহ (১৭২৬) একই সঙ্গে তিনটি মন্দির। লালবাঁধের দক্ষিণ পাড়ে। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ মন্দির নির্মাতা কৃষ্ণসিংহ (গোপালসিংহের পুত্র) শ্রীশ্রীরাধামাধব মন্দির কৃষ্ণসিংহের মহিষী : ১৭৩৭ খ্রীঃ। শ্রীশ্রীনন্দলাল মন্দিরটিও এইসময় নির্মিত হয়। শ্রীশ্রীরাধাশ্যাম বিগ্রহের মন্দির ১৭৫৮ (পলাশীর যুদ্ধের পরবৎসর) খ্রীঃ প্রতিষ্ঠিত হয়।

বৈষ্ণব ধর্মের উদ্ভব ঘটে আর তা বিশেষভাবে ব্রাহ্মণেতর নিম্নবর্গীয় সমাজের মধ্যেই প্রবাহিত হ'য়। বৌদ্ধ বা বৈষ্ণব দুই ভিন্ন নামে আখ্যায়িত হলেও সহজিয়া-বৌদ্ধ এবং বৈষ্ণব-সহজিয়ার একটি ধাতুগত সমগোত্রীয়তার কারণ শুধু তত্ত্বগত বা দর্শনগত নয়, উভয়-ক্ষেত্রেই নিম্নবর্গীয় মানুষের জগৎই এই সহজিয়ার ভিত্তিভূমি। উভয়ক্ষেত্রেই আদিম তান্ত্রিকতার প্রেক্ষাপট। গুহ্যতত্ত্বের কথা বাদ দিলে চর্যাপদের লোকায়ত বহিরাবরণ তাৎপর্যপূর্ণ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আদিম বশীকরণ, মারণ, ছাড়াও লোকসংস্কারের বহুলপ্রকাশ দেখা যায়। এ কৃষ্ণলীলার সঙ্গে পদাবলীর কৃষ্ণলীলা বা পৌরাণিক কৃষ্ণলীলা সগোত্র নয় ভিন্ন গোত্রের।

সংস্কৃতি ক্ষেত্রেও বর্ণগত বিভাজন। এই সাংস্কৃতিক বিভাজন যে সমাজে শুভ নয়—ধর্মমঙ্গলে তাঁর ইঙ্গিত সুস্পষ্ট। নিম্নবর্গীয় এই সব মানুষ আক্রমণকারী বৈদেশিক শক্তিকে ত্রাতা এবং ঈশ্বরের অবতার বলে স্বাগত জানিয়েছে। অনেকে ভারতের সংস্কৃতিতে বিবিধের মাঝে মহান মিলন লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু বর্ণভেদ স্পৃশ্যাস্পৃশ্য বিচার, সমুন্নত দার্শনিক উৎকর্ষের পাশে স্তূপীকৃত অশিক্ষার অন্ধকার, এমনি সব বিসম অবস্থানের মধ্যে যথার্থ সাংস্কৃতিক মিলন কতটুকু সম্ভব তা সহজবোধ্য নয়।

শুধু তাই নয়, সমাজের নীচের তলার সংস্কৃতি মুখ্যতঃ উৎপাদক শ্রমজীবী মানুষের গ্রামীণ সংস্কৃতি অন্যটি সমাজের উপরের তলার উদ্বৃত্তভোগী সম্ভোগমনস্ক মানুষের সংস্কৃতি।

উভয়ের গোত্র ভিন্ন। কৃষ্ণলীলাও দুই জগতে দুরকম। সহজিয়া শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে সুপণ্ডিত বড়ুর হস্তাবলেপের পরেও তার গ্রামীণ চরিত্রটি সুস্পষ্ট। এখানে রাধা-চন্দ্রাবলী রাহী-গোয়ালিনী। সহজ সরল গ্রাম্য সংস্কার রাধার চিন্তায় ধারণায় ভরপুর। বশীকরণ-মারণ-উচাটনের বহুল প্রয়োগ প্রণয় লীলায়। নায়ক কৃষ্ণও কানু রাখাল।

অন্যদিকে গোস্বামী গ্রন্থের রাধা শাশ্বত রসিকচিত্তবল্লভীর প্রোঢ়াপারাবতী'—কেলি-কলায়, লীলাবিলাসে এবং রতিশাস্ত্রে সচেতন

সুপরিণত নাগরিকা বা নায়িকা। শ্রীকৃষ্ণ কীর্তনে গোয়ালিনী রাহী-মথুরার হাটে কেনাবেচা করে দুধ-দই এর পসরা। রূপগোস্বামী গোয়ালিনী রাহীকে রাণী করে শ্রীকৃষ্ণের পাশে বসিয়েছেন। রূপ-গোস্বামীর সম্ভোগমনস্ক পদগুলিতে অভিসার বর্ণনায় রাজকবি কালিদাসের উত্তরাধিকার —জয়দেবের গভীর প্রভাবও গোস্বামী-চিন্তায় দুর্নিরীক্ষ্য নয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের উপমা-বর্ণনা ইত্যাদিতে গ্রামীণ বাতাবরণ সুস্পষ্ট। রূপ গোস্বামীতে ক্লাসিক দর্শন, নন্দন শাস্ত্র ও রতিশাস্ত্রের বহুল প্রয়োগে যথারীতি সংস্কৃত শাস্ত্র-সাহিত্যের আদর্শে ও অনুশাসনে নির্মিত শ্রীরাধায় তাত্ত্বিক প্রতীকী-চিন্তাই সমধিক। এখানেও গুপ্তযুগের-সামন্ততান্ত্রিক 'ভুক্তিমুক্তি'র নান্দনিক আদর্শের অনুসরণ 'রাগানুগা' তত্ত্বে।

মূলতঃ সমাজের দুইমেরুর দুই ভিন্নগোত্রের সাহিত্য। শিক্ষা-দীক্ষা সম্পদে সমৃদ্ধ উচ্চবর্ণের সম্ভোগমনস্ক সাহিত্যের পাশাপাশি ব্রাহ্মণ্যেতর গ্রামীণ সংস্কৃতির রূপভেদ সহজেই ধরা পড়ে। তবু উপরিকাঠামোর সমৃদ্ধ সংস্কৃতির উজ্জ্বল রূপটি সংখ্যালঘিষ্ঠ মানুষের সংস্কৃতি হয়েও উৎকর্ষে গরিমায় ভারত সংস্কৃতির প্রতিনিধিত্ব করে। গ্রামের উৎপাদক শ্রেণীর মানুষরা যতই প্রয়োজনীয় হোক সম্পদ-বন্টনের অধিকার নগরের রাজা-রাজন্য আর সম্ভ্রান্তদের হাতে। তাই এই উপরি কাঠামোর আশ্রিত আর্য-বৈদিক বা আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিই স্বল্প-সংখ্যক বা সংখ্যালঘিষ্ঠ মানুষের সংস্কৃতি হয়েও ঔজ্জ্বল্যে প্রভাবে আবহমানকাল থেকেই ভারত-সংস্কৃতিরই প্রতিনিধিত্ব করে চলেছে।

ভারতের টেরাকোটা জগতেও সমধিক প্রভাবশালী এই আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বিচিত্র বিকাশের চিত্রটি নিঃসন্দেহে উল্লেখযোগ্য। বিদ্যা ও বিত্তে সমৃদ্ধ ভারতীয় সমাজের উপরিকাঠামোর আশ্রয়ে ও পৃষ্ঠপোষকতায় লালিত এই আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি বা ভারতের শিষ্ট সংস্কৃতির তাৎপর্যপূর্ণ অগ্রগতি এখানেও সুস্পষ্ট।

স্বনামধন্য গবেষক শ্রীমতী দেবাঙ্গনা দেশাই এর গবেষণা-সমৃদ্ধ

রচনা অনুসরণ করে বলা যায় দেশের বাণিজ্য এবং সম্পদ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ভারতে নগর বিকাশের ধারা দ্রুততর হয়। আর এই সব নগরে স্বাভাবিকভাবে অর্থবান একশ্রেণীর নাগরিকের বিকাশ ঘটে। রাজা আর রাজন্যবর্গ ছাড়াও শ্রেষ্ঠী, বণিক প্রভৃতি সম্ভোগমনস্ক নাগরিক মানুষের চাহিদার ফলেই টেরাকোটা-সামগ্রী পণ্যদ্রব্য রূপে নিজস্ব বাজার তৈরী করে। পূর্বকালের গ্রামীণ মুখ্যতঃ ধর্মীয় টেরাকোটা-নিদর্শনগুলিই এইসব সম্পন্ন বিলাসী নাগরিকদের চাহিদার অনুসরণে অনাধ্যাত্মিক বা 'সেকুল্যার সজ্জা দ্রব্য' রূপে বিবর্তিত হয়। নব বিকশিত নাগরকদের আশা আকাঙ্খা এবং বিশেষ ধরণের রসতৃষ্ণা চরিতার্থ করার তাগিদেই গ্রামীণ টেরাকোটার এই নাগর সংস্করণের বিকাশ।

ডঃ নীহাররঞ্জন রায় মৌর্য-শুঙ্গ যুগের যক্ষীমূর্তিগুলির বিবর্তিত লাস্যময় ভঙ্গিমার নিরিখে এই সময়ের শিল্পকলায় তথা বৌদ্ধধর্মে শ্রেষ্ঠী-বণিকদের প্রভাব এবং পৃষ্ঠপোষকতা অনুমান করেছেন।

ভারতের টেরাকোটা-জগৎ যথারীতি (দুটি সংস্কৃতি অনুসারে) দুটি মোটা দাগে বিভক্ত। একটি সিন্ধু-উপত্যকায় বিকশিত প্রাগার্য মাতৃতান্ত্রিক সংস্কৃতি, অন্যটি গাঙ্গেয় উপত্যকায় বিকশিত পিতৃতান্ত্রিক আর্য-সংস্কৃতি।

সিন্ধু-উপত্যকায় বিকশিত সংস্কৃতির অন্যতম টেরাকোটা-প্রতীক মাতৃকা মূর্তিগুলিকে বহিরঙ্গ বিচারে বা অনেকটা অনুমানের ভিত্তিতে ধর্মীয় মূর্তি বা পূজামূর্তি রূপে ধরে নিলেও এগুলির পশ্চাতে কোন ধর্মীয় শাস্ত্রানুশাসন বা মূর্তিশাস্ত্রের কোন সুনির্দিষ্ট প্রতিমা লক্ষণের আভাস মেলেনা। তাছাড়া বিস্তীর্ণ ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে প্রচলিত অনেকাংশে আত্মজাতিক এই মূর্তিকাগুলির প্রভাবও প্রাসঙ্গিকতা পরবর্তীকালের ভারত সংস্কৃতিতে তার শক্তি সাধনা ও শাক্তদর্শনের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বলে স্বীকার করে নিয়েও বলা যায় এগুলির মাধ্যমে কোন সুস্পষ্ট বা শাস্ত্রীয় ধর্মদর্শনের আভাস পাওয়া যায় না।

তাছাড়া শিল্প-ভাস্কর্যের নিরিখে সিন্ধু-সভ্যতার জগতে শ্রেণী বিভাগের আভাস পাওয়া গেলেও সমাজ বা রাষ্ট্রব্যবস্থার কোন সুস্পষ্ট পরিচয়ও মেলেনা। লিপি-পাঠের পূর্ব পর্যন্ত এখানের সব কিছু অনিশ্চিত এবং অনুমানের কুয়াশায় আচ্ছন্ন।

কিন্তু গাঙ্গেয়-উপত্যকায় বিকশিত আর্যসভ্যতার প্রভাবশালী ভূমিকা তার সূচনা কাল থেকেই অনুভূত হয়। সমৃদ্ধ ভাষা-ভিত্তিক শাস্ত্র সাহিত্য ও চিন্তা-চর্চার প্রেক্ষাপটে বিকশিত ও বিবর্তিত এই সংস্কৃতি প্রথমাবধি যেমন স্বচ্ছ তেমনি চলমান-গতিশীল।

মৌর্য বা প্রাক্-মৌর্য যুগ থেকে গুপ্তযুগের মধ্যে এই আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির একটি সুস্পষ্ট অবয়ব পরিস্ফুট হয়েছে গাঙ্গেয় উপত্যকার টেরাকোটা-জগতে। এই সময়ের মধ্যে বিকশিত বিরাট পৌরাণিক দেবতা-জগতের পরিপ্রেক্ষিতে এ সংস্কৃতির সংশ্লেষণ, আত্তীকরণ এবং সংগঠন শক্তির যে পরিচয় পাওয়া যায় তা তাৎপর্য-পূর্ণ। একাধিক ধর্ম দর্শনের বিকাশ আভাসিত হয় এইসব কাল্ট-মূর্তিগুলির মাধ্যমে। কিন্তু শুধু ধর্মীয় জগতই নয়, ধর্মীয় শাসনমুক্ত সেক্যুলার জগতের নরনারীর অসামান্য কান্তিনির্মাণে এবং মুদ্রা-ভঙ্গিমার বিচিত্র প্রয়োগে বাঙ্ময় টেরাকোটা-মূর্তিকাগুলির নিরিখে একটি সম্ভোগমনস্ক রূপের জগৎ সৃষ্টির পশ্চাতে সমৃদ্ধ রতিশাস্ত্র নাট্যশাস্ত্র তথা পরিণত নন্দনশাস্ত্রের বিকাশও অনুমিত হয়। মৌর্য যুগের (গোলকপুরে)এক টেরাকোটা নারীমূর্তিতে শিল্পী যে সংবেদন-শীল রূপ সৃষ্টি করেছেন, সুপরিণত-নান্দনিক-আদর্শ ছাড়া এ ধরণের অসামান্য কান্তিনির্মাণ অসম্ভব। বিকানীর সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত (ঐ অঞ্চলেরই বিভিন্ন স্থান থেকে সংগৃহীত) টেরাকোটা মূর্তিগুলির উপর বাৎস্যায়নের কামশাস্ত্র (২০০ থেকে ৪০০ খ্রীস্টাব্দে রচিত বলে অনুমান করা হয়) ও ভরতের নাট্যশাস্ত্রের প্রভাব অনুমান করেছেন অনেক গবেষক।

কুষাণ-গুপ্ত যুগের ধর্মীয় টেরাকোটা-মূর্তিকাগুলি থেকে নানা ধর্মীয়-দর্শনের বিকাশের কথা আগেই বলা হয়েছে। কুষাণ ও গুপ্ত যুগের উমা-মহেশ্বর মূর্তিও বিভিন্ন বিষ্ণুমূর্তির নিরিখে ভাগবত ও

পাশুপত ধর্মের বিকাশ আভাসিত হয়। যাই হোক, মৌর্য যুগ থেকে গুপ্ত যুগের মধ্যে সুপরিণত হিন্দু-পৌরাণিক জগৎ এবং ধর্মীয় শাসনমুক্ত রূপের জগতের সুস্পষ্ট বিকাশ লক্ষ্যকরা যায় এই টেরাকোটা জগতে। কিন্তু এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, কি ধর্মীয় বা ধর্মীয়-শাসনমুক্ত এই সব টেরাকোটা-মূর্তিকাগুলির প্রেক্ষাপট নগর। এগুলির পশ্চাতে যে সমুন্নত ধর্মদর্শন অথবা নন্দন শাস্ত্রের প্রভাব অনুমান করা যায় তা নগরের রাজা ব্রাহ্মণ কিংবা সম্ভ্রান্ত বণিকশ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতাতেই বিকশিত হয়েছিল বলে মনে হয়।

মৌর্য যুগ থেকেই টেরাকোটা মূর্তিকার জগতে ধর্মীয় অপরিচয়ের কুয়াশা কাটিয়ে আর্য-ব্রাহ্মণ্য পৌরাণিক দেবতাদের পূজা-মূর্তি বা কাল্ট মূর্তিগুলির সুনির্দিষ্ট বিকাশ লক্ষ্য করা গেলেও গুপ্তযুগ থেকেই আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সুস্পষ্ট এবং পূর্ণ বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। এই সংস্কৃতির প্রায় সহজাত সামন্ততান্ত্রিক প্রেক্ষাপটটিও এই সঙ্গে সমুজ্জ্বল হয়ে ওঠে। নির্বিচার ব্রহ্মোত্তর প্রদানকে কেন্দ্র করে সামন্ততান্ত্রিক ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা লক্ষ্য করা যায়। রাজসভার আশ্রয়ে থেকেই মুখ্যতঃ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতরা শাস্ত্র-সাহিত্য-[২২] পুরাণ সমাজের উচ্চস্তরে প্রচার করতেন। মল্লরাজাদের আশ্রয়ে শঙ্কর কবিচন্দ্র রামায়ণ-মহাভারত রচনা করেন। এ রামায়ণ বিষ্ণুপুরী রামায়ণ নামে খ্যাত। ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন 'অঙ্গদের-রায়বার'

২২ মৌর্য-সাম্রাজ্যের অবসানের পর হইতে ধীরে ধীরে মধ্যদেশের সাংস্কৃতিক প্রাধান্য বাড়িতে থাকে। এবং গুপ্ত রাজাদের সময়ে সংস্কৃত শাস্ত্রবিধির অভিযান প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষে বিজয়ী হয়। বাঙ্গালা দেশেও "বেদজ্ঞ" ব্রাহ্মণের প্রতিপত্তি গুপ্ত অধিকারের সময় হইতেই আরম্ভ হইয়াছিল। মধ্যদেশে বিনির্গত "বেদাধ্যায়ী" ব্রাহ্মণকে আনাইয়া জমিজমা দিয়া স্থিত করানো এদেশের রাজশক্তির পক্ষে মানবৃদ্ধি কারক কর্তব্য বলিয়া গণ্য হইতে থাকিল। নবাগত ব্রাহ্মণেরা প্রাধান্য লাভ করায় পুরাণো (আথর্বণ ?) ব্রাহ্মণ অনেকে বর্ণ-ব্রাহ্মণে পরিণত হইল। অথবা ব্রাহ্মণেতর জাতির মধ্যে মিশিয়া গেল।

অধ্যায়টি কবিচন্দ্রের রচনা—অনুলিপির মাধ্যমে কাশীরাম দাসের রামায়ণে অনুপ্রবেশ করেছে। এ অনুমান যে অভ্রান্ত তার প্রমাণ রয়েছে গোপাল সিংহের সময়ে নির্মিত জোড়মন্দিরের ল্যাটারাইট ভাস্কর্যে "অঙ্গদের রায়বার" চিত্রে। গোপাল সিংহের পূর্ববর্তী কোন মন্দিরের ভাস্কর্যে "অঙ্গদের রায়বার" চিত্র দেখা যায় না। বলা বাহুল্য সভা-কবিদের ভূমিদান করে পুরাণ রচনায় উদ্বুদ্ধ করার মধ্যে মধ্যযুগের হিন্দু রাজদরবারেরই অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়। এমনি করে ক্রমশঃ ব্রাহ্মণের শক্তি দেশের রাজ্য-রাজনীতিতে বেড়ে যায়। রাজকার্যেও এঁদের অপরিসীম প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অনেক ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণরা প্রতাপশালী ভূম্যধিকারীতে পরিণত হয়ে রাজশক্তির নিয়ন্ত্রণের বাইরে স্বাধীন প্রশাসকেও পরিণত হন।[২৩]

গুপ্তযুগের চক্রপুরুষ-টেরাকোটায় সামন্ততন্ত্রের আভাস ও পরিস্ফুট হয়। সামন্তচক্র চূড়ামণি রাজারা এক সময় এই চক্রপুরুষের উপাসনা করতেন। গুপ্ত যুগের মূর্তি ভাস্কর্যে চক্রপুরুষের বহুল প্রচলন লক্ষ্যকরা যায়। ভাগবতধর্মের প্রবক্তা এবং ভগবান বিষ্ণুর উপাসক গুপ্ত সম্রাটরা চক্রপুরুষের উপাসনা করতেন এমন অনুমান অসঙ্গত নয়। চতুর্থ পঞ্চম শতকে গুপ্তরাজত্বকালে এই 'চক্রপুরুষ' উপাসনা

গ্রামশাসনভোগী ব্রাহ্মণেরা "গাঁই" সৃষ্টি করিয়া ক্রমশঃ সমাজপতিত্ব অবিচল করিল। রাজকার্যেও ইহাদের ক্ষমতা বাড়িয়া গেল। ইহারাই রাজসভার আশ্রয়ে থাকিয়া সংস্কৃত-শাস্ত্র-শাসিত আচার-অনুষ্ঠান-ধর্ম-বিশ্বাস সমাজের উচ্চস্তরে প্রবেশ করাইতে লাগিল। রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণ কাহিনী এইভাবে রাজসভার কবিদের দ্বারাই প্রচারিত হইল।" বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস : প্রথম খণ্ড : পূর্বার্ধ : ডঃ সুকুমার সেন : ১৯৭০ : ইস্টার্ন পাবলিশার্স : পৃষ্ঠা ৮০।

23 Thus the wide spread practice of making land-grants in the Gupta period paved the way for rise of brahmana feudatories, who performed administrative functions not under the authority of the royal officers but almost independently." —Indian Feudalism : R. S. Sharma. Mc Millan India : 1996. Page 4.

চক্রবর্ত্তী রাজাদের মধ্যে প্রচুর জনপ্রিয়তা লাভ করে। এ প্রসঙ্গে চতুর্থ শতকের তাৎপর্যপূর্ণ শুশুনিয়া লিপিটির উল্লেখ করা যায়। এটি গুপ্তরাজা বা গুপ্তদের কোন সামন্তরাজার লিপি। এটি কোন স্বাধীন স্বয়ম্ভু আঞ্চলিক রাজার লিপি নয় বলেই মনে হয়। এই লিপির শীর্ষ দেশে উৎকীর্ণ 'বিষ্ণুচক্রটি' বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই চক্রটির সঙ্গে 'বৃষ্ণি' জাতিগোষ্ঠীর মুদ্রায় উৎকীর্ণ (বক্ষ্যমান গ্রন্থে প্রদত্ত চিত্র দ্রষ্টব্য) চক্রটির উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। বলাবাহুল্য বিষ্ণু 'বৃষ্ণি' বংশসম্ভূত। শুশুনিয়া লিপির চক্রটির একটি সর্ব-ভারতীয় ঐতিহ্য থাকাই স্বাভাবিক এবং এটি চক্রস্বামী উপাসক গুপ্তরাজাদের বা গুপ্ত সামন্ত-রাজাদের লাঞ্ছন বলেই মনে হয়। এই চক্রলাঞ্ছনের নজিরে অনুমান করা যেতে পারে যে এ লিপির চন্দ্রবর্মা রাজপুতানার পুষ্করণা থেকে আগত এবং পোখর্ণায় (বাঁকুড়া) অধিষ্ঠিত গুপ্তদের কোন সামন্তরাজা। আপাতদৃষ্টিতে এই লিপিটি একটি বিচ্ছিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন বলে মনে হলেও আসলে তা নয়। অনেক পরবর্তীকালে হলেও শলদায় ভাগবতধর্মের ধারাটির সুস্পষ্ট বিকাশ লক্ষ্য করা যায়। পশ্চিমবঙ্গে শলদার মত একটি গুরুত্বপূর্ণ পুরাক্ষেত্র বিরল। এখানে ভাগবতধর্ম এবং পাশুপত ধর্মের যুগপৎ বিকাশ ঘটেছে। এখানের লকুলীশমূর্তি তথা ঘোর শৈব-মূর্তিগুলি একদিকে যেমন পাশুপত শৈবধর্মের অস্তিত্বের সাক্ষী অন্যদিকে জয়পুর থানার শলদা-গোকুলনগর রাজগ্রামের (বিষ্ণুর) ব্যূহ বিভব মূর্তি (অবতার) গুলি প্রাচীন ভাগবত-ধর্মেরই ঐতিহ্যবাহী। গোকুলনগরের অনন্তশয়ান বিষ্ণুমূর্তিটিও এপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

গুপ্তযুগেই বিষ্ণুকেন্দ্রিক ভক্তিধর্মের পূর্ণবিকশিত রূপটি টেরাকোটা-জগতেও ধরা পড়ে। কুষাণ-গুপ্তযুগের প্রেক্ষাপটেই ভাগবতধর্মের পূর্ণ পরিস্ফুট রূপটি গাঙ্গেয় উপত্যকার টেরাকোটা জগতে আত্মপ্রকাশ করে। অহিচ্ছত্র থেকে (এলাহাবাদ সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত) টেরাকোটা-বিষ্ণু মূর্তির মস্তকভাগ, ঝুসি (এলাহাবাদ) থেকে প্রাপ্ত নৃসিংহ অবতারের (টেরাকোটা) মূর্তি যেমন ভাগবতধর্মের ইঙ্গিত বহন করছে, গুপ্তযুগের উমা-মহেশ্বর মূর্তি তেমনি পাশুপত

শৈবধর্মের সাক্ষ্য বহন করছে।

এ যুগের (গুপ্ত) অজ-একপাদ মূর্তি (বৈদিক)তে গবেষকরা শৈব-পাশুপত এবং ভাগবন্ধর্মের সমন্বয়ের আভাস পেয়েছেন। হরিহর মূর্তিতেও এমনি এক সমন্বয়।

বলাবাহুল্য শ্যামরায় মন্দিরের উপর তলার কেন্দ্রীয় চূড়ার অভ্যন্তরে উমা-মহেশ্বর ও হরিহর মূর্তি এমনি এক পৌরাণিক সমন্বয়েরই প্রতীক বলে মনে হয়। খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে নানাসূত্রে বিষ্ণু দেবতার রূপগত বিবর্তন সূচিত হলেও গুপ্তযুগের প্রত্নতত্ত্বেই যে বিষ্ণুকেন্দ্রিক ভাগবত ধর্মের নানা দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপবিকাশ ঘটেছে তা সর্বজন বিদিত। টেরাকোটা-জগতের আয়নায় সে আভাস দুর্নিরীক্ষ্য নয়। প্রস্তর ভাস্কর্যে এ চিত্র আরো সুস্পষ্ট।

গুপ্তযুগের বিদিশায় (মধ্যপ্রদেশে) গুহা মন্দিরে বিষ্ণুর অবতার মূর্তি (বরাহ অবতার), চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি এবং শেষশায়ী-মূর্তি লক্ষ্য করা যায়। বিষ্ণুপুরের অন্তিম মধ্যযুগের টেরাকোটা মন্দিরগুলিতেও এই পৌরাণিক ভাগবন্ধর্মেরই উত্তরাধিকার সুস্পষ্ট।

এলাহাবাদের অনতিদূরে গাড়ওয়া গ্রামস্থ গুপ্ত যুগের এক মন্দিরের মধ্যে মৎস্য, কূর্ম, বরাহাদি পর্যায়ভুক্ত কয়েকটি পৃথক মূর্তি পাওয়া গেছে (পঞ্চোপাসনা : জিতেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : ফার্মা কে, এল, এম, দ্বিতীয় প্রকাশ : ১৯৯৭) মধ্যপ্রদেশের দেওগড়ে অবস্থিত গুপ্তযুগের দশাবতার মন্দিরে একটি অনবদ্য অনন্তশয়ী বিষ্ণুমূর্তি লক্ষ্য করা যায়। বিষ্ণুপুরের টেরাকোটা-মন্দিরেও ভাগবন্ধর্ম তথা বৈষ্ণবধর্মের পৌরাণিক ধারাটিই প্রবর্তিত হয়েছে। এখানেও বিষ্ণু দেবতার সমস্ত রূপেরই প্রকাশ ঘটেছে।

মধ্যপ্রদেশের দেওগড়ে অবস্থিত গুপ্তযুগের ঐ দশাবতার মন্দিরেরই "গজেন্দ্র মোক্ষ" মূর্তিটিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। পঞ্চরাত্র সংহিতার একটি শ্লোকে, ভক্তিকেন্দ্রিক ধর্মসম্প্রদায়ের যে নামের তালিকা দেওয়া হয়েছে, তার মধ্যে ভাগবন্ধর্মের তিনটি বা চারটি আকর্ষণীয়। প্রতিশব্দ লক্ষ্য করেছেন পণ্ডিতরা ; এগুলি হল—ভাগবত, সাত্বত, একান্তিক এবং পাঞ্চরাত্রিক। "গজেন্দ্রমোক্ষ" চিত্রটি যেন 'একান্তিক'

বা ঐকান্তিক ভগদ্ভক্তিরই ব্যঞ্জনা বহন করছে। চিত্রটি গোস্বামী গ্রন্থে (শ্রীরূপ গোস্বামীর পদ্যাবলী নামক সংকলন গ্রন্থে) উৎকলিত "গজেন্দ্র গ্রাহ" প্রসঙ্গের টেরাকোটা-চিত্ররূপে এখানের বিখ্যাত শ্যামরায় ও রাধাবিনোদ মন্দিরের টেরাকোটায় এবং গোপাল সিংহদেবের ল্যাটারাইট ভাস্কর্যে উদ্গত হয়েছে। এমনি করেই প্রাচীন ভারতীয় ক্লাসিক শাস্ত্র-সাহিত্য, চিত্র-ভাস্কর্যকে অবলম্বন করেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম-সংস্কৃতি আত্মপ্রকাশ করেছে। বিষ্ণুপুরের সপ্তদশ শতকের মন্দির-গুলির টেরাকোটা-অলঙ্করণের ক্ষেত্রেও শ্রীমদ্ভাগবতের অনুসরণ এবং কৃষ্ণলীলা চিত্রণের প্রাচীন ধারারই অনুবর্তন লক্ষ্য করা যায়।[২৪] স্বাভাবিকভাবেই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মকে কেন্দ্র করে বা অবলম্বন করে আর্য-ব্রাহ্মণ্য ক্লাসিক সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবন ঘটেছে। বেশকিছু তত্ত্বগত বৈশিষ্ট্য এবং বৈচিত্র্য থাকলেও এধর্ম সর্বত্রই ক্লাসিক বা পৌরাণিক বৈষ্ণব ধর্মেরই অনুসরণ করেছে দেখা যায়।

মৌর্যযুগ থেকে গুপ্তযুগের মধ্যে বিষ্ণুকেন্দ্রিক ভাগবদ্ধর্ম তথা বৈষ্ণব ধর্মেরই যে পূর্ণবিকাশ সম্পূর্ণ হয়েছিল তাই নয়, আর্য-ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির অসাধারণ সংশ্লেষণ ও আত্তীকরণ প্রক্রিয়ায় শৈব-শাক্ত-বৈষ্ণব-গাণপত্য-সৌর সম্প্রদায়ের একত্র সমাহারে বিরাট বিচিত্র এক পৌরাণিক জগৎও রচিত হয়েছিল। সিন্ধু উপত্যকার প্রাগৈতিহাসিক মাতৃ-তান্ত্রিক অনার্য সংস্কৃতির উপর আর্য-পিতৃতান্ত্রিকতার আধিপত্য এবং উত্তরাধিকারও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই একই প্রক্রিয়ায়। অনেকে মনে করেন মাতৃকা-মূর্তিগুলি (সপ্তমাতৃকা-অষ্টমাতৃকা থেকে ষোড়শ মাতৃকা) এই প্রক্রিয়ারই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মাতৃকাগণ স্ব স্ব

২৪ বিষ্ণুপুরের সপ্তদশ-শতকের মন্দিরগুলির টেরাকোটা-অলঙ্করণে ক্লাসিক ধারারই অনুসরণ লক্ষ্য করা যায়। শ্রীশ্রীমদনমোহন মন্দিরের টেরাকোটায় বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী চিত্রগুলির উৎসও প্রাচীন। মথুরা-সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত (প্রথম-দ্বিতীয় শতকের) একটি অধভগ্ন প্রস্তরখণ্ডে জন্মাষ্টমী-চিত্র খোদিত আছে কৃষ্ণ-বলরামের বাল্যলীলা ও অসুরবধের কাহিনীগুলি প্রস্তর ফলকে উদ্গত হয়ে গুপ্তযুগের বহুমন্দিরের (উত্তর ও দক্ষিণভারতের) অঙ্গশোভা বৃদ্ধি করেছে।

দেবতার বাহনগুলির দ্বারা চিহ্নিত হন। অসীম শক্তি সম্পন্ন মাতৃকা-তন্ত্রের উপর আর্য-পিতৃতান্ত্রিকতার আরোপ বা আধিপত্যের দৃষ্টান্ত রূপেই এগুলি উল্লিখিত হয়ে থাকে। বিষ্ণুপুরের জোড়বাংলা মন্দিরের টেরাকোটায় কৃষ্ণ-বলরাম আর দাশরথি-রামের বাল্যলীলা ও অসুর-বধ জাতীয় অদ্ভুত চিত্রগুলির বিক্রমের পাশাপাশি পৌরাণিক অষ্টমাতৃকা (এবং দেবীযুদ্ধ) প্যানেলগুলির উপস্থাপন তাৎপর্যপূর্ণ।

বিভিন্ন সম্প্রদায়ের (তেত্রিশ কোটি) অগণিত দেবতার সমন্বয়ে গড়ে ওঠা আর্য-ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির এই প্রভাবশালী পৌরাণিক জগৎ ক্রমশঃ ভারতীয় হিন্দু-ধর্ম-সংস্কৃতি রূপেই প্রতিভাত হয়েছে। শাস্ত্র-সাহিত্য ছাড়াও চিত্র-ভাস্কর্যে, মন্দিরের ভিত্তি-অলঙ্করণে সর্বত্র এই জগতের এক দুর্নিবার আধিপত্য স্থাপিত হয়েছে দেখা যায়।

যে রামায়ণের কাহিনী বিষ্ণুপুরের মন্দির-টেরাকোটার সিংহভাগ অধিকার করে আছে, তার সূচনাও গুপ্তযুগে। গুপ্তযুগের কিছু রামায়ণের চিত্রসম্বলিত টেরাকোটা-প্যানেল আবিষ্কৃত হয়েছে। বিশিষ্ট পুরাতত্ত্ববিদ ভোগেল সঙ্গত কারণেই মনে করেন, রামায়ণের কাহিনী সম্বলিত এই টেরাকোটা প্যানেলগুলি কোন ব্রাহ্মণ্য মন্দিরের বিশেষ করে কোন বিষ্ণু মন্দিরের। উত্তরপ্রদেশের শ্রাবস্তী থেকেও গুপ্ত-যুগের বেশকিছু রামায়ণের টেরাকোটা-প্যানেল আবিষ্কার করেছেন ভোগেল। জোড়বাংলার মন্দিরে রামকথা আর কৃষ্ণলীলার একই ধরণের (বাল্যলীলা ও অসুর বধ) ঘটনার ক্রমানুযায়ী বর্ণনামূলক কিছু টেরাকোটা টালির পাশাপাশি দুটি দেওয়ালে (পশ্চিম ও দক্ষিণ দেওয়ালে) সন্নিবেশ, প্রাক্ মধ্যযুগের কিছু রাজস্থানী মন্দির অলঙ্করণকে স্মরণ করিয়ে দেয়। এ প্রসঙ্গে "ললিতকলা"র উক্তিটির দ্রষ্টব্য ঃ "An interesting feature of some of the Rajasthani temples is the carving in miniature and in a narrative sequence of the lilas of Krishna and the story of Rama etc ..' Some Iconographic Elements of pre-mediaeval Rajasthani Temples. Lalit Kala Oct 8. 1960 P. 21

আর তার এই বিরাট বিস্তারকে স্থান করে দিতে মন্দির-স্থাপত্যেও নানা বৈচিত্র্য সূচিত হয়েছে। গুপ্তযুগের পরবর্তীকালে ভারতীয় শিল্পকলার (গুপ্তশৈলী থেকে) এক মধ্যযুগীয় বিবর্তনের সন্ধিলগ্নে মন্দির-অলংকরণের ক্ষেত্রে স্থাপত্যের উপর মূর্তি-ভাস্কর্যের নিরঙ্কুশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

দশম-একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে নির্মিত মন্দিরগুলির সর্বাঙ্গ আচ্ছাদিত ক'রে মূর্তি-ভাস্কর্যের ঢল নামে। মূলতঃ ভারতের বিচিত্র বিরাট পৌরাণিক জগৎকে স্থান করে দিতেই ভারতের মন্দিরগুলির গাত্রে এই সুপরিসর চিত্রপট রচনা। মন্দির গাত্রে এই অসংখ্য চিত্ররাজির সুশৃঙ্খল সংস্থানের দিকে লক্ষ্য রেখেই এ সব যুগে বিশেষভাবে রচিত হয়েছে মন্দির স্থাপত্যের পরিকল্পনা। এই মূর্তি-ভাস্কর্যের অফুরন্ত স্রোতকে সুষ্ঠুভাবে স্থান করে দিতে মন্দির-স্থাপত্যে এসেছে নানাধরণের প্রয়োজনীয় পরিবর্তন। নানা ধরণের কোটর বা কুলুঙ্গি, পলকাটা-স্তম্ভ, অর্ধ-স্তম্ভ এবং নানাপ্রকার অভিক্ষিপ্ত (Projected) অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উদ্গম হয়েছে মন্দির-গাত্রে। উড়িষ্যা এবং খাজুরাহোতে নির্মিত সমসাময়িককালের (দশম-দ্বাদশ) মন্দিরগুলি এর উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত।

অনেক পরবর্তীকালে প্রচুর পরিবর্তন-বিবর্তনের পরেও বিষ্ণুপুরের সপ্তদশ-শতকের শ্যামরায়-মন্দিরে সেই প্রাচীন ধারারই স্মৃতি অনুভব করা যায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের সূত্রে পুনরুজ্জীবিত ক্লাসিক ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতির প্রশস্ত পৌরাণিক জগতকে মূর্ত করার জন্যই যেন এই বিপুল বিরাট চিত্রপট রচিত হয়েছে. বিষ্ণুপুরের টেরাকোটা-মন্দিরে বিশেষ করে শ্যামরায়-জোড়বাংলায়। মন্দিরের সর্বাঙ্গে বিভিন্নধরণের অসংখ্য চিত্রের সন্নিবেশ করা হয়েছে। তারজন্যে মন্দির-স্থাপত্যে প্রয়োজনীয় অবকাশ সৃষ্টি করা হয়েছে। মন্দিরের বাইরের দেওয়ালে. ত্রিখিলান-স্তম্ভগাত্রে, গর্ভগৃহে. শিখরদেশে এমনকি শিলিং এর কোনখানে একইঞ্চি জায়গাও খালি নেই। জোড়বাংলার গর্ভ-গৃহটি অনলংকৃত হলেও দুটি চালার গায়ে, শীর্ষদেশে কাঠের-কাঠামোর অপূর্ব অনুকৃতি রচনা করে তার উপর প্রচুর টেরাকোটা-চিত্রের

সমাবেশে বিরল অভিনবত্ব সৃষ্টি করা হয়েছে। স্থাপত্য-ভাস্কর্যে এক ক্লাসিক শৃঙ্খলা এক নজরেই ধরা পড়ে। স্থাপত্য-ভাস্কর্যের মেল-বন্ধনই শুধু নয়, অসংখ্য টেরাকোটা-টালির মধ্যেও এক অসাধারণ মেলবন্ধন সৃষ্টি করে মন্দির জুড়ে ছন্দ-লয়ের নির্বাধ তরঙ্গকে অক্ষুন্ন রেখে একটি সর্বাত্মক সাঙ্গীতিক আবেদন মূর্ত করতে চেয়েছেন শিল্পী। শুধু বিষয় বস্তুতেই নয় আঙ্গিক-অলঙ্করণেও বিষ্ণুপুরের মন্দির-টেরাকোটায় ক্লাসিক উত্তরাধিকার সুস্পষ্ট। যে শিল্পধারা দু'শ বছর ধরে (ষোড়শ-অষ্টাদশ) বিষ্ণুপুর তথা মল্লভূমের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে স্থাপত্য-ভাস্কর্য-মিনিয়েচার-চিত্রকলা-সঙ্গীত, দশাবতার তাস [২৫] এককথায় সমকালীন ভারতের সর্বপ্রকার শিল্পকলাকে এখানে সার্থক-ভাবে বিকশিত করে বিষ্ণুপুরকে আঞ্চলিকতার ঊর্ধ্বে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত করে পূর্ব ভারতের অন্যতম বিশিষ্ট কলানগরীতে পরিণত করেছিল তা যে একটি সুসমৃদ্ধ সুপরিণত সর্বভারতীয় কেন্দ্রীয় শিল্পধারা এবং তার উৎস যে ঐতিহ্যমণ্ডিত তা সহজেই বোঝা যায়।

আগেই বলা হয়েছে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মাধ্যমে যে ভারতীয় ক্লাসিক-সংস্কৃতির অন্তিম মধ্যযুগীয় এক বিবর্তিত ধারা বিষ্ণুপুরে প্রবেশ করেছিল, তা বিষ্ণুপুর তথা মল্লভূমের রাষ্ট্র, সমাজ, শিক্ষা ব্যবস্থা, শিল্পকলা সমস্ত কিছুর উপর বিবর্তিত ক্লাসিক সংস্কৃতির বাতাবরণটি প্রসারিত করেছিল। এই ব্রাহ্মণ্য ক্লাসিক সংস্কৃতির পৌরাণিক ধারাটিই মন্দির টেরাকোটাতেও প্রতিধ্বনিত হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন যুগের অন্যান্য মন্দিরের মতই রামায়ণ-মহাভারত

---

২৫ উড়িষ্যা আর মহারাষ্ট্রেও দশাবতার তাসের প্রচলন আছে। কিন্তু বিষ্ণুপুর তাস তার বিশিষ্ট অঙ্কণশৈলী আর বিচিত্র বর্ণিকাভঙ্গে বঙ্গীয় শিল্পকলার এক বিশিষ্ট নিদর্শনরূপে গণ্য হয়। মিনিয়েচার চিত্রের আদলে বাংলার রেখাপ্রধান লোকশৈলীর প্রভাবজাত বিবর্তনে এই তাসগুলি আকর্ষণীয়।

শ্রীমদ্ভাগবতের পৌরাণিক চিত্রগুলিই এখানে সমধিক প্রাধান্য পেয়েছে। গোস্বামী তত্ত্বগুলিও বহুলাংশে পৌরাণিক চিত্রগুলির অনুসরণে প্রকাশিত হয়েছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম তথা চৈতন্য-জীবন এই পৌরাণিক পটাবরণে ঢাকা পড়েছে। প্রাক্-মধ্যযুগের মন্দির অলংকরণের প্রচলিত ধারাতে রামকথা, কৃষ্ণকথাই (পৌরাণিক দেবীযুদ্ধ আর মাতৃকা প্যানেলসহ) সবিস্তারে চিত্রার্পিত হয়েছে বিষ্ণুপুরের মন্দির-টেরাকোটায়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের দার্শনিক কলেবর রচনার ক্ষেত্রে গোস্বামীরা যে প্রচলিত পৌরাণিক বৈষ্ণব ধর্মের প্রেক্ষাপটটিকেই গ্রহণ করেছিলেন, ক্ল্যাসিক শাস্ত্র-সাহিত্যই যে এ কার্যে তাঁদের প্রধান অবলম্বন হয়েছিল তা পূর্বেই বলা হয়েছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মকে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যেই এ উদ্যোগ। এই জন্যই চৈতন্যকথাকে প্রায় উহ্য রেখে (রামকথা-কৃষ্ণকথা-দেবীযুদ্ধ ইত্যাদি) পৌরাণিক কাহিনীগুলি অবলম্বন করা হয়েছে। নবাঙ্গভক্তি, শরণাগতি সব কিছুর অংকুরই পুরাণ আর মহাকাব্যেই উপ্ত হয়েছে। কুঞ্জসেবা তথা মঞ্জরী তত্ত্বের বীজও পূর্ববর্তীকালের শাস্ত্র-সাহিত্যে লক্ষ্য করা যায়। কুঞ্জে মিলিত রাধাকৃষ্ণের লীলাদর্শনের ভাবাদর্শের ইঙ্গিত রয়েছে জয়দেবে। ক্ল্যাসিক শাস্ত্র-সাহিত্যের ঐতিহ্যমণ্ডিত প্রেক্ষাপটটি গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মকে একটি পরিণত সংস্কৃতির ঔজ্জ্বল্যে অভিষিক্ত করেছে। এই ক্ল্যাসিক ঐতিহ্য তার শিল্পকলার জগৎটিকেও অভিনবত্ব দান করেছে। বিষ্ণুপুরের মন্দির-টেরাকোটাতেও এই ক্ল্যাসিক উত্তরাধিকার দুর্নিরীক্ষ্য নয়। এই ক্ল্যাসিক ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক বৈভবযুক্ত বাতাবরণ তাকে পরবর্তী অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকের মন্দির-টেরাকোটা থেকে পৃথক করেছে।

ভারতীয় ক্ল্যাসিক সংস্কৃতির পূর্ণ বিকাশের কাল গুপ্তযুগ। ক্ল্যাসিক গুপ্তযুগেই ভারতীয় প্রাচীন শাস্ত্রসাহিত্যের একটি মান নির্ণীত হয়। যদিও প্রাক্ গুপ্তযুগে এমনকি মৌর্যযুগ থেকেই টেরাকোটার জগতে বেশকিছু মৃত্তিকার অপরূপ কান্তিনির্মাণে অত্যাশ্চর্য নিপুণতার পরিচয় পাওয়া যায়, এবং সেগুলির পশ্চাতে উন্নতমানের শাস্ত্র-সাহিত্যের তথা সুপরিণত নন্দনতত্ত্বের অস্তিত্ব বা

প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই অনুভূত হয়,[২৬] তবু গুপ্তযুগেই ভারতীয় শিল্প-সংস্কৃতির সুবর্ণযুগ— এ যুগেইভারতের শিল্প-সাহিত্য গৌরব-গরিমার শীর্ষদেশ স্পর্শ করেছিল বলে গবেষকরা মনে করেন।

এই গুপ্তযুগেই সামন্তচক্রচূড়ামণি গুপ্তরাজাদের ব্যাপক রাজ্য জয় আর বিজিত রাজাদের হাতে তাঁদের রাজ্য প্রত্যর্পণ ('গ্রহণ মোক্ষানুগ্রহ' দিল্লী-মেহেরৌলি লিপি) এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্রহ্মোত্তর প্রদানকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতি ও সামন্ত-অর্থনীতির এক বিশিষ্ট বিকাশ ঘটে। অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই ভারতীয় ক্লাসিক সংস্কৃতির মর্মমূলে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি আর সম্ভোগমনস্ক-সামন্ত-অর্থনীতির যুগপৎ প্রভাব সুদৃঢ়-ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে গুপ্তযুগের সম্ভোগমনস্ক (সামন্ততান্ত্রিক) 'ভুক্তি-মুক্তি'র নান্দনিক আদর্শ প্রসূত শৃঙ্গারাত্মক-ভক্তিশ্রীর বাতাবরণটি ভারতীয় ক্ল্যাসিক-ধর্মসংস্কৃতির ধাতুপ্রকৃতিতে গভীরভাবে মুদ্রিত হয়। কালিদাস থেকে জয়দেব সেখান থেকে গোস্বামী-সিদ্ধান্তের "রাগানুগা"র এই শৃঙ্গার-রসাত্মক ভক্তির ধারা প্রবেশ করে। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমেই এই ক্ল্যাসিক যুগের সংস্কৃতির বাতাবরণের প্রেক্ষাপটে বিষ্ণুপুরের মন্দির-টেরাকোটায় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পৌরাণিক-মোটিফগুলির পাশাপাশি পরিস্ফুট মোগলভারতের মোটিফগুলি, পৃষ্ঠপোষক মোগল-অনুগত মোগল-সামন্ত মল্লরাজাদের পৃষ্ঠপোষকতার আভাস দিচ্ছে। মোগল ভারত তথা মোগল সামন্ত-আভিজাত্য, তাদের ভোগবিলাস ও প্রভুত্ব প্রদর্শনের চিত্রগুলি

---

২৬ মৌর্যযুগে গোলকপুরে প্রাপ্ত অপরূপ টেরাকোটা নির্মিত নারী মূর্তিকার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। শুঙ্গযুগের অসামান্য টেরাকোটা যক্ষীমূর্তিগুলি এবং অন্যান্য অপূর্ব-দর্শন মূর্তিকা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদের সন্নিকট 'কৌশাম্বী' থেকে (উৎখাতের ফলে আবিষ্কৃত দেবী হারিতির মন্দিরের ভগ্নাবশেষ থেকে) প্রাপ্ত দেবী হারিতি ও গজলক্ষ্মীদেবীর অনন্যসাধারণ টেরাকোটা-মূর্তিকায় ক্ল্যাসিক গুপ্তযুগের গৌরব-গরিমার পূর্বাভাস লক্ষ্য করেছেন অনেক গবেষক।

মল্লরাজা তথা মোগল সামন্তজগতের আশা-আকাঙ্খাকেই যেন আভাসিত করেছে। নব-কলেবরে ব্রাহ্মণ্য-পৌরাণিক জগৎ আর সামন্তজগতের অবিনাবদ্ধ অবস্থিতি নবরূপে বিবর্তিত ক্লাসিক সংস্কৃতির বাতাবরণটিই প্রকটিত করেছে।

বলাবাহুল্য ভারতের বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য প্রভৃতি সর্বপ্রকার প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম-সংস্কৃতির মতই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মও বিষ্ণুপুরের মল্লরাজা ও রাজন্যদের সমর্থন পুষ্ট হয়েই মল্লভূমে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। এই ব্রাহ্মণ্যবাদী উচ্চ দার্শনিকতাপূর্ণ এবং নগরের প্রেক্ষাপটে পুষ্ট ক্লাসিক ধর্মসংস্কৃতি অনার্য জাতিপ্রধান মল্লভূমের আপামর জনসাধারণের মধ্যে স্বক্ষেত্র খুঁজে পায় নাই। বিপুল প্রজাসাধারণ থেকে এই বৈষ্ণব সংস্কৃতি এবং মল্লরাজারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। এই বিচ্ছিন্নতা মল্লরাজাদের সচেতন প্রয়াস প্রসূত হওয়াও অসম্ভব নয়। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজারা নিজেদের পদমর্যাদা বৃদ্ধির জন্য তাঁদের আঞ্চলিক পরিচয়ের গণ্ডী অতিক্রম করে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হতে চেয়েছিলেন, বলে মনে করা নানা কারণে অসমীচীন নয়। তাঁরা যে এ অঞ্চলেরই কৌম সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ এমন ইঙ্গিত বিরল নয়—অথচ নিজেদের রাজপুত কুলোদ্ভব বলে প্রমাণ করার জন্যই তাঁরা পূর্বাপর নানাভাবে প্রয়াসী হয়েছেন দেখা যায়। রাজপুত কুলশীলের দাবীদার হিসাবেও আঞ্চলিকতার ঊর্ধ্বে উত্তরণ প্রয়াস স্বাভাবিক। মোগল যুগে হিন্দু রাজপুত রাজাদের একটি বিশিষ্ট রাজনৈতিক তথা সাংস্কৃতিক ভূমিকার কথা আগেও বলা হয়েছে। আপাদমস্তক মোগল-সংস্কৃতিতে নিমজ্জিত থেকেও একটি প্রতিবাদী হিন্দু-রক্ষণাশীলতা এদের মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সদা জাগ্রত ছিল। এই বংশগৌরব ও আভিজাত্যের দাবীদার মল্লরাজারাও অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের রাজধানীতে এক সর্বভারতীয় হিন্দুস্থানী মার্গ-সংস্কৃতির সমৃদ্ধ-বাতাবরণ সৃষ্টির সর্বপ্রকার আয়োজন সম্পূর্ণ করে আঞ্চলিকতার ঊর্ধ্বে উঠতে প্রয়াসী হয়েছিলেন এমন চিন্তা অলীক নয়। সমকালীন (ষোড়শ-সপ্তদশ শতক) ভারতের শিল্প বিকাশের ধারার অনুসরণে স্থাপত্য-ভাস্কর্য-মিনিয়েচার

চিত্রকলা-মার্গসঙ্গীতের প্রসার ঘটিয়ে বিষ্ণুপুরকে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন বলেই মনে হয়।

ভ্রাম্যমান শিল্পী সংঘ বা গিল্ডগুলি সারা ভারতে বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করে মন্দির-নির্মাণ করতেন। এক একটি যুগে ভারতের বিভিন্ন অংশে রচিত স্থাপত্য-ভাস্কর্যের মধ্যে শিল্পরীতির সমগোত্রীয়তা এরই ফলে সম্ভব হয়েছে। উড়িষ্যার কোন কোন মন্দির-ভাস্কর্যের সঙ্গে খাজুরাহোর মিল দুর্নিরীক্ষ্য নয়। এমনি ভ্রাম্যমান কোন উচ্চমানের শিল্পী গিল্ডের নির্দেশনায় এবং তাদের রচিত তালিকা বা 'মাস্টার' ধরে বিষ্ণুপুরের টেরাকোটা-মন্দিরগুলির বিরাট চিত্রপটগুলি রচিত হয়েছে তাই সেখানে শুধু সর্বভারতীয় নয়, বহির্ভারতীয় বহু মোটিফের সমন্বয়ে এক একটি সমৃদ্ধ প্রেক্ষাপট রচনা সম্ভব হয়েছে। অতএব বিষ্ণুপুরের এই শিল্প-বিকাশ কোন আঞ্চলিক বিকাশ নয়, ভারতীয় শিল্পকলারই একটি বিশেষ যুগের প্রতিনিধিত্ব করছে। সর্বভারতীয় শিল্পকলার প্রেক্ষাপট বা পটভূমিকায় রেখেই এর বিচার করতে হয়। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম সংস্কৃতির মাধ্যমে বিষ্ণুপুরে এই মহান বিকাশ একটি সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। মল্লভূমের অধিকাংশ মানুষ ছিল এর সঙ্গে সম্পর্কহীন।

অনেকে মনে করেন, পাশাপাশি বাস করার ফলে বৈষ্ণবধর্ম-সংস্কৃতি দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বা আপামর জনসাধারণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করেছে। এই সরলীকৃত মন্তব্য আংশিক-ভাবে মেনে নিয়েও বলা যায় বিচিত্র প্রতিক্রিয়া জাত এই প্রভাবের চরিত্র বা প্রকৃতিগত পার্থক্য প্রচুর। প্রধানতঃ রাজধানী বা রাজসভা কেন্দ্রিক এইসব ধর্মসংস্কৃতির সুসংস্কৃত দার্শনিক ধারা মূলতঃ গ্রামবাসী, দেশের অধিকাংশ মানুষ বা আপামর জনসাধারণ এবং অনুন্নত কৌম সম্প্রদায় তথা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে চুঁইয়ে কিছুটা প্রবেশ করলেও তা দরিদ্র অশিক্ষিত অপাংক্তেয় এবং ক্ষুদ্র সংকীর্ণ গ্রাম-পরিবেশের মধ্যে আবদ্ধ দেশের অধিকাংশ অধিবাসীর সীমাবদ্ধ গ্রাম্য-চিন্তা-চেতনার প্রতিক্রিয়ায় বিবর্তিত হয়ে অসংস্কৃত গ্রাম্যতায় পর্যবসিত হয়েছে। মার্গ-শিল্পকলার সংস্কৃত

মোটিফগুলির অসংস্কৃত কম্পোজিশনের গ্রাম্যতাপূর্ণ চিত্রভাষা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কৃষ্ণলীলার আদিবাসী-পটগুলিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। বর্তমান গ্রন্থে আদিবাসী (গুরুসদয় দত্তের রচনা থেকে গৃহীত) কৃষ্ণলীলাপটে রাসলীলা, নৌকাখণ্ড চিত্র দ্রষ্টব্য। কৃষ্ণের গাভী দোহনের (শ্যামরায় মন্দিরের কেন্দ্রীয় চূড়ায় উৎকীর্ণ) চিত্রটির কথা "পদ্যাবলী"র শ্লোক সহযোগে পূর্বেই বলা হয়েছে। এরও একটি আদিবাসী-সংস্করণ পটে দেখা যায়। অবশ্য এই সংস্কৃত মোটিফগুলির বিষয়বস্তু হয়ত লোকজগৎ থেকেই আহৃত হয়েছে। কিন্তু সমাজের উপরি কাঠামোর উন্নত মার্গ-সংস্কৃতির সঙ্গে আপামর জনসাধারণের গ্রাম্যতাযুক্ত লোকায়ত সংস্কৃতির গোত্র-ভিন্নতা সুস্পষ্ট। মল্লরাজধানী বিষ্ণুপুরের নগরকেন্দ্রিক প্রেক্ষাপটে নির্মিত মন্দির এবং মন্দির-টেরাকোটার বিপুল বৈভব এ অঞ্চলের অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকের গ্রামকেন্দ্রিক আঞ্চলিকতার প্রেক্ষাপটে নির্মিত মন্দির এবং মন্দির-টেরাকোটায় অপসৃত প্রায়। ভারতীয় সমাজের উপরি-কাঠামো আর নীচের মহলের মধ্যে যে অপার সাংস্কৃতিক ব্যবধান তা অন্যত্র দেখা যায় না। একদিকে অতুল বৈভবশালী শাস্ত্র-সাহিত্যের সমুন্নত প্রেক্ষাপটে সৃষ্ট অলোকসাধারণ শিল্প-সংস্কৃতি, অন্যদিকে আপামর জনসাধারণের মনোমুখী লোকায়ত সংস্কৃতি। উভয়ের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। নিজের স্বাভাবিক জীবনরসে এ লোকায়ত জগৎ যতই সজীব এবং মৌলিক-রসসিক্ত হোক না কেন তার সঙ্গে মার্গ-সংস্কৃতির গোত্রভিন্নতা দুনিরীক্ষ্য নয়। শিক্ষা ও সম্পদ থেকে বঞ্চিত এই নিম্ন অবস্থানের আপামর জনসাধারণ স্বাভাবিকভাবেই মার্গসংস্কৃতি থেকে অনেক দূরবর্তী। শিক্ষা আর সম্পদের বণ্টন-বঞ্চনা থেকেও এই সাংস্কৃতিক বঞ্চনা, জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে অধিকতর মারাত্মক। ভারতের মার্গসংস্কৃতির সমুচ্চ দার্শনিক চিন্তা আর শিল্পকলার সমুন্নত বিকাশ কোন যুগেই তার রাষ্ট্রিক বা সামাজিক মহতী-বিনষ্টিকে বাধা দিতে পারেনি। মল্লভূমের ইতিহাসেও একই চিত্র। মল্লভূমের মহান শিল্প-বিকাশ তার অবক্ষয় এবং অবসানকে রোধ করতে পারেনি। দেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠী তার পতনের কালে সম্পূর্ণ উদাসীন থেকেছে দেখা যায়।



পরিশিষ্ট

সপ্তদশ শতকে নির্মিত বিষ্ণুপুরের (বর্তমানে টিকে থাকা) টেরাকোটা-অলঙ্কৃত মন্দিরগুলির সংখ্যা চারটির মত হলেও অলঙ্করণের দিক দিয়ে শ্যামরায় আর জোড়বাংলাই সর্বাধিক সমৃদ্ধ। খড়বাংলার শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ মন্দিরটি টেরাকোটা-অলঙ্করণের দিক থেকে না হলেও স্থাপত্য রীতির দিক থেকে উল্লেখযোগ্য। সপ্তদশ শতকের এই আটচালা মন্দিরটি বিষ্ণুপুরী আটচালার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শ্রীশ্রীমদনমোহন মন্দিরের টেরাকোটা-টালির সংখ্যা কম হলেও বিন্যাস বৈচিত্র্যে আকর্ষণীয়। দুটি ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরের (রাসতলা আর শাঁখারীবাজারের মদনমোহন মন্দিরের বিপরীতে) কিছু টেরাকোটা-টালির সংগ্রহ রয়েছে স্থানীয় আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনে। অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকের একটি (গোপালগঞ্জ) মন্দিরের কিছু টেরাকোটা-চিত্রও এখানে সংগৃহীত হয়েছে।

শুধু টেরাকোটা-চিত্রের সংখ্যা-প্রাচুর্য আর বিন্যাস বৈচিত্র্যেই এই টেরাকোটা-মন্দিরগুলি উল্লেখযোগ্য নয়—তত্ত্ব-তাৎপর্যে আর ভাব পারম্পর্যের গূঢ় ইঙ্গিতেও এগুলি আকর্ষণীয়। অলঙ্করণে ক্লাসিক-উত্তর প্রাক-মধ্যযুগের প্রচলিত ধারা অনুসরণ করে নিবিড় পৌরাণিক বাতাবরণ সৃষ্টি করা হলেও তারই আবরণে গোস্বামী-সিদ্ধান্তের নবাঙ্গ-ভক্তি, যুগলভজন তত্ত্ব, সখীভাব-কুঞ্জসেবা-মঞ্জরীতত্ত্ব বিষ্ণুপুরের মন্দির-টেরাকোটায় (বিশেষ করে শ্যামরায় ও জোড়বাংলায়) চিত্ররূপ লাভ করেছে। শৃঙ্গার ও উজ্জ্বল রসাত্মক রাগানুগা ভক্তি এবং বৈধী ভক্তি পাশাপাশি চিত্রিত হয়েছে।

সবচেয়ে বিচিত্র ব্যঞ্জনায় চিত্রিত হয়েছে গোস্বামী-সিদ্ধান্ত তথা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মূলতত্ত্ব 'রাগানুগা-ভক্তি' আর অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব। নৃত্যগীতে নিঃসৃত শৃঙ্গারাত্মক ভক্তি বা রাগানুগা ভক্তির চিত্রগুলি সব মন্দিরেই রয়েছে প্রচুর সংখ্যায়। পাশে নানামত আর পথের বিবিধ সাধনা বা বৈধী ভক্তির চিত্রাবলী। শ্যামরায়-জোড়-বাংলায় অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্বও রূপায়িত হয়েছে কৃষ্ণলীলার পৌরাণিক চিত্রগুলির মাধ্যমে। যে কৃষ্ণ আপনার অলৌকিক শক্তিতে শতধা বিভক্ত হয়ে অগণিত গোপীর মনোরঞ্জন করছেন তিনিই আবার একক প্রেমে প্রতিটি গোপীর কাছে পৃথকভাবে একান্ত ব্যক্তিগত প্রণয়ে আবদ্ধ (শ্যামরায় মন্দিরের রাসলীলাচিত্র দ্রষ্টব্য)। গোষ্ঠলীলায় যিনি অগণিত অসুরবধ করছেন (জোড়বাংলা) সখারা তাঁরই মুখে তুলে দিচ্ছেন উচ্ছিষ্ট ফল (শ্যামরায় মন্দিরের দক্ষিণ দিকের বারান্দায় প্রবেশের ত্রিখিলান দরজার মাঝেরটির বাঁদিকের স্তম্ভের নীচের দিকে।) মাতা যশোদা পুত্রের নানা অলৌকিক কীর্তির সাক্ষী হয়েও সাধারণ শিশুর মত দড়ি দিয়ে হাত বাঁধছেন (যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনের সংগ্রহ)। যে মাতৃকা শক্তির প্রচণ্ডরোষে সহস্র দানব মুহূর্তে লয় প্রাপ্ত হচ্ছে — তিনিই আবার গণেশজননী-স্কন্দ-মাতা (জোড়বাংলা)। একই রসতত্ত্বের অনুসরণে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে রাম-কৃষ্ণ আর দেবী-মাহাত্ম্যের চিত্রগুলি।

শুদ্ধাভক্তির প্রকাশজন্য অলৌকিক তত্ত্বের উপলব্ধিকে গৌণ স্থান দেওয়া হয়েছে। সহজ সম্পর্কগুলিই অধিকতর উল্লেখযোগ্য মাত্রা পেয়েছে।

মন্দিরগুলিতে সন্নিবেশিত টেরাকোটা-চিত্রের বর্ণনামূলক তালিকা ঃ—

শ্রীশ্রীশ্যামরায় ঃ—

১ রাসলীলা এ মন্দিরের মুখ্য প্রতিপাদ্য ; ৪০টি ছোট-বড়-মাঝারি রাসমণ্ডলচিত্র এ মন্দিরের প্রধান আকর্ষণ। মণ্ডলাকারে 'হল্লীশনৃত্য'।
২ দুই পাশে দুই গোপীর স্কন্ধে বাহুভার ন্যস্ত করে নৃত্যরত কৃষ্ণ ;

পূর্বদিকের ত্রিখিলান প্রবেশ দ্বারের দুপাশে দুটি এই চিত্র ছাড়াও অনুরূপ একাধিক চিত্র রয়েছে এ মন্দিরে। চিত্রটি শ্রীমদ্ভাগবতের রাস-লীলার একটি শ্লোকের চিত্ররূপ। ৩ গজেন্দ্রমোক্ষ : শরণাগতির প্রতীক, ক্লাসিক ভাস্কর্যের মাধ্যমে গোস্বামী শ্লোকের চিত্ররূপ--দক্ষিণের বারান্দা থেকে গর্ভগৃহে প্রবেশ পথের ভিতরের দিকের মাথায়। ৪ পশ্চিমের বারান্দায় গজকচ্ছপ চিত্রে একই অভিব্যক্তি। ৫ সখ্য (দক্ষিণের বারান্দায় প্রবেশের ত্রিখিলান দ্বারের মাঝের দুটি স্তম্ভের বাঁদিকেরটিতে) কৃষ্ণের মুখে সখা উচ্ছিষ্ট ফল গুঁজে দিচ্ছেন। ৬ দাস্য : বাহন সহিত মূর্তিগুলি ছাড়াও কৃষ্ণের গরুড়ারোহীমূর্তি, দক্ষিণের বারান্দায় বৃহদাকার পারিজাত হরণ চিত্র ; দক্ষিণের বারান্দায় এবং অন্যান্য মন্দিরেও রামের অভিষেক চিত্র (সামন্ত-সেবিত সামন্ত চক্রচূড়ামণি রাজা বা মহারাজাদের অভিষেকের অনুরূপ, এটিও সামন্তজগতের দাস্য ভাবেরই চিত্র)। ৭ নৃত্যগীতে রাগানুগা ভক্তির প্রকাশ শ্যামরায় মন্দির ছাড়া অন্যান্য সব মন্দিরেই লক্ষ্য করা যায়। জোড়বাংলার প্রথম দোচালার বারান্দায় এচিত্র সর্বত্র। শ্যামরায় মন্দিরের দক্ষিণদিকের বারান্দায় নর্তকীদের হাতে গুজরাটি চিত্রের পাখা, তেপায়া-পীঠিকা বেশভূষায় উড়িষ্যার প্রভাব ; মদনমোহন মন্দিরের ও জোড়বাংলা মন্দিরের ত্রিখিলান প্রবেশ দ্বারের স্তম্ভগাত্রের নৃত্য চিত্রগুলিও মনোরম। ৮ জটাজুটধারী তপস্যারত সন্ন্যাসীদের চিত্রগুলি— বৈধী ভক্তির প্রতীক। ৯ শ্যামরায়ের দক্ষিণদিকের ত্রিখিলান প্রবেশদ্বারের ডানদিকে শ্রীরাধিকার চিবুকস্পর্শ করে শ্রীকৃষ্ণ ; রূপগোস্বামীর পদ্যাবলীর প্রথম নমস্ক্রিয়ার শ্লোকের চিত্ররূপ। ১০ গর্ভগৃহের প্রতিমাবেদীর পশ্চাতে উড়িষ্যার কোণার্কের চাকার মোটিফে রাসমণ্ডল। ১১ দক্ষিণ দিকের বারান্দা থেকে গর্ভগৃহে প্রবেশের গলিপথের ডানদিকে বিভিন্ন সাধুসন্ত ; সর্বধর্ম সমন্বয়ের প্রতীক ;—দিগম্বর জৈনতীর্থঙ্করসহ। পশ্চিমদিকের বারান্দার নকল দরজার দুপাশে দশাবতার ও দশমহাবিদ্যা প্যানেল। ১৩ দক্ষিণ দিকের বারান্দায় শ্রীশ্রীজগন্নাথের (রথমধ্যে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-বলরাম সুভদ্রা চিত্র) ও

একাধিক রামরাজা চিত্র। ১৪ দক্ষিণের বারান্দা থেকে গর্ভগৃহে যাবার গলিপথে অনন্তশয়ন বিষ্ণুচিত্রে ওড়িশিপটের প্রভাব ১৫এইখানেই সংকীর্তনকারী বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভূলুণ্ঠিত পদবন্দনারত ভক্ত ; গোস্বামী শ্লোকের অনুশাসনের চিত্ররূপ। ১৬ মকররথ (পশ্চিমের দেওয়ালে গুজরাটি চিত্রের অনুরূপ) বিচিত্র প্রক্রিয়ায় টেরাকোটা-চিত্রে ছুটন্ত রথের গতিটি মূর্ত করার চেষ্টা। ১৭ দক্ষিণের বারান্দায় নকল দরজার পাশে 'ড্রাগন' মোটিফ। ১৮ দক্ষিণের বারান্দায় (শ্যামরায়) দক্ষিণ-পশ্চিমকোণে নর্তকীর হস্তধৃত বিচিত্র পাখা ও পীঠিকা গুজরাটি চিত্রের অনুরূপ। ১৯ দক্ষিণের বারান্দায় বড় আকারের 'পারিজাত হরণ' চিত্রে ক্লাসিক বা পৌরাণিক কৃষ্ণলীলার অনুসরণ ২০ উপর তলায় অষ্টকোণাকৃতি কেন্দ্রীয় চূড়ার বাইরের দক্ষিণ দেওয়ালে শ্রীকৃষ্ণের দুগ্ধদোহন চিত্র (গোস্বামী শ্লোকের চিত্ররূপ) ; ২১ দক্ষিণের বারান্দায় দক্ষিণ-পশ্চিমকোণার প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরে নৃসিংহ ও পঞ্চানন শিবের মূর্তি, পাশে স্তব স্তুতিরত সারিবদ্ধ ভক্তশ্রেণী ; নৃসিংহ পরিচর্যা ; (বৈষ্ণব স্মৃতির অনুশাসন প্রসূত ব্রতানুষ্ঠানের চিত্ররূপ)। ২২ এই মন্দিরের নানাস্থানে (দক্ষিণ-পূর্বের বারান্দা এবং পূর্বদিকের বাইরের পূর্ব-উত্তর কোণে) বিষ্ণুর স্থানক, আসন ও শয়ান মূর্তি, ব্যূহমূর্তিও একাধিক। ২৩ উপর তলার কেন্দ্রীয় চূড়ার ভিতরের দিকে বড় আকারের উমা-মহেশ্বর মূর্তি ও ষড়ানন কার্তিকেয়ের মূর্তি। ২৪ এ মন্দিরের উমামহেশ্বর, লক্ষ্মীনারায়ণ, রামসীতা মূর্তি ও রাধাকৃষ্ণ মূর্তি যুগল ভজন বা সাধনের প্রতীক। "কেহবলে রাধাশ্যাম কেহবলে সীতারাম কেহবলে শঙ্কর ভবানী"—পৌরাণিক সমন্বয়ের দ্যোতনা। ২৫ লক্ষ্মী-সরস্বতী, কার্ত্তিক-গণেশ সহ শ্রীদুর্গা ও মহেশ্বর শিবমূর্তি (উত্তরের বারান্দায়)। ২৬ পশ্চিম দিকের বারান্দায় [ত্রিখিলান দ্বারের মাঝের দুটি স্তম্ভের মাথার দিকের ভিতরে বাহিরে] গড়গড়ায় তামাকু সেবনের একাধিক চিত্র। ২৭ দক্ষিণ দিকের দেওয়ালের দুপাশে দুটি বৃহদাকার রাসমণ্ডল ও রাসলীলা চিত্র। ২৮ নীচেই টেরাকোটায় উৎকীর্ণ 'কুঞ্জকুটিরে' মিলিত রাধাকৃষ্ণের

যুগলমূর্তি দর্শনরত 'মঞ্জরী'। কুটিরগুলি বাংলা চালার আদলে রচিত। ২৯ নানাধরণের নৃত্যগীতে শ্রীকৃষ্ণের চিত্তবিনোদনের চিত্র মন্দিরময়। কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য নিবেদিতপ্রাণা গোপীদের বা রাধার চিত্র ; ব্রহ্মের হলাদিনী শক্তির মূর্ত বিগ্রহ এই নৃত্যগীতে উল্লসিত পুলকিত গোপীরা—তারই চিত্ররূপ এই মন্দির টেরাকোটায়। ৩০ পূর্ব-দক্ষিণ কোণার প্রকোষ্ঠে কৃষ্ণের বাঁশীর সঙ্গে ধুনুচি নাচের চিত্র (বর্তমান গ্রন্থে চিত্র দ্রষ্টব্য) ৩১ উত্তরের বারান্দায় এবং উত্তর—পশ্চিম কোণার প্রকোষ্ঠ মধ্যে হিল্লোলিত রেখার বন্ধনে অপূর্ব ভঙ্গিমায় রচিত কৃষ্ণবলরাম মূর্তিতে পরিণত ও সুসমৃদ্ধ চিত্ররীতির বৈভবশালী স্টাইলটি লক্ষনীয়; এগুলি দ্রুত সঞ্চরমান রেখা হিল্লোলে অঙ্কিত চিত্রের মতই আকর্ষণীয়। বর্তমান গ্রন্থে চিত্র দ্রষ্টব্য। ৩২ উপরের মূল বা কেন্দ্রীয় চূড়ার ভিত্তিমূলে—বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর মানুষের চিত্র ; বিচিত্র সব সাজ পোষাক। ৩৩ উত্তর-পশ্চিম কোণের চূড়াটির ভিত্তিমূলে উৎকীর্ণ বিচিত্র পোষাক ও টুপিতে ভূষিত চিত্রগুলিতে মোঙ্গলীয় ছাপ। "শাহী" চিত্রের স্পর্শ। ৩৪ পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিম-কোণার দেওয়ালে যুদ্ধরত রথ ও রথীর চিত্র। বিচিত্র কম্পোজিশনের মাধ্যমে রথের গতিবেগ প্রদর্শনের প্রয়াস—উন্নতমানের "স্টাডি"। ৩৫ দক্ষিণদিকের বাইরের দেওয়ালে (ত্রিখিলান প্রবেশ-দ্বারের দুপাশে) কুঞ্জকুটিরে মিলিত রাধাকৃষ্ণের সম্মুখে দণ্ডায়মান করজোড় ভক্তের চিত্রগুলি "কুঞ্জ সেবার" প্রতীক (বৈষ্ণবদের সাধনার বিশিষ্ট অঙ্গ) ৩৬ দক্ষিণ দিকের দেওয়ালে (প্রবেশের বাঁদিকে) কুঞ্জকুটিরে বিরাজমান রাধাকৃষ্ণকে মাঝে রেখে চারিদিকের ফ্রেমে বিভিন্ন চিত্রের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের মাথায় কলসী-ভর্তি জলঢেলে স্নান করানো বা অভিষেক ক্রিয়াও মঞ্জরী সাধনার অঙ্গীভূত। ৩৭ পূর্বদিকের ত্রিখিলান প্রবেশদ্বারের মাথায় রামরাবণের যুদ্ধ। পাশে করজোড়ে কপি সৈন্য। কৃত্তিবাসী রামায়ণের ভক্তিরসের প্রাধান্যের ইঙ্গিত। ৩৮ নবনারী কুঞ্জর নন্দন নারী বা গোপীতে নির্মিত হস্তীপৃষ্ঠে রাধাকৃষ্ণ। আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনে সংরক্ষিত প্রস্তর নির্মিত নবনারীর কুঞ্জর মূর্তিটি দ্রষ্টব্য। বৈষ্ণব মোটিফরূপে না

হলেও সিংহলের দালদা-ম্যালিগাওয়ার অনুরূপ মূর্তি-চিত্র লক্ষ্য করেছেন গবেষকরা। নজন স্ত্রীলোকের বিচিত্র দেহভঙ্গিমায় রচিত এইসব হস্তীমূর্তিতে অনেকে দৈহিক কসরৎ প্রদর্শনের প্রভাব দেখেছেন। প্রাচীনকাল থেকেই ভারতের বিভিন্ন ভাস্কর্যে দৈহিক ক্রীড়া-কসরতের চিত্র দেখা যায়। ভারহুতেও এ ধরণের চিত্র বর্তমান। শ্যামরায় মন্দিরের দ্বিতলের কেন্দ্রীয় চূড়োয় মল্লযুদ্ধের চিত্র এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয়। কুস্তি ষাঁড়ের লড়াই (জোড় বাংলার উত্তর দেওয়ালে) পায়রা ওড়ানো সামন্ত প্রভুদের অবসর বিনোদনের জনপ্রিয় বিষয়। জোড়বাংলার পশ্চিম (প্রথম চালার) দেওয়ালে কৃষ্ণ-বলরামের সঙ্গে অষ্টমল্লের যুদ্ধ এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। গুজরাটি চিত্রে অষ্টমল্লের কুস্তি দেখা যায় সিদ্ধার্থের কুস্তি চর্চা-চিত্রে। ৩৯ শ্যামরায় মন্দিরের পশ্চিম দিকে ভিত্তি সংলগ্ন ফ্রিজে একটি শ্মশ্রুগুম্ফযুক্ত মুখমণ্ডল সহ, হস্তে অস্ত্র শোভিত মৎস্য-নরের চিত্র দেখা যায়। ৪০ পূর্ব উত্তর কোণার প্রকোষ্ঠে একটি অপূর্ব গণপতি মূর্তি লক্ষ্য করা যায়। ৪১ এখানের দশাবতার প্যানেলে বিচিত্র নামাবলী (জ্যাকেট) পরিহিত বুদ্ধমূর্তি দেখা যায়।

জোড়বাংলা :

প্রতিষ্ঠা ফলকে কৃষ্ণ বলরাম বা অনন্ত-বাসুদেব। মূল প্রতিপাদ্য শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা বা বৃন্দাবন লীলা। বলা-বাহুল্য শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণিত কৃষ্ণলীলার পৌরাণিক রূপ তিনটি মন্দিরে পর্যায় ক্রমে বর্ণিত হয়েছে। শ্যামরায়, জোড়বাংলা, মদনমোহন এই তিনটি মন্দিরে যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা বাল্যলীলা-অসুরবধ ও শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীর চিত্র সন্নিবেশিত হয়েছে।

১ জোড়বাংলায় বলরাম-শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা (মাতা যশোদা-রোহিনীর ক্রোড়লগ্ন শিশুরূপে) ও অঘাসুর, বকাসুর প্রভৃতি অসুর বধের (জোড়বাংলার সামনের দো-চালার ডানদিকের দেওয়ালে) সমান্তরালে পিছনের দো-চালার পশ্চিমের দেওয়ালের বাঁদিকে রাম-লক্ষ্মণের বাল্যলীলা আর তাড়কাবধের দৃশ্যাবলী লক্ষ্য করা যায়। কৃষ্ণ-বলরামের মতই মাতৃক্রোড়ে রাম-লক্ষণ-ভরত-শত্রুঘ্নের চিত্র চোখে

পক্ষে। সামনের চালার পশ্চিম দেওয়ালে দেবী যুদ্ধ—দেবী অসুর বধ করছেন—নীচেই তিনি স্কন্দমাতা আর গণেশ জননী। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন বাৎসল্য রস (মাতৃক্রোড়ে বলরাম-শ্রীকৃষ্ণ বা রাম-লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্ন এবং গণেশ জননী ও স্কন্দমাতা রূপে দেবী) প্রথমে বিস্ময় রসের (বলরাম শ্রীকৃষ্ণের পুতনাবধ, অঘাসুর বধ, বকাসুর বধ, প্রলম্বাসুর ইত্যাদি অসুর বধ ও শ্রীরাম-লক্ষ্মণের তাড়কাবধ ইত্যাদি অদ্ভুত বিক্রম সম্ভূত লীলা ও দেবীযুদ্ধ বা দেবীর অসুরবধ) সঙ্গে বিজড়িত ছিল। এখানের টেরাকোটায় ডঃ সেনের মন্তব্যের প্রতিধ্বনি। শুধু রসবিন্যাসেই নয় তত্ত্বগত ভাবেও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের আভাস। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্বও যেন এইসব টেরাকোটা চিত্রগুলিতে অন্তর্লীন। যিনি অলৌকিক শক্তিতে অসুরবধ করছেন অবলীলায়; তিনিই আবার দাস্য বাৎসল্য সখ্য আর মধুররসের মানবিক বা লৌকিক আস্বাদনের জন্য সাধারণ আত্মীয় বন্ধনে আবদ্ধ—এই ভেদাভেদ অচিন্ত্য। ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন "কৃষ্ণলীলা প্রাচীন-

---

তিনটি মন্দিরের টেরাকোটা সন্নিবেশে সখ্য-দাস্য-বাৎসল্য বিস্ময়-মধুর প্রভৃতি রস পর্যায় মূর্ত হয়েছে দেখা যায়। শ্যামরায়ে সখা কৃষ্ণের মুখে উচ্ছিষ্ট ফল তুলে দিচ্ছেন—এচিত্র যেমন শুদ্ধ সখ্যরসের অভিব্যক্তি, মাতা যশোদা শিশু কৃষ্ণকে দড়ি দিয়ে বাঁধছেন (যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন সংগ্রহ) এ চিত্রেও তেমনি শুদ্ধ বাৎসল্যের অভিব্যক্তি। বাহন সহ দেবতারা গরুড়ারূঢ় শ্রীকৃষ্ণ ও ঐরাবতারূঢ় ইন্দ্র (শ্যামরায় মন্দিরে পারিজাত হরণ) শ্রীরামের অভিষেক চিত্রে ভ্রাতৃবৃন্দ আর করজোড়ে দণ্ডায়মান হনুমান-জাম্বুবান-সবই দাস্যভাবের চিত্র (শ্যামরায় ও জোড়বাংলা উভয় মন্দিরেই)। এমনকি বলরামের মধ্যেও দাস্যভাবের স্ফুরণ অনুভব করা হয়েছে। এ কথা অবশ্য পূর্বেই বলা হয়েছে যে জোড়বাংলা মন্দিরে মাতৃক্রোড়ে শিশুসন্তান রূপে কৃষ্ণ-বলরাম আর রাম-লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্ন ছাড়াও দেবী যুদ্ধের নিম্নে মাতৃকা প্যানেল আর গণেশ জননী ও স্কন্দমাতা চিত্রে বাৎসল্য ভাবের অভিব্যক্তি পরিস্ফুট। পাশাপাশি অসুরবধে বিস্ময়রসের অভিব্যক্তি।

কাল হইতেই তিনরসে সিক্ত—বিস্ময়, আদি ও বাৎসল্য।"জোড়বাংলায় দানলীলা-নৌকালীলা আছে। শ্রীমদ্ভাগবত বা শ্রীগীতগোবিন্দে এ দুই লীলা অনুক্ত থাকলেও রূপগোস্বামী দানলীলা নিয়ে নাটক রচনা করেছেন। তাঁর সংকলিত পদ্যাবলীতে নৌকালীলার ইঙ্গিত আছে। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন—"রূপ গোস্বামীও দানলীলা লইয়া নাট্য রচনা করিয়াছিলেন। (তাহাতে অবশ্য গ্রাম্যত্বের কোন ইঙ্গিত নাই। তবে রূপগোস্বামীর নির্দেশ সত্ত্বেও এই দুই কাহিনী হইতে আদিরসের ছিট একেবারে উঠিয়া যায় নাই।) জোড়-বাংলার দানলীলা টেরাকোটা-চিত্রে শ্রীকৃষ্ণ, রাধিকা আর বড়াইকে লক্ষ্য করা যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের হুবহু প্রতিফলন—চিত্রটির ধাতু-প্রকৃতিতেও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের সুস্পষ্ট আভাস। নৌকালীলার চিত্রেও আদিরসে তথা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের আভাস। এখানের দানলীলার টেরাটোকাটিতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দানলীলার সুস্পষ্ট আভাস তাৎপর্যপূর্ণ। রূপগোস্বামী-সনাতনগোস্বামীরা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন সম্পর্কে অবহিত ছিলেন, নইলে সম্পূর্ণ শ্রীমদ্ভাগবত-বহির্ভূত এই বিষয়টি নিয়ে রূপ নাটক লিখলেনই বা কেন? তাছাড়া জোড়বাংলার দক্ষিণ-পূর্ব কোণের শ্রীকৃষ্ণলীলার বিচিত্র বিন্যাসটিও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনকে স্মরণ করিয়ে দেয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মতই এখানে বস্ত্রহরণ আর কালিয়দমন সমাহৃত হয়েছে। ডঃ সেন বলেছেন "(বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস: প্রথম খণ্ড-পূর্বার্ধ: পৃষ্ঠা ১১৭ অষ্টম পরিচ্ছেদ) অপিচ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে বস্ত্রহরণ আর কালিয়দমন সমাহৃত হইয়াছে, আদি-রসের কিছু রঙ রাখিবার জন্য।" তিনি আরও বলেছেন—"শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের বস্তুতে ভাগবত কাহিনীর সঙ্গে বিভেদ পাই গোবর্ধন ধারণের মতো মুখ্যলীলারও অদ্ভুত বিক্রমের অনুল্লেখে—"।[১] বিশেষ করে বিষ্ণুপুরের সপ্তদশ-শতকের মন্দির-টেরাকোটায় যে ইঙ্গিত মেলে তা বিশ্লেষণ করলে স্বাভাবিকভাবেই মনে হয় শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন গোস্বামীদের

১ বিষ্ণুপুরের সপ্তদশ শতকের মন্দির-টেরাকোটায় 'গোবর্দ্ধন ধারণ' চিত্র প্রায় উহ্য।

অজ্ঞাত ছিল না এবং চণ্ডীদাসের যে কাব্য শ্রীচৈতন্য আস্বাদন করতেন তা বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন হওয়াও অসম্ভব নয়। অবশ্য এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। ২) জোড়বাংলা মন্দিরের সামনের দিকের চালাটির ত্রিখিলান দরজা দিয়ে বারান্দায় প্রবেশ করলেই নৃত্যের সমারোহ—গীতবাদ্যের নানা চিত্রও এখানে বর্তমান। ত্রিখিলান দরজার ডানদিকের শেষটির ভিতরের দিকের খিলানে বীণাধর গন্ধর্বের (অর্দ্ধেক পক্ষী অর্দ্ধেক নর) চিত্রও তাৎপর্যপূর্ণ। ৩) এখানেও নৃত্য গীতের পাশাপাশি তপস্যারত মুনি-ঋষিদের চিত্রে বৈধীভক্তির আভাস। ৪) এখানের নৃত্যচিত্রে মণিপুরীর প্রভাব দুর্নিরীক্ষ্য নয়। ৫) সামনের দোচালার দক্ষিণে-পশ্চিম কোণে মহাভারতের যুদ্ধ—ভীষ্মের শরশয্যা। ৬) মন্দির প্রবেশের ত্রিখিলান স্তম্ভগুলির গায়ে নৃত্য-চিত্রগুলিতে রাজস্থানী চিত্রের সুস্পষ্ট প্রভাব। ৭) সামনের চালাটির দক্ষিণ-পূর্ব কোণে বাঘশিকারের ধারাবাহিক চিত্রে মোহেন-জো দড়োর প্রভাব লক্ষ্য করেছেন অনেক গবেষক। বিশেষ করে বৃক্ষের উপরে উপবিষ্ট শিকারীর দিকে বাঘের ফিরে তাকানোর বিশিষ্ট গ্রীবাভঙ্গিতে এবং তীর খেয়ে ভূপতিত ব্যাঘ্রের কম্পোজিশনে। ৮) পিছনের দো-চালার উত্তর-পূর্ব কোণের "অবতার প্যানেলে" পুথিহাতে একটি নধরকান্তি পুরুষের চিত্রকে শ্রীনিবাস বলে সনাক্ত করেছিলেন ডঃ সুকুমার সেন। ৯) প্রথমচালার পূর্ব দিকের দেওয়ালে কৃষ্ণ-বলরামের সঙ্গে অষ্টমল্লের যুদ্ধ এবং কংসবধ। দুটি চালা জুড়ে রচিত ভিত্তি সংলগ্ন ফ্রিজে অসীম ক্ষমতাশালী অমানবিক শক্তির প্রতীক পশু-পক্ষীর বিচিত্র চিত্রের প্যানেল। পাখাওয়ালা সিংহাকৃতি (অথচ হাতীর মত শুঁড়যুক্ত মুখ) এক বিচিত্র জীবের নখে বিধৃত কয়েকটি হাতী; উটপাখীর মত আর এক বিচিত্র অতিকায় পক্ষীর পায়ের থাবায় দোদুল্যমান হস্তীযূথ অলৌকিক শক্তির আভাস দেয়। পাশেই এক ক্ষমতাশালী পুরুষ দুই পায়ে দুই হস্তী ও দুই হাতে দুই সিংহকে শাসন করছেন। যে পাখাওয়ালা সিংহ দেখা যায় সাঁচী স্তূপের তোরণে এগুলি তার প্রায় সমগোত্রীয়। এ মোটিফগুলির উৎস পশ্চিম এশিয়া। গবেষকরা মনে করেন মৌর্যযুগেই এই সব মোটিফ

এদেশে আসে ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্রে। উত্তর দিকের দেওয়ালে নীচের দিকে রাম রাবণের সাগরবন্ধন চিত্রিত হয়েছে।

খড়বাংলার শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ মন্দিরের টেরাকোটার সংখ্যা যৎ-সামান্য। এরই মধ্যে গজেন্দ্র-মোক্ষ এবং জনৈক গোস্বামী কর্তৃক (উত্তর-পশ্চিমকোণে) গ্রন্থপাঠের (মালাজপন্ত দুই স্ত্রীশ্রোতা) চিত্রে গোস্বামী সিদ্ধান্তের অন্যতম অনুশাসন (স্মরণ-মনন)— গ্রন্থপাঠ আভাসিত।

শ্রীশ্রীমদনমোহন মন্দিরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে হংসলতা ছাড়া সম্মুখভাগের (দক্ষিণদিকের) ভিত্তি সংলগ্ন পাটিতে (ত্রিখিলান প্রবেশ দ্বারের বাঁপাশে) জনৈক রাজপুরুষের সম্মুখে পুঁথিপাঠরত গোস্বামী চিত্রটিতে শ্রীনিবাসের মল্লরাজসভা বিজয়ের ঐতিহাসিক চিত্রের আভাস।

আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন সংগ্রহে রয়েছে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের কিছু টেরাকোটা-চিত্র। এগুলি অধুনালুপ্ত শাঁখারিবাজার, রাসতলা আর গোপালগঞ্জের অষ্টাদশ শতকের মন্দির থেকে সংগৃহীত। কিছু নৃত্যচিত্র, অবতার চিত্র, বাৎসল্য রসের চিত্র এবং বীণাধর গন্ধর্ব চিত্র ছাড়াও শ্রীশ্রীরাধাশ্যাম মন্দিরের অনুসরণে একটি অনন্তশয়ন বিষ্ণুর মূর্তি-চিত্র (অষ্টাদশ ঊনবিংশ শতকের) উল্লেখযোগ্য।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে ঊনবিংশ শতকেও এ অঞ্চলের মন্দির-টেরাকোটায় পৌরাণিক বাতাবরণটি প্রায় অক্ষুন্ন।

মোগল-সাম্রাজ্যের সামরিক বা জঙ্গী স্বরূপটি প্রায় প্রতিটি মন্দিরের টেরাকোটায় লক্ষ্য করা গেলেও জোড়বাংলার ভিত্তি সংলগ্ন পাটিতে সমর-চিত্রের বিপুল সমারোহ। এখানে বন্দুক হাতে তুর্কী সৈন্য, উটের পিঠে দামামা বাদক, সুসজ্জিত অশ্বপৃষ্ঠে আরূঢ় অশ্বারোহীদের তুমুল যুদ্ধের কথা আগেই বলা হয়েছে। যাইহোক বিষ্ণুপুরের মন্দির-টেরাকোটার জগৎ, বিস্তারে আর ব্যাপকতায় যেমন বিপুল, সুচারু বিন্যাস আর অর্থবহ তাৎপর্যের প্রাসঙ্গিকতায় তেমনি সমকালীন তথা ক্লাসিক ভারতের পৌরাণিক সংস্কৃতির দর্পন স্বরূপ। একদিকে মোগল ভারত আর তারই প্রেক্ষাপটে ক্লাসিক ভারতের আভাস।

প্রভাব স্বাভাবিকভাবেই অনুভূত হয়,[২৬] তবু গুপ্তযুগেই ভারতীয় শিল্প-সংস্কৃতির সুবর্ণযুগ — এ যুগেইভারতের শিল্প-সাহিত্য গৌরব-গরিমার শীর্ষদেশ স্পর্শ করেছিল বলে গবেষকরা মনে করেন।

এই গুপ্তযুগেই সামন্তচক্রচূড়ামণি গুপ্তরাজাদের ব্যাপক রাজ্য জয় আর বিজিত রাজাদের হাতে তাঁদের রাজ্য প্রত্যর্পণ ('গ্রহণ মোক্ষানুগ্রহ' দিল্লী-মেহেরৌলি লিপি) এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে ব্রহ্মোত্তর প্রদানকে কেন্দ্র করে ব্রাহ্মণ্য-সংস্কৃতি ও সামন্ত-অর্থনীতির এক বিশিষ্ট বিকাশ ঘটে। অত্যন্ত স্বাভাবিক ভাবেই ভারতীয় ক্লাসিক সংস্কৃতির মর্মমূলে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি আর সম্ভোগমনস্ক-সামন্ত-অর্থনীতির যুগপৎ প্রভাব সুদৃঢ়-ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে গুপ্তযুগের সম্ভোগমনস্ক (সামন্ততান্ত্রিক) 'ভুক্তি মুক্তি'র নান্দনিক আদর্শ প্রসূত শৃঙ্গারাত্মক-ভক্তিশ্রীর বাতাবরণটি ভারতীয় ক্ল্যাসিক-ধর্মসংস্কৃতির ধাতুপ্রকৃতিতে গভীরভাবে মুদ্রিত হয়। কালিদাস থেকে জয়দেব সেখান থেকে গোস্বামী-সিদ্ধান্তের "রাগানুগা"র এই শৃঙ্গার-রসাত্মক ভক্তির ধারা প্রবেশ করে। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমেই এই ক্ল্যাসিক যুগের সংস্কৃতির বাতাবরণের প্রেক্ষাপটে বিষ্ণুপুরের মন্দির-টেরাকোটায় ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির পৌরাণিক-মোটিফগুলির পাশাপাশি পরিস্ফুট মোগলভারতের মোটিফগুলি, পৃষ্ঠপোষক মোগল-অনুগত মোগল-সামন্ত মল্লরাজাদের পৃষ্ঠপোষকতার আভাস দিচ্ছে। মোগল ভারত তথা মোগল সামন্ত-আভিজাত্য, তাদের ভোগবিলাস ও প্রভুত্ব প্রদর্শনের চিত্রগুলি

---

২৬ মৌর্যযুগে গোলকপুরে প্রাপ্ত অপরূপ টেরাকোটা নির্মিত নারী মূর্তিকার কথা পূর্বেই বলা হয়েছে। শুঙ্গযুগের অসামান্য টেরাকোটা যক্ষীমূর্তিগুলি এবং অন্যান্য অপূর্ব-দর্শন মূর্তিকা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদের সন্নিকট 'কৌশাম্বী' থেকে (উৎখাননের ফলে আবিষ্কৃত দেবী হারিতির মন্দিরের ভগ্নাবশেষ থেকে) প্রাপ্ত দেবী হারিতি ও গজলক্ষ্মীদেবীর অনন্যসাধারণ টেরাকোটা-মূর্তিকার ক্ল্যাসিক গুপ্তযুগের গৌরব-গরিমার পূর্বাভাস লক্ষ্য করেছেন অনেক গবেষক।

মল্লরাজা তথা মোগল সামন্তজগতের আশা-আকাঙ্খাকেই যেন আভাসিত করেছে। নব-কলেবরে ব্রাহ্মণ্য-পৌরাণিক জগৎ আর সামন্তজগতের অবিনাবন্ধ অবস্থিতি নবরূপে বিবর্তিত ক্লাসিক সংস্কৃতির বাতাবরণটিই প্রকটিত করেছে।

বলাবাহুল্য ভারতের বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্য প্রভৃতি সর্বপ্রকার প্রাতিষ্ঠানিক ধর্ম-সংস্কৃতির মতই গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মও বিষ্ণুপুরের মল্লরাজা ও রাজন্যদের সমর্থন পুষ্ট হয়েই মল্লভূমে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। এই ব্রাহ্মণ্যবাদী উচ্চ দার্শনিকতাপূর্ণ এবং নগরের প্রেক্ষাপটে পুষ্ট ক্লাসিক ধর্মসংস্কৃতি অনার্য জাতিপ্রধান মল্লভূমের আপামর জনসাধারণের মধ্যে স্বক্ষেত্র খুঁজে পায় নাই। বিপুল প্রজাসাধারণ থেকে এই বৈষ্ণব সংস্কৃতি এবং মল্লরাজারা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। এই বিচ্ছিন্নতা মল্লরাজাদের সচেতন প্রয়াস প্রসূত হওয়াও অসম্ভব নয়। বিষ্ণুপুরের মল্লরাজারা নিজেদের পদমর্যাদা বৃদ্ধির জন্য তাঁদের আঞ্চলিক পরিচয়ের গণ্ডী অতিক্রম করে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হতে চেয়েছিলেন, বলে মনে করা নানা কারণে অসমীচীন নয়। তাঁরা যে এ অঞ্চলেরই কোন সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ এমন ইঙ্গিত বিরল নয়—অথচ নিজেদের রাজপুত কুলোদ্ভব বলে প্রমাণ করার জন্যই তাঁরা পূর্বাপর নানাভাবে প্রয়াসী হয়েছেন দেখা যায়। রাজপুত কুলশীলের দাবীদার হিসাবেও আঞ্চলিকতার ঊর্ধ্বে উত্তরণ প্রয়াস স্বাভাবিক। মোগল যুগে হিন্দু রাজপুত রাজাদের একটি বিশিষ্ট রাজনৈতিক তথা সাংস্কৃতিক ভূমিকার কথা আগেও বলা হয়েছে। আপাদমস্তক মোগল-সংস্কৃতিতে নিমজ্জিত থেকেও একটি প্রতিবাদী হিন্দু-রক্ষণাশীলতা এদের মধ্যে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সদা জাগ্রত ছিল। এই বংশগৌরব ও আভিজাত্যের দাবীদার মল্লরাজারাও অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবেই তাঁদের রাজধানীতে এক সর্বভারতীয় হিন্দুস্থানী মার্গ-সংস্কৃতির সমৃদ্ধ-বাতাবরণ সৃষ্টির সর্বপ্রকার আয়োজন সম্পূর্ণ করে আঞ্চলিকতার ঊর্ধ্বে উঠতে প্রয়াসী হয়েছিলেন এমন চিন্তা অলীক নয়। সমকালীন (ষোড়শ-সপ্তদশ শতক) ভারতের শিল্প বিকাশের ধারার অনুসরণে স্থাপত্য-ভাস্কর্য-মিনিয়েচার

চিত্রকলা-মার্গসঙ্গীতের প্রসার ঘটিয়ে বিষ্ণুপুরকে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন বলেই মনে হয়।

ভ্রাম্যমান শিল্পী সংঘ বা গিল্ডগুলি সারা ভারতে বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করে মন্দির-নির্মাণ করতেন। এক একটি যুগে ভারতের বিভিন্ন অংশে রচিত স্থাপত্য-ভাস্কর্যের মধ্যে শিল্পরীতির সমগোত্রীয়তা এরই ফলে সম্ভব হয়েছে। উড়িষ্যার কোন কোন মন্দির-ভাস্কর্যের সঙ্গে খাজুরাহোর মিল দুর্নিরীক্ষ্য নয়। এমনি ভ্রাম্যমান কোন উচ্চমানের শিল্পী গিল্ডের নির্দেশনায় এবং তাদের রচিত তালিকা বা 'মাস্টার' ধরে বিষ্ণুপুরের টেরাকোটা-মন্দিরগুলির বিরাট চিত্রপটগুলি রচিত হয়েছে তাই সেখানে শুধু সর্বভারতীয় নয়, বহির্ভারতীয় বহু মোটিফের সমন্বয়ে এক একটি সমৃদ্ধ প্রেক্ষাপট রচনা সম্ভব হয়েছে। অতএব বিষ্ণুপুরের এই শিল্প-বিকাশ কোন আঞ্চলিক বিকাশ নয়, ভারতীয় শিল্পকলারই একটি বিশেষ যুগের প্রতিনিধিত্ব করছে। সর্বভারতীয় শিল্পকলার প্রেক্ষাপট বা পটভূমিকায় রেখেই এর বিচার করতে হয়। কিন্তু গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম সংস্কৃতির মাধ্যমে বিষ্ণুপুরে এই মহান বিকাশ একটি সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকেছে। মল্লভূমের অধিকাংশ মানুষ ছিল এর সঙ্গে সম্পর্কহীন।

অনেকে মনে করেন, পাশাপাশি বাস করার ফলে বৈষ্ণবধর্ম-সংস্কৃতি দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী বা আপামর জনসাধারণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করেছে। এই সরলীকৃত মন্তব্য আংশিক-ভাবে মেনে নিয়েও বলা যায় বিচিত্র প্রতিক্রিয়া জাত এই প্রভাবের চরিত্র বা প্রকৃতিগত পার্থক্য প্রচুর। প্রধানতঃ রাজধানী বা রাজসভা কেন্দ্রিক এইসব ধর্মসংস্কৃতির সুসংস্কৃত দার্শনিক ধারা মূলতঃ গ্রামবাসী, দেশের অধিকাংশ মানুষ বা আপামর জনসাধারণ এবং অনুন্নত কৌম সম্প্রদায় তথা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মানুষের মধ্যে চুঁইয়ে কিছুটা প্রবেশ করলেও তা দরিদ্র অশিক্ষিত অপাংক্তেয় এবং ক্ষুদ্র সংকীর্ণ গ্রাম-পরিবেশের মধ্যে আবদ্ধ দেশের অধিকাংশ অধিবাসীর সীমাবদ্ধ গ্রাম্য-চিন্তা-চেতনার প্রতিক্রিয়ায় বিবর্তিত হয়ে অসংস্কৃত গ্রাম্যতায় পর্যবসিত হয়েছে। মার্গ-শিল্পকলার সংস্কৃত

মোটিফগুলির অসংস্কৃত কম্পোজিশনের গ্রাম্যতাপূর্ণ চিত্রভাষা এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। কৃষ্ণলীলার আদিবাসী-পটগুলিও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য। বর্তমান গ্রন্থে আদিবাসী (গুরুসদয় দত্তের রচনা থেকে গৃহীত) কৃষ্ণলীলাপটে রাসলীলা, নৌকাখণ্ড চিত্র দ্রষ্টব্য। কৃষ্ণের গাভী দোহনের (শ্যামরায় মন্দিরের কেন্দ্রীয় চূড়ায় উৎকীর্ণ) চিত্রটির কথা "পদ্যাবলী"র শ্লোক সহযোগে পূর্বেই বলা হয়েছে। এরও একটি আদিবাসী-সংস্করণ পটে দেখা যায়। অবশ্য এই সংস্কৃত মোটিফগুলির বিষয়বস্তু হয়ত লোকজগৎ থেকেই আহৃত হয়েছে। কিন্তু সমাজের উপরি কাঠামোর উন্নত মার্গ-সংস্কৃতির সঙ্গে আপামর জনসাধারণের গ্রাম্যতাযুক্ত লোকায়ত সংস্কৃতির গোত্র-ভিন্নতা সুস্পষ্ট। মল্লরাজধানী বিষ্ণুপুরের নগরকেন্দ্রিক প্রেক্ষাপটে নির্মিত মন্দির এবং মন্দির-টেরাকোটার বিপুল বৈভব এ অঞ্চলের অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকের গ্রামকেন্দ্রিক আঞ্চলিকতার প্রেক্ষাপটে নির্মিত মন্দির এবং মন্দির-টেরাকোটায় অপসৃত প্রায়। ভারতীয় সমাজের উপরি-কাঠামো আর নীচের মহলের মধ্যে যে অপার সাংস্কৃতিক ব্যবধান তা অন্যত্র দেখা যায় না। একদিকে অতুল বৈভবশালী শাস্ত্র-সাহিত্যের সমুন্নত প্রেক্ষাপটে সৃষ্ট অলোকসাধারণ শিল্প-সংস্কৃতি, অন্যদিকে আপামর জনসাধারণের মনোমুখী লোকায়ত সংস্কৃতি। উভয়ের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান। নিজের স্বাভাবিক জীবনরসে এ লোকায়ত জগৎ যতই সজীব এবং মৌলিক-রসসিক্ত হোক না কেন তার সঙ্গে মার্গ-সংস্কৃতির গোত্রভিন্নতা দুর্নিরীক্ষ্য নয়। শিক্ষা ও সম্পদ থেকে বঞ্চিত এই নিম্ন অবস্থানের আপামর জনসাধারণ স্বাভাবিকভাবেই মার্গসংস্কৃতি থেকে অনেক দূরবর্তী। শিক্ষা আর সম্পদের বণ্টন-বঞ্চনা থেকেও এই সাংস্কৃতিক বঞ্চনা, জাতীয় সংহতির ক্ষেত্রে অধিকতর মারাত্মক। ভারতের মার্গসংস্কৃতির সমুচ্চ দার্শনিক চিন্তা আর শিল্পকলার সমুন্নত বিকাশ কোন যুগেই তার রাষ্ট্রিক বা সামাজিক মহতী-বিনষ্টিকে বাধা দিতে পারেনি। মল্লভূমের ইতিহাসেও একই চিত্র। মল্লভূমের মহান শিল্প-বিকাশ তার অবক্ষয় এবং অবসানকে রোধ করতে পারেনি। দেশের বৃহত্তম জনগোষ্ঠী তার পতনের কালে সম্পূর্ণ উদাসীন থেকেছে দেখা যায়।



পরিশিষ্ট

সপ্তদশ শতকে নির্মিত বিষ্ণুপুরের (বর্তমানে টিকে থাকা) টেরাকোটা-অলঙ্কৃত মন্দিরগুলির সংখ্যা চারটির মত হলেও অলঙ্করণের দিক দিয়ে শ্যামরায় আর জোড়বাংলাই সর্বাধিক সমৃদ্ধ। খড়বাংলার শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ মন্দিরটি টেরাকোটা-অলঙ্করণের দিক থেকে না হলেও স্থাপত্য রীতির দিক থেকে উল্লেখযোগ্য। সপ্তদশ শতকের এই আটচালা মন্দিরটি বিষ্ণুপুরী আটচালার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। শ্রীশ্রীমদনমোহন মন্দিরের টেরাকোটা-টালির সংখ্যা কম হলেও বিন্যাস বৈচিত্র্যে আকর্ষণীয়। দুটি ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরের (রাসতলা আর শাঁখারীবাজারের মদনমোহন মন্দিরের বিপরীতে) কিছু টেরাকোটা-টালির সংগ্রহ রয়েছে স্থানীয় আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনে। অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতকের একটি (গোপালগঞ্জ) মন্দিরের কিছু টেরাকোটা-চিত্রও এখানে সংগৃহীত হয়েছে।

শুধু টেরাকোটা-চিত্রের সংখ্যা-প্রাচুর্য আর বিন্যাস বৈচিত্র্যেই এই টেরাকোটা-মন্দিরগুলি উল্লেখযোগ্য নয়—তত্ত্ব-তাৎপর্যে আর ভাব পারম্পর্যের গূঢ় ইঙ্গিতেও এগুলি আকর্ষণীয়। অলঙ্করণে ক্লাসিক-উত্তর প্রাক-মধ্যযুগের প্রচলিত ধারা অনুসরণ করে নিবিড় পৌরাণিক বাতাবরণ সৃষ্টি করা হলেও তারই আবরণে গোস্বামী-সিদ্ধান্তের নবাঙ্গ-ভক্তি, যুগলভজন তত্ত্ব, সখীভাব-কুঞ্জসেবা-মঞ্জরীতত্ত্ব বিষ্ণুপুরের মন্দির-টেরাকোটায় (বিশেষ করে শ্যামরায় ও জোড়বাংলায়) চিত্ররূপ লাভ করেছে। শৃঙ্গার ও উজ্জ্বল রসাত্মক রাগানুগা ভক্তি এবং বৈধী ভক্তি পাশাপাশি চিত্রিত হয়েছে।

সবচেয়ে বিচিত্র ব্যঞ্জনায় চিত্রিত হয়েছে গোস্বামী-সিদ্ধান্ত তথা গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের মূলতত্ত্ব 'রাগানুগা-ভক্তি' আর অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব। নৃত্যগীতে নিঃসৃত শৃঙ্গারাত্মক ভক্তি বা রাগানুগা ভক্তির চিত্রগুলি সব মন্দিরেই রয়েছে প্রচুর সংখ্যায়। পাশে নানামত আর পথের বিবিধ সাধনা বা বৈধী ভক্তির চিত্রাবলী। শ্যামরায়-জোড়-বাংলায় অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্ত্বও রূপায়িত হয়েছে কৃষ্ণলীলার পৌরাণিক চিত্রগুলির মাধ্যমে। যে কৃষ্ণ আপনার অলৌকিক শক্তিতে শতধা বিভক্ত হয়ে অগণিত গোপীর মনোরঞ্জন করছেন তিনিই আবার একক প্রেমে প্রতিটি গোপীর কাছে পৃথকভাবে একান্ত ব্যক্তিগত প্রণয়ে আবদ্ধ (শ্যামরায় মন্দিরের রাসলীলাচিত্র দ্রষ্টব্য)। গোষ্ঠলীলায় যিনি অগণিত অসুরবধ করছেন (জোড়বাংলা) সখারা তাঁরই মুখে তুলে দিচ্ছেন উচ্ছিষ্ট ফল (শ্যামরায় মন্দিরের দক্ষিণ দিকের বারান্দায় প্রবেশের ত্রিখিলান দরজার মাঝেরটির বাঁদিকের স্তম্ভের নীচের দিকে।) মাতা যশোদা পুত্রের নানা অলৌকিক কীর্তির সাক্ষী হয়েও সাধারণ শিশুর মত দাঁড় দিয়ে হাত বাঁধছেন (যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনের সংগ্রহ)। যে মাতৃকা শক্তির প্রচণ্ডরোষে সহস্র দানব মুহূর্তে লয় প্রাপ্ত হচ্ছে — তিনিই আবার গণেশজননী-স্কন্দ-মাতা (জোড়বাংলা)। একই রসতত্ত্বের অনুসরণে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে রাম-কৃষ্ণ আর দেবী-মাহাত্ম্যের চিত্রগুলি।

শুদ্ধাভক্তির প্রকাশজন্য অলৌকিক তত্ত্বের উপলব্ধিকে গৌণ স্থান দেওয়া হয়েছে। সহজ সম্পর্কগুলিই অধিকতর উল্লেখযোগ্য মাত্রা পেয়েছে।

মন্দিরগুলিতে সন্নিবেশিত টেরাকোটা-চিত্রের বর্ণনামূলক তালিকা :—

শ্রীশ্রীশ্যামরায় :—

১ রাসলীলা এ মন্দিরের মুখ্য প্রতিপাদ্য ; ৪০টি ছোট-বড়-মাঝারি রাসমণ্ডলচিত্র এ মন্দিরের প্রধান আকর্ষণ। মণ্ডলাকারে 'হল্লীশনৃত্য'।
২ দুই পাশে দুই গোপীর স্কন্ধে বাহুভার ন্যস্ত করে নৃত্যরত কৃষ্ণ ;

পূর্বদিকের ত্রিখিলান প্রবেশ দ্বারের দুপাশে দুটি এই চিত্র ছাড়াও অনুরূপ একাধিক চিত্র রয়েছে এ মন্দিরে। তিনটি শ্রীমদ্ভাগবতের রাস-লীলার একটি শ্লোকের চিত্ররূপ। ৩ গজেন্দ্রমোক্ষ : শরণাগতির প্রতীক, ক্লাসিক ভাস্কর্যের মাধ্যমে গোস্বামী শ্লোকের চিত্ররূপ--দক্ষিণের বারান্দা থেকে গর্ভগৃহে প্রবেশ পথের ভিতরের দিকের মাথায়। ৪ পশ্চিমের বারান্দায় গজকচ্ছপ চিত্রে একই অভিব্যক্তি। ৫ সখ্য (দক্ষিণের বারান্দায় প্রবেশের ত্রিখিলান দ্বারের মাঝের দুটি স্তম্ভের বাঁদিকেরটিতে) কৃষ্ণের মুখে সখা উচ্ছিষ্ট ফল গুঁজে দিচ্ছেন। ৬ দাস্য : বাহন সহিত মূর্তিগুলি ছাড়াও কৃষ্ণের গরুড়ারোহীমূর্তি, দক্ষিণের বারান্দায় বৃহদাকার পারিজাত হরণ চিত্র ; দক্ষিণের বারান্দায় এবং অন্যান্য মন্দিরেও রামের অভিষেক চিত্র (সামন্ত-সেবিত সামন্ত চক্রচূড়ামণি রাজা বা মহারাজাদের অভিষেকের অনুরূপ, এটিও সামন্তজগতের দাস্য ভাবেরই চিত্র)। ৭ নৃত্যগীতে রাগানুগা ভক্তির প্রকাশ শ্যামরায় মন্দির ছাড়া অন্যান্য সব মন্দিরেই লক্ষ্য করা যায়। জোড়বাংলার প্রথম দোচালার বারান্দায় এচিত্র সর্বত্র। শ্যামরায় মন্দিরের দক্ষিণদিকের বারান্দায় নর্তকীদের হাতে গুজরাটি চিত্রের পাখা, তেপায়া-পীঠিকা বেশভূষায় উড়িষ্যার প্রভাব : মদনমোহন মন্দিরের ও জোড়বাংলা মন্দিরের ত্রিখিলান প্রবেশ দ্বারের স্তম্ভগাত্রের নৃত্য চিত্রগুলিও মনোরম। ৮ জটাজুটধারী তপস্যারত সন্ন্যাসীদের চিত্রগুলি— বৈধী ভক্তির প্রতীক। ৯ শ্যামরায়ের দক্ষিণদিকের ত্রিখিলান প্রবেশদ্বারের ডানদিকে শ্রীরাধিকার চিবুকস্পর্শ করে শ্রীকৃষ্ণ ; রূপগোস্বামীর পদ্যাবলীর প্রথম নমস্ক্রিয়ার শ্লোকের চিত্ররূপ। ১০ গর্ভগৃহের প্রতিমাবেদীর পশ্চাতে উড়িষ্যার কোণার্কের চাকার মোটিফে রাসমণ্ডল। ১১ দক্ষিণ দিকের বারান্দা থেকে গর্ভগৃহে প্রবেশের গলিপথের ডানদিকে বিভিন্ন সাধুসন্ত ; সর্বধর্ম সমন্বয়ের প্রতীক ; —দিগম্বর জৈনতীর্থঙ্করসহ। পশ্চিমদিকের বারান্দার নকল দরজার দুপাশে দশাবতার ও দশমহাবিদ্যা প্যানেল। ১৩ দক্ষিণ দিকের বারান্দায় শ্রীশ্রীজগন্নাথের (রথমধ্যে শ্রীশ্রীজগন্নাথ-বলরাম সুভদ্রা চিত্র) ও

একাধিক রামরাজা চিত্র। ১৪ দক্ষিণের বারান্দা থেকে গর্ভগৃহে যাবার গলিপথে অনন্তশয়ন বিষ্ণুচিত্রে ওড়িশিপটের প্রভাব ১৫এইখানেই সংকীর্ত্তনকারী বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভুলুণ্ঠিত পদবন্দনারত ভক্ত ; গোস্বামী শ্লোকের অনুশাসনের চিত্ররূপ। ১৬ মকররথ (পশ্চিমের দেওয়ালে গুজরাটি চিত্রের অনুরূপ) বিচিত্র প্রক্রিয়ায় টেরাকোটা-চিত্রে ছুটন্ত রথের গতিটি মূর্ত্তকরার চেষ্টা। ১৭ দক্ষিণের বারান্দায় নকল দরজার পাশে 'ড্রাগন' মোটিফ। ১৮ দক্ষিণের বারান্দায় (শ্যামরায়) দক্ষিণ-পশ্চিমকোণে নর্ত্তকীর হস্তধৃত বিচিত্র পাখা ও পীঠিকা গুজরাটি চিত্রের অনুরূপ। ১৯ দক্ষিণের বারান্দায় বড় আকারের 'পারিজাত হরণ' চিত্রে ক্লাসিক বা পৌরাণিক কৃষ্ণলীলার অনুসরণ ২০ উপর তলায় অষ্টকোণাকৃতি কেন্দ্রীয় চূড়ার বাইরের দক্ষিণ দেওয়ালে শ্রীকৃষ্ণের দুগ্ধদোহন চিত্র (গোস্বামী শ্লোকের চিত্ররূপ) ; ২১ দক্ষিণের বারান্দার দক্ষিণ-পশ্চিমকোণার প্রকোষ্ঠের অভ্যন্তরে নৃসিংহ ও পঞ্চানন শিবের মূর্তি, পাশে স্তব স্তুতিরত সারিবদ্ধ ভক্তশ্রেণী ; নৃসিংহ পরিচর্যা ; (বৈষ্ণব স্মৃতির অনুশাসন প্রসূত ব্রতানুষ্ঠানের চিত্ররূপ)। ২২ এই মন্দিরের নানাস্থানে (দক্ষিণ-পূর্বের বারান্দা এবং পূর্বদিকের বাইরের পূর্ব-উত্তর কোণে) বিষ্ণুর স্থানক, আসন ও শয়ান মূর্তি, ব্যূহমূর্তিও একাধিক। ২৩ উপর তলার কেন্দ্রীয় চূড়ার ভিতরের দিকে বড় আকারের উমা-মহেশ্বর মূর্তি ও ষড়ানন কার্তিকেয়ের মূর্তি। ২৪ এ মন্দিরের উমামহেশ্বর, লক্ষ্মীনারায়ণ, রামসীতা মূর্তি ও রাধাকৃষ্ণ মূর্তি যুগল ভজন বা সাধনের প্রতীক। "কেহবলে রাধাশ্যাম কেহবলে সীতারাম কেহবলে শঙ্কর ভবানী"—পৌরাণিক সমন্বয়ের দ্যোতনা। ২৫ লক্ষ্মী-সরস্বতী, কার্ত্তিক-গণেশ সহ শ্রীদুর্গা ও মহেশ্বর শিবমূর্তি (উত্তরের বারান্দায়)। ২৬ পশ্চিম দিকের বারান্দায় [ত্রিখিলান দ্বারের মাঝের দুটি স্তম্ভের মাথার দিকের ভিতরে বাহিরে] গড়গড়ায় তামাকু সেবনের একাধিক চিত্র। ২৭ দক্ষিণ দিকের দেওয়ালের দুপাশে দুটি বৃহদাকার রাসমন্ডল ও রাসলীলা চিত্র। ২৮ নীচেই টেরাকোটায় উৎকীর্ণ 'কুঞ্জকুটিরে' মিলিত রাধাকৃষ্ণের

যুগলমূর্তি দর্শনরত 'মঞ্জরী'। কুটিরগুলি বাংলা চালার আদলে রচিত। ২৯ নানাধরণের নৃত্যগীতে শ্রীকৃষ্ণের চিত্তবিনোদনের চিত্র মন্দিরময়। কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা পূর্ণ করার জন্য নিবেদিতপ্রাণা গোপীদের বা রাধার চিত্র ; ব্রহ্মের হলাদিনী শক্তির মূর্ত বিগ্রহ এই নৃত্যগীতে উল্লসিত পুলকিত গোপীরা—তারই চিত্ররূপ এই মন্দির টেরাকোটায়। ৩০ পূর্ব-দক্ষিণ কোণার প্রকোষ্ঠে কৃষ্ণের বাঁশীর সঙ্গে ধুনুচি নাচের চিত্র (বর্তমান গ্রন্থে চিত্র দ্রষ্টব্য) ৩১ উত্তরের বারান্দায় এবং উত্তর — পশ্চিম কোণার প্রকোষ্ঠ মধ্যে হিল্লোলিত রেখার বন্ধনে অপূর্ব ভঙ্গিমায় রচিত কৃষ্ণবলরাম মূর্তিতে পরিণত ও সুসমৃদ্ধ চিত্ররীতির বৈভবশালী স্টাইলটি লক্ষনীয়; এগুলি দ্রুত সঞ্চরমান রেখা হিল্লোলে অঙ্কিত চিত্রের মতই আকর্ষণীয়। বর্তমান গ্রন্থে চিত্র দ্রষ্টব্য। ৩২ উপরের মূল বা কেন্দ্রীয় চূড়ার ভিত্তিমূলে— বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীর মানুষের চিত্র ; বিচিত্র সব সাজ পোষাক। ৩৩ উত্তর-পশ্চিম কোণের চূড়াটির ভিত্তিমূলে উৎকীর্ণ বিচিত্র পোষাক ও টুপিতে ভূষিত চিত্রগুলিতে মোঙ্গলীয় ছাপ। "শাহী" চিত্রের স্পর্শ। ৩৪ পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিম-কোণার দেওয়ালে যুদ্ধরত রথ ও রথীর চিত্র। বিচিত্র কম্পোজিশনের মাধ্যমে রথের গতিবেগ প্রদর্শনের প্রয়াস— উন্নতমানের "স্টাডি"। ৩৫ দক্ষিণদিকের বাইরের দেওয়ালে (ত্রিখিলান প্রবেশ-দ্বারের দুপাশে) কুঞ্জকুটিরে মিলিত রাধাকৃষ্ণের সম্মুখে দণ্ডায়মান করজোড় ভক্তের চিত্রগুলি "কুঞ্জ সেবার" প্রতীক (বৈষ্ণবদের সাধনার বিশিষ্ট অঙ্গ) ৩৬ দক্ষিণ দিকের দেওয়ালে (প্রবেশের বাঁদিকে) কুঞ্জকুটিরে বিরাজমান রাধাকৃষ্ণকে মাঝে রেখে চারিদিকের ফ্রেমে বিভিন্ন চিত্রের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের মাথায় কলসী-ভর্তি জলঢেলে স্নান করানো বা অভিষেক ক্রিয়াও মঞ্জরী সাধনার অঙ্গীভূত। ৩৭ পূর্বদিকের ত্রিখিলান প্রবেশদ্বারের মাথায় রামরাবণের যুদ্ধ। পাশে করজোড়ে কপি সৈন্য। কৃত্তিবাসী রামায়ণের ভক্তিরসের প্রাধান্যের ইঙ্গিত। ৩৮ নবনারী কুঞ্জর নজন নারী বা গোপীতে নির্মিত হস্তীপৃষ্ঠে রাধাকৃষ্ণ। আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবনে সংরক্ষিত প্রস্তর নির্মিত নবনারীর কুঞ্জর মূর্তিটি দ্রষ্টব্য। বৈষ্ণব মোটিফরূপে না

হলেও সিংহলের দালদা-ম্যালিগাওয়ায় অনুরূপ মূর্তি-চিত্র লক্ষ্য করেছেন গবেষকরা। নর্তন স্ত্রীলোকের বিচিত্র দেহভঙ্গিমায় রচিত এইসব হস্তীমূর্তিতে অনেকে দৈহিক কসরৎ প্রদর্শনের প্রভাব দেখেছেন। প্রাচীনকাল থেকেই ভারতের বিভিন্ন ভাস্কর্যে দৈহিক ক্রীড়া-কসরতের চিত্র দেখা যায়। ভারহুতেও এ ধরণের চিত্র বর্তমান। শ্যামরায় মন্দিরের দ্বিতলের কেন্দ্রীয় চূড়োয় মল্লযুদ্ধের চিত্র এ প্রসঙ্গে লক্ষণীয়। কুস্তি ষাঁড়ের লড়াই (জোড় বাংলার উত্তর দেওয়ালে) পায়রা ওড়ানো সামন্ত প্রভুদের অবসর বিনোদনের জনপ্রিয় বিষয়। জোড়বাংলার পশ্চিম (প্রথম চালার) দেওয়ালে কৃষ্ণ-বলরামের সঙ্গে অষ্টমল্লের যুদ্ধ এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। গুজরাটি চিত্রে অষ্টমল্লের কুস্তি দেখা যায় সিদ্ধার্থের কুস্তি চর্চা-চিত্রে। ৩৯ শ্যামরায় মন্দিরের পশ্চিম দিকে ভিত্তি সংলগ্ন ফ্রিজে একটি শ্মশ্রুগুম্ফযুক্ত মুখমণ্ডল সহ, হস্তে অস্ত্র শোভিত মৎস্য-নরের চিত্র দেখা যায়। ৪০ পূর্ব উত্তর কোণার প্রকোষ্ঠে একটি অপূর্ব গণপতি মূর্তি লক্ষ্য করা যায়। ৪১ এখানের দশাবতার প্যানেলে বিচিত্র নামাবলী (জ্যাকেট) পরিহিত বুদ্ধমূর্তি দেখা যায়।

জোড়বাংলা :

প্রতিষ্ঠা ফলকে কৃষ্ণ বলরাম বা অনন্ত-বাসুদেব। মূল প্রতিপাদ্য শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণিত শ্রীকৃষ্ণের গোষ্ঠলীলা বা বৃন্দাবন লীলা। বলাবাহুল্য শ্রীমদ্ভাগবত বর্ণিত কৃষ্ণলীলার পৌরাণিক রূপ তিনটি মন্দিরে পর্যায় ক্রমে বর্ণিত হয়েছে। শ্যামরায়, জোড়বাংলা, মদনমোহন এই তিনটি মন্দিরে যথাক্রমে শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা বাল্যলীলা-অসুরবধ ও শ্রীকৃষ্ণ জন্মাষ্টমীর চিত্র সন্নিবেশিত হয়েছে।

১ জোড়বাংলায় বলরাম-শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলা (মাতা যশোদা-রোহিনীর ক্রোড়লগ্ন শিশুরূপে) ও অঘাসুর, বকাসুর প্রভৃতি অসুর বধের (জোড়বাংলার সামনের দো-চালার ডানদিকের দেওয়ালে) সমান্তরালে পিছনের দো-চালার পশ্চিমের দেওয়ালের বাঁদিকে রাম-লক্ষ্মণের বাল্যলীলা আর তাড়কাবধের দৃশ্যাবলী লক্ষ্য করা যায়। কৃষ্ণ-বলরামের মতই মাতৃক্রোড়ে রাম-লক্ষণ-ভরত-শত্রুঘ্নের চিত্র চোখে

পড়ে। সামনের চালার পশ্চিম দেওয়ালে দেবী যুদ্ধ—দেবী অসুর বধ করছেন—নীচেই তিনি স্কন্দমাতা আর গণেশ জননী। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন বাৎসল্য রস (মাতৃক্রোড়ে বলরাম-শ্রীকৃষ্ণ বা রাম-লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্ন এবং গণেশ জননী ও স্কন্দমাতা রূপে দেবী) প্রথমে বিস্ময় রসের (বলরাম শ্রীকৃষ্ণের পুতনাবধ, অঘাসুর বধ, বকাসুর বধ, প্রলম্বাসুর ইত্যাদি অসুর বধ ও শ্রীরাম-লক্ষ্মণের তাড়কাবধ ইত্যাদি অদ্ভুত বিক্রম সম্ভূত লীলা ও দেবীযুদ্ধ বা দেবীর অসুরবধ) সঙ্গে বিজড়িত ছিল। এখানের টেরাকোটায় ডঃ সেনের মন্তব্যের প্রতিধ্বনি। শুধু রসবিন্যাসেই নয় তত্ত্বগত ভাবেও গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের আভাস। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মের অচিন্ত্য ভেদাভেদ তত্বও যেন এইসব টেরাকোটা চিত্রগুলিতে অন্তর্লীন। যিনি অলৌকিক শক্তিতে অসুরবধ করছেন অবলীলায়; তিনিই আবার দাস্য বাৎসল্য সখ্য আর মধুররসের মানবিক বা লৌকিক আস্বাদনের জন্য সাধারণ আত্মীয় বন্ধনে আবদ্ধ—এই ভেদাভেদ অচিন্ত্য। ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন "কৃষ্ণলীলা প্রাচীন-

---

তিনটি মন্দিরের টেরাকোটা সন্নিবেশে সখ্য-দাস্য-বাৎসল্য বিস্ময়-মধুর প্রভৃতি রস পর্যায় মূর্ত হয়েছে দেখা যায়। শ্যামরায়ে সখা কৃষ্ণের মুখে উচ্ছিষ্ট ফল তুলে দিচ্ছেন—এচিত্র যেমন শুদ্ধ সখ্যরসের অভিব্যক্তি, মাতা যশোদা শিশু কৃষ্ণকে দড়ি দিয়ে বাঁধছেন (যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন সংগ্রহ) এ চিত্রেও তেমনি শুদ্ধ বাৎসল্যের অভিব্যক্তি। বাহন সহ দেবতারা - গরুড়ারূঢ় শ্রীকৃষ্ণ ও ঐরাবতারূঢ় ইন্দ্র (শ্যামরায় মন্দিরে পারিজাত হরণ) শ্রীরামের অভিষেক চিত্রে ভ্রাতৃবৃন্দ আর করজোড়ে দণ্ডায়মান হনুমান-জাম্বুবান-সবই দাস্যভাবের চিত্র (শ্যামরায় ও জোড়বাংলা উভয় মন্দিরেই)। এমনকি বলরামের মধ্যেও দাস্যভাবের স্ফুরণ অনুভব করা হয়েছে। এ কথা অবশ্য পূর্বেই বলা হয়েছে যে জোড়বাংলা মন্দিরে মাতৃক্রোড়ে শিশুসন্তান রূপে কৃষ্ণ-বলরাম আর রাম-লক্ষ্মণ-ভরত-শত্রুঘ্ন ছাড়াও দেবী যুদ্ধের নিম্নে মাতৃকা প্যানেল আর গণেশ জননী ওস্কন্দমাতা চিত্রে বাৎসল্য ভাবের অভিব্যক্তি পরিস্ফুট। পাশাপাশি অসুরবধে বিস্ময়রসের অভিব্যক্তি।

কাল হইতেই তিনরসে সিক্ত—বিস্ময়, আদি ও বাৎসল্য।"জোড়বাংলায় দানলীলা-নৌকালীলা আছে। শ্রীমদ্ভাগবত বা শ্রীগীতগোবিন্দে এ দুই লীলা অনুক্ত থাকলেও রূপগোস্বামী দানলীলা নিয়ে নাটক রচনা করেছেন। তাঁর সংকলিত পদ্যাবলীতে নৌকালীলার ইঙ্গিত আছে। ডঃ সুকুমার সেন বলেছেন—"রূপ গোস্বামীও দানলীলা লইয়া নাট্য রচনা করিয়াছিলেন। (তাহাতে অবশ্য গ্রাম্যত্বের কোন ইঙ্গিত নাই। তবে রূপগোস্বামীর নির্দেশ সত্ত্বেও এই দুই কাহিনী হইতে আদিরসের চিট একেবারে উঠিয়া যায় নাই।) জোড়-বাংলার দানলীলা টেরাকোটা-চিত্রে শ্রীকৃষ্ণ, রাধিকা আর বড়ায়িকে লক্ষ্য করা যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের হুবহু প্রতিফলন—চিত্রটির ধাতু-প্রকৃতিতেও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের সুস্পষ্ট আভাস। নৌকালীলার চিত্রেও আদিরসের তথা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের আভাস। এখানের দানলীলার টেরাটোকাটিতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের দানলীলার সুস্পষ্ট আভাস তাৎপর্যপূর্ণ। রূপগোস্বামী-সনাতনগোস্বামীরা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন সম্পর্কে অবহিত ছিলেন, নইলে সম্পূর্ণ শ্রীমদ্ভাগবত-বহির্ভূত এই বিষয়টি নিয়ে রূপ নাটক লিখলেনই বা কেন? তাছাড়া জোড়বাংলার দক্ষিণ-পূর্ব কোণের শ্রীকৃষ্ণলীলার বিচিত্র বিন্যাসটিও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনকে স্মরণ করিয়ে দেয়। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মতই এখানে বস্ত্রহরণ আর কালিয়দমন সমাহৃত হয়েছে। ডঃ সেন বলেছেন "(বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস ঃ প্রথম খণ্ড-পূর্বাধ ঃ পৃষ্ঠা ১১৭ অষ্টম পরিচ্ছেদ) অপিচ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে বস্ত্রহরণ আর কালিয়দমন সমাহৃত হইয়াছে, আদি-রসের কিছু রঙ রাখিবার জন্য।" তিনি আরও বলেছেন—"শ্রীকৃষ্ণ কীর্ত্তনের বস্তুতে ভাগবত কাহিনীর সঙ্গে বিভেদ পাই গোবর্ধন ধারণের মতো মুখ্যলীলারও অদ্ভূত বিক্রমের অনুল্লেখে—"।[১] বিশেষ করে বিষ্ণুপুরের সপ্তদশ-শতকের মন্দির-টেরাকোটায় যে ইঙ্গিত মেলে তা বিশ্লেষণ করলে স্বাভাবিকভাবেই মনে হয় শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন গোস্বামীদের

১ বিষ্ণুপুরের সপ্তদশ শতকের মন্দির-টেরাকোটায় 'গোবর্ধন ধারণ' চিত্র প্রায় উহ্য।

অজ্ঞাত ছিল না এবং চণ্ডীদাসের যে কাব্য শ্রীচৈতন্য আস্বাদন করতেন তা বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন হওয়াও অসম্ভব নয়। অবশ্য এ সম্বন্ধে মতভেদ আছে। ২) জোড়বাংলা মন্দিরের সামনের দিকের চালাটির ত্রিখিলান দরজা দিয়ে বারান্দায় প্রবেশ করলেই নৃত্যের সমারোহ—গীতবাদ্যের নানা চিত্রও এখানে বর্তমান। ত্রিখিলান দরজার ডানদিকের শেষটির ভিতরের দিকের খিলানে বীণাধর গন্ধর্বের (অর্ধেক পক্ষী অর্ধেক নর) চিত্রও তাৎপর্যপূর্ণ। ৩) এখানেও নৃত্য গীতের পাশাপাশি তপস্যারত মুনি-ঋষিদের চিত্রে বৈধীভক্তির আভাস। ৪) এখানের নৃত্যচিত্রে মণিপুরীর প্রভাব দুর্নিরীক্ষ্য নয়। ৫) সামনের দোচালার দক্ষিণে-পশ্চিম কোণে মহাভারতের যুদ্ধ—ভীষ্মের শরশয্যা। ৬) মন্দির প্রবেশের ত্রিখিলান স্তম্ভগুলির গায়ে নৃত্য-চিত্রগুলিতে রাজস্থানী চিত্রের সুস্পষ্ট প্রভাব। ৭) সামনের চালাটির দক্ষিণ-পূর্ব কোণে বাঘশিকারের ধারাবাহিক চিত্রে মোহেন-জো দড়োর প্রভাব লক্ষ্য করেছেন অনেক গবেষক। বিশেষ করে বৃক্ষের উপরে উপবিষ্ট শিকারীর দিকে বাঘের ফিরে তাকানোর বিশিষ্ট গ্রীবাভঙ্গিতে এবং তীর খেয়ে ভূপতিত ব্যাঘ্রের কম্পোজিশনে। ৮) পিছনের দো-চালার উত্তর-পূর্ব কোণের "অবতার প্যানেলে" পুঁথিহাতে একটি নধরকান্তি পুরুষের চিত্রকে শ্রীনিবাস বলে সনাক্ত করেছিলেন ডঃ সুকুমার সেন। ৯) প্রথমচালার পূর্ব দিকের দেওয়ালে কৃষ্ণ-বলরামের সঙ্গে অষ্টমল্লের যুদ্ধ এবং কংসবধ। দুটি চালা জুড়ে রচিত ভিত্তি সংলগ্ন ফ্রিজে অসীম ক্ষমতাশালী অমানবিক শক্তির প্রতীক পশু-পক্ষীর বিচিত্র চিত্রের প্যানেল। পাখাওয়ালা সিংহাকৃতি (অথচ হাতীর মত শুঁড়যুক্ত মুখ) এক বিচিত্র জীবের নখে বিধৃত কয়েকটি হাতী; উটপাখীর মত আর এক বিচিত্র অতিকায় পক্ষীর পায়ের থাবায় দোদুল্যমান হস্তীযূথ অলৌকিক শক্তির আভাস দেয়। পাশেই এক ক্ষমতাশালী পুরুষ দুই পায়ে দুই হস্তী ও দুই হাতে দুই সিংহকে শাসন করছেন। যে পাখাওয়ালা সিংহ দেখা যায় সাঁচী স্তূপের তোরণে এগুলি তার প্রায় সমগোত্রীয়। এ মোটিফগুলির উৎস পশ্চিম এশিয়া। গবেষকরা মনে করেন মৌর্যযুগেই এই সব মোটিফ

এদেশে আসে ব্যবসা-বাণিজ্যের সূত্রে। উত্তর দিকের দেওয়ালে নীচের দিকে রাম রাবণের সাগরবন্ধন চিত্রিত হয়েছে।

খড়বাংলার শ্রীশ্রীরাধাবিনোদ মন্দিরের টেরাকোটার সংখ্যা বৎ-সামান্য। এরই মধ্যে গজেন্দ্র-মোক্ষ এবং জনৈক গোস্বামী কর্তৃক (উত্তর-পশ্চিমকোণে) গ্রন্থপাঠের (মালাজপরত দুই স্ত্রীশ্রোতা) চিত্রে গোস্বামী সিদ্ধান্তের অন্যতম অনুশাসন (স্মরণ-মনন)— গ্রন্থপাঠ আভাসিত।

শ্রীশ্রীমদনমোহন মন্দিরের দক্ষিণ-পূর্ব কোণে হংসলতা ছাড়া সম্মুখভাগের (দক্ষিণদিকের) ভিত্তি সংলগ্ন পটিতে (ত্রিখিলান প্রবেশ দ্বারের বাঁপাশে) জনৈক রাজপুরুষের সম্মুখে পুঁথিপাঠরত গোস্বামী চিত্রটিতে শ্রীনিবাসের মল্লরাজসভা বিজয়ের ঐতিহাসিক চিত্রের আভাস।

আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন সংগ্রহে রয়েছে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতকের কিছু টেরাকোটা-চিত্র। এগুলি অধুনালুপ্ত শাঁখারিবাজার, রাসতলা আর গোপালগঞ্জের অষ্টাদশ শতকের মন্দির থেকে সংগৃহীত। কিছু নৃত্যচিত্র, অবতার চিত্র, বাৎসল্য রসের চিত্র এবং বীণাধর গন্ধর্ব চিত্র ছাড়াও শ্রীশ্রীরাধাশ্যাম মন্দিরের অনুসরণে একটি অনন্তশয়ন বিষ্ণুর মূর্তি-চিত্র (অষ্টাদশ ঊনবিংশ শতকের) উল্লেখযোগ্য।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে ঊনবিংশ শতকেও এ অঞ্চলের মন্দির-টেরাকোটায় পৌরাণিক বাতাবরণটি প্রায় অক্ষুন্ন।

মোগল-সাম্রাজ্যের সামরিক বা জঙ্গী স্বরূপটি প্রায় প্রতিটি মন্দিরের টেরাকোটায় লক্ষ্য করা গেলেও জোড়বাংলার ভিত্ত সংলগ্ন পটিতে সমর-চিত্রের বিপুল সমারোহ। এখানে বন্দুক হাতে তুর্কী সৈন্য, উটের পিঠে দামামা বাদক, সুসজ্জিত অশ্বপৃষ্ঠে আরূঢ় অশ্বারোহীদের তুমুল যুদ্ধের কথা আগেই বলা হয়েছে। যাইহোক বিষ্ণুপুরের মন্দির-টেরাকোটার জগৎ, বিস্তারে আর ব্যাপকতায় যেমন বিপুল, সুচারু বিন্যাস আর অর্থবহ তাৎপর্যের প্রাসঙ্গিকতায় তেমনি সমকালীন তথা ক্লাসিক ভারতের পৌরাণিক সংস্কৃতির দর্পন স্বরূপ। একদিকে মোগল ভারত আর তারই প্রেক্ষাপটে ক্লাসিক ভারতের আভাস।



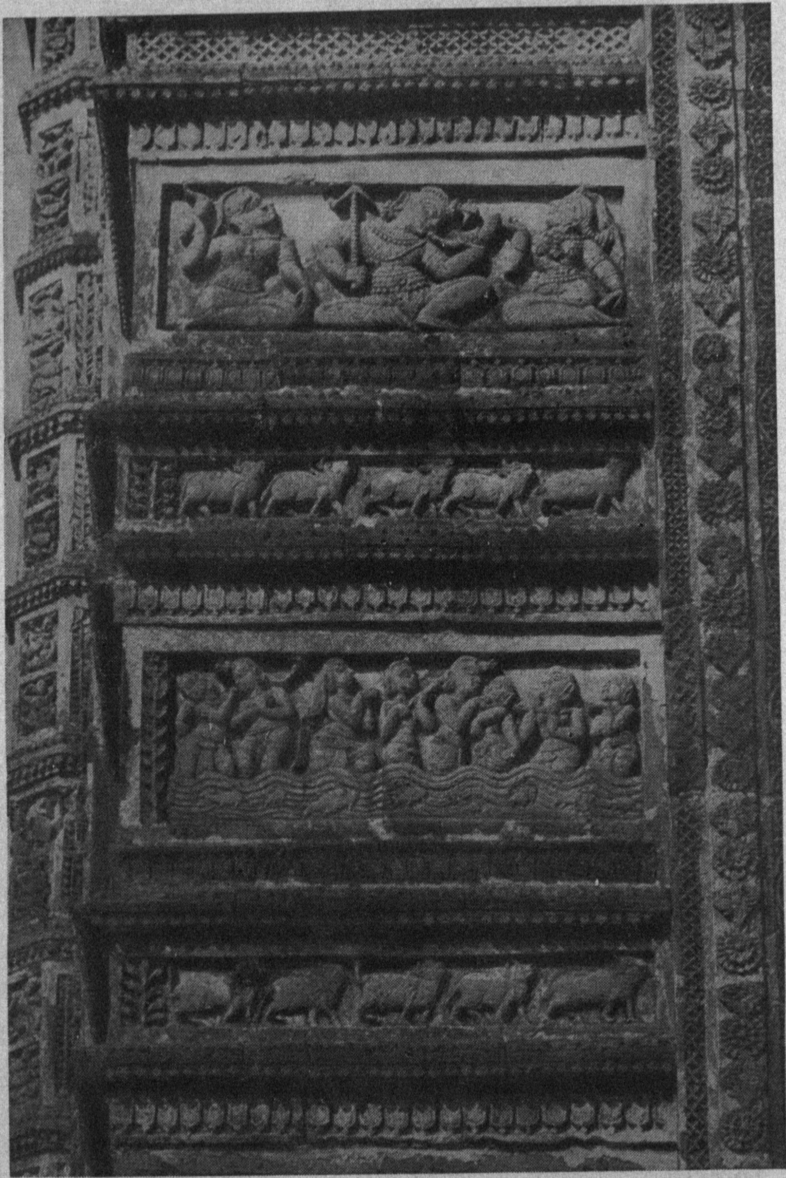
শ্যামরায়—পাদসেবন



জোড়বাংলা - সিন্ধুমুনিবধ

উপরে-জোড়বাংলা দক্ষিণের বারান্দা   নীচে-শিকার (জোড়বাংলা)





জোড়বাংলা পূর্ব-দক্ষিণকোণের অলঙ্করণ

কারুকার্যখচিত একটি স্তম্ভ [মদনমোহন মন্দির]

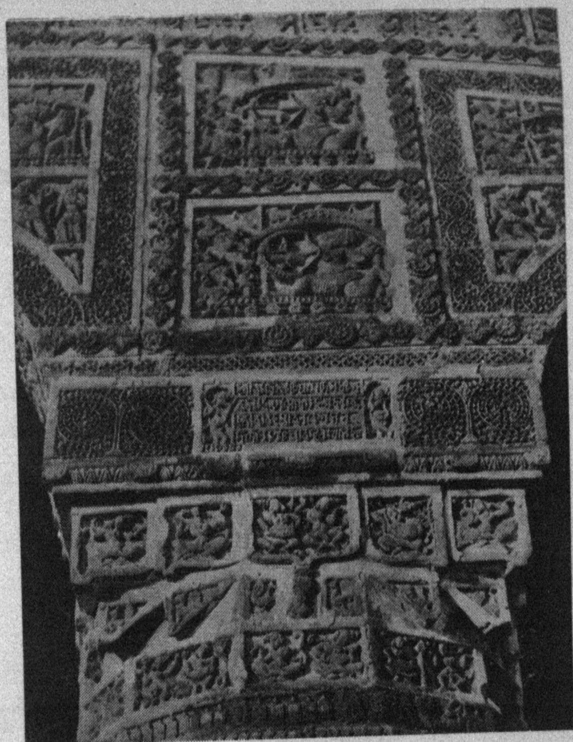


শ্যামরায় মন্দির

শ্যামরায় মন্দির



শ্রীশ্রীমদনমোহন মন্দির

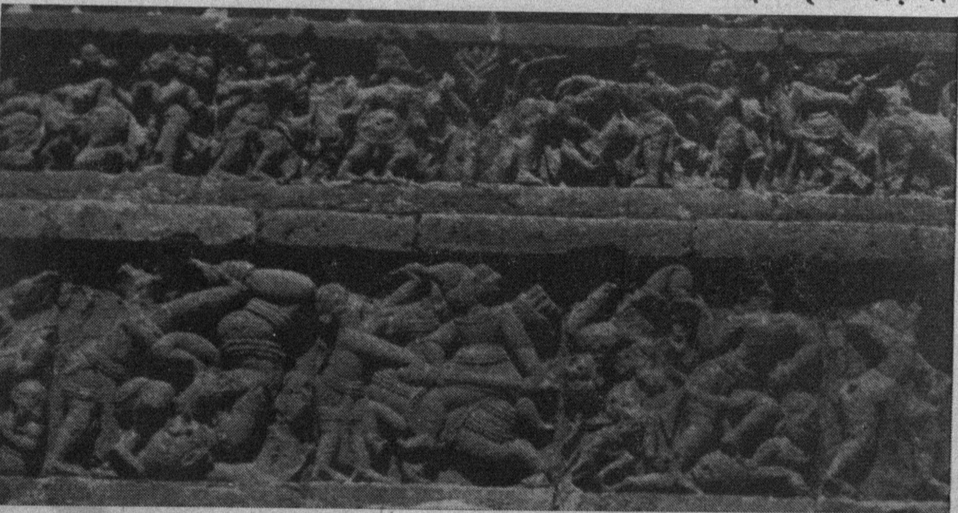


জোড়বাংলা



পর্তুগীজ রণতরী জোড়বাংলা (পশ্চিম)

উপরে-গোপীস্কন্ধে ন্যস্ত বাহুভার শ্রীকৃষ্ণ নৃত্যরত (শ্যামরায়) নীচে-যুদ্ধ দৃশ্য জোড়বাংলা





মোগল ভারতের সামন্তবিলাস [জোড়বাংলার উত্তর দিকের ভিত্তিচিত্র]



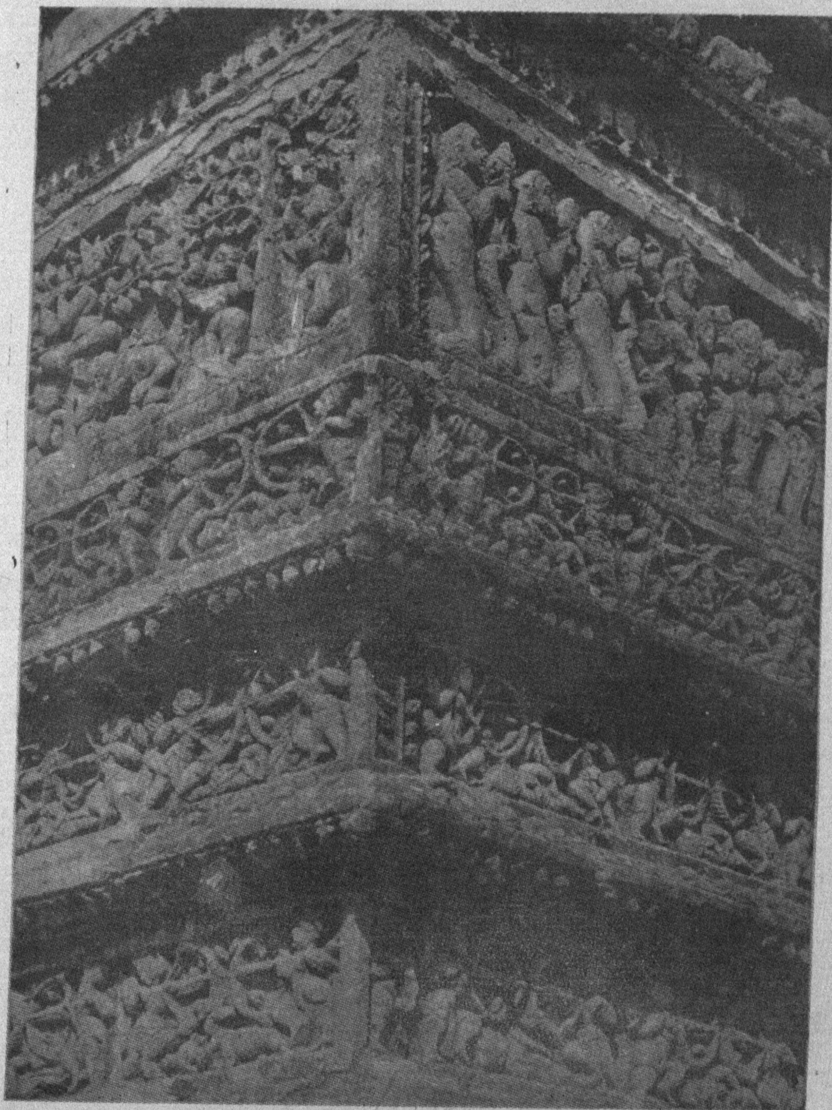
মোগল ভারতের সামন্তবিলাস [জোড়বাংলার উত্তরের ভিত্তিচিত্র]



যুদ্ধ দৃশ্য [জোড়বাংলা : দক্ষিণদিকের ভিত্তি সংলগ্ন পটিতে]



যুদ্ধ দৃশ্য [জোড়বাংলা : দক্ষিণদিকের ভিত্তি সংলগ্ন পটিতে]



জোড়বাংলার টেরাকোটা অলঙ্করণ



শ্যামরায় মন্দির (বিশিষ্ট ভঙ্গিমায় বলরাম)



শ্যামরায় মন্দির (মঞ্জরীভাব সাধনা)



জোড়বাংলা : (পোট্রেট ?)



জোড়বাংলা



নৃত্যছন্দে ছন্দিত দেহবল্লরীর বিচিত্র বিন্যাসে নক্সার বৈচিত্র্য
বিষ্ণুপুরের মন্দির-টেরাকোটা



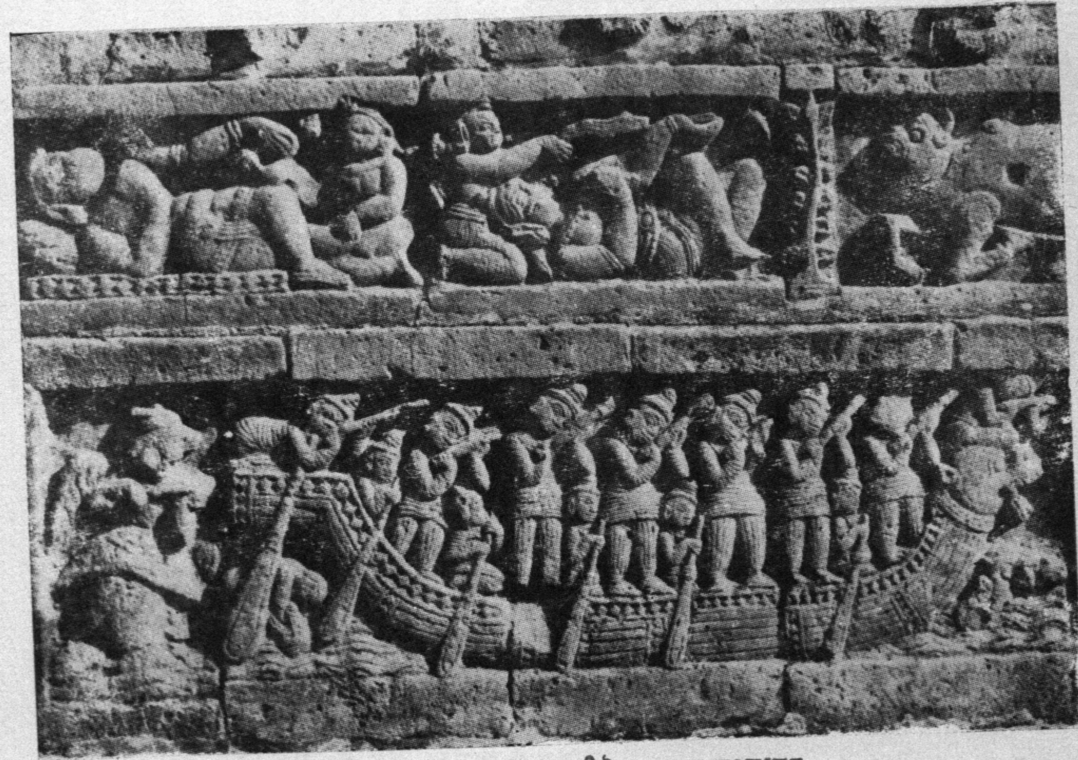
শ্যামরায় (দক্ষিণের ত্রিখিলান প্রবেশ দ্বার)



শ্যামরায় মন্দির

উপরে-মঞ্জরীতত্ত্বের পুঁথির পাতা   নীচে-ধুনুচি নৃত্য (শ্যামরায় দঃ-পূঃ কোণে)





পর্তুগীজ রণতরীর পাশে গীটার হাতে মৎস্যনর



জোড়বাংলার উত্তর দেওয়ালে সামন্তঘরণীর শিকারায়োজন



শ্যামরায় মন্দিরের রাসমণ্ডল



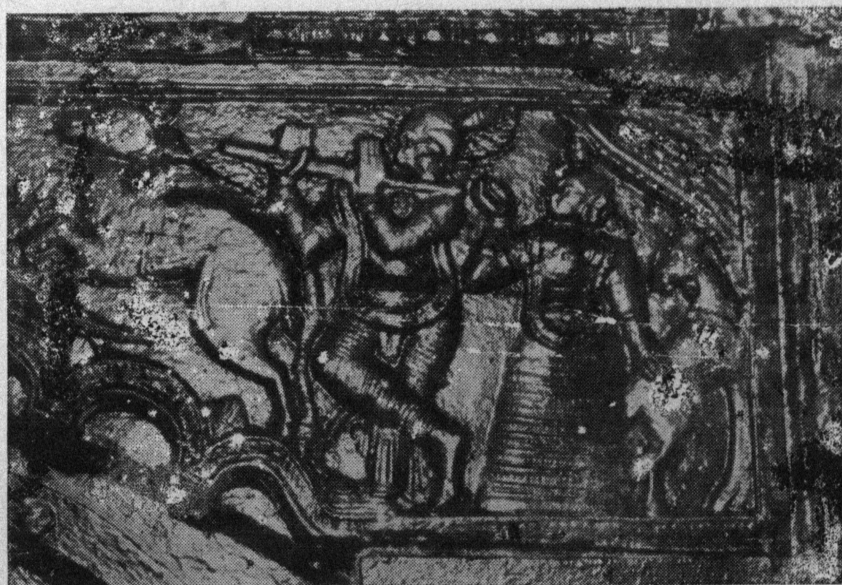
বোসপাড়ার শ্রীধর মন্দিরের টেরাকোটা



বাঘশিকার (জোড়বাংলার দক্ষিণ-পূর্বের ভিত্তিসংলগ্ন চিত্র)



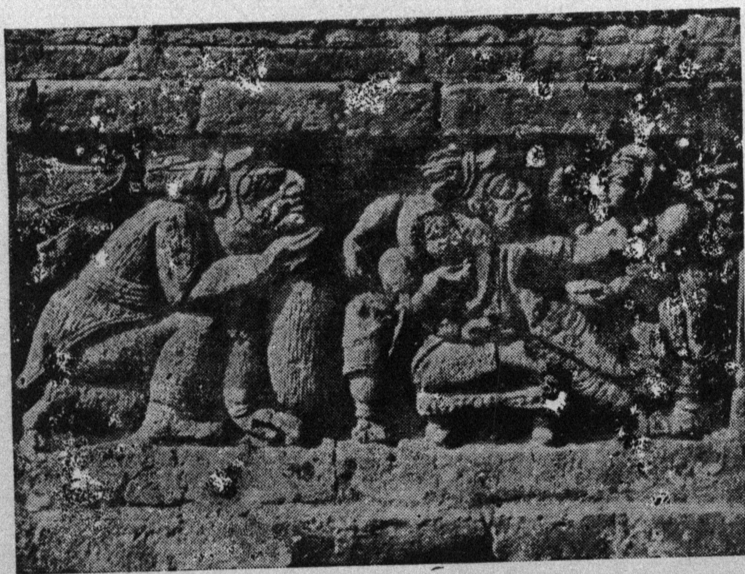
গৌরাঙ্গলীলা (কাঠ খোদাই) গ্রাম-ভড়া থানা-বিষ্ণুপুর



কৃষ্ণলীলা (কাঠ খোদাই) ভড়া



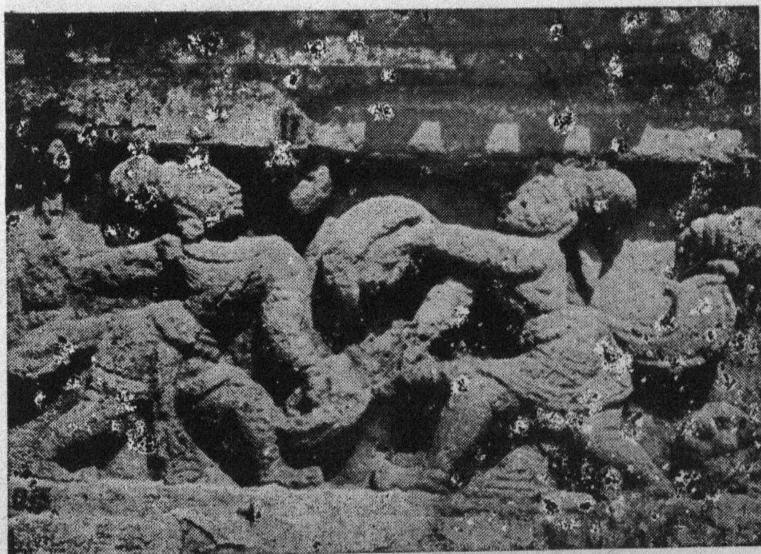
নৃত্যগীত টেরাকোটাচিত্র : জোড়বাংলা ত্রিখিলান স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ



মোগল ভারতের সামন্ত-বিলাসের চিত্র (জোড়বাংলার উত্তর দিকে)



জোড়বাংলা



জোড়বাংলা



শ্যামরায়



শ্যামরায়



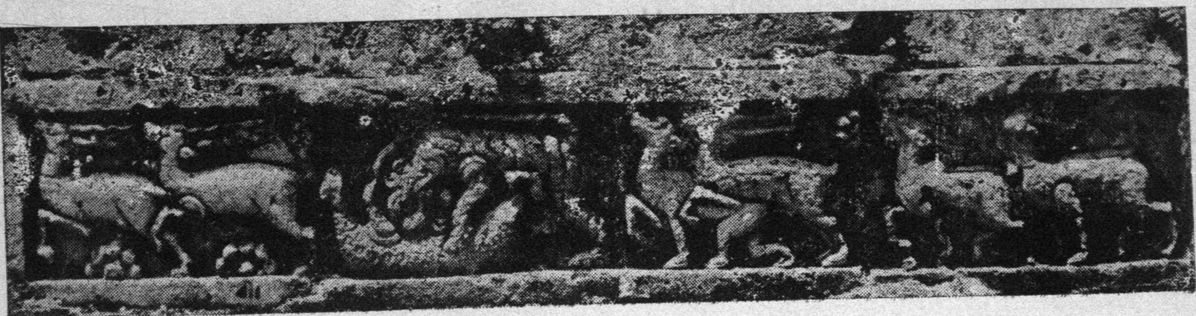
জোড়বাংলা (পূর্বদিক)



জোড়বাংলা



জোড়বাংলা



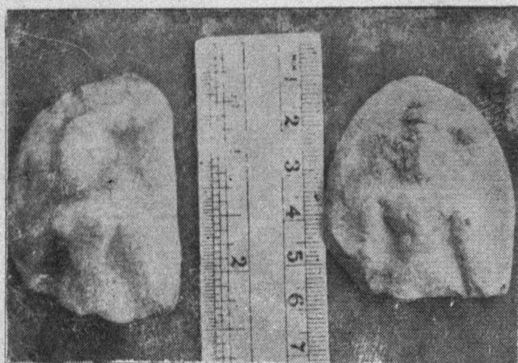
জোড়বাংলা



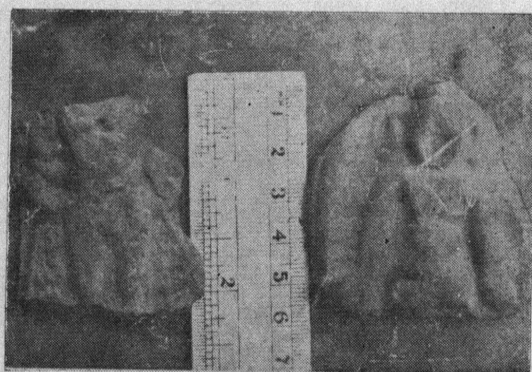
জোড়বাংলা ঃ নৃত্যাদির



জোড়বাংলা : মাতৃকা যুদ্ধ







প্রাচীন টেরাকোটা মূর্তিকা
(বিষ্ণুপুর আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন)



শ্যামরায় মন্দির (দক্ষিণের ত্রিখিলান প্রবেশ দ্বার)



জোড়বাংলা



শ্যামরায় মন্দির



শ্যামরায় মন্দির



শ্যামরায় মন্দিরের দক্ষিণের ত্রিখিলান প্রবেশ পথের স্তম্ভগাত্রে নৃত্যচিত্র

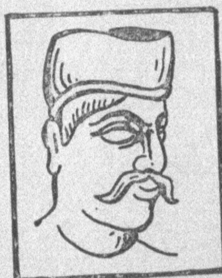


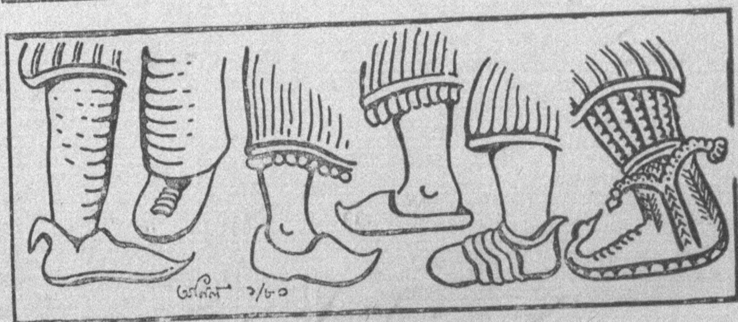
জোড়বাংলার দক্ষিণের ত্রিখিলান প্রবেশ পথের স্তম্ভগাত্রের নৃত্যগীতের চিত্রাবলী









বিষ্ণুপুরের মন্দির-টেরাকোটায় রূপায়িত বিচিত্র
জাতি-গোষ্ঠীর মানুষ, শিরস্ত্রাণ ও পাদুকা।





উপরে-পুঁথির পাটাচিত্র (যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন, বিষ্ণুপুর) নীচে-পাটাচিত্র রাসলীলা



আদিবাসী পট [কৃষ্ণলীলা]



মন্দির-টেরাকোটা (আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন সংগ্রহ)



'মাতা মোরে পুত্ররূপে করেন বন্ধন' : মন্দির-টেরাকোটা



মন্দির-টেরাকোটা (আচার্য যোগেশচন্দ্র পুরাকৃতি ভবন সংগ্রহ)


SHAMRAI

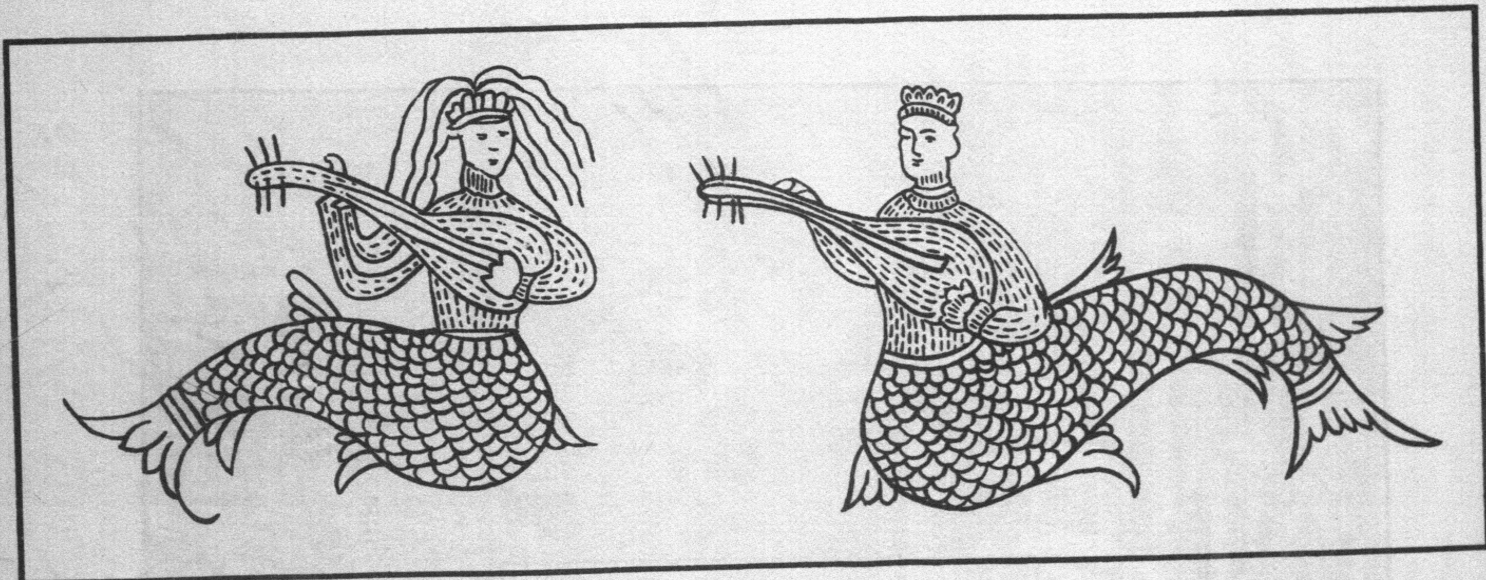

SHAMRAI

SHAMRAI

স্কেচ



স্কেচ (জোড়বাংলা)



Quilted hanging made for the Portuguese market cotton embroidered with wild silk, from Bengal, early 17 century. Calico Museums of Textiles, Ahmedabad.

জোড়বাংলা মন্দিরের পশ্চিমের ভিত্তি সংলগ্ন পটিতে পর্তুগীজ রণতরীর পার্শ্ববর্তী গীটার হাতে মৎস্যনর চিত্র দ্রষ্টব্য।


জলকেলি ঃ জোড়বাংলা বিষ্ণুপুর









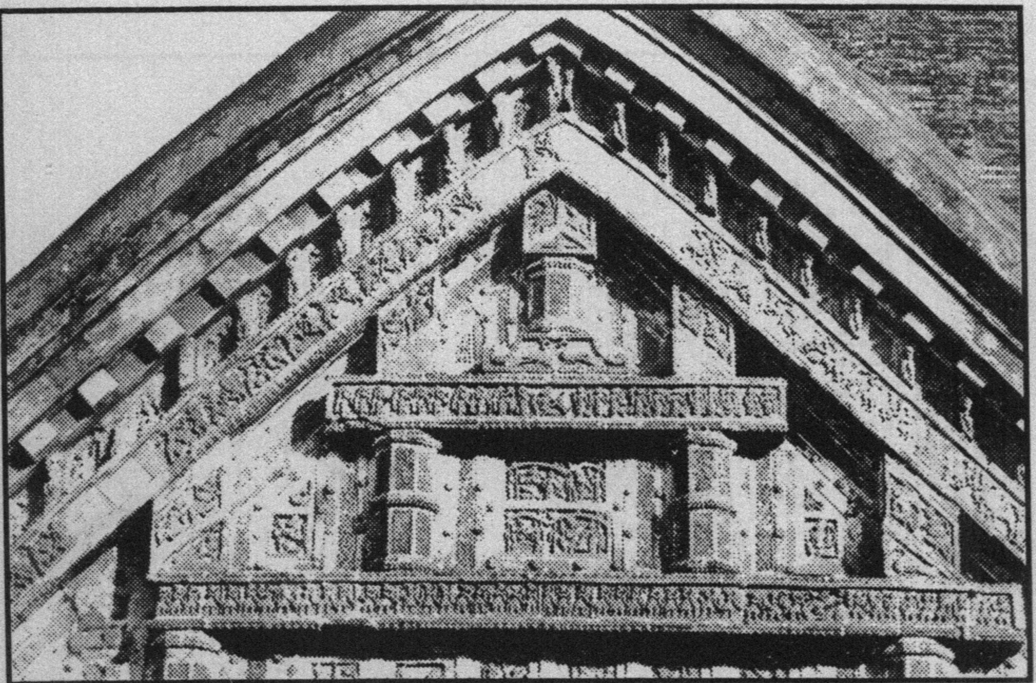



মহারাষ্ট্রের দশাবতারতাসের চিত্রাবলী
FIGURES OF DASAVATARA CARDS OF MAHARASTRA

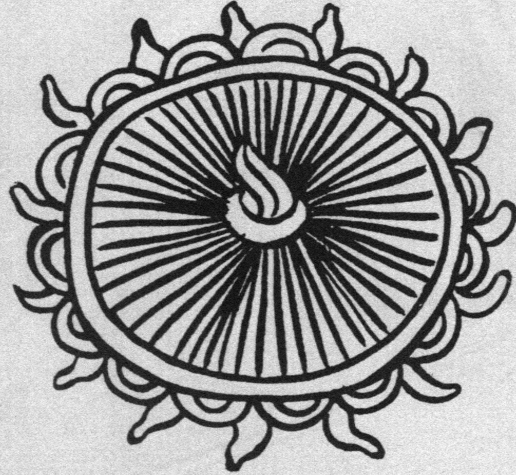


বিষ্ণুপুরের দশাবতারতাসের চিত্রাবলী

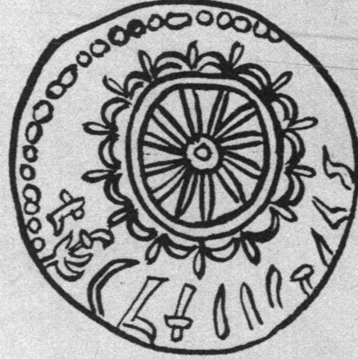
CIRCULAR CARDS OF VISHNUPUR



জোড়বাংলা মন্দিরের চালা দুটির শীর্ষদেশে কাঠের কাঠামোর নকল



শুশুনিয়ার বিষ্ণুচক্র
SUSUNIA WHEEL



বৃষ্ণি মুদ্রা
VRISNI COIN